রহস্য গোয়েন্দা অমনিবাস

চিরঞ্জীব সেন

সাহিত্য সংস্থা
১৪/এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪/এ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী, ১৯৬৩

প্রচ্ছদ
পার্থপ্রতিম

মুদ্রাকর
শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ
নিউ জয়গুরু প্রিন্টার্স
৩৩/ডি মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

কল্যাণীয়

জয়ন্ত দাস

প্রিয়বরেষু

রহস্য গোয়েন্দা অমনিবাস

বিষয় সূচি

রহস্য গোয়েন্দা
অমনিবাস

চিত্রকূট রহস্য

রাতের অন্ধকার যত কুটিলই হোক না কেন, সকালের সম্ভাবনাকে সে চেপে রাখতে পারে না। গোরার জীবনেও প্রভাতের বার্তা নিয়ে হঠাৎ একদিন একটা চিঠি এল। আর সেই চিঠি পড়েই গোরা বুঝল ভগবান সত্যিই আছেন। দুষ্ট গ্রহের প্রভাবে এক লহমায় ওর জীবনের সুখের প্রদীপটি হঠাৎ করে নিভে গেলেও এই চিঠিই সেই অন্ধকারে একমাত্র আশার আলো।

চিঠিটা এসেছে মধ্যপ্রদেশ থেকে।

বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত করবী নামে একটা জায়গা আছে। সেইখান থেকেই এসেছে চিঠিটা।

ওর বাবার বন্ধু সদাশিববাবু চিঠিটা লিখেছেন। বলেছেন দেরি না করে পত্রপাঠ চলে আসতে। চম্বল এক্সপ্রেসে চেপে সোজা করবী। একরাতের রাস্তা। এইখানেই একজন বিত্তবান ব্যবসায়ীর গদিতে ওর কাজের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। মাইনে খুব একটা বেশি নয়। মাত্র দু'হাজার টাকা। তবে ওর একার পক্ষে এই যথেষ্ট।

আনন্দে গোরার চোখে যেন জল এসে গেল।

চিঠিটা হাতে নিয়ে ছুটে গেল স্নেহদিদের বাড়ি।

স্নেহদি ওকে ছোট ভাইয়ের মতো ভালবাসেন। অত্যন্ত সুন্দরী এবং অবিবাহিতা। কথায় আছে অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, অতি বড় ঘরনীর না হয় ঘর। স্নেহদির বেলাতেও ঠিক তাই। ছেলেবেলায় মা মারা যান। বাবা আর বিয়ে করেননি। দুই দাদা আছেন। তারাও বড় হয়ে কেউ বিয়ে থা করলেন না। স্নেহদিরও বিয়ে হল না। অথচ বিয়ের বাসনা খুবই ছিল স্নেহদির। সে যাক। স্নেহদি এখন গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে দিব্যি সাধন ভজন করে সুখে আছেন। টাকা পয়সার অভাবও নেই স্নেহদিদের।

তা গোরার কপালও তো একইরকম।

স্নেহদির মা নেই। ওর মা বাবা কেউ নেই।

মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে একদিন ও বন্ধুদের সঙ্গে কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছিল, বিকেলবেলা বাড়ি এসে শুনল এক গুরুতর পথ দুর্ঘটনায় ওর বাবা-মা দুজনেই মারা গেছেন।

পাড়ার লোকেরা যখন ডেড বডি বহন করে নিয়ে এল তখন আর ওর মধ্যে ও নেই। উঃ সে কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য। চেনাই যায় না দুজনকে। একবার শুধু মা বাবার চরণে মাথা ঠেকিয়েই জ্ঞান হারিয়েছিল গোরা। কখন কীভাবে যে মুখাগ্নি করেছিল তাও স্মরণে আসে না ওর।

বাবা মা সামান্য মার্কেটিং-এর জন্য কলকাতায় গিয়েছিলেন। সম্ভবত নিউ মার্কেটে। ওইখান থেকে ফেরার সময় মেয়ো রোডের মুখে দুর্ঘটনা। দুর্দৈব একইসঙ্গে ছিনিয়ে নিল দুজনকে।

একা অসহায় গোরা চোখে যেন অন্ধকার দেখল।

একমাত্র মামা ছাড়া আর কোনও আপনজনও নেই ওর। কাকা, জ্যাঠা, দিদি, জামাইবাবু কেউ না। মামাও আবার থাকেন বারাণসীতে।

হাওড়া শহরের একান্তে বাড়িটা ওদের নিজস্ব তাই যা রক্ষে। দুটি ঘর, বাথরুম,

রান্নাঘর। একতলা বাড়ি। কিন্তু এ বাড়িতে গোরাকে দেখার মতো কেউ নেই। এক লহমায় সবই কেমন শূন্য হয়ে গেল। অভিমানে দুঃখে গভীর মনোবেদনায় গোরা যেন বোবা হয়ে গেল। এমন ভাগ্য বিপর্যয়ও মানুষের হয়?

মা বাবার স্নেহ মমতার ছায়ায় যে কিনা উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখে শশীকলার মতো বড় হচ্ছিল কোন অভিশাপে যে তার এমন হল তা কে জানে?

মৃত্যু যে কী ভীষণ-ভয়াল-ভয়ঙ্কর তা ও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল।

এক গেলাস জল কখনও গড়িয়ে খায় নি যে সেই গোরা একা ঘরে যেন হাঁফিয়ে উঠল। অসহায় কিশোর গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগল দিনরাত। উঠোনে ঘরে সর্বত্রই মা বাবার অস্তিত্বকে অনুভব করতে লাগল। মায়ের রাঙা চরণের ছন্দ, বাবার গম্ভীর গলার আওয়াজ মিলিয়ে গেছে বলে মনেই হল না। তা সেই দুঃসময়েই ওর সেই চরমতম বিপদের দিনে স্নেহময়ী জননীর মতো বা বড় দিদির মতো ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন স্নেহদি। অসহায় গোরাকে বুকে টেনে, চোখের জল মুছিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে নিজের কাছে এনে রাখলেন। তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেলে নিজেকে সামলে নিল গোরা। তবুও এই কৈশোরেও সে বেশ বুঝতে পারল ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে ওর চেয়ে হতভাগ্য আর কেউ নেই।

স্নেহদির দাদাদের চেষ্টায় ওর মা বাবার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট ওর আয়ত্বে এল। মাধ্যমিক পাশ করে কলেজেও ভর্তি হল ও। নিজে রান্না করতে পারে না, সে দায়িত্বও স্নেহদিই নিলেন। সত্যি স্নেহদিরা না থাকলে কী যে হত ওর।

তাই চিঠিখানা নিয়ে স্নেহদির হাতে দিতেই স্নেহদি বুকে জড়িয়ে ধরলেন গোরাকে। বললেন, "দেখলি তো আমার রাধামাধব ঠিকই আছেন। তিনিই মুখ তুলে চেয়েছেন তোর দিকে। সদাশিববাবু তোর বাবা মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়েই ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করছিলেন। এতদিনে একটা কাজের কাজ করেছেন তিনি। আমার মনে হয় এতে তোর ভালই হবে।"

গোরা বলল, "তোমারই দয়ায় কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম স্নেহদি। মন দিয়ে পড়াশুনাও করছিলাম। এখন এই অবস্থায় চলে গেলে দারুণ ক্ষতিও হবে। তবু আমি যাব। কেন যাব জানো? এখানে আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। সেই সবই আছে। মায়ের হাতে সাজানো ঘর, অথচ মা নেই। বাবার কত সখের জিনিসপত্তর, অথচ বাবা নেই। সবসময় ঘুরতে ফিরতে ওঁদের কথা মনে পড়ে যায়। মায়ের কোনও জিনিস আমি একদিনের জন্যও এদিক ওদিক করিনি। জানি মা বাবা আমার জীবনে আর কখনও ফিরে আসবেন না, তবুও না। ঘরের একটি জিনিসপত্তর এদিক ওদিক হলে মা কত রাগ করতেন। তাই মা যদি অলক্ষ্য হতে দেখেন তাহলে দুঃখ করবেন তো। মাঝে মাঝে মা আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, "খোকা, তোর খুব কষ্ট! নারে? কী করব বল, আমরা তো নিজের ইচ্ছেয় তোকে ছেড়ে আসিনি। তুই...।" বলতে বলতেই গোরার চোখ দুটো জলে ভরে উঠল।

স্নেহদি তাঁর স্নেহস্পর্শে এবং স্নেহাঞ্চলের খুঁট দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। বললেন, "কী হবে অত বেশি সেন্টিমেন্টাল হয়ে? বরং তাঁদের কথা স্মরণ করে জীবনে দাঁড়াবার চেষ্টা কর, দেখবি সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথাই চিন্তা কর না, কারাগারে জন্ম নিলেন, তারপর পিতা বসুদেব প্রবল দুর্যোগ মাথায় নিয়ে রাতের অন্ধকারে

সদ্যজাতকে রেখে এলেন যমুনা পার হয়ে নন্দালয়ে। নিজের বাবা মা থাকতেও অন্যের কাছে মানুষ হতে হল স্বয়ং ভগবানকেও।"

"কিন্তু স্নেহদি, তিনি তো শিশুকাল থেকেই অন্যকে বাবা মা বলে জেনে এসেছেন। আমার তো তা নয়। আমি যে সতেরোটা বছর ধরে তাঁদের চিনেছি। আদর যত্ন ভালবাসা পেয়েছি। আমার মায়ার বাঁধন যে ছেঁড়বার নয়।"

"সে জানি। তবু ভবিতব্যকে তো মানতেই হবে।"

"মানব। মানব বলেই এখান থেকে চলে যাব আমি। কেননা একা ওই বাড়িটাতে আমি থাকতে পারছি না আর। মনে হচ্ছে আর কিছুদিন এইভাবে থাকলে হয়তো আমি পাগল হয়ে যাব। আসলে মাকে ছেড়ে কখনও আমি থাকিনি, কোথাও যাইনি। দিদিমার মৃত্যুর পরে মামার বাড়ির সঙ্গেও সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। মামা থাকেন বারাণসীতে। তিনি অবশ্য বার বার আমাকে ওখানে চলে যেতে লিখেছেন। মা বাবা মারা যাবার পর আমাকে নিয়ে যাবার জন্য এসেওছিলেন তিনি। কিন্তু আমি যাইনি। আমার মামী মানুষটি সুবিধার নন। তাঁর পাল্লায় পড়লে জীবন আমার অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। দিদিমাকে যা কষ্ট দিয়েছেন উনি।"

"সে সব তো আমি জানি। তবু ভেবে দেখ কী করবি। তবে আমার মন বলছে বরাবরের জন্য না হোক, কিছুদিনের জন্য অন্তত তোর কোথাও যাওয়া দরকার। মনে হয়, অজানা অচেনা দেশে নতুন পরিবেশে গেলে তোর মনেরও অনেক পরিবর্তন হবে। ওখানে অনেক পাহাড়-পর্বত আছে নিশ্চয়ই। নদী-নালাও আছে। পাহাড়ে উঠবি, নদীতে নাইবি। জঙ্গলে ঘুরবি। পাখির ডাক শুনবি। ঝরনার জল খাবি। তবে হ্যাঁ, ঝরনার জল কিন্তু না ফুটিয়ে খাবি না কখনও।"

"বুঝলাম। সে জল আমাকে ফুটিয়ে দেবে কে? সেখানে কি আমার মা আছেন না স্নেহদি আছে?" এই বলে একটু চুপ করে থেকে গোরা আবার বলল, "আচ্ছা স্নেহদি, আমি যদি ওখানে গিয়ে দু'একমাস পরে কোনও ঘর ভাড়া নিই তুমি তাহলে আমার কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকবে?"

"আমার কি সে উপায় আছে রে ভাই?"

"মা তোমাকে কত ভালবাসতেন। তোমাকে দেখলেই আমার মা'র কথা মনে হয়। মনে হয় এই বুঝি আমার মা-ও তোমার পিছু পিছু এসে পড়বেন। আমার মতো তোমারও যদি একটা ছেলে থাকত তা হলে?"

স্নেহদি ম্লান হেসে বললেন, "তা হলে? ছেলেকে আমি কখনই আঁচলে গিঁট বেঁধে রেখে দিতাম না। যাই হোক, আগে তুই মন দিয়ে কাজকর্ম কর, ঘর-টর নে। তখন সময় করে এক-আধবার নিশ্চয়ই যাব তোর কাছে। আমার যে ঘর থেকে বেরনোর অসুবিধে কত তুই তো সবই জানিস। বহুকষ্টে একবার বৃন্দাবন গিয়েছিলাম। তবু যাব। তোর কাছে নিশ্চয়ই যাব।"

গোরা বলল, "যেও কিন্তু। এখন শৈলেনদাকে বলো আমার যাবার ব্যবস্থাটা করে দিতে।"

শৈলেনদা হল স্নেহদির বড়দা। উনি রেলে কাজ করেন। ভাগ্যক্রমে বাড়িতেই ছিলেন সেদিন। সদাশিববাবুর চিঠিটা পড়ে বললেন, "করবী! সে আবার কোন স্টেশন। এরকম

স্টেশনের নাম তো শুনিইনি কখনও। কোথায় সেটা?"

স্নেহদি বললেন, "ও যদি সব জানবে তাহলে তোমার কাছে আসবে কেন? চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে জায়গাটা মধ্যপ্রদেশে। এবং বুন্দেলখণ্ডে। তা তোমার রেলের টাইমটেব্‌লটা একবার দেখলেই তো সমস্যা মিটে যায়।"

গোরা আশান্বিত হয়ে শৈলেনদার মুখের দিকে তাকাল। শৈলেনদা রেলের লোক। ঠিকই খুঁজে বের করবেন জায়গাটা কোথায়।

গোরাকে বসিয়ে রেখে শৈলেনদা টাইমটেব্‌ল দেখে বললেন, "পেয়েছি। চম্বল এক্সপ্রেসে যখন চাপতে বলেছে তখন এটাই হবে।" বলেই এক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, "এই তো, চিত্রকূটধাম করবী। বিকেলবেলা তিনটে পঁচিশের গাড়িতে চাপলে পরদিন সকাল সাড়ে নটা নাগাদ পৌঁছে যাবে। কিন্তু একা অতদূরে ছেলেটা যাবে কী করে?"

গোরা বলল, "আপনি আমাকে টিকিট কেটে গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে আসবেন চলুন। আমি ঠিক পৌঁছে যাব। যাবার আগে দিনক্ষণ জানিয়ে সদাশিববাবুকে একটা টেলিগ্রাম করলে উনি নিশ্চয়ই নিতে আসবেন আমাকে।"

শৈলেনদা বললেন, "কিন্তু কোনও কারণে দৈবাৎ তিনি যদি না আসেন? তা হলে কী করবি?"

"কী আর করব? ভেসে চলেছি। না হয় আরও ভেসে যাব।"

শৈলেনদা বললেন, "তোর একটা থ্রি-টায়ারের টিকিট কালই আমি কেটে আনছি। যেদিনের পাব সেদিনেরই আনব তো?"

"হ্যাঁ। আমাব মন ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আপনি যে ভাবেই হোক আমার যাবার ব্যবস্থাটা করে দিন।"

স্নেহদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ওর এই সুখবরটা বাড়ি বাড়ি বলে আসতে ভুলল না গোরা। আত্মীয়স্বজন না থাক, পাড়া প্রতিবেশীরা তো আছেন। তাঁরাও সবাই যা করেছেন ওর জন্য তা ভোলবার নয়। শুধু স্নেহদিরা নয়, ওর ওই বিপদের দিনে সবাই এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিন। এখনও শরীর খারাপ হলে এ বাড়ি ও বাড়ির বউ-মেয়েরা এসে দেখাশোনা করে ওর। গোরার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। ও সকলের সঙ্গেই দেখা করে ওর চাকরির কথাটা বলল। শুনে সবাই খুশি হল এবং যাবার ব্যাপারে উৎসাহ দিল ওকে।

গোরা নিশ্চিন্ত। শৈলেনদা যখন টিকিট কাটার দায়িত্ব নিয়েছেন তখন সে টিকিট ও পাবেই। তবে কিনা যাওয়ার ব্যাপারে ওর অসুবিধে শুধু একটাই, সেটা হল মা বাবার সযত্নে সাজানো এই ঘরগুলো দেখবে কে? এমনিতেই তো ধুলো পড়ে সব মলিন হয়ে যাচ্ছে। কাজের লোক ছাড়িয়ে দেওয়ার ফলে হতশ্রী হয়েছে সব। মাঝে মধ্যে স্নেহদি এসে একটু যা ঝাড়পোছ করে। এই খাট, আলমারি, ড্রেসিং-টেবিল, রেডিও, টিভি, মায় ফ্রিজটি পর্যন্ত পড়ে থাকবে দিনের পর দিন তালাবন্দী হয়ে। এ পাড়ায় চোরের উৎপাত খুব কম। তবুও ঘরে কেউ নেই দেখে হঠাৎ করে রাতদুপুরে কোনও চোর এসে যদি চুরি করে? চুরি-ডাকাতির কথা মনে হতেই গোরার মুখ শুকিয়ে যায়। কিন্তু দু'হাজার টাকা মাইনের লোভও গোরা সামলাতে পারে না।

ওদের পাড়ায় ফণীবাবু নামে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি বললেন, "তুমি যাচ্ছ বটে, তবে বাবা আমার মনটা কিন্তু খুব একটা সায় দিচ্ছে না।"

গোরা বলল, "কেন?"

"এখন তোমার ছেলেমানুষ বয়েস। ভাগ্য বিপর্যয়ের ওপর কারও হাত নেই। ইউ.বি.আই এর অপলকবাবু ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে ডি.বি.ডি./এফ.ডি এমন কি তোমার মা বাবার নামে রাখা লকারের অধিকারও খুব সহজে তোমাকে পাইয়ে দিয়েছেন। যদিও তোমার নামে নমিনি করা ছিল সব কিছুই। তবুও দু' চারদিনের মাথায় করিয়ে দিয়েছেন তো সব। একটু সাবালক হলে তোমার বাবার অফিসের চাকরিটাও হয়তো তুমি পাবে। তা হলে? কীসের অভাব তোমার? এখন মাসে মাসে হাজার তিনেক টাকার সুদও তো পাচ্ছ। তুমি তো কারও মুখাপেক্ষি নও। তাই বলি সামান্য দু'হাজার টাকার জন্য ঘর দোর ফেলে রেখে কেন যাবে তুমি ওই দূর দেশে চাকরি করতে? একা একা ট্রেন জার্নি করে ওই দূরপাল্লায় পাড়ি দিতে গিয়ে হয়তো কোনও বাজে লোকের পাল্লাতেই পড়ে যাবে তুমি। তাই বলি কি এখন ওইসব ধান্দা ছেড়ে মন দিয়ে লেখাপড়াটা কর। কলেজে যাচ্ছো তো নিয়মিত? উচ্চমাধ্যমিকটা পাশ করে বি. এ. পড়।"

ঠিক একই কথা বলল ওর বন্ধু গৌতমের বোন গোপাও। গোপা আগামীবারে মাধ্যমিক দেবে। বলল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে গোরাদা? ওই সদাশিববাবুর চিঠি পেয়ে কী তুমি করতে যাচ্ছ? তুমি তো দুদিনে লোপাট হয়ে যাবে। তোমার কাছে টাকা বড় না নিজের ভবিষ্যৎ? তোমার কলেজ বন্ধ হবে, কোচিং বন্ধ হবে, লেখাপড়ার বারোটা বাজবে।"

গোরা বলল, "তুই ঠিকই বলেছিস গোপা। ফণীবাবুও ওই একই কথা বললেন।"

"উনি অভিজ্ঞ লোক। তাই যা বলেছেন বেশ বুঝেশুনেই তোমার ভালর জন্য বলেছেন। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না স্নেহদি তোমাকে যাবার ব্যাপারে এত উৎসাহ দেন কী করে? উনিই তো তোমাকে বারণ করতে পারতেন।"

"শৈলেনদার কিন্তু একটু অনিচ্ছা রয়েছে বলে মনে হল।"

গোপা বলল, "আমি এখন ভাবছি অন্য কথা।"

"কী ভাবছিস তুই বল?"

"এর মধ্যে আমি যেন কেমন এক রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।"

"কি রকম?"

"সদাশিববাবু যখন তোমার বাবার বন্ধু তখন উনি কি জানতেন না তোমার বয়স কত? তুমি একজন কলেজ-পড়ুয়া ছেলে। কত ছেলেমানুষ তুমি। তাই নিজে না এসে একা একা ওই দূরদেশে কী করে তোমাকে যেতে বলেন উনি? তা ছাড়া আরও রহস্য আছে। কাজটা কোনও সরকারি অফিসে বা কোনও নামীদামী কোম্পানির ফার্মে নয়, একজন ব্যবসায়ীর গদিতে। সেখানে কী কাজ করবে তুমি? চা-জল বইবে? মাল ওজন করবে? না খাতা লিখবে? প্রথমটা তোমার দ্বারা সম্ভব হলেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টা অসম্ভব। মাল ওজন তোমার বয়সী ছেলের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। আর খাতা লেখা? ওখানে তোমার বাংলা লেখা কে বুঝবে? অতএব আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব আছে ওদের, এবং এটা একটা টোপ।"

গোরা টান টান হয়ে উঠে দাঁড়াল এবার। বলল, "তুই ঠিক বলেছিস গোপা। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। ওখানে আমার না যাওয়াটাই উচিত।"

"এবং আমাদেরও উচিত এখন থেকে তোমার বাড়িতে আমাদের একটা নিয়মিত আড্ডার ব্যবস্থা করা।"

গোরা বলল, "তাই কর। তা যদি হয় তা-হলে আমাকে আর একা থাকতে হয় না। 'বোর' লাগবে না।"

"বুঝতে পেরেছি। একা থেকে থেকেই তোমার অলস মস্তিষ্কে এইরকম চাকরির ভূত চেপেছে। একটা পাস তুমি করেছ ঠিকই। অন্তত গ্র্যাজুয়েট হতে না পারলে এই কমপিটিশনের মার্কেটে তুমি তো একটা মূর্খের সমান।"

গোরা এবার নিজের মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে স্থির একটা সিদ্ধান্তে এসে বিকেলবেলা আবার স্নেহদিদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

স্নেহদি বললেন, "কী ব্যাপার গোরাচাঁদ? দুপুরে এসে আবার এখন এলি যে? বুঝেছি তোকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবার জন্য আমাকেও যেতে হবে তাই তো?"

গোরা বলল, "না স্নেহদি। শৈলেনদাকে বারণ করে দাও আমার জন্য টিকিট কাটতে হবে না। আমি যাচ্ছি না।'

"সে কী! কেন?"

"আমার মনটা ঠিক সায় দিচ্ছে না।"

"কেউ কিছু উল্টোপাল্টা বুঝিয়েছে বুঝি?"

"না, ঠিক তা নয়।"

"তবে?"

গোরা তখন সব বলল।

স্নেহদি বললেন, "ওরে পাগল, জীবনে ঘর না ছাড়লে উন্নতি হবে কী করে? তোর চেয়েও কত ছোট ছোট ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে জীবনে উন্নতি করেছে। তোর ক্ষতি হয় এমন কিছু কি আমি ভাবতে পারি? গোবিন্দর গো' আর রাধার 'রা' এই নিয়ে গোরা। তোর এ নাম তো আমিই রেখেছি। কাজেই আমি যেখানে যেতে বলছি তোকে সেখানে তুই অন্য মত করিস না। তোকে যে যা বলেছেন বা বলেছে তা সবই ঠিক। আমিও বলছি লেখাপড়া ছেড়ে আর কিছু তুই করিস না। তোর দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে। রাজগীর, বেনারস, পুরী, দেওঘর—বাবা মায়ের সঙ্গে অনেকবার গেছিস তুই, তাই ট্রেন জার্নি তোর কাছে ভয়াবহ নয়। সদাশিববাবু তোর বাবার বন্ধু। তিনি কী বুঝে তোর জন্য এইরকম একটা ব্যবস্থা করেছেন, কেনই বা করেছেন তা আমরা কেউই জানি না। ওই কাজ যে তোর পক্ষে সম্ভব হবে না তাও জানি। কিছুদিনের মধ্যেই ওখান থেকে তুই যে পালিয়ে আসতে পথ পাবি না তাও জানি আমি। তবু তোকে যেতেই হবে। তোর কি ভয় পেলে চলে? একলা যাবার জন্যই যে তুই। আমার কথা শোন, অমত করিস না, তুই যা। কেমন কাজ, কী ধরনের কাজ দেখেই আয় না। বেশিদিন নয়, একমাসের জন্য যা। এতে তোর ভয় ভীতি কাটবে, অভিজ্ঞতা হবে আর একঘেয়েমিও দূর হবে। মাসখানেক থেকে হাওয়া বদল করে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবি তুই। সবকিছুই তোর বজায় থাকবে। একমাস স্কুল-কলেজ কামাই করলে কোনও ক্ষতিই হবে না তোর।"

স্নেহদির এই কথাটা খুবই মনে ধরল ওর।

এই নাহলে স্নেহদি? ঠিকই বলেছেন উনি। এক মাসের জন্য কোনও দূরদেশে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে গেলে ক্ষতি কী? চাকরির জন্য না হোক, দেশভ্রমণের জন্য কদিন একটু ঘুরে আসতে বাধা কোথায়?

গোরা স্নেহদির সঙ্গে পরামর্শ করে বাড়ি চলে এল। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত নিজের সম্বন্ধে অনেক ভাবনাচিন্তা করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর যেখানে যা কিছু ছিল সব এক জায়গায় জড় করে একটা স্যুটকেশে পুরল। দেওয়ালে টাঙানো বাবা-মায়ের যে ছবিটা ছিল সেটা মাথার কাছে নিয়ে এসে কাঁদল অনেকক্ষণ ধরে। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়ল একসময়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও কত কী স্বপ্ন দেখল। কখনও দেখল মা-বাবার সঙ্গে ও ট্রেনের থ্রি-টায়ারে শুয়ে কোথায় যেন বেড়াতে যাচ্ছে। কখনও দেখল বাবা মায়ের সেই মৃত্যুর দৃশ্যটা। কখনও দেখল...।

যাই হোক, এক ঘুমে রাত কাবার করে ও চাকরির লোভে নয়, নতুন দেশ দেখার সংকল্প নিয়েই নিজেকে তৈরি করতে লাগল।

এখন শুধু শৈলেনদার কাছ থেকে ওর টিকিটটা পাবার অপেক্ষা।

কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে ওর বর্তমান অবস্থার কথা জানিয়ে এক মাসের ছুটি চেয়ে নিলেই হবে।

একবার সাহস করে সকলের একা একা ঘর ছেড়ে বেরোতে পারলে একঘেয়েমি কাটাবার জন্য মাঝে মাঝেই এদিক সেদিকে চলে যেতে পারবে ও। আর তখন একটু একটু করে বিয়োগান্ত দিনগুলোকে ভুলে যেতে পারবে। গোরার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

দুই

যথাদিনে যথাসময়ে যাত্রা হল শুরু। স্নেহদি, শৈলেনদা, গোরার বন্ধুরা সবাই হাওড়া স্টেশনে এল ওকে ট্রেনে তুলে দিতে।

জানলার ধারে সাইড লোয়ারে একটা বার্থ পেয়েছে গোরা। আপার বার্থে আছেন একজন সম্ভ্রান্ত যুবক। উনি গোয়ালিয়রে যাবেন।

স্নেহদি সেই যুবককে অনেক করে বলে দিলেন গোরাকে একটু চোখে চোখে রাখতে। এই প্রথম ও একা দূরদেশে যাচ্ছে। সঙ্গে সেরকম কেউ নেই।

যুবক কথা দিলেন।

স্নেহদি গোরাকেও বললেন, "ট্রেন থেকে একদম নামবি না। খাবার দাবার কিছু কেনবার দরকার হলে গাড়িতে বসেই কিনবি। জল যা দিয়েছি তাতে তোর হয়ে যাবে। পৌঁছেই চিঠি দিবি।"

গোরা সুবোধ বালকের মতো ঘাড় নাড়ল।

ট্রেনও ছাড়ল।

দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে বিদায় নিল গোরা। মা বাবা বেঁচে থাকলে আজ কি ওকে এইভাবে কোথাও যেতে হত? যদিও এই যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে ওর নিজের মতামতই যথেষ্ট ছিল তবুও কয়েকদিনের জন্য একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে বলেই ওর এই

একক যাত্রা। বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা এদের কাছ থেকে ও কী বেঁচে থাকবার মতো একটা উপায় খুঁজে পাবে না? নিশ্চয়ই পাবে। এ জগতে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, কিছুই তো স্থায়ী নয়।

ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে ট্রেন। দেখতে দেখতে ব্যান্ডেল বর্ধমান পার হয়ে গেল।

ওর সামনের সিটে বসা সেই যুবক অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলেন গোরাকে। একই সিটে মুখোমুখি বসেছেন দুজনে। তাই কথা না বলে থাকা যায় না। বিশেষ করে সবাই যখন তাঁকে অনুরোধ করেছেন এই অসহায় ছেলেটির দিকে নজর রাখতে তখন তারও কিছু কর্তব্য আছে বৈকি।

যুবক জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি ভাই?"

গোরা বলল, "আমার নাম গোরাচাঁদ সরকার।"

"নামের সঙ্গে তোমার চেহারার দেখছি দারুণ মিল।"

গোরা একটু ম্লান হাসল।

"চিত্রকূটে তুমি কেন যাচ্ছো? বেড়াতে?"

"আমি যাচ্ছি করবীতে।"

"ওই হল। তুমি যেখানে ট্রেন থেকে নামবে সেই জায়গাটার নামই হল চিত্রকূটধাম করবী। স্থানীয় লোকেরা কারভীও বলে। এর আগে তুমি কখনও যাও নি বোধ হয়!"

"না।"

"তা হলে? এত জায়গা থাকতে ওই বন-জঙ্গলের দেশে একা একা, ব্যাপারটা কী?"

গোরা চুপ করে রইল।

"তোমার বাবা কী করেন?"

"আমার বাবা বেঁচে নেই।"

"আই অ্যাম স্যরি। তোমার মা?"

গোরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছল ছল চোখে বলল, "আমার বাবা মা দুজনেরই দেহান্ত হয়ে গেছে।"

যুবক মর্মাহত হয়ে বললেন, "ও মাই গড। স্টেশনে যে সুন্দরী মহিলা তোমাকে তুলে দিতে এসেছিলেন উনি কি তোমার দিদি?"

"উনিই আমার সব। মায়ের মতো, দিদির মতো। আমার বাবা মায়ের আমিই একমাত্র সন্তান।"

যুবক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "করবীতে তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"আমার বাবার এক বন্ধু ওখানে থাকেন। উনি আমার একটি কাজেরও ব্যবস্থা করেছেন। তাই—।"

যুবক চমকে উঠলেন। বললেন, "সে কী! এই বয়সে ওখানে গিয়ে কী কাজ করবে তুমি? কতই বা বয়স তোমার? ষোলো কি সতেরো। তুমি তো দেখছি নেহাতই ছেলেমানুষ।"

"কী কাজ করতে হবে তাও আমি জানি না। মনের মতো না হলে ফিরে যাব।"

যুবক বললেন, "শোনো, আমার ঠিকানাটা তুমি রেখে দাও। আমি অবশ্য তোমাকে কোনও কাজকর্মের ব্যবস্থা করে দিতে পারব না। তবে যদি তুমি এখানে এসে কোনও

বিপদে পড় তা হলে চলে এসো আমার কাছে। এই বিদেশ বিভুঁয়ে তোমাকে আমি অন্যভাবে সাহায্য করতে পারব।"

গোরা যুবকের ঠিকানাটা ওর নোটবুকে টুকে নিল। এই ঠিকানাটা গোয়ালিয়রের।

গোরা বলল, "আপনি তো বাঙালি। কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন?"

"ম্যানটন জানো? বেহালাতে।"

"অনেকদিন আগে একবার আমি পর্ণশ্রীতে গিয়েছিলাম।'

"তা হলে তো জানবে।"

"গোয়ালিয়রে আপনি থাকেন কোথায়?"

"কেন, ঠিকানায় তো লিখেই দিয়েছি। স্টেশন রোডে। বাসেই যাও আর ট্রেনেই যাও, হাঁটাপথের দূরত্ব।"

গোরা হেসে বলল, "প্রয়োজন হোক না হোক একবার আমি যাব। গোয়ালিয়রের ফোর্টটা দেখবার খুব ইচ্ছে আছে আমার।"

"অবশ্যই যাবে। আমি বি.এস.এফ-এ চাকরি করি। এখনও তিন চার বছর থাকতে হবে আমাকে। এখানে জমি কিনে ছোট্ট একটা বাড়িও করেছি। কর্মজীবনের শেষে হয়তো এখানেই আমি রয়ে যাব।"

গোরা বলল, "কী সুন্দর।" তারপর বলল, "আচ্ছা ওখানে নদী আছে?"

"ঠিক শহরের মধ্যে নেই। একটু দূরে আছে। চম্বলের নাম শুনেছ তো?"

"শুনেছি। অভিশপ্ত চম্বল।"

"অভিশপ্ত কেন হবে? গল্প উপন্যাসের কাহিনীর গতি রাখতে ওইরকম বলা হয়। না হলে নদী নদীই। ইলাহাবাদ থেকে মানিকপুর শাখায় অতীতের গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলপথ এই নদীর অববাহিকার ওপর দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত গেছে। এই নদীর উপত্যকায় অনেক দুর্ভেদ্য জঙ্গল, পাহাড় আর অসংখ্য বেহড় আছে। সেইসব জায়গায় একসময় দুর্ধর্ষ সব ডাকাতের বাস ছিল। এখনও আছে। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত এই অঞ্চল এখনও সাধারণ মানুষের বিভীষিকা।"

গোরা অবাক হয়ে বলল, "আমার খুব চম্বলের ডাকাত দেখতে ইচ্ছে করে।"

"করলে কী হবে, গল্পের বইতে বা সিনেমার পর্দায় যে রকম বেহড় বাগীদের দেখতে পাও সেরকম ডাকাত কিন্তু এখন নেই। সে যাক গে, এখন আমার যেটা ভয়, সেটা হচ্ছে চিত্রকূটের আশপাশগুলো খুব একটা সুবিধের নয়। কোনও বদ লোকের পাল্লায় না পড়ে যাও।"

"সেরকম বুঝলে আপনার ওখানেই চলে যাব। নয়তো ফিরে যাব বাড়িতে।"

"সেটা করলেই বুদ্ধিমানের কাজ করবে।"

গোরা বলল, "আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? ওখানেও চম্বলের ডাকাতরা আছে বুঝি?"

"না না। তা কেন? চিত্রকূট তো তীর্থস্থান। চিত্রকূটে ডাকাত থাকবে কেন? কত যাত্রী যায় আসে সেখানে। হোটেল ধর্মশালা কত কী আছে। বনবাসের সময় রামচন্দ্র তো লক্ষ্মণ আর সীতাকে নিয়ে প্রথমদিকে ওখানেই ছিলেন। আসলে তোমার ওই কাজের ব্যাপারটাতেই আমার সন্দেহ হচ্ছে। অবশ্য তোমার বাবার বন্ধু যখন চিঠি দিয়ে ডাকিয়েছেন, তখন—।"

"তখন নিশ্চয়ই ভয়ের কোনও ব্যাপার থাকবে না।"

"না থাকলেই ভাল। চিত্রকূটের পাহাড়-পর্বত দেখে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াও।"

গোরা বলল, "ওখানে অনেক পাহাড় আছে তাই না?"

"তা আছে। চারদিকেই পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়। সেইসঙ্গে আছে অপূর্ব বনশোভা। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে মন ভরে যাবে।"

"আপনি যেখানে থাকেন সেই গোয়ালিয়রে পাহাড় নেই?"

"আছে বৈকি। গোয়ালিয়র ফোর্টটাই তো একটি পাহাড়কে কেন্দ্র করে। ওই পাহাড়ের কাছেই সঙ্গীতসম্রাট মিয়াঁ তানসেনের সমাধি। যদি তুমি একবার আসতে পার সময় করে আমি তাহলে সব দেখিয়ে দেব তোমাকে।"

গোরা চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বলল, "আমি যাব। নিশ্চয়ই যাব। শুধু তানসেনের সমাধি নয়। চম্বল নদীকেও দেখব। আর যদি হঠাৎ করে কোনও দস্যুসর্দারের দেখা পেয়ে যাই তা হলে ঠিক ঢুকে পড়ব ওদের বেহড়ে।"

"সে কী! তোমার ভয় করবে না?"

"প্রাণের ভয় তো আমি করি না। আমার মতো অনাথের মরে গেলেই বা কার কী ক্ষতি?"

যুবক একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন গোরার মুখের দিকে। তাঁর দুটি চোখে এই অসহায় ছেলেটির জন্য একটু মায়া এবং মমতাও ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "শোনো, তোমার মা নেই, বাবা নেই, সেজন্য তোমার জীবনেও কোনও আনন্দ নেই। কিন্তু জীবন হচ্ছে পদ্মপাতায় জল। সে জল যে কখন কোনদিকে গড়িয়ে পড়বে তা কি কেউ বলতে পারে? কিন্তু মানুষের জীবনে দুঃখটাই সব নয়। তারও ওপরে কিছু একটা আছে। এ জীবনে তুমি বড় অসহায় এও যেমন সত্যি, তেমনই তুমি যে অত্যন্ত সুখী তাও সত্যি। তার কারণ তুমি স্বাধীন।"

গোরা ম্লান হাসল।

"আমার কথা শুনে হাসছ তুমি। কিন্তু তুমি ভেবে দেখো তুমি বাধাহীন, বন্ধনহীন। কারও শাসনাধীন নও। ভগবান তোমাকে মুক্ত বিহঙ্গ করে এই নিখিল বিশ্বের বুকে ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি পরীক্ষা করছেন তোমাকে। কঠিন পরীক্ষা। তিনি দেখতে চাইছেন এই জীবন যুদ্ধে হার না মেনে সকল বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করে তুমি জয়লাভ করতে পারো কিনা। বাবা মা চিরকাল কারও থাকে না। আমারও নেই। তোমারও না। তবে হ্যাঁ। তোমাকে আর একটু বড় করে যদি তাঁরা যেতেন তাহলে তোমার ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করতে হত না। তা কী আর করবে বলো, যা হবার তা হয়ে গেছে। ওই সব এখন ভুলে যাও। যাঁরা চলে গেছেন তাঁরা তো আর ফিরে আসবেন না। এখন তুমিই তোমার অভিভাবক। কাজেই তোমার চেয়ে সুখী কে?"

গোরা যুবকের কথায় মনে বল পেল। বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে কিনা একা থাকি তো। মাঝে মাঝে দারুণ অসহায় বোধ করি। খারাপও লাগে খুব। সব সময় বাবা-মার জন্য মন কেমন করে।"

"প্রথম প্রথম দু'একটা বছর এরকম হবেই। তারপর সময়েব ব্যবধানে সবই ভুলে যাবে। আসলে এত অল্পবয়সে ভগবান তোমার কাছ থেকে তোমার বাবা মাকে কেড়ে নিয়ে

এটাই বোঝাতে চাইছেন যে এই পৃথিবীতে কেউ কারও নয়।"

গোরার চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল এবার। বলল, "ভগবানের নাম শুনলে আমার দেহমনে বড় জ্বালা ধরে। আমি বড় হবার আগেই এইভাবে আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে আমার ওপর উনি দারুণ একটা অবিচার করলেন না কী?"

যুবক হাসলেন। বললেন, "না। অনেকের শিশুকালেই বাবা মা মারা যান। তোমার তো তা নয়। তুমি একটু বড় হয়েছ। বুঝতে শিখেছ। তুমি এখন কিশোর। আর দু'এক বছরের মধ্যেই তুমি যুবক হবে। সাবালক হবে। পড়াশুনা করছ তো?"

"অবশ্যই। মাধ্যমিক পাশ করে এখন আমি কলেজে বারো ক্লাসে পড়ি।"

"বাঃ বাঃ। মন দিয়ে পড়াশুনা কর। লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি করে ঘর সংসার কর। তখন দেখবে আর নিজেকে একা বা অসহায় বলে মনে হবে না। এ সংসারের নিয়মই এই। যাঁরা পুরাতন তাঁরা বিদায় নেন। যাঁরা নতুন তাঁরা ঘর আলো করে থাকেন। সব লোক যদি বেঁচে থাকত তাহলে পৃথিবীর বুকে মানুষের পা রাখবার জায়গা থাকত না।"

গোরার খুব ভাল লাগল যুবকের কথাগুলো শুনতে। এমন করে কেউ কখনও কিছু বলেনি ওকে। বলল, "আপনার নাম?"

"আমার নাম এম. কে. রায়। তোমার নোটবুকে আমার যে ঠিকানাটা টুকে রেখেছ তার একপাশে নামটাও লিখে রেখো।"

কথা বলতে বলতেই কত সময় পার হয়ে গেল। স্বল্প পরিচয়েই মানুষটিকে দারুণ ভাল লেগে গেল ওর।

সে রাত্রিটা বেশ আরাম করেই ঘুমিয়ে কাটল। পরদিন সকালে ঘুম যখন ভাঙল ট্রেন তখন ইলাহাবাদ জংশনে থেমেছে।

মিঃ রায় একজন চা-ওয়ালার কাছ থেকে চা নিয়ে খাচ্ছেন। গোরাকে উঠে বসতে দেখে বললেন, "চা খাবে তুমি?"

"এখনও মুখ ধুইনি যে!"

"তাতে কী! এটা বেড টি। বিশেষ করে ট্রেনের কামরায়, মুখ না ধুয়েও খাওয়া যায়। তবে তোমার যদি ইচ্ছে না হয় চট করে গিয়ে মুখটা ধুয়ে এসো।"

গোরা তাই করল। কলে গিয়ে বেশ করে চোখে মুখে জল দিয়ে সিটে এসে বসল।

মিঃ রায় ওর হাতে প্লাস্টিক কাগজের গেলাসে চা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "এই যে দেখছ ইলাহাবাদ, এইখানে প্রয়াগ নামে এক তীর্থ আছে। গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলন হয়েছে সেই প্রয়াগে। এখন অবশ্য সরস্বতীর ধারাটা লুপ্ত হয়ে গেছে। তবে গঙ্গা যমুনা আছে। এইখানে প্রতি বারো বছর অন্তর কুম্ভমেলা হয়। এইখান থেকে সোজা যে রেলপথ উত্তরের দিকে চলে গেছে সেইপথেই আমাদের রাজধানী দিল্লি। আর আমরা যাব একটু পিছু হটে অন্যদিকে মুখ করে বম্বের দিকে। তবে বেশিদূর যাব না। মানিকপুর জংশন থেকে আমরা ঢুকে পড়ব বুন্দেলখণ্ডে। অর্থাৎ ঝাঁসি হয়ে চলে যাব গোয়ালিয়র। তার মানে আগ্রা হয়ে আবার দিল্লিমুখো। তুমি অবশ্য তার অনেক আগেই নেমে যাবে।"

গোরা বলল, "আমার যেন কেমন সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে।"

"যাবেই তো। ছেলেমানুষ। সবে চিনতে শিখেছ। এই পথে দু'একবার যাতায়াত কর, দেখবে একসময় চমৎকার মানচিত্রজ্ঞান এসে গেছে।"

মিঃ রায়ের কথাই ঠিক। ইলাহাবাদ থেকে ছেড়ে গাড়ি ক্রমশ পিছু হটতে লাগল। অর্থাৎ পেছনদিকে ইঞ্জিন লেগে যে মুখে এসেছিল সেইমুখেই চলতে লাগল গাড়ি।

ট্রেন এসে মানিকপুরে থামল।

তারপর আর মুম্বাই-এর দিকে না গিয়ে ঢুকে পড়ল ঝাঁসী লাইনে। ঝাঁসী কি রানির দেশ বুন্দেলখণ্ডের দিকে।

মানিকপুর ছাড়ার পরই মিঃ রায় গোরাকে বললেন, "এইবার তুমি রেডি হও। এর পরের স্টেশনেই নামতে হবে তোমাকে। মাঝে একটি ছোট্ট স্টেশন আছে। গাড়ি সেখানে থামবে না। থামবে একেবারে চিত্রকূটে।"

গোরার অবশ্য মালপত্তর বলতে তেমন কিছুই ছিল না। বহনযোগ্য একটি চামড়ার সুটকেশে যা যা নেবার নিয়েছিল ও। সেটাকেই হাতের কাছে নিয়ে নামার জন্য প্রস্তুত হল।

একটু পরেই স্টেশন এল। চিত্রকূটধাম করবী।

মিঃ রায়ের সঙ্গে করমর্দন করে গোরা নেমে পড়ল ট্রেন থেকে।

মিনিট পাঁচেক থামল ট্রেন। তারপর আবার চলতে শুরু করল। চলন্ত ট্রেনের জানলা থেকে মিঃ রায় হেঁকে বললেন, "সময় পেলে একবার এসো কিন্তু। খুব খুশি হব।"

গোরা 'আচ্ছা' বলে হাত নেড়ে বিদায় অভিনন্দন জানাল তাঁকে।

তিন

ট্রেনটা যখন প্লাটফর্ম ছেড়ে একেবারেই মিলিয়ে গেল দূরে তখন ওর চমক ভাঙল। তাই তো, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু কই? কেউ তো ওকে নিতে এল না। গোরার কেমন ভয় ভয় করল।

এই দূর দেশে এমন কোনও বাংলাভাষার মানুষ নেই যার সঙ্গে কথাবার্তা বলে, কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে। সবাই কথা বলছে দেশোয়ালি হিন্দিতে।

ওকে এই অচেনা পরিবেশে কেউ যদি নিতে না আসে তা হলে কী করবে ও? কোথায় যাবে? সদাশিববাবুর ঠিকানা তো আছেই ওর কাছে। সেখানে কি নিজের থেকেই চলে যাবে? কিন্তু কী করে এবং কীভাবে যাবে তা তো জানে না ও। ওর ভাষা এখানে বুঝবে কে? ক্ষোভে দুঃখে গোরার চোখে যেন জল এল। গৌতমের বোন গোপা ওকে অনেক বুঝিয়েছিল এখানে না আসবার জন্য। ফণীবাবু বয়স্ক লোক। তিনিও সর্তকবাণী দিয়েছিলেন। ও কিন্তু কারও কথা শোনেনি। শোনেনি এই কারণে, আসলে ও তো চাকরির উদ্দেশ্যে এখানে আসে নি, এসেছে দেশভ্রমণে। কিন্তু এখন উপায়?

গোরা কোনওরকম উপায়ান্তর না দেখে হতাশ হয়ে ধুপ করে বসে পড়ল প্লাটফর্মের বেঞ্চিতে। বসে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগল নিজেকে। যে জন্য এখানে আসা সেই কাজই যখন করবে না, তখন না এলেই হত। অথবা একই ট্রেনে চলে যেতে পারত মিঃ রায়ের সঙ্গে গোয়ালিয়রে। সেখানে কিছুদিন থেকে ফিরে যেত কলকাতায়। ওর মা-বাবার স্বপ্নের নীড়ে। যেখানে ওর নিজের আশ্রয় আছে, পাড়া প্রতিবেশীরা আছেন, স্নেহময়ী স্নেহদি আছেন। ওর কলেজ কোচিং আছে। কিন্তু এখানে এই বিদেশ বিভুঁয়ে ওর পাশে কেউ তো নেই।

ওকে ওইভাবে বসে থাকতে দেখে একজন চেকার এগিয়ে এসে বললেন, "টিকট

দিখাইয়ে জনাব।"

বাড়িতে টি.ভি. থাকার সুবাদে এইরকম হিন্দি ও বুঝতে পারে। তাই বলামাত্রই টিকিট বের করে দেখাল।

চেকার টিকিট চেক করে বললেন, "কাঁহা যানা হ্যায় তুমকো? হোয়াই ইউ আর সিটিং হিয়ার?"

গোরা বলল, "আই অ্যাম ওয়েটিং ফর সামওয়ান।"

"হু ইজ হি? এনি রেলওয়ে স্টাফ অর ভি. আই. পি?"

"সদাশিববাবু নামে একজন। আপনি কি চেনেন তাঁকে? আমার বাবার বন্ধু। আমাকে তাঁর নিতে আসবার কথা। কিন্তু কেন যে তিনি আসছেন না তা বুঝতে পারছি না।"

"তুমহারা বাত মেরি সমঝমে নেহি আতা। হিন্দি মে বোলিয়ে।"

গোরা বলল, "আমি হিন্দি বলতে পারি না।"

"তব বাহার যাকে বৈঠো। আভি দুসরা ট্রেন আনেবালি হ্যায়।"

এমন সময় হঠাৎই হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখা গেল সদাশিববাবুকে।

গোরাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এলেন তিনি, "একি! গোরা তুমি এখানে বসে কেন? আমি কখন থেকে তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছি। গেট-এ টিকিট জমা দিয়ে প্লাটফর্মের বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে তো।"

গোরা বলল, "আসলে আমি ভিড়ের জন্য যাইনি। তাই ফাঁকা জায়গা দেখে এখানেই বসেছিলাম।"

"এ লাইনে ট্রেন তো খুব কম। তাই ভিড় একটু বেশি। চিত্রকূট বাঁদা থেকে ঝাঁসি পর্যন্ত প্রচণ্ড ভিড় হয়। তবে অন্য কোথাও ঘোরাঘুরি না করে তুমি যে প্লাটফর্মেই বসেছিলে এটাই তুমি বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। তোমার মালপত্তর কী আছে?"

"কিচ্ছু না। এই যা।"

সদাশিববাবু সুটকেশটা হাতে নিলে গোরা ওর ঝোলাটা কাঁধে নিল। তারপর স্টেশনের বাইরে এসে অটো। কোথায় কতদূরে যেতে হবে তা ও জানে না। বেশ কিছুক্ষণ পর এক জায়গায় অটো থেকে নামল ওরা। তারপর উঁচু নিচু পার্বত্য পথ ধরে হাঁটা শুরু করল। এখানে কাছে দূরে কত-কত পাহাড়। জায়গাটাও বেশ জমজমাট। পুরনো দিনের ঘরবাড়ি দেবস্থান অনেক কিছুই চোখে পড়ল।

যাই হোক, বেশিক্ষণ হাঁটতে হল না। খানিক হেঁটে আসার পরই দেখল কী চমৎকার স্বচ্ছ সলিলা একটা নদী দক্ষিণ থেকে উত্তরে কল কল করে বয়ে চলেছে। কাছে দূরে অনেক পাহাড় ও বনভূমি।

সদাশিববাবু সেই নদীর কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন একবার। তারপর বললেন, "এই যে নদীটা দেখছ, এই নদীর নাম কি জান?"

"চম্বল।'

"না, চম্বলকে এখানে কোথায় পাবে? সে নদী অনেকদূরে। এই নদী হল মন্দাকিনী। মর্ত্যের নদী। নদীর ওপারে ওই যে পাহাড়, ওই পাহাড়ের নাম হনুমান ধারা। একটি পবিত্র ঝরনাধারার জন্যই হনুমান পর্বত না বলে হনুমান ধারা বলে লোকে। আর এই দিকের পাহাড় হল চিত্রকূট পর্বত। ওই চিত্রকূটের পেছনদিকে যে দুর্ভেদ্য জঙ্গল, সেইখানে বন বিভাগের বহু লোক কাজ করে। তারা লক্ষ্য রাখে কেউ অকারণে বন জঙ্গলে গাছপালা কেটে অরণ্যের নিধন না করে। শহরের একেবারে শেষপ্রান্তে আছে টিম্বার মার্চেন্ট বিল্লুপ্রসাদের গদি। ওইখানেই তোমার কাজের ব্যাপারটা পাকা হবে।"

গোরা কোনও উত্তর না দিয়ে শুনে যেতে লাগল সব।

সদাশিববাবু বললেন, "প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হলেও পরে ঠিক মানিয়ে নিতে পারবে। আসলে এই কাজের জন্য দরকার একজন বিশ্বাসী লোকের। যদিও তুমি উপযুক্ত নও, তবু অল্প বয়স তোমার। ব্যবসাটা বুঝে গেলে আখেরে ভাল হবে। এ কাজের দাবিদার অনেক। শুধু আমার অনুরোধেই বিল্লুপ্রসাদ কাজটা তোমাকে দিতে রাজি হয়েছেন।"

"আপনাকে উনি যথেষ্ট মর্যাদা দেন তা হলে।"

"তা দেন বৈকি। আসলে তোমার বাবা মা দুজনেই একসঙ্গে চলে গেলেন, তাই তোমার অসহায় অবস্থাটার কথা চিন্তা করেই তোমাকে এখানে আনিয়ে নিলাম। তোমার এক মামা আছেন না?"

"হ্যাঁ। উনি তো বেনারসে থাকেন।"

"এখন আর বেনারস কেউ বলে না। বারাণসী। বারাণসীতে কোথায় থাকেন তিনি?"

"পাণ্ডে ঘাট।"

"পাঁড়ে ঘাট? আমার ছেলেবেলাটা তো ওইখানেই কেটেছে। আমার জন্মভূমি কিন্তু ইলাহাবাদ। যাই হোক, আমার এখানে থাকলে তুমি কিন্তু বদ সঙ্গে পড়ে ভেসে যাবে না। তোমার মামার ঠিকানাটা আমাকে দিও। তোমার ব্যাপারে তাঁকেও একটু জানিয়ে রাখা

ভাল।"

গোরা বলল, "সবই তো শুনলাম। তবে আমার কিন্তু কাজকর্ম করবার ইচ্ছে এতটুকুও নেই।"

চমকে উঠলেন সদাশিববাবু, "সে কী!"

"তবুও আমি এখানে এতদূরে এলাম শহরের বদ্ধ পরিবেশ থেকে দিনকতকের জন্য হাঁফ ছেড়ে বাচব বলে। দু'হাজার টাকা মাইনের এই চাকরিটা পেলে আমার খুবই উপকার হয়। সে জন্য আমি লালায়িতও হয়েছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম এখন এই চাকরির চেয়েও লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে ওঠা আমার একান্ত দরকার। তাছাড়া আমি যে একেবারে খেতে পাচ্ছি না তা তো নয়। একমাত্র মা-বাবার স্নেহ মমতার ছায়াটুকু ছাড়া এখন আমার অন্য কোনও অভাব নেই। তবে কিনা এর ওপর ওই দু'হাজার টাকা হাতে পড়লে দারুণ হত।"

কথা বলতে বলতে কয়েকটি মন্দির ফেলে রেখে এক জায়গায় একটু ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় একটি বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তেই এক ভদ্রমহিলা এসে দরজা খুলে বললেন, "এসো বাবা।"

ভদ্রমহিলাকে গোরা এব আগে দেখেনি কখনও। তবু অনুমানে বুঝল ইনিই সদাশিববাবুর স্ত্রী।

ভদ্রমহিলা আদর করে গোরাকে ভেতরে নিয়ে এসে বসতে দিয়ে বললেন, "তোমার কথা ওর মুখে সব শুনেছি আমি। তোমার জীবনে যা ঘটে গেল তা যেন আর কারও জীবনে না ঘটে। আমাদেব তো ছেলেপুলে নেই। তাই ওকে বললাম যেভাবেই হোক ছেলেটাকে নিয়ে এসে রাখো আমাদের কাছে। আমাদের এত কিছু, এইসব ভোগ করবে কে? এখন থেকে ও আমাদের কাছেই থাকবে। এইসব দেশের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলে দেহ মন সবই ভাল থাকবে। হাওড়া কলকাতাব ওই পবিবেশ এখন আর বসবাসের যোগ্য নয়। তা আমার কথা শুনে উনি বললেন, "মন্দ বলোনি কিন্তু। ছেলেটাকে এখানে আনতে পারলে ও-ও বাঁচবে। আমরাও মনে শান্তি পাব। একটা পাসও করেছে। আর বেশি লেখাপড়া না করলেও চলবে। তা ছাড়া মাথার ওপর মা বাবার শাসন না থাকলে ছেলেদের লেখাপড়া হওয়াও মুশকিল। কিছুদিন আগে বিল্লুপ্রসাদ একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছিল ওর কাজের জন্য। ওকেই একটু বলে কয়ে দেখি। তা কাজ ওখানে হবে। কিন্তু পরে যা শুনলাম তাতে বাবা আমার আর ওই কাজে কোনও সায় নেই।"

"কী শুনলেন আপনি পরে?"

সদাশিববাবু বললেন, "আঃ। ছেলেটা এল অতদূর থেকে, আগে ওকে জামা প্যান্ট ছাড়তে দাও, কিছু খেতে টেতে দাও, তবে তো। পরে যা হবার তা হবে। বিল্লুপ্রসাদের ওখানে না হোক অন্য কোথাও তো লাগিয়ে দিতে পাবব ওকে। এখন ও এসেছে এখানে থাকুক না দিনকতক। তা ছাড়া চাকরি যে করতেই হবে ওকে তারই বা মানেটা কী?"

সদাশিববাবু এবং ওঁর স্ত্রীকে প্রণাম করল গোরা।

সদাশিববাবুর স্ত্রী বললেন, "তুমি আমাকে কাকিমা বলবে, কেমন? আর পাশের এই ঘরটাতে তুমি থাকবে। তোমার জন্য ঘর একেবারে সাজিয়ে রেখেছি।"

সত্যই তাই। একটু ছোট হোক, তবু বেশ মনের মতো ঘর। দুটি ঘর, রান্নাঘর,

বাথরুম ও ছোট্ট একটি ঠাকুরঘর নিয়ে দুজনের সংসার। গোরার খুব ভাল লাগল এঁদের সংস্পর্শে এসে। এবং এঁদের উদার মনের পরিচয় পেয়েও বেশ ভাল লাগল. গোরার মা বাবার আশীর্বাদে কারও সাহায্য ছাড়াই বেশ ভালভাবে চলে যাবে ওর। কিন্তু যদি ও সত্যসত্যই সহায়সম্বলহীন হত তা হলে? তা হলে এমন একটি আশ্রয় কি ওর জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠত না? মানুষের সত্যিকারের বিপদের দিনে এইভাবে যারা এগিয়ে আসেন তাঁদের মহানুভবতার তুলনাই হয় না।

গোরা ওর স্যুটকেশ ও কাঁধের ঝোলাটা যথাস্থানে রেখে বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে নিল। তারপর জলখাবার খেয়ে রান্নাঘরে বসে ওর জীবনের সুখ দুঃখের গল্প করতে লাগল কাকিমার সঙ্গে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমে উঠল। গোরা বুঝতে পারল এই কাকিমা ওর স্নেহময়ী জননী বা স্নেহদির চেয়ে কোনও অংশেই কম নন। এইরকম পরিবেশে দিনের পর দিন থাকলেও খারাপ লাগবে না ওর। কোনও সময়ই কারও গলগ্রহ বলে মনে হবে না নিজেকে। ও যদি দুস্থ হত, বা ওর নিজের সম্বল বলে কিছু না থাকত তা হলে ও কখনই যেতে চাইত না এখান থেকে।

কাকিমা কত কথা বললেন ওর সঙ্গে। বললেন, "এই জায়গাটা পাহাড়ি অঞ্চল হলেও খুবই ভাল জায়গা। এ এক পবিত্র তীর্থভূমি। তাই এই জায়গাকে ঘিরে অনেক মানুষের আনাগোনা। নিত্য নতুন উৎসব যেন লেগেই থাকে এখানে। বিশেষ করে রামনবমীর সময় এখানকার চেহারাটাই যেন পাল্টে যায়। বিরাট মেলা বসে। ভক্ত তীর্থযাত্রীতে গম গম করে চারদিক। এখানে সারাবছরই মন্দাকিনীর ঘাটে ঘাটে চলে স্নান দান মুণ্ডন পিণ্ডদান কত কী। অক্ষয় পুণ্যলাভের আশায় মানুষ কত কী-ই না করে। তা ছাড়াও নৌকায় ভ্রমণ আর মন্দিরে পুজোপাঠ নিয়ে মেতে থাকে সবাই। সন্ধ্যায় নদীর জলে প্রদীপ ভাসানো হয়, শঙ্খ-ঘণ্টায় মুখর মন্দিরে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলে, নামে গানে মেতে ওঠে চারদিক। অথচ মুঠোর মধ্যে ধরা যায় এমন এক ক্ষুদ্র জনপদ এই চিত্রকূট।

গোরা কথার ছলেই জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকিমা, আপনারা স্নান করেন কোথায়? বাথরুমে না নদীতে?"

"এখানে নদী ছাড়া স্নানের কথা কি কেউ ভাবতে পারে বাবা? আমরা সবাই নদীতে স্নান করি। একটু পরেই চল না তোমাকে সঙ্গে নিয়েই নদীতে যাব। তুমি আমি দুজনেই স্নান করব। দেখবে খুব ভাল লাগবে জায়গাটা। কাল সারারাত তুমি ট্রেন-জার্নি করেছ। ভাল ঘুম হয়নি নিশ্চয়ই। দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে বেশটি করে ঘুমিয়ে নাও। তারপর বিকেলবেলা কাকাবাবু তোমাকে নিয়ে যাবেন বিল্লুপ্রসাদের গদিতে। তা আমি বলি কি বাবা, সামান্য কটা টাকার জন্যে ওর ওই গদির চাকরি তুমি নিও না। শুনেছি নাকি জঙ্গলের ভেতরে থাকতে হবে। রাত ভিত কখন কী বিপদ ঘটে বসে তা কে বলতে পারে? ওই কাজ কখনও তোমাকে পোষায়? এ সব হল শক্তসমর্থ জোয়ানদের কাজ।"

গোরা বলল, "না না। সেরকম বুঝলে কাজ আমি করবই না। তা ছাড়া আমার বাবা-মা যা রেখে গেছেন তাতে আমার এই মুহূর্তে ওই সবের কোনও প্রয়োজনও নেই। সামনে আমার মেঘে ঢাকা ভবিষ্যৎ। তাই লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে আমার দিগন্তকে আলোয় ভরিয়ে তুলতে হবে। আমি এখানে বেড়াতে এসেছি। দিনকতক থেকেই চলে যাব।

াপনাদের ভালবাসা পেলে যখন তখনই আসব।"

পাশের ঘর থেকে সদাশিববাবু শুনছিলেন গোরার কথাগুলো। এইবার ওর পাশে এসে বললেন, "সেই ভাল। তবে কি জানো, তুমি যে কী অবস্থায় আছ তা তো আমি জানতাম না। সেইজন্যই তোমাকে এখানে আসতে বলেছিলাম। এখন যা তুমি ভাল বুঝবে তাই করবে। আমি তোমাকে জোর করে ধরে রাখবার চেষ্টা করব না। তা ছাড়া বিল্লুপ্রসাদ যে কাজের জন্য তোমাকে রাখছে তা কিন্তু আমারও পছন্দ নয়।"

কাকিমা বললেন, "ল্যাঠা তা হলে চুকেই গেল। ও এখানে এসেছে, চারদিক ঘুরে বেড়িয়ে যাক। মাঝে মধ্যে ছুটি কাটাতে এখানে আসুক। ওর আপনজন বলতে আমাদেরই জানুক, এই হলেই যথেষ্ট।"

গোরা বলল, "আপনাদের আমি কখনও ভুলব না। তবে ওই বিল্লুপ্রসাদের গদিতে আমি যাব। একবার গিয়েই দেখি না কী ধরনের কাজ উনি আমাকে দিয়ে করান। কাজ করি বা করি জীবনে এই প্রথম কিছু একটা করার অভিজ্ঞতা তো হবে?"

সদাশিববাবু বললেন, "অমনি দু'এক মাসের মাইনের টাকাটাও হাতে আসবে।"

কাকিমা বললেন, "যাক। কথা বলতে বলতে অনেক বেলা হল। এখন স্নানের পর্বটা মিটিয়ে নেওয়া যাক।"

সদাশিববাবু বললেন, "ও-ও কি নদীতে স্নান করবে?"

"অবশ্যই। মন্দাকিনী বলে কথা। দেহমন জুড়িয়ে যাবে ওর। তা ছাড়া মহাগুরুনিপাতের পর একবার তীর্থে এসে গঙ্গা অথবা কোনও মাহাত্ম্যপূর্ণ নদীতে স্নান করতেও হয়।"

গোরা বলল, "ঘরের কাছেই নদী। এমন সুযোগ কখনও ছাড়ি। রোজই আমি নদীতে স্নান কবব।"

কাকিমা ততক্ষণে স্নানের জন্য তৈরি হয়েছেন।

গোরাও ওর সঙ্গে আনা তোয়ালে গামছা ইত্যাদি নিয়ে সঙ্গ নিল কাকিমার।

সদাশিববাবু একটি ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে দেহটা এলিয়ে দিলেন।

কাকিমার সঙ্গে গোরা চলল পুণ্যস্নানে।

এঁদের বাড়ি থেকে নদী খুব একটা বেশি দূরে নয়। স্বর্গের নদী মর্ত্যের মন্দাকিনী চিত্রকূটে মহিমান্বিতা।

মায়ের মুখে শোনা রামায়ণের কাহিনীগুলো যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল গোরার, সেই চিত্রকূট।

মা! মাগো! আজ তুমি কোথায় কতদূরে চলে গেলে মা! তোমার দেওয়া এই চোখ দুটো দিয়ে কত কী-ই তো দেখছি। আমার এই দেখার মধ্য দিয়ে তোমার দেখাও যেন হয়ে যায়। তোমার সব কিছু নিয়েই যে আমি। তুমি স্বর্গাদপি গরীয়সী। এই পবিত্র নদীতে পুণ্যস্নানে যদি আমার নরদেহ শুদ্ধ হয় তা হলে পরপারে যেখানেই তুমি থাক না কেন, তোমার আত্মারও যেন শান্তি হয়। আমার বাপি, আদরের বাপি আমার, তোমাদের দুজনেরই যেন মহামুক্তি হয়।

গোরা মন্দাকিনীর তীরে দাঁড়িয়ে এইসব ভাবছিল। ভাবছিল আর দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। ওর চোখে জল। নদীতে জল। কী চমৎকার কাকের চোখের মতো জল নদীতে।

চারদিকে বড় বড় পাথর ছড়ানো আছে। প্রকৃতির খেয়ালেই। সেইসব পাথরে ধাক্কা খেয়ে ছল ছল কল কল করে ছুটে চলেছে এই পার্বত্য নদী।

ঘাটে ঘাটে কত যে স্নানার্থী স্নান করছেন তার যেন শেষ নেই। এরই মাঝে কোথাও কীর্তন হচ্ছে, কোথাও স্নানের আগে তৈলমর্দন চলছে। কোথাও বা ভিক্ষা ব্যবসায়ীরা লাইন দিয়ে বসে আছে ভিক্ষা পাবার আশায়।

এক সাধুবাবা ধ্যান করছেন ধুনি জ্বেলে। তাঁকে ঘিরে কত ভক্ত বসে আছে গোল হয়ে।

আর এক সাধুবাবা ছাইভস্ম মেখে কুল-কাঁটা ও বাবলা-কাঁটায় চিৎ হয়ে শুয়ে বিড় বিড় করে কী সব যেন বলছেন। ধর্মের নামে অযথা এইরকম দৈহিক নির্যাতন গোরা সহ্য করতে পারে না। গোরার মনে হল এবাও ভিখারি, সন্ন্যাস এদের ছদ্মবেশ। তা যদি না হবে তাহলে এঁরা হিমারণ্যে না থেকে জনারণ্যে কেন?

কাকিমা বললেন, "কেমন লাগছে গোরাচাঁদ?"

"খুব ভাল। বিশেষ করে এখানকার পরিবেশটা।"

"পাহাড়-নদীর এমন মিলন এর আগে আমি কখনও দেখিনি। চারদিকে পাহাড়, মাঝে নদী। আমাব তো মনে হয় এইটাই পৃথিবীর স্বর্গ।"

গোরা দূরের একটা পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "আচ্ছা কাকিমা, ওই যে দূরে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওই পাহাড়ে ওঠা যায় না?"

"কেন যাবে না। আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব একদিন। ওই পাহাড়ের নাম হনুমান ধারা।"

"এমন নাম কেন?"

"পৌরাণিক কোনও ব্যাপার কিছু থাকলে তা বলতে পারব না। তবে শুনেছি ওই পাহাড়ে নাকি অনেক হনুমানেব বাস, তাই এইরকম নাম। আর মিষ্টি একটি জলের ধাবাব সঙ্গে নামে নাম মিলিয়ে হনুমান ধারা। ওই জল যেমনই সুস্বাদু, তেমনই উপকারি। ওর মিষ্টি জল কিছুদিন খেলে অনেকের অনেক পুরনো পেটের রোগ একেবারেই সেরে যায়।"

"বলেন কী।"

"হ্যাঁ। তাই ওই জলের জন্য অনেক গ্রাম ও শহববাসী অনেক দূর থেকে ভোরবেলা সাইকেলে করে এসে জল খায়, জল নিয়ে যায়।"

"আপনারাও তা হলে ওই জল খান না কেন?"

"আমাদের যে জল আনবার লোকের খুব অভাব বাবা।"

"এবার থেকে আমি জল আনব। আমাকে একবার জায়গাটা চিনিয়ে দেবেন আর একটা সাইকেলের ব্যবস্থা করে দেবেন।"

"সে আর কদিন? তুমি তো চলেই যাবে।"

"গেলেও বরাবরের জন্য তো যাব না। সময় পেলেই আসব। তখন আবার আনব। মোট কথা চিত্রকূটকে আমি কখনও ভুলব না। এটাই হবে আমার দেশ ঘর।"

"তাই যেন হয় বাবা। আমাদেরও কেউ তো নেই। আমাদের দুজনকে যেন ভুলে যেও না।"

"আপনাদের আমি কখনও ভুলব না। যেমন ভুলব না আমার স্নেহদিকে।"

"স্নেহদি কে?"

"তিনি আমার এক মাতৃরূপা দিদি। অনন্যা। পরে আপনাকে সময়মতো বলব তাঁর কথা।"

কয়েকজন মালি তখন নাও নিয়ে একটানা চেঁচাচ্ছে "হনুমান ধারা—হনুমান ধারা।"

গোরা বলল, "হনুমান ধারা কি নৌকোয় করে যেতে হয় কাকিমা?"

"না না। আসলে মাঝিরা পয়সা রোজগারের জন্য ওইসব চালাকি করে। এই যে বড় বড় পাথরগুলো দেখছ, এগুলোয় পা দিয়ে নদী পার হয়ে তিন কিমি পথ হেঁটে গেলেই হনুমান ধারা। নৌকোয় গেলে এক কিমি পথ লাঘব হয়। তবে কিনা জলভ্রমণের মজাটা পাওয়া যায়। নবাগত যাত্রীরা অতশত বোঝে না। তারা ভাবে এই নৌকোয় চাপলেই বুঝি পাহাড়ের কোলে নিয়ে ভিড়বে নৌকোটা। তাই যারা একবার ওইসব নৌকোয় চাপে তারা দ্বিতীয়বার পদব্রজেই যায়। এখন পাহাড়ের কোল পর্যন্ত দু'একটা অটোও হয়েছে।"

গোরা অবাক চোখে চেয়ে রইল সেইদিকে।

তারপর কাকিমার হাত ধরে যখন জলে নামল স্নান করতে তখন দেখল কয়েকজন উত্তরপ্রদেশী মস্তক মুণ্ডন করে নদীর জলে পিণ্ড ভাসাচ্ছেন।

গোরা মনের আনন্দে পব পর বেশ কয়েকটা ডুব দিয়ে ঘাটের সিঁড়িতে উঠে বেশ করে নতুন গামছা দিয়ে নিজের গা মাথা মুছে নিল।

নদীতে ডুব জল নেই। কিন্তু কী অসম্ভব স্রোতের টান। কিছু একটা না ধরে স্নান করা যায় না।

কাকিমাও স্নান সেবে ডাঙায় উঠলেন। তাবপব ভিজে কাপড়েই গোরাকে নিয়ে রওনা হলেন বাড়ির দিকে।

নদীতে অবগাহন করে গোবাব দেহমন ভরে উঠল এক গভীর প্রশান্তিতে। ওব যেন পুনর্জন্ম হল। মনের মধ্যে বাবা মায়ের বিয়োগ বেদনাটা এক-আধবার চারা দিলেও নতুন দেশ দেখার আনন্দে, পুণ্যস্নানের পরিতৃপ্তিতে তা দূর হল।

এখন আনন্দে নেচে উঠেছে ওব মন।

এই মন্দাকিনীর তীর, দুপাশের অসংখ্য মঠ মন্দিরাদি, কাছে দূরেব পাহাড়মালা ওকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। কে যেন কানের কাছে বলতে লাগল, ওরে! কেউ তোব না থাক, আমি আছি। আমি যে বিশ্বপিতা। আমার বুকে আছড়ে পড়। আমি তোকে আশ্রয় দেব। তোর সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে।

চার

দুপুরে দারুণ খাওয়াদাওয়া হল। কী সুন্দর বান্না কাকিমার। যদিও নিরামিষ। তবু অপূর্ব। এদেশের লোকেরা মাছমাংস খায় না। বলে কিনা মাছ হল জলের পোকা। আর মাংস? প্রাণীদেহ থেকেই যত কিছু রোগের উৎপত্তি। তাই কাকিমার হাতে রান্না করা নিরামিষ খাবাব খেয়ে খুব ভাল লাগল গোরার। শাক ভাজা, অড়হর ডাল, ফুলকপির তরকাবি, বড়ির ঝাল, চাটনি, সেই সঙ্গে টক-ঝাল-লঙ্কার আচার। কী ভাল যে লাগল। মা মারা যাবার পর থেকে এত যত্নের খাওয়া ও কখনও খাযনি।

খাওযা দাওয়ার পর সেই সাজানো ঘবটিতে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিল ও। তারপব

স্নেহদিকে, গোপাকে ও গৌতমকে আলাদা আলাদা করে চিঠি লিখল। গৌতম আর গোপাকে লিখল, "একবার একটু সময় করে চলে আয়। রামায়ণের চিত্রকূট আজও অপরূপ। না এলে ঠকবি কিন্তু।"

এরপর বিকেলবেলা চা-টা খেয়ে সদাশিববাবুর সঙ্গে চলল ও বিল্লুপ্রসাদের গদিতে। দেখাই যাক না বিল্লুপ্রসাদ কী কাজের দায়িত্ব দেন ওকে।

বিল্লুপ্রসাদের গদিটা সীতাপুরে।

সীতাপুর চিত্রকূটেরই অংশ। এখানে ইলাহাবাদ বাঁদার বাস থামে। যে সব যাত্রীরা চিত্রকূটধাম করবীতে ট্রেন থেকে নামেন তাঁরা বাসে চেপে সীতাপুরে এসে সাইকেল-ভ্যানে মালপত্তর চাপিয়ে তবেই আসেন চিত্রকূটধামে। অর্থাৎ মন্দাকিনীর ধারে তীর্থভূমিতে।

তা সেই সীতাপুরে গোরা যখন সদাশিববাবুর সঙ্গে বিল্লুপ্রসাদের গদিতে এল তখন কেমন যেন একটু ভয় ভয় করতে লাগল ওর। কী সব গাবদা গোবদা চেহারা সকলের। দেখলেই ভয় হয়। ডাকাতের মতো পাকানো গোঁফ। পানের কষে ঠোঁটমুখ লাল। সবার মুখে পান। অনবরত পচর পচর করে পানই চিবিয়ে চলেছে সবাই। মুখে পান থাকায় কথাও বলছে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে। ঠোঁটের কষ বেয়ে পানের পিক গড়িয়ে আসছে তবু ঘেটবার বা ফেলবার নাম নেই।

গদিতে আধশোয়া হয়ে যে ভীষণদর্শন মানুষটি শুয়েছিলেন তিনিই বিল্লুপ্রসাদ। সদাশিববাবু যেতেই দারুণ অভ্যর্থনা করে বসতে বললেন তাঁকে। তারপর গোরার দিকে একনজর তাকিয়েই বললেন, "এহি হ্যায় ও ছোকরা?"

"হ্যাঁ, আমি এর কথাই তোমাকে বলেছিলাম বিল্লুপ্রসাদ। এ আমার দোস্ত কা লেড়কা।"

"লেকিন ইয়ে নেহি চলেগা।"

সদাশিববাবু চুপ করে বসে রইলেন।

বিল্লুপ্রসাদ গোরার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ক্যা নাম হ্যায় তুমহারা?"

"আমার নাম গোরাচাঁদ।"

"উমর কিতনা?"

গোরা সদাশিববাবুর মুখের দিকে তাকাল।

সদাশিববাবু বললেন, "উনি জিজ্ঞেস করছেন তোমার বয়স কত?"

গোরা বলল, "সতেরো আঠারো হবে।"

"দেখনে সে মালুম হোতা কি চৌদ্দ সাল সে জায়দা নেহি।"

সদাশিববাবু বললেন, "এই বয়সটা ঠিক বোঝা যায় না।"

বিল্লুপ্রসাদ এবার একদৃষ্টে কিছুক্ষণ গোরার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আক্ষেপ করে বললেন, "ইতনি কমতি উমরমে তুমহারা নসীব ক্যায়সে ফাঁস গিয়া রে ভাই। বহৎ বদনসীবি হো তুম।"

গোরার এইসব কথা শুনতে একদম ভাল লাগে না। যতই সে সবকিছু ভুলে যেতে চায় ততই তাকে সব কথা মনে পড়িয়ে দেওয়া হয়।

সদাশিববাবু বললেন, "সেইজন্যেই তো ওকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। একটু হিল্লে করে দাও ওর।"

কী অপমান।

গোরার চোখে যেন জল এল। সদাশিববাবু ওকে ভিখিরির ছেলে পেয়েছেন নাকি? ও যেখানে বলেই দিয়েছে পড়াশুনা ত্যাগ করে কোনও চাকরি-বাকরি ও এখন করবে না, তখন আর কেন এই অযথা খোশামোদি? এতে কোন্ স্বার্থটা আছে সদাশিববাবুর? উনি বাবার বন্ধু হলেও বয়সে প্রবীণ। এখন রিটায়ার্ড ম্যান। অনেকদিন কোনও যোগাযোগও ছিল না ওদের পরিবারের সঙ্গে। শুধু বাবার মৃত্যু সংবাদটা কার মুখে যেন শুনেই ওর ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি।

বিল্লুপ্রসাদ সদাশিববাবুর কথার কোনও উত্তর না দিয়েই ডাকলেন, "বিঠ্ঠলভাই। এ বিঠ্ঠলভাই!"

একজন চাকর গোছের প্রবীণ লোক এগিয়ে এসে বলল, "ফরমাইয়ে।"

"ইয়ে অনাথ কো কুছ মিঠাই তো খিলাও।"

অপমানের পর অপমান। লাল হয়ে উঠল গোরার মুখ।

"ঔর হাম সবকে লিয়ে থোড়া চায় ভি লা না।"

বিঠ্ঠলজী আদেশ পালন করতে চলে গেল।

বিল্লুপ্রসাদ গোরার দিকে তাকিয়ে এবার স্নেহপূর্ণ হাসি হাসলেন একটু। তারপর বললেন, "কাম অ্যায়সা খাস কুছ নেহি। রাতভর দিনভর জঙ্গলমে ঠাহারনা হোগা। দো হাজার রুপাইয়া তনখা মিলেগা। দো-চারদিন কাম করো, উসকে বাদ সার্ভিস পাক্কা হো যায়েগা। ইয়ে কাম তুমহারে লিয়ে হ্যায়ই নেহি। সদাশিউবাবুকি ওজোঃসে ম্যায়নে ইয়ে কাম তুমকো দে দিয়া।"

বিল্লুপ্রসাদের কথাগুলো সদাশিববাবু আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন গোরাকে। তারপর ইশারায় বললেন, এখনকার মতো এই কাজের ব্যাপারে ওকে রাজি হয়ে যেতে।

রাজি তো হবে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে ও দিনরাত কী করে থাকবে? তার চেয়েও বড় কথা কাজটা কী? ওই অরণ্যে কোন কাজের জন্য বিল্লুপ্রসাদ পাঠাচ্ছেন ওকে? ওর কোনও কিছুই বোধগম্য হল না। একা কখনও থাকেনি ও। বাবা মায়ের কোল ঘেঁষে মানুষ। তাই গভীর নির্জনতাকে ওর বড় ভয়।

গোরা যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

বিল্লুপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, "কাম করো গে?"

গোরা ভয়ে ভয়ে বলল, "করব। কিন্তু কী কাজ করতে হবে?"

বিল্লুপ্রসাদ হেসে বললেন, "কাম পর যানে সে মালুম হো যায়েগা।"

"ঠিক আছে। আমি রাজি। কাল থেকেই আমি লেগে যাব কাজে। যদি মনে ধরে তা হলে করব। নাহলে ফিরে যাব আমার নিজের জায়গায়।"

"সোচ লো। যো তুমহারা মর্জি।"

ততক্ষণে বিঠ্ঠলভাই খাবার নিয়ে এসেছে।

সে কী লোভনীয় খাবার। বড় বড় খাস্তার কচুরি। মুগের লাড্ডু আর প্যাঁড়া। খাবার সবার জন্যই এল। সেইসঙ্গে চা।

খাওয়া শেষ হতেই সদাশিববাবু বললেন, "তা হলে ওর চাকরিটা হয়ে গেল কী বল?"

বিল্লুপ্রসাদ হেসে ঘাড় নাড়লেন।

গোরা সদাশিববাবুর সঙ্গে চলে এল।

জীবনে প্রথম চাকরির অভিজ্ঞতাটা কী রকম হয় দেখাই যাক না। কাজ করতে পারুক না পারুক জঙ্গলবাসের অভিজ্ঞতাটা তো হবে।

সদাশিববাবু পথ চলতে চলতে বললেন, ''আসলে তোমাকে আমি যতটা অসহায় বা অনাথ ভেবেছিলাম তা তুমি নও। সেইজন্যই এই কাজের ব্যবস্থাটা আমি তোমার জন্য করেছিলাম। পরে অবশ্য ভেবে দেখলাম তোমার বয়সী কোনও ছেলেকে ওইভাবে বনে জঙ্গলে পাঠানো ঠিক নয়। তাই আমার মনেও খুব একটা সায় দিচ্ছে না। তবু তোমাকে কাজটা নিয়ে নিতে বললাম কেন তার একটা কারণ আছে।''

''কী কারণ আমাকে একটু বলবেন? আপনি একবার বলছেন কাজটা নিয়ে নিতে, আবার বলছেন এই কাজের ব্যাপারে আপনার কোনও সায় নেই।''

''আসলে এই ব্যাপাবে সত্যি বলতে কি আমি নিজেই এখনও মনস্থির করে উঠতে পারছি না। এই বিল্লুপ্রসাদ অত্যন্ত দুনম্বরী লোক। এবং বদ লোক। জঙ্গল মহলে ওর কীসের কারবার তা জানার আমার একান্ত প্রয়োজন। এবং সেইজন্যই আমি আমার একজন কাউকে ওখানে বসিয়ে রাখতে চাই। আর সেই কারণে তোমাকেই উপযুক্ত মনে করে ডাকিয়ে এনেছিলাম। এতে তুমিও বাঁচতে আমারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত। পরে যখন বুঝলাম মা বাবার অবর্তমানেও তুমি সচ্ছল, তখন মনে হল এ কাজ তোমাকে দিয়ে না করানোই ভাল। কেননা এ কাজে অনেক বিপদের ঝুঁকিও আছে। আবার অর্থও আছে। বিল্লুপ্রসাদ ওর অনুগতদের হাতে রাখতে প্রচুর অর্থব্যয় করে। ভাল ইনাম দেয়।''

''বিল্লুপ্রসাদের কাজ কারবার জেনে আপনার লাভ?''

''আছে। যদি তুমি ওর দলের লোকেদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ওর কতকগুলো ঘাঁটি চিনে আসতে পার তা হলে হয়তো দারুণ একটা ভাল কাজ তোমার দ্বারা সম্ভব হতে পারে। তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে। দেশের সরকার তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে তোমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবেন আশা করি।''

''আমি আপনার কথার কিছুই বুঝতে পারছি না। ওই বিল্লুপ্রসাদকে অ্যারেস্ট করলেই তো সব রহস্যের সমাধান হয়ে যায়।''

''না। প্রথমত বিল্লুপ্রসাদকে অ্যারেস্ট করবার মতো কোনও প্রমাণ গভর্ণমেন্টের হাতে নেই। তা ছাড়া এখানকার পুলিশ প্রশাসনের সাধ্য নেই যে ওকে অ্যারেস্ট করে। পুলিশের লোকেরা সকলেই ওর গোলাম। আজ থেকে দশ বছর আগে ছত্রিশ কোটি টাকার সোনা নিয়ে একদল সোনাপাচাবকারী পুলিশের তাড়া খেয়ে ওই জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। কিন্তু রহস্যময় ব্যাপার হল তারপর তারা যে কে কোথায় গেল তা কেউ জানে না। সোনাপাচারকারীরা একটি অ্যাম্বাসাডরে ছিল। পুলিশের লোকেরা ছিল একটি জিপের মধ্যে কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে গাড়ি শুদ্ধু সবাই নিখোঁজ।''

''সে কী! এর পেছনে কি বিল্লুপ্রসাদের হাত থাকতে পারে?''

''পারে। আবার না-ও পারে। পুলিশ, সেনাবাহিনীর লোক, জঙ্গল তোলপাড় করেও ওদের কোনও হদিশ পায়নি। তবে এখন আমার মনে হচ্ছে বিল্লুপ্রসাদ হয়তো সন্ধান পেয়েছে কোনও কিছুর। না হলে ওই জঙ্গলে ও ঘাঁটি করতে যাবে কেন? তাছাড়া যেভাবে

ও দিনের পর দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে তাতে কিন্তু সন্দেহের কাঁটাটা ওর দিকেই যায়। সীতাপুরের যে পুলিশ অফিসার সোনাপাচারকারীদের ধাওয়া করে ওই জঙ্গলে যান তিনি আমার পরম বন্ধু ছিলেন। কাজেই বুঝতে পারছ কেন আমি এতটা আগ্রহী? ওই সোনা উদ্ধার হলে দেশের কত উপকার হবে তা তুমি ভাবতে পার?"

গোরা সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আচ্ছা, ওরা দুপক্ষই কোনও দুর্ঘটনায় পড়ে থাকতে পারে তো?"

"সেক্ষেত্রে ভাঙাচোরা অবস্থায় গাড়িগুলোকে অন্তত পাওয়া যেত। কিছু ডেড বডির দেখা মিলত।"

"অর্থাৎ কিনা নিছক দুর্ঘটনা নয়। সবই পরিকল্পনা মাফিক করা হয়েছে। হয়তো গুম করা হয়েছে উভয় পক্ষকেই।"

"এখানেও রহস্য আছে। কেননা ওই সোনা পাচারকারীরা পুলিশের তাড়া না খেলে তো জঙ্গলে ঢুকত না। তা হলে?"

"তা হলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে হয় বিল্লুপ্রসাদ, নয়তো ওর চেয়েও সাংঘাতিক কারও হাত আছে এর পেছনে।"

"কিন্তু সেই লোকটি কে? বিল্লুপ্রসাদ নিজেই? নাকি দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি? এটা জানার কৌতূহল আমার অনেক। এ কাজ যদি বিল্লুপ্রসাদেরই হয় তা হলে ওর সঙ্গে আমার যতই ভালবাসার সম্পর্ক থাকুক ওর ফাঁসি হওয়া উচিত। আর এমন যদি হয় ওই সোনার লোভে ও ওই জঙ্গলে ডেরা বেঁধে জঙ্গল ইজারা নিয়ে ভেতবে ভেতরে ওই গুপ্তধনের অনুসন্ধান করছে অথবা পেয়ে আত্মসাৎ করেছে তা হলে আলাদা কথা। কেননা সোনাব প্রতি লোভ কার না আছে? সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা সরকারের নজরে আনা উচিত নয় কী।"

গোরা বলল, "আপনার মুখে যা শুনলাম তাতে নিজেব কানকেও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার পড়াশুনার ক্ষতি হয় হোক, এই রহস্যের যবনিকা না টেনে আমি কিন্তু যাচ্ছি না। শুধু বুঝতে পারছি না বিল্লুপ্রসাদ আমাকে এই জঙ্গলের গদিতে বসিয়ে কী কাজ করাতে চান!"

"দেখোই না গিয়ে কী করান। তারপরের কাজ তুমি তোমার বুদ্ধি খাটিয়ে করবে।"

কথা বলতে বলতেই বাড়ির কাছাকাছি চলে এল দুজনে। বিকেল গড়িয়ে এলেও সন্ধে হতে তখনও অনেক দেবি।

গোরা বলল, 'আপনি তো এখন বাড়ি যাবেন কাকাবাবু? আমি কিন্তু এখনই যাচ্ছি না।"

"তুমি তা হলে কোথায় যাবে?"

"কোথাও না। পায়ে হেঁটে এদিক সেদিক ঘুরে একটু পরিচিত হব জায়গাটার সঙ্গে।"

"বাড়ি চিনে যেতে পারবে?"

"নদীর ঘাটে গিয়ে পড়লে বাড়ি চিনতে অসুবিধে কোথায়? ঘাটের কাছাকাছিই তো ঘর।"

"খুব একটা বেশি দূরে যেও না যেন।"

"না না। পথে পথে ঘুরে নদীর ঘাটেই বসে থাকব। খেয়া পারাপার দেখব। গান শুনব। আমার খুব ভাল লেগেছে জায়গাটা।"

সদাশিববাবু বিদায় নিলে গোবা চারদিক দেখতে দেখতে একসময় নদীর ঘাটে এসে বসল। বহু লোকজনের সমাগমে প্রত্যেকটি ঘাট তখন গম গম করছে।

পাঁচ

এইখানে নদীর ধারে একটি ধর্মশালা আছে। তার নাম শ্রীমাজী ধর্মশালা। ধর্মশালা এখানের আশপাশে আরও অনেক আছে। তবে এই ধর্মশালাটি একেবারেই নদী কিনারে।

সেই ধর্মশালায় একদল যাত্রী এসেছে। কী বিচিত্র সাজ পোশাক তাদের। দেখলে যেন চোখ ঝলসে যায়। পুরুষরা প্যান্ট শার্ট পরে থাকলেও মেয়েরা রঙ-বেরঙের শাড়ি, ফ্রক, চুড়িদার পরে কল্লোলিনীর মতো কল কল করছে।

ওদেরই ভেতর থেকে এক সুন্দরী রমণী ঘাটের প্রশস্ত জায়গাটায় নেমে এসে হাঁক দিলেন, "আরে ভাই লেড়কা লেনেবালে কোঈ হ্যায়?"

গোরা অবাক হয়ে গেল। ছেলে নেবার জন্য লোক খুঁজছেন রমণী! এমন তো কখনও শোনে নি ও।

রমণী আবার হাঁক দিলেন, "আরে ভাই হ্যায় কোঈ?"

বিস্ময়ে পলক পড়ল না গোরার চোখের পাতায়। ও একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রমণীর দিকে। কী আশ্চর্য সুন্দরী সে। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা গায়ের রঙ। কপালে সিঁথিতে ওর মায়ের মতো পরা সিঁদুর। তবে কিনা দারুণ স্মার্ট। আর কণ্ঠস্বরেও অত্যন্ত বলিষ্ঠতা। বেশ বনেদি পরিবারের বউ। অনেকটা ফিল্মিস্টারের মতো।

একজন শক্তসমর্থ চেহারার এ দেশীয় লোক ঘাটে স্নান করছিল, সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে গা মুছতে মুছতে বলল, "ম্যায় হু। ম্যায় যাউঙ্গা। উমর কিতনা লেড়কা কো?"

"দো সালকা।"

"কাঁহা যানা?"

"কামতানাথ।"

'কামতানাথ? দশ রুপাইয়া লাগে গা।"

"দে দুঙ্গা। জলদি করো।"

কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারল না গোরা। বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল ওদের দিকে।

এবার একজন পুরুষ মানুষ এগিয়ে এলেন, "কিতনা টাইম লাগে গা?"

"হমারি পা-ও মে তো আধে ঘণ্টেকা রাস্তা। লেকিন আপ যিতনা টাইম লাগাইয়ে গা।"

"চলো চলো আভি চলো।"

আর একজন বললেন, "আভি যানে সে সামকো আ সকে?"

"বড়ী আরামসে।"

"তব চলনা শুরু করো।"

কামতানাথ কোথায়? ওদের ব্যাপার-স্যাপার কী? এসব সঠিকভাবে বুঝতে না পারলেও কিছুটা অনুমান করল গোরা। এঁরা নিশ্চয়ই সদলবলে কোথাও বেড়াতে যেতে চান। আর এই লোকটা ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে এবং ছেলে বইবে। শুধু তাই নয়,

সন্ধের আগে ফিরেও আসবে ওরা।

গোরার হঠাৎ মনে হল এই সুন্দর পবিবেশে এইভাবে বসে না থেকে ওদের সঙ্গ নি‌লে কেমন হয়। ও তো একা। ও যদি চুপিচুপি ওই দলের পিছু নেয় তা হলে ক্ষতি কী? এই ভেবে আপনমনে ও যেন একা একা নিজেই যাচ্ছে এমন ভাব করে স্বল্প একটু দূরত্ব বজায় রেখে ওদের পিছু নিল।

এই তীর্থযাত্রীদলে পুরুষ মহিলা করে জনা দশেক ছিল। ছেলে বাহক লোকটি এবং ওকে ধরলে মোট বারোজন।

সেই দেহাতি লোকটি ওদের বছর দুয়েকের শিশুটিকে কোলে নিয়ে কামতানাথের জয় দিয়ে একটি নাতি উচ্চ পাহাড়ের গা বেয়ে চলতে শুরু করল।

চারদিকে ঘন বনানী। এবং পাহাড় আর পাহাড়! সেই পাহাড়ের কোলে কোলে ওদের পথ চলা।

ওদের কথাবার্তা শুনে গোরা বুঝতে পারল এই তীর্থযাত্রী দল চিত্রকূট পর্বত প্রদক্ষিণ করতে চলেছে। এই পর্বতের চারদিক ঘুরে ওরা সন্ধের আগেই ফিরে আসবে।

গোরা তাই এই সুযোগটা হাতছাড়া করেনি। কেননা কাল সকাল থেকেই ও যদি বিল্লুপ্রসাদের গদিতে লেগে পড়ে তা হলে হয়তো এখানের কোনও কিছুই দেখা হবে না ওর। কাজেই সময় ও সুযোগকে একেবারেই হাতছাড়া করা নয়।

রমণীয় পরিবেশে পার্বত্য উপত্যকা দিয়ে পথ চলতে চলতে বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর এই তীর্থযাত্রী দলের হঠাৎই একজনের নজর পড়ল ওর দিকে।

ভদ্রলোক হাসিমুখে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি অকেলে হো?"

গোরা বলল, "জী হাঁ।"

"ক্যা নাম তুমহারা?"

"গোরাচাঁদ।"

"তুমি বঙ্গালি?"

গোরা হেসে বলল, "হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক বললেন, "আরে ভাই হাম ভি কলকাত্তাকা। হুঁয়া পর দশ সাল হরিসেন রোড মে থা।"

গোরা বুঝতে পারল ভদ্রলোক হ্যারিসন রোডের কথা বলছেন। তাই বলল, "এখন কোথায় আছেন?"

"আলিগড় মে।"

গোরা বলল, "আপনি নিশ্চয়ই বিজনেস ম্যান।"

"হাঁ। ভুজিয়াবালা। লেকিন মেরা দেশ বিকানীর। আউর ইয়ে সব বনারস কা।"

গোরা বলল, "আমি এখানে নতুন এসেছি। পথ ঘাট কিছু চিনি না। নদীর ঘাটে বসেছিলাম। আপনারা আসছেন দেখে আমিও আপনাদের সঙ্গে আসছি।"

"তো ঠিক হ্যায়। সাথী হো যাও হমারা।" বলেই দলের মেয়ে পুরুষদের ডেকে বললেন, "আরে দেখো ভাই, কৌন আ গিয়া। বঙ্গাল সে আয়া। সাথী বন গিয়া হমারা।"

ভদ্রলোকের কথা শুনে সবাই বেশ খুশি খুশি ভাব নিয়ে চেয়ে দেখল গোরাকে।

কয়েকজন বয়স্কা মহিলা আদরের সুরে বললেন, "আ যাও মেরে লাল। অকেলে

আয়ে হো?"

গোরা ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

আবার চলা শুরু।

পড়ন্তবেলায় সেই অবাঙালি পরিবারের লোকেদের সঙ্গে এই জনহীন পার্বত্য প্রদেশে পথ চলতে কী ভাল যে লাগল ওর তা ও-ই জানে।

চারদিকে শুধু পাহাড়-পাহাড় আর পাহাড়। তারই কোলে ঘন বনানী। সেই বনানীর শাখা-প্রশাখার ভেতর থেকে কত যে পাখি ডাকছে। সে সব পাখির নাম কে জানে? এক একটা পাখি এমন শিস টানছে যে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কিরকম করে উঠছে যেন।

খানিক চলার পরই মেয়েরা গান শুরু করল। রাম ও সীতাকে নিয়ে গান। কী সুন্দর। পাহাড় ও বনতল যেন সেই গানের সুরে সুরভিত হয়ে উঠল। মেয়ে এবং বউগুলোকে দেখতেও কী চমৎকার। কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ। হাতে আবার কী সব নক্সা কাটা। মেহেন্দি না কী যেন রঙ লাগানো।

যে লোকটি ওদের পথ দেখিয়ে এবং দু'বছরের সেই শিশুটিকে কোলে নিয়ে আগে আগে যাচ্ছিল হঠাৎ তার কী ভাবাবেগ হতে সেও চেঁচিয়ে তার দেশোয়ালি সুর টেনে গেয়ে উঠল, "সাম ভৈল সহেলি না আয়ে রোটি না বানাই...।"

এই সঙ্গীতবহুল প্রাণোচ্ছল পথযাত্রায় শুধু গোরাই যা নীরব শ্রোতা। এক একসময় ওরও ওদের মতো গেয়ে উঠতে ইচ্ছা করল। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি সবকিছু হয়?

যাই হোক, এইভাবে যেতে যেতে একসময় ওরা চিত্রকূট পর্বতের পাদদেশে কামতানাথের মন্দিরে এসে উপস্থিত হল।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে প্রায়।

ওরা মন্দিরে প্রবেশ করে কামতানাথের রম্য মনোহর রূপ দর্শন করে ধন্য হল। এখানে কামতানাথের কালো কষ্টিপাথরের এক অনবদ্য মূর্তি আছে। কথিত আছে বনবাসকালে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র এই মূর্তিকে পূজা করে গেছেন। মূর্তিটি বহু প্রাচীন, মূর্তি মানে শুধু একটি মুখ।

ওরা যখন মন্দিরে এল সেখানে তখন আরতি হচ্ছে।

আরতি শেষ হলে ডালা নিয়ে পুজো দেবার পালা। নারকেল, প্যাঁড়া, এলাচদানা, ধূপ কত কি দিয়ে পুজো দিল ওরা। গোরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখল। ওর তো কোনও কিছু করার উপায় নেই। যা করবার তা ওরাই করল।

পুজো দেওয়ার পর্ব শেষ হলে দেবতার সামনে নারকেল ফাটিয়ে প্রসাদ বিতরণ করল ওরা।

সত্যই অনবদ্য ব্যাপার। চমৎকার প্রথায় প্রসাদ বিতরণের পর একটি দোকানে বসে শুরু হল জলযোগের পর্ব। আদব করে গোরাকেও ডেকে নিল এরা । ও যেন ওদেরই কেউ। জলযোগ বলতে ঘুগনি, চাটনি মেশানো সিঙাড়া আর চা। ওরা অবশ্য ঘুগনিকে চানা বলে আর সিঙাড়াকে বলে সামোশা। খেয়ে পেট ভরে গেল। এক তো বিল্লুপ্রসাদের ওখানে জব্বর খাওয়া হয়েছিল, তার ওপর আর এক প্রস্থ হয়ে গেল। দিনটা খুবই ভাল বলতে হবে।

এরপর সন্ধের অন্ধকার ঘনীভূত হবার আগেই ওরা কামতানাথ প্রদক্ষিণে চলল।

অর্থাৎ এই চিত্রকূট পর্বতকে বেড় দিয়েই ঘুরতে হবে পুরোটা। ওরা দেরি না করে প্রদক্ষিণ শুরু করল।

সবাই জয়ধ্বনি করল সমস্বরে, "বোলো কামতানাথ কি জয়...।"

ওদেব সুরে সুর মিলিয়ে গোরাও জয়ধ্বনি করল।

এইবার হল গোরার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এইসব সুন্দরী বধূ কন্যাদের দলে সতীয়া নামের একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি ওরই বয়সী। কী দারুণ দেখতে তাকে। চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো তার গায়ের রঙ। পটের ছবির মতো মুখ। একমাত্র হরিণের চোখের সঙ্গেই বুঝি তার চোখদুটিব তুলনা চলে। গোরা অনেকক্ষণ থেকেই একটু ভয়ে ভয়ে এবং লাজুক লাজুক চোখে দেখছিল তাকে। দেখছিল আর কী ভাল যে লাগছিল তা বোঝাবে কাকে? গৌতমের বোন গোপাকেও ওর ভাল লাগে। কী দারুণ মিষ্টি মেয়েটি। কিন্তু এই মেয়েটি যে সম্পূর্ণ অন্যরকম। কী অদ্ভুতভাবে মনকে নাড়া দেয়। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কথা বলতে সাধ যায়। এমন একটি মেয়ের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হলে জীবনের সব দুঃখকেই যেন ভুলে যেতে পারে ও। ওকে দেখে ওর আবার নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছে করল। মনে হল এ পৃথিবীর সব কিছুই অসুন্দর নয়।

কী সুন্দর পিঠের ওপর লম্বা বেনীটি দুলিয়ে স্কার্ট পরা মেয়েটি ধীর স্থিরভাবে পথ চলছে। ওর পথ চলাতেও কেমন যেন একটা ছন্দ আছে। মেয়েটিও পথ চলার কালে আড়চোখে মাঝে মাঝে দেখছিল ওকে।

গোরার বুকের ভেতরটা কীরকম করে উঠল।

এই জগতের আনন্দযজ্ঞে কোনও দুঃখই চিরকাল স্থায়ী হয় না। গোরা বুঝতে পারল ওর দুঃখের অমানিশায় সতীয়া নামের এই কিশোরীই যেন সুখের প্রদীপ শিখা। এখন মনে হচ্ছে এই চিত্রকূটে না এলে ও জীবনে বেঁচে থাকার আলোর আভাষ কখনও পেত না। এমন একজনের বন্ধুত্ব ওর সব দুঃখকে দূর করে দিতে পারে।

মেয়েটিও বোধ হয় ওর সৌন্দর্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তাই দেখছিল আর চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল।

গোরার মনে হল বাতাসের আন্দোলনে দুলে ওঠা ও যেন একটি ম্যাগনোলিয়া ফুল। যার সৌরভে ও সবাইকে মাতিয়ে দিতে চায়।

চলতে চলতে মেয়েটি হঠাৎ একসময় দল থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে এল।

গোরা ছিল সবার পেছনে।

মেয়েটি একটি চকোলেট ওর হাতে দিয়ে নিজে একটি মুখে পুরল। তারপর সুন্দর মুখখানি আলোয় ভরিয়ে মিষ্টি হাসি হেসে মধুর সুরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি বঙ্গাল সে আয়া? কলকাত্তা কা?"

গোরা বলল, "হ্যাঁ।"

"ক্যা নাম তুমহারা?"

"গোরা। গোরাচাঁদ। তুমহারা?" গোরা যদিও দলের কথাবার্তায় মেয়েটির নাম জেনেছিল তবু জিজ্ঞেস করল।

মেয়েটি আস্তে করে বলল, "আমার নাম সতীয়া।"

অবাক হয়ে গেল গোরা। কী সুন্দর সহজ সরলভাবে পরিষ্কার বাংলায় নিজের নাম

বলল মেয়েটি। মুগ্ধ গোরা বলল, "বাঃ। বেশ মিষ্টি নাম তো তোমার।"

"তোমার নামও খুব ভাল।"

"তুমি বাংলা জানো?"

"জানি।"

"কী করে শিখলে? নিশ্চয়ই আগে কলকাতায় ছিলে?"

"ছিলাম কিছুদিন।"

"কলকাতায় কিছুদিন কেন, অনেকদিন থাকলেও তোমার মতো এত ভাল বাংলা খুব কম জনই বলতে পারে।"

সতীয়া মিষ্টি করে হাসল। হাসিতে যে কারও সত্যিই মধু ঝরে তা গোরা এই প্রথম দেখল। বলল, "কী সুন্দর তুমি।"

"তুমিও তো।"

কোনও মেয়ে ওকে ভাল চোখে দেখবে, ভাল কথা বলবে—এমন ও স্বপ্নেও ভাবেনি কখনও। বিশেষ করে সতীয়ার মতো ফুটফুটে একটি কিশোরী মেয়ে। গোরা বুঝল ওর দুঃখ সাগরে সতীয়া একটি সুগন্ধি গোলাপ ফুল। যা কিনা ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত। কথাবার্তা আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য গোরা বলল, "তোমার মুখে বাংলা শুনে এত ভাল লাগল আমার...।"

সতীয়া বলল, "আসলে আমি তো বারাণসীর মেয়ে। ওখানকার অবাঙালিরা সবাই প্রায় বাংলা জানে। তা ছাড়া আমি ওখানকার ইউনিভারসিটিতে যে হস্টেলে থাকি সেখানে আমার অনেক বাঙালি বান্ধবী আছে। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে কথাবার্তা বলে বাংলা আমার দখলে আছে। তবে কিনা বাংলা লিখতে বা পড়তে পারি না।"

"তুমি হস্টেলে থাকো কেন? বাড়িতে বাবা মা'র কাছে থাকতে পারো না?"

সতীয়া আস্তে করে বলল, "খুব ছোটবেলায় মা বাবা দুজনকেই হারিয়েছি আমি।"

"তাই বুঝি?"

"হ্যাঁ। একটু আগে যার সঙ্গে তুমি বাতচিত করছিলে উনি আমার আঙ্কলজী। আমাকে নিজের মেয়ের মতো করে মানুষ করেছেন। আমার হস্টেলে থাকার সমস্ত খরচখরচা উনিই দেন। এখন ব্যবসার জন্য আলিগড়ে থাকেন। বড় ভালমানুষ। আর বছর দু'ই বাদে আমি আর একটু বড় হলে আগ্রার একটি ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে উনি উত্তরকাশীতে গিয়ে থাকবেন।"

এই শেষের কথাটায় গোরার বুকের ভেতরটা যেন কিরকম করে উঠল। যাকে দেখে ও বাঁচার একটা প্রেরণা পেল সেও আর দু'বছর বাদে পর হয়ে যাবে। যাক, সবাই সুখী হোক। গোরা একাই পথ চলবে। কারও প্রতি কোনও অনুরাগ ও রাখবে না।

গোরাকে হঠাৎ নীরব হয়ে যেতে দেখে সতীয়া বলল, "কী বন্ধু! তুমি আর কথা বলছ না যে?"

গোরা বলল, "না। এমনি।"

"এই দূর দেশে তুমি এমন একা কেন?"

"আমিও যে তোমারই মতো অনাথ। আমার মা বাবা দুজনেই এক বছর আগে এক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।"

সতীয়া থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "সচ!"

গোরা ম্লান হেসে বলল, "এসব কথা কি কেউ মিথ্যে বলে?"

ওরা আবার দলের পিছু পিছু চলতে শুরু করল।

গোরা দেখল ওর কথা শুনে সতীয়ার চোখ দুটো কেমন যেন করুণ হয়ে উঠল। কী ভীর মমতায় ভরে উঠল ওর মুখখানি। গোরার মনে হল ঈশ্বর তা হলে ওর সবকিছুই কড়ে নেননি। ওর দুঃখেও কোনও কিশোরীর মনে ব্যথা জাগে। সতীয়ার চোখের দিকে চয়ে গোরার চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠল।

সতীয়ার চোখের কোণেও জল। বলল, "আমার মতো তুমিও?"

"হ্যাঁ, আমিও।" তারপর বলল, "সতীয়া, তোমার বারাণসীর ঠিকানাটা আমাকে দবে? আমি তোমাকে চিঠি লিখব। আমার খুব ভাল লেগেছে তোমাকে। তুমি কি আমার বন্ধু হবে? আমার কিন্তু আপনজন বলতে কেউ নেই।"

সতীয়া বলল, "কিঁউ নেহি? নিশ্চয়ই দেব। আমার বন্ধু হওয়ার তুমিই তো উপযুক্ত হলে। আমার দুঃখ তুমি যতটা বুঝবে আর কেউ তো তা বুঝবে না।" কথা শেষ করেই ক টুকরো কাগজে সতীয়া মুক্তোর মতো অক্ষরে ওর ঠিকানা লিখে গোরাকে দিল।

একসময় পরিক্রমা শেষ হল ওদের।

এবার ফেরার পালা।

গোরার বুকের ভেতরটা টনটনিয়ে উঠল। কেননা আজকের এই রাত্রিটা প্রভাত হলে ক কোথায় হারিয়ে যাবে তার ঠিক কী? গোরাকে যেতে হবে জঙ্গলের গভীরে। সতীয়ারা লে যাবে ইলাহাবাদ হয়ে বারাণসীর দিকে। ওদের কথাবার্তাতেই ওদের এই পরিকল্পনার থা জেনেছে গোরা।

এমন সময় হঠাৎই একটি অঘটন হয়ে গেল। প্রদক্ষিণ যেখানে শেষ হল সেখানে াহাড় জঙ্গল ভেদ করে চার পাঁচজন দস্যু আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর।

এর মধ্যে ওদের একজনের কাঁধে একটি বন্দুকও ছিল।

শুরু হল হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তি।

দলের পুরুষরা বাধা দিতে যেতেই ফটাফট লাঠির ঘা পড়ল তাদের মাথায়।

দস্যুদের লক্ষ ছিল মেয়েদের গায়ের গয়নাগুলোর ওপর। তাই প্রবল পরাক্রমে হনতাই পর্ব শুরু করল ওরা।

ওদের লাঠির ঘায়ে পুরুষরা লুটিয়ে পড়ল সবাই। কান্নায় আর্তনাদে সচকিত হয়ে ঠল চারদিক।

বাধা দিতে গেলে সতীয়ার আঙ্কলজীর মাথাতেও পড়ল একটা লাঠির ঘা। যেই না াড়া সতীয়া অমনি একটা পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল একজনের মাথা লক্ষ্য করে।

মোক্ষম ঘা। লোকটি আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল পাহাড়ের কোলে। আর বাকিরা াপিয়ে পড়ল সতীয়ার ওপর।

গোরাও তখন মরিয়া। প্রবল প্রতাপে সে একজনের গলা ধরে ঝুলে পড়তেই মাথায় চণ্ড আঘাত। ওর সব যেন কিরকম ঘুলিয়ে গেল। ও দেখতে পেল সতীয়াকে কাঁধে নিয়ে জন লোক অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। সতীয়া প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে কিন্তু পেরে উঠছে না দের শক্তির সঙ্গে। গোরা একটু একটু করে জ্ঞান হারাল।

ছয়

জ্ঞান যখন ফিরল গোরার রাত্রি তখন অনেক। সদাশিববাবু এবং কাকিমা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছেন। ঘর ভর্তি লোক তখন। সকলের সেবা শুশ্রূষায় এবং ইনজেকশনের প্রভাবে অনেকটা সুস্থ ও। চোখ মেলে ও অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সবার মুখের দিকে। কী থেকে যে কী হয়ে গেল তা মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল। এক এক করে মনেও পড়ল সব সতীয়া কি রক্ষা পেয়েছে? শত্রুর কবল থেকে ওকে কি উদ্ধার করতে পেরেছে কেউ? একথার উত্তর ওকে কে দেবে?

ঘোর কাটলে ধীরে ধীরে উঠে বসল গোরা।

কাকিমা জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কেমন বোধ করছ বাবা? কোনও কষ্ট নেই তো?'

গোরা বলল, "না। আসলে মাথায় ঘা খেয়েই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। কী ভাগ্যিস ঘাড়ের কাছে লেগেছিল তাই, না হলে মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যেত।"

"ভাল থাকলেই ভাল। খুব গুরু রক্ষে যে প্রাণে বেঁচেছ।"

"সতীয়া কোথায়? ওকে কি পাওয়া গেছে?"

"কার কথা বলছ তুমি?"

গোরার চোখে জল এল এবার। বলল, "সেই যে সেই মেয়েটি।"

"বুঝেছি। যাদের দলে তুমি ছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"ওকে পাওয়া যায়নি। তবে কিনা পুলিশ ওর জন্যে হন্যে হয়েছে। উদ্ধার ওবে করবেই।"

সদাশিববাবু বললেন, "আমি তোমাকে কত করে বারণ করলাম একা একা দূরে কোথাও না যেতে, আমার কথা শুনলে না তো?"

"আমি তো একা যাইনি। আমি যে ওদের দলের সঙ্গে ছিলাম। কী দারুণ আন্তরিকতায় আদর করে ওরা ওদের দলে আপনজনের মতো আমাকে টেনে নিল।"

"তা না হয় নিল। কিন্তু ওদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কী? কেন শুধু শুধু নিজের সুস্থ শরীরটাকে তুমি ব্যস্ত করলে?"

গোরা বলল, "কে জানত বলুন না এমন হবে।"

কাকিমা ততক্ষণে একটু দুধ গরম করে এনে খেতে দিলেন ওকে। বললেন, "আজ আর এত রাতে ভারি কিছু খেও না। এই খেয়েই শুয়ে পড়।"

গোরার দুধ খাওয়া হলে সদাশিববাবু বললেন, "তোমাকে আর জঙ্গলেব মধ্যে কাজে যেতে হবে না বাবা। দু'একদিন থেকে একটু সুস্থ হয়ে তুমি বাড়ি চলে যাও।"

গোরা বলল, "না। যে কাজের জন্য আমি এতদূরে এসেছি সেই কাজ না করে আমি কী করে যাব?" ওই জঙ্গলের গভীরে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে তা আমাকে জানতেই হবে। তা ছাড়াও আরও একটা কাজ আছে আমার। পুলিশ যদি সতীয়াকে উদ্ধার করতে না পারে তা হলে আমি জীবন দিয়েও ওকে উদ্ধার করব।"

"অসম্ভব। এই অঞ্চলের যারা সন্ত্রাস তারা যাকে তুলে নেয় তার মৃতদেহও কারও হাতে আসে না। তুমি এখানকার কিছুই জানো না তাই এইসব ভাবছ। তেমন বুঝলে ওর

তামাকেও লোপাট করে দেবে।"

গোরা ম্লান হাসল। বলল, "কাকাবাবু! ভয়ঙ্কর কোনও অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে একটি দেশলাই কাঠিই যথেষ্ট।"

কাকাবাবু বললেন, "বুঝলাম। কিন্তু কাল সকালে বিল্পুপ্রসাদের লোকেরা এলেই আমি ওদের ফিরিয়ে দেব।"

গোরা বলল, "যা আপনার ইচ্ছা। আমি কিন্তু আমার কাজ শেষ না করে যাব না।"

কাকিমা বললেন, "এসব কথা এখন থাক। অনেক রাত হয়েছে। ওকে একটু বিশ্রাম করতে দাও।"

বিশ্রাম অনেক হয়েছে। তাই গোরার চোখে ঘুম আর এল না। তবু শুয়ে শুয়ে অনেক কথাই ভাবতে লাগল। সতীয়ার ঠিকানা লেখা কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে ওর স্যুটকেশে ঢুকিয়ে রাখল সেটা। আর মনে মনে নানারকম পরিকল্পনা করতে লাগল। ওই রহস্যময় জঙ্গলে যেখানে মানুষ, পুলিশের গাড়ি সব কিছুই হারিয়ে যায় সেই জঙ্গলমহলের অধিনায়ক কে? সতীয়াকে যারা লুণ্ঠন করল তারা কারা? সতীয়াও কি ওই জঙ্গলের গভীরে বরাবরের জন্য হারিয়ে যাবে? চম্বলের দস্যুদলের সঙ্গে কি ওই জঙ্গলরাজের কোন গোপন সম্পর্ক আছে? যারা হারিয়ে যায় তারা কোথায় যায়?

ভাবতে ভাবতেই ভোর হয়ে এল। মঙ্গলারতির শঙ্খঘণ্টায় মুখর হয়ে উঠল মন্দাকিনীর তীরের মন্দিরগুলি।

গোরা ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করে উঠে বসল। তারপর ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে এল বাইরে।

শরীরটা এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে। কোনও ক্লান্তির লেশমাত্র নেই। শুধু ঘাড় ও মাথার কাছটায় সামান্য একটু ব্যথার বেদনাবোধ।

ও পায়ে পায়ে চলে এল মন্দাকিনীর তীরে। ঘাটে ঘাটে সাধু সন্ন্যাসী ও অনেক পুণ্যার্থীর ভিড়। এত ভোরেও স্নানের পর্ব সমানে চলেছে এখানে। অন্ধকারের ভাবটা তখনও কাটেনি। আকাশময় অসংখ্য নক্ষত্রের মালা গাঁথা। চারদিক আলোয় আলো।

কী ভাল যে লাগছে এখনকার এই পরিবেশ। এমন স্বর্গীয় সুখ হাওড়া কলকাতায় অনুভব করা যায় না। মন্দাকিনীর স্রোতের মতো জীবনটাকে যদি এখানেই কাটিয়ে দেওয়া যেত তা হলে কী ভালই না হত।

গোরা যখন তন্ময় হয়ে এইসব ভাবছে ঠিক তখনই ওর কাঁধের ওপর কোমল একটি হাতের স্পর্শ, "তুমি ভাল আছ তো?"

সেদিকে তাকিয়েই অবাক হয়ে গেল গোরা। বলল, "একী! সতীয়া তুমি?"

"হ্যাঁ আমি।"

"তুমি এখানে কী করে এলে?"

"ঈশ্বরের কৃপায়। শুনলাম তুমি নাকি জোর আঘাত পেয়েছিলে?"

"ঠিকই শুনেছ। তবে কিনা সেরকম গুরুতর কিছু নয়। তা হলে এই অবস্থায় আমাকে এখানে দেখতে পেতে না। তোমার আঙ্কলজী কেমন আছেন?"

"আমাদের দলের পুরুষরা সবাই আহত হয়েছেন অল্পবিস্তর। তার মধ্যে বেশ কয়েকজনের মাথা ফেটেছে। আঙ্কলজীর আঘাতটাই সবচেয়ে বেশি।"

"ওরা যখন তোমার ওপর চড়াও হয়েছিল আমি তখন বাধা দিতে গিয়েছিলাম।"

"জানি। তারই পরিণামে তোমাকে আঘাত পেতে হয়েছিল।"

"কিন্তু তুমি কীভাবে মুক্ত হলে ওদের কবল থেকে?"

"এসব কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয় না। চলো ঘাটের সিঁড়িতে গিয়ে বসি। চা খাবে?'

"আমার কাছে পয়সা নেই।"

"আমি খাওয়াব।" বলেই হাঁক দিল, "গুরুচরণ! দো কাপ চায় লাও।"

সতীয়ার সঙ্গে ঘাটের সিঁড়িতে এসে বসল গোরা। একটু নির্জনে, পাশাপাশি। কোথ থেকে একটা কুকুরও এসে ওদের গা ঘেঁষে বসল।

গোরা বলল, "তোমাকে যত দেখছি, ততই আমি মুগ্ধ হচ্ছি। তুমি কত সহজ সরল সাবলীল। কিন্তু এখানকার চা-ওয়ালার নাম তুমি কী করে জানলে?"

"বাঃ রে। ও যে আমার পরিচিত। সারনাথের কাছে মউ নামে একটা জায়গা আছে ও সেখানকার ছেলে। তা ছাড়া বছরে দু'তিনবার আমরা এখানে সময় পেলেই আসি বারাণসী থেকে বুন্দেলখণ্ড এক্সপ্রেসে, নয়তো বাসে। চিত্রকূট আমার পরিচিত জায়গা।"

একটু পরেই গুরুচরণ চা নিয়ে এলে চা খেতে খেতে গোরা বলল, "এবার বল তোমার কথা। তোমার কথা ভেবে ভেবে আমার মন উৎকণ্ঠায় ভরে ছিল।"

সতীয়া বলল, "ওরা তো আমাকে জবরদস্তি তুলে নিয়ে গেল। আমিও ওদের প্রাণপণে বাধা দিতে লাগলাম। কিন্তু পাহাড়ি পথে আমার বয়সী কোনও মেয়েকে ওইভাবে নিয়ে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার? তাই ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এই অবসরে আমি করলাম কি লাথি মেরে ওদের একজনকে পাহাড়ের ঢালে ফেলে দিয়ে আর একজনের দুটো চোখে আঙুল গুঁজে দিলাম। বিনা অস্ত্রে আত্মরক্ষার এর চেয়ে সহজ পন্থা আর নেই। লোকটি অন্ধত্বের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে আমাকে ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে বসে পড়ল আমিও কোনওরকমে ওখান থেকে পালিয়ে একজনদের বাড়িতে রাতটুকুর মতো আশ্রয় নিলাম। এখন ওদের এক মাতাজী স্নানে এলে ওঁরই সঙ্গে চলে এলাম।"

"তোমাদের ওরা খবর পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ। খবর দিয়েই তো সবেমাত্র আসছি। আসলে এই ভোরের আলোয় মন্দাকিনীর ঘাটে নাম গান শুনতে, মঙ্গলাবতি দেখতে, পায়চারি করতে আমার খুব ভাল লাগে। এই সময় তোমার কথাও আমার খুবই মনে হচ্ছিল। ভগবানের দয়া, তাই দেখা হয়ে গেল তোমার সঙ্গে।"

গোরা বলল, "তোমরা কি আজই চলে যাবে?"

"হ্যাঁ। ইলাহাবাদ হয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমরা সরাসরিই চলে যাব। তুমি কিন্তু চিঠি দিও আমাকে।"

"অবশ্যই দেব।"

"তুমি কবে কলকাতায় ফিরবে?"

"ঠিক নেই। কেননা আমার এখানে অনেক কাজ।"

সতীয়া হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, "তোমার আবার কী কাজ?"

"সে তুমি ঠিক বুঝবে না।"

সতীয়ার মুখটা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, "এই বয়সের ছেলে তুমি। কী

এমন কাজ তোমার যে আমি বুঝব না?"

গোরা বলল, "খুবই কনফিডেন্সিয়াল। কাউকে বলবে না তো?"

"কথা দিলাম।"

"বললে কিন্তু আমার ক্ষতি হবে। বিপদ হবে। কার্যোদ্ধারও হবে না।"

"এই বিশ্বাসটুকু তুমি আমার ওপরে রাখতে পারো বন্ধু।"

গোরা হেসে বলল, "বন্ধুত্ব তো হয়েই গেছে। তাই বার বার বন্ধু নয়, এবারে আমার নাম ধরে ডাক। বল, "গোরা। গোরাচাঁদ।"

"গো-রা। গোরাচানদ্।"

গোরা বলল, "শোনো তা হলে।" বলে আগাগোড়া ওর জীবনবৃত্তান্তের কাহিনী শুনিয়ে কেন এবং কী কারণে এখানে আসা তাও বলল। বলল, বিল্লুপ্রসাদের জঙ্গলমহলে ওর চাকরি নিয়ে যাবার কথা। সব শেষে শুনিয়ে দিল ছত্রিশ কোটি টাকার সোনা সহ একদল সোনাপাচারকারীর অ্যাম্বাসাডর নিয়ে ওই জঙ্গলে প্রবেশ এবং সেইসঙ্গে ওদের পিছু নিয়ে পুলিশের ধাওয়া করা জিপের উধাও হওয়ার কথা। অ্যাম্বাসাডর, জিপ, দুষ্কৃতী ও পুলিশ একধার থেকে সবেরই বিলোপ হওয়ার রোমাঞ্চকর কাহিনী।

সব শুনে চোখে মুখে অনন্ত বিস্ময় নিয়ে সতীয়া বলল, "এ অসম্ভব। হতে পারে না।"

"এই রকমই হয়েছে।"

"না। এইরকম হয় নি। ছত্রিশ কোটি টাকার সোনা পুলিশ ও দুষ্কৃতীদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছে। তারপর ইচ্ছে করেই উধাও হয়েছে ওরা। এবং একটা রহস্যের সৃষ্টি করেছে।"

"বেশ। তোমার কথাই না হয় মানলাম। মানুষগুলো না হয় সবাই আড়ালে গেল। কিন্তু অ্যাম্বাসাডর, জিপ সেগুলো উবে যায় কী করে?"

"ওগুলোকে নিশ্চয়ই সুকৌশলে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে।"

"এ ঘটনা আজ থেকে দীর্ঘ দশ বছর আগেকার। পুলিশ, সেনাবাহিনীর লোকেরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে জঙ্গল তোলপাড় করেও ও দুটোর কোনও হদিশ পায় নি। অবশেষে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন হঠাৎ এই জঙ্গলমহলে বিল্লুপ্রসাদের ডেরা গজিয়ে উঠল কী কারণে সেটাই তো সন্দেহের বিষয়।

"পুলিশ ওর দিকে নজর দেয় না?"

"না। কেননা বিল্লুপ্রসাদ দুর্ধর্ষ। পুলিশ ওর কথায় ওঠে বসে। অতএব—।"

"অতএব আমার মনের মধ্যে আরও একটা প্রশ্ন জেগে উঠছে।"

"কী প্রশ্ন বল।"

"ওই সোনাপাচারকারীরা যে ওই জঙ্গলেই ঢুকেছিল তার কোনও প্রমাণ আছে?"

"পুলিশ রেকর্ড তাই বলছে।"

"পুলিশ যে ওদের তাড়া করে ওই জঙ্গলে ঢুকেছিল তাই বা দেখেছে কে?"

"বহু লোকের চোখের সামনেই তো এটা ঘটেছে।"

"তা হলে শোনো, এই অঞ্চলের মানচিত্র সম্বন্ধে তোমার কোনও জ্ঞান নেই। এই যে দেখছ চিত্রকূট পর্বতকে। ওদিকে হনুমান ধারাই বল আর এদিকে এত সব পাহাড় পর্বত এ

সবই বিন্ধ্যপর্বতমালার শাখা প্রশাখা। এখানকার জঙ্গলের গভীরতা এবং ভয়াবহতা সম্বন্ধে তোমার কোনও ধারণা নেই। এই জঙ্গলে মানুষ যেখানে পাশাপাশি পথ চলতে পারে না সেখানে একটি অ্যাম্বাসাডর এবং পুলিশ জিপের প্রবেশ করা কী করে সম্ভব?''

গোরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ''তাও তো ঠিক। কিন্তু বিল্লুপ্রসাদের জিপ আমাকে ওই জঙ্গলের গভীরে নিয়ে যাবে কী করে?''

''জঙ্গলের কাঠ বিক্রির জন্য কিছুটা পথ হয়তো এখন তৈরি হয়েছে কিন্তু অতীতে কি ছিল?''

''জানিনা, জানিনা। কিচ্ছু জানিনা আমি। তবে আমার মনে হচ্ছে ওই জঙ্গলকে ঘিরেই যত কিছু রহস্য যেন দানা বেঁধে আছে।''

সতীয়া বলল, ''আমি যে কথাগুলো বললাম সেগুলো যুক্তির কথা। সকলের সন্দেহের মূল কারণ হয়তো ওইখানেই। যাই হোক, তুমি যাও। দেখো, কোনও কিছুর হদিশ পাও কিনা। যদি পাও তা হলে জেনো জীবনের শুরুতেই সত্যিকারের কোনও ভাল কাজ তোমার দ্বারা হল। এই ব্যাপারে চিঠিপত্রে আমার সঙ্গে কিন্তু যোগাযোগ রেখ। তোমার এখানকার ঠিকানা আমাকে দিয়ে রেখ। আমিও চিঠি দেবো।''

''দিও, কিন্তু সাংকেতিকভাবে। তুমি যে জেনেছ ব্যাপারটা তোমার চিঠি পড়ে কেউ যেন না জানতে পারে।''

''কোনও ভয় নেই তোমার। অত কাঁচা মেয়ে আমি নই।''

কথা বলতে বলতেই আকাশ ফর্সা হয়ে দিনের আলো ফুটে উঠল। প্রভাত হল চিত্রকূটে।

গোরা কাকাবাবুর ঠিকানাটা সতীয়ার হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখল ওদের দলের সবাই হাসি হাসি মুখ করে এগিয়ে আসছেন ওদের দিকে। পুরুষদের অনেকেরই মাথায় ব্যান্ডেজ।

সতীয়ার আঙ্কলজী এসে আবেগে জড়িয়ে ধরলেন গোরাকে। বললেন, ''তুমহার তবিয়ৎ ঠিক তো হ্যায়?''

''আপনি কিরকম?''

''বিলকুল ঠিক। আভি হাম সব যা রহেঁ।''

সতীয়া ওর দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে বিদায় নিল। কেন জানিনা এই বিদায়বেলায় গোরার মনে হল ও যেন এই মুহূর্তে ওর সত্যিকারের কোনও আপনজনকে বরাবরের মতো হারিয়ে ফেলল। আর কি কখনও দেখা হবে ওর সঙ্গে? আর দু'এক বছর পরে আগ্রার একটি ছেলের সঙ্গে ওর তো বিয়েই হয়ে যাবে। তবুও এই ফুলের মতো পবিত্র ফুটফুটে মেয়েটি ওর অন্তরময় দারুণ এক সুবাস ছড়িয়ে নয়নপথের বাইরে হারিয়ে গেল।

সাত

মন্দাকিনীর ঘাট থেকে ঘরে ফেরার পথেই দেখা হয়ে গেল কাকাবাবুর সঙ্গে। গোরাকে দেখেই চোখ কপালে উঠিয়ে বললেন, ''নাঃ। তোমাকে নিয়ে দেখছি সত্যিই পারা গেল না। কাল অত কাণ্ডর পরও তুমি ঘর থেকে বেরিয়েছ?''

গোরা হেসে বলল, ''সেকি! ওদের ভয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকব নাকি?''

"তোমাকে না দেখে আমার দারুণ ভয় হয়ে গিয়েছিল।"

"আসলে ভোরের দিকটা আমার খুবই ভাল লাগে। তায় তীর্থভূমির রমণীয় পরিবেশ। ভালই লাগল। তা যাক, ওরা কখন আসবে?"

"একটু পরেই। ঘরে এসে মুখ হাত ধোও, চা-টা খাও।"

কথা বলতে বলতেই বাড়ি এল গোরা। কাকাবাবুও সঙ্গে এলেন। কাকিমা তখন হানটান করছিলেন ওর জন্য। বললেন, "এসেছ? তোমাকে না দেখে কী ভয় হয়েছিল আমার।"

"কেন? এত ভয় পাবার কী আছে? রাতের অন্ধকারে ওরকম চুরি ছিনতাই কোথায় না হয়? ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট।"

"তুমি তো জানো না বাবা, এখানকাব মাঝিমাল্লাদের মধ্যেও ওদের লোক আছে। নদীর ঘাটেও চর আছে ওদের।"

গোরা বাথরুমের কাজ সেরে ওর পোশাক পরিবর্তন করে একেবারে ফ্রেস হয়ে নিতেই কাকিমা ওর জন্য জলখাবার নিয়ে এলেন।

বেলা প্রায় নটা নাগাদ বিল্লুপ্রসাদের লোকরা ওকে নিতে এল। রামঘাটের কাছে জিপ রেখে দুজন লোক বাড়ি আসতেই কাকাবাবু ও কাকিমাকে প্রণাম করে বিদায় নিল গোরা।

চিত্রকূটের নগরাঞ্চল ছাড়িয়েই গাড়ি জঙ্গলের পথ ধরল। এ পথে পথ বলতে এখনও কিছু নেই। পিচ ঢালা পাকা পথ নয়। উপলাকীর্ণ বনভূমির এবড়ো খেবড়ো অমসৃণ পথ। হেলে দুলে লাফিয়ে ঝাঁকানি খেয়ে এমনভাবে চলল যে মনে হতে লাগল এই বুঝি উল্টে যাবে গাড়িটা।

এইভাবে বেশ কিছুদূব যাবার পর এক জায়গায় এসে জিপ থামল।

জিপে ড্রাইভার ছাড়া যে দুজন লোক ছিল তাদের একজনের নাম বীরু আর একজনের নাম বাদল। গাড়ি থামলে ওরা গোরাকে বলল, "উতারো।"

এমন গভীর জঙ্গল গোরা এর আগে আর কখনও দেখেনি। তাই জঙ্গলের ভয়াবহ রূপ দেখে ও অবাক হয়ে গেল। জঙ্গল এতই ঘন এখানে যে দিনমানেও অন্ধকার।

ওরা ইশারায় গোরাকে ওদের সঙ্গে আসতে বলে এক জায়গায় পাহাড়ের ঢালে কাঠের তৈরি একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল ওকে।

বীরু বলল, "হিন্দি সমঝমে আয়েগা?"

গোরা বলল, "অল্প স্বল্প।"

বাদল বলল, "ও এমন কিছু কঠিন নয়। দু'চারদিন থাকতে থাকতেই শিখে যাবে।"

গোরা বলল, "একেবারেই যে বুঝি না তা নয়। তবে কিনা তোমরা তোমাদের দেশোয়ালি ভাষায় কথা বললে কিন্তু বুঝতে পারব না। বাড়িতে টিভি থাকায় অনেক হিন্দি ছবি দেখেছি। তাই কিছু বুঝি কিছু বুঝি না। তবে লিখতে বা বলতে পারি না।"

"ঠিক আছে। ওইরকম একটু আধটু বুঝলেও হবে। আমি বাংলা জানি। আমি সব বুঝিয়ে দেব তোমাকে।"

"তুমি বাঙালি?"

"না। আমি বিহারি। আমার দেশ হচ্ছে মধুপুরে। আসল দেশ মিথিলায়। কাজ কামের ধান্দায় এখানে এসেছি। বিল্লুপ্রসাদজীর গদিতে তিন বছর আছি। উনি এমনিতে খুব

ভালমানুষ। ওঁর লোকজনদের উনি বেশ ভালরকমই দেখেন। কিন্তু কেউ বেইমানি করলে বা ওঁর সঙ্গে চালাকি করবার চেষ্টা করলে তার কাছে উনি কিন্তু বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর।"

বীরু কর্কশ স্বরে বলল, "ফালতু বকোয়াস মাৎ করো। যো কাম করনে আয়া ওহি করো। সমঝা দো সবকুছ।"

বাদলও খ্যাঁক করে উঠল, "তোর এই দাঁড়কাকের মতো কণ্ঠস্বরটা একটু চেপে রাখ দেখি। ছেলেমানুষ, ভয় পেয়ে যাবে। এই দুধের শিশু একা এখানে কী করে থাকবে তাই ভেবে পাচ্ছি না, তার ওপর...।"

"আরে জলদি কর না ভাই।"

"তোর তাড়া থাকে তুই কেটে পড়। আমি মোহন সিং-এর ট্রাকে যাব। এখানে সারাদিন থেকে স্নান খাওয়া করে বিকেলে যাব আমি।"

"তব হাম যা রহে।"

"হ্যাঁ যাও। তোমার সাট্টার নেশা ছুটে যাচ্ছে তা তো বুঝতেই পারছি।"

বীরু একরাশ বিরক্তি নিয়ে চলে গেল।

ও চলে গেলে বাদল বলল, "ডরো মাৎ। কোনও ভয় নেই।" তারপর বলল, "আসলে ইউ পি'র লোকেরা একটু বদমেজাজি টাইপের হয়। তা যাকগে, তুমি এত কম বয়সে এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এলে কেন?"

গোবা বলল, "আসলে আমি তো স্টুডেন্ট। তাই একটু অরণ্যপ্রেমিক। আমার বাবা মা মারা যাওয়ার পর আমি বড় একা একা ফিল করছিলাম নিজেকে। এমন সময় এই কাজের খবর পেয়েই চলে এলাম।"

"ভালই করেছ।"

"কিন্তু কী কাজের জন্য যে আমাকে এখানে আনা হল তা আমিই জানিনা।"

বাদল হেসে বলল, "এখানে তোমার একটাই মাত্র কাজ হল এই বাড়িটাকে পাহারা দেওয়া।"

"সেকি! আর কোনও কাজ নেই?"

"মাঝে মধ্যে রাতের অন্ধকারে এক আধজন আসবে এখানে। তারা এসে কিছু দিয়ে গেলে তুমি রেখে দেবে। সে ব্যাপারে কোনও কৌতূহল প্রকাশ করবে না। আর এই ঘরের পেছন দিক দিয়ে যে পথটা নদীর দিকে চলে গেছে সেদিকে কখনও যাবে না। গেলে কিন্তু বিপদ হবে।"

গোরা বলল, "এই কাজ?"

"হ্যাঁ, এই কাজ?"

"কোনও স্মাগলিং গুডস্-এর আদান প্রদান হয় নিশ্চয়ই?"

"বলেছি তো কোনও কৌতূহল প্রকাশ করবে না।"

গোরা মাথা নেড়ে জানাল ভুল হয়ে গেছে তার। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "রাতের অন্ধকারে যে কাজের আদান প্রদান হয় সেই কাজের ব্যাপারে হঠাৎ যদি কখনও পুলিশের আবির্ভাব হয়? তখন কীভাবে সামাল দেব আমি?"

"এটা অবশ্য একটা বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করেছ। তবে জেনে রেখ পুলিশ এখানে আসবে না।"

"আসবেই। কোনও ব্যাপারেই একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকাটা ঠিক নয়। না আসে ভালই। এলে কী করতে হবে সেটাই বলে দাও।"

বাদল কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল গোরার মুখের দিকে। তারপর বলল, "বিল্লুপ্রসাদজী ভুল করেননি। ঠিক লোককেই রেখেছেন এখানে। তুমিই এই কাজের সত্যিকারের উপযুক্ত।"

গোরা বলল, "উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত সেটা পরে আমার কাজের মধ্য দিয়েই বুঝিয়ে দেব আমি। তবে এখন যখন আমি তোমাদেরই লোক তখন সব কিছু খতিয়ে দেখে কাজে হাত দিলে তবেই কাজটা ভালভাবে করা সম্ভব হবে।"

বাদল সস্নেহে বুকে টেনে নিল গোরাকে। তারপর বলল, "তোর মতো আমার একটা ভাই ছিল রে। তার নাম রাকেশ। হঠাৎ একটা অসুখ করে বছর দুই আগে সে মারা গেল। তুই আমার সেই ভাই। তোর যাতে ভাল হয় তাই আমি করব। আমি থাকতে তোর কোনও

অসুবিধে হবে না এখানে। তবু তোকে একটা কথা জানিয়ে রাখি, যে দলের হয়ে তুই আমি কাজ করছি সেই দলের নাম হল 'ব্ল্যাক নাইট গ্যাঙ'। কালো রাতের কুটিল অন্ধকারেই আমাদের কাজ কারবার। অঞ্চলের যত কুখ্যাত ক্রিমিনালরাই এই দলের সদস্য। আমাদের গড ফাদার বিল্লুপ্রসাদজী এই দলটিকে পরিচালনা করেন। এই জঙ্গলের ইজারা নেওয়া অংশটুকু ছাড়াও গভীর জঙ্গলের ভেতর থেকে নামি দামি অনেক গাছ কেটে লুকিয়ে বিক্রি করে দেন। নিষিদ্ধ ড্রাগ পাচার করেন।"

"এবং এগুলো সব রাতের অন্ধকারেই হয়।"

"হয়। তবে এর জন্য তোকে অবশ্য রাত জেগে বসে থাকতে হবে না। তুই দিব্যি

খাবি দাবি ঘুমোবি। কেউ এসে ডাকলে দরজা খুলে দিবি। যে যা দেবে নিয়ে রেখে দিবি। হয় আমি, না হয় বীরু এসে মাল নিয়ে যাব।"

গোরা বলল, "তুমিই এসো বাদলদা। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।"

"তুই আমাকে দাদা বললি?"

"বলব না? তুমি যে আমাকে ভাই বললে? তবে একটা কথা, তুমি যে তখন আমাকে বললে এই বাড়ির পেছনদিকের যে পথ নদীর দিকে গেছে সেইদিকে কখনও যাস না। গেলে বিপদ হবে। তার কারণটা কী? কীসের বিপদ?"

"ওই দিকটায় হল ভালুকা তালুক। ওরা নিষাদ সম্প্রদায়ের লোক। জঙ্গলের চোরা কাটরাদের সঙ্গে ওদের ঘোর বিপদ। আমরা চাইছি অরণ্যের নিধন করে বিত্তবান হতে, ওরা চাইছে অরণ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে সুখে শান্তিতে দিনাতিপাত করতে। কাজেই ওদের ওই খাসতালুকে অনধিকার প্রবেশকারী কাউকে দেখলেই তীর নিক্ষেপ করে ওরা। আমরা কেউ ওদিকে যাই না। যারা গেছে তারা কেউ ফিরে আসেনি। তুই অবশ্য ছোট ছেলে। হয়তো ওরা তোকে কিছুই বলবে না। তবুও বলা তো যায় না। তাই বলি কি ওদিকে ভুলেও যাস না তুই। কেন বিদেশ বিভুঁয়ে এসে বেঘোরে প্রাণটা দিবি।"

বাদলের কথা শুনে গোরা তন্ময় হয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। ভালুকা তালুক। বন্য শবর। নিষিদ্ধ এলাকা। সেই সঙ্গে দশ বছর আগে সোনা পাচারকারীদের নিখোঁজ হওয়া ওই নিষাদরাজ্যের মধ্যেই কোথাও হারিয়ে যায়নি তো ওই সোনা পাচারকারীদের অ্যাম্বাসাডর, পুলিশের জিপ...?

বাদল বলল, "ভয় পেলি?"

"না না। ভয় পাব কেন? আচ্ছা, রাতের অন্ধকারে ওরা কখনও এখানে এসে পড়তে পারে না?"

"না। ওদের নিজস্ব জগত ছেড়ে ওরা অন্য কোথাও যায় না। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের এই লীলাভূমিকে অরণ্যবেষ্টিত রাখতে চায় ওরা। কিন্তু এইভাবে কতদিন ওরা ওদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবে তা কে জানে? বিল্লুপ্রসাদের লোভের গ্রাস যেভাবে জঙ্গলকে ফাঁকা করছে তাতে আগামী বিশ বছরে এখানে একটি দুব্বো ঘাসও থাকবে কিনা সন্দেহ।"

"আচ্ছা বাদলদা, বিল্লুপ্রসাদজীর তো অনেক টাকা। তবুও এত লোভ কেন?"

"তবে আর বলে কে?"

"তা ছাড়া ওঁর যখন অন্য ব্যবসাও রয়েছে। তা এই ব্যাপারে ওঁকে কি একটু বুঝিয়ে বলা যায় না? তাতে শবরদের সঙ্গেও আমাদের বন্ধুত্ব হয়, আর অরণ্যও নির্মূল হবে না।"

"খবরদার। ভুলেও এই আলোচনা কারও কাছে করিস না। বিল্লুপ্রসাদের কাজের ব্যাপারে কেউ কোনও কথা বললে উনি সঙ্গে সঙ্গে তার দফাটি রফা করে দেন।" তারপর একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, "কেন যে উনি এইভাবে অরণ্যনিধনে মেতেছেন তা আর কেউ না জানুক আমি জানি।"

গোরা বলল, "কী জানো তুমি?"

"সে কথা কারও কাছে বলা যাবে না।"

"আমার কাছেও না?"

"না।"

“আচ্ছা, দশ বছর আগের কোনও ঘটনার ব্যাপারে এই নিধনযজ্ঞ কী?”

বাদল সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ চেপে ধরল, “তুই কী করে জানলি?”

“জেনেছি।”

শঙ্কিত হয়ে বাদল বলল, “যা জেনেছিস, জেনেছিস। কিন্তু এই ব্যাপারে কারও কাছে মুখ খুলবি না।”

“আমি শুধু তোমাকেই বললাম।”

“তোর পরিণাম যে কী হবে শেষ পর্যন্ত তা ভেবেই কূল পাচ্ছি না আমি। তোর অকালমৃত্যু ঠেকায় কে?”

এমন সময় আচমকাই ওদের বিস্ময় জাগিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল বীরু। বলল, “হামারি বারে মে ক্যা জানকারি কর লিয়া তুমনে? সাচ সাচ বতাও।”

বাদল বলল, “কীরে। ফিরে এলি যে তুই?”

“আধে রাস্তে মে যা কর গাড়ি খারাপ হো গয়া। ইস লিয়ে ওয়াপস আয়া। লেকিন ইয়ে নয়া চিড়িয়া তো বহৎই বোলনে লাগা।” বলে গোরার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, “ক্যা শোচা তুম, হাম সবকো বারে মে?”

গোরা বলল, “কিছু না।”

“সচ সচ বতাও। নেহি তো মার ডালুঙ্গা।”

গোরা বলল, “হোয়াট ননসেন্স”!

বীরু বলল, “আংরেজি মাৎ বোল। তু বহুৎ হুঁশিয়ার মালুম হোতা। শয়তান কি ঔলাদ।”

বাদল বলল, “দ্যাখ বীরু, ভাল হচ্ছে না বলছি। প্রথমদিনই ছেলেটা এল আমাদের দলে আর তুই কিনা তার সঙ্গে এইরকম খারাপ ব্যবহার করছিস?”

“আরে এ ব্যাটা স্পাই আছে। বিল্লুপ্রসাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেবার জন্য ভিজিলেন্সের লোকেরাই ওকে চালাকি করে পাঠিয়েছে এখানে।” বলেই গোবার জামার কলারটাকে শক্ত করে চেপে ধরল বীরু। বলল, “বোল, কিনোনে ভেজা তু নে?”

বাদল বীরুর হাত চেপে ধরল এবার শক্ত করে। বলল, “নির্ঘাত নেশা করেছিস তুই? নাহলে একটা বাচ্চা ছেলের গায়ে হাত দিতে তোর লজ্জা করছে না?”

বীরু হিংস্র গলায় বলল, “ক্যা বোলা? বাচ্চা ছেলে? আভি সাদি দেনে সে...।”

গোরা উত্তেজিত হয়ে বলল, “মুখ সামলে কথা বলবে বলে দিচ্ছি।”

বীরু ধমকে উঠল, “চোপ্।”

আর থাকা যায় না। গোরা এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করেই ওর চোয়াল লক্ষ করে মারল এক ঘুষি। সে ঘুষির আঘাত সহ্য করতে পারল না বীরু। একেবারে দরজার বাইরে ছিটকে পড়ল সে।

অভাবনীয় ব্যাপার।

গোরা নিজেও ভেবে পেল না এমন অমানুষিক শক্তি সে পেল কোথা থেকে?

বাদল নির্বাক।

হতভম্ব বীরু কিছু বুঝে ওঠার আগেই গোরা আবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

এমন সময় ড্রাইভার এসে খবর দিল গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে।

বীরু ক্রুদ্ধ চোখে গোরার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বলল, "তুঝকো ম্যায় ছোড়ুঙ্গা নেহি।"

গোরাও রোখ নিয়ে বলল, "আরে যাঃ যাঃ। ফোট হিঁয়াসে।"

কত সহজেই না হিন্দিটা বেরিয়ে গেল ওর মুখ দিয়ে।

বাদল অবাক বিস্ময়ে বলল, "তুই তো কামাল করে দিলি রে ভাই। তোকে যতটা নিরীহ গোবেচারা ভেবেছিলাম তা তো নয়। তবে চট করে ওর গায়ে হাত দিয়ে কিন্তু ভাল করলি না। বীরুটা মহা শয়তান। কখন কি করে বসে তা কে জানে? আমার ভয় করছে ও গিয়ে আবার বিল্লুপ্রসাদজীকে উল্টোপাল্টা কিছু না বোঝায়।"

গোরা বলল, "বোঝাক না। বিল্লুপ্রসাদজী যদি মনে করেন আমি ওঁর কাজের যোগ্য নই তাহলে আমাকে বিদায় দেবেন। ঘরেব ছেলে ঘরে ফিরে যাব আমি। নয়তো অন্য কোনও কাজের ধান্দা দেখব।"

বাদল বলল, "যাক, অনেক হয়েছে। এখন তোকে বুঝিয়ে দিই এখানে কোথায় কি আছে।"

গোরা বলল, "হ্যাঁ। আজেবাজে ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে কাজের কাজই করা যাক।"

বাদলের সঙ্গে সব কিছু ঘুরে দেখে নিল গোবা।

রান্নাঘর বাথরুমসহ ছোট ছোট দুটো ঘর। ঘরের বাইরে দালানের মতো একটু অংশ। বাড়ির পেছনদিকে ইঁদারা। জলের ব্যবস্থা আছে সেখানে। আশপাশের গ্রাম থেকে সকালের দিকে জল নিতে অনেকেই আসে। জল নেওয়ার প্রয়োজন শেষ হলেই চলে যায় সব। মানুষজনের সংখ্যা এখানে খুবই কম।

বাদল বলল, "ঘরে চাল ডাল আটা পেঁযাজ ডিম আলু সবই মজুদ আছে। সপ্তায় সপ্তায় আমি এসে দিয়ে যাব সব। চায়ের সরঞ্জাম, হ্যারিকেন, লণ্ঠন, দেশলাই, টর্চ, সবই আছে। কোনও কিছুর অসুবিধে হলে আমাকে বলবি। আর শোন, সন্ধের পর ঘর থেকে একদম বেরোবি না। বন জঙ্গলের ব্যাপার তো। বলা যায় না, হঠাৎ কোনও জন্তু টন্তু যদি এসে পড়ে তাহলে যে কোনও মুহূর্তে একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে।"

গোরা বলল, "বাঘ টাঘ আছে বুঝি?"

"থাকতে পারে। তবে মাঝে মধ্যে ভালুক বেরোয় বলে শুনেছি।"

"ও মাই গড। ওরাও তো মোস্ট ডেঞ্জারাস।"

বাদল ততক্ষণে জল এনে স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছে।

গোরা বলল, "এই ঘরে আমার আগে কে থাকত?"

"বসন্ত ঠাকুর নামে একজন লোক। খুবই বিশ্বাসী লোক ছিল। তা একদিন কী যে মতলব চাপল তার মাথায়, প্রায় দশ লাখ টাকার হিরে নিয়ে সে রাতের অন্ধকারে পালাতে গেল। সঙ্গে ওঁর মেয়েও ছিল। এই হিরে নেবার জন্যে বিল্লুপ্রসাদজী নিজে আসছিলেন গাড়ি নিয়ে। বীরু আমি দুজনেই ছিলাম সঙ্গে। একেবারে রাহুর গ্রাসে পড়ে গেল ঠাকুর। মেয়েটা কত কান্নাকাটি করল বিল্লুপ্রসাদজীর হাতে পায়ে ধরে। কিন্তু কোনও ফল হল না। কঠিন শাস্তি হিসেবে এই জঙ্গলের মাটিতেই ঠাকুরকে জ্যান্ত কবর দিলেন তিনি। বীরু তো চুলের মুঠি ধরে মেয়েটাকে পাহাড়ের খাদে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। আমিই আটকালাম। মেয়েটা

এখন পাশের গ্রামে ডেরা নিয়েছে। এর ওর দুয়ারে পড়ে থাকে। কেউ কিছু খেতে দিলে খায়, না দিলে উপোস।"

"আহা রে। বেচারি। তা হঠাৎ ওঁর অমন কুমতলব হল কেন? উনি কি জানতেন না এর পরিণাম কী হতে পারে?"

"নিশ্চয়ই জানত। তবে আমার মনে হয় ঠাকুর ঠিক চুরির জন্য চুরি করেনি।"

"তা হলে?"

"নিশ্চয়ই কোনও গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ওর। এই হিরেগুলো তাদের হাতে তুলে দিয়েই বিল্লুপ্রসাদকে ফাঁসাতে চেয়েছিল।"

"তার মানে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।"

"ঠিক তা নয়, প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল।"

'প্রতিশোধ?"

"হ্যাঁ। তুই ছেলেমানুষ, তোকে কী করে বলি। ঠাকুরের স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী ছিল। বিল্লুপ্রসাদের কারণেই সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।"

গোরার চোখ দুটো রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। বলল, "থাক আর বলতে হবে না। এই লোকের হয়ে তোমরা কাজ করছ?"

"উপায় নেই রে। তবে খুব বেশিদিন করব না। বিল্লুপ্রসাদের দয়ায় এই কবছরে ভালই কামিয়ে নিয়েছি। আরও দু'চার লাখ কামাতে পারলেই গ্রামে ফিরে যাব।"

"বিল্লুপ্রসাদজী যেতে দেবেন তোমাকে?"

"না চটিয়ে বুদ্ধি করে পালাতে হবে।"

কথা বলতে বলতেই চা তৈরি হয়ে গেল। কী সুন্দর চা। দু'এক চুমুক দিতেই ভরে গেল মন।

গোরা বলল, "এখন তো এখানে লোকজন কেউ থাকে না। এই সবের ব্যবস্থা করলে কী করে?"

"কাল এসে আমরাই তো সব করে গেছি। তাছাড়া কিছু কিছু মালপত্তর দেওয়া নেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে আমাদের কাউকে না কাউকে আসতেই হয় এখানে। এই লেনদেনগুলো বাড়িতে বসে হবার নয়। লোক্যাল পুলিশ কোনও গণ্ডগোল না করলেও ভিজিলেন্সের লোকেদের কিন্তু কড়া নজর আছে এইদিকে।"

গোরা হেসে বলল, "কচু আছে। এতদিন ধরে এই ঘরের মধ্যে এত কাণ্ড হচ্ছে তা হলে কবেই ধরা পড়তে মাল সমেত।"

বাদল বলল, "অত সস্তা নয় রে ভাই। প্রথমত বহিরাগতদের পথ চিনে এখানে আসা ম্ভব নয়। বিশেষ করে এটি একটি যথার্থই গোপন ঘাঁটি। আর দলবদ্ধ হয়ে আসতে গেলে য ওরা সতর্ক হয়ে যেত, নয়তো রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ লেগে যেত ওদের সঙ্গে। সব বাধা তিক্রম করে ওরা এখানে হাজির হলেও চোরাই মালের সহসা কোনও হদিশ পেত না। ই যেখানে বসে আমরা কথা বলছি এর নীচেই একটি চোরকুঠরি আছে। চোরাই মাল রাখা য সেখানে। ওই চোরকুঠরির সঙ্গে আবার একটি সুড়ঙ্গ পথের যোগাযোগ আছে। য়োজনে আবার ওই পথে গিয়ে জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের মধ্যে পাতা চাপা দিয়ে লুকিয়ে ফলা হয় মালগুলো।" বলে চোরকুঠরিতে নামিয়ে সুড়ঙ্গ পথটাও গোরাকে দেখিয়ে দিল

বাদল।

বাদল আগের দিন এসে কিছু ডিম রেখে গিয়েছিল। তারই ওমলেট বানিয়ে চালে ডালে খিচুড়ি তৈরি করে ফেলল অভ্যস্ত হাতে।

রান্নার ব্যাপারে গোরাও তো অপটু নয়। তাই ও-ও অনেক ব্যাপারে সাহায্য করল বাদলকে।

দুপুরে স্নান খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিতে না নিতেই বাইরে ট্রাকের হর্ন শোনা গেল।

বাদল বলল, "আর দেরি নয়, মোহন সিং এসে গেছে। আমি যাই? তুই কিন্তু সাবধানে থাকিস।"

গোরা হাসিমুখে বিদায় জানাল বাদলকে। মোহন সিং-এর ট্রাক জঙ্গলের গভীরে মিলিয়ে গেল।

আট

এই বিশাল বিন্ধ্যারণ্যে গোরা এখন একা। চারদিকে সুন্দর প্রকৃতির মাঝে এমন একটা লোভনীয় আশ্রয়ের কথা ভাবাই যায় না। এখানে বেশ কিছুদিন ও যদি নিজেকে টিকিয়ে নিতে পারে তা হলে এখানকার মানুষজন, পশুপক্ষী সবার সঙ্গেই মিতালি পাতিয়ে নেবে ও। চাই কি ভালুকা তালুকেও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে ঢুকে পড়বে সাহস করে।

আশ্রয়স্থলটি মন্দ নয়। ছোট একটি রঙিন পাথরের টিলা পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি বড় বড় গাছের গুঁড়িকে অবলম্বন করে বেশ বড় সড় একখানি বাংলোর মতো ঘর তৈরি হয়েছে। ছোট্ট একটি বাথরুম আর রান্নার জায়গাও করা হয়েছে একপাশে। ঘরটি একটু উচ্চস্থানে। বাইরে থেকে এটিকে দেখলে একতলা মনে হলেও আসলে এটি দোতলা। নীচের ঘরে কোনও জানলা দরজার ব্যবস্থা নেই। ওপর থেকে দড়ির মই বেয়ে নীচে নামতে হয়। নীচের ঘরের ভেতর দিয়েই একটি সুড়ঙ্গ। আসলে সেটি একটি গুহামুখ। সেই সুড়ঙ্গপথ প্রকৃতিরই অবদান। এবং তার শেষ আরও গভীর জঙ্গলের দিকে। সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে একটি কাঠের আগল এমনভাবে দেওয়া আছে যাতে বাইরের কেউ চট করে ঢুকে পড়তে না পারে বা কোনও হিংস্র জন্তুর প্রবেশ না ঘটে। ঘর থেকে বেরোলেই দালানের মতো একটু অংশ। সেটি তারের জাল দিয়ে ঘেরা। বসবার জন্য কয়েকটি চেয়ার ও একটা টেবিলও আছে। আর আছে একটি বেঞ্চ। বাংলোর চৌহদ্দিটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে এমনভাবে ঘেরা যে সেটাকে টপকে কোনও জন্তু জানোয়ারের ভেতরে প্রবেশ করা অসম্ভব।

ওরা চলে যাবার পর গোরা বেশ কিছুক্ষণ দালানের মধ্যে পায়চারি করে উঠোনে নামল। এখানে যত সব বুনো কাঁটাগাছে ভর্তি। ও ঠিক করল দু'একদিন পরে জায়গাটার সঙ্গে একটু পরিচিত হয়ে আশপাশের কোনও গ্রাম থেকে কিছু ফুলগাছের চারা নিয়ে এসে লাগাবে এখানে। ও তো চিরকাল এখানে থাকবে না। কখনও না। কোনও মতেই না। তবু যে কদিনের জন্য আছে সেই কদিনের মধ্যেই নিজের রুচি অনুযায়ী ভোল পাল্টে দিয়ে যাবে জায়গাটার।

এমন মধুময় পরিবেশে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর থাকলেও এ জায়গা পুরনো হবার নয়। কিন্তু ওর নিজের কথা ভেবে, ভবিষ্যৎ চিন্তা করে

লে যেতেই হবে ওকে। তবে কিনা চলে গেলেও প্রকৃতির ডাকে বারবারই ও ছুটে আসবে খানে। বিল্লুপ্রসাদজীর সঙ্গেও কোনও সংঘর্ষে যাবে না ও। হয়তো এর ফলে সদাশিববাবুর ীবনও বিপন্ন হবে। তাই কী দরকার ওই অশুভশক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবার? বং যে কদিন ও এখানে আছে বা থাকবে, তারই মধ্যে এই বনখণ্ডীর গভীরে সেই ালোরাতের রহস্য কীভাবে বিলীন হয়ে আছে সেই চেষ্টাই সে করবে। বন্ধু গৌতম ও াপাকে চিঠি তো দিয়েইছে। স্নেহদিকেও আসতে লিখেছে একটি চিঠিতে। লিখেছে, ্রকবার অন্তত রামায়ণের এই চিত্রকূটে এসো স্নেহদি। মন্দাকিনীর শীতল সলিলে স্নান করে দহকে শুদ্ধ কর। বনবাসকালে এই মন্দাকিনীর জলেই স্নান করেছেন দেবী সীতা। অতএব ্রকবার এসো তুমি। কামতাগিরিকে প্রদক্ষিণ কর। দেখবে জীবন কেমন ধন্য হয়ে যাবে।"

হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝাঁক পাখি কলকলিয়ে উড়ে গেল ওর মাথার ওপর দিয়ে।

গোরার মনটা উদাস হয়ে গেল। হবে নাই বা কেন? যা দারুণ নির্জনতা এখানে। ়েইরকম পরিবেশে দুপুর বিকেলে এক ঝাঁক পাখির কলতানে মন তো উদাস হবেই।

ও ধীরে ধীরে মনের মধ্যে অল্প একটু সাহস সঞ্চয় করে বাংলোর বাইরে এসে এক া এক পা করে টিলার মাথায় উঠে এল। একেবারে মাথার ওপরে আছে বিশাল কলেবরের ্রকটি বহেড়া গাছ। তার আশপাশে আছে আমলকি, কেঁদ, হরিতকি, মহুয়া ও পলাশের বন। ্র সব কটি গাছই ও চেনে। এইখানে এসে এই ভয়ঙ্কর নির্জনে সুন্দরের প্রকাশ দেখে ও ়ভিভূত হয়ে গেল। হঠাৎ কিছু দূরের একটু ঢালু ভূমিতে যা ও দেখতে পেল তাতে আর িজেকে স্থির রাখতে পারল না ও। দেখল সে এক মহারণ্য। সেই অরণ্যে পলাশ ছাড়া আর কানও গাছ নেই। দিগন্তবিস্তৃত রক্তপলাশের সেই বনের দিকে তাকালে মনে হয় বনে বুঝি ়াগুন লেগেছে।

এখন ফাল্গুন মাস। তাই বুঝি ফাগুনে আগুন। কী সুন্দর সেই উপত্যকা। গোরার মনে লে এখনই ছুটে গিয়ে হারিয়ে যায় ওই গভীর বনের অন্তরালে। কিন্তু সাহস হল না। টিলার ওপরে উঠে একটি শিলাখণ্ডে বসে সেই দাবানলসম বনানীর দিকে তাকিয়ে রইল একভাবে।

বহুদূরে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই মন্দাকিনী। চিত্রকূট থেকে ও কতদূরে কোথায় আছে তা ও জানে না। শুধু জানে কখনও পালিয়ে যাবার মন হলে ওই নদীর তিপথ ধরেই ও পালিয়ে যাবে। কিন্তু ভালুকা তালুক? সেখানে প্রবেশাধিকার ও পাবে কি? দিলদা বার বার মানা করে গেছে ভুলেও ওদিকে না যেতে।

গোরা যখন আপন খেয়ালে প্রকৃতির রূপে রসে গন্ধে বিভোর হয়ে আছে ঠিক খনই ও শুনতে পেল কে যেন পেছন থেকে ডাকল ওকে, "এই।"

চমকের ঘোর কাটিয়ে গোরা পেছনদিকে তাকিয়ে দেখল দুটি বন্য মেয়ে অসীম কৌতূহলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের একজন যেমনই ফর্সা, মলিন বেশবাস। পরজন তেমনই কালো, বন্য বেশভূষা। দুজনেরই বয়স চোদ্দ পনেরোর মধ্যে। বন্য কালো মেয়েটির হাতে তীর ধনুক। আর ফর্সা মলিন পোশাকের মেয়েটির হাতে একটি জলের লসী।

গোরা হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল মেয়ে দুটিকে।

ওরা হরিণীর মতো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে এসে ওর সামনে কটু দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটু মুড়ে বসল।

গোরা বলল, "তোমরা এখানে কোত্থেকে এলে?"

ফর্সা মেয়েটি বলল, "আমরা ঝরনার জল নিতে এসেছি।"

"তাই বুঝি? কোথায় থাকো তোমরা?"

ফর্সা মেয়েটি বলল, "আংটিনাড়ায়।"

কালো মেয়ে বলল, "বনখণ্ডী।"

"বনখণ্ডী তো এখানে সবটাই।"

মেয়েটি তখন যেদিকে দেখাল সেদিকে তাকিয়েই শিউরে উঠল গোরা। বলল, "ও তো ভালুকা তালুক।"

"আমি সব ওইখানেই থাকে। লেকিন তুমি ওইখানে কখনও যাবে না। যানে সে মর যাওগে।"

কথা শুনে গোরা বুঝল মেয়েটি ভাল বাংলা বলতে পারে না। কিন্তু অন্য মেয়েটি পারে।

ও তাকেই প্রশ্ন করল, "এই প্রদেশের মেয়ে হয়ে তুমি এত ভাল বাংলা কী করে বলছ?"

মেয়েটি হাসি হাসি মুখ করে বলল, "আমি একজন মৈথিলি ব্রাহ্মণের মেয়ে। আমি বাংলা ভাল বলতে পারি।"

"কী নাম তোমার?"

"আমার নাম হাসি। আর আমার এই বন্ধুটি হল নিষাদকন্যা। ওর নাম শিলি। বড় ভাল মেয়ে। ভাল তীরন্দাজ। ওর কাছ থেকে আমি তীর নিক্ষেপ শিখেছি।"

"তা এই আসন্ন সন্ধ্যায় তোমরা যে এসেছ দুজনে তোমাদের বাড়ি ফিরে যাবার সময় ভয় করবে না?"

ওরা দুজনেই ঘাড় নাড়ল।

হাসি বলল, "আমরা বনখণ্ডীর মেয়ে। বনে আমাদের ভয় কী? আর আমার বন্ধু শিলি, ওর বাড়ি ভালুকা তালুক। ওর হাতে তীর কাঁড় দেখলে বাঘ ভালুক কিছুই ওর দিকে এগোয় না।"

গোরা বলল, "ভালুকা তালুক! নামটা শুনলেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে ওঠে।"

শিলি ওর ভাষা বুঝল। তাই দু'হাত নেড়ে বলল, "নেহি নেহি। ডরো মৎ।"

হাসি বলল, "ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। এককালে ভালুকা তালুক ছিল ভালুকের রাজত্ব। এখন অনেক কমে গেছে। একটু দূরের দিকে আপারকোটে আশ্রয় নিয়েছে ওরা তবু আছে। আছে কেন রোজই আসে। ওই ভালুকা তালুক এই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে লোভনীয় ও সুন্দর জায়গা। ওখানকার মানুষজনদের মধ্যে কতকগুলো নিয়ম আছে। সে নিয়মের ব্যতিক্রম হলে ওরা কাউকেই ক্ষমা করে না। তাই অনধিকার প্রবেশকারীর একমাত্র শাস্তি ওখানে মৃত্যুদণ্ড। তবে আমরা তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে নির্ভয়ে যেতে পাব তুমি কিন্তু একা গেলেই বিপদ।"

গোরা বলল, "তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভালই হল। আমি তো এখন একা এক থাকব এখানে। খুব খারাপ লাগবে আমার। তোমরা এলে একটু সাহস পাব মনের মধ্যে

কথা বলে সময় কাটবে।"

হাসি বলল, "আমরা তো রোজ আসি। বনে বনে ঘুরে বেড়াই। তবে কিনা ভয়ে ভয়ে আসি। লুকিয়ে থাকি অনেক সময়।"

"কিসের ভয় তোমাদের?"

"মানুষের।"

"মানুষকে তোমরা ভয় পাও?"

"সবাই ভয় পায়। তুমি ভয় পাও না? পাবে কী করে? মানুষের নিষ্ঠুরতা তো দেখ নি কখনও। আমি দেখেছি। আমার মাকে মরতে দেখেছি। আমার বাবাকে জীবন্ত কবরে যেতে দেখেছি। উঃ সে কী ভয়ানক নিষ্ঠুরতা।"

গোরার চোখদুটো ছলছলিয়ে উঠল এবার। বলল, "তুমি কি বসন্ত ঠাকুরের মেয়ে?"

হাসির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল, "আমার বাবার নাম তুমি কী করে জানলে?"

"এদেরই একজনের মুখে শুনেছি।"

শিলি একটু দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওই—ওইখানে, উধারবালা জমিন পর ঠাকুর কো গোর দিয়া ও্লোগ। বহুৎ বদমাশ।"

গোরা বলল, "অধিকাংশ মানুষই বদ। কিন্তু আমিও তো সেই মানুষ। তাব ওপরে তোমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবুও আমার কাছে তোমরা এলে কীভাবে? তোমাদের ভয় করল না?"

"না। তুমি খুব ভাল।"

"কী করে ভাল হই আমি? আমি তো এদেরই একজন।"

হাসি বলল, "না। তুমি এদের মতো নও। তুমি তো কাজ কাম করতে এসেছ। আমার বাবাও তো টাকার জন্যই বনখণ্ডীতে এসেছিলেন জঙ্গল মহলে। আমার বাবা তো খারাপ ছিলেন না।"

"তবুও আমি আমিই।"

"তুমি আমার দেবতা। বনদেবতা তুমি। রোজ সকালে এসে তোমার পায়ে ফুল দিয়ে তোমার পুজো করব আমি। আমার অন্তরের কান্না শুনে তুমি এসেছ। আমার চোখের জলে তোমার আবির্ভাব। তোমার জন্যে আমার জীবন দিয়ে দেব আমি। এখন আমি তৈরি। আমার একপাশে আছে শিলি, অন্যদিকে তুমি। প্রতিশোধ নেওয়ার এমন শুভ মুহূর্ত আর হবে না। শুধু এই ব্যাপারে তোমার একটু সাহায্য আমি চাই।"

বিস্মিত অভিভূত গোরা বলল, "আমি কী এমন করলাম যে প্রথম দর্শনেই তুমি আমাকে দেবতার আসনে বসিয়ে দিলে?"

"তুমি যে আমার মনের আগুনে ঘি দিয়েছ।"

"আগুন তো তাতে আরও জ্বলবে।"

"জ্বলছে। লকলকে অগ্নিশিখায় উল্লাসে নৃত্য করছি আমি। কী আনন্দ! কী দারুণ আনন্দময় তুমি, তা তোমাকে কী করে বোঝাব?"

"তোমার এইসব কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু যদি পরিষ্কার করে ল, তা হলে আমার পক্ষে বোঝার সুবিধে হয়।"

"বিল্লুপ্রসাদের জন্যে আমার মা মরেছে। বিল্লুপ্রসাদ আমার বাবাকে সমাধি দিয়েছে। তারই লোক বীরু আমার চুলের মুঠি ধরে আমাকে গহেরা খাদে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। সেই বীরুকে আজ তুমি যেভাবে মেরেছ তা আমরা অনেক দূর থেকেই লক্ষ করেছি। তাই তো তোমাকেই আমি দেবতা বলে মানছি। তোমার মধ্যে বারুদ আছে। সেই বারুদে এবার আমি আগুন ধরাব। আমি এখনও ভেবে পাচ্ছি না ওই ভয়ঙ্কর বীরুকে একা তুমি ওইভাবে পেটালে কী করে?"

"আমার মাথায় রাগ চড়ে গিয়েছিল তখন।"

"তুমি কি এখানে আসার আগে কামতানাথ প্রদক্ষিণ করেছ?"

"হ্যাঁ করেছি।"

"সেইজন্যেই তোমার পক্ষে ওইরকম সম্ভব হয়েছে। এখন আমি তোমাদের দুজনের সাহায্য নিয়ে ওদের সবাইকে, বিশেষ করে ওই বিল্লুপ্রসাদকে হত্যা করতে চাই।"

"এই গভীর অরণ্যে সে কাজ তুমি কারও সাহায্য না নিয়েই করতে পার।"

"আমি পারি না। বিল্লুপ্রসাদ একা আসে না। সঙ্গে ওর লোকজন থাকে। তাদের হাতে বন্দুক রিভলভার থাকে। তাও সে আসে রাতের আঁধারে। চতুর বেড়ালের মতো কখন কীভাবে আসে তা কেউ জানে না। একটু ধৈর্য ধরে বুদ্ধি করে আমাকে শুধু ওর আসার সময়ের সুযোগ করে দিতে হবে।"

"তখন তোমাকে কোথায় পাব?"

"ওইসবের আলোচনার আজ আর সময় নেই। বেলা পড়ে আসছে। এবার তুমি ঘরে চল। এমন অসময়ে একা তোমার পক্ষে এই জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। কাল সকালেই আমরা আবার আসব। অনেকেই আসবে ইঁদারায় জল নিতে। তখনই কথা হবে। অনেক কথা হবে তোমার সঙ্গে। ওই ওদিকে একটা ঝরনা আছে। ওর জল খুব মিষ্টি। দারুণ হজমি জল। আমি ওখানে জল নিতে যাব। এখন চল আমাদের সঙ্গে ঝরনা দেখতে।"

ওরা টিলার ওপর থেকে নীচে নামতেই শিলি বিদায় নিল। কী সুন্দর কাজলবরণা অরণ্যকন্যা, ধীর লঘুছন্দে ভালুকা তালুকে মিলিয়ে গেল পায়ে পায়ে। যেন এক চঞ্চলা হরিণী।

শিলি মিলিয়ে গেল আর হাসি চলল গোরাকে নিয়ে ছোট্ট একটি পাহাড়ি ঝরনায় কলসী ভরে জল নিতে।

জল ভরা হলে বিদায় নিল হাসি।

গোরা হাসিকে বিদায় দিয়ে ওর আশ্রয়ে ফিরে এল। গভীর বনের বনবাংলো। খুব একটা উন্নতমানের না হলেও বসবাসের যোগ্য। কিন্তু মুহূর্তে এই বনবাংলোয়, সুগভীর নির্জনতায়, শীতল মৃত্যুর মতো হিমশীতল মনে হল পরিবেশটাকে। চারদিকের প্রচণ্ড থমথমে ভাব আর নির্জনতার ভয় ওকে যেন পাগল করে তুলল। এতক্ষণ দিনের আলোয় যা মনে হয়েছিল দারুণ সুন্দর, এখন দিনশেষে তাই মনে হচ্ছে অতি ভয়ঙ্কর।

বাংলোয় ঢুকে গোরা সমস্ত দরজা জানলা যা যা বন্ধ করার সব বন্ধ করে লণ্ঠনের আলো জ্বেলে বসে রইল চুপচাপ। ওর জীবনে অরণ্যগভীরে এই ওর প্রথম রাত।

সে-রাত যে বাংলোর ঘরে কীভাবে কাটল তা গোরাই জানে। সারাটা রাত এই

পদসঙ্কুল অরণ্যে বন্য জন্তুদের ডাকে বুকের ভেতরটা টিপটিপিয়ে উঠছিল, ভূতের ভয়ও
রছিল মাঝে মাঝে। কিন্তু না, এই বাংলোয় ভূত নেই। জঙ্গলে বন্য জন্তুদের অনেকরকম
াক শোনা গেলেও বাঘের ডাক শোনা যায় নি। বাঘ থাকলেও বাংলোর ধারে কাছে
াসেনি অথবা ডাকেনি।

এখন দিনের আলোর আভাস পেয়ে মন যেন ভরে উঠল খুশির জোয়ারে। কাল
ারারাত কিছুই খায় নি সে। লণ্ঠনের আলোটাও অন্ধকারের ভয়ে ইচ্ছে করেই নেভায়নি।
খন আলো নিভিয়ে দরজা খুলে ঘরের বাইরে আসতেই মনের মধ্যে অদম্য উৎসাহ এবং
র্জয় সাহস এসে ভর করল। দু'চোখ ভরে প্রকৃতির কত রূপই না দেখল ও। দেখল,
ভারের আলোয় মিশে বনসবুজে নতুন সূর্যোদয়ের আলো কেমন নানা রঙের বাহার এনে
য়েছে।

ও টুথব্রাশে দাঁত মাজতে মাজতে বাইরে এসেই দেখে ঘরের সামনে একটি
হুযাগাছের নীচে ময়লা একটি চাদর গায়ে দিয়ে চুপচাপ বসে আছে হাসি। ওকে দেখেই
াসিহাসি মুখে বলল, ''কী! ঘুম হল বাবুর? রাতে একা থাকতে ভয় করে নি তো?''

''ভয় করবে কেন? ভয় পাবার হলে কি একা আমি থাকতে রাজি হতাম এখানে?''

''তোমার মতো সাহসী ছেলে আমি কখনও দেখিনি।''

''কিন্তু এত সকালে তুমি এখানে এলে কী করে?''

''আমি তো খুব একটা দূরে থাকি না। ওই ওধারে যে টিলাটা রয়েছে দেখছ, তার
:পারে আংটিনাড়ায় থাকি। তোমার জন্য খুব মন কেমন করছিল তাই তোমার খোঁজ নিতে
লাম। আমার মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই। এর ওর বাড়িতে ফাইফরমাস খেটে যা পাই
াই আর ঘুরে ঘুরে বেড়াই।''

গভীর বেদনায় ভরে উঠল গোরার বুক। বলল, ''তুমি তো জান না হাসি, আমি কত
মসহায়। তোমার মতো আমারও কেউ কোথাও নেই। বাবা মা দুজনেই হঠাৎ করে মারা
গছেন। তাই তো মনের দুঃখে বনে এসেছি।''

''তুমি তা হলে বনেই থাক। ঘরে ফিরো না আর। এই বনের মতো মনের শান্তি
থাও কিন্তু নেই। আমার বন্ধু শিলি, ওরও কেউ নেই। ও জন্মাবার সময় ওর মা মারা
য়ছিল, বাবাও মারা গেছে বছর দুই আগে। এখন গ্রামের লোকরাই দেখাশোনা করে
।''

বিস্মিত অভিভূত গোরা বলল, ''তার মানে 'হাম পঞ্ছি এক ডালকে?' সব পাখিই তা
। একই ডালে এসে বসেছি? এখন বুঝেছি ঈশ্বরের মহিমা। আমাদের সকলের দুর্ভাগ্যের
াদার হবার জন্যই বুঝি একাকার হতে সবাইকে এনে জড়ো করেছেন একই জায়গায়।''

কথা বলতে বলতেই মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেস হয়ে নিল গোরা।

হাসি বলল, ''আমাকে একটা জলের জায়গা দাও। আমি তোমাকে ঝরনার জল এনে
ছ। ওই জল রোজ খাবে তুমি। তা হলে কখনও তোমার কোনও অসুখ করবে না।
নক তাগত বাড়বে।''

গোরা একটা প্লাষ্টিক জাগ এনে হাসিকে দিল। বলল, ''কিন্তু ঝরনার জল তো না
ফয়ে খেতে নেই।''

''সেটা বিশেষ বিশেষ জায়গার। এখানকার নয়। এই জল ছাড়া আমরা খাই-ই না।

অনেকে তোমাদের এই ইঁদারার জল ব্যবহার করে। কিন্তু ওই ঝরনার জলের চেয়ে এই জলে ততো উপকারী নয়।"

অল্প সময়ের মধ্যে হাসি ওকে জাগ ভর্তি জল এনে দিল। সেই জল খালি পেটেই আকণ্ঠ পান করল গোরা। তারপর বলল, "এবার একটু চা যে না খেলেই নয়।"

"চা খাও তুমি?"

"তুমি খাও না?"

"কে দেবে আমায়? দয়া করে দুবেলা দুমুঠো পাত কুড়ুনি খেতে দেয় লোকে এই ঢের। শিলি মাঝে মধ্যে বুনো হাঁস, পাখি এইসব মারলে দুজনে পুড়িয়ে ঝলসে খাই। তখন কিন্তু খুব ভাল লাগে, বাঁচতে ইচ্ছে করে।"

"বেশ এবার থেকে আমিই তোমাকে রোজ চা করে খাওয়াব। একবেলা নয়, দুবেলাই। খুশি তো?"

খুশি মানে? দারুণ খুশি। হাসি আর খুশি যেন একাকার হয়ে গেল। পূর্ণ চাঁদের মতো ওর মুখখানি খুশির জ্যোৎস্নায় ভরে উঠল। বলল, "আমি আরও খুশি হব যদি তুমি আমাকে আরও একটু অধিকার দাও।"

"বলো, কী চাও তুমি?"

"তোমার ওই বাংলোর মধ্যে যা কিছু সবই আমার নিজের হাতে সাজানো। ওখানে কোথায় যে কী আছে তার কোনও কিছুই আমার অজানা নয়। তাই চা তৈরির কাজটা আমাকেই করতে দাও। ওই ঘরের মায়া আমি ছাড়তে পারি না। বাবার মর্মান্তিক মৃত্যুর পর থেকেই তো ওই ঘরের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে।"

গোরা সস্নেহে ডাকল ওকে, "এসো, ভেতরে এসো। তোমার ঘর সংসার তুমি দেখে নাও। আমি যতদিন আছি ততদিন এই ঘর তোমার। তারপরে যা আছে কপালে তাই হবে তবে খুব সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে। জানো তো, এ ঘর আমার হলেও আমার নয়।"

"জানি। বিপদের সম্ভাবনা আমি গন্ধে টের পাই। তেমন বুঝলে আমি ঘরের ভেতর থেকেই বেমালুম উবে যাব।"

"তা হলেই হবে। আমার দিক থেকে যা বলবার আমি তা বলেই দিলাম। আচ্ছা এখানে দোকান বাজার কোথায়?"

"এই বনখণ্ডীতে কোথাও কিছুই নেই। সব ওই চিত্রকূটে। তোমার কাছে যদি টাকা পয়সা কিছু থাকে তো দিও, শিলি মন্দাকিনীর মাঝিদের দিয়ে আনিয়ে নেবে।"

হাসি হাসিমুখেই বাংলোয় ঢুকে চোখের পলকে চারদিক ঝাড়পোছ করে চা তৈরির সরঞ্জাম নিয়ে বসল। তারপর কিছু সময়ের মধ্যেই দু'কাপ চা তৈরি করে গোরাকে দিল, নিজে নিল। শুধু চা নয় বিস্কুটের ব্যবস্থাও করা ছিল এখানে।

চা খেতে খেতে গভীর প্রশান্তিতে ভরে উঠল হাসি।

গোরারও ভাল লাগল খুব। বলল, "ভারি সুন্দর চা-টা করেছ তো। কতদিন খাইনি এমন চা।"

হাসি বলল, "আমিও। অনেকদিনের তৃষ্ণা আজ যেন একই সঙ্গে মিটে গেল। তুমি যতদিন থাকবে এখানে, আমি তোমার সব কিছু করে দেব। শুধু তোমার পাতে যা পড়ে থাকবে তাই থেকেই একটু আধটু ভাগ দিও আমাকে। তা হলেই চলে যাবে আমার।"

গোরা বলল, "তুমি কি আমাকে এমনই অমানুষ ভাব যে আমি খাব পেট ভরে আর , খাবে আমার পাত-কুড়ু নিটা। এখানে যা কিছু তুমি করবে তা দুজনের মতোই কোরো। ।নওরকম লজ্জা সংকোচ না করে নিজের ভেবেই সবকিছু করবে তুমি। না হলে আমি থ পাব।"

হাসি ছলছল চোখে বলল, "লোকের বাড়ি খেয়ে আমার পেট ভরে না। মনও ভরে । খিদের জ্বালায় এঁটোকুঁটো যার কাছে যা পাই তাই খাই। এর আগে কারও এঁটো কখনও ই নি আমি।"

গোরা ওর চিবুক ধরে আদর করে বলল, "এখন থেকে তোমার সব দুঃখের শেষ। র কারও এঁটো খেয়ে থাকতে হবে না। তুমি না আমাকে দেবতার আসনে বসিয়েছ? সেই সনে বসবার আমি কতটা উপযুক্ত তারই প্রমাণ আমি দেব। এখন থেকে তুমি আমার ছেই থাকবে। আমার দেখাশোনা করবে। আমি যখন একেবারেই চলে যাব, তুমিও তখন মারই সঙ্গে চলে যাবে। তোমাকে আর লোকের বাড়ি কাজ করে চেয়ে চিন্তে খেতে হবে । আমার এক স্নেহদি আছেন। নিজের দিদি নন, কিন্তু নিজেরই মতো। উনি তোমায় লে খু-উ-ব খুশি হবেন। তোমার দুঃখ দূর করবার জন্যই ভগবান হয়তো আনিয়েছেন মাকে। এখন থেকেই শুরু হবে তোমার আমার দুঃখজয়ের জয়যাত্রা।"

"তুমি তো কলকাতায় থাক। সে তো শুনেছি মস্ত শহর। সেখানে তুমি আমাকে নিয়ে বে?"

"তবে কি এই বনখণ্ডীতে লোকের পাত কুড়িয়ে খাবার জন্য তোমাকে রেখে যাব?"

"আমাকে তুমি ভুলে যাবে না?"

"আমায় দেখে কি সেইরকম মনে হচ্ছে?"

আশার আলোয় এবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল হাসির মুখ। গোরাও সস্নেহে তাকিয়ে ইল কিশোরী হাসির মুখের দিকে। নিঠুর নিয়তি ওর মতো সুরূপার বুকে কেন যে এমন ঘাঘাত হানলেন তা কে জানে?

চা পর্ব শেষ হলে হাসি বলল, "চল, এই সকালে দিনের আলোয় তোমাকে আমি য়াকানন ঘুরিয়ে আনি।"

"মায়াকানন?"

"হ্যাঁ। স্বপ্নের মতো ঘুমের মায়া জড়িয়ে থাকে যেখানে। মর্তের নন্দনকানন। আমরা লি মায়াকানন। আগে নাকি সোনার হরিণ ঘুরত ওখানে। সোনা মানে অলঙ্কারের সোনা য়, স্বর্ণমৃগ। এখন আর আসে না তারা। শুধু মোহিনীমায়ার রেশটুকু রেখে সবাই তারা রিয়ে গেছে।"

গোরা সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল।

বাইরের ইঁদারায় তখন আংটিনাড়া, রাঙতাখেড়ের গ্রাম্য মেয়ে বউরা জল নিতে সেছে। ওরা গেট খোলা রেখেই শুধুমাত্র ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে মিশে গেল বাইরের গতে।

হাসির নির্দেশে দুজনে কথা বলতে বলতে সেই রঙিন পাথরের টিলাটার ওপর ঠল। তারপর ঘনপত্রে ভরা বিশালায়তন সেই বহেড়াগাছের নীচে একটি শিলার ওপর সল মনের মধ্যে প্রশান্তি নিয়ে।

হাসি বলল, "শিলি এখনই আসবে এখানে। ওর জন্য একটু অপেক্ষা করা যাক, কী বল?"

"অবশ্যই। আমাদের এখন কাজের তাড়াটা কী? শুধুমাত্র খাওয়া আর ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর তো কোনও কাজ নেই।"

"ওর আসবার সময় হয়ে গেছে। রোজ সকালে ছাগল আর ভেড়া নিয়ে ও চরাতে আসে। তারপর সারাদিন বসে বসে ও গল্প করে আমার সঙ্গে। আমি শুধু স্নান খাওয়া সময় একবার গ্রামে যাই। ভোরে উঠে লোকের উঠোন ঝাঁট দিই, গোলা দিই। বেলায় কাপড় কাচি, বাসন মাজি। তাও সবদিন নয়। আমার জন্য সবাই একটু একটু খাবার তুলে রাখে তাতেই চলে যায় আমার।"

গোরা কানে হাতচাপা দিয়ে বলল, "আর বলতে হবে না। তোমার মতো ভদ্রঘরে একটি মেয়ের কপালে এত কষ্টও লিখেছিলেন বিধাতা তা ভাবলেও মন খারাপ হয়ে যায় তোমার অতীত তুমি ভুলে যাও। এখন হাসিমুখে বর্তমানকে মেনে নাও।"

গোরা একটু বসে থাকার পর উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে একসময় সেই জায়গাটার কাছে এসে দাঁড়াল। যেখানে উপত্যকার মতো এক বিস্তীর্ণ ঢালু অংশ জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে সেই আগুনে বন। কী সুন্দর সেই দৃশ্য।

ওকে ওইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে একসময় হাসি এসে দাঁড়াল ওর পাশে। বলল "ওদিকে তাকিয়ে অমন করে কী দেখছ?"

"দেখছি সুন্দরের প্রকাশ। পলাশবন যে এত রমণীয় তা কে জানত? এত দেখেও মন যেন ভরছে না আমার।"

"ওই তো আমাদের নন্দনকানন। যাকে আমরা মায়াকানন বলি। কেউ কেউ বলে কুসুমবনী। ওটা পুষ্পবিহার। রক্তপলাশ ছাড়া আর কোনও গাছ নেই ওখানে। রঙিন পাথরের বুকে লাল পলাশ। ঠিক যেন রঙের আগুন। সামনের ওই লছমনরেখাটা পার হয়েই যেতে হবে ওখানে। ওটাও কিন্তু ভালুকা তালুকের মধ্যে।"

ওরা কতক্ষণ সেদিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল তা কে জানে? একসময় খুক খুক কাশির শব্দে পেছন ফিরে তাকিয়েই দেখল, শিলি। এই সুন্দর সকালে শিলি আজ শুভ্রতার প্রতীক। সে যেন অপরূপা। ওর হাতে তীর ধনুক থাকলেও গলায় দুলছে গাঁদা ফুলের বড় একটি মালা। আর এক হাতে কাঁচা শালপাতায় মোড়া আছে হরেক রকমের পাহাড়ি ফুল।

গোরা মুগ্ধ হয়ে বলল, "সত্যি, কত সুন্দর তোমরা দুজনে। এমন মালা একা তুমি পরবে কেন, আমাদের জন্য আনতে পারতে।"

শিলি খিল খিল করে হেসে উঠল। তারপর ফুলগুলো হাসির হাতে দিতেই ওরা দুজনে ফুল ভাগ করে অঞ্জলি দিল গোরার পায়ে। মালাটা ঝুলিয়ে দিল গাছের ডালে।

গোরা বলল, "এ কি করলে? ফুল কখনও মানুষের পায়ে দেয়? এ ফুল যে দেবতার অর্ঘ্য।"

হাসি ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলল, "সেইজন্যই তোমারই চরণে নিবেদন করলাম। তুমি যে আমাদের বনদেবতা। যে নামই হোক না কেন তোমার, তোমাকে আমরা দেবতা জ্ঞানেই মানব। দেবতা বলেই জানব। দেবতা-দেবতা-দেবতা।"

গোরা বলল, "না না না। তোমরা ভুল করছ। আমি তোমাদেরই মতো অসহায়

কজন। সুখে সুখী, দুঃখে দুখী। আমার নাম গোরা, গোরাচাঁদ। আমাকে তোমরা মানুষ :সেবেই তোমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা কোরো। দেবতা হিসেবে নয়।"

হাসি বলল, "তুমি দেবতাই। আমরা জানি তুমি একদিন আসবে। শিলি আমাকে লেছে তোমারই মতো একজনকে একদিন পথ ভুলে হঠাৎ করেই আসতে হবে এখানে। ামরা অনেকেই তাই তোমারই প্রতীক্ষায় আছি। তুমি কি সেই লোক না হয়ে পার? তামার যে এখানে অনেক কাজ।"

"কী কাজ আমার?"

হাসিতে মুখ ভরিয়ে হাসি বলল, "পাথরের বুকে ফুল ফোটাতে হবে। আকাশগঙ্গার [প্ত ধারাকে বইতে দিতে হবে আগের মতো করেই। আর মহাকালের ললাটলিখন পড়ে াতে হবে তোমাকেই। তা যদি পার, তা হলে তুমিই হবে এই বনখণ্ডীর রাজা। শুধু রাজা য়, রাজাধিরাজ। ভালুকা তালুকও তোমার আধিপত্য মানবে।"

গোরা বলল, "তোমার কথার অর্থ আমি কিছুমাত্র বুঝতে পারছি না। তাছাড়া রাজা য়ে আমি কী করব। আমি তো চিরকাল এখানে থাকব বলে আসিনি।"

"কেউ কি কারও ইচ্ছাধীন? আমাদের দুজনেরই মনে হচ্ছে তুমিই সেই। একমাত্র তামারই মধ্যে আছে সেই শক্তির প্রকাশ।"

হাসির কথাবার্তা ক্রমেই কেমন ঘোরালো হয়ে উঠল। কেমন যেন একটা রহস্যের ়ায়া ওর মধ্যে দেখতে পেল গোরা। তবু একসময় বাস্তবে ফিরে এসে বলল, "আর কেন, শলি তো এসে গেছে। এবার তা হলে রওনা হওয়া যাক?"

শিলি বলল, "চল।"

হাসি বলল, "চল।"

ওরা দুজনে দুদিক থেকে দুটি হাত পরম স্নেহভরে ধরল গোরার। তারপর প্রকৃতির র্রাজ্যে রক্তকুসুমের বনভূমির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

জায়গাটা একটু ঢালুতে নেমে আবার লাল মাটি ও পাথরের দেহ নিয়ে আরও অনেক চুতে উঠে গেছে। মাথার ওপর নীল আকাশ, পায়ের নীচে লাল মাটি আর চারদিকে লাশের আগুন। কী সুন্দর। কী অপরূপ।

খানিক যাওয়ার পর এক জায়গায় এসে ওরা থমকে দাঁড়াল। যে জায়গাটায় ওরা ামে দাঁড়াল সেই জায়গাটা দেখে মনে হল পাহাড়ের দুটো অংশকে এক করবার জন্য কেউ ন টেনে জুড়ে দিয়েছে। ও যেন আশ্চর্য সীমান্তরেখা।

হাসি বলল, "এই হল লছমনরেখা। আদৌ বনবাসকালে লক্ষ্মণ এখানে কোনও রেখা খনও টেনেছিলেন কিনা কেউ জানে না। তবু জায়গাটার এইরকমই এক নাম। আসলে বার মুখে শুনেছি আগে এখানে একটি গহেরা নালা ছিল। এখানে ছিল অতলস্পর্শী এক ণকূপ। অনেক পুণ্যকামী ও সাধুসন্তরা মোক্ষলাভের আশায় এখানে নাকি ঝাঁপ দিয়ে ত্মহত্যা করতেন। কেউ কেউ একে ভৈরবঝম্পও বলত। তারপর হঠাৎ একদিন কীভাবে ন আপনা থেকেই জুড়ে গেল জায়গাটা। দুই পাহাড়ের মাঝের অংশ এক হয়ে গেল। ্ত হয়ে গেলেও অমঙ্গলের আশঙ্কায় এদিক থেকে ওদিকে বড় একটা কেউ যায় না। আর রই বা কে? ওই নন্দনকানন একসময় মায়াকানন হয়ে গেল। স্বর্ণমৃগরা কোথায় লুকলো জানে? তবুও ফাগুনে যখন আগুন লাগে বনে, মন তখন উচাটন হয়।"

হাসি এক নিঃশ্বাসে ওর কথাগুলো বলে গেল।

গোরাও শুনল সব মন দিয়ে। আর কত কী ভাবতে লাগল।

একসময় লছমনরেখা পার হয়ে সেই অগ্নিবনে এসে পৌঁছে গেল ওরা। যতদূর চোখ যায় শুধু পলাশের আগুন। লালে লাল চারদিকে।

ওরা পরস্পরের হাত ধরে সেই বনভূমি পার হয়ে অনেকদূরে চলে এল।

একসময় চোখে পড়ল অনতিদূরে সুগভীর জঙ্গল ও নিকষকালো পাহাড়ের সারি। তারই মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে দুরন্ত এক নদী।

গোরা বলল, "নিশ্চয়ই মন্দাকিনী।"

"হ্যাঁ। আর এই যে ওপারের পাহাড়গুলো দেখছ ওগুলো বিন্ধ্যাচলের শাখা প্রশাখা।"

শিলি অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাল, "উ দেখো কামতাগিরি।"

গোরা সবিস্ময়ে বলল, "কামতাগিরি!"

হাসি বলল, "কেন চিনতে পারছ না? কামতানাথ। আর ওই সবই তো চিত্রকূট পর্বতমালা। ওই—ওই যে দুটো গুহা দেখতে পাচ্ছ ওই দুটোর একটাতে বাস করতেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। আর তার পাশের গুহাটার ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে গুপ্ত গোদাবরী। আরও ওধারে আছে এক স্বচ্ছ স্ফটিকশিলা। ওর পেছনদিকে অনসূয়ার আশ্রম। যা এখান থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ওখানে যেতে গেলে অবশ্য দুরন্ত মন্দাকিনীকে পার হতেই হবে। দু'একদিন থাক, তারপরে একদিন সবই দেখিয়ে দেব তোমাকে।"

গোরা বলল, "বুঝেছি। কিন্তু এই ভালুকা তালুকে লোকের বাস কই?"

শিলি বলল, 'ইধার কুছ ভি নেহি। ইয়ে দেবভূমি।"

হাসি বলল, "এই দেবভূমি পার হলে আরও একটি উচ্চভূমি পড়বে। সেই উচ্চভূমিকে বলা হয় আপারকোট। সেখানে একটি ছোট পাহাড়ের ওপর মহাকাল আছেন। সেই মহাকালের কপালে এমন কিছু লেখা আছে যা কেউ পড়ে বুঝে উঠতে পারে না। সকলের ধারণা এই পবিত্র দেবভূমিকে ধ্বংসের দেবতার গ্রাস থেকে রক্ষা করবার মন্ত্রই বুঝি লেখা আছে তাতে। সেই লেখা পড়বার জন্য একদিন হঠাৎ করেই কেউ না কেউ এসে পড়বে এখানে। আর ওই পাহাড়ের একটি ফাটল থেকে আকাশগঙ্গা নেমে এসে ঝরে পড়ত মহাকালের মাথায়, সেই ঝোরাও আজ বন্ধ হয়ে গেছে কয়েক বছর। ওই মন্ত্রের পাঠোদ্ধার না হলে ওই আকাশগঙ্গাও হয়তো আর ঝরে পড়বে না। তাই একাজ তোমাকেই করতে হবে দেবতা।"

গোরা বলল, "অসম্ভব। এ কাজ কখনও-ই আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

হাসি বলল, "তোমার দ্বারাই সম্ভব। একমাত্র তুমিই পারবে এ কাজ করতে। আর কেউ নয়। আমার বাবাও সেই একই কথা বলে গেছেন। একদিন না একদিন, কাউকে না কাউকে আসতেই হবে এখানে। আকাশগঙ্গা ঝরে পড়লেই ভালুকা তালুক আবার সজীব হয়ে উঠবে।"

গোরা বলল, "অনেক বেলা হয়ে গেছে। চল এখন ঘরে ফেরা যাক। পরে একসময় ভেবেচিন্তে দেখা যাবে কীভাবে কী করা যায়।"

ওরা অগ্নিবন থেকে ফিরে আবার সেই টিলার মাথায় এসে দাঁড়াল। এই পাহাড়ের অপরপ্রান্তের ডাল বেয়ে যে অস্পষ্ট গ্রামের রেখা দেখা যাচ্ছে সেইটাই হল খাস ভালুকা তালুক। সেখানে শান্ত নির্জনে শিলিরা থাকে অরণ্যের গভীর গোপনে।

বাংলোয় ফিরে আসতে অনেকটা বেলা হয়ে গেল। তা হোক, তবু এই অল্পসময়ের মধ্যেই যেটুকু অভিজ্ঞতা ওর হল তা বড় কম নয়। তবে আপাতদৃষ্টিতে ওর সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে ও বুঝে নিয়েছে ওই লছমনরেখাকে কেন্দ্র করে লুকিয়ে আছে এই বনখণ্ডীর জটিল রহস্য।

হাসি বলল, "তোমার এখানে রান্নার ব্যবস্থা সবই আছে দেখছি। আমি ততক্ষণ কাজে লেগে পড়ি। তুমি বরং স্নানটা করে আসতে পার। আমার ভোরে স্নান করা অভ্যাস। তবে আজ তোমার কাছে আসব বলে স্নানের সময় করে নিতে পারি নি। এর জন্য অবশ্য আমার কোনও অসুবিধে হবে না। তুমি যাও। ওই ঝরনার জলে বেশ করে স্নান করে এসো। দেহমন সুস্থ হয়ে উঠবে এখনই।"

গোরা তাই করল। এই সময় ওর আর এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু পরের মেয়েকে দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে লাভ নেই। ও স্নানের সরঞ্জাম নিয়ে জঙ্গল পাহাড় ভেদ করে কাছেই একটি ক্ষীণধারা ঝরনার কাছে এসে হাজির হল। কাল বিকেলে হাসির সঙ্গে এসে চিনে গেছে জায়গাটা।

এইখানে এসে একটি শিলাখণ্ডে বসে অনেক কিছুরই চিন্তা ভাবনা করতে লাগল ও।

প্রথম দুর্ভাবনা যেটা হল, সেটা হাসিকে নিয়ে। ওই অসহায় মেয়েটি এখন ওকে অবলম্বন করেই বেঁচে থাকতে চায়। এই ব্যাপারে ওকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। এই অরণ্যভূমের গ্রামবাসীরা ওকে ভালভাবে বেঁচে থাকবার সুযোগ দেবেই বা কী করে? ওরা নিজেরাই হয়তো দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খেতে পায় না। কাজেই পাতকুড়নো অবশিষ্টটুকু ছাড়া কীই-বা জুটতে পারে ওর বরাতে? অথচ একবস্ত্রের এই মেয়েটিকে ওর এখানে পাকাপাকিভাবে রাখারও অসুবিধে অনেক। কাল রাতে বিল্লুপ্রসাদের কুটুমরা কেউ আসেনি ঠিক, কিন্তু আজও যে আসবে না তাই বা কে বলতে পারে? অতএব রাতে এখানে কোনওমতেই ওকে আশ্রয় দেওয়া নয়। আবার দিনমানেও কেউ যদি হঠাৎ করে এসে পড়ে তা হলেও তো রক্ষে নেই। কী জবাবদিহি করবে ও? যদিও হাসি নিজেই বলেছে বিপদের গন্ধ ও বাতাসে টের পায়, তবুও ছেলেমানুষ তো।

এই হল প্রথম চিন্তা। পরের চিন্তা হল যে কাজের জন্য অসীম আগ্রহ নিয়ে ও এসেছে এখানে সেই কাজের ব্যাপারে। অর্থাৎ কী ধরণের জিনিসপত্তরের আদান প্রদান হয় এখানে সেটা দেখার এবং সে রাতের সেই দুর্ঘটনার কেন্দ্রস্থলটিকে খুঁজে বের করার। আজ এতদিন পরেও যে রহস্যের কোনও সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে পারলেন না কেউ তারই ব্যাপারে একটু পরিশ্রম করার।

এরপরে আছে, বিল্লুপ্রসাদের সঙ্গে ওর কোনও খারাপ সম্পর্ক না থাকলেও হাসির মন রাখতে যথাযথভাবে ওকে সাহায্য করার। ওই বিল্লুপ্রসাদের মতো শয়তানের আর যাই হোক পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার কোনও অধিকার নেই।

তারও পরে আছে, হাসি, নিষাদকন্যা শিলি ও অন্যান্যদের একটি ভ্রান্ত ধারণা ওই মহাকালের ললাট লিখনের পাঠোদ্ধার নিয়ে। শিলি আর হাসি কী করে ধারণা করে যা কেউ পারেনি তা ও পারবে বলে? শুকিয়ে যাওয়া আকাশগঙ্গার ধারাকে নতুন করে প্রবাহিত করা কি ওর পক্ষে সম্ভব? ও কী জাদু জানে? আর নীরস পাথরের বুকে ফুল ফোটানো?

অসম্ভব। ওদের অন্ধসংস্কারে আলো দেখাতে গিয়ে নিজেকেই না ও বিপন্ন করে বসে।

এইসব ভাবতে ভাবতে কতক্ষণ যে তন্ময় হয়ে বসেছিল ও তা কে জানে? হঠাৎ একদল বুনো টিয়া এসে ওকে ঘিরে ট্যাঁ ট্যাঁ করতেই সম্বিত ফিরে পেল ও। আর তখনই ঝরনার স্বচ্ছ জলে স্নান করে তাপিত অঙ্গ শীতল করল। তারপর যখন বাংলোয় ফিরে এল তখন দেখল বাংলোর সামনে সেই মহুয়াতলায় হাসি আর শিলি গল্প করতে করতে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

গোরা এসেই বলল, "কী ব্যাপার! শিলি তুমি?"

হাসি বলল, "জানো, মেয়েটা কত ভাল? দেবতার জন্য ও কত মাছ ধরে এনেছে। ও অবশ্য ধরেনি। রামেরাম মাঝির ছেলের কাছ থেকে চেয়ে এনেছে। রামেরাম মাঝির ছেলে লাখন ওকে খুব ভালবাসে। ছোটবোনের মতো দেখে। কত কী খেতে দেয়। আমার মতো দুঃখী নয় ও। ওকেও আজ আমি আমাদের এখানে খেতে বলেছি। তোমার আপত্তি নেই তো?"

"আপত্তি থাকবে কেন? যা রান্না হবে তা রোজই আমরা তিনজনে ভাগ করে খাব।"

"ও আরও কি বলেছে জানো?"

"কী বলেছে? কাল ও উপরকোটের জঙ্গলে গিয়ে পাখি শিকার করে আনবে। নয়তো বুনো মুরগী ধরবে। ওর শিকারের যা হাত তাতে...।"

হঠাৎ একটা গাড়ি আসার ঘর্ ঘর্ শব্দ কানে আসতেই চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল দুজনে।

গোরা কান খাড়া করে বুঝল গাড়িটা বাংলোর দিকেই আসছে। ও একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই দেখতে পেল একরাশ ধুলো উড়িয়ে একটি জিপ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে এইদিকে।

একটু পরেই জিপটা এসে ব্রেক কষল ওর সামনে। আর জিপের ভেতর থেকে হাসিমুখে নেমে এল বাদলদা। নেমেই ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কিরে! কোনও অসুবিধে হয়নি তো কাল? একা থাকতে ভয় করেনি?"

গোরা বলল, "সেরকম হলে কি আজ সকালে তুমি আমাকে দেখতে পেতে?"

"তা অবশ্য ঠিক। তবে ওই বীরুটাকে ঘাঁটিয়ে দিয়ে তুই কিন্তু খুব একটা ভাল কাজ করলি না। কাল থেকে ও অনেক উল্টোপাল্টা বোঝাচ্ছে বিল্লুপ্রসাদকে।"

গোরা বলল, "বয়েই গেল। এটা কি একটা চাকরি। না হয় ছেড়েই দেব।"

"সে যা হয় হবেখন। আজ রাতে কেউ একজন আসবে এখানে। কিছু দিলে নিয়ে রাখিস। একটু সজাগ থাকিস আজ। ঘরে টর্চ ব্যাটারি সবই আছে। আলো না জ্বেলে বাইরে বেরোবি না। আমি কাল সকালে আবার আসব।"

"তুমি কি এখনই চলে যাবে?"

"হাঁ, আমার তাড়া আছে। একজন ব্যাপারীকে জঙ্গলের ভেতরে রেখে এসেছি গাছের দরদাম হিসেবের জন্যে। দামে পোষালে কাল থেকেই শুরু হবে আবার নতুন করে গাছ কাটা। যাই হোক, এরপরে বীরু আবার এলে আর ওকে চটাবি না। একটু ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলবি কেমন?" বলে গাড়ির ভেতর থেকে একটা খাবারের প্যাকেট বের করে বলল, "এতে কতকগুলো খাস্তার কচুরি, গজা আর প্যাঁড়া আছে। একটা দুটো করে রেখে ঢেকে

খেয়ে নিস। একসঙ্গে বেশি খাস না। অভ্যেস তো নেই, হয়তো পেট ছেড়ে দেবে।"

গোরা প্যাকেটটা হাতে নিয়ে একটু পিছিয়ে আসতেই বাদলদা গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলল, "স্টার্ট দিজিয়ে।"

ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

গাড়িটা বনান্তরালে হারিয়ে যেতেই হাসি আর শিলির কচি কচি মুখ দুটি বেরিয়ে এল ঝোপঝাড়ের ফাঁক থেকে।

গোরা হাতছানি দিয়ে ডাকতেই ভয়ে ভয়ে ঘরে এল ওরা।

এইবার ওদের তিনজনের মাঝখানে হঠাৎ করে আবির্ভাব হল আরও একজনের। ইয়া মোটা পাঁশুটে রঙের তাগড়াই একটা কেঁদো কুকুর। সে এসে বাইরের দরজার কাছে বসে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওদের দিকে।

গোরা বুঝল এই বনবাসে ওই কুকুরই হচ্ছে ওর প্রকৃত বন্ধু। ওকে কোনওরকমে হাত করতে পারলে ও এখানে সম্পূর্ণ নির্ভয়। ও তাই নিজেদের ভাগের খাবার থেকে কিছুটা
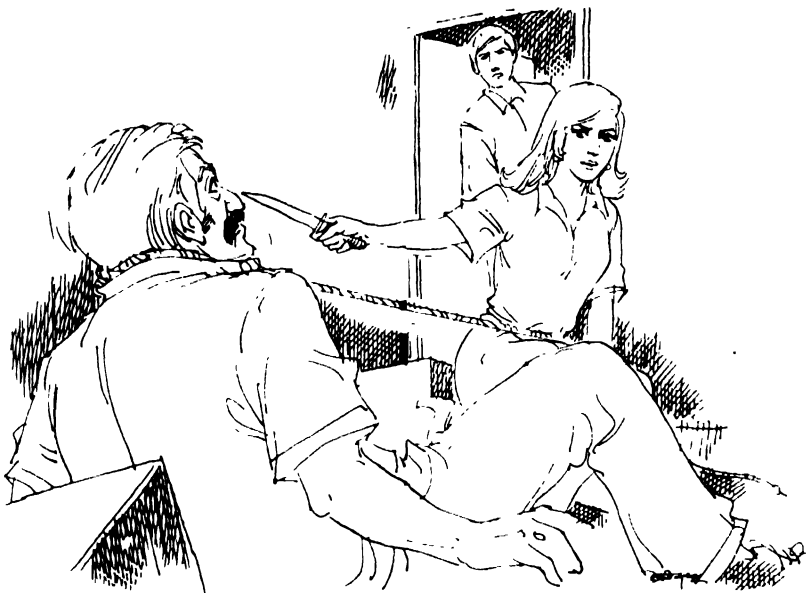
নিয়ে এসে খেতে দিল কুকুরটাকে। তারপর একসঙ্গে তিনজনে বসে পেট ভরে ভাত ডাল ডিমের কারি আর শিলির আনা চুনো মাছের ঝাল তৃপ্তি করে খেল।

খাওয়ার পর পূর্ণ বিশ্রাম।

দুপুর একটু গড়িয়ে আসতেই বিদায় নিল শিলি।

গোরা হাসিকে বলল, "তুমি তা হলে কী করবে?"

"আমাকে একবার আংটিনাড়ায় যেতেই হবে। একজনদের জল এনে দিলে দুটো মুড়ি পাব। তারপর রাতে যদি থাকতে দাও তো থাকব এখানে।"

গোরা বলল, "তুমি থাকলে আমি অবশ্য মনে একটু বল পাব। কিন্তু বিল্লুপ্রসাদের

লোকেরা যদি কোনওরকমে জানতে পারে?"

"ওই ব্যাপারটা আমার ওপরে ছেড়ে দাও। এখানকার সুড়ঙ্গপথ আমার জানা আছে। ঠিক পালিয়ে যেতে পারব আমি। তোমার এখানে থাকার একটাই উদ্দেশ্য আমার, বিল্লুপ্রসাদকে শাস্তি দেওয়ার।"

গোরা হেসে বলল, "বাবা মায়ের হত্যাকারীকে শাস্তি অবশ্যই দেওয়া উচিত। তবে কিনা সেইভাবে তৈরি হতে পারলে তবেই তো? ধরো আজ রাতেই সে যদি হঠাৎ করে এসে পড়ে, তখন? শুধু হাতে লড়বে নাকি ওর সঙ্গে? তুমি নিরস্ত্র ও সশস্ত্র। কোনওরকম বুদ্ধির প্যাঁচ কষেও ওকে পরাস্ত করা যাবে না।"

"আমারও তীর কাঁড় আছে। আমি এখানে আসবার সময় সেটাকে সঙ্গে করেই নিয়ে আসব। শুধু তুমি আমাকে তোমার এখানে থাকবার একটু অনুমতি দাও।"

"যাও তবে। দেরি কোরো না। আমি বাংলোয় না থাকলে জানবে ওই টিলাতে আছি।"

হাসি চলে গেলে ঘরে তালা দিয়ে। গোরা একা একাই সেই রঙ্গিলা টিলায় উঠে দাঁড়াল। হঠাৎই দেখল ওর পিছু নিয়ে দিব্যি লেজ নাড়তে নাড়তে সেই কুকুরটাও কেমন উঠে আসছে।

ও এক জায়গায় বসে খুব আদর করে কুকুরটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই সে একেবারে গড়াগড়ি খেতে লাগল ওর পায়ে। গোরা বুঝতে পারল নিমেষেই পোষ মেনে গেছে এই স্বল্পাহারে তুষ্ট সারমেয়টি। তবু যদি একটু পেট ভরে খেতে পেত বেচারি।

যাই হোক, ও কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়েই ধীরে ধীরে সেই লছমনরেখার দিকে এগোল। তারপর খুব ভালভাবে দাগগুলোকে পরীক্ষা করতে লাগল সে। জায়গাটা একটা ফাটলের মতো, একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায় অংশটি এককালে সত্যিই বিচ্ছিন্ন ছিল। পরবর্তীকালে কোনও প্রাকৃতিক ঘটনায় হঠাৎ করেই জুড়ে গেছে। ও সেই লছমনরেখার পথ ধরেই একটু একটু করে নামতে লাগল নীচের দিকে। এই জায়গাটা মালভূমির মতো অনেকটা ঢালু হয়ে মিশে গেছে সমতলে। এখানটা বৃক্ষবিরল। জুড়ে যাওয়া ওই অংশটুকুর পরেই একটি বড় খাদ। খাদটি কম করেও একশ ফুট গভীর। অর্থাৎ সৃষ্টির শুরু থেকেই জায়গাটা বিভক্ত ছিল। আবার অপর দিকে ভালুকা তালুকের মুখ পর্যন্ত গিয়ে অনুমান করল খাদ সেদিকেও এমনই গভীর। শুধু দুই পাহাড়ের মাঝের অংশটাই অদ্ভুতভাবে জুড়ে গেছে।

গোরা এই লছমনরেখার সামনে দাঁড়িয়ে কত কীই না ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে বেলা গড়িয়ে পড়ল। সন্ধ্যায় রক্তসূর্য মায়াকাননের রক্তপলাশকে আরও রাঙিয়ে দিয়ে দিগন্তে ডুব দিল। আর এখানে থাকা চলে না। গোরা ওর সঙ্গী কুকুরটাকে নতুন নাম দিয়ে আদর করে ডাকল, "ভেলু আয়।" ভেলু নামে ছোটবেলায় ও একটা কুকুর পুষেছিল। তাই সেই নামেই ডাকল। ভেলুও আনুগত্য দেখিয়ে কুঁইকুঁই করে আসতে লাগল ওর পিছু পিছু।

গোরার মন এখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে হাসির জন্যে। মেয়েটা সেই গেল আর তো এল না। বলল, একজনদের জল ভরে দিয়েই চলে আসব। কিন্তু কই? অথচ এখানে আসবার কতই না সাধ ছিল ওর। এই ঘরের মায়া ওকে টানে। এই ঘরের রান্নার জায়গাটিতে ওর মন পড়ে আছে। শোবার জায়গাটি ওর কত নিজস্ব ছিল। কিন্তু হঠাৎ

করেই একদিন সব শেষ হয়ে গেল। ক্ষুধার তাড়নায় ঘরের মায়ায় ও আবার এখানে ফিরে আসতে চায়। আসুক। গোরা যতদিন আছে ততদিন এই বাংলোর জঠরে ওর আশ্রয় বাঁধা। কিন্তু সেই মেয়ের হঠাৎ করে না আসার কারণটা কী?

কারণটা কী তা ও বুঝতে পারল বাংলোয় এসেই। দেখল পাকানো গোঁফের দুজন গুণ্ডাকৃতি লোক অস্থিরভাবে পায়চারি করছে সেখানে। লোক দুজন যে কোনদিক থেকে কীভাবে এল তা কে জানে? একপাশে একটি মোটরবাইক রাখা আছে। কিন্তু এই নির্জনে মোটরবাইকের শব্দ ও শুনতে পেল না কেন? তবে কি ও যখন গহেরা নালা আবিষ্কারে মনোযোগী ছিল তখনই এসেছে ওরা? হবেও বা।

ওদের দুজনেরই চোখ লাল। আর কী ভয়ঙ্কর।

একজন ক্রুদ্ধ গলায় বলল, ''বাংলো কা নয়া চিড়িয়া তুম হো?''

''হ্যাঁ আমি আছি।''

''কাঁহা গয়ে থে?''

''একটু এদিক ওদিক করছিলাম।''

''ফির কভি অ্যায়সা নেহি হোনা চাহিয়ে। ইয়োর ডিউটি টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স। আন্ডারস্ট্যান্ড?''

''হোয়াই নট? মাই ডিশিসন, আই মাস্ট গো এভরিহোয়্যার।''

লোকটি এবার মারমুখি হয়ে এগিয়ে আসতেই গর্জে উঠল ভেলু। এমন একটা হাঁক ছাড়ল যে সভয়ে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হল সে।

অপর লোকটি বলল, ''দিজ বয় ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। বীরু নে ঠিকই বতায়া।''

আগের লোকটি বলল, ''বিল্লুপ্রসাদকা সাথ দুশমনি মাৎ করনা। একদম হাপিস হো যাওগে।''

গোরা বলল, ''এইসব কথাগুলো আমি বিল্লুপ্রসাদজীর মুখেই শুনতে চাই। তোমাদের মুখে নয়। এখানে কী দরকারে এসেছ সেটাই বল।''

লোকটি একটি পার্সেল ওর হাতে জমা দিয়ে বলল, ''ইয়ে চীজ সামালকে রাখনা। বাত এক বাজে কা বাদ যো আদমি আয়েগা উসকো দে দেনা।''

গোরা বলল, ''কী আছে এতে?''

''বদতমিজ কাঁহাকা।''

অপরজন বলল, ''কোয়্যারি মাৎ করো। অর্ডার কি মাফিক কাম করনা হি পড়েগা তুম কো।''

গোরা এবার একটু নরম সুরে বলল, ''হ্যাঁ, এইরকমই কথাবার্তা হয়েছিল বটে আমার সঙ্গে। শর্তটা ভুলেই গিয়েছিলাম।''

''অ্যায়সা ভুল দোবারা নেহি হোনা চাহিয়ে।''

গোরা আর কোনও কথা বলল না। জিনিসটা নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে নিরাপদ স্থানেই রেখে দিল।

ওদের মোটরবাইকও তখন ভুট ভুট শব্দ তুলে মিলিয়ে গেল দূরের দিকে।

আর সেই শব্দের বেশ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোরা শুনতে পেল দরজার কাছ থেকে কে যেন বলছে, ''মে আই কাম ইন প্লিজ?''

গোরা বলল, "ইয়েস ডু কাম ইন প্লিজ।" বলেই চমকে উঠল গোরা। কে? কে বলল এই কথা? এ কার কণ্ঠস্বর?

ও কোনওরকমে লণ্ঠনটা জ্বেলে দরজার দিকে তাকাতেই যাকে দেখল তাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সে। বলল, "এ কী! সতীয়া!"

সতীয়া বলল, "হ্যাঁ আমি।"

"তোমাকে একটু ছুঁয়ে দেখব, এই তুমি সেই তুমি কিনা? না হলে কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি সতীয়ার প্রেতাত্মা নও তো?"

সতীয়া নিজেই তখন গোরার হাত দুটো মুঠো করে ধরল। ওর পুষ্পস্তবকের মতো হাতের পরশ পেয়ে গোরা বলল, "না। এ তো দেখছি তোমারই হাত। এ তো তুমিই। কিন্তু তুমি আমার এই জায়গার হদিশ পেলে কী করে?"

"সে অনেক কাণ্ড করে। এখন আমি বড় ক্লান্ত। সারাটা দিন তোমারই সন্ধানে এই অরণ্যে হন্যে হয়ে ঘুরেছি। অবশেষে এই সন্ধ্যার উপকূলে দ্যাখা পেলাম তোমার।"

গোরা বলল, "বাঃ। বেশ চমৎকার বাংলা বল তো তুমি। আমি বাঙালি হয়েও ভাবছি এবার তোমার কাছে বাংলা শিখব।"

"কী যে বলো, এসব কি আমার নিজের ভাষা? আমি ময়না পাখি। শেখা বুলি আউড়ে গেলাম।"

এমন সময় প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতেই ঘরে এসে ঢুকল হাসি।

গোরা বলল, "কী ব্যাপার! এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি? এত হাঁফাচ্ছ কেন?"

হাসি বলল, "উঃ। আর একটুর জন্য বেঁচে গেছি। যা জোর তাড়া করেছিল ভালুকে।"

"সে তো করবেই। এই অন্ধকারে কেউ আসে? তা ছাড়া তোমার তো আরও আগে আসবার কথা ছিল।"

"ছিল। এসেওছিলুম। হঠাৎ দেখি এই দিদিটা একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাকে যেন খুঁজছে। আমি পরিচয় জানতে চাইলে ও তোমার কথা বলল। আর ঠিক তখনই দেখতে পেলাম দূর থেকে লাল্লু আর কাল্লু নামের বদমায়েস দুটো আসছে। ভয়ানক অত্যাচারি ও দুটো। কত লোককে যে খুন করেছে ওবা তার ঠিক নেই। কত জায়গা থেকে কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ধরে এনে ওরা বিক্রি করে দিয়েছে। বাবা মারা যাবার পর আমাকেও নানারকম লোভ দেখিয়ে এখান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল ওরা। আমি তো ওদের চিনি। তাই ওদের ফাঁদে পা দিইনি। এখানে লোকের পাত কুড়নো খেয়ে আছি তবু ভাল আছি। যাই হোক আমি সেই মুহূর্তে দিদিটাকে নিয়ে তোমার কাছে না গিয়ে ওকে সতর্ক করে লুকিয়ে রাখলাম এক জায়গায়। তারপর ওদের নজর এড়িয়ে একটু বাঁকা পথে গিয়ে হাজির হলাম শিলির কাছে। ওকে বলে এলাম আমার এক দিদি এসেছে। ঘরে তো তেমন কিছু নেই, তুই শিগগির দুটো বনমোরগ বা যা হোক কিছু ধরে বাংলোয় চলে আয়। ওর ওখান থেকে আসবার পথেই আমি ভালুকের পাল্লায় পড়ি। ভাগ্যে একটা ছোটখাটো খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে গা ঢাকা দিতে পেরেছিলাম না হলে ওই ভালুকটার হাতেই আমার মরণ ছিল।"

গোরা বলল, "কী আশ্চর্য! এমন ভুল কেউ করে? তোমার উচিত ছিল আমি না

আসা পর্যন্ত এই দিদিটিকে আগলে রাখা। ধরো তুমি চলে যাবার পর হঠাৎ করে যদি ওই বদমায়েশ দুটোর চোখে পড়ে যেত দিদিটা তা হলে কী হত?''

''দিদিকে আমি যে জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলাম তাতে নিজের থেকে দেখা না দিলে দিদিকে ওরা কিছুতেই দেখতে পেত না।''

''যাক, কারও কোনও বিপদ যে হয়নি এই ঢের। এখন এক কাজ কর, দিদিকে ইঁদাবা থেকে একটু জল তুলে মুখ হাত ধোবার ব্যবস্থা করে দাও। তারপর একটু চা করে খাওয়াও আমাদের। পরে দিদির ব্যাপারেও সবকিছু শুনব। আমি এখনও ভেবে পাচ্ছি না। এই জঙ্গলে ও পথ খুঁজে এল কী করে? এই জঙ্গলে আসবার পর থেকেই দেখছি চারদিক থেকে রহস্য যেন জমাট বেঁধে আসছে।''

সতীয়া ওর কাঁধের ব্যাগটা একপাশে রেখে হাসির সঙ্গে ইঁদারায় গেল মুখ হাত ধুতে। সারাদিনের পথশ্রমে ক্লান্ত বেচারি এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তারপর ঘরে এসে খুব আয়েস করে তক্তাপোষের বিছানায় এলিয়ে দিল দেহটা।

হাসি খুশিমনে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসল। ওর যে কী আনন্দ তা বলে বোঝানো যাবে না। সেই আনন্দের উচ্ছ্বাসে বেশ ভাল করে তৈরি করল চা।

চা খেতে খেতেই সতীয়া বলল, ''ভারি চমৎকার মেয়েটি। একে তুমি কোথায় পেলে গোরা?''

গোরা তখন হাসির ব্যাপারে সব বলল। তারপর বলল, ''এবারে তোমার কথা বল। এই জঙ্গলের পথ চিনে তুমি কী করে এখানে এলে?''

সতীয়া বলল, ''কাল তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তো চলে গেলাম। কিন্তু মনটা আমার তোমার কাছেই পড়ে রইল। তুমি যে কেন এবং কী কারণে এই বনবাসে এসেছ তা তো বলেইছ আমাকে। তাই হঠাৎ আমি আমার মতের পরিবর্তন করলাম। ইতিমধ্যে ইলাহাবাদে পৌঁছেই শুনলাম মানিকপুরের কাছে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এক ভয়াবহ ডাকাতি হয়ে গেছে। সেই ব্যাঙ্কের লকারে রাখা শেঠ ভাগারাম বাঙ্গুরের দশ লাখ টাকা মূল্যের কয়েকটা হিরে চুরি হয়ে গেছে। সকলের সন্দেহ এ কাজ বিল্লুপ্রসাদের দলবল ছাড়া কারও নয়। সেই শুনেই আমি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। আমার কেন জানিনা মনে হল ওই হিরেগুলো উদ্ধার করতে গেলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করা একান্ত দরকার। তোমার অজান্তেই হয়তো তোমারই হাত দিয়ে পাচার হয়ে যাবে ওই হিরেগুলো।''

সতীয়ার কথা শুনে কেমন যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল গোরা। একটু নীরব থেকে বলল, ''তারপর?''

''তারপর আমি আঙ্কলজীকে জানিয়ে দিলাম বিশেষ কারণে এখন আর আমার ফেরা হবে না। আমার যেতে দু'একদিন দেরি হবে। বলে আমার বান্ধবীর স্কুটার নিয়ে সোজা চলে এলাম চিত্রকূটে। ওখানে এসে তোমার ওই সদাশিববাবুর বাড়িতে ছিলামও একরাত। তারপর ওঁরই মুখে এই জায়গাটার ভাসা ভাসা বিবরণ শুনে জঙ্গল তোলপাড় করতে লাগলাম। তারপর একসময় এসে পৌঁছলাম এখানে। এখানে এসে দেখি বাংলোয় কেউ নেই। তালা দেওয়া। তখন কী আর করি, হতাশ হয়ে ফিরে যাব ভাবছি এমনসময় দেখি এই মিষ্টি মেয়েটি অবাক চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওকে তোমার কথা বলতেই ও লাফিয়ে উঠল আনন্দে। আর তখনই দূর থেকে একটা মোটরবাইকের শব্দ কানে আসতেই

মেয়েটি আমার হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখল এক জায়গায়। তারপর চাপা গলায় বলল, 'আমি না আসা পর্যন্ত বা ওরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি এখান থেকে যাবে না কোথাও। মনে রেখো, এটা কিন্তু আমাদের শত্রুপুরী।' আমি ওর কথামতোই লুকিয়েছিলাম। তারপর যখনই দেখলাম ওরা তোমার হাতে কী যেন একটা দিয়ে চলে গেল তখনই বেরিয়ে এসে দেখা দিলাম তোমাকে।"

সতীয়া এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল গোরাকে। গোরা সব শুনে বলল, "কিন্তু তুমি যে চিত্রকূট থেকে এই জঙ্গলে এলে, কীসে এলে?"

"বললাম তো, ইলাহাবাদে আমার এক বান্ধবী থাকে। তার কাছ থেকে কয়েকদিনের জন্য ওর স্কুটারটা আমি চেয়ে এনেছি, তাতেই এলাম।"

"কিন্তু সেটা কোথায়।"

"সেটা আছে। বাইরেই এক জায়গায় এমনভাবে রাখা আছে যা কারও চোখে পড়বে না।"

এমন সময় শিলি এল। মাঝির ছেলে লাখন ওকে দুটো বনমোরগ মেরে অনেক মাংস উপহার দিয়েছে। তাই নিয়েই এল।

সতীয়া তো ওকে দেখে দারুণ খুশি। বলল, "এই হল প্রকৃত অরণ্যকন্যা। মেঘের মতো কালো গায়ের রঙ। ছুরির ফলার মতো চকচক করছে চোখ, কী সুন্দর।"

শিলিও খুশি হল সতীয়াকে দেখে। এমন সুন্দরী এই অরণ্যে সচরাচর চোখে পড়ে না। তা ছাড়া জিনসের প্যান্ট শার্ট পরা সতীয়ার মধ্যে একটা শহুরে আভিজাত্য আছে। সেই আভিজাত্যের পাশে ওরা নিষ্প্রদীপ। তাই ওর অঙ্গের জৌলুষ দেখেই ওকে দারুণ ভালবেসে ফেলল ও। হাসি শিলি দুজনেই একান্ত আপন করে নিল সতীয়াকে।

সতীয়াও এই বনবাসে ওদের মতো সঙ্গিনী পেয়ে বর্তে গেল যেন। ওরা তিনজনেই হাতে হাত মিলিয়ে গরম ভাত আর বনমুরগির মাংস তৈরি করে ফেলল অল্পসময়ের মধ্যেই।

খাওয়া দাওয়া করতে করতেই রাত দশটা বেজে গেল। গতকালের রাত আর আজকের রাতে কত তফাৎ। গোরা একটুও ভয় পেল না আজ। ওর কোনও আতঙ্ক হল না। বরং এরা তিনজনে থাকায় ওর মনোবল আরও বৃদ্ধি পেল। শিলিকেও এই রাতে আর ফিরে যেতে দেওয়া হল না। আদর করে রেখে দেওয়া হল ওদের কাছেই।

রাত বাড়ছে। কিন্তু এ রাতে ওদের কারও চোখে ঘুম নেই। কেননা এ রাত ঘুমের রাত নয়। এ রাত আতঙ্কের রাত। লণ্ঠণের স্বল্পালোকে ওরা চারজনে তক্তাপোষের বিছানায় গোল হয়ে বসে এই দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে কীভাবে রুখে দাঁড়ান যায় সেই নিয়ে পরিকল্পনা করতে লাগল।

হাসির করুণ কাহিনী শুনে সতীয়া এমনই উত্তেজিত হল যে মনে হল পারলে ও এখনই বিল্লুপ্রসাদের লোকজনসহ সবাইকে শেষ করে দেয়।

শিলি এমনিতেই কথা খুব কম বলে। তবু বলল, 'ইসি লিয়ে ইয়ে লোগনকো ভালুকা তালুক বরদাস্ত নেহি করতা। উধার যানে সে মার দেতা।"

সতীয়া গোরাকে বলল, "তুমি তো কাল থেকেই এখানে আছ। সেই দুর্ঘটনার

্যাপারে কোনও কিছু অনুমান করতে পারলে?"

"না। আমি তো এখানে এসে শুধু শালমহুয়ার বন, অরণ্য, পর্বত, ঝরনা আর রক্তপলাশের ফাগুনরাঙা আগুন দেখছি, এ ছাড়া ওইসবের কোনও গন্ধও পাচ্ছি না।"

"ঠিক আছে। কাল সকাল থেকেই আমরা লেগে পড়ব দুজনে। যেখানে পথ আছে সেখানে আমার স্কুটারকে কাজে লাগাব। যেখানে পথ নেই সেখানে পায়ে হেঁটেই যাব।"

হাসি বলল, "এই অরণ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন বিল্লুপ্রসাদের। কোথায় কোনখানে ওর কোন লোক যে ওৎ পেতে আছে তা কে জানে? কাজেই যা করতে হবে খুব সাবধানে। তোমার ভাগ্য ভাল যে এখানে আসবার সময় কেউ তোমাকে দেখে ফেলে নি।"

গোরা বলল, "স্কুটার নিয়ে নয়, এমনিই পায়ে হেঁটেই ঘুরে দেখতে হবে সব কিছু। তবে আমার মনে কিন্তু একটাই সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে।"

"কীরকম!"

"এক একসময় মনে হচ্ছে, সে রাতে বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে ওই সোনাপাচারকারীদের গাড়ি বা পুলিশের গাড়ি শেষ পর্যন্ত গহেরানালায় তলিয়ে যায়নি তো?"

সতীয়া বলল, "গহেরানালা?"

"হ্যাঁ। সে এক বিপজ্জনক মরণ খাদ। আমার মনে হচ্ছে ওই খাদের গভীরেই জমা জলের নীচে কাদায় পাঁকে তলিয়ে গেছে ওরা।"

উল্লসিত হয়ে সতীয়া বলল, "তুমি যা ভেবেছ ঠিক তাই হয়েছে। ওই খাদটা একবার আমাকে চিনিয়ে দিতে পার?"

হাসি বলল, "চিনে কী করবে? এখানে নামা যায় না।"

"যাতে নামা যায় সেইরকম ব্যবস্থা করতে হবে।"

গোরা বলল, "কাল সকাল হলেই চষে ফেলব আমরা জায়গাটাকে। কিন্তু আজকের রাতটা যে আমরা কী করে কাটাব তাই তো ভাবছি।"

"আজ তোমার ওই রাতের অতিথি কখন আসবে?"

"রাত একটা নাগাদ। ওই পার্সেলটা ওর হাতে তুলে দিলে তবেই নিশ্চিন্তি।"

"কী আছে ওতে?"

"তা আমি কী করে জানব?"

সতীয়া হঠাৎ কী যেন ভেবে দারুণ উৎসাহিত হয়ে বলল, "আচ্ছা, মানিকপুর ব্রাঞ্চের সেই লকারভাঙা হিরেগুলো নেই তো ওর ভেতর?"

গোরার চোখ কপালে উঠল।

হাসি শিলিও চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, "হয়তো তাই।"

সতীয়া বলল, "কোনওরকমে একবার খুলে দেখলে হয় না?"

গোরা বলল, "তাতে লাভ? ধরো ওই হিরেগুলোই যদি থাকে ওর ভেতরে?"

"তা হলে আমরাই ডাকাতি করব ওগুলো।"

"কিন্তু কীভাবে?"

"সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে। এখন তো নিয়ে এসো ওই প্যাকিংটা।"

গোরা সেই পার্সেলের মতো গালা সিল করা প্যাকিংটা নিয়ে এসে সতীয়াকে দিল।

সতীয়া সেটা হাতে নিয়েই বলল, "নির্ঘাৎ হিরেগুলো এর ভেতরেই আছে।" বলেই নানারকম কসরত করে ভেঙে ফেলল প্যাকিং বক্সটাকে।

আর তখনই ওরা বুঝতে পারল অনুমান ওদের মিথ্যে নয়। ছোট্ট একটি কাঠের বাক্সে তুলোয় মোড়া বিভিন্ন আকারের পাঁচটি হিরে যা আছে তার দ্যুতির কাছে দিনের আলোও বুঝি ম্লান।

সতীয়া হিরেগুলো পেয়েই বলল, "কোনওরকমেই এগুলোকে হাতছাড়া করা নয়। এগুলো যেভাবেই হোক মানিকপুরের ওই ব্রাঞ্চেই ফেরত দিতে হবে।"

গোরা বলল, "আজ রাত থেকেই তা হলে লড়াই-এর প্রস্তুতি নেওয়া যাক?"

"হ্যাঁ। আর এই ব্যাপারটা তুমি ছেড়ে দাও আমারই ওপরে।"

গোরা বুঝে গেছে সতীয়া অসম সাহসী এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। তাই এইসব ক্ষেত্রে ওর ওপরে যথেষ্ট ভরসা রাখা যায়।

দশ

ঘড়ির কাঁটায় রাত একটা হতেই বাইরে একটি গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। ওরা সবাই সতর্ক হয়ে উঁকি মেরে দেখল গাড়ি থেকে নামলেন চম্বলের দস্যুনেত্রীর মতো এক ভয়ঙ্করী। সেই সঙ্গে শয়তান বীরু।

গোরা বলল, "সবাই যে যার জায়গায় পজিসন নিয়ে দাঁড়াও। এখনই রোমহর্ষক ব্যাপার একটা কিছু ঘটবেই। তার কারণ ওই দস্যুনেত্রীর বন্দুকের গুলির কাছে আমরা কিছুই নই।"

সতীয়া বলল, "হিরেগুলো মনে হয় ওঁর হাত দিয়েই পাচার হবে।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

সতীয়া বলল, "আমি বলি কি এই বিপজ্জনক মুহূর্তে হাসি আর শিলির এখানে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। ওরা বরং হিরেগুলো নিয়ে উধাও হয়ে যাক। সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে গিয়ে পৌঁছে যাক ভালুকা তালুকে শিলিদের গ্রামে।"

গোরা বলল, "দি আইডিয়া। তাই করুক ওরা। না হলে হিরেগুলো হয়তো হাতছাড়া হয়ে যাবে।" বলেই ওদের পালাবার নির্দেশ দিল।

সতীয়ার হাতে ততক্ষণে ঝকঝক করছে টেবিলের ওপরে রাখা আনাজকাটা ছুরিটা।

এদিকে পদশব্দও ধীরে ধীরে বাংলোর গেটের কাছে এগিয়ে আসছে।

আর সেই ভয়ঙ্করী রাইফেল কাঁধে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন বাংলোর বাইরে। এদিক থেকে ওদিকে। ঠিক যেন পুতলিবাঈ।

বীরু এসে বাংলোর দরজায় টক টক শব্দ করে বলল, "শোনেবালে জাগো।"

গোরা ভেতর থেকেই সাড়া দিল, "কে?"

"তেরা ফাদার। দরোয়াজা খোল শয়তানকা বাচ্ছা।"

গোরা দরজা খুলল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সতীয়া করল কি একটা দড়ির ফাঁস ওর গলায় আটকে টেনে আনল ঘরের ভেতর। গোরা সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

এমন যে হবে বীরু তা ভাবেনি। মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে নাক মুখ ফেটে সে কী কাণ্ড তার।

বীরু সতীয়াকে দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, "তুম কৌন হো?"

সতীয়ার হয়ে গোরাই বলল, "তোর মাদার।"

এদিকে পায়ে পায়ে দরজার কাছ থেকে ভেলুও বেরিয়ে এসেছে। বীরুর গলা মুখ একবার জিভ দিয়ে চেটে সমানে গরগর করতে লাগল সে।

বীরু বলল, "ইয়ে কুত্তা কাঁহা সে আয়া?"

"কোথা থেকে আবার আসবে? এখানে আসতেই জুটে গেল। আমিও আশ্রয় দিলাম। তোমরা বন্দুক পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াবে আর আমি এই বনে জঙ্গলে একা একা থাকব বুঝি?"

"আউর ইয়ে লেড়কি? এ কাঁহাসে আয়া?"

"এ লেড়কি তো একটু আগেই আকাশ থেকে পড়ল।"

বীরু একটু উঠে বসবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। ওর গলার ফাঁসের দড়ি সতীয়ার হাতে। এক হাতে দড়ি আর এক হাতে উদ্যত ছোরা। তার ওপর চোখের সামনে এক ক্রুদ্ধ কুকুর।

বীরু বলল, "ও চীজ কাঁহা হ্যায়?"

"কোন চীজ!"

"কাল্লু বিল্লুনে যো দিয়া থা।"

"ও নামে কাউকে আমরা চিনি না। কেউ কিছুই দেয় নি।"

বীরু বলল, "আমরা খুব খারাপ লোক আছি। এইরকম দুশমনি হাম লোগনকা সাথ াৎ কব না। ও প্যাকিট মে দশ লাখ রুপিয়া কা হীরা মজুত থা। ও মুঝে দে দো। চম্বল কা ানি ুলারীবাঈ বাহার খাড়া হ্যায়। হীরা নেহি মিলনে সে সবকো মার ডালে গা ওই পশাচিন।"

গোরা বলল, "আমি এখানে আসার পর থেকেই সমানে খারাপ ব্যবহার করছ তুমি। খন তুমি আমাদের কব্জায়। একটু আগেই তুমি আমার ফাদার তুললে। এবার আমরা তামাকে যা যা জিজ্ঞেস করব তার ঠিকমতো উত্তর না দিলে মেরে কিন্তু মুখ ভেঙে দেব তামার।"

বীরু বলল, "আমি কামতানাথের কসম খেয়ে বলছি, আজ রাতে তোদের দুজনকে দি গহেরা খাদে ফেলে দিতে না পারি তো আমি এক বাপের ব্যাটা নই।"

গোরা হাসল। বলল, "আজ রাতের মধ্যে তোমার খেল্ও যদি খতম করতে না পারি তা আমবাও এক বাপের ব্যাটা এক মায়ের বেটি নই।"

সতীয়া ছুরির ফলাটা বীরুর চোখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "তোমার মতো যতানকে কখনও প্রাণে মারতে নেই। তাই আমি কী করব জানো? ছুরির এই ফলাটা দিয়ে তামার ওই চোখ দুটোকে উপড়ে নেব। অন্ধ মানুষের আসুরিক শক্তি থাকলেও তা কাজে গে না।"

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই বীরু হঠাৎ একটা লাথি মেরে গোরাকে ফেলে দিল ঘরের কপাশে। আর এক হাতে দড়ি ধরে হেঁচকা একটা টান দিতেই অসতর্ক সতীয়া মুখ থুবড়ে ড়ল ওরই গায়ের ওপর। সেই সুযোগে বীরু দুহাতে ওর গলা টিপে ধরল। কিন্তু সে-ও শিক্ষণের জন্য নয়। ক্রুদ্ধ ভেলু ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন একটা মরণ কামড় দিল ওর ঘাড়ে

যে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল সে।

এদিকে হল কি হাসি আর শিলি তখনকার মতো সরে গেলেও একেবারে চলে যায় নি। তার কারণ যদি ওদের হঠাৎ করে কোনও সাহায্যের দরকার হয় এই ভেবেই লুকিয়েছিল একপাশে। এখন বীরুকে ওইরকম বেকায়দায় পড়তে দেখে আত্মপ্রকাশ করল ওরা। শিলি একটা ভারি কাঠ দিয়ে মেরে বসল বীরুর মাথায়। আর হাসি এতদিনে প্রতিশোধ নেবার একটা চমৎকার সুযোগ পেয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে এল বীরুর কাছে। গোরাকে বলল, "এই, এই লোকটা আমার বাবাকে জ্যান্ত পুঁতেছিল। আমার চুলের মুঠি ধরে গহেরা খাদে ফেলে দিতে যাচ্ছিল আমাকে। একে কোনওরকমেই ছেড়ো না কিন্তু।"

বীরু চোখ লাল করে বলল, "আভি সমঝ গিয়া। ওইরাতে আমি তোকে খাদে ফেলিয়ে দিলে এমনটি হত না। তু নেহি বাঁচোগে নাগিন লেড়কি। তেরা হাল ভি. .।"

আর কিছু বলবার সুযোগই পেল না বীরু। হাসি দারুণ হিংস্র হয়ে ওর নখ শুদ্ধ আঙুলগুলো বীরুর চোখের মধ্যে গুঁজে দিল।

বীরুর প্রাণান্ত চিৎকারে কেঁপে উঠল বাংলোর ভেতরটা।

চম্বলের সেই দস্যুনেত্রীও তখন চমকে উঠলেন। রাইফেল উদ্যত করে বাঘিনীর দৃষ্টিতে এগিয়ে আসতে লাগলেন বাংলোর দিকে। দস্যুনেত্রী দুলারীবাঈ। কথায় কথায় যিনি মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেন। মানুষ খুন করে তারই রক্ততিলক কপালে না পরলে মনে যিনি শান্তি পান না, সেই দুলারীবাঈ বাংলোর কাঠের দরজায় ঘুসি মেরে বললেন, "দরোয়াজা খুলিয়ে।"

গোরার ঈশারায় হাসি আর শিলি আবার লুকিয়ে পড়ল ওদের গুপ্তস্থানে।

গোরার আগে সতীয়াই গিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

দুলারীবাঈ চোখের মধ্যে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে ভেতরে ঢুকে বললেন, "বীরু কাঁহা?"

বীরু তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। আর চিৎকার করছিল, "মেরা দোনো আঁখ বরবাদ হো গয়া। কুছ দিখাই নেহি দে তা। বাঈ! এ সবকো নেই ছোড়না। গোলি মার দিজিয়ে।"

দুলারীবাঈ বললেন, "এর এইরকম হাল কী করে হল? কৌন বদতমিজ করেছে এ কাজ?"

সতীয়া বলল, "আমি।"

"কেন এ কাজ করেছ তুমি? আমার লোকের গায়ে হাত দেওয়ার পরিণাম জানো?"

সতীয়া বলল, "না। কিন্তু এই কাজ না করা ছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না। এই বীরু বদমাশ আজ দুদিন হল আমাকে এইখানে আটকে রেখেছে। আমাকে বিক্রি করে দেবার মতলব করেছে ও। এই ছেলেটাকে আমার পাহারায় রেখেছে। ছেলেটা খুব ভাল। আমাকে যত্ন করেছে। খেতে দিয়েছে। আমি পালাবার চেষ্টা করলে ও বাধা দিয়েছে। বলে একদিকে ভালুকা তালুক, অন্যদিকে বিল্লুপ্রসাদের লোকেরা ঘোরাফেরা করছে। আমি তোমাকে এই জঙ্গলেই কোথাও লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেব। আজ দুজন লোক এসে একটা প্যাকিং বক্স এই ছেলেটার হাতে দিয়ে যায়। সেই প্যাকিং-এর মধ্যে কতকগুলো দামি দামি হিরে ছিল। বিল্লুপ্রসাদজীর নির্দেশ ছিল আজ রাত একটার সময় কেউ এলে ও

প্যাকিং তাকে দেবার। কিন্তু এই শয়তান বীরু তার অনেক আগেই এসে জোর করে প্যাকিংটাকে নিয়ে সেটাকে কেটে তার ভেতর থেকে হিরেগুলোকে বের করে ওরই একজন লোকের মারফত পাচার করে। তারপর এখন আপনার সঙ্গে এসে চোখ রাঙাচ্ছে আমাদের। ভয় দেখিয়ে বলছে, 'শিগগির বল, হিরেগুলো কোথায় রেখেছিস?' আমরা যত বলছি, 'ওগুলো তুমিই তো নিয়ে গেলে, ও ততই আমাদের ধমকাচ্ছে'।"

বীরু চিৎকার করে বলল, "সব ঝুটা হ্যায়। ইয়ে লেড়কি ভি বহুৎ খতরনক।"

দুলারীবাঈ ধমক দিয়ে বললেন, "চোপ রও। পহলে বোলনে দো উসকো।"

সতীয়া বলল, "শুধু তাই নয়, ও এখন এই ছোরাটা আমার হাতে দিয়ে বলছে যদি বাচতে চাস তো দুলারী আমার খোঁজে বাংলোয় ঢুকলেই ছোরাটা ওর বুকে গেঁথে দিবি। তারপর সবাই মিলে ওই অবস্থাতেই ওকে গহেরানালায় ফেলে দেব। বিল্লুপ্রসাদেব

ইরকমই নির্দেশ আছে। তা আমি তো কখনও মানুষ খুন করিনি বাঈ। তাই ওর কথায় জি হই না। সেই রাগে ও আমাকে হেনস্থা করতে চাইছিল। ওর সঙ্গে গায়ের জোরে তো মি পেরে উঠব না। তাই ওর চোখে আঙুল গুঁজে দিয়েছি আমি।"

দুলারীবাঈ তখন দারুণ ক্রোধে ফুঁসতে লাগলেন। বললেন, "কে কাকে গহেবানালায় ফেলে এবার দেখাই যাবে। আমি হলুম এই জঙ্গলমহলের বানি। বিল্লুপ্রসাদ আমার হুকুমে খানে কাজ কাম করে। বুঝেছি, ও এখন আমাকে সরিয়ে দিয়ে এই জায়গার পুরোপুরি খল নিয়ে নিতে চায়। যে ব্যাঙ্কে ওরা ডাকাতি করে হিরেগুলো পেয়েছে ওই ব্যাঙ্কে ওই

হিরেগুলোর ব্যাপারে সন্ধান তো আমিই ওদের দিয়েছিলাম। এই জঙ্গল আমার কথা শোনে। যদিও আমি চম্বলকে ভালবাসি বলে চম্বলেই থাকি, তবুও এই জঙ্গল আমার প্রাণ। এখানে একবার কেউ ঢুকে পড়লে আমার মর্জি ছাড়া বেরোতে পারে না। আজ থেকে দশ সাল পহলে একদল লোক কোটি কোটি টাকার সোনা পাচার করে দিচ্ছিল। পুলিশের তাড়া খেয়ে এই জঙ্গলে ঢুকে পড়ে তারা। পথঘাট জানা ছিল না তাই পড়বি তো পড় একেবারেই গহেরানালায়। পুলিশের জিপও ওইভাবেই পড়ল। এমনভাবে পড়ল যে দুদিকের পাহাড় ধসে একেবারেই চাপা পড়ে গেল জায়গাটা। তারপর কত লোকজন এল। কত কী করল। কিন্তু কেউ বুঝতেই পারল না সে জিনিস কীভাবে ঢেকে রইল নালার মধ্যে। আজ দশ বছর ধসের ফাঁকে লুকিয়ে আছে সেই অমূল্য ধন। পুলিশ এল, সরকারি লোকজন এল, চারদিক দেখল। পালিয়ে গেল। কেউ ভেবেও পেল না দু'দুটো গাড়ি লোকজন সমেত উধাও হয়ে গেল কীভাবে। আমি জঙ্গলের রানি হাসতে লাগলাম হো হো করে। পরে বিল্লুপ্রসাদ সরকারের কাছ থেকে ইজারা নিয়ে এই জঙ্গলে এল টিম্বার মার্চেন্ট হয়ে। কিন্তু শুধু তো জঙ্গলের কাঠের ব্যবসা নয়, অন্য ব্যবসাও শুরু করল সেই সঙ্গে। কিন্তু আমার এলাকায় আমার পুজো না দিয়ে কি কোনও কিছু করা যায়? আমি রোজই ওর দলের একজন করে মানুষকে বান্দরের মতো মারতে লাগলাম আর ঝুলিয়ে দিতে লাগলাম গাছের ডালে। রাম সিং, বচন সিং, ভুখা সিংরা আমার কথায় ওঠে বসে। শেষমেশ এই বিল্লুপ্রসাদ হার মানল আমার কাছে। আমাকে বছরে তিন লাখ টাকা হিস্যা দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে যায় ও। শুধু ওই ভালুকা তালুক আমাকে মানতে চাইল না। তাই আমিও ওদের জব্দ করলাম। ওদের ওই আকাশগঙ্গার ধারাকে আমি রুদ্ধ করে দিলাম। আমার এলাকার কয়েকটা পাথরের চাঁই ডিনামাইট দিয়ে ধসিয়ে দিতেই জলের ধারা এদিক দিয়ে বইতে লাগল। পলাশফুলের বন পেরিয়ে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভালুকা তালুকের ঢাল তা রুক্ষ হয়ে গেল। ওদের মহাকাল আমার করালগ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারল না ওদের।"

সতীয়া বলল, "দুলারীবাঈ! আমরা আগে জানতাম ওই বিল্লুপ্রসাদই এইখানকার সব। কিন্তু এখন তো দেখছি ও আপনার দাসানুদাস ছাড়া কিছুই নয়।"

"নয়ই তো। আমার লোকজনদের চেহারা তো দ্যাখোনি তোমরা, ওরকম অনেক বিল্লুপ্রসাদকে ওরা হজম করে দিতে পারে। আজ ওরা ঝাঁসীতে গেছে রক্ত ঝরাতে। গোয়ালিয়রের এক শেঠ ধন্নুরামের ছেলের বিয়ে আজ ঝাঁসীর হাজারিমল-এর মেয়ের সঙ্গে। ওরা মেয়েটাকে তুলে আনতে গেছে।"

গোরা বলল, "মেয়েটা কোন অপরাধ করল দুলারীবাঈ?"

"আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন আমার মা ওদের বাড়িতে কাজ কাম করত। ওর মা আমার মাকে চুলের মুঠি ধরে মারত। ঝি বলত। চোর বদনাম দিত। তাই ওরই মেয়েকে আমি আমার বাঁদী করে রাখতে চাই। সেইসঙ্গে চাই অনেক সোনা অনেক টাকা।"

সতীয়া বলল, "তাই যদি হয় তো আপনি ওই মেয়েটাকে ধরে না এনে ওর মা'কেই আপনার বাঁদী করে রাখতে পারতেন।"

দুলারীবাঈ হেসে বললেন, "আমার বিচারটা অন্যরকম। যে অপরাধ করবে সে বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে। মরবে অন্য লোক। আমি যদি মেয়েটাকে আমার বাঁদী করে রেখে দিই ওর মায়ের রাতের ঘুম চলে যাবে তখন। বাবা মায়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে

আমি তাদের ছেলেমেয়েকে হাপিস করে দিই। এই যেমন বীরু। একে আমি মারব না। একে আমি শ্রীশ্রী ভগবানের চরণে নিবেদন করব। ভগবান একে রক্ষা করলে এ ব্যাটা বেঁচে যাবে।''

বীরু কেঁদে বলল, ''মুঝে মাফ কর দো বাঈ। ম্যায়নে কুছ নেহি কিয়া থা। সব ঝুটা হ্যায়।''

''সব যদি ঝুটা হোবে তো হীরাগুলো এইখানেই থাকবে।''

গোরা বলল, ''আপনি আমাদের সব কিছু দেখুন বাঈ। আমরা নিয়ে থাকলে ওগুলো অবশ্যই এখানে থাকবে। আমরা তো জঙ্গলের বাইরে কোথাও পাচার করতে যাই নি।''

দুলারীবাঈ কোনও কথা না বলে কোনও অনুসন্ধান না করেই গম্ভীর গলায় বললেন, ''বীরু উঠো।''

বীরু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ''বাঈ! ম্যায় কুছ নেহি জানতা। ইয়ে সব ড্রামা হ্যায়।''

''বকোয়াস মাৎ করো, উঠো।''

গোরা আর সতীযা দুজনে মিলে হাত ধরে টেনে তুলল বীরুকে।

দুলারীবাঈ হুকুম করলেন, ''বাহার লে চলো।''

বীরুর একে চোখের যন্ত্রণা, তার ওপর দুলারীবাঈ-এর মনোভাব যে কী তা বুঝতে না পেরে রীতিমতো কান্না শুরু করে দিল।

ওরা বেরিয়ে এলে হাসি আর শিলিও গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে লক্ষ্য রাখতে লাগল ওদের দিকে।

বীরু কাঁদতে কাঁদতে বলে চলেছে, ''বাঈ! মুঝে সমঝনে কি কোশিস করো। ম্যায় নির্দোষ হুঁ।''

দুলারীবাঈ আরও কঠিন গলায় বললেন, ''চলতে রহো।''

সতীয়া আর গোরাও পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে বীরুর হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল বীরুকে। একটু দূরত্ব বজায় রেখে ভেলুও আসতে লাগল পা টিপে টিপে।

রাতের অন্ধকারে পথঘাট ভাল করে চেনা যাচ্ছে না। কোথায় কোনদিকে যে যাচ্ছে ওরা তাও ভেবে পাচ্ছে না। হঠাৎ এক জায়গায় যেতেই দুলারীবাঈ বললেন, ''রুখ্ যাও।''

ওরা থমকে দাঁড়াল।

দুলারীবাঈ বললেন, ''বীরু বদমাশ, তুমি আমার হয়েও কাজ করবে আবার বিল্লুপ্রসাদের হয়েও কাজ করবে, এমন তো হয় না। তুমি কাজ করছ আবার বেইমানিও করছ। হিরেগুলো নিজে হাপিস করে বিল্লুপ্রসাদকে বলবে ও জিনিস দুলারীবাঈয়ের হাতে পৌঁছে গেছে। আবার আমাকে খুন করে গহেরানালায় ফেলে দিয়ে ইনাম নেবে বিল্লুপ্রসাদের কাছে। এইরকম কাজ কাম আমি বরদাস্ত করে না। তাই আমি তোমাকে ঝুটমুট গুলি করে একটা গুলিও নষ্ট করতে চাই না। মানুষ খুন করতে আমার হাত কাঁপে না। ওতে আমি মজা পাই। লেকিন তোমাকে আমি পাঠাতে চাই ওই গহেরানালাতেই। বোলো ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কি...।''

দড়াম করে এক লাথি। পাহাড়ের মাথা থেকে যেন চুড়ো খসে পড়ল। বীরুর প্রাণান্তকর চিৎকার পাহাড়ে পর্বতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরে ফিরল গহেরানালার এ প্রান্ত থেকে

ও প্রান্তে। গহেরানালার খাদে, কাদায় পাঁকে, সমাধি হল বীরুরও।

এরপর কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। গোরা আর সতীয়া পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে।

দুলারীবাঈ কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎই হাঃ হাঃ করে পৈশাচিক হাসি হেসে লুটিয়ে পড়লেন ওদের গায়ে। তারপর নাগিনির মতো ফণা তুলে বললেন, "এখন তোমাদের আমি কী ইনাম দেব বলো? আমি সৈয়দরাজার দুলারীবাঈ। চম্বল কা রানি। লেকিন আমার কোনও রাজা নেই। এই ব্যাটা বীরু রাজা হবার স্বপ্ন দেখছিল তাই ওকে আমি শেষ করে দিলাম। আমার দিকে কেউ বুরা নজর ডাললে আমি তাকে ক্ষমা করি না।"

সতীয়া বলল, "'আপ সৈয়দরাজা কা? ও তো বারাণসী জিলা মে হ্যায়।"

"আমিও বনারসী বাঈ। লেকিন নাচনেগানেবালে বাঈ নেহি। আমি ফুলন দেবীর সঙ্গে ভি কাজ কাম করিয়েছি। আমার যখন আঠারো সাল উমর, আমার সাদি কি রাতে আমার নসীব আমাকে এইখানে নিয়ে এল। এই চিত্রকূটের বিন্ধ্যগিরিতে আমি জীবনকে চিনতে শিখলাম। এখানে মন্দাকিনীকে যেমন ভালবাসলাম, আকাশগঙ্গাকে যেমন ভালবাসলাম, তেমনই ভালবাসলাম চম্বলকে। আমার ছোট্ট দল আছে। মাত্র আঠারো জন। এতেই আমি কাঁদিয়ে দিই চারদিক। ওই বিল্লুপ্রসাদ আমার হুকুমমতো কাজ কাম করে। না করলে এই জঙ্গলেই ওকে আমি শেষ করে দেব। আমার আঠারো জন লোক ওর গদিতে গিয়ে ওকে মেরে আসবে। দশ সাল পহলের সেই সোনার লালসও ওর আছে। কিন্তু সেই মাল যে এখন কোথায় তা ও জানে না। সরকারের লোকরা এসে গহেরানালায় লোক নামিয়েও কোনও কিছুর হদিশ পায় নি। আমি সবই বুঝি। বীরুর পরে আমি বিল্লুপ্রসাদকে শেষ করব। না হলে এই জঙ্গলকে আর রাখা যাবে না। জঙ্গল না থাকলে চিত্রকূট মরে যাবে। জঙ্গল না থাকলে দুলারীবাঈ বাঁচবে না। ও হারামখোর চোরা কাটরা অনেক গাছ কেটে নিয়ে বেচে দিয়েছে। কিন্তু আমাকে তার হিস্যা দেয় নি। ওই হিরেগুলোর ব্যাপারেও ও বেইমানি করল।"

এমন সময় হঠাৎই অন্ধকারে দুটো চোখ টর্চের মতো জ্বলে উঠতেই দুলারীবাঈয়ের রাইফেল গর্জে উঠল, "ডিস্যুম।"

গুলিতে আহত একটা চিতা এসে তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল দুলারীবাঈ-এর ওপর। তারপর বাঘে মানুষে সে কী প্রচণ্ড হুটোপুটি। সেই মুহূর্তে সতীয়াও ওর হাতের ছোরাটা নিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়ে গেল। বেকায়দা বুঝে পালিয়ে বাঁচল বাঘটা।

দুলারীবাঈয়ের সারা শরীর দিয়ে তখন রক্ত ঝরছে। তবুও কী দারুণ সহ্যশক্তি তার। যেন কিছুই নয় এমনভাবে সবকিছু ঝেড়ে মুছে আবার আগের মতো হেসে বললেন, "খুব জোর বেঁচে গেলাম এ যাত্রা।" তারপর বললেন, "তোমাদের কার কি নাম আছে আমাকে বলো?"

ওরা ওদের নাম বলল।

দুলারীবাঈ সতীয়াকে বললেন, "তুমি তো বেঙ্গলি নও। তোমার মকান কোথায় আছে?"

"বনারস।"

"এই জঙ্গলে তোমরা কী করছ? বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ বুঝি?"

সতীয়া বলল, "না ম্যাডাম। আমরা পালিয়ে আসি নি।"

দুলারীবাঈ বললেন, "আমাকে ম্যাডাম বলবে না। আমাকে বাঈ বল বাঈ। এবার বল, পালিয়ে যদি না এসে থাক তো কেন এসেছ এখানে?"

"এই ছেলেটার বা আমার বাবা মা কেউ নেই। ও এসেছে এই জঙ্গলে চাকরি করতে। আর আমাকে এরা ধরে নিয়ে এসেছে।"

দুলারীবাঈ হেসে বলল, "ঝুট মাৎ বোলো। কেউ তোমাকে ধরে নিয়ে আসেনি। তুমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছ। কেননা তোমার মতো মেয়েকে ধরে আনা যায় না। ঠিক কিনা?"

সতীয়া ধরা পড়ে গিয়ে মাথা নত করল।

বাঈ বললেন, "এবং তুমি আজই এসেছ একটা স্কুটার নিজে চালিয়ে। আমার লোকেরা দূর থেকে নজর রেখেছিল তোমার দিকে।"

গোরা বলল, "আপনি আমাদের ক্ষমা করুন বাঈ।"

দুলারীবাঈ হেসে গড়িয়ে বললেন, "আমি কাউকে কখনও ক্ষমা করি নি। করবও না। তোমাদের এমন এক কঠিন শাস্তি দেব আমি যা তোমাদের সারাজীবন ধরে ভোগ করতে হবে।"

গোরা বলল, "কী করবেন? হয় আমাদের গুলি করে মারবেন, না হয় গহেরানালায় ফেলে দেবেন। এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবেন না তো?"

"না। এর চেয়ে বেশি কিছু করতে আমি চাইও না। যেহেতু তোমাদের দুজনেরই বয়েস খুব কম তাই গুলি করে হত্যা তোমাদের করব না। তবে আরও বেশি গহেরানালায় ফেলে দেব তোমাদের। এমন গাড্ডায় ফেলব যে তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। বিশেষ করে কেউ আমার ভাল করলে আমি তার খারাপই করি। এই মেয়েটি ছোরা মেরে বাঘটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আমাকে বাঁচাল। তাই এর ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।"

সতীয়া আর গোরা পরস্পরের হাত ধরে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ভয়ঙ্করী দুলারীবাঈ-এর মনোভাব এরা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। এদিকে বাঘ দেখে ভেলুটা সেই যে পালিয়েছে আর এমুখো হয় নি। আসলে কুকুর হচ্ছে বাঘের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। তাই বাঘকে কুকুর যমের মতই ভয় করে। তা ছাড়া বাঈ-এর হাতে বন্দুক দেখেও ভয় পেয়েছে ও। বন্দুকের গুলির কাছে কোনও চালাকিই কাজ করবে না ওদের।

বাঈ বললেন, "এখন বল কীরকম মৃত্যু তোমাদের পছন্দ? গুলিতে মরবে না খাদেই পড়বে?"

গোরা বলল, "মরতে আমরা ভয় পাই না। আপনি যেভাবে ইচ্ছে আমাদের মারতে পারেন।"

"আমার ইচ্ছেটাই তোমরা মেনে নেবে?"

"হ্যাঁ নেব।"

"তা হলে মরবার আগে ওই হিরেগুলো আমাকে দিয়ে দাও। কেননা তোমরা মরে গেলে ওই হিরেগুলো তোমাদের কোনও কাজে লাগবে না।"

গোরা বলল, "ওগুলো তো আমাদের কাছে নেই। ওগুলো—।"

"বীরুর এমন ক্ষমতা হবে না যে আমার কোনও কিছু ও অন্যত্র পাচার করে।

ওগুলো তোমাদের কাছেই আছে। তবুও ওকে আমি কেন মারলাম জানো? ও আমার দি
বুরা নজর দিচ্ছিল, বিল্লুপ্রসাদ ও আমার ব্যাপারে একটু ষড়যন্ত্র করছিল। তাছাড়া তোমরা
যেভাবে ওর চোখ দুটো কানা করে দিয়েছিলে তাতে হসপিটাল অথবা নার্সিং হোমে ওকে
যেতেই হত। তখন পুলিশের নজরে এলে ফাঁস করে দিত আমার কথা। তাই ওকে সরিয়ে
দিলাম।''

সতীয়া বলল, ''আপনার কাছে আমরা হেরে গেলাম বাঈ।''

''বেশি কথা বাড়িও না। ভালয় ভালয় হিরেগুলো আমাকে দিয়ে দাও। না হলে—।''

ঠিক সেই মুহূর্তে হাসি আর শিলি এসে লুটিয়ে পড়ল বাঈ-এর পায়ে। বলল, ''দয়া
করে ওদের ছেড়ে দিন বাঈ। হিরেগুলো আমার কাছে। মারতে হয় আমাদের মারুন।''

''তোরা আবার কারা? আসমান সে গিরাকে আয়া না ক্যা রে চুনমুনিয়া?''

হাসি বলল, ''না। আমরা এ জঙ্গলেরই মেয়ে। আমি বসন্তঠাকুর কা লেড়কি। আর
এই শিলি হল ভালুকা তালুকের মেয়ে। এই যে দাদাটা, একলা এসেছিল এখানে। তাই
আমরা ওকে আগলে রাখবার জন্য এখানে ছিলাম। এমন সময় এই দিদিটাও এসে জুটে
গেল আমাদের সঙ্গে। বেশ ছিলাম আমরা। হঠাৎ ওই বীরু শয়তানটা এসে হাজির হল। ও
আমার বাবাকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতেছে। আমার চুলের মুঠি ধরে আমাকে গহেরানালায়
ফেলে দিতে যাচ্ছিল। তাই আমরা ওর ওপর প্রতিশোধ নেব বলেই মিথ্যে কথা বলেছিলাম
ওর নামে।''

দুলারীবাঈ হিরেগুলো হাতে নিয়ে সেই অন্ধকারেই সেগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে
লাগলেন। তারপর বললেন, ''মিল গয়া।'' বলে বললেন, ''এই হিরেগুলো কার জানো?''

সতীয়া বলল ''শেঠ ভাঘারাম বাঙ্গুরের।''

'নেহি। ইয়ে মেরা হি হ্যায়। বারাণসীর সৈয়দরাজার রামদেও গোয়ালার লেড়কির
সাদী কি রাতে ওই ভাগারাম ডাকাইতি করে এইগুলোর সঙ্গে আমাকেও উঠিয়ে নিয়ে
এসেছিল। সে এখন বিরাট শেঠ। আর আমি এখন ডাকাতরানি।''

গোরা বলল, ''তবে তো ভালই হল। আপনার জিনিস আপনি ফিরে পেলেন।''

''পেলাম শুধু সারাজীবন ধরে অনেক রক্ত ঝরিয়ে। আমার মা পরের বাড়িতে কাজ
করত। একদিন তারা চোর বদনাম দিয়ে আমার মাকে বাড়ি থেকে তাড়াল। আমার জন্মের
পর থেকেই বাবা নিরুদ্দেশ ছিলেন। তাই সৈয়দরাজা থেকে আমরা একজনের পরামর্শে
ঝাঁসীতে এসেছিলাম। এখন আবার যখন সৈয়দরাজায় ফিরে এলাম তখন দেখি আমার বাবা
দারুণ বিত্তবান হয়ে ফিরে এসেছেন। কিন্তু আমাকে আর আমার মাকে না দেখে পাগলের
মতো হয়েছিলেন তিনি। এরপর আমাদের ফিরে পেয়ে সে কী আনন্দ ওঁর। আমাদের
দুঃখেরও শেষ হল। আমার বাবার ছোট্ট ব্যবসা ফুলে ফেঁপে অনেক বড় হল। আমিও বড়
হলাম। জোনপুরের একটি ভাল ছেলের সঙ্গে আমার সাদীর ঠিক হল। সাদীর রাতেই এই
ভাগারামের দলবল ইন্দোরের রাজ পরিবার থেকে পাওয়া আমার বাবার ওই হিরেগুলোর
লোভে আমাদের বাড়িতে ডাকাতি করল। হিরেগুলো তো ওরা নিলই উপরন্তু আমাকেও
উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে আমার কপাল পুড়িয়ে দিল। ওইসময় নাগিনাবিবি আমাকে তাঁর দলে
নিয়ে ডাকাইতি শিখিয়ে দিলেন। চিত্রকূট থেকে চম্বল দাপিয়ে বেড়াতে লাগলাম আমি। আর
মানুষ খুন করে আমার রক্তপিপাসা মেটাতে লাগলাম।''

গোরা বলল, "আপনি তো দেবী। কিন্তু এত রক্তপান করেও আপনার তৃষ্ণা মিটছে না কেন?"

"এখন যে হত্যা আমার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই ভাগারামকে আমি আজও বাঁচিয়ে রেখেছি! কিন্তু ওর লেড়কির সাদীর দিনে ওর লেড়কিকে আমি নিজে হাতে গুলি করে মেরেছি। ওর দুই জোয়ান ছেলেকে আমার লোকেরা ওর চোখের সামনে গুলি করে মেরেছে। বদলার চরম আমি নিয়েছি। এখন ঝাঁসীর হাজারিমলের বেটি ভানুমতীকে আমার বাঁদী করে রাখতে পারলেই 'ওম শান্তি' হয়ে যাবে আমার। লেকিন তেরা ক্যা হোগা?"

গোরা বলল, "দেবীর কাছে কৃপা ভিক্ষা আমরা করব না। দেবীর যা ইচ্ছা তাই করুন। হাসতে হাসতেই মরতে চাই আমরা।"

"তাই মর।" বলে বন্দুকটা ওপরে উঠিয়ে 'দুম দুম' করে দুটো গুলি ছুড়লেন দুলারীবাঈ।

হাসি আর শিলি ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

গুলির শব্দে মশালের আলোয় আলোকিত করে কয়েকজন দুর্ধর্ষ দস্যু ঘোড়ায় চেপে হাজির হল সেখানে।

দুলারীবাঈ বললেন, "কাম হো গিয়া চেতা সিং?"

"হো গিয়া বাঈ।"

"ভানুমতী কো লায়া?"

'লোয়ারকোট মে হ্যায় ও।"

"লেকিন ইতনা জলদি ক্যায়সে হো গিয়া সব কুছ?"

"ও লোগ মেরে ডর সে ঝাঁসী মে নেহী, বাঁদা মে সাদী কা কাম কিয়া থা।"

"ঠিক হ্যায়। তুম সব লোয়ারকোট মে চলা যাও। ম্যায় গাড়ি লে কর আভি যা রহা হুঁ।"

ওরা চলে গেলে গোরা বলল, "কী হল! আপনি শূন্যে গুলি চালালেন কেন? মারুন আমাদের।"

"মারব। আমি মানুষকে একেবারে মারি না। খেলিয়ে খেলিয়ে মারি। তোদের দুজনকে আমি একইসঙ্গে মারব।"

হাসি আর শিলি তখন হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

দুলারীবাঈ বললেন, "কেঁদে কোনও লাভ হবে না রে। তোদের চোখের জলে পাষাণ গলে গেলেও আমার হৃদয় গলবে না। এখন থেকে আমি যা বলব তোরা তাই শুনবি। তোরা সবাই বন্দী আমার হাতে। বিল্লুপ্রসাদ নয়, এখন আমিই তোদের ভাগ্যবিধাতা। বীরুর খবর পেলে ও নিজেও আর জঙ্গলে ঢুকতে সাহস করবে না। আজ থেকেই ওর ব্যবসা বনধ্।"

সতীয়া বলল, "আপনার কথা শুনে আমাদের টেনশন বেড়ে যাচ্ছে। আপনি যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন আমাদের।"

বাঈ বললেন, "তুই বনারসীয়া, তাই না? তোর মা বাবা কেউ তো নেই।"

"আমার এক আঙ্কলজী আছেন। লেকিন এই ছেলেটার কেউ নেই। তাই ও সামান্য কটা টাকার জন্য এই জঙ্গলে চাকরি করতে এসেছিল। ওকে অন্তত আপনি মুক্তি দিন।"

গোরা বলল, "আমি মুক্তি চাই না। আমি মরতেই চাই। মরে গেলে আমি আমার মা বাবার কাছে পৌঁছে যাব।"

দুলারীবাঈ হেসে বললেন, "তা হলে শোন, আমি তোদের এমন শাস্তি দেব যে মরবার নামও আর মুখে আনবি না তোরা। আজ রাতেই আমি তোদের দুজনের সাদী দেব। একজন বাঙ্গালি অন্যজন বনারসীয়া। বেশ ভালই হবে কী বল? আমাদের দেশে খুব অল্পবয়সেই ছেলেমেয়েদের সাদী হয়ে যায়। তোদেরও তাই হোক।"

গোরা বলল, "কিন্তু আপনার এই ইচ্ছা তো পূর্ণ হবার নয়। হওয়া উচিত নয়। আমিও রাজি নই।"

"সে কী রে বাঙ্গালি! এমন সুন্দর একটা মেয়েকে সাদী করতে তুই রাজি নয়।"

গোরা বলল, "আপনি জানেন না বাঈ, আগ্রার একটি ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ের ঠিক হয়ে আছে। কাজেই—।"

বাঈ বললেন, "সচ্?"

সতীয়া বলল, "না। মিথ্যে কথা। আমি কখনও কোনও ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে আগেই তাকে জানিয়ে দিই আমার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে। যাতে সে আমার ব্যাপারে অন্যরকম কোনও ভাবনা চিন্তা না করে। ও সবই আমার বানানো কথা।"

বাঈ বন্দুক গাড়িতে রেখে দু'হাতে সতীয়াকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তার মানে তুই রাজি। সব মেয়েই যদি তোর মতো বুদ্ধিমতী হত রে। আয় তোরা আমাব সঙ্গে। আমি মহাকালের দরবারে গিয়ে তোদের শুভ কাজটা করিয়ে দিই। তোদের মতো বয়সেই আমারও সাদী হয়েছিল। কিন্তু কপালে সইল না। এখন থেকে এই এলাকার দায়িত্ব তোদের। লোয়ারকোটের বাংলোয় তোরা থাকবি। তোরা হবি এই বিন্ধ্যারণ্যের রাজারানি। ভালুকা তালুক যদি তোদের মানে তবে ওদের জল দিবি। ওই জলে ভালুকা তালুক আবার সজীব হবে। পাথরের বুকে ফুল ফুটবে। আর শোন, ওই সোনাগুলোর ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবি না। ওগুলো যেমন গহেরানালার ধসের মধ্যে লুকিয়ে আছে তেমনই থাকবে। কী লাভ সকলকে জানিয়ে? ওই সোনা নিয়ে খুন জখম হবে, লুট মার হবে। অথচ ওগুলো না জমা পড়বে সরকারের ঘরে না পাবি তোরা। চোরাই সোনা ওগুলো। কোন দেশ থেকে কীভাবে আসছিল তাও জানে না কেউ। তবে কোটি কোটি টাকার সম্পদ যে ছিল এটা অবশ্য জানতে পারা গিয়েছিল।" বলে হিরেগুলো সতীয়ার হাতে দিয়ে বললেন, "এগুলো তোরাই রাখ। দুলারীবাঈ-এর আর কোনও হিরের প্রয়োজন নেই।"

সতীয়া হিরেগুলো হাত পেতে নিতেই বাঈ বললেন, "আয় তোরা আমার সঙ্গে। শুভ কাজটা সেরে নিই আগে।"

ওরা সবাই মৃত্যুভয় কাটিয়ে যখন যাবার জন্য তৎপর হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে দুজন অশ্বারোহী এসে কানে কানে ফিস ফিস করে কী যেন বলল দুলারীবাঈকে।

দুলারীবাঈ আবার ভয়ঙ্করী মূর্তিতে জেগে উঠলেন। বন্দুকে আবার টোটা ভর্তি করে বললেন, "বিল্লুপ্রসাদ রাঠোর সিং-কা সাথ হাত মিলায়া? কাঁহা হ্যায় ও বদমাশ?"

"কালীকুয়াঁমে। লেকিন ম্যায়নে চানদ সিং, ভৈরোঁ সিংকো ভেজা উনকো মুকাবিলা করনে কে লিয়ে।"

"চলো, হাম ভি যা রহেঁ। যানে সে পহলে...।" বলে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

'তোদের ভয় পাবার কিছু নেই। তোরা ওই দূরের টিলাটা পার হয়ে আপারকোটে চলে যা। একদম সিধা রাস্তা। ইধার উধার ঘুমনা নেহি।''

শিলি বলল, ''মুঝে মালুম হ্যায়, মহাকাল গিরি তো ওঁহি পর।''

''তুই তো জানবিই। কেননা তুই ভালুকা তালুকের মেয়ে। ওইখানে গিয়ে তোরা নেমে যাবি লোয়ারকোটে। সেখানকার ডেরায় লাল সিং আছে। আমার নাম বললেই লাল সিং থাকতে দেবে তোদের। কিন্তু এইখানে আর তোরা ভুলেও থাকবি না। কেননা বিল্লুপ্রসাদ যদি কোনওরকমে একবার এখানে এসে পড়ে তা হলে তোদের সবাইকে শেষ করে দেবে। কিন্তু তোদের না পেলে ও বুঝে নেবে আমিই তোদের নিয়ে গেছি। কাল ভোরে সূর্য ওঠার আগেই আমি ফিরে আসব লোয়ারকোটে। তারপর তোদের দুজনের দুটি হাত এক করে দেব।''

দস্যুদের ভেতর থেকে একজন একটি মশাল ধরিয়ে ওদের হাতে দিয়ে বলল, ''তুরন্ত যাও। জলদি ভাগো।'' বলে ওরা ঘোড়া ছোটালো আর দুলারীবাঈ গাড়ি নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন।

মশালের আলোয় সতীয়া, গোরা, হাসি আর শিলির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। গোরা কখনও কোনও মেয়েকে অন্যভাবে চিন্তা করেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মনের মতো এই মেয়েটির সঙ্গে স্থায়ী একটা সম্পর্ক হতে চলেছে ভেবেই আনন্দে অধীর হয়ে উঠল সে। সত্যি, এইসময় মা বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তা হলে কী ভালই না হত। গোরার হঠাৎই মনে হল, জীবনটা বড়ই সুন্দর।

এগারো

দুলারীবাঈ ঠিকই বলেছেন আর এখানে থাকা ঠিক নয়। কেননা বিল্লুপ্রসাদ যখন ওঁরই সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে পড়েছেন তখন বনখণ্ডীর এই বাংলোর অধিকার উনি নেবেনই না। তবে ওর খোঁজে অথবা বীরুর খোঁজে একবার হয়তো এদিকে আসবেন। নাও আসতে পারেন তিনি। কিন্তু ওদের পক্ষে ওই ঘর আর নিরাপদ নয়।

মশালের আলোয় পথ দেখে ওরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল টিলা পাহাড়ের দিকে।

শিলির হাত থেকে মশালটা নিয়ে হাসি বলল, ''একবার একটু দাঁড়াও তোমরা। আমার একটা কাজ আমি সেরে আসি।'' বলে বাংলোর দিকে কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল একবার।

হাসিকে দেখেই ভেলু কুঁই কুঁই করে ছুটে এল বাংলো থেকে।

গোরাও ওকে অনেক আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, ''তুই আর একা একা এখানে থাকবি কেন? তুইও আয় আমাদের সঙ্গে। সবাই আমরা একসূত্রে গাঁথা মালার মতোই থাকি।''

আদর পেয়ে ভেলু তো লুটোপুটি করল গোরার পায়ে।

আর হাসি যা করল তা এক সর্বনাশা কাণ্ড। সে করল কি বাংলোর ভেতরে ঢুকে বেশ কয়েকটি জায়গায় মশালের আগুন দিয়ে অগ্নিকাণ্ড করে বেরিয়ে এল।

তারপর বলল, ''এই ঘরের সকল সুখের স্মৃতি অগ্নিদেবতাকেই উৎসর্গ করলাম। এখন আমি সম্পূর্ণ আসক্তিহীন।''

দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। আগুনের লেলিহান শিখায় অন্ধকার বনভূ
আলোকিত হয়ে উঠল।

গোরা বলল, "একদিকে ভালই হল। বিল্লুপ্রসাদ আমার খোঁজে এখানে এলে
ধরেই নেবে দুলারীবাঈ আমাকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করেছে। সেইসঙ্গে বীরুরও ওই এক
পরিণতি চিন্তা করে ওর ব্যাপারেও মাথা ঘামাবে না আর। শুধুমাত্র হিরেগুলোর শোকেই
পাগল হয়ে যাবে।"

"কিন্তু হিরেগুলো ও তো দুলারীবাঈকেই দিতে চেয়েছিল।"

"হিরের টোপ দিয়ে হয়তো মারতেও চেয়েছিল। দুলারীবাঈ বুঝতে পেরে
গহেরানালায় ফেলে দিয়েছে বীরুকে।"

"সে যা হবার হয়েছে। এখন চল আমরা লোয়ারকোটের দিকে যাই।"

সতীয়া বলল, "লোয়ারকোট-এ কেন যাব? আপারকোটেই থাকব আমরা। বাঈ ফি
এলে যা হবার হবে।"

"বাঈ কি এখনই ফিরবে ভেবেছ? সবে তো গেল। তাছাড়া লোয়ারকোটে আমাদে
রাতের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া অন্য কাজও আছে।"

"ওখানে আমাদের অন্য কী কাজ থাকতে পারে?"

"যেমন ধরো বন্দিনী ভানুমতিকে গুহার জঠর থেকে মুক্ত করা। আকাশগঙ্গা
ধারাকে যেখান থেকে অন্যপথে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই জায়গাটাকে চিনে রাখা। সম্ভ
হলে এখান থেকে রাতের অন্ধকারেই কেটে পড়া।"

সতীয়া চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "ওমা, সেকী! তা হলে আমাদের ব্যাপারটা?

গোরা বলল, "ও ব্যাপারটা কামতানাথের মন্দিরে গিয়ে আমরা নিজেরাও মিটি
নিতে পারি।"

ওরা আর একটুও দেরি না করে হনহনিয়ে চলল সেই লালপলাশের বন ছাড়ি
আপারকোটের দিকে। এদিকে জঙ্গল খুব ঘন। তারই সর্বোচ্চ চূড়ায় এক মহাকালের মূ
আছে। কবে কোন যুগে পাথর কুঁদে এই মূর্তিটি তৈরি করা হয়েছিল তা কে জানে? সে
মূর্তির কপালে যা লেখা আছে তার পাঠোদ্ধার আজও করতে পারেনি কেউ। ওরা এ
একে সেই মূর্তির সামনে এসে দাঁড়াল। গোরা অবাক চোখে অপলকে তাকিয়ে রইল সে
ললাট লিখনের দিকে। তারপর সবাই মিলে জঙ্গলের পথ এড়িয়ে ধীরে ধীরে নেমে এ
লোয়ারকোটে।

জায়গাটা সত্যই দুর্ভেদ্য। জানা না থাকলে সচরাচর এখানে হঠাৎ করে অচেনা কার
এসে পড়বার কথাই নয়।

ওদের দেখে দুজন ভীষণদর্শন লোক এগিয়ে এল ওদের দিকে।

একজন কঠিন গলায় বলল, "তুম সব ইধার কিঁউ আয়া?"

সতীযা বলল, "বাঈ নে ভেজা।"

গোরা বলল, "লাল সিং কে আছে?"

অপর লোকটি বলল, "ম্যায় হুঁ। আইয়ে মেরে সাথ।" বলে তাকে অনুসরণ কর
বলল।

একটি পাহাড়ের বড় বড় কয়েকটি গাছের গুঁড়িকে অবলম্বন করে ছোট্ট এক

বাংলোর মতো চালাঘর আছে এক জায়গায়। খুব একটা উন্নতমানের না হলেও বসবাসের উপযুক্ত। পাহাড়ের যে অংশটায় বাংলোটা সেখানে একটা গুহাও আছে। গুহাটা বাংলোয় না ঢুকলে নজরে পড়বে না কারও। অর্থাৎ কিনা গুহাটাকে আড়াল করেই গড়ে উঠেছে পাহাড়ি বাংলোটা। চিত্রকূটের বিন্ধ্যারণ্যে এলে বাঈ এখানেই থাকেন। আর ওঁকে পাহারা দেয় লাল সিং ও অন্যেরা। এই গুহারই জঠরে বন্দিনী হয়ে আছে সুন্দরী ভানুমতী।

রাত এখন কত তা কারও খেয়াল নেই। তবে এখন যে শেষ রাত তা বোঝাই যাচ্ছে। যাই হোক, লাল সিং ও তার সঙ্গী ওদের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে পাহারায় রইল। ঘরের মধ্যে বাতির আলো জ্বলছে। গুহাটা ছায়ান্ধকার। কিন্তু গুহার মুখটা লোহার গ্রিল দিয়ে আটকানো এবং তালা দেওয়া।

ওরা পা টিপে টিপে সেই গ্রিল গেটের কাছে গেল। গিয়ে দেখল এক অসামান্যা সুন্দরী পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কারও দিকে তাকাচ্ছে না একবারও।

সতীয়া চাপা গলায় ডাকল, "ভানুমতী!"

এতক্ষণে কান্না ভুলে চোখ মেলে তাকাল ভানুমতী। বলল, "কৌন?"

সতীয়া ঠোঁটের কাছে তর্জনি রেখে বলল, "রো না মাৎ। হাম সব দুশমন নেহি। তুমকো ছোড়ানো আয়া।"

"লেকিন ক্যায়সে।"

"জ্যায়সে হি হোক। চাবি কিসিকা পাস?"

ভানুমতী দেখিয়ে দিল চাবি কোথায় আছে। একটা কাঠের খুঁটিতে পেরেকে ঝোলানো আছে চাবিটা।

গোরা দেখতে পেয়েই চাবি নিয়ে তালা খুলে সর্বাগ্রে মুক্ত করল ভানুমতীকে।

এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ভানুমতী। বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েই সকলকে জড়িয়ে ধরে বলল "আজ মেরি সাদী কী রাত থা। লেকিন ইয়ে লোক সবকুছ বরবাদ কর দিয়া আপনকো।"

ভানুমতী সুন্দরী। বুন্দেলখণ্ডের মেয়ে। একেই সাদা পায়রার মতো তার গায়ের রঙ। তার ওপরে বিয়ের কনের সাজে সজ্জিতা ছিল বলে তাকে দারুণ দেখতে লাগছিল।

সতীয়া বলল, "তুমহারি বারে মে সব কুছ বতায়া বাঈ নে। তুম ঘাবড়াও মাত। হাম সব এক সাথ ভাগেঙ্গে হিঁয়া সে।"

"হাম কাঁহা হ্যায়?"

"ইয়ে হ্যায় বিন্ধ্যারণ্য। চিত্রকূট কা বনখণ্ডী। লোয়ারকোট। আভি ইয়ে সবকো খেল খতম হোনেবালে হ্যায়।"

হাসি বলল, "এই একটা সত্যিকারের ভাল কাজ হল। এখন কঠিন কাজ যেটা, সেটা হল এদের নজর এড়িয়ে পালাব কী করে? ওই ভয়ঙ্কর দুজনকে ঘায়েল না করে তো পালানো যাবে না।"

সতীয়া বলল,"ধরো কোনও একটা উপায় বের করে পালিয়েই না হয় গেলাম। কিন্তু বাঈ ফিরে এসে যখন দেখবেন আমরা নেই তখন কী ভাববেন বল তো?"

গোরা বলল, "অথচ উপায়ও নেই। কেননা উনি আমাদের প্রতি সদয় থাকলেও

ভানুমতীকে তো ছাড়বেন না। এই মুহূর্তে ওকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে না পারলে ও
জীবন শেষ হয়ে যাবে। অতএব ওর সম্ভ্রম রক্ষা করাটাই এখন আমাদের পবিত্র কর্তব্য।"

এমন সময় হঠাৎই পর পর কয়েকটি বন্দুকের গুলিতে চমকে উঠল এই পার্বত্য এলাকাটা।

সেইসঙ্গে শোনা গেল বহু মানুষের সুতীব্র কোলাহল।

শিলি বলল, "ভালুকা তালুক জাগ উঠা।"

হাসি বলল, "কিন্তু বন্দুকের গুলির আওয়াজ ভেসে এল কোথা থেকে? ভালুক তালুকের লোকেদের হাতে তো বন্দুক নেই।"

গোরা বলল, "তবে কি বিল্লুপ্রসাদের লোকেদের সঙ্গে কোনও জোরদার গোলমাল বেঁধে গেল দুলারীবাঈয়ের?"

সতীয়া বলল, "মনে হয় তাই।"

আবার—আবার গুলির শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক।

লাল সিং আর ওর সঙ্গী ছুটে এল বাংলোর দিকে।

ওদের আসতে দেখেই অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ভানুমতী।

লাল সিং কোনওদিকে না তাকিয়ে গোরাকে বলল, "খোকাবাবু, তুমি কি বেঙ্গলি আছে?"

"হ্যাঁ। আমি বাঙালি।"

"তো শুনো, হামারা বহুৎ বড়া দুশমন রাঠোর সিং আয়া, উনকো মুকাবিলা করনা পড়েগা। উয়ো লোগ অচানক আ গিয়া হিঁয়া পর। তা সে যাই হোক। এই বাংলোর পিছনদিকে একটা পথ আছে। ওই পথ ধরে খানিকটা নীচে নামলেই আকাশগঙ্গা দেখতে পাবে। হাম দোনো কো কুছ হো যায়েগা তো তুমি সব ওইদিক দিয়ে নিকাল যাবে। ওই রাঠোর সিং ইনসান নেহি, জানোয়ার আছে জানোয়ার।"

ওরা চলে গেলে সতীয়া বলল, "ভালই হল। পথের সন্ধান যখন পাওয়া গেল তখন আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। অন্ধকার থাকতে থাকতেই আমরা পালাই চল।"

ভানুমতী তো পালাতে পারলেই বাঁচে। বলল, "হাঁ হাঁ, জলদি চলো। ও বাঈ আয়েগা তো মার ডালে গা মুঝে।"

অগত্যা ওরা পেছনের দরজা দিয়েই পালাবার চেষ্টা করল।

ওদের টেবিলে একটা টর্চ ছিল। সতীয়া সেই টর্চটা নিয়ে গোরার হাতে দিয়ে বলল, "এরই আলোয় পথ দেখিয়ে তুমি আমাদের নিয়ে চল।"

গোরা তাই করল। টর্চের আলোয় পথ দেখে চলতে শুরু করল সকলকে নিয়ে।

শিলি হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "ইধার সে যানা তো ঠিক নেহি।"

সতীয়া বলল, "কিঁউ?"

"তেজি জানবার হ্যায ইধার।"

গোরা বলল, "তবুও যেতে হবে।" বলেই বলল, "তাই তো এতক্ষণ আসছি আমরা, ভেলু কই? তাকে দেখছি না কেন?"

সতীয়া বলল, "রহস্যময় ব্যাপার। আমরা লাল সিং-এর বাংলোয় যাওয়ার সময় থেকেই তার দিকে নজর দিতে পারিনি।"

হাসি বলল, "ও কিন্তু মহাকালের ওই পাষাণ-মূর্তির কাছ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিল। তারপর থেকেই আর দেখছি না।"

গোরা বলল, "আমাদের অসতর্কতায় বাঘে ধরেনি তো ওকে?"

সতীয়া বলল, "হয়তো।"

গোরা বলল, "না না। ও বেচারিকে এখানে একা ফেলে রেখে আমাদের চলে যাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না। তোমরা এখানে একটু বসো। আমি চট করে একবার বাংলোটা দেখে আসি।"

সতীয়া বলল, "ওই ভুলটি খবরদার কোরো না। এখানে কখনও এইভাবে সময় নষ্ট করে?"

হাসি বলল. "এতটা পথ এসে আর ফিরে যাওয়াটা সত্যিই ঠিক নয়। ও মনে হয় মহাকালেই রয়ে গেছে।"

"কিন্তু ওর না আসার কারণ?"

হাসি বলল, "মনে হয় ও বন্দুক দেখলে ভয় পায়। তাই লাল সিং ও তার সঙ্গীর কাঁধে বন্দুক দেখেই ভয়ে এগোয়নি ও।"

এমন সময় বাংলোর দিক থেকে পর পর দুটো গুলির শব্দ ও সুতীব্র আর্তনাদ ভেসে আসতেই ওরা বুঝতে পারল লাল সিং ও তার সঙ্গীর ভবলীলা শেষ হল।

হাসি বলল, "ভাগ্যে সময় থাকতে আমরা পালিয়ে এসেছিলাম, না হলে সবাই মরতাম একসঙ্গে।"

গোরা বলল, "লাল সিং বুঝতে পেরেছিল ওদের অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে। তাই সময় থাকতেই সাবধান করে দিয়েছিল আমাদের। এখন আমার মনে হয় ওদের শেষ পরিণতিটা একবার দেখে আসা ভাল। সেইসঙ্গে এই জঙ্গলের পথে চলার জন্য বন্দুক দুটোও নিয়ে আসার দরকার।"

হাসি হেসে গড়িয়ে বলল, "বন্দুক নিয়েই বা লাভ কী? চালাতে পারবে?"

"চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?"

বাংলো থেকে অনেকটা দূরেই চলে এসেছিল ওরা। তাই গোরা ওদের সবাইকে ওইখানেই অপেক্ষা করতে বলে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলল বাংলোর দিকে।

ধূর্ত বেড়ালের মতো বাংলোর কাছে এসেই বিপদের আশংকায় থমকে দাঁড়াল। মনে হল বাংলোর ঘরে কারা যেন পৈশাচিক উল্লাস করছে। ও পেছনের যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সেই দরজার কাছে এসে মৃদু একটু চাপ দিতেই দেখল চারজন দুর্ধর্ষ দস্যু ঘরে বসে নেশা করছে। তাদের একজন বুঝি সর্দার। আর দুলারীবাঈ একটি খুঁটির সঙ্গে হাত পা বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন স্থির হয়ে। ওঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে দর দর করে।

এই অবস্থায় কী যে করা উচিত গোরা তা ভেবে পেল না। তবুও সে বাইরের দিক থেকে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে পা টিপে টিপে সামনের দিকে এল। দেখল একটা গাছের ডালে জ্বলন্ত মশাল বেঁধে একজন দস্যু বন্দুক কাঁধে টহলদারি করছে। অদূরেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছে লাল সিং ও তার অপর সঙ্গী, যার নাম ও জানে না।

এই মুহূর্তে কী যে করবে গোরা তা ভেবে পেল না। কোনওরকমে এই লোকটিকে ঘায়েল করতে না পারলে বাংলোর ভেতরে ঢোকা অসম্ভব। বাংলোয় যারা আছে তারা

নেশা করতে করতে বেসামাল হয়ে পড়বে। অতএব ওদের কব্জা করতে একটুও দেরি হবে না ওর।

হঠাৎই এক জায়গায় একটা কুড়ুল দেখতে পেয়েই আশার আলোয় বুক ভরে উঠল। এক হাতে টর্চ ও অন্য হাতে কুড়ুল নিয়ে অন্ধকারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েই অনেকটা কাছাকাছি এল ওদের। তারপর টর্চটাকে পকেটে নিয়ে ও দুহাতে কুড়ুলটাকে শক্ত করে ধরে সুযোগের অপেক্ষায় রইল। লোকটা দারুণ ট্রেনিংপ্রাপ্ত। একেবারে মিলিটারি কায়দায় ঘোরাফেরা করছে। আর সর্তক দৃষ্টি রাখছে চারদিকে।

হঠাৎই লোকটি লাল সিং-এর ওপরে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখবার চেষ্টা করতেই অন্ধকারের আড়াল থেকে গোরা লাফিয়ে পড়ে ওর ঘাড়ের ওপর কুড়ুলের বাড়ি বসিয়ে দিল এক কোপ। লোকটি তীব্র আর্তনাদ করে মাটি ও পাথরের বুকে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল মৃত্যু যন্ত্রণায়।
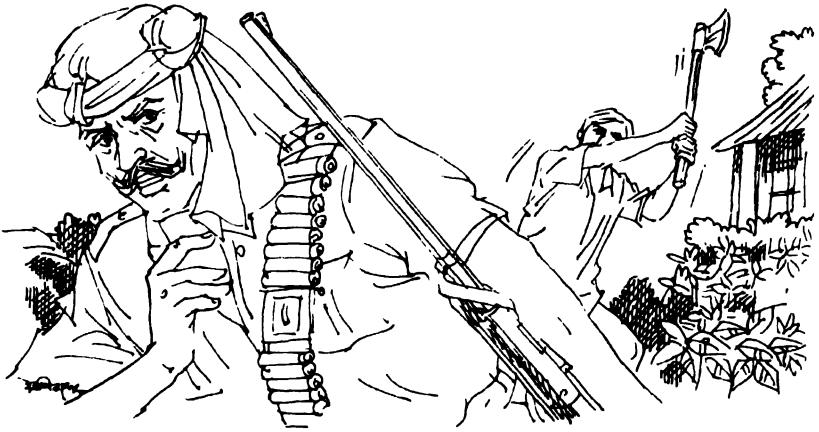
ওর ওই অবস্থা দেখে ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল গোরা। কেননা দস্যুর এই অন্তিম পরিমতি ও-ই ঘটিয়েছে। যে জীবন ওর নিজের দান করবার ক্ষমতা নেই সেই জীবন ওকেই হরণ করতে হল। সত্যি, পরিস্থিতি মানুষকে কী না করে দেয়। চোখের সামনে এরকম মৃত্যুও দুবার দেখল। এক দেখল গহেরানালায় বীরুর পতন, আর এই।

গোরা লোকটির কাঁধের বন্দুক নিয়ে সেটিকে ওর বুকের কাছে ধরে ট্রিগারে একবার চাপ দিল।

বন্দুকের গুলির শব্দে কেঁপে উঠল রাতের নিস্তব্ধতা।

গুলি করেই ও ছিটকে যাচ্ছিল। হঠাৎই পেছনদিক থেকে ছুটে এসে ওকে আঁকড়ে ধরল কে যেন।

গোরা সবিস্ময়ে বলল, "কে?"

"ম্যায় হুঁ। ভানুমতী।"

"ভানুমতী! তুমি এখানে কী করে এলে?"

কথা বলবে কি ভানুমতী তখন থর থর করে কাঁপছে। তবুও বহুকষ্টে কোনওরকমে

বলল, "তুমি তো চলে এলে। আমরা সবাই তোমার ফিরে আসার জন্য ইন্তেজার করতে লাগলাম। এমন সময় হঠাৎই চার পাঁচ জন ডাকু এসে অচানক ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর। আমি অন্ধকারে একটা বড় পাথরের আড়ালে ছুপাকে রাখলাম নিজেকে। ওরা আমাদের তিনজনকেই উঠিয়ে নিল। ওদের কথা শুনে আমার মালুম হল কি ওরা বিল্লুপ্রসাদকা আদমি।"

আতঙ্কিত গোরা বলল, "এইটুকু সময়ের মধ্যে এমন কাণ্ড হয়ে গেল?"

"হাঁ। কুছ করনেকা ভি মওকা নেহী মিলা। আমার তো ডর লেগে গেল। ও লোগ নিকাল যানে কা বাদ আমি ছুপকে ছুপকে এইখানে এসে ওই ঘরের শিকল খুলেই দেখি দু'তিনজন ডাকু বসে আছে ঘরের ভেতর। আর দুলারীবাঈ—।"

"তুমি কি শিকল খুলে দিয়ে এসেছ ঘরের?"

"ম্যায় ক্যা কিয়া, নেহি কিয়া, কুছ মালুম নেহি মুঝে।"

"সর্বনাশ করেছ। বন্দি পাখিরা উড়ে গেল বুঝি। চলো তো দেখি।"

গোরা যা ভেবেছে তাই। অর্থাৎ সবাই পালিয়েছে ওরা। আসলে গোরার বন্দুকের গুলির শব্দ শুনেই ভয় পেয়েছে। তাই বহিরাগত অন্য কোনও শত্রুর আশংকা করেই মত্ত অবস্থায় লড়তে পারবে না বুঝে দরজা খোলা পেয়ে কেটে পড়েছে। ঘরে যে চারজন ছিল তাদেব একজন যে রাঠোর সিং তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ভানুমতী গোরার একটা হাত শক্ত করে ধরে বলল, "তুমি আমাকে জলদি জলদি এখান থেকে নিয়ে চলো। না হলে এই দুলারী নাগিন আমাকে মার ডালবে।"

গোরা বলল, "বাঈ এখন আর কিচ্ছু করবে না তোমার। ওর খেলা শেষ।" বলে ভানুমতীকে আড়ালে রেখে ঘরের ভেতরে ঢুকে সর্বাগ্রে বন্ধনমুক্ত করল বাঈ-এর।

বাঈ সস্নেহে গোরাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, "শেষকালে তুই আমার জীবন রক্ষা করলি? কিন্তু তোর হাতে বন্দুক কেন? তুই কি বন্দুক চালাতে পারিস?"

গোরা বলল, "না। ওদেরই একজনের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছি। নিয়ে শেষও করেছি তাকে।"

"সাবাস বেটা। দুলারীবাঈ-এর সালাম নে তুই। আমার বন্দুকটা ওরা কেড়ে নিয়েছে, এটা তুই-ই রাখ। পারলে লাল সিং-এর বন্দুকটা আমাকে এনে দে। ওই রাঠোর সিংকে আমি ছাড়ব না।"

গোরা তক্ষুনি লাল সিং-এর বন্দুকটা এনে দিল। সেটা হাতে নিয়ে বেশ ভালভাবে একবার পরীক্ষা করে বলল, "ওরা তো এইদিক দিয়েই গেছে। এদিকের পথ বহুতই টেরা। তাই বেশিদূর যেতে পারবে না ওরা। কেননা ওরা খুবই বেসামাল আছে।"

গোরা বলল, "আপনার সঙ্গের ওরা সব কোথায়?"

"ওরা গেছে বিল্লুপ্রসাদের ডেরায়।"

"কিন্তু বিল্লুপ্রসাদ তো এখানে। মনে হয় রাঠোর সিং-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েই এখানে এসেছিল। সতীয়াকে ওরা উঠিয়ে নিয়ে গেছে। নিয়ে গেছে হাসি আর শিলিকেও।"

চিৎকার করে উঠলেন দুলারীবাঈ, "ইয়ে কভি নেহী হো সকতা।"

"তাই তো হয়েছে।"

"ঠিক আছে তুম ইঁয়া হি ঠারো।" বলেই ঝড়েব গতিতে এগিয়ে চললেন বাঈ হিংস্র

চিতা বাঘিনীর মতো। দুলারীবাঈ-এর চোখ অন্ধকারেও শ্বাপদের মতো জ্বলে।

বাঈ চলে গেলে অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ভানুমতী।

গোরা বলল, "উঃ কী ভয়ঙ্কর এই রাত।"

ভানুমতী বলল, "মেরে বারেমে কুছ সোচা?"

"শুধু তোমার ব্যাপারে কেন, নিজের ব্যাপারেও চিন্তা করছি। এই কালরাত্রির শেষ যে কেন হচ্ছে না তা ভেবে পাচ্ছি না।"

"আজ মেরে সাদি কে রাত থে।"

"সে তো আমাদেরও ছিল। কিন্তু বাদ সাধল দুষ্টগ্রহ।"

ভানুমতী বলল, "তোমার নাম কী আছে? গোরা?"

"হ্যাঁ, গোরাচাঁদ।"

"তা গোরাবাবু, তুমি এখনও কেন এইখানে সময় নষ্ট করছ? এখনই চলে চল?"

"সময় নষ্ট করব কেন? আমি শুধু ভাবছি পালাবার পথ কোনদিকে। কোনদিক দিয়ে গেলে সুবিধে হবে। একবার চিত্রকূটে গিয়ে পৌঁছতে পারলে আর এখানে থাকা নয়।"

হঠাৎই দূরে পরপর কয়েকটা গুলির আওয়াজ ও আর্তনাদে আতঙ্কিত হয়ে উঠল জায়গাটা।

গোরা ওর সেই কুড়ুলটা নিয়ে এসে ভানুমতীর হাতে দিয়ে বলল, "এটা তুমি সঙ্গে রাখো। আমার হাতে তো বন্দুক আছেই। এখন চলো বাঈ-এর পাশে গিয়ে একটু দাঁড়াই আমরা। তাছাড়া সতীয়া, হাসি, শিলি ওদের তো এই পথেই নিয়ে গেছে বিল্লুপ্রসাদের লোকেরা। ওদেরও তো উদ্ধার করা দরকার।"

ভানুমতী দারুণ ভয় পেয়ে বলল, "আমি তোমার গোর পাকড়ছি গোরাবাবু। অ্যায়সা বুরবাকি মাৎ করনা। ও বাঈ হামকো মার ডালে গা।"

গোরা বলল, "তুমি আমার ওপর ভরসা রাখো ভানুমতী। ও যদি সেইরকম কিছু সত্যিই করে তা হলে ওর খেল আমিই খতম করে দেব। তোমার মতো এমন একটি প্রস্ফুটিত ফুলকে কখনই আমি অকালে ঝরে যেতে দেব না।" বলে গোরা-ই ওর একটা হাত ধরে টান দিল, "এসো তুমি আমার সঙ্গে।"

অগত্যা গোরাকেই অনুসরণ করল ভানুমতী। ভয়ে যদিও বুকের ভেতরটা কাঁপছিল ওর, তবুও যেতে বাধ্য হল।

খানিক যাওয়ার পরই ওরা দেখল এক জায়গায় একটি বড় পাথরের ওপর লুটিয়ে আছে সেই দস্যুসর্দার। আর গুলি খাওয়া বাঘিনীর মতো হিংস্র হয়ে তর্জন করছেন দুলারীবাঈ। গুলি তাঁরও লেগেছে। তাই যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন তিনি। গোরাকে দেখেই বললেন, "আমার শত্রুর শেষ আমি রাখি না। ওই দ্যাখ রাঠোর সিং-এর কী করেছি আমি। ও আর আমার সঙ্গে দুশমনি করতে আসবে না। কোনও দিনও না। তোরা আর থাকিস না এখানে। তবে আমার শেষ ইচ্ছেটা পূর্ণ করিস। সতীয়াকে সাদী করে নিস তুই। ও বড় ভাল মেয়ে। আর শোন আমার ওই হিরেগুলোকে যত্নে রাখিস। মহাকালকে বলিস দুলারীবাঈকে যেন ক্ষমা করে।" তারপর একটু থেমে বললেন, "আমাকে একটু আকাশগঙ্গার জল এনে দিবি রে?"

গোরা বলল, "হ্যাঁ দেব, নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু আকাশগঙ্গা কোথায়?"

"একটু নীচের দিকে নামতে হবে।" বলে বললেন, "কিন্তু আনবি কী করে?"

"সে আমি যেভাবেই হোক নিয়ে আসব।" বলে রাঠোর সিং-এর ব্যাগ থেকে একটা বোতল বের করে এগিয়ে চলল আকাশগঙ্গার জল আনতে।

ভানুমতীও চলল ওর সঙ্গ নিয়ে। দুলারীবাঈ ওকে দেখেও দেখল না অথবা চিনতে পারল না বোধহয়। তাই ভাবল কে না কে।

ওরা দুজনে অন্ধকার হাতড়ে একটা ঝরনার কল কল শব্দ শুনে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। ভানুমতী ওর সঙ্গ নিলেও বেশ শক্ত করেই ধরেছিল ওর হাত। হঠাৎই এক জায়গায় অন্ধকারে পা ফসকে হড়কে গেল একটা ঢালের গায়ে। ঝুরো মাটি, পাথর আর লতা গুল্ম ইত্যাদির ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে অনেক-অনেক নীচে গিয়ে পড়ল দুজনেই। সে জায়গাটা আরও আবিল অন্ধকারে ঢাকা। গোরা ভানুমতী দুজনেই প্রাণান্ত চিৎকার করে উঠল। কিন্তু কে-ই বা শুনবে ওদের আর্তনাদ? অদূরে আকাশগঙ্গার কলকল ধ্বনিতে চিৎকার ওদের ঢাকা পড়ে গেল। চোখের সামনে আরও বেশি অন্ধকার দেখল দুজনেই।

দারুণ আঘাত পেয়ে দুজনেই জ্ঞান হারাল।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার পর একটু একটু করে চেতনাকে ফিরে পেল গোরা। মাথাটা কেমন ভারি হয়ে আছে। কেটে ছিঁড়ে ছড়ে যাওয়ায় সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে যেন। আর কী দারুণ ব্যথা। প্রথমে ও কিছুতেই মনে করতে পারল না ও কোথায়। পরক্ষণেই এক এক করে মনে পড়ল সব।

ভানুমতীর জ্ঞান তখনও ফেরেনি। ওর মাথা ও একটা হাত গোরার বুকের ওপর রাখা ছিল। ও বহুকষ্টে সেই মাথা ও হাত নামিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসল। তারপর পাথরের খাঁজ ধরে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াতেই বুঝতে পারল পাহাড়ের একটি খাদের মতো গর্তে এসে পড়েছে ওরা। ভাগ্যে ধসের ঢালে হড়কে পড়েছে, না হলে সরাসরি মুখ থুবড়ে পড়লে মৃত্যু ওদের অনিবার্য ছিল।

গোরা ভানুমতীকে চিৎ করে শুইয়ে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ভালভাবে তাকিয়ে থেকে বুঝল এখনও জ্ঞান ফেরেনি ওর। তবে এখনো শ্বাস প্রশ্বাস বইছে। এই অবস্থায় ওকে নিয়ে কী যে করবে ও তা ভেবে পেল না।

এবার এখান থেকে কীভাবে বাইরের জগতে পৌঁছনো যায় তাই দেখতে লাগল গোরা এদিক ওদিক ঘুরে। কিন্তু না কোনওভাবেই ওপরে ওঠার কোনও পথ পেল না। এমনই মারাত্মক ঢাল চারদিকে যে উঠতে গেলেই হড়কে পড়ে যাবে। তবুও এক পা, এক পা করে সামনের দিকে এগিয়ে চলল গোরা। কিছুটা পথ যাবার পরই দেখতে পেল একটি ঝরনার ধারা সেই গর্তের একপাশে জমে পাশেরই নিচু জায়গাটা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু সে জায়গাটাও এমনই খাড়াই ও পিচ্ছিল যে সেখান দিয়েও পালানোর কোনও পথ নেই।

গোরা প্রথমেই সেই ঝরনার কাছে গিয়ে চোখে মুখে জল দিল। আকণ্ঠ ভরে পান করল কিছু। তারপর অঞ্জলি ভরে সেই জল খানিকটা নিয়ে এল ভানুমতীর জন্য। ভানুমতীর চোখে মুখে সেই জলের তরতরা দিয়ে আস্তে করে ডাকল, "ভানুমতী!"

ভানুমতী একটা জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর উঠে বসল একটু একটু করে।

কাল রাতের অন্ধকারে ভানুমতীর যে রূপ দেখেছিল গোরা এখন দেখল তা যেন আরও অপরূপ। যেমনই গায়ের রঙ, তেমনই চোখমুখের গড়ন। পরনে বিয়ের কনের লাল

বেনারসী। গা ভর্তি সোনার গয়না। কপালে অলকাতিলকা আঁকা। কী মিষ্টি।

গোরা বলল, "এখন কীরকম মনে করছ?"

ভানুমতীর কান্না এল। ও কোনওরকমে দুটো হাত তুলে ধরল গোরার দিকে।

গোরা ওর হাত ধরে তুলে বসাল ওকে।

ওকে দেখলে সত্যিই কষ্ট হয়। বিত্তবান সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী মেয়ে। কত ঘট করে বিয়ে হচ্ছিল বেচারির। আজকের এই সকালে ও কোথায় স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরাল যাবে, তার জায়গায় সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এক কিশোরের সঙ্গে ওকে একটি পার্বত গাড্ডায় চেতনাহীন হয়ে রাত্রিবাস করতে হল। এরই নাম বিধিলিপি।

ভানুমতী অতি কষ্টে বলল, "হিঁয়াসে নিকালনে কা রাস্তা?"

"কোনও রাস্তা নেই। তবুও আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।"

"পানি কাঁহাসে মিলা?"

"ওই ওধারে। আকাশগঙ্গার ধারা থেকেই নিয়ে এসেছি।"

ভানুমতী পাথরের দেওয়াল ধরে নিজেই উঠে দাঁড়াল এবার। ওরও সর্বাঙ্গ কে ছড়ে গেছে। কপালের বাঁদিকটা কেটে রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেছে। ভানুমতী গোরা দিকে আর একবার ভাল করে তাকিয়ে বলল, "তোমার চোট খুব জায়দা হয়েছে না?"

"তা হয়েছে। তুমিও তো কম চোট পাওনি। তবে ভাগ্য ভাল যে আমরা ওপর থে একেবারেই মুখ থুবড়ে পড়িনি।"

ভানুমতী গোরার কাঁধে ভর করে কোনওরকমে টলতে টলতে ঝরনার দিকে এগি চলল।

ঝরনার কাছে গিয়ে নিজেই আঁজলা ভরে জল নিয়ে চোখে মুখে ঝাপটা দিয়ে বল "ওই নাগিন দুলারীবাঈ-এর জন্যে আমার জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল। আমার সাদী হ না। শ্বশুরাল যাওয়া হল না এ জীবনে। হবেও না আর।"

গোরা বলল, "কেন হবে না কেন?"

"সাদী কি রাতে ডাকু যে লেড়কিকে উঠাকে লে যায় তার কি কখনও সাদী হয়?

"হয় না বুঝি?"

"কে তাকে সাদী করবে? তুমি করবে?"

গোরা বলল, "আমার কথা ছাড়ো। সতীয়াকে যদি ফিরে পাই তবে ওকেই সাদী কর আমি।"

"সে কী! তোমার মনে কোনও অন্যরকম কিছু হবে না?"

"না। কেন হবে? অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট।"

"তোমরা বাঙালিরা কত ভাল। আমাদের সমাজে ওইরকম কিন্তু হয় না। তবে আ ঠিক করেছি আমার সবকিছু যখন প্রথম দিনেই বরবাদ হয়ে গেল তখন আর আমি সা উদি কুছু করব না। লিখাপড়া নিয়ে থাকব। কাজ কাম করব।"

"তুমি পড়াশোনা করো?"

"গোয়ালিয়রের কলেজে বি.কম. পার্ট ওয়ান পড়ছি আমি। হঠাৎই সাদীর যোগাযো একটা হয়ে গেল, তাই বাবা মা আমার সাদীর জন্য তৈরি হলেন। আমার যিনি হাসবে হতেন উনি এয়ারফোর্সে আছেন।"

এরপর আর কোনও কথা নয়। ওরা এখান থেকে বেরোবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু না। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এমনই যে নামাওঠার কোনও পথই খোলা নেই। ঝরনা বা আকাশগঙ্গার জলও যেদিকে গড়িয়ে যাচ্ছে সেদিকেও বড় বড় পাথরের আড়ালে গভীর খাদ!

দেখতে দেখতে সূর্য উঠল। সোনালি আলোয় ভরে গেল চারদিক। এখানেও গর্তের গভীরতায় অজস্র বুনো ঝোপঝাড়ে রোদের সোনা লুটিয়ে পড়ল।

হঠাৎই বহু মানুষের কলরব শোনা গেল চারদিক থেকে।

ভানুমতী গোরার একটা হাত ধরে টান দিয়েই লুকিয়ে পড়ল একটা ঝোপের আড়ালে।

গোরা বলল, "কী ব্যাপার! এত ভয় পেলে কেন?"

"বাহার মে ডাকু হ্যায়। ও হাম দোনোকো মার ডালেগা।"

"কোথায় ডাকু? ডাকু নয়। ডাকুরা কি দিনের বেলা দল বেঁধে বেরোয়? নিশ্চয়ই অন্য কেউ।"

এমন সময় সতীয়ার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "গোরা! গো-রা-চা-ন-দ।"

গোরা সেই ডাক শুনতে পেয়েই হাঁক দিল, "আমরা এ-খা-নে-এ-। সতীয়া—।"

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল ওরা।

গোরা তখন ভানুমতীকে নিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ওরা সবাই ওদের অবস্থা দেখে কীভাবে যে ওদের ওখান থেকে উদ্ধার করা যায় তাই ভাবতে লাগল। হাসি শিলি ওদের অপেক্ষা করতে বলে কিছু সময়ের মধ্যেই একটি শক্তপোক্ত চীহড়লতাকে টেনে এনে ঝুলিয়ে দিল ওদের দিকে।

ওরা বহুকষ্টে সেই শক্ত লতার রজ্জু ধরে কোনওরকমে ওপরে উঠল।

গোরা বলল, "শুনলাম তোমাদের তিনজনকেই বিল্লুপ্রসাদের লোকেরা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।"

সতীয়া বলল, "ভাগ্য জোরে বেঁচে গেছি।"

"কী করে কী হল তবু শুনি?"

"ভালুকা তালুকের লোকেরাই আমাদের রক্ষা করেছে। ওই দ্যাখো, ওরা সব আসছে। ভেল্লুও আছে ওদের সঙ্গে। বিল্লুপ্রসাদের লোকেরা যখন আমাদের নিয়ে পালাচ্ছিল তখনই আমাদের চেঁচামেচিতে ছুটে এল ওরা। আসলে আমরা বনখণ্ডীর সেই বাংলোয় যে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে এসেছি তারই লেলিহান শিখা দেখে জেগে উঠেছিল ওরা। সবাই জানত শিলি আমাদের কাছেই আছে। তাই শিলির খোঁজেই আরও বেশি করে তৈরি হয়ে এসেছিল। কিন্তু ওইরকম অবস্থা দেখে ওরা এমনই মারমুখী হয়ে ওঠে যে ওরা ঠিকই করেছিল পুরো জঙ্গলের অধিকার ওরাই নিয়ে নেবে। সামনে যাকে পাবে তাকেই মারবে। বিল্লুপ্রসাদ ও রাঠোর সিং-এর কয়েকজন লোককে ওরা তীরবিদ্ধ করে মেরেছে। বিল্লুপ্রসাদ বন্দি হয়েছেন ওদের হাতে। মহাকালের মূর্তির সামনে একটি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে আহত অবস্থায় বাঁধা আছেন। রাঠোর সিং-এর মরদেহও উদ্ধার করেছে ওরা।"

গোরা বলল, "আর দুলারীবাঈ? তিনি কোথায়?"

"ওঁর ব্যাপারে কিছুই বলতে পারব না। উনি তো নেই।"

"রাঠোর সিং-এর গুলিতে জখম হয়ে উনি আমাদের কাছে জল চেয়েছিলেন একটু
সেই জল আনতে গিয়েই এই বিপত্তি। দুজনেই পা হড়কে গাড্ডায় পড়ে যাই।"

সতীয়া চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "ও মাই গড। আমরা ভাবছিলাম ডাকাতরা বোধ হয় তোমাদেরকে ফেলে দিয়েছে ওই গর্তের মধ্যে। অথবা প্রাণের ভয়ে তোমর নিজেরাই লুকিয়েছ ওখানে। কী ভাগ্যিস পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙেনি।"

হাসি আর শিলি এসে দুদিক থেকে গোরার দুটো হাত ধরল। সতীয়া পরমাদরে টে নিল ভানুমতীকে।

গোরা বলল, "এখন তা হলে আমরা কোথায় যাব?"

হাসি বলল, "মহাকালের দরবারে। ভালুকা তালুকের সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষ করছে সেখানে। এই দ্যাখো কত লোক এখানেও আছে। আমাদের সঙ্গ নিয়ে এসেছে।"

"কিন্তু কেন?"

"ওমা! তা বুঝি জানো না, তুমি তো সেই লোক। ওদের অন্ধ বিশ্বাস, তুমিই সে লোক না হলে তুমি এখানে আসামাত্রই বনখণ্ডীতে এমন বিপর্যয় ঘটত না। এইবার তোমার পরীক্ষা।"

ওরা সবাই ধীরে ধীরে অরণ্য ও চড়াই পথ পার হয়ে আপারকোটে মহাকালে দরবারে গিয়ে হাজির হল। পাহাড়ের মাথায় বড় একটি পাথরকে কুঁদে বিশালায়তন এ শিবমূর্তি কে যে কবে নির্মাণ করেছে তা কেউ জানে না। সেখানে না আছে মন্দির না আ অন্য কোনও কিছু। শুধু অনবদ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে চারদিক ভরে আছে। আর সে মহাকালের দরবারে একটি পিপুলগাছের গুঁড়িতে বাঁধা আছেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিল্লুপ্রসাদ। তাঁ রক্তচক্ষুর দিকে তাকিয়ে ভয়ে বুক কেঁপে উঠল গোরার।

নিষাদরা গোরাকে দেখে দেবতাজ্ঞানে সমাদর করল।

এতখানি পথ খাড়াই হেঁটে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে মূর্তির বেদীর কাছে ধপ করে বসে পড় গোরা। মূর্তিটা পূর্ণাঙ্গ নয়। শুধু বুক থেকে মুখ পর্যন্ত। এবং সুবিশাল।

ওকে ঘিরে তখন নারীপুরুষের সে কী ভিড়।

নিষাদসর্দার সেই ভিড় ঠেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে গোরার সামনে দাঁড়ালেন।

তারপর ওর হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে মহাকালের সেই মূর্তিটার দিকে আঙু দেখিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় বললেন কী যেন।

শিলি এবার এগিয়ে এসে গোরার পাশটিতে দাঁড়াল। তারপর বলল, "উনহোনে পু শিউজীকা কপালো মে ক্যা লিখা হ্যায় কুছ সমঝমে আয়া?"

গোরা অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সেই ললাটলিখনের দিকে। সাংকেতি কতকগুলো শব্দ। কিছুই বুঝে ওঠবার উপায় নেই। তবুও ও নিজে বাঁচার জন্য এবং এখ থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়বার জন্য বুদ্ধি করে একটু চতুর হাসি হাসল।

সবাই আশান্বিত হয়ে তাকাল ওর মুখের দিকে।

ও বলল, "এখানে লেখা আছে, বন্যপ্রাণী হত্যা বন্ধ করো, ধর্মের নামে পশুবলি ব করো, সকল মানুষের ভাল করো, অরণ্যকে রক্ষা করো।"

শিলি সেই কথাটা সকলকে বুঝিয়ে দিতেই আনন্দে নৃত্য করতে লাগল সকলে ভালুকা তালুকের নিষাদদের সেই উল্লাস দ্যাখে কে। দামামা, কাড়ানাকাড়া কত কী বাজ

লাগল।

সর্দার আবার কী যেন বললেন।

শিলি বলল, "উনি জানতে চাইছেন আকাশগঙ্গা কি আর কখনও বইবে না এখান থেকে? এখানকার এই রুক্ষ্ম প্রান্তরে পাথরের বুকে আবার কি আগের মতো ফুল ফুটবে না?"

গোরা বলল, "আকাশগঙ্গাও আবার বইবে এখান দিয়ে। সেই ধারায় শ্যাওলা জমলে পাথরের বুকেও ফুল ফুটবে আবার। কিন্তু এই বনাঞ্চলে সকলকেই সমস্ত রকমের হিংসা ত্যাগ করে সৎভাবে জীবনযাপন করতে হবে।"

শিলি সেই কথাটাও ভাল করে বুঝিয়ে দিল সকলকে।

গোরা তখন শিলিকে বলল, "আকাশগঙ্গার ধারা এখান দিয়ে আবার বইয়ে আনতে গেলে ওদিকের ধসের মুখটা বন্ধ করতে হবে। সব লোককে এখনই গিয়ে ওই ফাটলের মুখ বন্ধ করে দিতে বলো।"

সেই কথা শুনে উন্মত্ত উল্লাসে নাচতে লাগল সবাই।

এমন সময় পাহাড়ের আর এক উচ্চস্থান থেকে এক দীপ্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল, "না। কাউকে কোথাও যেতে হবে না। যে ধারাকে আমিই রুদ্ধ করেছি সেই ধারাকে আমিই প্রবাহিত করব। আমার লোকেরা এতক্ষণে কাজে লেগে গেছে। আজ থেকে ভালুকা তালুকের সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক। এখন থেকে এর সবটাই মুক্তাঞ্চল। আমি এখানকার অধিকার ত্যাগ করে আবার চম্বলেই ফিরে যাচ্ছি। যদি বেঁচে থাকি তাহলে এবার আমি ফিরে আসব মহাকালের দাসী হয়ে ডাকুরানি দুলারীবাঈ হয়ে নয়।"

দুলারীবাঈ-এর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশগঙ্গার ধারা আবার ঝরতে লাগল ছরছর করে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দুলারীবাঈয়ের বন্দুকের গুলিতে লুটিয়ে পড়লেন বিল্লুপ্রসাদ।

দুলারীবাঈ যেমন এসেছিলেন তেমনই উধাও হয়ে গেলেন।

গোরাকে কোলে তুলে ওর কপালে লাল আবীর মাখিয়ে নিষাদরা তখন জয়োল্লাসে মেতে উঠেছে।

এমন সময় যারা সেখানে এল তাদের দেখবে বলে কল্পনাও করেনি ওরা। এ কী করে সম্ভব! এমনও কি হতে পারে?

গোরা দেখল ট্রেনের মধ্যে আলাপ হওয়া সেই যুবক মিঃ এম. কে. রায়। যিনি গোয়ালিয়রে থাকেন। বি. এস. এফ-এ চাকরি করেন। আছেন সদাশিববাবু। আর আছেন স্নেহদি, ওর বন্ধু গৌতম ও গোপা।

গোপা ও গৌতম তো ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল গোরাকে।

স্নেহদি বললেন, "ভগবান কামতানাথ রক্ষা করেছেন তোকে। তোর চিঠি পেয়েই আমি ওদের নিয়ে বিনা রিজার্ভেশানে যোধপুর এক্সপ্রেসে ইলাহাবাদে এসে বাসে করে চিত্রকূটে এসেছি। সদাশিববাবুর মুখেই শুনলাম জঙ্গলে নাকি দারুণ গোলমাল। আর এখানে কামতানাথের মন্দিরেই হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেল মিঃ রায়ের সঙ্গে। ওঁর লোকেরা ভানুমতীর ব্যাপারে জঙ্গল তোলপাড় করছে। কত পুলিশ ঘুরছে চারদিকে।"

গোরা মিঃ রায়কে বলল, "আপনার সঙ্গে যে আবার দেখা হবে তা কিন্তু আমি ভাবিনি।"

"এটাকে ঘটনাচক্র বলতে পারো। ভানুমতীর বাবা পুলিশে খবর দিতেই ওপর মহ থেকে নির্দেশ আসে জঙ্গল তোলপাড় করবার। ভাগ্যক্রমে আমি অফিসেরই অন্য একটা কা বাঁদায় এসেছিলাম। এখানে এলে কামতানাথ দর্শনে আমি এসেই থাকি। আর তাই মন্দি পুজো দিতে গিয়ে হঠাৎ করেই দেখা হয়ে গেল তোমার এই দিদিটির সঙ্গে। স্নেহময়ী স্নেহদি।

ওদিকে ভানুমতীও দেখতে পেল একদল পুলিশের সঙ্গে ওর মা বাবাও আসছেন। স্থান কাল ভুলে শিশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর মা বাবার বুকে।

স্নেহদি বললেন, "আর নয়। অনেক বেলা হয়েছে। এবার পুলিশের কাজ পুলি করুক। আমরা যাই।"

গোরা বলল, "তার আগে আমার একটা কাজ বাকি আছে।" বলেই মিঃ রায় জড়িয়ে ধরে বলল, "দাদাভাই, আমি জানি আমার স্নেহদিকে আপনার ভালই লাগে। সেদি ট্রেনের পরিচয় পর্বেই তা বুঝতে পেরেছি। এই মহাকালের সামনে আপনি কি আমা দিদিটিকে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না?"

মিঃ রায় হেসে বললেন, "তোমার বা আমার ইচ্ছায় কি সব? ওই স্নেহময়ী যদি ওঁ স্নেহমমতার বন্ধনে আমাকে বেঁধে নেন, তবেই না?"

স্নেহদি লজ্জায় নতবদন হলেন।

হাসি বলল, "তা হলে আমার দিদিভাই? সতীয়া দিদি?"

কিন্তু কোথায় তখন সতীয়া। সে তখন সবার অলক্ষে লালপলাশের বন পার হ অনেক-অনেকদূরে চলে গেছে। সঙ্গে চলেছে ভেলুও।

গোরা চিৎকাব করে ডাকল তাকে, "সতীয়া! তুমি ফিরে এসো। সতীয়া—তোমা সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"

হাসি বলল, "ও আর আসবে না।"

শিলি দুলারীবাঈয়ের সেই হিরেগুলো গোরার হাতে তুলে দিয়ে বলল, "ও ইয়ে স তুমকো দে গয়ী।"

গোরার চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল। সতীয়ার হঠাৎ এমন পরিবর্তনের কারণটা কী তা ও ভেবে পেল না। ওদের মাঝে গোপাকে দেখেই কি? হাসিকে বলল, "এখন ব তুমি কী করবে?"

"কী আবার করব? এইখানেই থেকে যাব আমি। মহাকালের পুজো করব। শিলি সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াব। তুমি দূরের মানুষ দূরেই চলে যাও।"

গোরা শিলির দেওয়া সেই হিরেগুলো মুঠোয় নিয়ে সবাইকে ফেলে সতীয়াকে ধরবা জন্য ছুটল। কিন্তু পারল না। শিলি ও হাসি ছুটে গিয়ে ওকে এমনভাবে শক্ত করে ধরে রই যে ওর আর এগোবার সাধ্য রইল না। দারুণ অভিমানে গোরা তখন হিরেগুলো পাহাড়ে ঢালে ছুড়ে দিয়ে গৌতম্ ও গোপার হাত ধরে সকলের সঙ্গে এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে।

ভালুকা তালুকের নিষাদরা ওদের সকলকে বিদায় জানাতে মন্দাকিনীর তীর পর্য নিয়ে এল। সেই সেখানে, যেখানে নদী পার হয়ে কিছু দূর গেলেই চোখে পড়বে গু গোদাবরীর বিস্ময়কর গুহা। আর তার পাশেই সেই পবিত্র গুহা যার সুবিশাল অভ্যন্ত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রজী বনবাসকালে বসবাস করেছিলেন।

—ঃঃ—

তপোবন রহস্য

উৎসর্গ

আদ্যামায়ের চরণাশ্রিতা
ব্রহ্মচারিণী দুর্গা
সুচরিতাষু

কিশোর বয়সে আমি একবার অ্যানিমিয়ায় ভুগে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে ভাল করে চলাফেরা পর্যন্ত করতে পারতাম না।

ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিলেন চেঞ্জে যাবার জন্য। অন্তত একমাস পশ্চিমের কোনও দেশে একভাবে কাটিয়ে আসতে পারলে আমার শরীর সম্পূর্ণ সেরে যাবে এইরকম নির্দেশ দিলেন।

আমি তো বেড়ানোর গন্ধ পেলে আর কিছুই চাই না। তাই ডাক্তারবাবুর প্রস্তাবে লাফিয়ে উঠলাম।

বাবা মা দুজনেই পড়লেন সংশয়ে।

একমাস বাড়ি ছেড়ে বাইরে থাকাটা আমাদের পক্ষে খুবই অসুবিধার ছিল তখন। অর্থকরী ব্যাপারে নয়। বাবার চাকরির জন্য। বাবা আর্মিতে চাকরি করতেন। তাই তাঁর পক্ষে আগেভাগে না জানিয়ে হঠাৎ করে ওইরকম ছুটি নেওয়া অসম্ভব ছিল।

কিন্তু আমি ছিলাম ডাকাবুকো।

বাবাকে বললাম, "তুমি যদি আমাকে দু' একদিনের ছুটি নিয়ে কোনও একটা জায়গায় আমার দেখাশোনার জন্য একজন কাউকে ব্যবস্থা করে রেখে আসতে পার তা হলে আর আমার জন্য চিন্তা কোরো না।"

মা বললেন, "তাই কি হয়? একা তোকে দূর দেশে কার ভরসায় ছেড়ে দেব? তার ওপর রুগ্ন শরীরে?"

আমি বললাম, "কেন, বাইরে গিয়ে একা কেউ কি থাকে না, শুধু আমার জন্য এমন কাউকে তোমরা রাখবে যে আমাকে রেঁধে খাওয়াবে, আমার জামা কাপড় কেচে দেবে, দেখাশোনা করবে। এই হলেই তো চলে যাবে আমার।"

"সবই তো বুঝলুম। কিন্তু তোকে বিদেশ বিভুঁয়ে ওইভাবে রেখে আমরাই কি ঠিক থাকতে পারব?"

"তা হলে তো আমার যাওয়া হয় না। কিন্তু আমার ভাল যদি তোমরা চাও তা হলে অযথা মায়া না বাড়িয়ে আমাকে যেখানে হোক তোমরা রেখে এসো। বাইরের জলহাওয়া পেলে আমি খুব শিগগির বল ফিরে পাব।"

আমার কথা শুনে বাবা মা দুজনেই আমার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন।

আমার প্রাণের বন্ধু ছিল গোপাল। একই পাড়ায় বাড়ি। তাকে আড়ালে ডেকে সব কথা খুলে বললাম। আড়ালে ডেকে বললাম এই কারণে যে, আমার অন্যান্য বন্ধুরা শুনলে নানারকম মন্তব্য করবে। বিশেষ করে আমার অসুখটা অনেকে খারাপ অসুখ মনে করে আমার কাছে আসা যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল।

যাই হোক, আমার কথা শুনে লাফিয়ে উঠল গোপাল। বলল, "হায়রে! আমারও যদি তোর মতো অসুখ করত, তাহলে আমাকেও ডাক্তার চেঞ্জে যেতে বলত। তোর কী মজা, বল?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "মজা! এর নাম মজা? কদিন কিরকম ভুগলাম বল দিকিনি? তার ওপর এই দুর্বলতা।"

গোপাল বলল, "আমি শুনেছি যাদের পেটে বড় কৃমি থাকে তাদেরই নাকি অ্যানিমিয়া হয়।"

"তার কোনও মানে নেই। তবে ও জিনিস আমারও ছিল। কিন্তু সেটা বেরিয়ে গেছে।"

"একটা না দুটো?"

"একটা।"

"তা হলেই গেছে। আরও একটা আছে পেটের ভেতর। তোর শরীরে সব রক্ত শুষে না খেয়ে ও যাবে না।"

"কী বলছিস যা তা?"

"যা বলছি ঠিকই বলছি। আমার মামাতো ভাই—।"

"ওসব কথা থাক। এখন কোথায় যাওয়া যায় বল দেখি? স্বাস্থ্য ফেরানোর পক্ষে সবচেয়ে ভাল জায়গা কোনটা?"

"শুনেছি মিহিজাম নাকি সবচেযে ভাল জায়গা।"

"মিহিজামটা কোথায়?"

"কেন, চিত্তরঞ্জনে। মিহিজাম, জামতারা, কারমাটার, এইসবের নাম শুনিসনি?"

"শুনেছি। আরও একটু দূরের কোনও জায়গার নাম বল।"

"তা হলে মধুপুর কিংবা গিরিডিতে চলে যা।"

আমি একটু ভেবে বললাম, "আচ্ছা শিমূলতলায় গেলে হয় না? কে যেন বলেছিল ওখানে লীলাবরণ ঝরনা আছে, লাট্টু পাহাড় আছে।"

"দি আইডিয়া। খু-উ-ব ভাল জায়গা। তবে কিনা বড় নির্জন। অত নির্জনে গেলে দুদিনে হাঁপিয়ে উঠবি।"

"তা হলে আর একটা জায়গার নাম বল।"

"আমি বলি কি, তুই বরং স্বাস্থ্য ফেরাতে দেওঘরে চলে যা।"

"ওরে বাবা! ওখানে তো শুনেছি পাণ্ডাগুণ্ডার উপদ্রব খুব। বাইরের লোকজন গেলে ভীষণ হয়রান করে।"

"ঠিকই শুনেছিস। তবে কিনা তুই বাচ্চা ছেলে। তোর কী করবে? যে বোকা সোকা লোকগুলো ওখানে গিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে যায় ওরা তাদেরই গলা কাটে।"

"তা হলে কি বলছিস দেওঘরেই যাব?"

"আমি হলে তাই যেতাম।"

গোপালের কথা শেষ হলে আমি কোথায় যে যাব তাই নিয়ে ভাবতে লাগলাম। তা ছাড়াও ভাবতে লাগলাম অন্য কথা।

গোপাল বলল, "এত কী ভাবছিস তুই? আর অন্য কোথাও যাবার চিন্তা মনে আনিস না। ওখানে গেলে দেখবি যেমনই জলহাওয়ার গুণ, তেমনই প্রকৃতির দৃশ্য। তাছাড়া সুস্বাদু প্যাঁড়া খেয়েও বাঁচবি। জানিস তো দেওঘরের প্যাঁড়া বিখ্যাত?"

আমি বললাম, "তা আবার জানি না? কিন্তু ভাই, এই একটা মাস তোকে ছেড়ে কী করে থাকব তাই তো ভাবছি। তুই হলি আমার একমাত্র বন্ধু। আমার এই অসুখের জন্য কেউ আসে না আমার কাছে একমাত্র তুই ছাড়া।"

"অথচ তোর এটা কোনও অসুখই নয়।"

"সেটা আমি কাকে বোঝাই বল?"

"তুই চলে গেলে আমারও মন খুব খারাপ হয়ে যাবে। সবসময় তোর কথাই মনে পড়বে আমার।'

আমি একটু ভেবে বললাম, "আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না?"

"কী কাজ?"

"তুই চল না আমার সঙ্গে?"

আমার এই কথায় কেমন যেন মিইয়ে গেল গোপাল। বলল, "কী করে যাব ভাই? আমরা যে গরিব। জানিস তো? কত কষ্ট করে দিন কাটে আমাদের। গাড়ি ভাড়ার পয়সা পাব কোথায়?"

আমি বললাম, "তোর সমস্ত খরচ-খরচা যদি আমরা দিই? তা হলে?"

গোপাল লাফিয়ে উঠল শুনে। বলল, "তা হলে তো আমি এক কথায় রাজি।"

"আমি তা হলে তোর ব্যাপারটা নিয়ে আমার বাবার সঙ্গে আলোচনা করি কেমন?"

"ওনারা রাজি হলে আমিও বাড়িতে জানাব—তা হলে।"

দুজনেই লাফিয়ে উঠলাম, হু-র্-র্-র্-রে। কী মজা!

আমি অনেক আনন্দ নিয়ে মাকে বললাম গোপালের কথা।

মা বললেন, "ও যদি সত্যিই যেতে রাজি হয় তোর সঙ্গে তা হলে এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে বল? তবে যেখানেই যাওযা হোক সাবধানে থাকিস কিন্তু।"

আমি বললাম, "সে কথা আবার বলতে?"

মা আমার প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসপত্তর যা কিছু ছিল সবই এক এক করে গোছাতে শুরু করলেন। যদি যাওয়া হয়। তবে আমার যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর মনে খুব একটা ভয় ভাবনা নেই। নেই এই কারণে, মাঝে মধ্যেই হুট-হাট করে এব ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি আমি। একবার এক বন্ধুর সঙ্গে তো গড়বেতায় গিয়ে কাটিয়ে এসেছিলাম বেশ কিছুদিন। বর্ধমান জেলার নাড়ুগ্রামে আমাদেব দেশের বাড়িতেও গেছি একা একা।

কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, কোথায় যাব তা কিন্তু এখনও ঠিক হয়নি। কেননা আমাব যাওয়ার এবং থাকার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন আমার বাবা। অথচ তিনিই এই ব্যাপারে একদম মুখ খুলছেন না।

দুই

অবশেষে ঠিক হল দেওঘরেই যাবার।

বাবার এক সহকর্মীর বড়মামা থাকেন দেওঘরের কুণ্ডাতে। তিনি একটা চিঠি পোস্ট করে, আমাকে নিয়েই সেইখানে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন বাবাকে। বললেন, সেখানে গেলে কোনও অসুবিধাই হবে না আমার। কেননা ওখানে বড়মামার কাছে ফাগু নামে একজন বিশ্বস্ত লোক আছে। বাড়ির সবসময়ের জন্য কাজের লোক। খুব ভাল মানুষ। সে পাশে থাকলে ভয়ের কোনও ব্যাপারই নেই।

এই সুখবরটা আমি গোপালের বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়েই হতাশ হলাম। কেননা গোপালের বাবা মা আমার সঙ্গে একমাসের জন্য তাঁদের ছেলেকে ছেড়ে দিতে মোটেই

রাজি নন।

গোপাল যাবে না শুনে দারুণ মন খারাপ হয়ে গেল আমার। একা একা একমাস ও
বিজনে কী করে থাকব তাই ভাবতে লাগলাম। অথচ যাবারও আমার তীব্র বাসনা।

আমার মনের অবস্থা দেখে বাবা বললেন, "তা হলে কোথাও গিয়ে কাজ নেই তোর
ঘরের ছেলে ঘরেই থাক। মর্নিংওয়াক কর। ভাল খা দা। এতেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু মন যে মানে না।

তা ছাড়া আমারও তখন জেদ চেপে গেছে দারুণ। গোপালের তো আমার স
যাবার কথা নয়, শারীরিক অসুস্থতার জন্য বায়ু পরিবর্তনের দরকার আমারই। ওকে এক
প্রস্তাব দিয়েছিলাম মাত্র। ও না গেলে আমার কী? বরং আমার বাবার খরচ খানিকটা বেঁ
যাবে। তাই আমি বেশ কিছুটা সময় নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে বাবাকে বললা
"কেউ না যাক, আমি যাব। তুমি শুধু আমাকে সঙ্গে করে রেখে এসো যেখানে আমা
থাকতে হবে। তারপরের ব্যাপারটা আমিই বুঝে নেব। আমার জন্য তোমরা আর কোন
চিন্তাই কোরো না। আমি তো বোকা হাবা ছেলে নই। তা ছাড়া সেখানে তোমার বন্ধু
বড়মামা যখন আছেন তখন চিন্তারও কারণ নেই কিছু।"

আমার যুক্তিটা মেনে নিলেন বাবা মা দুজনেই। মা বললেন, "সেই ভাল। দু' মা
এক হলেই হয়তো দৌড় ঝাঁপ করে বসবি। তার চেয়ে একাই যা তুই। মাঝে মধ্যে এক
করে চিঠি দিস, তাতেই হবে।"

বাবা বললেন, "তারই বা প্রয়োজন কী? একমাস বই তো নয়। তা ছাড়া ও
ওখানে রেখে এসে আমারই কি মন ঠিক থাকবে? আমি শনি রবি বা অন্য কোনও ছু
ছাটার দিন পেলেই চলে যাব।"

"খুউব ভাল হবে তা হলে।"

আমার সব কিছুই গোছানো হয়ে গেল। সারা মাসের ওষুধপত্তর সব।

তবুও মায়ের মন। বললেন, "ওষুধগুলো ঠিক ঠাক খাস কিন্তু। বিশেষ করে টনিক
অবশ্যই খাবি।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ। অত করে বলতে হবে না তোমাকে। ক্লাশ নাই
পড়ি। নেহাত ছেলেমানুষ তো নই।"

আমার যাওয়ার দিনটা চূড়ান্তভাবে স্থির হল ভাইফোঁটার রাতে। বাইরে বেড়া
যাওয়ার পক্ষে এর চেয়ে ভাল সময় আর হয় না। যদিও ভাইফোঁটার পরই আমার স্কু
খুলবে, তবুও স্কুল খুললেও আমার স্কুলে যাওয়া চলবে না। তার কারণ প্রথমত ডাক্তারে
বারণ, দ্বিতীয়ত আমি এতই দুর্বল যে আমার পক্ষে নিয়মিত স্কুলে যাওয়াও সম্ভব নয়। ত
এর মধ্যে হঠাৎ করে যদি পরীক্ষার দিন ঘোষণা হয় তা হলে অবশ্যই বাধ্য হব ফি
আসতে।

আমার যাওয়ার দিনটা কেন যে স্থির হল ভাইফোঁটার রাতে তারও একটা কার
আছে।

দুর্গাপুজোর পরে কালীপুজো। এই সময়টা দেওয়ালির বাড়ি পোড়ানোর উৎস
ফেলে কোথাও যেতে আমার মন চায় না। তা ছাড়া নতুন শীতের মুখ। যদিও হেমন্তকা
তবুও হেমন্তের শেষ। শাল, সোয়েটার চাপানোর মরশুম এসে যায়। নতুন ফসল ওঠে। আ

তার চেয়েও যেটা মুখ্য কারণ, সেটা আমার দিদি কিংবা কোনও বোন-টোন নেই। পাশের বাড়ির রুমিদি আমাকে আদর করে ফোঁটা দেন। ওই আনন্দটুকু আমি কোনও কিছুর বিনিময়েই বিসর্জন দিতে চাই না।

যাই হোক, ভাইফোঁটার দিন সকাল থেকেই দেখি মায়ের চোখে জল। আমাকে এক মাসের জন্য চোখের আড়াল করতে কিছুতেই মন চাইছে না মার।

মায়ের ওইরকম মনের অবস্থা দেখে রুমিদি বলেন, "ঠিক আছে মাসিমা, আপনি আর মন খারাপ করবেন না। একমাসের ব্যাপার তো, আমিই বরং যাব ওর সঙ্গে।"

রুমিদি যাবেন!

এ যে অবিশ্বাস্য। রুমিদি কাছে থাকলে আমার যে কী ভাল লাগবে তা কী করে বোঝাব? একেবারে হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেয়ে যাব আমি।

মা-ও অবাক! বললেন, "তুই কি সত্যি বলছিস রুমি? তা হলে যে কোনও দুশ্চিন্তাই থাকে না আমার!"

রুমিদি বললেন, "হ্যাঁ মাসিমা। আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমিই যাব। আমরাই আজ কদিন ধরে বাড়িতে বলাবলি করছিলাম, রুগ্ন ছেলেটাকে অন্যের ভরসায় বাইরে রেখে আসা কি ঠিক হবে? অথচ ওর যা শরীরের অবস্থা, তাতে বাইরে ওকে যেতেই হবে। ও দেখি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পড়ে যায়।"

মা বললেন, "সেইজন্যই তো দুশ্চিন্তা মা। তবে ওখানে ও একা গেলেও খুব একটা অসুবিধা হবে না। সেইরকম ব্যবস্থা না করে ওর বাবা ছাড়ছেন না। তবে তুই যদি সঙ্গে যাস তা হলে তো কথাই নেই। এতটুকু চিন্তাও থাকবে না ওর জন্য। তোর মতো করে আর কে ওকে দেখবে বল?"

রুমিদি বললেন, "আমি যাবই। আসলে সত্যিকথা বলতে কি, আমি কখনও কোথাও যাইনি। বছর পাঁচেক আগে একবার শুধু তারকেশ্বরে গিয়েছিলাম। সেটা কি যাওয়া হল? পাহাড়-পর্বত নদী-নালা অরণ্য-নির্ঝর এইসব দেখতে আমার খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু কী করে যাব? কার সঙ্গে যাব? আমাকে নিয়ে যাবে কে? ওর বন্ধু গোপালের যাবার কথা ছিল, কিন্তু সে যখন গেল না তখন ভাবলাম আমিই বলি। বলতে গিয়েও লজ্জায় বলতে পারিনি। ভাবলাম কী ভাববেন আপনারা। কিন্তু আজ আপনার মানসিক অবস্থা দেখে আর থাকতে পারলাম না।"

মা বললেন, "তোর ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না রুমি। তোর চেয়েও আপনজন কি ওর আর কেউ আছে? অথচ দ্যাখ, তোর কথাটা আমাদের একবারও মনে হয়নি। তা হ্যাঁরে, তুই যে যাবি তোর মা বাবা আপত্তি করবেন না?"

রুমিদি বললেন, "সত্যি বলব মাসিমা? ওনারাই আমাকে বললেন যাবার জন্য আপনাকে বলতে। তাছাড়া দেওঘরে যাবার সাধ আমার অনেকদিনের। আমি অবশ্য জানতাম আমি যাব বললে আপনি না তো করবেনই না উপরন্তু খুশি হবেন, তাই বললাম।"

বাবাও অভিভূত হলেন রুমিদি যাবেন শুনে। আনন্দের চোটে কত কী কিনে আনলেন আমাদের জন্য। রুমিদির জন্য দুটো শাড়ি, ব্লাউজ, সেন্ট, সাবান, সুগন্ধি পাউডার কত কী। এসব তো রুমিদির ছিলই তবুও আনলেন। আসলে এসব হচ্ছে কি আমার বাবার

কৃতজ্ঞতার এবং বলতে গেলে এক ধরনের আনন্দের প্রকাশ।

রুমিদিও খুব তৎপরতার সঙ্গে স্যুটকেস ভর্তি করে গুছিয়ে নিলেন ওনার প্রয়োজনীঃ যা কিছু।

আমার তো গোছানোই ছিল, তাই আর নতুন করে কোনও কিছু গোছানোর প্রয়োজ॰ হল না।

রাত নটায় ট্রেন।

রুমিদি যাচ্ছেন বলে বাবা আর সঙ্গে গেলেন না।

আসলে রুমিদিই যেতে দিলেন না বাবাকে। বললেন, ''আমি যখন ওর সঙ্গে যাচ্ছি তখন আপনাব যাবার আর কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি বরং ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে দিন। পারেন তো স্টেশনে গিয়ে আমাদের গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে আসুন।''

রুমিদি যদিও কখনও বাইরে বেরোননি তবু কী সাহস। আসলে গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। খু স্মার্ট।

যাই হোক, আমাদের তো যাওয়ার ঠিক হল। আমি যে সময়কাব কথা বলছি তখ কিন্তু এখনকার মতো এমন থ্রি-টায়ার শ্লিপার কোচের ব্যবস্থা ছিল না। তবে সিট রিজার্ভেশন ব্যবস্থাটা চালু হয়েছিল দু' একটা গাড়িতে।

দেওঘরে যাবার জন্য ট্রেনও ছিল না এত রকমেব।

সকালের দিকে একটাই গাড়ি ছিল তুফান এক্সপ্রেস। রাতের গাড়ি জনতা এক্সপ্রেস ' মুঘলসরাই প্যাসেঞ্জার। দিল্লি এক্সপ্রেসও ছিল, কিন্তু সে গাড়ি মধ্যরাতে পৌঁছত বলে নেহা দায়ে না পড়লে কেউ তাতে চাপত না।

এইসব গাড়িতে চেপে জসিডিতে নেমে গাড়ি বদল করে যেতে হত দেওঘ বৈদ্যনাথধামে। এখনও হয়।

আমাদের পাড়ার হরিদা নামে একজন বয়স্ক মানুষ ছিলেন। তাঁর একটি ভাড়ার গা ছিল। আমরা সেই গাড়িতে চেপে হাওড়া স্টেশনে এলাম।

বাবা একটা প্লাটফর্ম টিকিট ও আমাদেব দুজনের জন্য দুটো টিকিট কেটে আনলেন

এরপর একজন কুলিকে ঠিক করা হল আমাদের গাড়িতে চাপিয়ে দেবার জন্য।

কুলি তার চাহিদামতো টাকা পেয়ে দারুণ খুশি। সে করল কি ট্রেন আসামাত্র গাড়িতে উঠে গিয়ে জানলার ধারের সিট ও ওপরের একটা বাঙ্ক দখল করল।

তখন এখনকার মতো এমন ভয়াবহ ভিড় হত না গাড়িতে। দেশে স্থায়ী সরকার ছিল বলে চুরি ডাকাতি কম হত। ট্রেনজার্নিও ছিল আনন্দের ও নিরাপদের। যখন তখন এ দুর্ঘটনা ঘটত না। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব ছিল। তাই মেয়েদের সম্মান দিত। ছোট ছো ছেলেমেয়েদের যাত্রাপথে যাতে কোনও অসুবিধে না হয় সেদিকেও নজর দিত। তবুও বা অন্যান্য সহযাত্রীদের আমাদের দিকে একটু নজর রাখতে বলে বিদায় নিলেন।

ট্রেন ছাড়ল যথাসময়ে।

কী আনন্দ! কী আনন্দ!

আমি তো জানালার ধারে বসে দু' চোখ ভরে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগলাম অন্ধকারে ঢাকা কালো কালো ছায়ার মতো গাছপালার দৃশ্য দেখতে বড়ই ভাল লাগ আমার।

আকাশে দ্বিতীয়ার চাঁদ। কী অপরূপ!

খানিক যাবার পরই রুমিদি জানালা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, "রোগা শরীর। এখুনি ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

কথাটা ঠিক। তখনই তো হাফ সোয়েটার পরে ফেলেছিলাম। শীত শীতও লাগছিল ষ্টু।

রুমিদি এবার খেতে দিলেন।

শুকনো রুটি আলুর দম আর মিষ্টি। মিষ্টি মানে কড়াপাকের সন্দেশ।

তাই খেয়ে আমি বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়লাম।

রুমিদিকে বললাম, "তুমিও উঠে এসো না রুমিদি।"

রুমিদি বললেন, "না রে। দুজনেরই শুয়ে পড়াটা ঠিক হবে না। তা ছাড়া শেষরাতে ারের দিকে ট্রেন থামবে জসিডিতে। যদি ঘুমিয়ে পড়ি তা হলেই তো মুশকিল। কোথায় াতে কোথায় চলে যাব তা কে জানে?"

অন্যান্য সহযাত্রীরা বললেন, "তার জন্য ভাবনা কী? আমরাও কেউ চিত্তরঞ্জন, কেউ পুর, কেউ জসিডিতে নামব। শোবার ইচ্ছে করলে আপনি শুতে পারেন। ডেকে দেব মবা।"

রুমিদি বললেন, "সে দেখা যাবে। তবে কিনা বসে বসেই বেশ ঘুমিয়ে নিতে পারি মি।"

অগত্যা আমি চোখ বুজলাম।

আর রুমিদি বসেই রইলেন।

আসলে ব্যাপারটা কি, এই প্রথম ট্রেনজার্নি তো, রুমিদি তাই জানালার ধারে বসে ইরের প্রকৃতি দেখতে চাইছিলেন। তবে আমার যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সেদিকে খেয়াল খেই জানালা খোলা না রেখে কাচটা নামিয়ে দিয়ে তাতেই কপাল ঠেকিয়ে দৃশ্য খছিলেন তিনি। দেখুন। দেখবার জন্যই তো আসা।

সত্যি, কী ভাল রুমিদি।

তিন

া ভোরবেলায় আমরা যখন জসিডিতে নামলাম তখন কী দারুণ শীত!

আসলে এবছর পুজোটাই যে পড়েছিল অক্টোবরের শেষে। তারপর লক্ষ্মীপুজো লীপুজো গেছে। ভাইফোঁটাও পার হয়েছে। নভেম্বরের পনেরো তারিখ তখন। শীতের াব দোষ কি?

আমরা যে প্লাটফর্মে ট্রেন থেকে নামলাম তার ঠিক উল্টোদিকেই অন্য একটি টফর্মে বৈদ্যনাথধামের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি দাঁড়িয়েছিল।

কুলির মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে আমরা সেই ট্রেনে উঠলাম।

কয়েকজন পাণ্ডা এলে তাঁদের বুঝিয়ে বললাম, "আমরা স্বাস্থ্যোদ্ধারে এসেছি। ওাতে অনুরূপবাবুর বাড়িতে উঠব। ওনাদের যিনি পাণ্ডা তিনিই আমাদের পাণ্ডা হবেন, দি আমরা মন্দিরে যাই।"

তবুও পাণ্ডারা যাঁর যাঁর নাম লেখা একটি করে কার্ড আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে

চলে গেলেন।

রুমিদি বললেন, "এই সময় একটু করে চা খেয়ে নিতে পারলে বেশ হত না রে?"

আমি আহ্লাদিত হয়ে বললাম, "খুব ভাল হয় তা হলে।"

রুমিদি দুজনের জন্য দু'ভাঁড় চা কিনলেন।

সেই চায়ের যে কী স্বাদ তা জীবনেও ভুলব না। গাঢ় ঘন দুধের সুস্বাদু চা। খেয়ে তৃপ্তিতে ভরে উঠলাম।

অনেক পরে কু-উ-উ-ক্ করে সিটি দিয়ে নড়ে উঠল ট্রেন। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈদ্যনাথধামে যখন পৌঁছলাম, তখন আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে।

এক আশ্চর্যসুন্দর নতুন প্রভাত।

স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতেই ইব্রাহিম নামে একজন টাঙ্গাওয়ালা এসে হাজির হল আমাদের কাছে। তাকে কুণ্ডায় অনুরূপবাবুর বাড়ি নিয়ে যাবার কথা বলতেই টাঙ্গাওয়ালা বলল, "অনুরূপবাবুর বাড়ি আমি খুব ভালরকমই চিনি। তা ছাড়া আমার বাড়িও ওইদিকে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমের কাছে। অনুরূপবাবুর বাড়ি যে দেখাশোনা করে সেই ফাগুও আমার বন্ধু।"

ফাগুর কথা শুনেই লাফিয়ে উঠলাম আমি। বললাম, "তা হলে তো ঠিক লোকের টাঙ্গাতেই উঠেছি আমরা। আর দেরি নয়, নিয়ে চলো আমাদের।"

আমরা যখন সবে খানিকটা এসেছি তখন হঠাৎ দেখা গেল একজন লোক আমাদের টাঙ্গার পেছনে ছুটতে ছুটতে আসছে।

রুমিদি টাঙ্গাওয়ালাকে বললেন, "একবার টাঙ্গা থামাও তো ভাই, দেখ তো লোকটা কে?"

লোকটি তখন চেঁচিয়ে বলছে, "ইব্রাহিম! টাঙ্গা রোখো।"

টাঙ্গা থামিয়েই ইব্রাহিম বলল, "এই তো ফাগু! এর কথাই বলছিলাম।"

ফাগু বলল, "আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন?"

রুমিদি আমি, দুজনেই বললাম, "হ্যাঁ।"

"বাবু পাঠিয়েছেন আমাকে আপনাদের নিয়ে যাবার জন্য। আমি এসে স্টেশনের চারদিক খুঁজছি। কে যেন একজন বলল, 'এক দিদিমণি আর একটি ছেলে তোমার নাম করছিল। ওরা এইমাত্র ইব্রাহিমের টাঙ্গায় গেছে।' তাই আপনাদের ধরব বলে ছুটতে ছুটতে আসছি আমি।"

ফাগু ততক্ষণে টাঙ্গায় উঠে ইব্রাহিমের পাশে বসে পড়েছে।

ইব্রাহিম বলল, "স্টেশন পর তুম কাঁহা থে?"

"টিকটঘরকা বগলমে থা।" তারপর আমাদের বলল, "বাবুজি এলেন না? তাঁর তো আসবার কথা ছিল।"

আমার হয়ে রুমিদিই বললেন, "না, উনি একটি বিশেষ কাজে আটকে গেছেন। উনি এলেন না বলেই আমি এলাম।"

ফাগু বলল, "ওই একই কথা হল। আমি যেখানে আছি সেখানে কোনও ভয় নেই আপনাদের। তা ছাড়া আমার বাবুর বাড়িতে থাকলে কেউ আপনাদের দিকে ফিরে তাকাবে না।"

ফাগুর কথায় বোঝাই গেল অনুরূপবাবু এই অঞ্চলের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি! যাই হোক, আমাদের এক মাসের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় হলেই হল।

টাঙ্গা চলেছে প্রশস্ত রাজপথ ধরে।

টুংটাং-টুংটাং করে ঘোড়ার গলায় লাগানো ঘন্টির শব্দ উঠছে।

পথের দুধারে ঘন গাছপালা। কাছে দূরে ছোট ছোট পাহাড়। দূরে বহুদূরে বড় পাহাড়ের রেখা।

ফাগু বলল, "ওই যে দেখছ পাহাড়টা, ওই হচ্ছে ত্রিকূট পর্বত। একদিন আমি তোমাদের নিয়ে যাব ওখানে।"

আমি বললাম, "নিয়ে যেও। তবে আমি তো উঠতে পারব না পাহাড়ে। আমি যে বড় দুর্বল।"

ফাগু বলল, "খোকাবাবু, এর নাম দেওঘর। এক সপ্তা এখানকার জল পেটে পড়লেই দেখবে তোমার তাগত কত বেড়ে গেছে। তুমি তখন সব পাহাড়েই উঠতে পারবে। এখানে কত পাহাড় আছে। তপোবন পাহাড়, নন্দন পাহাড়, হাতি পাহাড়। আর টিলা যে কত আছে তার ঠিক নেই। তোমরা যেখানে যাচ্ছ ওইখানে কুণ্ডেশ্বরী মা আছেন। তাঁর কৃপায় একেবারেই ভাল হয়ে উঠবে তুমি।"

বলতে বলতেই টাঙ্গা এসে থেমে গেল এক জায়গায়। সেইখানে একটি পুরনো ধরনের বিশাল বাড়ির সামনে কয়েকজন আদিবাসী জটলা করছে।

ফাগু বলল, "এই আমাদের বাড়ি।" বলে নিজের হাতেই মালপত্তরগুলো নামিয়ে নিল।

রুমিদি, আমি দুজনেই টাঙ্গা থেকে নামলাম।

রুমিদি টাঙ্গাওয়ালার ভাড়া মেটালেন।

আমরা ফাগুর সঙ্গে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। বাড়ি তো নয়, যেন রাজবাড়ি এটা।

বাড়ির পেছনদিকে পাঁচিলঘেরা বাগান। কত-কত গাছ সেখানে।

ফাগু সিঁড়ি বেয়ে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গেল আমাদের।

রুমিদি বললেন. "ওনারা কোথায়?"

"ওনারা কর্তা গিন্নিতে গেছেন মর্নিংওয়াকে। এখনই আসবেন।"

রুমিদি বললেন, "ফাগু তোমার দেশ কোথায়?"

"কেন? এখানেই, এই বিহারই আমার মাতৃভূমি।"

"তুমি খুব ভাল বাংলা বলতে পার তো।"

"আমি যে খুব ছোটবেলা থেকেই বাঙালিবাবুদের বাড়িতে আছি। তবে আমার মাতৃভাষা কিন্তু আমি ভুলে যাইনি। আমার দেশোয়ালি ভাইদের সঙ্গে যখন কথা বলি তখন মাতৃভাষাতেই।"

ফাগু আমাদের বাথরুম দেখিয়ে দিলে আমরা সর্বাগ্রে গিয়ে দাঁত মেজে মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিলাম।

আর ঠিক তখনই অনুরূপবাবু ও তাঁর স্ত্রী এসে হাজির হলেন। বেশ লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান। আর কী সুন্দর দেখতে দুজনকে। গায়ের রঙ ফুটে লালাভ একটা জ্যোতি

বেরোচ্ছে। যেন হরপার্বতী।

আমরা প্রণাম করলাম দুজনকে।

অনুরূপবাবু আমাকে আদর করে বললেন, "তোমারই নাম সৌরভ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"তোমার বাবার আসবার কথা ছিল যে?"

"উনিই আমাকে নিয়ে আসতেন, তা এই যে আমার রুমিদি, আমাদের পাশের বাড়িতে থাকেন, উনি এলেন বলেই বাবা আর এলেন না।"

অনুরূপবাবুর স্ত্রী বললেন, "ভালই হয়েছে। মেয়েটি আসায় আমারও সুবিধে হয়েছে খুব। মনের দুটো কথা বলে বাঁচব। ছেলেটা আসবে শুনে আনন্দও হচ্ছিল, আবার মনে মনে ভাবছিলাম ছেলেটা বাপ-মা ছেড়ে থাকবে, ওর ভাল লাগবে কি না। ওর সমবয়সী কেউ তো এখানে নেই, ও হয়তো দুদিনে হাঁফিয়ে উঠবে। তার ওপর শহরের বাইরে জায়গাটা। কী নির্জন। দেখছ তো লোকজনের আনাগোনা এদিকে একদম নেই বললেই চলে। দোকানপত্তরও খুব কম। ফাগু গিয়ে সব নিয়ে আসে দেওঘর থেকে।"

অনুরূপবাবু আমাকে বললেন, "তা সৌরভবাবু! প্রথম দর্শনেই কেমন লাগল আমাদের এই জায়গাটা? থাকতে পারবে তো?"

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, "খুব পারব। আসলে শহরের মধ্যে থেকে আমরা হাঁফিয়ে উঠেছি। এই রুমিদিও পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গলের দেশে থাকতে খুব ভালবাসেন, এমন সুন্দর পরিবেশে আপনাদের এই বাড়িতে আমাদের যখন থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে তখন বহাল তবিয়তেই থাকব আমরা।"

অনুরূপবাবু বললেন, "শোনো, আমিও তোমার বাবার মতো আর্মিবই লোক। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর এইখানে এসে এই বাড়িটা আমি কিনেছি।"

রুমিদি বললেন, "এত জায়গা থাকতে আপনারা এতদূরে এখানে এলেন কেন?"

"তারও কারণ আছে। চাকরিজীবনে চিরকাল এখানে ওখানে ঘুরেছি আমি। আমাদেব ছেলেমেয়ে নেই। শুধু এই বুড়োবুড়ি দুজনেই। দুজনেরই বয়স সত্তরের ওপরে। এই বয়সে দুদিন অন্তর রোগে ভোগা ছাড়া আর হবেটা কি? যখন তখন বাতের ব্যথায় ভুগব, অম্বল অজীর্ণে ধুঁকব। তাই ঠিক করলাম প্রকৃতির কোলে এইরকম একটি স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকতে পারলে শেষ বয়সে আর যাই হোক রোগে-নাড়ায় ভুগতে হবে না। এই ভেবেই এই বাড়িটা কিনে ফেললাম। এই বাড়ির যিনি মালিক তাঁর ছেলেরা সব প্রবাসী। ওনারাও তাই দিন আসন্ন জেনে এই বাড়ি বিক্রি করে ছেলেদের কাছে চলে গেলেন। এখন আমরা এই বাড়ির মালিক। আমরা যখন মরে যাব এই বাড়ি তখন ফাগুর হয়ে যাবে।"

আমি বললাম, "ফাগু আপনাদের খুব বিশ্বাসী আর পুরনো দিনের লোক বুঝি?"

"আরে, না না! আমি এই বাড়ি কিনেছি বছর দশেক। ফাগু এই বাড়িতেই থাকত। তা আগের মালিক বাড়ি বেচে দিয়ে চলে যাবার সময় আমাদের হাতে ধরে অনুরোধ করেন ফাগুকে এখান থেকে তাড়িয়ে না দিতে। লোকটা বড় বিশ্বাসী। আর কেউ কোথাও নেইও তার। কাজেই আশ্রয়টুকু ঘুচে গেলে মাথা গোঁজবার মতো একটুও জায়গাও থাকবে না বেচারির। সেইসব শুনে আমরা এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম ফাগুকে রাখতে। তা ছাড়া আমাদেরও দুই বুড়োবুড়ির জন্য এইরকম বিশ্বাসী একজন কাউকে দরকার তো। তা ফাগুই

বহাল রইল। দিনে দিনে ওর যা পরিচয় পেলাম তাতে বুঝলাম গঙ্গার জলে যদিও কোনও ময়লা থাকে ফাগুর সেটুকুও নেই। লোকটা সত্যিই ভাল। এই দেখো না, আমাদের আসতে দেখেই ও বাজারের থলি নিয়ে বাজার করতে চলে গেছে।"

আমি বললাম, "আপনাদের এখানে বাজার কোথায়?"

"এখানে কোনও বাজার নেই। সেই দেওঘরে।"

"ওরে বাবা। সে তো অনেকদূর।"

"তাতে কি? ও ঠিক চলে যাবে। হেঁটে তো যাবে না, কারও সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে, নয়তো বা কোনও টাঙ্গা ম্যানেজ করে ঠিক চলে যাবে ও।" বলেই বললেন, "শোনো, তোমরা সারারাত ট্রেন জার্নি করে এসেছ। এখন যা হোক কিছু মুখে দাও। তবে প্রথমেই জল খাও পেট ভরে।"

অনুরূপবাবু নিজেই আমাদের দুজনকে দু' গেলাস জল এনে দিলেন। দিয়ে বললেন, "জান তো, খালি পেটে জল আর ভরা পেটে ফল, এর বিকল্প নেই।"

অনুরূপবাবুর স্ত্রী আমাদের মিষ্টি দিতে যাচ্ছিলেন, অনুরূপবাবু বাধা দিলেন, "উঁহু, একদম নয়। আগে খালি পেটে জল খাক, তার পরে।"

আমরা দুজনেই ঢক ঢক করে জল খেলাম পেট ভরে। খেয়ে তৃপ্ত হলাম।

তারপর সোফায় দেহটা এলিয়ে দিলে একটু পরে অনুরূপবাবুর স্ত্রী আমাদের প্লেট ভর্তি খাবার দিলেন— বড় বড় শিঙ্গাড়া, প্যাঁড়া, চমচম। দেখেই তো নোলায় জল এসে গেল। বেশ তৃপ্তি করেই তাই খেয়ে আবার জল খেলাম।

তারপর চা।

জলযোগপর্ব শেষ হলে অনুরূপবাবুর স্ত্রী আমাদের ঘর গুছিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "শোনো, এই একমাসের জন্য তোমরা আর চক্ষুলজ্জা দেখিয়ে নিজেরা রেঁধে খেতে যেও না। যা হবে সব একসঙ্গে হবে। আলাদা কিছুর ব্যবস্থা না করাই ভাল। তা ছাড়া আমি তোমাদের বুড়ি দিদা। আমি থাকতে তোমরা রেঁধে খেতেই বা যাবে কেন? দুদিন বাদে এই ঘরদোর খাট আলমারি সবই তো পড়ে থাকবে। কাজেই তোমরা মনে কোরো তোমরা তোমাদের দাদু দিদার কাছেই এসেছ।"

এই কথার পরে আর কথা চলে না।

একটু পরে ফাগু ফিরে এলে রুমিদি দিদার সঙ্গে গৃহস্থালীর কাজে ও রান্নাবান্না নিয়ে মেতে উঠলেন। আর আমি করলাম কি, চুপি চুপি বাড়ির বাইরে এসে ডানদিকের বনপথ ধরে এগিয়ে চললাম প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে দেখতে। কত অসংখ্য টিলা যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখানে তার ঠিক নেই। আর কী অনবদ্য শোভা এখানকার! যেন প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য, যা আমি জীবনেও ভুলব না।

চার

সেদিনটা বেশ ভালোভাবেই কাটল।

পরদিন খুব ভোরে দাদু-দিদা আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। বললেন, "আর শুয়ে থাকা নয়, ওঠো। মর্নিংওয়াক করে আসি চল।"

আমি তো এইসবই চাই। রুমিদিও। তাই চটপট উঠে তৈরি হয়ে নিলাম আমরা।

আকাশ তখনও ভাল করে ফর্সা হয়নি। অসংখ্য তারায় ভরে আছে আকাশ। পাখিরা এক এক করে জেগে উঠছে। আমরা ভালরকম শীতবস্ত্র গায়ে চড়িয়ে উঁচু নিচু পাথর ওঠা পথ ধরে সমুখপানে এগিয়ে চললাম। যেদিকে গাছপালা খুব ঘন সেদিকে না গিয়ে অপেক্ষাকৃত হালকা গাছপালা যেদিকে সেইদিকে গেলাম। দাদুর মুখে শুনলাম এই দিকটায় হিংস্র জন্তুর উপদ্রব সেরকম নেই যদিও, তবুও সাবধানের মার নেই। কেননা ভালুক-টালুকগুলো মাঝে মধ্যে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থাকে।

সে যাই হোক, বেশি দূরে অবশ্য যেতে হল না আমাকে। খানিক যাবার পরই পা দুটো বেরিয়ে পড়ল। অজান্তেই কখন একসময় ধুপ করে বসে পড়লাম আমি।

দিদা হেসে বললেন, "কী হল তোমার?"

কমিদি বললেন, "ওই তো ওর রোগ। বড় দুর্বল।"

দিদা বললেন, "একদম নার্ভাস হয়ো না। একটু জিরিয়ে নাও, তারপর আবার হাঁটো।"

দাদু বললেন, "আসবার আগে জল খেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ! পেট ভরে জল খেয়ে এসেছি।"

"তা হলে আর মাত্র দুদিন। তারপরই দেখবে শরীরে দুর্বলতা বলে কিছুই আর নেই। ওসব অ্যানিমিয়া-ট্যানিমিয়া কোথায় চলে গেছে। গায়ে এমন জোর হবে যে ছুটতে পারবে তখন। নেহাত পরের ছেলে, তোমার ওপর কোনও জোর তো নেই। না হলে এই যে এসেছ তুমি আব তোমাকে যেতেই দিতাম না। বরাববের জন্য রেখে দিতাম।" বলেই একটু হেসে বললেন, "কী ভায়া, রেখে দিলে থাকবে নাকি?"

আমিও হেসে বললাম, "এই জায়গা কি কেউ ছেড়ে যায়? কিন্তু আমার স্কুলে যাওয়া, পড়াশোনা সে সবের কী হবে?"

"সব কিছুরই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আসলে ব্যাপার কি জান? মানুযেব জীবনে এই দেহটার জন্যই সব কিছু। দেহই মানুযের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেই দেহই যদি সুস্থ না থাকে তা হলে লেখাপড়া শিখেই বা লাভ কী?"

এইভাবে কথা বলতে বলতে আমরা ধীর পায়ে আরও অনেকক্ষণ হাঁটলাম। কথাপ্রসঙ্গেই বললাম, "এখানে থেকে গেলে কিন্তু মন্দ হয় না। তবে কি জানেন, বাবা মাকে ছেড়ে যে বেশিদিন থাকতে পারব না।"

আমার কথা শুনে দাদু-দিদা দুজনেই হেসে উঠলেন।

যথা সময়ে হাঁটা শেষ করে বাড়ি ফিরলাম আমরা।

ফাগু এসে বলল, "কী দাদাভাই, বেড়ানো হল? চল এবার আমার সঙ্গে বাজারে চল।"

আমি বললাম, "তোমাদের বাজার মানে তো সেই দেওঘরে?"

"এটাও তো দেওঘর।"

"জানি। তবু আজ আর পারছি না গো। বড্ড বুক ধড়ফড় করছে। অন্য একদিন নিশ্চয়ই যাব।"

ফাগু চলে গেল।

আমি ছাদে উঠে রোদ পোহাতে পোহাতে দূরের বনভূমি ও পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে

লাগলাম। এখান থেকে চারদিকের দৃশ্য খুব ভালভাবে দেখা যায়।

একটু পরেই রুমিদি আমাকে মরিচ-মাখানো চিড়েভাজা ও সন্দেশ দিয়ে গেলেন। তারপর চা।

আমি চা খেয়ে যখন নীচে নামলাম তখন দেখি রুমিদি দিদার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ঠাকুরের ছবিতে পরাবার জন্য ফুলের মালা গাঁথছেন।

বাবা-মার সঙ্গে একবার আদ্যাপীঠে গিয়ে যে মূর্তি দেখেছিলাম এখানে দেখি তারই বাঁধানো ছবি রয়েছে সিংহাসনে। আর আছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদা মায়ের ছবি। সেই সঙ্গে আরও একজনের। সে ছবিটা যে কার তা অবশ্য আমি জানতাম না। তাই চুপি চুপি রুমিদিকে বললাম, "রুমিদি, ওই ছবিটা কার বল তো?"

দিদা শুনতে পেয়ে বললেন, "ওমা, সেকি! এ ছবি কার জান না? ইনিই তো অন্নদাঠাকুর। আদ্যামার মূর্তি ইনিই তো ইডেন গার্ডেন থেকে আবিষ্কার করেছিলেন।"

আমার মন তখন ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

রুমিদি মালা গাঁথতে গাঁথতে বললেন, "নিজের খেয়ালে একা একা কোথাও যেন চলে যাস না। কাছাকাছিই থাকিস, বুঝলি?"

আমি বললাম, "না, না। আমি এই বাগানের মধ্যেই আছি।"

দিদা বললেন, "সেই ভাল। ঘরের ভেতর না থেকে মুক্ত আলো-বাতাসে যত থাকতে পারবে তত ভাল। পারলে খালি পায়ে চলাফেরা কোরো, কেমন?"

আমি 'আচ্ছা' বলে খালি পায়ে বাগানে এলাম। অনেকখানি জায়গা জুড়ে পাঁচিল দিয়ে বাগানটা ঘেরা। কত যে গাছ আছে এখানে তার ঠিক নেই। আম, কাঁঠাল, লেবু, পেয়ারা গাছ তো আছেই আর আছে করবী, চাঁপা, টগর, গোলঞ্চ, শ্বেতরঙ্গন ও লাল রঙ্গনের ঝাড়। লালমাটির বুকে সবুজ ঘাস ও লতাগুল্মে ভরা বনবীথি আমার মনকে ভরিয়ে দিল। শুধু কি তাই? কত রঙবেরঙের প্রজাপতি, কত পাখি, কত—। আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম।

আমার দুর্বলতা কোথায় গেল তা কে জানে? আমি ধীরে ধীরে এদিক সেদিক করতে করতে গোটা বাগানটাকেই চষে ফেললাম একসময়।

অনেক— অনেক পরে দেখলাম রুমিদিও আসছেন আমার কাছে।

আমার মতো রুমিদিরও নিশ্চয়ই ভাল লেগে গেছে জায়গাটা। ভাল তো লাগবেই। কী সুন্দর পরিবেশ এখানকার। কিন্তু এ কী! রুমিদিকে অমন মনমরা লাগছে কেন?

রুমিদির কাছে এসে বললাম, "তোমার কী হয়েছে রুমিদি? শরীর খারাপ?"

রুমিদি বললেন, "না রে। অন্য একটা ব্যাপার।"

আমি কৌতূহলী দৃষ্টিতে রুমিদির দিকে তাকালে রুমিদি বললেন, "জানিস না তো, দিদার মায়ের খুব অসুখ। এইমাত্র তার এল। এখন তখন অবস্থা। বাঁচবেন না এ যাত্রায়।"

"সে কী! দিদার আবার মা?"

রুমিদি বললেন, "হ্যাঁ, দিদার মা।"

আমি বললাম, "কী আশ্চর্য।"

"কেন? দিদার মা থাকতে নেই? পঁচানব্বুই বছর বয়স। কাশীতে থাকতেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"

"তা হলে?"

"তা হলে আর কী? দিদা কাঁদছেন। আজ রাতের গাড়িতেই চলে যাবেন ওনারা

"কোথায় যাবেন?"

"বেনারসে।"

"তার মানে তো কাশী।"

"হ্যাঁ। কাশীরই অপর নাম বারাণসী। ইংরেজদের দেওয়া নাম বেনারস। দাদু এইম ব্যাঙ্কে গেলেন টাকা তুলতে।"

আমি বাগান থেকে রুমিদির সঙ্গে ঘরে এলাম।

দিদা কী কান্নাটাই না কাঁদছেন তখন। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, "মাকে আমি অে চেষ্টা করেছিলাম আমাদের কাছে রাখতে, কিন্তু উনি শুনলেন না। কাশী ছেড়ে কিছুতে এলেন না উনি। মাসে মাসে টাকা পাঠাতাম, বছরে দু-চারবার যেতাম, মা বলে ডাকতা সব ঘুচে গেল।"

রুমিদি বললেন, "তবু তো আপনার ভাগ্য ভাগ বলতে হবে যে আপনার মা এতদি বেঁচেছিলেন। না হলে আজকের দিনে পঁচানব্বই বছর বেঁচে থাকা কি সবার ভাগ্যে হয়'

দিদা বললেন, "তোমরা তো দেখনি আমার মাকে। দেখলে বিশ্বাসই করতে না অ বয়স বলে। তবে সবচেয়ে খারাপ লাগছে যেটা, সেটা হচ্ছে এই প্রথম এলে তোম তোমাদের নিয়ে যে একটু আনন্দ করব তা আর বরাতে সইল না। এ এমনই ব্যাপার যে গেলে নয়। তবে ঘর-দোরের খুঁটিনাটি তো বুঝেই নিয়েছ, কাছে রইল ফাগু। ওই তোমাে দেখাশোনা করবে। নির্ভাবনায় থাকবে দুজনে। সকালে উঠে নিয়মিত মর্নিংওয়াক করে আমরা যে কবে ফিরব তা তো বলতে পারছি না, তবে দিন দশেকের মধ্যেই ফিরব আ করছি। এই কটা দিন একটু সাবধানে থেকো। দূরে কোথাও যেও না।"

রুমিদি বললেন, "না না কোথাও যাব না আমরা। এই রুগ্ন ছেলেটাকে নিয়ে যা বা কোথায়?"

যাই হোক, দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে দিদারা চলে গেলেন

রাতের গাড়ি। বেনারস এক্সপ্রেস।

ফাগু ওনাদের সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবে বলেছিল। কি ওনারা রাজি হলেন না। বললেন, "তুই কী যাবি? ছেলেমেয়ে দুটো এই নির্বান্ধবপুরীতে এ থাকবে, ভয় পাবে যে। তুই থাকলে তবু ওরা সাহস পাবে মনে। কাজেই ওদের এইভা রেখে তোর যাওয়াটা উচিত হবে না।"

তাই রয়েই গেল ফাগু।

একটা টাঙ্গা ডেকে ওঁদের বিদায় জানিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে মধুর করে হাস সে। বলল, "চলুন দিদিমণি, আমরা একটু মায়ের মন্দির থেকে ঘুরে আসি।"

মায়ের মন্দির বলতে কুণ্ডেশ্বরী মন্দির। আমাদের এই বাড়ির খুব কাছেই। জায়গা আরও শান্ত নির্জন ও বনময়। এখানে কুণ্ডেশ্বরীর উৎসবের সময় নাকি অনেক যা আসেন। অষ্টধাতুর এই মূর্তিটির মহিমাও অনেক। আর সবচেয়ে বড় কথা, এখানক প্রাকৃতিক পরিবেশের যেন তুলনা নেই। এখানকার বাতাসে নিঃশ্বাস নিলে গাছগাছালি সোঁদা গন্ধে বুক যেন ভরে ওঠে। শুচিতা, শুভ্রতা ও বিশুদ্ধতার প্রতীক যেন এই জায়গাট

আমরা অনেকক্ষণ কুণ্ডেশ্বরীর মন্দিরে বসে ওখানকার সুস্বাদু মিষ্ট জল পেট ভরে পান করে ফাগুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হেঁটেই চলে এলাম বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে। এখানে একটি শ্বেত পাথরের সুউচ্চ মন্দির আছে। এই মন্দিরটি তৈরি করতে ন-লাখ টাকা খরচ হয়েছিল বলে একে 'নলাখা' বা 'নওলাখিয়া মন্দির' বলে। এই জায়গাটার নাম করণীবাগ।

এমন মন্দির এর আগে আমি আর কখনও দেখিনি। শুধু কি মন্দির? আশপাশের পরিবেশ ও আশ্রমও দেখবার মতো। কত যে রঙ-বেরঙের গোলাপ গাছ, তাতেই কত যে ফুল ফুটে আছে তা কী বলব। সব দেখে শুনে সন্ধের আগেই ঘরে ফিরলাম আমরা।

পাঁচ

ফাগু যে কত কাজের লোক সে-রাতেই তার পরিচয় পেলাম। রুমিদির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আলুর দম আর পরোটা নিজেই বানিয়ে ফেলল সে। তারপর রুমিদির কাছ থেকে টাকা নিয়ে চলে গেল রাবড়ি কিনে আনতে।

ও থাকায় আমরা এমনই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলাম যে, এই বাড়িটাকে আর অন্যের বাড়ি বলে মনেই হল না। বরং অভিভাবকহীন এই বাড়িটা আমাদের নিজেদের বাড়ি বলেই মনে হল।

সন্ধের পর কনকনে শীত পড়ল আজ।

আসলে জায়গাটা দেওঘরে হলেও একেবারেই জমজমাট এলাকার বাইরে তো, তাই বেশ শীত। আর কনকনে সেই ঠাণ্ডার সঙ্গে খিদেও পেতে লাগল খুব। সবচেয়ে বড় কথা যা খাচ্ছি তাই হজম হয়ে যাচ্ছে। আর একদিনেই আমার মনে হচ্ছে আমি যেন অনেকটা দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছি।

খাওয়া দাওয়ার পর যখন ওপরের ঘরে শুতে গেছি তখনই হঠাৎ কোথা থেকে একটা টর্চের আলো এসে পড়ল আমার মুখে। সে কী দারুণ তীব্রতা! আমি ঘর থেকে বারান্দায় আসতেই বাগানের গাছপালার ওপর দিকে সরে গেল আলোটা।

রুমিদি তখন বাথরুমে ছিলেন।

আমি বারান্দা থেকেই হাঁক দিয়ে ডাকলাম, "ফাগু! ফাগু! একবার এদিকে এসো।"

ডাক শুনেই ওপরে উঠে এল ফাগু। বলল, "কী হয়েছে দাদাভাই?"

"শোনো কে যেন একজন আমার মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলল।"

"সে কী! কোথায় ছিলে তুমি?"

"ঘরেই ছিলাম।"

আমাদের এই বাড়ির অদূরেই পুরনো দিনের আরও একটি বাড়ি ছিল। সেই বাড়ির দোতলার জানলাটা কাল থেকে এসে পর্যন্ত বন্ধ দেখছি। আজই দেখছি তার জানলা খোলা।

ফাগু বলল, "কোনদিক থেকে আলোটা এল বলতে পার?"

আমি দেখিয়ে দিলাম সেই বাড়ির দিকে।

"ওটা তো ভবনাথবাবুর বাড়ি। কলকাতায় থাকেন। উনিই হয়তো এসে পড়েছেন হঠাৎ করে।"

"ওনার বাড়িতে পাহারা দেয় কে?"

''কেউ না। আগে একজন লোক ছিল অবশ্য। তবে যেকোনও কারণেই হোক সে কাজ ছেড়ে দিয়েছে।''

এমন সময় রুমিদিও বারান্দায় এসে বললেন, ''কী হয়েছে? অমন করে কী দেখছ ওদিকে?''

আমি বললাম, ''জানো রুমিদি, কে একজন না আমার মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলল।''

রুমিদির কাছে টর্চ ছিল। রুমিদিও এবার সেই বাড়ির জানলা লক্ষ করে টর্চের আলো ফেলল। কিন্তু কী আশ্চর্য! এই তো একটু আগেও খোলা ছিল জানলাটা, হঠাৎ বন্ধ হল কী করে?

ফাগু কেমন যেন সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে রইল সেইদিকে। তারপর বলল, ''ভবনাথবাবু এলে তো আমাদের বাড়িতে একবার দেখা করতে আসতেন।''

রুমিদি বললেন, ''হয়তো এসেছিলেন। আমরা সন্ধে পর্যন্ত বাইরে ছিলাম। সেই ফাঁকে এসেছিলেন হয়তো।''

ফাগু গম্ভীর হয়ে বলল, ''ঠিক আছে, কাল সকালেই দেখা যাবে কে এল ওই বাড়িতে।''

আমি বললাম, ''যেই আসুক, ঘরে মানুষজন এলে আলো তো জ্বলবে।''

ফাগুর চোখ দুটো অন্ধকারের মধ্যেও যেন জ্বলে উঠল একবার।

আমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম।

আজ শীত বেশি ছিল বলে ফাগু একটা লেপ বার করে দিয়েছিল।

আমি সেই লেপের ভেতরে কুণ্ডলি পাকিয়ে রুমিদিকে জড়িয়ে ধরে ওঁর বুকে মুখ গুঁজে চুপটি করে শুয়ে রইলাম।

রুমিদি বললেন, ''ছাড়, ছাড়রে ছেলেটা, এইভাবে শুতে আছে নাকি। বড় হচ্ছিস না? তাছাড়া দম আটকে আসছে আমার।''

আমি বললাম, ''আমি তোমাকে না জড়িয়ে শুতে পারব না।''

রুমিদি আদর করে বললেন, ''ওরে আমার দুষ্টুরে। একেবারে ছেলেমানুষ তুই।''

আমি এবার আমার বাঁধন আলগা করে শুলাম। রুমিদি সস্নেহে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। রুমিদিকে আমার বড্ড ভাল লাগে। উনি আমাকে এইভাবেই আদর করেন। আমার বয়স পনেরো, রুমিদির বাইশ। তবুও রুমিদির কাছে আমি যেন পাঁচ বছরের শিশুটি। আসলে ছোটবেলায় রুমিদিই তো আমাকে কোলে-পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাই এক একসময় ভাবি, রুমিদির বিয়ে হয়ে গেলে, ছেলেপুলে হলে তখনও কি রুমিদি আমাকে এমন করে ভালবাসবেন? কে জানে।

এইভাবে শুয়ে আদর খেতে খেতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। সেই ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে ভোরবেলায়।

আমি ঘুম থেকে উঠে বসেই রুমিদিকে ডাকলাম, ''রুমিদি ওঠো, মর্নিংওয়াকে যাবে না?''

রুমিদি এক ডাকেই উঠে বসলেন। বললেন, ''যাব না মানে? ওইজন্যেই তো আসা।'' বলেই দরজা খুলে বারান্দায় এলেন।

ওদিকের বাড়ির সেই জানলাটা আগের মতোই বন্ধ।

রুমিদি বললেন, "কাল তুই ভুল দেখিসনি তো?"

"না।"

"টর্চের আলোটা কি ওইদিক থেকেই এসেছিল?"

"হ্যাঁ। না হলে আলোটা আমার মুখে এসে পড়বে কী করে? ওই বাড়ির জানলার সঙ্গে এই বাড়ির দরজা একেবারেই মুখোমুখি। মুখে আলো পড়তেই আমি বারান্দায় এসে দেখি আলোটা বাগানের দিকে ঘুরে গেল। শুধু আলো নয়, ওই জানলায় একটা ছায়াশরীরও আমি দেখেছি।"

"তোর খুব ভয় করছিল?"

"না না। ভয় করবে কেন? কৌতূহল হচ্ছিল। আমার মনে হয় রুমিদি, ও বাড়িতে লোকজন তো কেউ থাকে না, তাই নিশ্চয়ই কোনও চোর এসেছিল ওই বাড়িতে।"

"হয়তো।"

যাই হোক, আমরা আর দেরি না করে খালি পেটে এক গেলাস করে জল খেয়ে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে ফাগুর সঙ্গে দেখা করে মর্নিংওয়াকে বেরোলাম। গতকাল দাদু-দিদার সঙ্গে যেদিকে গিয়েছিলাম আজ আর সেইদিকে না গিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলে গেলাম। এইভাবেই নতুন জায়গার পথ চেনা হোক।

এদিকটাও রমণীয়।

কত অসংখ্য গাছপালা এদিকে। বেঁটে বেঁটে পলাশের বন। সেইসঙ্গে সুবৃহৎ শাল সেগুন তো আছেই। আর আছে আমলকী হরীতকীর গাছ। মহুয়া গাছ যে কত তার আর লেখাজোখা নেই। বড় বড় ইউক্যালিপ্টাস, শিমূল ও কেন্দুগাছও আছে অনেক। এইসব গাছের কোনওটারই নাম আমরা জানতাম না। কাল দাদু-দিদাই আমাদের গাছ চিনিয়ে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, সেই বনপথ ধরে অনেক দূরে যাবার পর যখন ফিরে আসবার উপক্রম করছি তখন দেখি লংকোট পরা এক সুদর্শন যুবক আড়চোখে আমাদের দিকে দেখতে দেখতে হনহন করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। যুবক আমার চেয়েও বেশি দেখল রুমিদিকে। কিন্তু রুমিদি গ্রাহ্যের মধ্যেও আনলেন না তাকে।

আমার কেমন যেন ভয় হল।

এই যুবককে কাল তো দেখিনি! যদিও আমরা আসিনি এ পথে তবুও—।

আমরা আর পথে দেরি না করে বাড়ি ফিরে এলাম। আসবার সময় ছোট্ট একটা চালাঘরের দোকান থেকে শালপাতার ঠোঙায় করে গরম জিলিপিও কিনে আনলাম কিছু।

ফাগু আমাদের দেখেই চায়ের জল বসাল।

আমি তখন ওই যুবকের কথাটা বললাম ফাগুকে।

শুনে ফাগু বলল, "ওইরকম চেহারার কেউ তো এদিকে নেই। আর এত সকালে লংকোট পরে কে যাবে?"

আমি বললাম, "ভারি সুন্দর দেখতে কিন্তু তাকে। তবে চোখের চাহনিটা বড় বাজে। ইচ্ছে করছিল—"

রুমিদি হেসে বললেন, "ইচ্ছে যেটা করছিল সেটা যে করে ফেলিসনি এই রক্ষে।

দুর্বল শরীরে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসতিস তা হলে।''

আমি বললাম, ''আচ্ছা ফাগু, কাল রাতে ওই যে টর্চের আলোর কথা বললাম ওটার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখলে একটু?''

''হ্যাঁ দাদাভাই। তোমরা চলে যাবার পর আমি ওই বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম দরজা তো আগের মতোই তালা দেওয়া। কেউ তো নেই।''

রুমিদি বললেন, ''তুই নিশ্চয়ই ভুল দেখেছিস।''

আমি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললাম, ''মা কালীর দিব্যি।''

রুমিদি সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বললেন, ''আর কখনও ঠাকুর দেবতার নামে দিব্যি করিস না। ওতে দেবতারা অসন্তুষ্ট হন।''

যাই হোক, আমাদের চা-পর্ব শেষ হলে রুমিদি, আমি আর ফাগু একটা টাঙ্গা নিয়ে দেওঘরের বাজারে গেলাম বাজার করতে। বেশ বড়সড় বাজার। আর কী জমজমাট। এখানকার বিখ্যাত প্যাঁড়া গলিটাও ফাগু আমাদের চিনিয়ে দিল।

বাজারের ভেতরে গিয়েই ফাগু করল কি, এক জায়গায় একদল আদিবাসীর ভিড়ে কয়েকজন দেহাতির সঙ্গে ইট পেতে বসে পেট ভরে দহিচুড়া খেয়ে নিল। দহিচুড়া হল খাট্টা দই, লাল লাল মোটা চিড়ে ও প্যাঁড়ার সংমিশ্রণ। দেখে লোভ হল। কিন্তু অ্যাসিড হয়ে যাবার ভয়ে রুমিদি আমাকে খেতে দিলেন না। নিজেও খেলেন না।

এরপর মনের মতন শাকসব্জি নতুন ওঠা ফুলকপি ইত্যাদি কিনে মাছের বাজারে এলাম। দু'শ টাকা দরের টাটকা বড় রুইকাটা হাফ কিলো কিনে আবার একটা টাঙ্গা নিয়ে ফিরে এলাম কুণ্ডাতে।

ফিরে আসার পর ফের আর এক প্রস্থ চা হল।

সামান্য জলযোগের পর রুমিদি আর ফাগু রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

রুমিদি বললেন, ''তুই আর কী করবি? যা দিকিনি, ঠাকুরঘর থেকে সাজিটা নিয়ে গোটাকতক ফুল তুলে আন। আদ্যামাকে একটা মালা গেঁথে দিতে হবে।''

ফাগু বললে, ''ও কী ফুল তুলবে? ফুল যা তোলবার আমিই তুলে রেখেছি। এটা যে আমার রোজের অভ্যাস দিদিভাই।''

রুমিদি বললেন, ''তাহলে আর কি? তুই শুধু ঘুরে বেড়া।''

আমি চটিটা পায়ে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে ভবনাথবাবুর সেই বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। কী বিশাল আয়তনের বাড়ি। সামনের লোহার গেটে তালা দেওয়া। আমি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম সেই বাড়িটার দিকে। এই অঞ্চলে এইরকম বাড়ির অভাব নেই। সস্তা গণ্ডার বাজারে কলকাতার বিত্তবান ব্যক্তিরা একসময় এই সব বাড়ি তৈরি করেছিলেন হাওয়া বদল করতে আসার জন্য। এখন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সবই পোড়ো বাড়ির রূপ নিয়েছে।

যাই হোক, এই অঞ্চলের মধ্যে আমার মনে হয় এই বাড়িটাই সবচেয়ে বড় বাড়ি এমনকি অনুরূপবাবুর যে বাড়িতে আমরা আছি তার চেয়েও বড়। আর প্রায় বিঘে দুই জমি নিয়ে সাজানো বাগান। যদিও বাগানের অধিকাংশই জঙ্গলে ভরে গেছে তবুও বেশ লোভনীয়।

আমি আপন মনে সেই বাড়ির পাঁচিলের ধারে ধারে শান্ত নির্জন পথ ধরে এগিয়ে

চললাম।

হঠাৎ এক জায়গায় পাঁচিলের একটু ভগ্নাংশ আমার চোখে পড়ল।

আমি কৌতূহল নিবৃত্তি করতে না পেবে সেই ভগ্নাংশ পেরিয়ে বাগানে প্রবেশ করলাম; একটা গন্ধরাজ গাছের ডাল ধরে যখন আমি ঘাসজমিতে পা রাখলাম তখন কেন জানি না বারেকের তরে গা-টা একবার ছমছমিয়ে উঠল। একটু হয়তো ভূতের ভয়ে অথবা ভয়ঙ্কর নির্জনতার জন্য।

তবে সে বারেকের তরে। আমি বেশ কিছুক্ষণ দূর থেকে বাড়িটার দিকে লক্ষ রেখে এক পা এক পা করে এগিয়ে চললাম।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই এক জায়গায় একটি জিনিস দেখে চমকে উঠলাম আমি। দেখলাম সরু চেনের একটি ছিন্ন হার পড়ে আছে ঘাসজমিতে।

আমি সেটির ওপর ঝুঁকে পড়ে কুড়িয়ে নিলাম সেটিকে। তারপর নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলাম এটা সোনার না অন্য কিছুর। যাই হোক, আমি হারগাছাটা নেড়ে চেড়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবু সেটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে আরও এদিক সেদিক দেখতে লাগলাম। হঠাৎ এক জায়গায় একটি লকেট দেখেই চমকে উঠলাম আমি। এটা এখানে কী করে এল। লকেটে একটি নামও ছিল, গীতা।

গীতা যখন নাম তখন নিশ্চয়ই কোনও মেয়ের। আর এই ছিন্নহার বা লকেট তা হলে মেকি নয়। কেননা মেকি জিনিসে কেউ নাম খোদাই করে রাখে না।

হঠাৎই একটা সন্দেহ বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠল আমার মনে। তবে কি কাল রাতের সেই আলোর সঙ্গে এই ছিন্নহারের কোনও সম্পর্ক আছে? কোনও দুষ্কৃতী কি গীতা নামের কোনও মেয়েকে কিড্‌ন্যাপ করে লুকিয়ে রেখেছে এখানে? তা যদি হয় তা হলে তো এই নির্বান্ধবপুরীতে আমারও ওইরকম অবস্থা হতে পারে যে কোনও মুহূর্তে।

তবুও সাহসে ভর করে এক পা এক পা করে আমি এগিয়ে চললাম সেই বাড়ির দিকে।

বাগান পেরিয়ে বাড়ির কাছাকাছি যেতেই দেখলাম এক জায়গায় খড়খড়ি দেওয়া মোটা ফ্রেমের একটা জানলার পাল্লা ভাঙা। আর তার মরচে ধরা লোহার দুটো গরাদ চাড় দিয়ে বাঁকানো। তার মানে এই বাড়িব মধ্যে অবাঞ্ছিত অতিথিদের নিয়মিত যাতায়াত চলে। আমি তাই কোনওরকম দ্বিধাবোধ না করে সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

গোয়েন্দা গল্পের বই পড়ে মনটাও আমার সেইরকমভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাই বাড়ির ভেতরে ঢুকেই রহস্যের গন্ধ পেলাম। প্রথমেই লক্ষ করলাম এই বাড়ির মেঝেয় কারও কোনও পায়ের ছাপ আছে কি না। এক নজরেই বোঝা গেল একজন অথবা একাধিকজনের পায়ের ছাপ আছে সেখানে।

আমি খুব সন্তর্পণে সেই ছাপ দেখতে দেখতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম। এমনভাবে উঠলাম যাতে করে আমার পদশব্দে সচকিত হয়ে কেউ সতর্ক না হয়ে যায়।

দোতলার প্রশস্ত দালানে দেওয়ালের গা ঘেঁষে খানিক যাবার পরই এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম আমি। পরক্ষণেই চোখে মুখে অন্ধকার দেখলাম। কে বা কারা যেন হঠাৎ পেছনদিক থেকে চেপে ধরে হাত মুখ বেঁধে ফেলল আমার। দুর্বল শরীরে আমি তাদের একটুও বাধা দিতে পারলাম না।

ছয়

ভয় যে কী ভয়াবহ তা এই প্রথম অনুভব করলাম আমি। তখনই মনে হল কেন যে এম..
হঠকারিতা করতে গেলাম নিজের সঙ্গে। এই পোড়ো বাড়িতে এইভাবে ঢুকতে না এলে তে
এমন ফাঁদে পড়তে হত না। এখন উপায়? কী ভাবে মুক্তি পাব এদের হাত থেকে।

আমাকে ওরা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এসে একটি পাতালঘরে ঢুকিয়ে দিলে।

উঃ! সে কী ভীষণ অন্ধকার! এই দিনের আলোতেও সেই অন্ধকারে আমি কোনও
কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না।

যাবার সময় ওদের একজন বলে গেল, "স্পাইগিরি করতে আসা বের করছি
দাঁড়াও। আজ রাতেই তোমার হচ্ছে।"

ওদের কথামতো কী যে আমার হবে বা হতে পারে তা আমি কল্পনায় অনুমান করতে
পারলাম।

ওরা নিশ্চয়ই আমাকে কোথাও পাচার করে দেবে অথবা গলা টিপে মেরে ফেলবে
কিন্তু এরা কারা? কাল রাতে নিশ্চয়ই এদেরই কেউ টর্চের আলো ফেলেছিল আমার মুখে
আর ওই সুদর্শন যুবক? কালো ওভারকোট গায়ে দ্রুত পদক্ষেপে যেতে যেতে যে কিন
তাকিয়ে দেখছিল আমাদের দিকে। সেও কি এদেরই লোক?

আমি আর কোনও কিছুই ভাবতে পারলাম না। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে
লাগল।

এইসময় আমার খুব বেশি করে বাড়ির কথা মনে হতে লাগল। বাবা মা দুজনকেই
মনে পড়ল আমার। আর মনে পড়ল রুমিদি ও ফাগুকে। আমার ফিরতে দেরি দেখলে ওর
নিশ্চয়ই চারদিক তোলপাড় করবে। অথচ আমি যে ঠিক পাশের বাড়িতেই বন্দি হয়ে আছি
তা ওরা ভাবতেও পারবে না। অযথা চারদিকে খোঁজাখুঁজি করবে। তারপর থানা পুলিশ
হবে। রুমিদি নিশ্চয় টেলিগ্রাম করবেন আমার বাবাকে। তবে ওরা যদি বুদ্ধি করে একবার
এই বাড়ির দিকে অসেন তা হলেই সমস্যার সমাধান হয়। আমিও মুক্তি পাই এদের হাত
থেকে। অবশ্য এলেও যে আমাকে খুঁজে পাবে তা নয়, তবে ফাগুর পক্ষে অসম্ভব হবে ন
আমাকে উদ্ধার করা। কেননা এই বাড়ির কোনখানে যে এই চোরাকুঠরি তা আর কেউ ন
জানলেও ফাগুর অন্তত জানা উচিত।

আমি বন্দি অবস্থায় এই ঘরের মধ্যে যখন ছটফট করছি ঠিক তখনই হঠাৎ একটি
চাপা কান্নার স্বর আমার কানে এল।

কে কাঁদে? কে ও? আমার মতো ওকেও কি কেউ ধরে নিয়ে এসে আটকে রেখেছে
এখানে? হবেও বা। এই বন্দিশিবিরে আমি তা হলে একা নই।

আমার তো হাত পা মুখ সবই বাঁধা। তাই না পারলাম এগিয়ে যেতে, না পারলাম
সাড়া দিতে। তবুও আমি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেই বাঁধন খোলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা
করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বাঁধন আলগা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ির জন্য ওরা খুব
একটা শক্ত করে বাঁধতে পারেনি অথবা বাঁধেনি। সর্বাগ্রে মুখের বাঁধনটা সরে গেল।

এইবার আমি একটু হাঁফ ছেড়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কে? কে কাঁদে?"

কান্না এবার থেমে গেল।

উত্তর এল, "আমি গীতা। তুমি কে?"

"আমি সৌরভ। তুমিও কি বন্দিনী?"

"হ্যাঁ। তবে তোমার মতো অতটা খারাপ অবস্থা আমার নয়। আমাকে ওরা বেঁধে রাখেনি। কিন্তু তুমি কী করে এদের খপ্পরে পড়ে গেলে?"

"আমার নিজের দোষে।"

এতক্ষণে একটু নিঃশ্বাস আমার গায়ের ওপর অনুভব করলাম আমি। মেয়েটি আমার অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। অন্ধকার এত ঘন যে ওর অস্তিত্ব টের পেলেও ওকে স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম না। ও কাছে এসেই আমাকে স্পর্শ করে সর্বাগ্রে আমার বন্ধনমুক্ত করল।

আমি একটু দম নিয়ে বললাম, "তুমি কতদিন এখানে আছ?"

"বেশিদিন নয়। কাল সন্ধেবেলা ওরা আমাকে এইখানে নিয়ে এসেছে। আজ রাতের অন্ধকারে নিয়ে যাবে অন্য কোনওখানে।"

"এ কথা তুমি কী করে জানলে?"

"ওদের আলোচনায় শুনেছি।"

"এখানে তুমি কি একা? না আর কেউ আছে?"

"জানি না, তবে মনে হয় আমি একা। আর কাউকে তো দেখিনি, শুধু তোমাকেই দেখলাম।"

"তোমার বাড়ি কোথায়?"

"কলকাতায়। আলিপুরের রাজা সন্তোষ রোডে। একদিন আমরা দু-ভাইবোনে স্কুলে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ওরা আমাদের দুজনকেই অপহরণ করে। কলকাতা থেকে একটা গাড়িতে করে প্রথমেই আমাদের নিয়ে যায় বিহারের বেগুসরাইতে। তারপর সেখানে হঠাৎ করে একদিন পুলিশি ঝামেলা হতেই আমরা দু ভাইবোনে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই।"

"তোমার ভাই এখন কোথায়?"

"কী করে জানব? তার কোনও খবরই আমার কাছে নেই। আমি নিজেই তো এই অন্ধকার ঘরে।"

হঠাৎ আমার কী মনে পড়ে যেতে বললাম, "আচ্ছা গীতা, তোমার কি কিছু হারিয়েছে?"

"আমি নিজেই যেখানে হারিয়ে গেছি সেখানে আমার আর হারানোর মতো কী থাকতে পারে?"

"তা অবশ্য ঠিক। তবে কৌতূহলের বশে এই বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে একটি ছিন্নহার ও লকেট আমি কুড়িয়ে পাই। সেই লকেটে একটি নাম লেখা আছে। সে নাম—।"

"গীতা। তাইতো? ওটা আমার গলার হার। দুষ্কৃতিরা ছিনিয়ে নেয়নি। আমি ইচ্ছে করেই ওটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিই যদি এই ছিন্নহারের সূত্র ধরে কেউ আমাকে উদ্ধার করে। এমন সময় তুমি এলে।"

আমি মনে সাহস সঞ্চয় করে বললাম, "হয়তো আমার দ্বারাই সেই অসম্ভবটা সম্ভব হতে পারে।"

আমার কথা শুনে হেসে ফেলল গীতা। বলল, "তা কী করে হবে? তুমিই তো এখন

বন্দি।''

''হলেই বা। জেল ভেঙে কয়েদীরা পালায় না? মনে করো না কেন আমরাও সেইরকম। একটু কৌশল করতে হবে। হতাশ হয়ে চুপচাপ বোকার মতো বসে বসে কাঁদলে হবে না। লড়তে হবে ওদের সঙ্গে। বুদ্ধির চাল চালতে হবে।''

''কিন্তু কী ভাবে? আমার তো মনেই হয় না এদের হাত থেকে কখনও মুক্তি পাব বলে।''

আমি কঠিন গলায় বললাম, ''মুক্তি পেতেই হবে। তা সে যেভাবেই হোক। এই অন্ধ নরকে পচে মরবার জন্য আমাদের এই জীবন নাকি?''

''তুমি কি সত্যই আমাকে আশার আলো দেখাতে চাইছ?''

''হ্যাঁ। তার কারণ আমার দুর্দান্ত মনের জোর আছে। আমি কত বই পড়েছি তা জানো? আমার একমাত্র প্রিয় বই হল পাণ্ডব-গোয়েন্দা। তাছাড়াও সোনার গণপতি হিরের চোখ, গোয়েন্দা অম্বর, অভিশপ্ত তিড়িম, কত-কত বই পড়েছি আমি। আমাদের মতো এইরকম বিপদে কেউ পড়লে অন্তিম মুহূর্তে কী করা উচিত তা ওইসব বই পড়ে বুঝতে পারবে। ভূতের গল্পে যেমন মনের ভয় কাটায়, তেমনি ওইসব গোয়েন্দা রহস্যে উপস্থিত বুদ্ধি জোগায়। আপাতত আমি যা যা বলব তুমিও ঠিক সেইমতো কাজ করবে। মনে হয় এক চালে বাজিমাত হবে আমাদের।''

আমার কথায় গীতার চোখদুটো আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল কি না অন্ধকারে তা বোঝা গেল না। তবে মনে হল সে মনের মধ্যে বেশ খানিকটা জোর পেয়েছে। বলল, ''পারবে? পারবে তুমি এই বন্দিশালা থেকে আমাকে উদ্ধার করতে? নিজেকে মুক্ত করতে?''

''পারব। কেননা দুজন বলেই এটা সম্ভব। একা হলে অন্যরকম পরিকল্পনা করতে হত। যেহেতু দুজন, তাই—।'' বলে যা করতে হবে তা বলে দিলাম গীতাকে।

গীতা বলল, ''কিন্তু যদি আমাদের চাল ভেস্তে যায়?''

''তা হলে যেমন আছি তেমনই থেকে যাব। এখন যে অবস্থায় আছি এর চেয়ে খারাপ অবস্থা নিশ্চয়ই আর কিছু হবে না।''

''তা অবশ্য ঠিক।''

আমি যা পরিকল্পনা করলাম তা হল, ওরা যখন আমাদের অন্য কোথাও নিয়ে যাবার জন্যই হোক বা কিছু খেতে দেবার জন্যই হোক এই ঘরের ভেতর আসবে ঠিক তখনই আমরা দুজনে আক্রমণ করব ওদের। আক্রমণটা গায়ের জোরে নয়। যে দড়িতে ওরা আমার হাত পা বেঁধে রেখেছিল সেই দড়ির দুই প্রান্ত আমরা দু'দিক থেকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকব পাতালঘরে নামার মুখে দরজার কাছে। ওরা ঘরে ঢুকতে গেলেই দড়ি পায়ে জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। আর সেই সুযোগে আমরা পালাব।

আমার যুক্তিটা দারুণ পছন্দ হল গীতার। বলল, ''এর চেয়ে ভাল উপায় আর হয় না। কিন্তু পালাবার সময় আর কেউ যদি ধরে ফেলে আমাদের?''

''সে ভয় খুব একটা নেই। তার কারণ এটা দুষ্টচক্রের বড়সড় কোনও ঘাঁটি নয়। তাড়াহুড়ো করে তোমাকে ওরা নিয়ে আসার সময় এইখানে লুকিয়ে রেখেছিল, আর আমি বোকার মতো ধরা পড়ে গেছি। এদের মূল ঘাঁটি অন্যত্র। সেই যেখানে তোমাকে সরিয়ে

"কইরে! কেউ তো নেই এর ভেতর"?

নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে, আমাকেও সেখানে নিয়ে যেত। যদি এখান থেকে আমরা বেরোতে পারি তা হলে ওই মূল ঘাঁটি আমরা খুঁজে বার করে পুলিশকে জানাব। তাছাড়া ফাণ্ড যা আছে না, সে যদি একবার জানতে পারে, তা হলে আমাকে গুম করার মজা হাড়ে হাড়ে টের পাবে বাছাধনরা।"

গীতা বলল, "আমি কিন্তু সর্বাগ্রে আমার বাবাকে ফোন করে জানাব। শুধু মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার ভাইটার জন্য। কী যে হল তার কে জানে?"

এমন সময় হঠাৎ পদশব্দ শোনা গেল।

তারপর বাইরে থেকে শিকল খোলার আওয়াজ।

আমরা দুজনে পরিকল্পনা মতো দড়িটা টান করে দরজার আড়ালে লুকিয়ে রইলাম।

টর্চের তীব্র আলো একটা ঘরের মধ্যে এসে পড়ল।

একজন বলল, "কইরে। কেউ তো নেই এর ভেতরে?"

"আছে আছে ভাল করে দেখ।"

"বলছি নেই।"

"নেই বললেই হল? এক ঘণ্টাও হয়নি রেখে গেছি ওদের।"

"আগে নীচে নাম। ভেতরে ঢোক। অনেকক্ষণ খায়নি ছেলেমেয়ে দুটো। এই ঘোলের সরবত এক গেলাস করে খেলেই চিত্তির। ভুবন অন্ধকার দেখবে বাছাধনরা। আর সেই সুযোগে ওদের নিয়ে একবারে তপোবন পাহাড়ের নির্জন পরিবেশে। দেখি এবার ধরে কে?"

"ছেলেটার ব্যাপারে এদিকে বাইরে দারুণ হইচই পড়ে গেছে জানিস তো?"

"পড়ুক না। অচৈতন্য ছেলেমেয়ে দুটোকে একটা পিচের ড্রামে ঢুকিয়ে পাচার করে দেব। আমার নাম গোখরো।"

"কুমারদা এই কাজটা কিন্তু ভাল করল না। ওই রুগ্ন ছেলেটাকে না ধরলেই পারত।"

"তুই বড় বাজে বকছিস। নীচে নামবি কি না?" বলে ওর হাত থেকে টর্চটা নিয়ে সেই আলোয় চারদিক দেখতে দেখতে যেই না এক ধাপ নেমেছে অমনি পায়ে দড়ি জড়িয়ে মুখ থুবড়ে ঘরের মেঝেয় একজন দড়াম।

আর একজন যে দাঁড়িয়েছিল সে কিছু বোঝার আগেই আমি তার পা ধরে এমন টান দিলাম যে নিজেই উল্টে পড়লাম ধাপের নীচে। লোকটাও পড়ল।

সেই মুহূর্তে গীতা আমাকে তুলে দাঁড় না করালেই হয়েছিল আর কি।

আগে যে লোকটা পড়েছিল অর্থাৎ যার নাম গোখরো সে বলল, "কেউটে রে। আমার মনে হয় ওই ছেলেমেয়ে দুটো মানুষের বাচ্চা নয়। নির্ঘাত ভূতের বাচ্চা। না হলে এ কী হাল করল আমাদের।"

কেউটে বলল, "যা বলেছিস। তবে একবার যদি নাগাল পাই ওদের তো—"

আমরা ততক্ষণে ওপরের ধাপে উঠে দরজার কাছে গিয়ে "কেউটে গোখরো টা-টা" বলে দরজায় শিকল তুলে দিলাম।

ওরা তো ফাঁদে পড়ে চিৎকার চেঁচামেচি দমাদমি শাপশাপান্ত যা ইচ্ছে তাই করতে লাগল। পাতালঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে সবের কিছুই আমাদের স্পষ্টভাবে কানে এল না। তবে ক্ষীণ ও চাপা শব্দ শুনে তা অনুভব করতে পারলাম।

মুক্তির বাতাস পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম দুজনে। এই প্রথম গীতাকে দেখলাম আমি। কী দারুণ মিষ্টি মেয়ে। ওকে যে কী ভাল লাগল তা বলে বোঝাতে পারব না। তার ওপরে আমারই সমবয়সি। ওকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। যতক্ষণ না ওর বাবা মা ওকে নিতে আসেন বা অন্য ব্যবস্থা না হয় ততক্ষণ ও আমাদের কাছেই থাকবে। আমি আছি, রুমিদি আছেন, ফাগু আছে। কোনও অসুবিধেই হবে না ওর। এখন এ বাড়িব বাইরে যাবার পথ কই? কোনখান দিয়ে যে এই চক্রব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম তা তো মনে নেই। যাই হোক, পালাবার পথ একটা খুঁজে বের করতেই হবে। আমরা এদিক সেদিক সতর্ক দৃষ্টি রেখে দুজনে হাত ধরাধরি করে দালানের মধ্য দিয়ে এগোতে লাগলাম।

হঠাৎই আমাদের চোখের সামনে এমনই একজনের আবির্ভাব ঘটল যাকে দেখলে যমের বুকও ভয়ে শুকিয়ে যাবে।

গীতা তো চিৎকার করে উঠল।

আমারও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বার মতো অবস্থা। সেই মুহূর্তে আমি দিদার ঘরের সেই আদ্যামাকে স্মরণ করতে লাগলাম। কিন্তু করলে কী হবে? গ্রহচক্রকে তো আটকানো যাবে না। আমার এই ডাক যতক্ষণে তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছবে ততক্ষণ আমাদের দুর্ভোগ এড়াবে কে? ভগবান সর্বশক্তিমান। কিন্তু শয়তানও কম শক্তিমান নয়।

সেই ভয়ঙ্কর তার লৌহকঠিন দুটি হাত বাঘের থাবার মতো উঁচিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। গীতা চোখ বুজল ভয়ে। আমি এক পা এক পা করে পিছু হটতে লাগলাম।

সাত

পারলাম না। পারলাম না ওই রাহুর গ্রাস থেকে নিজেদের মুক্ত করতে। লোকটা আমাদের দুজনের ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে গেল অন্য একটি ঘরে। তারপর ঠাস ঠাস করে দুজনের গালে দুটো চড় কষিয়ে বলল, "তোদের সাহস তো কম নয়! টাকার খনি তোরা, আমাদের গর্ত থেকে পালাতে চাস?"

আমি বললাম, "তোমরা আমাদের এই ভাবে আটকে রেখেছ কেন?"

"উদ্দেশ্য একটা নিশ্চয়ই আছে। সেটা পরে জানতে পারবি। আমার নাম ময়নিহান। লোকে আমাকে ময়দানব বলে! আমার প্রাণে কোনও মায়ামমতা নেই। তোরা হচ্ছিস আমাদের টোপ। তোদের দিয়ে চিঠি লিখিয়ে তোদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে মাঝে মধ্যেই টাকা আদায় করব আমরা। টাকা দিলে ভাল, না দিলেই মেরে ফেলব তোদের।"

"কত টাকার বিনিময়ে তোমরা আমাদের মুক্তি দেবে?"

"কোটি টাকার বিনিময়েও নয়। একবার টাকা দিলে আবার চাইব, তারপর আবার। ওরা শুধু দিতে থাকবে, আমরা নিতেই থাকব। যেই বলবে দেব না, অমনি গলা টিপে মেরে ফেলব তোদের। এইরকম আরও অনেক ছেলেমেয়ে আমাদের গোপন ঘাঁটিতে আছে।"

গীতা বলল, "আমার ভাই, আমার একমাত্র আদরের ভাই মনুকে কোথায় রেখেছ তোমরা?"

"ওর ভাগ্যটা ভাল। তাই ও আমাদের হাত থেকে ফসকে বেরিয়ে গেছে। ও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে। তোর কিন্তু মুক্তি নেই। আর রেহাই নেই এই ছেলেটার। এ তো

নিজেই এসে ধরা দিয়েছে।"

এমন সময় ছিপছিপে রোগা লম্বাটে চেহারার একজন অল্পবয়সী যুবক এসে বলল, "দানো! এই দানো!"

ময়দানব গর্জে উঠে বলল, "আরে দানো নেহি, ময়দানো। বাঙালি ছোকরাদের এইজন্যে কিছু হল না। ময়দানব বল।"

"আরে তামাশা রাখো। বস বলল এখনই এই ড্যারা ছেড়ে পালাতে।"

"বসের কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এই দিনের আলোয় কোথায় নিয়ে যাব দু-দুটো দজ্জালকে?"

"এমনি নিয়ে যেতে কে বলেছে? অজ্ঞান করাও ওদের। কেউটে আর গোখরো কোথায়?"

"ওরা পাতালঘরে বন্দি হয়ে আছে। তুই গিয়ে নিয়ে আয় ওদের, নয়তো সামাল দে এই দুটোকে।"

"আমিই দেখছি এদের। তুমি যাও।"

ময়নিহান চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, "এই দুজনের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকবি। গোলমাল করলেই চালিয়ে দিবি। এতটুকু দয়ামায়া দেখাবি না।"

আমি আর গীতা দুজনেই একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। কোনওরকমভাবেই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলাম না ওদের। কেননা এখন চেষ্টা করলেও পালাতে পারব না বরং সুস্থ শরীর ব্যস্ত করে দেবে ওরা। প্রয়োজনে খুন করতেও দ্বিধা করবে না। বিশেষ করে যাকে আমাদের পাহারায় রেখে গেল তার হাতে একটা স্প্রিং দেওয়া ছোরা।

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই ফিরে এল সেই দানব। সঙ্গে কেউটে আর গোখরো। ওরা এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের দুজনের ওপর। দুজনে এসে আমাদের দুজনের গলা এমনভাবে টিপে ধরল যে দম বন্ধ হয়ে চোখমুখ ঠেলে বেরিয়ে আসবার উপক্রম হল আমাদের।

ওইসময় ময়নিহান ওদের দুজনকে ছাড়িয়ে না দিলে যা হত সেকথা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

যন্ত্রণায় চোখে জল এসে গেল আমাদের। গলাটা টাটিয়ে উঠল। একে রুগ্‌নো শরীর আমার, তার ওপর অমানুষিক আক্রমণ, এ কখনও সহ্য হয়?

যে লোকটা ছোরা হাতে পাহারা দিচ্ছিল আমাদের, সে এবার বলল, "শোনো ভাই, একটা কথা বলি। তোমাদের দুজনকে আর এখানে রাখা যাবে না। ফাগু ওর দলবল নিয়ে এই বাড়িতে চড়াও হয়েছে। তাই এখনই পালাতে হবে আমাদের। যদি তোমরা চুপচাপ থাক তা হলে ঠিক আছে। না হলে কিন্তু ওষুধ প্রয়োগ করে অজ্ঞান করতে হবে তোমাদের। এখন বলো তোমরা কী চাও?"

ফাগু এসেছে শুনেই বুকে যেন অসুরের বল পেয়ে গেলাম আমি। তাই জোর গলায় বললাম, "আমি চাই তোদের সর্বনাশ। ফাগুর হাতে মার খেয়ে মর তোরা।" বলেই চেঁচিয়ে উঠলাম, "ফাগু, আমি এ—খা—নে।"

ময়দানব তখন ঘরের দরজায় খিল দিয়ে আমার আর গীতার মুখ চেপে ধরেছে।

কেউটে গোখরো আর সেই লোকটি তখন অন্য একটি দরজা খুলে আমাদের নিয়ে

একেবারে বাগানে। তারপর বাঘ যেভাবে ছাগলছানা ধরে নিয়ে পালায় ঠিক সেইভাবে বাগানের বাইরে এসে একটা বড় থলির মধ্যে আমাদের দুজনকে পুরে একটা খড় বোঝাই গরুর গাড়িব মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। আমাদের দুজনেরই তখন চেতনা লোপ পাওয়ার জোগাড়। অসহায় অবস্থায় আমাদের দম যেন বন্ধ হয়ে এল।

গরুর গাড়ি চলতে লাগল একটু একটু করে। কোথায় যে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে ওরা, কিছুই জানি না তা।

বেশ কিছুদুর যাওয়ার পর এক জায়গায় আমাদের দুজনকে বস্তাসুদ্ধু নামাল ওরা। তারপর বস্তার মুখ খুলে ভেতর থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে বার করল।

আমরা দুজনেই তখন নেতিয়ে পড়েছি খুব।

প্রথমেই আমরা প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলাম। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম এখানে শুধু পাহাড় আর পাহাড়।

কেউটে আর গোখরো বলল, "আমাদের চেয়েও তোরা খুব চালাক না?"

যে লোকটির হাতে স্প্রিং দেওয়া ছোরা ছিল সে বলল, "অযথা আস্ফালন না করে নদী থেকে একটু জল এনে মুখে দে ওদের।"

কাছেই নদী। কেউটে গোখরোর বদলে সেই লোকটিই গিয়ে আঁজলা ভর্তি জল নিয়ে এল। নিয়ে এসে চোখে মুখে দিল আমাদের।

ময়নিহান তখন মস্ত একটি তেলের পিপেকে গড়িয়ে গড়িয়ে আনছে। পিপেটা পাহাড় জঙ্গলের ধারে কোথাও যেন আগে থেকেই রাখা ছিল। সে দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলল, "ও দুটোকে এর মধ্যে ঢুকিয়ে মুখটাকে এঁটে দে নেলো। আর গরুর গাড়ির মুখটা ঘুরিয়ে দে। ওটা ফিরে যাক।"

ছোরা হাতে লোকটির নাম বুঝি নেলো। সে বলল, "কী যে করছ কিছু ভেবে পাচ্ছি না। আগাগোড়া কাঁচা চাল চালছ কিন্তু। নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনছ।"

"তোকে যা করতে বলছি তাই কর না তুই।"

"ওরা কিন্তু এল বলে। ফাগুকে তো চেন না, যতই কেন ঘটোৎকচের মতো চেহারা হোক তোমার, ইচ্ছে করলে ও তোমার ঠ্যাং-দুটো ছিঁড়ে দিতে পারে।"

কেউটে আর গোখরো কী দেখে যেন লাফিয়ে উঠল হঠাৎ "ওই—ওই আসছে। প্রায় দশ বারোজন লোক আসছে এদিকে।"

ময়নিহান হঠাৎ গীতাকে তুলে নিয়ে পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে হাবিয়ে গেল। যাওযার সময় বলে গেল, "ওই ছোকরাটাকে তোরা সামাল দে।"

কেউটে আর গোখরো করল কি আমাকে সেই পিপের মধ্যে ঢুকিয়ে মুখটা তক্তা এঁটে গড়গড় করে গড়িয়ে দিল নদীর দিকে। উঃ! সে কী কষ্ট!

নেলোটা তখন কোথায় গেল কে জানে?

একটু পরেই প্রচণ্ড একটা কোলাহল আমার কানে এল। তারপরই জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন বুঝলাম আমার সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। সর্বাঙ্গ চটচট করছে। জ্বালা করছে। স্থানে স্থানে ছড়ে গিয়ে চিনচিন করছে। পিপের মুখটা পিচ পাইন কাঠের তক্তা দিয়ে আঁটা ছিল। ফাঁক ছিল তার চারদিকে। তাই অক্সিজেনের অভাব হচ্ছিল না। তবে দিনের আলো তখন নিভে আসছিল। এ কোথায় যে এলাম আমি কিছুই

জানি না। আমার খুব ভয় করলে লাগল।

আমি তখন বাঁচতে চাই। পিপের গায়ে ঠেস দিয়ে দুপায়ে জোর দিতেই আঁটা মুখটা আলগা হয়ে গেল। আর তখনই মনে হল আবার কে যেন গড়িয়ে দিল পিপেটাকে। আমি পিপে সুদ্ধু নদীর গর্ভে গিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ দেখি পিপেটাকে ধরে কেউ যেন টানাটানি করছে। ততক্ষণে আমার সর্বাঙ্গ ভিজে সবসপ করছে। উঃ কী শীত। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম আমি।

কে যেন বলল, "মালুম হোতা হ্যায় কি ইসকো অন্দরমে হ্যায় কোঈ।"

একটি মেয়েলি গলা শোনা গেল এবার, "প্রেতোয়া।"

অর্থাৎ কিনা ভূত। আমি কি ভূত? সত্যিই কি মরে ভূত হয়ে গেছি আমি?

ততক্ষণে ওরা দুজনে চাড় দিয়ে খুলে ফেলেছে মুখটাকে। আমি খোলা মুখ দিয়ে গুটি গুটি বেরিয়ে আসতেই ওরা ভয়ে পালাল আমাকে দেখে।

গোধূলিবেলায় গরু মোষ ছাগল ভেড়া চড়িয়ে ঘরে ফিবছিল ওরা। দু-ভাই বোন অথবা ওইরকম কেউ।

আমি হেঁকে বললাম, "আবে ভাই শোনো তো? মাৎ যাও। আমাকে একটু দেখো।"

আমি হিন্দি ভাল বলতে পারি না। তবু একটু খিচুড়ি পাকিয়ে বললাম।

ওরা আমার কথা শুনে থমকে দাঁড়াল একবাব। তারপব ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে এগিয়ে এল আমার দিকে। খানিক এসেই আবার দৌড়। দৌড়—দৌড়—দৌড়।

ওদের আর দোষ কী? আমি নিজেই বুঝতে পারছি আমার শরীরেব অবস্থা কিবকম তেল কালিতে মাখামাখি হয়ে গেছি আমি। কিন্তু কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না এই অবস্থায় আমি কী করব। বাড়ির পথ কোনদিকে তা জানি না। চারদিকে ঘন গাছপালা। আর অসংখ্য টিলা পাহাড়। যদি কোনও বাঘ ভালুক বেরিয়ে আসে এই সময়ে?

এমন সময হঠাৎ দূরে একটা আলো দেখে থমকে দাঁড়ালাম। মনে হল কে যেন সাইকেলে চেপে আসছে এইদিকে।

ওই তো রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ওই লোকটার সাইকেলে চাপলে ও কি আমায যথাস্থানে পৌঁছে দেবে না?

আমাব পা যেন আর চলছে না।

সন্ধের অন্ধকারে টলতে টলতে একসময যখন বড় রাস্তায় এলাম তখন দেখি সেই লোকটা। সকালে দেখা সুদর্শন সেই যুবক যে কিনা লংকোট পরে আমাদের পাশ দিয়ে হন হন করে যাচ্ছিল আর আড় চোখে তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। বেশি দেখছিল রুমিদিকে তাই মনে মনে খুব রেগে ছিলাম তার ওপব। এখন কিন্তু সেই লোককেই আমাব ভাল লাগল। সেই লোকটাই সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিল এই পথে।

আমি কিছু বলার আগেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল সে।

আমি বললাম, "এই যে শুনছেন?"

লোকটি বলল, "শোনবার কিছু তো নেই, দেখছি। তুই তাহলে নিখোঁজ ছিলি সকাল থেকে? এখন এইবকম হাল করলি কী করে?"

"সব বলব আপনাকে। আপনি শুধু দয়া করে আমাকে আমার রুমিদির কাছে পৌঁছে দিয়ে আসুন, যে বাড়িতে ফাগু থাকে…।"

"জানি রে বাবা, জানি। অত করে আর বলতে হবে না তোকে। নে বসে পড় সাইকেলের সামনের রডে। তোকে পৌঁছে দিই। তবে একটা কথা, আমার কথা কিন্তু কাউকে বলবি না। আমি তোকে তোর বাড়ির কাছাকাছি নামিয়ে দিয়েই কেটে পড়ব।"

"কেন বাড়িতে যাবেন না?"

"একটু অসুবিধে আছে। আর শোন, পুলিশ এলে তাকেও কিন্তু আমার কথা বলবি না। পুলিশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল নয়।"

"আপনি যখন বলছেন তখন আপনার ব্যাপারটা আমি গোপনই রাখব। একটু শুধু দয়া করে—।"

"মারব চাঁটি একটা। ভিজে ইঁদুর কোথাকার। নে ওঠ।"

আমি ওর সাইকেলে উঠে বসতেই সে বলল, "ভাল করে বসেছিস তো?"

"হ্যাঁ। আমার ভাগ্য ভাল, ঠিক সময়টিতেই আপনি এসে পড়েছিলেন।"

যুবক হেসে বলল, "আমি কিন্তু তোর খোঁজেই এদিকে এসেছিলাম। একবার নন্দন পাহাড়, একবার ত্রিকূট পাহাড় এই করেছি সারাদিন।"

"আমার জন্য?"

"তবে না তো কী? ফাগুর মুখে তোর কথা শুনেই—।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "ফাগু চেনে আপনাকে?"

"না চেনবার কী আছে?"

"কিন্তু সকালবেলায় আমি যখন আপনার কথা জিজ্ঞেস কবলাম ওকে, ও তখন আকাশ থেকে পড়ল যে?"

"পড়বেই তো। কেননা তখনও পর্যন্ত ও জানত না আমি এখানে এসেছি বলে। তোব দিদির কান্না শুনেই আমি ওকে জিজ্ঞেস করে জানতে পাবি সব। তারপর দারুণ সব বিপদের ঝুঁকি নিয়েও এতসব জায়গায় ঘুরেছি আমি। শুধু তোর জন্য।"

আমি বললাম, "আপনি কি আপনাব পরিচয় দেবেন? কে আপনি আমাব খুব জানতে ইচ্ছে করছে।"

"বেশি কৌতূহল ভাল না রে ফচকে। ফের যদি দেখা হয় তখন সব বলব। এখন যা ঘরে যা তুই। একা একা আর পথে বাব হোস না।" বলেই আমাকে অন্ধকারে নামিয়ে উধাও হয়ে গেল সে।

আমার এই বিপদের মুহূর্তে ওই মানুষটিকে দেবতা বলে মনে হল। ভাগ্যিস সকালবেলা ভুল বুঝে অন্যায় কিছু করে ফেলিনি। ওইজন্যই বুঝি বলে যে, সহসা কোনও কাজ করে ফেলতে নেই।

আমি পায়ে পায়ে আমাদের বাড়ির কাছে আসতেই রুমিদি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। তাবপর সে কী কান্না তার।

আমি বললাম, "রুমিদি ফাগু কোথায়?"

"সে তোরই খোঁজে গেছে। সারাটা দিন ধবে একবার থানা পুলিশ করছে আর একবাব তোলপাড় করছে পাহাড় জঙ্গল। মাঝে মধ্যে দেখে যাচ্ছে আমাকে।" বলেই বলল, "এ কী বে! তোর এ কী অবস্থা! তুই যে একেবারে ভিজে সপসপ করছিস।"

"আমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি রুমিদি।"

"পরে সব শুনব তোর মুখ থেকে। এখন জামা প্যান্ট ছেড়ে গরম জলে গায়ে তেলকালিগুলো ওঠা দেখি? কালই তোকে নিয়ে চলে যাব এখান থেকে।"

আমি বললাম, "আমার তো এখন যাওয়া হবে না। আমার এখন অনেক কাজ।"

"কাজ? তোর আবার কাজ কিসের?"

"ওরা গীতাকে নিয়ে গেছে। তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে না?"

"গীতা আবার কে?"

"তুমি তাকে চিনবে না। সব বলব তোমাকে। আমি শুধু ভেবে পাচ্ছি না এই পাশের বাড়িতেই বন্দি ছিলাম আমি। তোমরা একবার কেন লোকজন নিয়ে হানা দিলে ওখানে? তা হলে তো ওরা আমাকে নিয়ে পালাতে পারত না।"

"কেন, ফাগু তো গিয়েছিল ও বাড়িতে।"

"সে তো অনেক পরে।"

"আসলে আমরা ভেবেছিলাম একা একা ঘুরতে ঘুরতে তুই বোধ হয় অনেক দূ কোথায় চলে গেছিস। বেলা বারোটা বেজে যাওয়ার পরও যখন তুই এলি না তখনই সন্দেহ হল আমাদের। তাও আমরা ভেবেছিলাম তুই বোধ হয় পথ হারিয়েছিস। সে ভেবেই থানা পুলিশ খোঁজাখুঁজি সব হল।"

রুমিদি নিজে আমাকে গরম জল করিয়ে পরিষ্কার করিয়ে দিল। কত আদর রুমিদি

একটু পরেই ফাগু এসে পড়ায় ও ছুটে গিয়ে একজন কবিরাজের কাছ থেকে ও এনে দিল। এই অঞ্চলে অ্যালোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথির চল ছিল না তখন! তাই ব্যবস্থা। আমার কাটাছড়া জায়গাগুলোয় কিসের যেন প্রলেপ দিয়ে ব্যথা মরার ওষুধ দি কেউটে আর গোখরো আমার গলা টিপে ধরেছিল, তাই কী দারুণ ব্যথা হয়ে আছে গলা কোনও কিছু খেতে গেলেই গলায় লাগছে। তা ছাড়া শরীর বলতেও আমার যেন অ কিছুই নেই তখন। সারাটা দিন ধরে যা গেল তাতে মরে যে যাইনি এই ঢের।

আট

সারাদিন তো খাওয়াদাওয়া ছিল না। রাত্রিবেলা শুধু দুধ রুটি আর মিষ্টি খেয়েই খি মেটালাম।

ফাগু বলল, "এইবার তুমি বল তো দাদাভাই সকাল থেকে ঠিক কী কী হয়েছিল?

রুমিদি বলল, "যা যা হয়েছিল সব বলবি। কোথায় গিয়ে কীভাবে বিপদে পড়া সব।" তারপর ফাগুকে বলল, "ছেলেটা তো ফিরে এল। এখন থানায় একটা খবর দি হয় না?"

"ওইজন্য আপনি কোনও রকম ভাবনা চিন্তা করবেন না। আমার যা লোকজন আ এখানে তাতে খবর এতক্ষণে পৌঁছে গেছে! দাদাভাইয়ের ব্যাপারে সবাই আমরা চিন্তি ছিলাম কিনা।"

আমি তখন এক এক করে সব বললাম।

সব শুনে কপাল চাপড়াতে লাগল ফাগু। বলল, "হায় হায়রে। একেবারে পাশে বাড়িতেই এমন কাণ্ড হয়ে গেল অথচ আমরা কিছুই টের পেলাম না?"

রুমিদি বলল, "এর জন্য কিন্তু আমরাই দায়ী। ও তো কাল রাতেই ওই আলো দে

সন্দেহ প্রকাশ করেছিল।''

''ওর কথা অবিশ্বাস করিনি আমি। সকালে গিয়েই গেট পেরিয়ে বাড়িতে তালা দেখে ফিরে এসেছি। কিন্তু তখন ভাবতেও পারিনি ওরা অন্যদিক দিয়ে ওদের গোপন একটা পথ করে রেখেছে বলে। কিন্তু এই বাড়ির নাড়ি-নক্ষত্রের সন্ধান ওরা পেল কী করে? আমি তো এতদিন এখানে আছি সন্দেহজনক কাউকেই আমি কখনও ওই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করতে দেখিনি।''

রুমিদি বলল, ''তোমার উচিত এখনই একটা চিঠি লিখে ভবনাথবাবুকে সব জানানো।''

''ওদের ঠিকানাও তো জানি না। আগে আসতেন মাঝে মাঝে, এখন আসাও বন্ধ করেছেন। একজন লোক থাকত ওই বাড়িতে। সে কাজ ছেড়ে দেওয়ায় আর লোকও রাখেননি। আদৌ ভবনাথবাবু বেঁচে আছেন কি না তাও জানি না। ওনার দুই ছেলে। দুজনেই বদ প্রকৃতির।''

রুমিদি বলল, ''তা যদি হয় তা হলে বাড়িটাকে পোড়ো বাড়ি আখ্যা দেওয়া যায়।''

আমি বললাম, ''কথায় আছে ভাঙা ঘরে ভূতের বাসা, ওখানেও তাই হয়েছে তা হলে।''

ফাগু বলল, ''তবে আর একবার যদি ওই বাড়িতে ঢোকে বাছাধনরা তা হলে মজা কাকে বলে টের পাবে।''

''তুমি তো ওই বাড়িতে গেলে। আমি যে চেঁচিয়ে তোমার নাম ধরে ডাকলাম তুমি শুনতে পেয়েছ?''

''হ্যাঁ। পেয়েই তো ছুটে গিয়ে দেখি ওরা দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ওরা কজন ছিল?''

''চারজন। ময়দানব, কেউটে, গোখরো আর নোলো বলে একজন লোক।''

রুমিদি বলল, ''ওদের সেই বস, তাকে দেখিসনি?''

''না।''

ফাগু বলল, ''আসলে ভবনাথবাবুর ওই বাড়িটার অবস্থান এমনই যে ওই বাড়ির সামনের দিক থেকে পেছনে যেতে হলে অনেকটা পথ ঘুরে তবে যেতে হয়। অথচ বদ লোকগুলো আগে থেকেই পালানোর জন্য গোপন পথ একটা তৈরি করে রেখেছিল। সেইজন্যই তোমাদের নিয়ে অত সহজে ওরা পালাতে পেরেছে। আমি যখন দিদিভাই-এর কথা শুনে লোকজন নিয়ে ওই বাড়িতে ভাঙচুর করে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করি তখনই ওরা সতর্ক হয়ে পালাবার জন্য তৈরি হয়। আমরা যখন পাতালঘরে ঢুকতে যাচ্ছি তখনই তোমার কণ্ঠস্বর শুনে ছুটে যাই। কিন্তু গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। আমরা তখন ছাতে উঠি। ঘন গাছপালার জন্য কিছুই আমাদের চোখে পড়ে না।''

আমি বললাম, ''আচ্ছা ফাগু, এইবার তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, ওই যে লংকোট পরা লোকটির কথা তোমাকে বলেছিলাম ওই লোকটিকে তুমি চিনতে?''

''তুমি কি রাঙাবাবুর কথা বলছ?''

''আমি তো ওনার নাম জানি না। উনিই তো আমাকে এই বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন। আর বারবার বলে গেলেন ওনার কথা কাউকে না বলতে। তবে তুমি

তো আমাদের ঘরের লোক, তাই তোমাকে না বলে থাকতে পারলাম না।"

"হ্যাঁ। উনিই রাঙাবাবু। অমন ভালমানুষ সত্যিই হয় না গো। শুধুমাত্র ভাগ্যদোষে মানুষটার আজ কী অবস্থা। ওঁর কথা কাউকে বোলো না। পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। ধরা পড়লেই হয় ফাঁসি, না হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।"

রুমিদি বলল, "সে কী! কী করেছেন উনি?"

"খুন করেছেন। তাও একজন পুলিশ অফিসারকে।"

শিউরে উঠল রুমিদি।

আমারও বিস্ময়ের অন্ত রইল না। বললাম, "অমন সুন্দর দেখতে যাঁকে তাঁর এই প্রকৃতি?"

রুমিদি বলল, "ওঁর কথা যখন বললাম তোমাকে তখন কিছু বললে না তো তুমি?"

"তখন তো আমি ঠিক বুঝতে পারিনি দিদিভাই। পরে যখন দাদাভাইকে নিয়ে খুব হইচই হচ্ছে তখনই উনি এসে সব জিজ্ঞেস করলেন আমাকে। আমি ওনাকে সব বললাম। আর এও বললাম, 'রাঙাবাবু আপনি এখানে? কোথায় উঠেছেন আপনি?' রাঙাবাবু বললেন, 'আপাতত একজনদের বাড়িতে। কিন্তু সে দু'চার দিনের জন্য। পরে সুযোগ-সুবিধে মতো পালিয়ে যেতে হবে।' আমি বললাম, 'কিন্তু কেন?' উত্তরে ওনার সব কথাই উনি বললেন।"

রুমিদি বলল, "আমরা কি জানতে পারি ওনার ব্যাপারে?"

"দিদিমণি! আমরা এই তিনজন ছাড়া কাক পক্ষীতেও কেউ যেন না জানে। রাঙাবাবুর তা হলে খুবই বিপদ হয়ে যাবে।"

"কেউ জানবে না, বল তুমি।"

"গিরিডিতে রাঙাবাবুদের একটা দালান কোঠা ছিল। রাঙাবাবু ছিলেন ওনার বাবার একমাত্র ছেলে। আদি বাড়ি কলকাতায়। বেহালার সখেরবাজারে। তা গিরিডিতে এলে ওনারা প্রায়ই দেওঘরে আসতেন। ওনার বাবার সঙ্গে আমার বাবুর খুবই বন্ধুত্ব ছিল। তাই এই বাড়িতেও ওনাদের আনাগোনা ছিল খুব। পরে গিরিডির বাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ায় আসা যাওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় ওনাদের। যাই হোক, রাঙাবাবুরা মস্ত বড়লোক। অগাধ সম্পত্তির মালিক। তা একদিন হল কি এক পুলিশ অফিসার খিদিরপুরের বাজারে এক লেবু বিক্রেতা ছেলেকে নির্মমভাবে মারধোর করতে দেখে উনি বাধা দিতে যান। যে ছেলেটিকে মারধোর করা হচ্ছিল তার বয়স দশ বছরের বেশি নয়। নিতান্তই বালক। কথা না শুনে হয়তো রাস্তার ফুটপাতে বসে লেবু বিক্রি করছিল। তা ওইরকম বয়সের কোনও ছেলেকে কেউ যদি ওই-ভাবে মারে তাতে যে কোনও মানুষেরই মাথা গরম হয়ে যায়। রাঙাবাবু তাই ছেলেটিকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে যান। অফিসার তখন রাগে অন্ধ হয়ে চড়াও হন রাঙাবাবুর ওপর। রাঙাবাবু হিতাহিত ভুলে সেই অফিসারের পেটে একটা ঘুসি মারতেই উনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। রাঙাবাবু তখন থেকেই ফেরার। পুলিশ ওনাকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছে। কাগজে নাকি ছবিও বেরিয়েছে।"

আমি বললাম, "তা না হয় হল। কিন্তু রাঙাবাবুর পরিচয় পুলিশ জানবে কী করে?"

"কী আর বলব তোমাকে দাদাভাই। মানুষের ভেতরই ভগবান এবং শয়তান দুই-ই বাসা বেঁধে থাকে। ওঁর পরিচিত কেউ একজন দেখে ফেলে এবং নাম ঠিকানা বলে দেয়।"

রুমিদি বলল, "তাই যদি হয় তা হলে তো বলব এ মানুষ খুনী নয়। এটা নেহাতই দুর্ঘটনা।"

"কিন্তু দিদিভাই, আইন তো তা মানবে না।"

আমি বললাম, "এটা দুর্ঘটনাই। তবে একটা কথা, উনি তো এখানে এসে এই বাড়িতেও উঠতে পারতেন?"

"পারতেন। কিন্তু তোমরা আছ দেখে আর এখানে আসেননি।"

রুমিদি বলল, "তা কলকাতার ওই ঘটনার কথা এখানকার পুলিশ জানবে কী করে? চিনবেই বা কীভাবে?"

"এখানে ওনার ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তবুও সাবধানের তো মার নেই। তা ছাড়া গোয়েন্দা পুলিশের আসামী ধরার পদ্ধতি আছে। একমাস দু'মাস লুকিয়ে থাকতে পারবে। তারপর?"

রুমিদি বলল, "আমার কিন্তু খুব মায়া হচ্ছে ওঁর ওপর।"

আমি বললাম, "আচ্ছা ফাগু, ওনাকে আমাদের এই বাড়িতেই এনে রাখা যায় না?"

"কার হুকুমে রাখব বল? বাড়ি কি আমার?"

এর পরে আর কথা চলে না। সত্যিই তো ফাগুরও অধিকারের একটা সীমা আছে। এই বাড়িতে দাদু দিদা থাকলে হয়তো একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত। কিন্তু তাঁদের অবর্তমানে ফাগু কী করেই বা আশ্রয় দেয় ওঁকে।

রাঙাবাবুর মিষ্টি চেহারা, মিষ্টি কথাবার্তা, ফুলের সুবাসের মতো আমার মনকে যেন ভরিয়ে তুলল। আমার কেবলই মনে হতে লাগল উনি কোথায় উঠেছেন তা একটু খুঁজে-পেতে দেখবার।

আমি ফাগুকে বললাম, "ফাগু, কাল তুমি আমাকে একবার ওনার কাছে নিয়ে যেতে পারবে?"

"ওঁর সঙ্গে এখন দেখা সাক্ষাৎ না করতে যাওয়াই ভাল। উনি এখানকার গিরিজাবাবুর বাড়িতে উঠেছেন। আমি চেষ্টা করব ওইখান থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও রাখবার। সবচেয়ে বড় কথা উনি তো বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগই রাখতে পারছেন না। সঙ্গে যা টাকা পয়সা আছে তা আর কদিন? ফুরিয়ে গেলে তখন কী হবে?"

"সেই ব্যাপারেই আমার একটা মতামত ওনাকে দিতে চাই আমি।"

"কি রকম?"

"ওনার এখনই উচিত গায়ে ছাই ভস্ম মেখে সাধু হয়ে যাওয়া। মাথায় জটা কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। তখন কে আর চিনবে ওঁকে?"

"ওনার বাবা মা? তাঁদের কী অবস্থা হবে তা হলে? তাঁরা তো তাঁদের ছেলেকে দেখতে পাবেন না আর। উনিও ওনার বিষয় সম্পত্তি সুখ-ভোগ ছেড়ে চিরকাল যদি বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে ঘুরতে থাকেন তা হলে সেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মতো একটা শাস্তি নয় কি?"

রুমিদি বলল, "সত্যি, সুস্থ সুন্দর একটি জীবন কেমন যেন বিষিয়ে গেল, তাই না?"

"ভাল মানুষদের জীবনে এইরকম হয়।"

আমি বললাম, "না। ওনার জীবন আমি কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না। দাদু-দিদা এলেই

আমরা বাড়ি ফিরে যাব। তারপর সব কথা খুলে বলব আমার বাবাকে। উনি নিশ্চয়ই রাঙাবাবুর ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।"

ফাগু বলল, "তুমি ছেলেমানুষ ভাই, তাই ঠিক বুঝবে না। পুলিশ হল সরকারি কর্মচারী। তার গায়ে হাত তোলা অমার্জনীয় অপরাধ। তার ওপর এই খুন। ওনাকে বাঁচাবে কী করে?"

"উনি তো খুন করেননি।"

"আইন তা মানবে কেন?"

"মানতে বাধ্য। কতদিন আগের ঘটনা?"

"তোমরা এখানে আসার পরই।"

"না। উনি খুন করেননি। উনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ওইসময় এখানে এসেছিলেন।"

"কিন্তু একজন তো দেখে ফেলেছিল ওঁকে।"

"সে ভুল দেখেছিল। মিথ্যে কথা বলেছিল। আমি একজন ব্রিগেডিয়ারের ছেলে ওনার সঙ্গে আমাদের পরিবারের যোগাযোগ আছে। রাঙাবাবুই আমাকে আর রুমিদিকে দেওঘরে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। দরকার হলে রুমিদি আর আমি বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে এই কথা বলব দুজনে। দেখি তো ওঁর মতো লোককে কে ফাঁসিতে চড়ায়।"

আমার কথা শুনে লাফিয়ে উঠল ফাগু। বলল, "ঠিকই তো। আমাদের সাক্ষ্যও তো চলতে পারে। আমিও তো এই কথাই বলব পুলিশকে, জজসাহেবকে। আমরা সবাই যদি এই কথা বলি তা হলে নিশ্চয়ই ওই একজন লোকের সাক্ষ্য ধোপে টিকবে না।" তারপর আনন্দে উল্লসিত হয়ে ফাগু বলল, "দাদাভাই! তুমি না? সত্যি, কী যে বলব তোমাকে আমি এখনই গিয়ে এই কথাটা বলে আসি রাঙাবাবুকে। উনি যে কী খুশি হবেন।"

ফাগুর রাতে চলাফেরা করতে টর্চ লাগে না। তাই চাদরটা গায়ে জড়িয়ে খালি পায়েই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিন্তু সবে কয়েক পা গেছে এমন সময় ওর একটা আর্তস্বর কানে এল আমাদের।

কী হল! কী হল ফাগুর?

রুমিদি, আমি দুজনেই ছুটলাম। আর তখনই ঘটে গেল বিপর্যয়। অন্ধকারের আড়াল থেকে কারা যেন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। তারপর একটা রুমাল আমার নাকে মুখে চেপে ধরতেই দম যেন বন্ধ হয়ে গেল। মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। তারপরে কী যে হল কিছুই আর মনে নেই। আবার আমি শয়তানের কবলে পড়ে গেলাম।

নয়

পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল আমার। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখি ছোট্ট একটি বন্ধ ঘরে শুয়ে আছি আমি। গায়ে একটা কম্বল চাপানো ছিল, সেটা টান মেরে ফেলে দিয়ে জানালার কাছে এলাম। ছোট ঘরের ছোট জানালা। পাল্লা খুলতেই এক ঝলক সোনালি রোদ আমার মুখে এসে পড়ল। কী সুন্দর সকাল। কিন্তু আমি কোথায়?

আমি যে কোথায় তা আমাকে কে-ই বা বলে দেবে? এই ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ তো নেই। বাইরের প্রকৃতিতে শুধু পাহাড়—পাহাড়—আর পাহাড়। সেই সঙ্গে ঘন সবুজের বন। মনে হল দেওঘর থেকে অনেক—অনেক দূরে কোথাও নিয়ে এসে রাখা হয়েছে

আমাকে।

ঘরের মধ্যে একটা টেবিলে চুবড়ি চাপা কতকগুলো শুকনো রুটি, আলুর দম আর একটা লাড্ডু রাখা আছে। এক পাশে জলের জায়গা, আর গ্লাস। একটি লণ্ঠন জ্বলছিল একপাশে। আমি সেটাকে নিভিয়ে দিলাম।

টেবিলের একপাশে একটি খবরের কাগজ ছিল। তাতে বিশেষ একটি খবরের ওপর লাল কালি দিয়ে দাগ দেওয়া। খবরটা এইরকম, ''কলকাতার মনু বেগুসরাইয়ে''—আলিপুরের এক কোটিপতি ব্যবসায়ীর অপহৃত ছেলে সাত বছরের মনুকে বিহারের বেগুসরাই থেকে সোমবার গভীর রাতে উদ্ধার করা হয়েছে। অপহরণের দায়ে গ্রেফতার হয়েছে ওই ব্যবসায়ীর বাড়ির পরিচারক ও তার এক সঙ্গী। মনুর মুক্তির বিনিময়ে চার লক্ষ টাকা দাবি করেছিল অপহরণকারীরা। কয়েকদিন আগে মনু ও তার দিদি গীতাকে স্কুলে যাওয়ার পথে ওই বাড়ির একজন পরিচারক রতন সিংহ তার বাড়ি বেগুসরাইয়ে নিয়ে যায়। পুলিশ এখন অপহরণকারীদের 'বস'-কে খুঁজছে। মুক্তিপণ না দিলে ওদের দু'ভাইবোনকে কেটে টুকরো টুকরো করা হবে বলে ফোনে হুমকি দিয়েছিল ওই 'বস'-ই। বিহার ও কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাবা তার খোঁজে যৌথ তল্লাসি চালাচ্ছে। মনুকে মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় ফিরিয়ে এনে তার মা-বাবার হাতে তুলে দেওয়া হলেও গীতাব খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি।

আলিপুরের রাজা সন্তোষ রোডে মনুদের বাড়ি। প্রতিদিনের মতোই গত শুক্রবার সকালে তাদের দু'ভাইবোনকে বেলভেডিয়ার রোডে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেরিয়েছিল রতন। মাত্র সাত মাস আগে কাজে যোগ দেয় সে। বিকেল পর্যন্ত সে মনু ও গীতাকে নিয়ে না-ফেরায় স্কুলে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আদৌ ওরা স্কুলেই পৌঁছায়নি। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর যায়। ডি সি (ডি ডি-১) বলেন, পুলিশ বাড়ির পরিচারকের কোয়ার্টারে তল্লাসি চালিয়ে রতনের লেখা একটি চিঠি পায়। মোটা টাকার মুক্তিপণ চেয়ে তাতে লেখা : আমি মনু ও গীতাকে নিয়ে বেগুসরাই যাচ্ছি। পুলিশে খবর দিলে ওদের মেরে ফেলব। এই চিঠি পাওয়ার পর জানা যায়, রতনের এক দেশোয়ালি ভাইও উধাও। কয়েকদিন আগেই সে দেশ থেকে আলিপুরে এসেছিল।

শনিবার সকালে আলিপুরের বাড়িতে ফোন আসে বেগুসরাই থেকে। তাতে রতন চার লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে জানায়, রবিবার বিকেল চারটের মধ্যে টাকা না পৌঁছলে দু'ভাইবোনকেই মেরে ফেলা হবে। সে বারবার ওদের বাবার খোঁজ করছিল। কিন্তু ফোন ধরেছিলেন ওদের কাকা। তিনি টাকা সংগ্রহের জন্য সময় চাইলে রতন বলে, মেরা বসসে বাত কিজিয়ে। তারপরই সেই 'বস'-এর হুঙ্কার : পুলিশকো খবর দেনে সে দোনোকো কাট কর ফিক দেঙ্গে। রুপিয়া জলদি চাহিয়ে।

এরপর রতন জানায় টাকা নিয়ে বেগুসরাইয়ের কোথায় যেতে হবে। গোয়েন্দা পুলিশ তার সব কথাই রেকর্ড করে রাখে। তারপর ফাঁদ পেতে মনু সহ রতন ও তার সঙ্গীকে গ্রেফতার করলেও গীতাকে পাওয়া যায় না।

এই পর্যন্ত পড়েই আমি বুঝে নিলাম গীতাকে না পাওয়ার কারণটা কী? অর্থাৎ কিনা দুষ্কৃতীরা মনুকে বেগুসরাইতে রেখে গীতাকে পাচার করে দেওঘরে। ওদের উদ্দেশ্য ছিল দুটো। এক, মনু ও গীতার বাবা-মা যদি পুলিশে খবর না দিয়ে চার লক্ষ টাকা নিয়ে

ছেলেমেয়েদের ফেরত নিতে আসেন তা হলে টাকা পেয়ে মনুকেই ফেরত দেবে ওরা তারপর আরও টাকা দাবি করে মুক্তি দেবে গীতাকে। যদি ওনারা পুলিশে খবর দেন ত হলে ফল হবে উল্টো। গীতার জীবন বিপন্ন করে দেবে ওরা। এই চিন্তা করেই মনটা আমা দারুণ খারাপ হয়ে গেল। কী মিষ্টি মেয়ে গীতা। ওরা কি সত্যই ওকে মেরে ফেলবে? কি যদি বাঁচিয়ে রাখে তা হলে সে এখন কোথায়? আর ওর এই বন্দিশালাই বা কোনখানে?

আমি কিছুই ভেবে পেলাম না। ফাগু রুমিদি ওদের অবস্থা কী? ফাগু কেন অম চিৎকার করে উঠেছিল? ওরা কি ওর মতো রুমিদিকেও আটকে রেখেছে কোথাও?

এমন সময় হঠাৎ ঘরের শিকল খুলে ভেতরে ঢুকল নেলো। আমার দিকে তাকিে বলল, "তোর বরাত দেখছি খুবই মন্দ রে! আমাদের চক্করে একবার কেউ পড়ে গেলে সে আর সহজে নিষ্কৃতি পায় না। হয় তার বাবা-মা'কে প্রচুর টাকা আমাদের হাতে তুলে দিতে হয়, নয়তো আমরা তাকে এই পবিত্র তপোবনের গুহায় গলা টিপে মেরে ফেলি। আমর হচ্ছি পবিত্র পাপী। তা তুই আমাদের চক্করে পড়েও যেভাবে বেঁচে গেলি তাতে আমাদে বস-এর ধারণা, তোর মতো ছেলে হচ্ছে ক্ষণজন্মা। তাই আজ রাত্রে তোকে এই পাহাড়ে আরও একটু উচ্চস্থানে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা বড় গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখব আমরা বাঘ এসে তোর এই সিঁটকে আমসির মতো চেহারাটাকে কড়মড় করে চিবিয়ে খাবে সেই দৃশ্যই আমরা দূর থেকে দেখব। কী মজা হবে, না? ও হ্যাঁ, তোর সঙ্গে সেই দুষ্টু মেয়েটাকে বেঁধে রাখা হবে।"

আমি বললাম, "কার কথা বলছ তোমরা? রুমিদি?"

"আরে না না। সেই যে রে, সেই মেয়েটা। যাকে নিয়ে তুই পালিয়ে যাচ্ছিলিস, সে গীতা। ওর বাবা আমাদের বস-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পুলিশে খবর দিে আমাদের আর এক সঙ্গী রতনকে গ্রেফতার করিয়েছে। মারের চোটে রতন পুলিশকে ব দিয়েছে আমাদের নাম-ধাম সব কিছু। কিন্তু দিলে কী হবে? পুলিশ আমাদের নাগালও পা না। তার কারণ, রতনও জানে না। আমাদের এই তপোবন পাহাড়ের ঠিকানাব কথা। আমব এখন এই বিখ্যাত পাহাড়ের ঠিক পেছন দিকে আছি।"

আমি বললাম, "ফাগু, রুমিদি, ওরা কোথায়?"

"ফাগু এখন হাসপাতালে। আর রুমিদি? তাকেও আমরা অন্য জায়গায় আটবে রেখেছি। আমাদের বস জয়ন্তদার তো খুব পছন্দ তোদের ওই রুমিদিকে। হয়তো বা বিয়ে করবে।"

নেলোর স্পর্ধার কথা শুনে মাথাটা গরম হয়ে উঠল আমার। কোথাকার কে এব ক্রিমিন্যাল, সে করবে কিনা রুমিদির মতো মেয়েকে বিয়ে? সখ মন্দ নয়। অন্তত আমা দেহে এতটুকু প্রাণ থাকতে তা কখনও সম্ভব হবে না। রুমিদির বিয়ে তো হবেই। হওয দরকার। আমি নিজে রুমিদির জন্য বর পছন্দ করে রেখেছি। রুমিদির বিয়ে যদি কারও সে হয় তো আমার পছন্দের রাঙাবাবু ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে নয়। এ আমার স্বপ্ন। রাঙাবাবু রুমিদির উপযুক্ত বর। প্রয়োজনে রাঙাবাবুর দুটি পায়েও ধরব আমি।

নেলো বলল, "যা। বাইরে একটা বালতিতে জল আছে, সেই জলে মুখ হাত ধু নে। দাঁত যদি মাজিস তো ছাই আছে. খবরদার যেন পালাবার চেষ্টা করবি না। তা হলে মরবি।"

আমি বললাম, "কাল রাতের বাসি খাবারগুলো তুমি এবার নিয়ে যেতে পারো। ও আমি খাব না।"

"কাল কিছু খাসনি তুই?"

"কাল কি আমার জ্ঞান ছিল?"

নেলো কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর বলল, "আজ যখন তুই মরবি, তখন তোর একটু ভাল খাওয়া-দাওয়ার দরকার। কী বল?"

"সেটা তোমাদের ব্যাপার।"

নেলো বাসি খাবারগুলো নিয়ে ঘরের বাইরে এসে ছুড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। আমি ওর হাত থেকে খাবার নিয়ে বললাম, "এইভাবে খাদ্যের অপচয় করতে নেই। ওগুলো দাও আমাকে।"

"তুই খাবি এগুলো?"

"বয়ে গেছে আমার।" বলেই হাঁক দিলাম, "আয়— আয়— আয়।"

অমনি কতকগুলো হনুমান 'উপ্ উপ্' করে ছুটে এল সেখানে।

আমি খাবারগুলো তাদের কাছে ধরতেই চোখের পলকে সেগুলো কাড়াকাড়ি করে উদরস্থ করল তারা।

এরপর আমার মুখ হাত ধোয়া হলে আবার গৃহবন্দি হলাম আমি। এমন অনবদ্য প্রকৃতির মাঝে চার দেওয়ালের এই ঘেরাটোপে বন্দি থাকতে কি ভাল লাগে? কী অপূর্ব দৃশ্যাবলী এখানকার। আমরা যেখানে ছিলাম সেই কুণ্ডেশ্বরীর চেয়েও ভাল জায়গা। কিন্তু কী করে যে এদের হাত থেকে মুক্তি পাব, তা ভেবে পেলাম না। শুধু আমি তো নই, গীতা, রুমিদি সবাই এদের হাতে বন্দি। আমাদের রক্ষাকর্তা হতে পারে একমাত্র রাঙাবাবু। কিন্তু রাঙাবাবু কি খবর পেয়েছে? ফাগু যখন হাসপাতালে তখন আমাদের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অজানা নেই। হয়তো বা পুলিশও খোঁজ করছে আমাদের। তবু শয়তানের এই ঘাঁটির খবর তারা কি কখনও পাবে? আর যেখানে পুলিশ, সেখানে রাঙাবাবুর কোনও ভূমিকা থাকবে না। আমি শুধুই ভাবতে লাগলাম এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়টা কী? এই বিপর্যয়ের মধ্যে আমার শরীরের দুর্বলতা এখন অনেকটা কেটে গেছে। এক অটুট মনোবল ফিরে পেয়ে আমি এখন অনেক সুস্থ।

একটু পরেই ছোট একটি মেয়েকে নিয়ে নেলো এল।

মেয়েটির বয়স বছর বারো হবে। তার হাতে কিছু প্রসাদী প্যাঁড়া ও দুধ।

নেলো একটা পাঁউরুটি আমাকে দিয়ে বলল, "এখনকার মতো এই খা। দুপুরে খিচুড়ি পাবি। তারপর জয়ন্তদা যেমন যা বলবে তাই হবে। চেঁচামেচি করবি না। চুপচাপ থাকবি। গোলমাল করলে এমন পেটাব যে মার কাকে বলে টের পাবি।"

আমি নেলোর কথায় কর্ণপাত না করে আগে আমার খাদ্য গ্রহণ করলাম। আমাকে যে পাঁউরুটি দেওয়া হয়েছিল তার থেকেও কিছুটা রেখে দিলাম হনুমানগুলোর জন্য। তার কারণ যদি কোনওরকমে এই ঘর থেকে আমি বেরোতে পারি তখন ওরাই হয়তো আমার বন্ধু হয়ে যাবে।

যাই হোক, গরম দুধ, প্যাঁড়া ও পাঁউরুটি পেটে পড়ায় শরীরটা চাঙ্গা হল একটু।

মেয়েটি আমার এঁটো গেলাস আর ডিশ নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে ভয়ে ভয়ে

নেলোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে গেল একবার।

এই মেয়েটি এখানে কোত্থেকে এল? ওকেও কি আমার মতো, গীতার মতো, রুমিদির মতো হরণ করে নিয়ে এসেছে ওরা? হয়তো। তবে মেয়েটিকে দেখে মনে হল বাঙালি নয়. স্থানীয় কোনও গ্রামবাসীর মেয়ে। সে যাই হোক, মেয়েটি চলে গেলে নেলো বলল, "শোন কেউটে আর গোখরোকে নিয়ে আমি একবার ত্রিকুট পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি। ফিরতে অনেব দেরি হবে। এই সময়টুকু একা থাকবি তুই। যেহেতু এখান থেকে পালানো তোর পক্ষে অসম্ভব, তাই ইচ্ছে করেই হাত-পা বেঁধে রেখে গেলাম না। বাইরের দরজায় তালা দেওয় থাকবে। আর চাবিটা থাকবে বজরঙ্গবাবার কাছে।"

"বজরঙ্গবাবা কে?"

"তিনি সাধুবেশী এক শয়তান। সহস্রমুণ্ডির আসনে বসে ভৈরবমন্ত্র জপ করেন উনি অযথা চিৎকার চেঁচামেচি করে ওনার শান্তি যেন নষ্ট করিস না।" বলে দরজা বন্ধ কর শিকল তুলে তালা দিয়ে চলে গেল।

একা আমি অসহায়ভাবে বসে বসে মৃত্যুর প্রহর গুনতে লাগলাম। আর ভাবতে লাগলাম, জয়ন্তদা যদি ওদের 'বস' হয় তা হলে বজরঙ্গবাবা কে? কিন্তু কে আমাকে দেবে এইসব প্রশ্নের উত্তর? খাঁচায় পোরা পাখি যেমন বারবার ছটফট করে খাঁচার চারদিকে ঘোরে, আমি তাই করতে লাগলাম। কিন্তু আমার চারদিকে দেওয়াল। একপাশে একটি দরজা, সেটিও বন্ধ। আর একপাশে ছোট্ট একটি জানলা। তারই লোহার গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাইরের পার্বত্য প্রকৃতি ও বনাঞ্চলের দিকে তাকিয়ে মন আমার বন্দি বিহঙ্গের মতোই ছটফট করতে লাগল। হায়রে! ওই উন্মুক্ত প্রান্তরে একবার যদি ছুটে যেতে পারতাম। কিন্তু তা তো হবার নয়। এই স্বর্গের উদ্যানে আমি এক তীর বেঁধা পাখি

আমি দূরের পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রুমিদি আর গীতার কথা ভাবতে লাগলাম। ওদের দুজনকে ওরা কোথায় নিয়ে এসে রেখেছে কে জানে? ওদের ওই 'বস' জয়ন্তদা, সেকি সত্যিই বিয়ে করবে রুমিদিকে? হে ভগবান! রক্ষা করো তুমি। রুমিদির মতো মেয়ের কপালে এইরকম দুর্দৈব যেন না হয়।

আমার এইসময়ে হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল দিদার বাড়ির সেই ছবির আদ্যামায়ের কথা। উনি হলেন সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি মহামায়া। মানুষ স্বার্থ নিয়ে ডাকলে তিনি নির্বিকার থাকেন কিন্তু বিপদে পড়ে তাঁর শরণ নিলে তিনি কি সেই ডাক শুনতে পাবেন না? নিশ্চয়ই ওর এই বিপৎকালে তিনি অসুরদলনে আবির্ভূতা হবেন। তিনি যে বিশ্বজননী, বিপত্তারিণী মা। আমি হঠাৎই আমার এই বিপৎকালে আদ্যামাকে শরণ করে ধ্যান করার ভঙ্গিতে বসে কাতর প্রার্থনা করতে লাগলাম।

কতক্ষণ এইভাবে বসে বসে আদ্যামাকে শরণ করছিলাম তা মনে নেই, হঠাৎই জানলা দিয়ে একটি পেয়ারা আমার কোলে এসে পড়ল।

আমি জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েই দেখি সেই ছোট্ট মেয়েটি।

মেয়েটি আমাকে দেখে হাত নাড়ল। তারপর আর একটা পেয়ারা আমাকে দেখিয়ে বলল, "খায়গা?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।" তারপর বললাম, "কোথায় পেলি?"

মেয়েটি দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ও—ই দিক থেকে নিয়ে এসেছি

পহেরা জঙ্গল আছে ওইদিকে। বহুৎ মিঠা মিঠা আমরূদ আছে।"

"আমাকে ওইখানে নিয়ে যাবি?"

"ক্যায়সে যাওগে তুম? বাইরে তো তালা দেওয়া।"

"তাতে কী? বজরঙ্গবাবার কাছে চাবি আছে। গিয়ে নিয়ে আয় না।"

মেয়েটি একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন ভাবল। তারপর হাতের ইশারায় আমাকে অপেক্ষা করতে বলে বলল, "তুম ভাগোগে তো নেহি?"

আমি হেসে বললাম, "না না।"

"তুম চল জানেসে ও লোগ মার ডালেগা হামকো।"

আমি বললাম, "কোনও ভয় নেই তোর। আসলে এই ঘরের ভেতরে আমি হাঁফিয়ে উঠছি। ওই জঙ্গল থেকে ফিরে এসে আমি আবার এই ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ব, তুই আবার দরজায় তালা দিয়ে যাবি।"

মেয়েটি আনন্দে নেচে উঠল, "তো ঠিক হ্যায়, তুম ঠ্যারো। ম্যায় আভি আ রহা হুঁ।" বলেই তির তির করে নেমে গেল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।

আশার আলো দেখে মন ভরে উঠল আমার। আবার শরণ করলাম আদ্যামাকে। মনে মনে বললাম, দেখো মা, যেন আবার নতুন করে কোনও বাধা বিপত্তি না ঘটে। দেবীকে শরণ করলাম আর ভাবতে লাগলাম-— একবার যদি এই চার দেওয়ালের বাইরে আমি যেতে পারি তা হলে আমি একা নয়, ওই মেয়েটাকেও নিয়ে যাব আমার সঙ্গে। তারপর কোনওরকমে ওদের নজর এড়িয়ে যদি কুণ্ডায় ফিরে যেতে পারি তখন রাঙাবাবুর সাহায্য নিয়ে রুমিদি আর গীতাকে উদ্ধার আমি করবই।

এমন সময় হঠাৎ কাপালিকের মতো চেহারার একজন সন্ন্যাসীকে আর তার সঙ্গে একজন প্যান্ট শার্ট পরা রুক্ষ চেহারার যুবককে আমার ঘরের দিকে আসতে দেখেই সব আশা ও আনন্দ জল হয়ে গেল একেবারে।

ওরা দুজনে কথা বলতে বলতে এসে আমার ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। দুজনে বেশ কিছুক্ষণ আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল ভালভাবে। তারপর যুবক বলল, "তোর নাম কী? বাড়ি কোথায়?"

আমি সব বললাম।

"বাবা কী করেন? ওই দিদি ছাড়া তোর আর কে আছে?"

"কেউ নেই। বাবা মা গত হওয়ার পর আমরা দু'ভাইবোনে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। তাই অনুরূপবাবু আমাদের—।"

"অনুরূপবাবু তোদের কে হন?"

"কেউ না। আমাদের তো কেউ নেই, তাই ওঁর বাড়িতেই এসে উঠেছিলাম।"

"ওনার খোঁজ পেলি কী করে?"

"আমার বাবার এক বন্ধু আমাদের ওইখানে পৌঁছে দিয়ে যান। কিন্তু আপনারা আমাকে এইভাবে বন্দি করে রেখেছেন কেন?"

যুবক বলল, "ভুল করেছিলাম। তোকে আমরা ভেবেছিলাম টাকার খনি। কিন্তু তুই তো দেখছি ভিখিরির বাচ্চা। তোকে আটকে রেখে কোনও লাভই হবে না আমাদের।"

কাপালিকের মতো লোকটি বলল, "লাভ হবে। ছেলেটি খুবই লক্ষণযুক্ত। একে নিয়ে

আমার সংখ্যা হবে সাত। আরও পাঁচজনকে চাই। মোট বারোজনকে পেলেই আমার কার্য সিদ্ধি হবে।''

যুবক বলল, ''বজরঙ্গ! তোমার চিন্তাধারার সঙ্গে আমার মেলে না। ছেলেটির একটা আশ্রয়ের দরকার। তোমার আওতায় থাকলে ওর ভাল হবে। কিন্তু দিদির যা তেজ! বাপরে বাপ। আমার গালে এমন একটা চড় কষিয়েছে যে এখনও জ্বালা করছে। যাই হোক, একে যদি তোমার আশ্রমে রাখতে চাও, রাখো। তোমার উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু এই ব্যাপারে তুমি কতটা সফল হবে তা জানি না।''

''দেখিই না চেষ্টা করে। ভারতীয় যোগশিক্ষার মাধ্যমে অন্তত এক ডজন ছেলেকেও যদি জ্ঞানের আলো দেখাতে পারি তাই বা মন্দ কী? তবে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি জয়ন্ত নারী জাতির অমর্যাদা কখনও কোরো না।''

''আরে! কী আশ্চর্য! বিয়ে করতে চাওয়াটা কি অমর্যাদার?''

''এর আগে তুমি এইরকম বিয়ে অনেক করেছ।''

জয়ন্ত এবার ফুঁসে উঠল, ''তা হলে এবার তোমার কথাই বলি? তোমার ওই যোগাশ্রমের জন্য এর আগে কত ছেলেকে এনে দিয়েছিলাম তার হিসেবটা তোমার নিজের কাছেও আছে কি? এখন মাত্র ছ'জন কেন?''

''এরাই সত্যিকারের উপযুক্ত বলে। এদের দিয়েই কাজ হবে।''

''বুঝলাম। কিন্তু বাকি যারা তারা কোথায়? তুমি কি অস্বীকার করতে পার যে তুমি নিজের হাতে গলা টিপে মেরে ফেলোনি তাদের?''

''কেন অস্বীকার করব? এটা তো সত্যিই। আমার এখানে কি যত্নের অভাব ছিল? তবু তারা কেন পালাতে গেল? সন্ন্যাসীর যেমন পূর্বপরিচয় থাকে না, আমার কাছে দীক্ষা নিলেও তাদের বাবা-মা ঘর বলে কিছু থাকে না। তবু তারা মা মা বলে কাঁদে—বাবাকে দেখতে চায়। এমন মুক্ত পরিবেশ ছেড়ে ফিরে যেতে চায় সংসার-নরকে। ওগুলো হচ্ছে কালসাপ। ওদের দুধকলা দিয়ে পুষতে নেই। কিন্তু ছাঁকা ছাঁকা যে ছ'জনকে আমি তৈরি করছি তাদের কোনও পিছুটান নেই। যেমন থাকবে না এই ছেলেটির। এরাই আদর্শের ধ্বজা তুলে ধরতে পারবে।''

জয়ন্ত বলল, ''আদর্শের ধ্বজা? শুনলেও হাসি পায়। খুনির আদর্শ! এই যোগাশ্রম তোমার ভাঁওতা। এদের যোগশিক্ষা দেওয়ার মূলে নিশ্চয়ই তোমার অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে।''

''কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে মনে করো তুমি?''

''জানি না। হয়তো বা ওদের দিয়ে তুমি কোনও ব্যবসা করাতে চাও। কারণ উদ্দেশ্য তোমার মহৎ হলে এইভাবে ছেলেমেয়ে চুরি করিয়ে আনাতে না। অনেক অনাথ আতুরের ছেলেমেয়ে তুমি এমনিই পেতে। যাই হোক, আমার ব্যাপারে নাক গলিও না তুমি। তোমার যোগাশ্রমের জন্য এই ছেলেটিকে তুমি নিতে পারো কিন্তু ওই গরিবের মেয়েটিকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আমাকে দাও।''

বজরঙ্গ বলল, ''না। আমার এখানেও একজন মেয়ের দরকার। ওই মেয়েটি বেশ বড়সড়। সে আমার আশ্রমের কাজ করতে পারবে।''

জয়ন্ত বলল, ''ওরে মাথামোটা! ওই মেয়ে এখানে থাকলে যে নিজের বিপদ নিজে

'ওই মেয়েটাকে তুই নয়, আমি বিয়ে করব'

ডেকে আনবি। অতবড় মেয়ে কখনও পোষ মানে? যদি কোনও রকমে এখান থেকে একবার পালাতে পারে তা হলে আবার সেই তিহার জেল। সেই অভিশপ্ত দিনগুলোর কথা এরই মধ্যে ভুলে গেছ ব্রাদার?"

বজরঙ্গ বলল, "না ভুলিনি। আমার এই আশ্রমেও একজন ভৈরবীর দরকার। ওই মেয়েটিকে তুই নয়, আমি বিয়ে করব।"

জয়ন্ত বলল, "তবে রে ছুঁচো? ওই মেয়েকে আমি বিয়ে করব।"

বজরঙ্গ বলল, "আমি ছুঁচো? তুই তা হলে শুকনো ইঁদুর।"

জয়ন্ত তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাতে গলা টিপে ধরেছে বজরঙ্গ-এর। বজরঙ্গও ওর চোয়াল লক্ষ করে মেরেছে এক ঘুষি।

জয় আদ্যামা। আর আমাকে পায় কে? আমি তালাচাবিটা নিয়ে এক লাফে বাইরে বেরিয়েই দরজায় তালা দিয়ে বললাম, "অ্যাই ইঁদুর ছুঁচোরা। আমি যাচ্ছি।"

ওরা দুজনেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তখন দরজার ওপর, "খোল খোল বলছি, শয়তান কোথাকার। শিগগির দরজা খোল।"

আমি বললাম, "কী করে খুলব দরজা? আমি তালা দিতে জানি। খুলতে জানি না।"

"তবে রে হতচ্ছাড়া পাজি। একবার যদি দরজা খুলে বেরোতে পারি তা হলে কী অবস্থা করি তোর দ্যাখ।"

"তার আগে দ্যাখো আমি তোমাদের কী অবস্থা করি।"

"কী করবি তুই আমাদের?"

"ভাবছি একটু কেরোসিন তেল এনে এই ঘরে আগুন লাগিয়ে তোমাদের পুড়িয়ে মারব।"

বজরঙ্গ আর জয়ন্তর মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল।

জয়ন্ত বলল, "এই শোন, ওইসব বদমায়েসি করিস না। তোকে আমরা মুক্তি দিলাম। তোর দিদি ত্রিকূট পাহাড়ে আছে। আমার লোকদের বলে দেব তাকেও ছেড়ে দেবে। তুই শুধু একবার দরজার তালাটা খুলে দে।"

আমি বললাম, "বেশ, খুলে দিচ্ছি। কিন্তু তোমরা কথার খেলাপ করবে না তো?"

"না না। মা কালীর দিব্যি। আমাদের যা কথা তাই। হাজার হলেও আমরা ভদ্র সন্তান।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। একেবারে বরাহনন্দনের মতো ভদ্র সন্তান। তোমরা একটু বোসো, আমি আসছি।"

এবার বজরঙ্গ-এর গলা শোনা গেল, "কোথায় যাচ্ছিস রে তুই?"

"পুরুত ডাকতে। আমার দিদিকে বিয়ে করবে না? তাই পুলিশ পুরুত ডাকতে যাচ্ছি।"

এবার বজরঙ্গ আর জয়ন্ত দুজনেই চেঁচাতে লাগল, "অ্যাই! অ্যাই শোন, লক্ষ্মীটি। ছেলেমানুষি করিস না। অ্যাই—।"

আমি তখন সেই মেয়েটি যে পথে গিয়েছিল সেই পথেই চললাম।

মেয়েটি একটি পাথরের খাঁজে লুকিয়ে সব দেখছিল। এবার কাছে এসে বলল, "কী হল ভাইয়া?"

আমি বললাম, "কিছুই হয়নি। ওদের জেলখানায় ওদেরই ঢুকিয়ে দিয়েছি। এখন পালাই চল এখান থেকে। কী নাম তোর?"

"যমুনা।"

"তুই যাবি আমার সঙ্গে?"

"চলো!"

"আমি দেওঘরের দিকে যাব। আমাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবি?"

"খুব পারব।"

"আমার দিদিকে ওরা ত্রিকূট পাহাড়ে রেখে এসেছে। ওখানে গিয়ে তাকে উদ্ধার করতেই হবে। আমার মতো বয়সের একটি মেয়েকেও ওরা নিয়ে এসেছে এখানে। তাকে কোথায় রেখেছে বলতে পারিস?"

"হ্যাঁ। ও তো আমাদের আশ্রমেই আছে।"

"শিগগির চল। তাকেও আমরা উদ্ধার করব। তারপর তিনজনে মিলে পালাব এখান থেকে।"

আমরা বজবঙ্গবাবার আশ্রমে গিয়ে সর্বাগ্রে মুক্ত করলাম গীতাকে। মুক্তির আনন্দে গীতা যে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। ছুটে এসে আমার হাত দুটি ধরে বলল, 'সৌরভ তুমি! তুমি কি জাদু জানো?"

আমি বললাম, "কিছুই জানি না আমি। তবে এক অলৌকিক উপায়ে মুক্তি পেয়েছি এই কথাই শুধু বলতে পারি তোমাকে।"

"এখন আর দেরি নয়। শিগগির পালিয়ে চলো এখান থেকে।"

আমরা যাওয়ার জন্য উদ্যত হতেই চোখের সামনে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। দেখলাম আমাদের দিকে সাপের চোখে তাকিয়ে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে বজরঙ্গবাবা ও জয়ন্ত।

দশ

ওবা এখানে কী করে এল? ওরা কি জাদু জানে? নাহলে যে তালা আমি নিজে হাতে লাগিয়ে এসেছি সেই তালা ওরা ভেতর থেকে খোলে কী করে? নাকি এতক্ষণ যা ঘটেছে তা আমার অবচেতন মনের কল্পনা? এই ভূতুড়ে ব্যাপারটা যে কী করে সম্ভব হল তা কিছুতেই ভেবে পেলাম না।

বজরঙ্গবাবার দৃষ্টি স্থির। কিন্তু সেই স্থিরতার মধ্যেও যেন সাপের চোখের খলতা আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

জয়ন্ত আমার দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে বলল, "এইবার তোকে বাঁচাবে কে? শয়তান! আমাদের হাত থেকে দু' দুবার ফসকে গেছিস তুই। আর তোকে বাঁচিয়ে রাখা নয়।"

বজরঙ্গবাবা তখন আমার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সেই ছোট্ট মেয়েটি যমুনার দিকে তাকাল।

কী ছিল সেই চাহনিতে? সেদিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল যমুনা।

বজরঙ্গ বলল, "শেষপর্যন্ত তুইও এদের ফাঁদে পা দিলি? কত ছোটটি থেকে তোকে নিয়ে এসে লালন পালন করলাম, তবুও পোষ মানলি না?"

যমুনা ভয়ে কেঁদে উঠল এবার। বলল, "মেরা কসুর ক্যা?"

"তোর কসুর হচ্ছে এদেব পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তুই সাহায্য করেছিস। কিন্তু একবার যখন এই কাজ তুই করেছিস, তখন আর তোকে বাঁচিয়ে রাখা নয়। তোদের তিনজনকেই আজ জগন্মাতাব সামনে বলি দেব আমি। এবং এখনই।"

জয়ন্ত বলল, "ভাগ্যিস ময়নিহানটা হঠাৎ করে এসে পড়েছিল।"

বজরঙ্গ বলল, "সবই মায়ের মহিমা।"

"ওই অসুরটা হঠাৎ করে এসে না পড়লে আর দরজার তালা না ভাঙলে হয়েছিল আর কী!"

আমার মনে পড়ল ময়নিহানেব কথা। ভবনাথবাবুর সেই পোড়ো বাড়ির ভেতরে যে আমাদের পালিয়ে যাওযাব পথ আগলেছিল। মূর্তিমান যমের মতো আতঙ্ক একটা। অমানুষিক চেহারার এক দানব। ঠিক সময়টিতে অশুভ প্রেতের মতো আবির্ভাব হওয়াই যাব কাজ। এখন এই মুহূর্তে কি ওই পাপটার না এসে পড়লেই চলত না? আর একটু পরে এলে আমরা যেভাবেই হোক জঙ্গলের গভীরে হারিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু এখন আর কোনও উপায়ই নেই।

ময়নিহানের নাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে এসে ঢুকল সে। আমাদের দিকে তাকিয়ে পৈশাচিক হাসি হাসতে লাগল।

এইভাবে ধবা পড়ে গিয়ে চোখে জল এসে গেল আমার। গীতা ও যমুনার অবস্থাও একইরকম।

মনোমতো একটি শিকারকে বেশ কায়দা করে ধবার আগে বেড়াল যেভাবে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসে বজবঙ্গ ঠিক সেইভাবে লক্ষ স্থির রেখে এগিয়ে এল যমুনার দিকে।

যমুনা ভয়ে দেযালের গা ঘেঁষে সরে এল। ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

এই অবস্থায় ওকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার মুখেও নেই।

বজরঙ্গ ওর চুলের মুঠি ধবে টেনে আনল ওকে। তারপর ঠাস ঠাস করে ওর দু'গালে দুটি চড় দিয়ে পিঠের ওপর এমন একটা ঘুষি মারল যে প্রাণান্ত একটা চিৎকার করে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল যমুনা। তাবপর আহত পাখির মতো ছটফট করতে লাগল।

ওর এই অবস্থা দেখে আমার চোখেও জল এসে গেল তখন। কিন্তু অসহায় আমি বা আমবা। কিছুই করার নেই। তবুও মনের রাগ চেপে রাখতে না পেরে বললাম, "তোমাব দিন এবার ঘনিয়ে এসেছে বজরঙ্গ। নারীর কেশে হাত দিয়ে রাবণ বংশ ধ্বংস হয়েছিল, এবার তোমার বংশও ধ্বংস হবার সময় এসেছে।"

বজরঙ্গ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল আমার কথায়। বলল, "আমার বংশই নেই তো ধ্বংস হবে কী করে?"

"কে বলল তোমার বংশ নেই? এরা তাহলে কারা? এই শয়তানের বংশ কি তোমাব নয়?"

ক্রোধান্ধ বজরঙ্গ তখন আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, "একরত্তি ছেলে, বড় বেশি তত্ত্বজ্ঞান হয়ে গেছে, না? থাবড়ে মুখ ভেঙে দেব এখুনি।"

জয়ন্ত বলল, "দেব কেন? এখনই দে। মার মুখে এক ঘুষি।" বলেই ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে এল আমার দিকে।

বজরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে ওকে বাধা দিয়ে বলল, ''খবরদার নয়। ও আমার বলির নর। আমার মা জগজ্জননী ওর রক্ত-পিপাসায় লোলুপ হয়ে আছে। আজ বিশেষ কোনও তিথি নয়। তবুও আজ এই মুহূর্তে ওর বিনাশ আমিই করব।'' বলে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, ''কীরে! কিছু শুনতে পাচ্ছিস?''

আমি বললাম, ''না।''

''পাচ্ছিস না?''

''বললাম তো, না।''

''তাহলে ভাল করে শোন। কালের মন্দিরা বাজছে। বাজছে মহাকালের ঘণ্টা। ঢং ঢং ঢং। অর্থাৎ মৃত্যুঘণ্টা বাজছে তোর। শুধু তোর নয়, তোদের তিনজনেরই। আর একটু পরেই বলির প্রসাদ হয়ে যাবি তোরা।''

জয়ন্ত বলল, ''সেইসঙ্গে আমরাও শত্রুমুক্ত হব।''

আমি একবার যমুনা ও গীতার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। যমুনা উঠে বসেছে তখন। কিন্তু সমানে কাঁদছে। ওর লেগেছে খুব। বারো বছরের মেয়ে। ওই মার কখনও সহ্য করতে পারে? ওর পিঠের শিরদাঁড়ার হাড় যে গুঁড়িয়ে যায়নি এই ঢের।

আর গীতা? মৃত্যু আসন্ন জেনে সে তখন মূর্তির মতো স্থির। ওর সুন্দর মুখশ্রীতে তখন কালো মেঘের ছায়া।

কিন্তু আমি তো এত সহজে হাল ছাড়ব না।

মৃত্যু যখন দুয়ারে উপস্থিত তখন শত্রুর সঙ্গে শত্রুতা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই বললাম, ''ওহে হত্যাকারীর দল! আমাদের কি এবার সত্যই মরতে হবে?''

বজরঙ্গ বলল, ''অবশ্যই।''

''তা যদি হয় তাহলে মরবার আগে নিশ্চয়ই একবার আমরা আমাদের মাকে স্মরণ করতে পারি?''

''নিশ্চয়ই পারিস। মা মামা বাবা কাকা জ্যাঠা সবাইকে স্মরণ কর। চোদ্দপুরুষের নাম যদি মনে থাকে তাহলে তাদেরকেও স্মরণ করতে পারিস। কিন্তু জেনে রাখিস, তোদের অন্তিমকাল উপস্থিত। এখন যাকেই স্মরণ কর না কেন কোনও লাভই হবে না আর। মা ভবতারিণীও তোদের রক্ষা করতে পারবে না।''

''পারুক না পারুক মা মা বলে একবার ডেকে তো দেখি।''

''ডাক, ডাক, বদন ভরে মাকে ডাক। ধ্রুব নক্ষত্র থেকে খসে পড়া ভক্ত ধ্রুবর মতো ভক্তি নিয়ে ডাক। সাধক রামপ্রসাদের মতো ডাক। বামাক্ষ্যাপার মতো ডাক। কিন্তু বাছারে আমার, আমি যেখানে থাকব, সেখানে কোনও মা-ই আসবে না তোর ওই ডাক শুনে। তবু ডাক।''

আমি বললাম, ''তাহলে ডাকি?''

''ডাক ডাক। দেরি করছিস কেন?''

আমি জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, ''জয় মা। জয় আদ্যামা। এখনই যেন এই অশুভ শক্তির বিনাশ হয়।''

আমার ডাক শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ল বজরঙ্গ। বলল, ''ওরে বাবারে! এই ঘোর কলিতে এ কোন ভক্ত উল্কা থেকে খসে পড়ল রে! একি ধ্রুব! না প্রহ্লাদ! না জল্লাদ!''

আমি রেগে বললাম, "তুমি আমাকে বিদ্রূপ করছ শয়তান!"

"করব না? আমি না বলেছিলুম, যেখানে আমি থাকব সেখানে কোনও মা-ই আসবে না।'

আমি বললাম, "কে বললে আসবে না? এই তো এসেছে।"

"এসেছে! কই কোথায়?"

"এই তো এখানে।"

"তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

"কী করে পাবে? তুমি যে অন্ধ হয়ে গেছ।"

"আমি অন্ধ হয়ে গেছি?"

"হ্যাঁ।"

"মিথ্যে কথা। এই তো আমি তোকে দেখছি। দিনের আলো দেখছি। ঘর বাড়ি দেখছি। সবই দেখছি।"

"ভুল দেখছ। এখন ঘোর অমাবস্যার রাত। এই রাতে তুমি পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পাচ্ছো কী?"

"না। অমাবস্যায় কখনও পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যায়?"

"কেন যাবে না? আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখো, তাহলেই দেখতে পাবে।'

বজরঙ্গ আচ্ছন্নের মতো আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে আমার চোখে চোখ রাখতে এল যেই অমনি আমার দু'হাতের দুটো আঙুল ওর দু'চোখে প্যাঁক করে গুঁজে দিয়ে বললাম "এইবার দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদ ঠিক এইভাবেই দ্যাখে। এইভাবেই দেখা যায় মধ্যরাতে সূর্যগ্রহণ।"

আর চাঁদ দ্যাখা, গ্রহণ দ্যাখা।

চোখে আঙুল গুঁজে দেওয়ার যন্ত্রণার চোটে বজরঙ্গ তখন দু'হাতে চোখ ঢেকে বিকট চিৎকার করে এমন লাফাতে লাগল যে সেটাকে ডিসকো অথবা ভাঙ্ড়া ড্যান্সের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে।

ওর দু'চোখ বেয়ে তখন গলগল করে রক্ত ঝরছে।

বজরঙ্গ ভীষণ চিৎকার করতে লাগল, "ওরে আমি অন্ধ হয়ে গেলাম রে। আমার দুটো চোখই নষ্ট হয়ে গেল। ওরে তোরা কী কুক্ষণে এই কালসাপটাকে ধরে এনেছিলি রে!'

জয়ন্ত তখন ছুটে গেল বজরঙ্গকে সাহায্য করতে।

সেই সুযোগে গীতা আমি আর যমুনা এক লাফে উঠোনের মাঝখানে।

আমাদের পালাতে দেখেই জয়ন্ত চ্যাঁচাতে লাগল, "ধর ধর। ধর ওদের। ময়নিহান শিগগির ওদের ধর। কেলেঙ্কারির চরম হয়ে যাবে। কুমারদার কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।"

আমরা তিনজনেই তখন ময়নিহানকে ফাঁকি দিয়ে কাঠবেড়ালির গতিতে ছোটা শুরু করেছি।

ময়নিহান প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল আমাদের ব্যাপার স্যাপার দেখে। পরে বীরবিক্রমে তেড়ে এল আমাদের দিকে।

আমাদের তখন খরগোশের দৌড়।

কিন্তু ময়নিহানের খপ্পর থেকে পালানো কি এতই সহজ? ও-ও সামুদ্রিক ঝড়ের গতিতে ধেয়ে এল আমাদের দিকে।

আমরা আরও—আরও জোরে ছোটা শুরু করলাম। মোটকথা চেষ্টার ত্রুটি রাখলাম না এতটুকুও।

একসময় অতিকায় দৈত্যের মতো চেহারাটা নিয়ে ময়নিহান এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর।

বাঘের মুখে হরিণশিশুর মতোই জব্দ হয়ে গেলাম আমরা।

ময়নিহান প্রথমেই হাতের কাছে পেয়ে গেল যমুনাকে। ওকে শক্ত হাতে ধরে পাথরে আছাড় মারবার জন্য যেই না প্রস্তুত হয়েছে অমনি ঘটে গেল বিপর্যয়।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা হনুমান এসে লাফিয়ে পড়ল ময়নিহানের ঘাড়ে। তারপর পরম আদরে এক হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে ঠাস ঠাস করে সে কী চড় কষানোর ধুম। বাপ্‌রে! ভুবন যেন অন্ধকার করে দিল।

গীতা আর আমি তখন যমুনাকে ওর কবলমুক্ত করেছি।

যমুনাও মুক্তি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

এই হনুমানটিকে যমুনা রোজ প্রসাদী ফল ইত্যাদি খাওয়াত। কাজেই যমুনার গায়ে হাত দেওয়ার জন্য চরম প্রতিশোধ নিয়েই নিল হনুমানটি।

আমি কিন্তু বুঝলাম এ সবই মায়ের মহিমা। আদ্যামায়ের লীলার প্রকাশ। যাই হোক, ময়নিহানের অবস্থা দেখে আমাদের মন আনন্দে কানায় কানায় ভরে উঠল।

হনুমানের কবলে পড়ে দানব ময়নিহান তখন প্রাণ বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে, শুধু তাই নয়, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সেই হনুমানটাকে দু'হাতে টিপে মেরে ফেলবাব চেষ্টা করছে।

কিন্তু এতই কি সহজ? ফল তাতে উল্টোটাই হল।

হনুমানটা তো আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দিল ময়নিহানকে। তার ওপর দলে দলে হনুমানের পাল এসে তাদের জাতভায়ের গায়ে হাত দেওয়ার বদলা নিতে ভীষণ রেগে এমন ব্যতিব্যস্ত করে তুলল ওকে যে জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়ল ওর। নরবানরে সে কী তুমুল যুদ্ধ।

আমরা দূরে দাঁড়িয়ে সেই লড়াই দেখতে লাগলাম। একা ময়নিহান। হনুমান একশো। দৃশ্যটা কল্পনা করলেও গা যেন শিউরে ওঠে।

এগারো

আমাদের এই বিপদকালে আদ্যামা যে এইভাবে আমাদের ডাক শুনবেন তা আমরা ভাবতেও পারিনি। তাই মুক্তির আনন্দে বিহ্বল হয়ে আমরা জঙ্গলের গভীরে হারিয়ে যাওয়ার জন্য রওনা হলাম।

চারদিকে ঘন বন। তারই মাঝে এই তপোবন।

এই দেবভূমেও দানবের বাস।

এরই মাঝে কোথাও জপে তপে সাধকের সিদ্ধিলাভ। কোথাও বা পাণ্ডায় গুণ্ডায় মানুষের জীবনও বিপর্যস্ত। ঈশ্বরের লীলার বুঝি এইভাবেই প্রকাশ হয়।

যাই হোক, আমরা চলা শুরু করলাম। একটু দ্রুত। তবে ছুটে নয়। কেননা এখানে পাহাড়ের ডালে জঙ্গল ও বড় বড় শিলাখণ্ডর এমনই ঘন অবস্থান যে জোরে পথ চলা অসম্ভব।

তবু আমরা চেষ্টা করতে লাগলাম, যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি জায়গাটা থেকে দূরে সরে যেতে পারি।

যেতে যেতে এক জায়গায় একটি গুহাকৃতি অংশের কাছে থমকে দাঁড়ালাম আমরা।

জায়গাটা বেশ ছায়াশীতল ও মনোরম।

পথ চলার শ্রম দূর করতে আমরা সেখানে কথকগুলো বড় বড় পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

এইখানে ঘন ঝোপঝাড়ের ফাঁকে অজস্র আতা ও পেযারার বন।

গীতা ও যমুনা সেই বন থেকে সুপক্ক আতা ও ডাঁসা পেয়ারা সংগ্রহ করল অনেক। গীতা তো গাছে উঠতে পারে না, যমুনাই গাছে উঠে পেয়ারা পেড়ে ওকে দিল।

আমরা তিনজনে মনের আনন্দে সেই পেয়ারা ও আতা খেলাম। সে কী অপূর্ব স্বাদ তাব।

ফলাহার সেরে চিন্তা করতে লাগলাম কীভাবে এখান থেকে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কুণ্ডাতে পৌঁছানো যায়।

যমুনা বলল, "ডরো মাৎ। আমি পথ চিনি। তোমরা যদি হাঁটতে পারো আমি তাহলে পথ চিনিয়ে ঠিকই নিয়ে যেতে পারব তোমাদের।"

গীতা বলল, "হাঁটতে পারি মানে? পারতেই হবে। নাহলে এইভাবে এইখানে বনে জঙ্গলে পড়ে থেকে বেঘোরে মরব নাকি আমরা?"

আমি যমুনাকে জিজ্ঞেস কবলাম, "তুই এখানকাব পথঘাট ঠিক চিনিস তো?"

যমুনা বলল, "থোড়া থোড়া। তবে দেওঘরে যাবার রাস্তা বিলকুল সিধা। ভয়েল গাড়িতে চেপে দু'একবার গেছি এসেছি আমি।"

গীতা জিজ্ঞেস করল, "তোর দেশ কোথায়? মুলুক?"

"আমি জানি না।"

'এদের এখানে তুই কী করে এলি?'

উত্তরে যমুনা যা বলল তা হল এই, চার পাঁচ বছর আগে শোনপুরের মেলায় ও হারিয়ে গিয়েছিল। সেই সময় এই বজরঙ্গবাবা ওকে ওর মা বাবার কাছে পৌঁছে দেবার নাম করে এখানে নিয়ে আসে।

আমি বললাম, "তোর গ্রামের নাম মনে নেই?"

যমুনা বলল, "না। তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম তো। তবে ওই মেলা যেখানে বসে সেইখানেই কাছাকাছি কোনও গ্রামে আমাদের বাড়ি। আমার মা বাবাকে দেখলে আমি চিনতে পারব। আমি এখনও তাদের কথা ইয়াদ করি। মা'র জন্য আমার মন কেমন করে।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে। তোর কোনও চিন্তা নেই। আমরাই তোকে তোর বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব। আমাদের ফাগু যা আছে না, শোনপুরে গিয়ে তোকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঠিক খুঁজে বার করবে তোর বাবা মা'কে।"

আমার কথায় আনন্দে নেচে উঠল যমুনা।

"এখন তুই শুধু আমাদের পথ দেখিয়ে দেওঘরের দিকে নিয়ে চল।"

আমরা সেই জায়গাটা ছেড়ে ছোট ছোট টিলার পাশ দিয়ে উপলাকীর্ণ পথ ধরে ারও কিছুটা এগোতেই এক ভয়ঙ্কর নির্জনে হঠাৎই একটা বাজখাঁই গলার স্বর শুনতে পলাম, "রুখ্ যাও।"

এ কার কণ্ঠস্বর?

ভয়ে বুকের রক্ত জল হয়ে গেল আমাদের। আমরা যে কী করব কিছু ভেবে না পয়ে থমকে দাঁড়ালাম। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে চারদিকে তাকিয়ে কাউকে কোথাও দখতে পেলাম না।

কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, "তোদের পেছনদিকে দুটো বড় পাথরের পাশে ছোট্ট কটা গুহা দেখতে পাচ্ছিস?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"ওই গুহাটা লক্ষ্য করে এগিয়ে আয়।"

আমরা ভয়ে ভয়ে সেইদিকে আসতেই কুঞ্জবনের মতো পাহাড়ি লতায় ছাওয়া ছোট্ট কটি আস্তানা দেখতে পেলাম। বড় বড় লম্বাকৃতি কয়েকটি বিশাল পাথরকে আশ্রয় করে ই আস্তানাটি এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে সচরাচর বাইরে থেকে কেউ এটিকে দেখতে াবে না। একমাত্র হাতি ছাড়া অন্য কোনও বন্য জন্তুও কোনও ক্ষতি করতে পারবে না ার। বাঘ ভালুক নেকড়েও ঢুকতে পারবে না এর ভেতর। এমন কি একটি শেয়াল কুকুরও াথা গলাতে পারবে না এখানে।

ওইখানেই এক জায়গায় এক সিদ্ধাসনে দুটি ছোট ছোট টিলার মধ্যস্থলে ধুনি জ্বালিয়ে াসে আছেন জটাজূটধারী কৌপিন পরা এক সাধুবাবা। দীর্ঘ দেহ বিশাল শরীর সৌম্যকান্তি ান্যাসী।

আমাদের নজর সেদিকে পড়তেই হাতছানি দিয়ে ডাকলেন উনি।

আমরা পায়ে পায়ে তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই আমাদের গায়ে াথায় হাত বুলিয়ে কমণ্ডলু থেকে একটু শান্তিবারি নিয়ে আমাদের সারা গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে ালেন, "এই ভুল পথে কোথায় চলেছিস তোরা? এ পথে জঙ্গল আরও গভীর। দনমানেও বন্যজন্তুর ভয় আছে।"

আমি বললাম, "আমাদের বড় বিপদ সাধুবাবা।"

"বিপদ! কিসের বিপদ? তোরা কি পথ হারিয়েছিস?"

"না। আমরা পথ খুঁজছি।"

সাধুবাবা বললেন, "হাসালি তোরা। পথ যেখানে নেই সেখানে তোরা পথ খুঁজছিস? াই হোক, শুধু বনে নয়, জীবনেও তোরা যাতে সঠিক পথটি খুঁজে পাস মা জগজ্জননীর কাছে জগন্মাতার কাছে এইটুকুই শুধু কামনা করি।"

জগন্মাতার নাম শুনেই শিউরে উঠলাম। কেননা ওই শয়তান বজরঙ্গ তো জগন্মাতার কাছেই আমাদের বলি দিতে চেয়েছিল।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "আপনি কি জগন্মাতার কাছে আমাদের বলি দেবেন?"

সাধুবাবু হেসে বললেন, "না রে বালক, না। আমার জগন্মাতা বলি চান। তবে সে বলি নরবলি নয়, পশুবলি। আর সে পশু বনের নিরীহ প্রাণী নয়, মানুষের অন্তরের পশু।

অর্থাৎ কিনা তাদের পাশব প্রবৃত্তি। তোরা হচ্ছিস মায়ের ফুল। আদ্যাশক্তি মহামায়ার সন্তান তোরা। তোদের গায়ে হাত দিলে মা যে আমাকেই শেষ করে দেবেন।" বলে সস্নেহে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নে প্রসাদ খা। আমার এক ভক্ত এক গাদা প্যাঁড়া দিয়েছে আমাকে। তোরাই খেয়ে নে ওগুলো। রোজ প্যাঁড়া খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে আমার। এই বনের হনুমানরা আমার পরম ভক্ত। আমি রোজ ওদের খিচুড়ি করে খাওয়াই, প্যাঁড়া দিই। ওদের জন্যই রেখেছিলাম ওগুলো। অনেকক্ষণ ওরা কেউ নেই। কোথায় গেছে কে জানে? হয়তো এখন বনে বনে ঘুরে ফলপাকুড় পেড়ে খাচ্ছে। তা হঠাৎ করে তোরা যখন এসেই পড়েছিস তখন তোরাই খেয়ে নে এগুলো। তোরাও তো মায়েরই সন্তান।"

আমরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলাম। একে তো মুক্তির আনন্দ, তার ওপর সুস্বাদু প্যাঁড়া। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এই প্রথম অনুভব করলাম মানুষ ভগবান হয় না যদিও, তবুও ভগবান মানুষের মধ্য দিয়েই মানুষের মঙ্গল করিয়ে দেন। এই সাধুবাবা যেন সেই মঙ্গলময়েরই প্রতীক।

গীতা যমুনা আমার দিকে তাকালে বললাম, "দেখলি তো আদ্যামায়ের কত ক্ষমতা। ওই দুর্ধর্ষ শত্রুদের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিলেন। বনের ফল দিয়ে খিদে মেটালেন। এখন আবার সাধুর আস্তানায় মিষ্টিমুখও করালেন। আর কী চাই আমাদের?"

আমরা প্যাঁড়া খেয়ে জল খেয়ে তৃপ্ত হলে সাধুবাবা বললেন, "হ্যাঁ। যে কথা বলছিলাম, এ পথে কেন এসেছিলি তোরা? কিসের বিপদ তোদের?"

আমি আগাগোড়া আমাদের বিপদের কথা সব বললাম।

শুনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সাধুবাবু। বললেন, "শয়তানরা এত বাড় বেড়েছে? ওই আশ্রম আগে আমারই ছিল। ওইখানে সহস্রমুণ্ডির আসনে বসে আমি তপস্যা করতাম। একবার গঙ্গাসাগরে গিয়ে বজরঙ্গ-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হলে ভালবেসে ওকে নিয়ে এসে আমি আমার কাছেই রাখি। জয়ন্তও আসত তখন মাঝে মাঝে, ওই সময় আমরা একটা যোগাশ্রমের পরিকল্পনা করি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কিছু লক্ষণযুক্ত বালককে যোগ শিখিয়ে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করে সৎ শিক্ষা প্রচারের কাজে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেব। এবং এইসব ছেলেরা কোনও বাবা মায়ের বুকের মানিক ছিনিয়ে আনা ছেলে হবে না। হবে সত্যিকারের অনাথ শিশু। কিন্তু তার জায়গায় এ কী শুনছি?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "সেকি! আপনি এত কাছে থাকেন অথচ ওদের কীর্তিকলাপ কিছুই জানেন না?"

"না। ওদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি তিন বছরের জন্য হিমালয় পরিক্রমায় গিয়েছিলাম। ফিরেওছি দিন কয়েক আগে। এসেই কয়েকদিনের জন্য সুলতানগঞ্জের কাছে গৈবীনাথে গিয়েছিলাম। এই সিদ্ধাসনে এসে বসেছি দিন দশেক হল।"

গীতা বলল, "আপনার সহস্রমুণ্ডির আসন এই বজরঙ্গকে দিয়ে আপনি এখানে সিদ্ধাসনে বসলেন? কিরকম সাধক আপনি?"

গীতার এই কথায় সাধুবাবার রাগ করা উচিত ছিল। কিন্তু উনি রাগলেন না। বললেন, "সহস্রমুণ্ডির আসন তো এখন ওখানে নেই। সে আসন এখন এইখানে। এই দারুণ নির্জনে, আসন ওইখান থেকে সরিয়ে এনে এইখানে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করে এই সিদ্ধাসন তৈরি করা হয়েছে।"

আমি বললাম, "আপনি ওই কাজ করলেন কেন?"

"তার কারণ, ওই যোগাশ্রমের পরিবেশে এই আসনের পবিত্রতা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না বলে। তাছাড়া ওদের হাতে সব কিছুর দায়িত্ব দিয়ে আমি একটু দূরে বসে সাধনা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কে জানত যে তার ফল এমন হবে?"

"এখন তাহলে কী করবেন?"

সাধুবাবা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "কী করব সেটা তাহলে দ্যাখ এবার। আয় তোরা আমার সঙ্গে।"

আবার ওইখানে যেতে হবে? শুনেই মুখ শুকিয়ে গেল আমাদের।

এ কোন সাধুবাবা?

ছদ্মবেশী শয়তান নয়তো?

গীতা আর যমুনা আবার ভয়ে ভয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

সাধুবাবা বললেন, "তোরা ওখানে যেতে ভয় পাচ্ছিস? ভয় কী? ও তো আমারই আশ্রম। আয় আমার সঙ্গে।"

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সাধুবাবার সঙ্গে চললাম। সাধুবাবার স্নেহপূর্ণ কথাবার্তাতেই বোঝা গেল তিনি অসাধু নন। অবশ্য তেমন কিছু হলেও আমাদের বিপদের সম্ভাবনা খুব কম। তার কারণ, ময়নিহানের যা হাল হয়েছে বা বজরঙ্গ-এর চোখের যে অবস্থা আমি করে এসেছি তাতে ওদের সাধ্য নেই আমাদের কিছু করে। বাকি রইল জয়ন্ত। একা ওর পক্ষে কিছু করা হয়তো বা সম্ভব হবে না।

আমরা আবার সেই জায়গাটার কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেলাম হনুমানের দল ময়নিহানকে ছেড়ে আশ্রমের মধ্যে ঢুকে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে। ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত ময়নিহানের সংজ্ঞাহীন অবস্থা।

সাধুবাবা যেতেই শান্ত হল হনুমানের দল।

আমরাও বুকে বল পেলাম।

অন্ধ বজরঙ্গ তখনও যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

জয়ন্ত ভয়ে একটি ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে কাঁপছে থরথর করে।

সম্পূর্ণ পরিবেশটাই কেমন যেন থমথম করছে।

সাধুবাবার ডাকাডাকিতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সাধুবাবা জয়ন্তর গালে ঠাস করে একটা চড় মারলেন। তারপর বললেন, "শয়তানের বাচ্চা, বড্ড বাড় বেড়েছ তোমরা, না? নোংরামো করবার জন্য শেষপর্যন্ত বেছে নিলে আমার আশ্রমকে? শুধুমাত্র মাঝে মধ্যে তীর্থ ভ্রমণে বেরোবার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি সরল বিশ্বাসে তোমাদের হাতে আশ্রমের দায়িত্বভার তুলে দিয়ে আরও নির্জনে সরে গেছি। এমন এক জায়গায় গেছি যেখানে সচরাচর কেউ গিয়ে আমাকে বিরক্ত করবে না। এমনকি নতুন জায়গা নির্বাচন করে আমার গুরুদেব ভবশংকরের সহস্রমুণ্ডির আসন পর্যন্ত স্থানান্তরিত করেছি। তার এই প্রতিদান? ঠিক আছে, আজ থেকে আবার আমি এই আশ্রমেই থাকব। তোমাদের খেলা শেষ।"

জয়ন্ত সাধুবাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, "আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি মহেন্দ্রজী। কিন্তু এতসব কাণ্ডর জন্য একা আমি দায়ি নই। ওই বজরঙ্গটা নাটের গুরু। ভেতরে ভেতরে আপনি ফিরে এলে ও আপনাকে খুন করবারও ষড়যন্ত্র করেছিল। আর সব

কিছুরই মূলে হল কুমারদা। সেই এসে সব গোলমাল করে দিল।"

সাধুবাবা বললেন, "কুমারদা কে?"

"ভবনাথবাবুর বড় ছেলে। ভবনাথবাবু মারা যাবার পর সম্পত্তির লোভে ভাইকে খুন করল। তারপর ফেরাব হয়ে কুণ্ডার বাড়িতে ঘাঁটি করে যতসব খারাপ কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে।"

"সে এখন কোথায়?"

"ত্রিকূট পাহাড়ের এক গুহায় এদেরই এক দিদিকে বন্দিনী করে সেখানেই পাহারা দিচ্ছে। কেউটে গোখরো আব নেলো গেছে মেয়েটিকে এখানে নিয়ে আসবার জন্য।"

"এখানে নিয়ে আসবে কেন?"

"ওকে দিয়ে আশ্রমের কাজ করাবে বলে।"

সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রতিবাদ করে বললাম, "মিথ্যে কথা। ওদের দুজনের অন্য কথাবার্তা হচ্ছিল।"
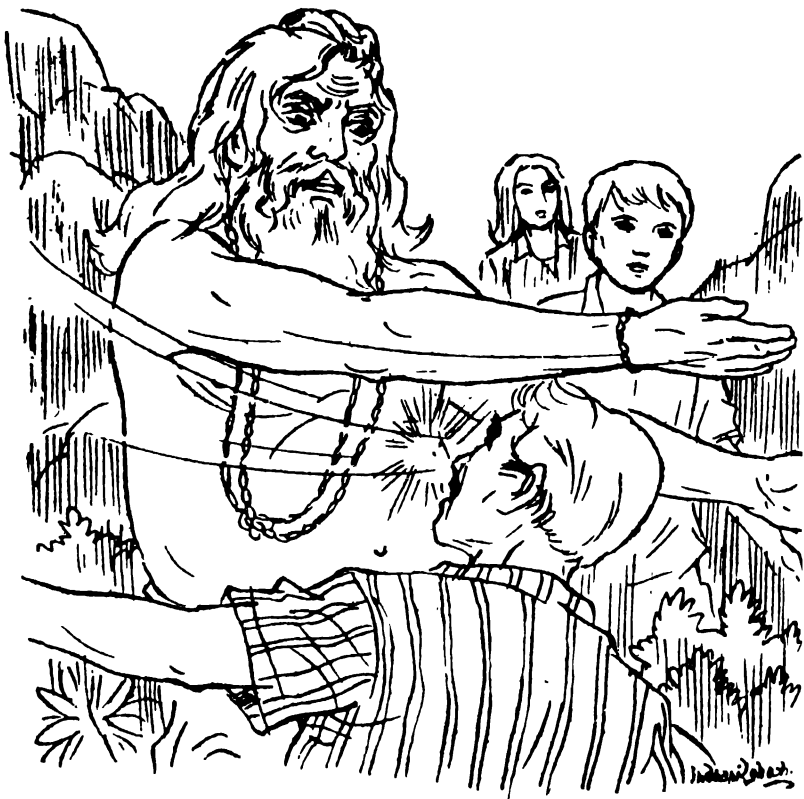
সাধুবাবা জয়ন্তর গালে ঠাস করে একটা চড় মারলেন।

সাধুবাবা বললেন, "একটু আগেই তো সে কথা শুনেছি। তা কেউটে গোখরো ওরা কারা?"

"আপনি ওদের চিনবেন না।"

"ঠিক আছে, পরে চিনে নেব। বুঝতেই পারছি বেশ রীতিমতো একটা ক্রিমিন্যালের গ্যাঙ গড়ে উঠেছে এই জায়গাটা ঘিরে। যাই হোক, এই পবিত্র তপোবনের পুণ্য প্রভাবে পাপচক্র স্থায়ী হতে পারল না। তপোবনের মহিমার প্রকাশ এইখানেই।" বলে টেনে হিঁচড়ে বজরঙ্গ ও ময়নিহানকে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে জয়ন্তকেও ভেতরে ঢোকালেন। তারপর দরজায় শিকল দিয়ে যমুনার কাছ থেকে একটা তালা নিয়ে লাগিয়ে দিলেন ঘরের দরজায়।

জয়ন্ত অনেক অনুনয় বিনয় করতে লাগল, "মহেন্দ্রজী! এবারের মতো আমাকে মাফ করুন। আমার চোদ্দপুরুষের দিব্যি আমি আর কখনও এইসব কাজ করব না।"

সাধুবাবু বললেন, "আমারও আঠাশ পুরুষের দিব্যি, জীবনে একবার যে ভুল করেছি সেই ভুল আর দু'বার করব না।"

ততক্ষণে আশ্রমের অন্যান্য ছেলেরাও সব এসে দাঁড়িয়েছে।

সাধুবাবা আমাদের সকলকে নিয়ে চললেন পাহাড়েব উপলাকীর্ণ পথ বেয়ে আরও উচ্চস্থানে তপোবন পাহাড়ের এক রমণীয় পরিবেশে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর সাধনপীঠে।

যেতে যেতে সাধুবাবা বললেন, "এই তপোবন এক মহাতীর্থ ও রম্যস্থান। আমাদের পুবাণেও এর উল্লেখ আছে। বৈদ্যনাথ পুজোয় কোটি লিঙ্গপূজার ফল হয় কিন্তু তপোবন ভ্রমণে বৈদ্যনাথ পূজার ফল হয়, এমনও নির্দেশ আছে। এখানে শূলকুণ্ড নামে একটি কূপ আছে। আর পাহাড়ের নীচে আছে দেবীকুণ্ড। তোরা ওই দেবীকুণ্ডে স্নান করে সুস্থ হ। তারপর আশ্রমে খাওয়া দাওয়া কর। এখানে ভোগ প্রসাদেব অভাব হবে না। বিকেলবেলা আমি নিজে গিয়ে তোদেব রেখে আসব কুণ্ডাতে। একজন লোককে আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি থানায়।"

আমাদের মন আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পব একসময় আমরা পবিত্র তপোবনের শান্ত নির্জন পরিবেশে এসে উপস্থিত হলাম।

তপোবন আশ্রমের সাধক, পূজারী ও পাণ্ডা ঠাকুররা সাধুবাবা মহেন্দ্রনাথ গিরি মহারাজকে অত্যন্ত মান্য ও শ্রদ্ধাভক্তি করেন দেখলাম। সব শুনে তো রেগে আগুন হয়ে গেলেন তাঁরা। আমাদের অভয় দিয়ে নতুন বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে নিজেরা সঙ্গে থেকে স্নান ভোজন করালেন। তারপর গোলকধাঁধার মতো এখানকার গুহাপথ ধবে নিয়ে গেলেন পাহাড়ের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

পূজারীরা বললেন, "এই তপোবনের পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরও। দিনেব পর দিন এখানে এমনসব অপকর্ম হচ্ছে অথচ আমরা জানতে পারিনি এর ব্যর্থতা আমাদেরও এড়িয়ে যাবার নয়। যাই হোক, এখন থেকে আমরা আর বিশ্বাসের ওপর নির্ভর না করে সবসময় কড়া নজরদারি রাখব চারদিকে। বাবা বৈদ্যনাথের দেওঘরের সঙ্গে তপোবনের যোগসূত্র বাঁধা। কাজেই দেওঘরে এলে তপোবন দেখতেই হয়। আসেনও সকলে। তবে পুণ্যার্জনের জন্য তপোবন দেখতে গেলে পদব্রজে আসতে হয়। অবশ্য তার আগে দেখে আসতে হয় নন্দন পাহাড়। এই প্রাচীন পাহাড়ে দুটি দুর্বোধ্য শিলালিপিও আছে।

এই জায়গার কী তুলনা হয়?"

পূজারীরা বলে গেলেন। আমরাও শুনে গেলাম। কিন্তু আমাদের মন তখন সম্পূর্ণ অন্যদিকে। বিশেষ করে আমার মন পড়ে আছে অদেখা ত্রিকূট পাহাড়ে। সেখানে আমার রুমিদি আছে।

তপোবন ঘোরা শেষ হলে ফিরে এসে সাধুবাবাকে বললাম, "বাবাজী, আমরা তো নিরাপদ একটা আশ্রয় পেলাম। কিন্তু আমার রুমিদির কী হবে? ত্রিকূট পাহাড় কতদূর?"

সাধুবাবা বললেন, "সে অনেক দূর।" বলে পাহাড়ের উচ্চস্থান থেকে ঘন অরণ্যপরিবৃত ভীষণদর্শন ত্রিকূট পর্বতকে দেখিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, "ওখানে যেতে গেলে ভালো একটা গাড়ি চাই। মোটর, টাঙ্গা কিংবা টমটম ছাড়া যাওয়া যাবে না। আশ্রমের লোক সাইকেল নিয়ে দেওঘরে গেছে পুলিশে খবর দিতে। পুলিশ এলে ওদের গাড়িতেই আমরা যাব।"

আমরা অধীর আগ্রহে কখন পুলিশের গাড়ি আসে সেই আশায় পাহাড়ের এদিক সেদিকে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। এইখানকার উচ্চস্থান থেকে দূরের দৃশ্যগুলি বড়ই মনোরম। চারদিকে লাল মাটি, সবুজ বন আর অসংখ্য ছোট বড় পাহাড় ও টিলায় ভরে আছে জায়গাটা।

একসময় পুলিশের গাড়ি এসে গেল।

আর সেই গাড়ি থেকে সর্বাগ্রে যিনি নামলেন তাঁকে দেখে আমার বিস্ময়ের অন্ত রইল না।

এমনও কী হয়?

পুলিশের গাড়ি থেকে প্রথমেই নামলেন আমার বাবা। তারপরে মা।

মায়ের চোখে জল।

চোখের জল আমিও আর ধরে রাখতে পারলাম না। আমি ছুটে গিয়ে তাঁদের জড়িয়ে ধরতেই বাবা মা দুজনেরই সে কী কান্না। হারানিধি ফিরে পেয়ে কী যে করবেন তাঁরা কিছু যেন ভেবে পেলেন না।

আমি বললাম, "তোমরা কী করে আমার খবর পেলে?"

বাবা বললেন, "ফাগু ওর লোকদের দিয়ে টেলিগ্রামে খবর পাঠিয়েছিল। সেই খবর পেয়েই ছুটে এসেছি আমরা। কিন্তু রুমির ব্যাপারে কী যে করব তাই ভাবছি। ওকে যদি ফিরে না পাই তাহলে কী করে মুখ দেখাব ওর বাবা মায়ের কাছে?"

আমি বললাম, "ফাগু কেমন আছে বাপি?"

"ভালো আছে। ছাড়াও পেয়েছে হাসপাতাল থেকে।"

মা বললেন, "তোর শরীরের অবস্থা কিরকম?"

"খুব ভালো। এখন আমার কোনও দুর্বলতা নেই। মনে হচ্ছে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।"

বাবা বললেন, "সে তোকে দেখেই বুঝতে পারছি। যাই হোক, টেলিগ্রাম পেয়েই আমি ছুটে এসে থানা পুলিশ করেছি। এমন সময় আশ্রমের লোক মারফত তোদের খবর শুনেই ছুটে এলাম এখানে।"

আমি বললাম, "খুব ভালো করেছ। তবে বাবা, তুমি হয়তো জানো না রুমিদিকে ওরা ত্রিকূট পাহাড়ের গুহায় আটকে রেখেছে।"

চমকে উঠলেন বাবা, "বলিস কী!"

"হ্যাঁ। তুমি এখনই পুলিশকে সে কথা বলে রুমিদিকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করো। নাহলে আর হয়তো পাওয়া যাবে না রুমিদিকে।"

মা বললেন, "একথা তুই জানলি কী করে?"

"ওদেরই লোকের মুখ থেকে শুনেছি।"

বাবা বললেন, "তা যদি হয়, তাহলে ওদের সাধ্য নেই ওকে কোথাও ধরে রাখে। এই ব্যাপারে পুলিশের ওপর কড়া নির্দেশ দেওয়া আছে। আমবা এখনই পুলিশ নিয়ে যাব সেখানে।"

পুলিশের লোকরা তখন বজরঙ্গবাবা, ময়নিহান ও জয়ন্তকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে ওঠাচ্ছে।

বজরঙ্গবাবা ও ময়নিহানের অবস্থা খুবই শোচনীয়। ওদের এখনই হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। বজরঙ্গবাবা যদিও অন্ধ হয়ে বেঁচে থাকে, হনুমানের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ময়নিহানের বোধ হয় বাঁচার আশা নেই।

ওদের দুর্দশা দেখে আনন্দে ভরে উঠল আমার মন। এইসব পাপীদের শুধু তপোবনে কেন, পৃথিবীর মাটিতে জীবনধারণ করে বেঁচে থাকাও ঠিক নয়। অনন্ত নরকই এদের উপযুক্ত স্থান।

এমন সময় বিস্ময়েব পর বিস্ময়।

সাধুবাবা তপোবন পাহাড়ের ওপর থেকে খড়ম খটখটিয়ে নীচে নেমে একেবারে বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, "হ্যাঁরে অম্বিকা, এই দুগ্ধপোষ্য বালকটি কি তোর ছেলে?" বলে পরমাদরে আমার কাঁধে হাত রাখলেন।

বাবা বললেন, "হ্যাঁ, আমারই ছেলে। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।"

সাধুবাবা হেসে বললেন, "দীর্ঘ বিশ বছর পরে দেখা। আমার দাড়ি গোঁফ জটা দেখে না চেনাই স্বাভাবিক। কিন্তু কণ্ঠস্বরও কি চেনা বলে মনে হচ্ছে না?"

বাবা হঠাৎ উল্লসিত হয়ে বললেন, "তুই কি মহেন্দ্র! মহেন্দ্রগিরি! স্কটিশ চার্চের সেই—।"

"চিনতে পেরেছিস তাহলে। তখন ছাত্রাবস্থায় ছিলাম বিপ্লবী, এখন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী ঠিক নয়, যোগী।"

সে কী মধুর মিলন। দুজনেই দুজনকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে বিভোর হলেন।

আর দেরি নয়, আমরা সবাই চললাম পুলিশের গাড়িতে চেপে ত্রিকূট পাহাড়ের দিকে।

যমুনা বালানন্দ আশ্রমেই নিরাপদে রইল।

গীতা এল আমাদের সঙ্গে।

যেতে যেতে আমি আমাদের আগাগোড়া বিপদের সব কথা শুনিয়ে দিলাম বাবাকে। পুলিশের লোকরাও শুনল। মহেন্দ্রগিরি আগে শুনেছিলেন, আবার শুনলেন।

রাঙাবাবুর বৃত্তান্ত শুনে মহেন্দ্রগিরি বললেন, "কোনও ভয় নেই তোর ওই রাঙাবাবুর। ওর দায়টা আমিই নেব। খুনের সময় ও যে কলকাতায় ছিল না সেটা প্রমাণ

করতে বেশিক্ষণ লাগবে না আমাদেব। এখন ভালোয় ভালোয় মেয়েটাকে ওদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করতে পাবলেই নিশ্চিন্ত হই।

একসময় আমরা ত্রিকূট পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছলাম। ঘন অরণ্যের পাশে সে কী বিশাল পর্বত। আগাগোড়া কালো পাথরের যেন এক মূর্তিমান বিভীষিকা।

এইখানেই একটি চায়ের দোকানে বসে চা খাওয়া অবস্থায় হাতে নাতে ধরা পড়ে গেল কেউটে গোখরো আর নেলো নামের তিনসঙ্গী। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও হদিস পাওয়া গেল না কুমারদাব। সেইসঙ্গে পাওয়া গেল না রুমিদিকেও।

তাইতো! কোথায় গেল রুমিদি?

বারো

না। রুমিদির কোনও খোঁজখবরই পাওয়া গেল না। বেলা গড়িয়ে আসছে দেখে পুলিশের গাড়ি আমাদের কুণ্ডায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল দেওঘরে।

অবশ্য পুলিশ যে এইভাবেই তাদের কর্তব্য শেষ করল তা নয়। ওয়ারলেসে খবর দিয়ে চারদিকেই সতর্কবার্তা পৌঁছে দিল। জনা চারেক কনস্টেবলকেও রেখে এল ত্রিকূট পাহাড়ের কাছে নজরদারির জন্য। আর সঙ্গে করে নিয়ে এল কেউটে, গোখরো ও নেলোকে, লক-আপে ঢুকিয়ে বেশটি করে মোচড় দিয়ে ওদের পেট থেকে আরও কিছু কথা বার করবার জন্য।

যাই হোক, আমরা ফিরে এসেই দেখি ফাগু ও তার দলবল লাঠি সোঁটা নিয়ে একেবারে তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। আমাকে দেখেই উল্লসিত হয়ে ফাগু বলল, "ওই—ওই তো এসে গেছে আমার দাদাভাই।"

আমি বাবা-মাকে ছেড়ে ছুটে গেলাম ফাগুর কাছে। বললাম, "তুমি কেমন আছ ফাগু? শুনলাম তোমাকে নাকি হাসাপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল?"

"হয়েছিলই তো। দেখছো তো এখনও মাথায় আমার ব্যান্ডেজ বাঁধা।"

"তা তো দেখছি। কিন্তু লাটি সোঁটা নিয়ে এসব কী ব্যাপার?"

"বাঃ রে। বদলা নিতে হবে না?"

"কার বদলা নেবে?"

"কেন, যারা আমার মাথা ফাটিয়েছে, তোমাকে অপহরণ করেছে, দিদিমণিকে নিয়ে গেছে। তাদের প্রত্যেকের বদলা যে নিতে হবে। সেইজন্যই তোমাদের ফিরে আসার সময়টুকু পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম। তা দিদিমণির খবর কী?"

আমার হয়ে মা বাবাই বললেন সব কথা।

সব শুনে ফাগু বলল, "ওরা পালাতে পারবে না। একমাত্র রাবণগুহায় ছাড়া লুকিয়ে থাকার আর কোনও জায়গাও পাবে না ওরা। রুমিদিদিমণিকে ওরা ঠিক রাবণগুহায় নিয়ে গেছে।"

আমি বললাম, "ওরা তো নয়, কুমারদা একা।"

ফাগু বলল, "তুমি খুবই ছেলেমানুষ দাদাভাই, একার পক্ষে কখনও কুমারের সাধ্য আছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার রুমিদিদিমণিকে জোর করে নিয়ে যায়?"

"তা ঠিক? তবে কিনা রিভলভার দেখিয়েও তো নিয়ে যেতে পারে?"

ফাগু বলল, "হ্যাঁ। ওইভাবে ভয় দেখিয়ে হয়তো নিয়ে যাওয়া সম্ভব।"

বাবা বললেন, "রাবণগুহার পথ কি তুমি চেনো?"

তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাই অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল চারদিক। হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "আমি চিনি।"

ফাগু বলল, "আমরা সবাই চিনি। কিন্তু রাঙাবাবু, তুমি এই অসময়ে কোত্থেকে এলে?"

"আমি আশপাশেই ছিলাম এবং সকলের গতিবিধির দিকে নজর রাখছিলাম। দিনের আলোয় নিজেকে আমি লুকিয়ে রাখলেও রাত্রে আমি নিশাচর। বহুকষ্টে একটা মোটরবাইক আমি ম্যানেজ করেছি। ভেবেছিলাম আজ সারারাত ধরে চারদিক তোলপাড় করে এই ক্ষুদেটাকে খুঁজে বের করব। তা ওকে যখন পাওয়া গেছে তখন আর কোনও চিন্তা নেই। কিন্তু ওর ওই রুমিদিকে রাবণগুহা থেকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমিই নেব।"

আমাদের কথার মাঝখানে বাবা বললেন, "ও তুমিই তাহলে সেই—।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ বাবা, ইনিই আমাদের রাঙাবাবু।"

রাঙাবাবু আমার বাবাকে প্রণাম করে বলল, "বিনা অপরাধে অপরাধী হয়ে খুনের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি কাকাবাবু। এবারে ভাবছি সত্যিকারের একটা খুন করে নিজের থেকেই আত্মসমর্পণ করব পুলিশের কাছে।"

বাবা বললেন, "তোমার ব্যাপারে আমি সব শুনেছি। কোনও ভয় নেই তোমার। তুমি যে খুন করোনি সেটা আমরা প্রমাণ করে দেব। আমার বন্ধু মহেন্দ্রগিরিও এই ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করবে। সে এখন থানায় গেছে পুলিশের কাছে স্টেটমেন্ট দিতে। ফিরে আসবে এখনই। সে এলে—।"

"আমি কিন্তু আর দেরি করতে পারব না। ভবনাথবাবুর ওই ছেলেটিকে আমি চিনি। অত্যন্ত বদ প্রকৃতির। এখনই না গিয়ে পড়তে পারলে হয়তো সাংঘাতিক রকমের ক্ষতি করে দেবে মেয়েটির।"

বাবা বললেন, "তাহলে এক কাজ করো, আমার রিভলবারটা তুমি নিয়ে যাও।"

রাঙাবাবু বলল, "ও জিনিস আমার কাজে লাগবে না কাকাবাবু, তার কারণ আমি ওসব জিনিস ব্যবহার করতে শিখিনি।"

"তাহলে আত্মরক্ষার জন্য যা হোক কিছু একটা সঙ্গে রাখো। নাহলে বিপদে পড়ে যাবে যে, শুধু হাতে ওই ধরনের দুষ্কৃতীর সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া ঠিক হবে না।"

রাঙাবাবু হেসে বলল, 'একটা ছোরা অবশ্য সঙ্গে আছে আমার। দড়ির ফাঁসও একটা রেখেছি সঙ্গে।"

ফাগু উৎসাহিত হয়ে বলল, "বাইকটাকে আপনি কোথায় রেখে এসেছেন রাঙাবাবু?"

"ভবনাথবাবুর বাড়ির সামনেই রাখা আছে।"

বাবা বললেন, "তোমার বাড়ির ঠিকানা বা ফোন নম্বর যদি কিছু থাকে তো আমার কাছে রেখে যাও।"

"সবই আছে।" বলে একটা কাগজে খস খস করে সব লিখে দিল রাঙাবাবু।

ফাগু বলল, "তুমি তাহলে আর একটুও দেরি না করে চলে যাও। আমাদের আগে

তুমিই গিয়ে ওকে খুঁজে বার করো। বাধা দাও। তারপরে আমরা যাচ্ছি। কিছু টাঙি, বল্লম আর মশাল নিয়ে ইব্রাহিমের টাঙায় চেপে যাচ্ছি আমরা।"

রাঙাবাবু আমার বাবা মা দুজনকেই পেন্নাম করে যাবার জন্য উদ্যত হলে আমিও রাঙাবাবুর পিছু নিলাম। দেখাদেখি গীতাও।

রাঙাবাবু বলল, "একি! তোরা কোথায় চললি?"

আমি বললাম, "আমি যাব তোমার সঙ্গে। রুমিদির জন্য আমার মন ভীষণ ছটফট করছে।"

গীতা বলল, "সৌরভ গেলে আমিই বা যাব না কেন? আমার মন বুঝি ছটফট করছে না?"

ফাগু বলল, "শোনো দাদাবাবু, ছেলেমানুষি কোরো না। ওই পাহাড়ে জঙ্গলে ভয়ানক সব হিংস্র জন্তুর বাস। যে কোনও মুহূর্তে একটা বিপদ ঘটে গেলে কিন্তু আফশোসের শেষ থাকবে না। তার চেয়ে বলি কি দিদিমণিকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারটা আমাদের ওপরই ছেড়ে দাও।"

আমার মা তো কিছুতেই যেতে দেবেন না আমাদের।

বাবাও রাজি নন।

অবশেষে জোর করে গীতাকে ধরে রাখলেন ওনারা।

মা বললেন, "পরের মেয়ে বহুকষ্টে উদ্ধার যখন হয়েছে তখন আর ওকে হাতছাড়া করা ঠিক নয়। গেলে তুইই যা।"

সজল চোখে রয়ে গেল গীতা।

আমি বীরবিক্রমে রাঙাবাবুর সঙ্গ নিলাম।

রাঙাবাবু যে কী অসম্ভব রকমের তেজি পুরুষ তা ওঁর সঙ্গে যেতে গিয়েই বুঝলাম।

আমি মোটরবাইকের পেছনদিকের সিটে বসে দুহাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রইলাম রাঙাবাবুকে।

রাঙাবাবু মোটরবাইকটাকে ঝড়ের বেগে চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল, "রাতের অন্ধকারে এইভাবে পথ চলতে কেমন লাগছে রে ফচকে?"

বললাম, "খু-উ-ব ভালো।"

"তোর জীবনে বোধ হয় এই প্রথম অভিযান, তাই না?"

'হ্যাঁ। এবং বিচিত্র অভিযান।"

"এই যে পথ ধরে যাচ্ছিস, এই পথ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে জানিস?"

"না।"

রাঙাবাবু হেসে বলল, "শেষ হয়েছে একথা অবশ্য বলা ঠিক নয়। তার কারণ পথের কখনও শেষ হয় না। এই পথটা দুমকা হয়ে সিউড়ি, ভাগলপুর এইসব দিকে বেঁকে গেছে। সে পথের দৃশ্য আরও সুন্দর। বিশেষ করে ভাগলপুরের কাছে মান্দার হিল আছে মন্দার পর্বত। অত্যন্ত ভালো জায়গা।"

আমি বললাম, "তোমার সব কথা আমি বাবাকে বলেছি জানো তো রাঙাদা।" রাঙাবাবুকে এখন আমার খুব আপনার জন মনে হচ্ছে বলেই একেবারে আপনি থেকে তুমিতে চলে এলাম।

"আমার সব কথা তুই কী করে জানলি?"

"কেন? ফাগু বলেছে।"

"ফাগু বলেছে? ফাগুটার পেটে দেখছি একদম কথা থাকে না।"

আমি বললাম, "না। ফাগুর সম্বন্ধে তুমি কোনওরকম ভুল ধারণা কোরো না। ওর মতো ভালোমানুষ সত্যিই হয় না। ও সব কথা বলেছে আমার রুমিদিকে। রুমিদি খুব চাপা মেয়ে।"

"কিন্তু তুই তো পেট আলগা। তোর বাবাকে মাকে সবাইকে বলে দিয়েছিস।"

"দেবই তো। সাধুবাবা মহেন্দ্রজীকেও বলেছি। এইসব লোককে না জানালে তোমাকে আমরা বাঁচাব কী করে? তোমার আর কোনও ভয় নেই। তুমি যে খুন করোনি সেটাই আমরা সবাই মিলে প্রমাণ করে দেবো।"

"কিন্তু আমার নামে যে ওয়ারেন্ট বেরিয়ে গেছে।"

"সেটা তো সন্দেহের বশে। তাছাড়া ওই পুলিশ অফিসার যেদিন খুন হল তুমি তো সেদিন আমাদের এখানে। রুমিদিকে আমাকে পৌঁছে দেবে বলে দেওঘরে এসে আমাদের এখানে ছিলে। আমরা তোমার হয়ে এই কথাই বলব। আমার বাবা, মহেন্দ্রজী সবাই একই কথা বলবেন।"

রাঙাবাবু উল্লসিত হয়ে বলল, "সত্যি! সত্যি বলছিস তুই?"

"সত্যি না তো কি মিথ্যে?"

"তা যদি হয়, তাহলে কিন্তু আমি বেঁচে যাব। ওই বিশেষ একজনের অভিযোগ ধোপে টিকবে না।"

"সাধুবাবা মহেন্দ্রজী, আমার বাবা, এঁদের স্টেটমেন্টও কিন্তু খুব একটা সাধারণ নয়। এঁরা দু'কলম লিখে দিলে কারও কোনও অভিযোগই ধোপে টিকবে না। মহেন্দ্রজী তো থানায় গেছেন কেউটে গোখরো আর নেলোর ব্যাপারে সব কিছু লিখে জানাতে। অমনি তোমার আমার রুমিদির ব্যাপারেও জানিয়ে আসবেন। সেইরকমই কথা হয়েছে।"

"আমার ব্যাপারে কী লিখবেন উনি? কিছুই তো জানেন না।"

"লিখে আসবেন এই কথা যে আমাদের দুজনকে নিয়ে একমাস আগে তুমি এখানে এসেছিলে। তারপর দুষ্টচক্রের হাতে পড়ে আমরা তিনজনেই গুম হই। ভবনাথবাবুর পাতালঘর থেকে সাধুবাবা তোমাকে উদ্ধার করেন, এইসব।"

"কী সব ভুলভাল বকছিস বল দেখি?"

"গাড়িতে বাবার সঙ্গে সাধুবাবার যা আলোচনা হয়েছে তাই শুনেই বললাম।"

রাঙাবাবু সব শুনে বলল, "এ যদি হয়, তাহলে ওঁদের ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না।"

"যদি নয়, এটাই হবে বা হতে চলেছে। তুমি তো খুনী নও। তোমার জীবনে যেটা ঘটে গেছে সেটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। কাজেই তুমি নির্ভয়ে মাথা উঁচিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াও। সেইসঙ্গে আমার একটা মিনতি যদি রাখো—।"

"কী মিনতি তোর?"

"আমার রুমিদিকে তুমি তো দেখেছ? ওরা খুব গরিব। তুমি কি আমার রুমিদিকে বিয়ে করতে পারো না রাঙাদা?"

রাঙাবাবু হেসে বলল, "তুই আবার ঘটকালিও শুরু করে দিলি?"

"হ্যাঁ দিলাম। আমি রুমিদির ভালো চাই বলেই এই কথা বলছি।"

রাঙাবাবু বলল, "এটা তো তোর আবদার। কিন্তু তোর ওই রুমিদি যদি আমাকে পছন্দ না করেন? কত ভাল দেখতে তোর ওই রুমিদিকে। আমার মতো একটা খুনের আসামীর গলায় উনি মালা দেবেন কেন?"

"তোমার মতো বর পেলে রুমিদি না করবে এমন বোকা মেয়ে রুমিদি নয়। তাছাড় এত কথার পর এখনও তুমি নিজেকে খুনের আসামী কেন ভাবছ রাঙাদা?"

"কী জানি রে, আমার যেন সবসময়ই নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।"

"এরকম হওয়ার কারণ?"

"আসলে ভয় পেতে পেতেই আমি এইরকম হয়ে গেছি। বাড়ির জন্য আমার ক মন কেমন করে। মাকে কতদিন দেখিনি, দেখতে ইচ্ছে করে। সঙ্গে যা টাকা পয়সা ছি তাও কমে আসছে বলে খাওয়া দাওযার ব্যাপারেও হিসেব করে চলতে হচ্ছে। যা কখন করিনি।"

"আর তোমার কোনোও ভয় নেই রাঙাদা। এখন থেকে আমরা সবাই তোমার পা আছি। তাছাড়া তুমি যখন চোর নও, তুমি যখন ডাকাত নও, তুমি যখন খুনী নও, তখ কেন তুমি ভয পাবে? মাথা উঁচিয়ে বুক ফুলিয়ে চলো তুমি, দেখবে সব বিপদ দূর হ যাবে। আর মনে মনে আদ্যামাকে শরণ করো, উনিই তোমাকে রক্ষা করবেন।"

"আদ্যামা কে?"

"বাঃ রে, আদ্যামা হলেন আদ্যাপীঠের মা। বাবা মা'র সঙ্গে আমি একবার আদ্যাপী গিযেছিলাম। তবে এইখানকার দিদার বাড়ি, ছবিতে আদ্যামাকে দেখার পর আমার মন যেন কিরকম হয়ে গেল। আমি যখন ঘোর বিপদে পড়লাম তখন ওই মাকে ডেকেই বিপ থেকে উদ্ধার হলাম। তুমিও যদি ডাকো—।"

"ডাকব। আমিও ডাকব আদ্যামা'কে। তবে এখন নয়। এখন আমাদের প্রধান কা হল পাহাড় জঙ্গল তোলপাড় করে তোর ওই দিদিটিকে উদ্ধার করা। ত্রিকূট পাহাড় এ গেছে, আর একটুও দেরি নয়। কড়া নজর রেখে যা চারদিকে।"

আমাদের মোটরবাইক থামতেই চার পাঁচজন কনস্টেবল ছুটে এল আমাদের দিকে তারপর আমাকে দেখেই পিছিয়ে গেল।

রাঙাবাবু আর আমি রাতের অন্ধকারে গভীর জঙ্গলে ভরা সেই শ্বাপদসংকুল ত্রিকূ পাহাড়ের সংকীর্ণ পথ ধরে টর্চের আলোয় চারদিকে নজর রাখতে রাখতে পাহাড়ে ওঠা শু করলাম।

কয়েক ধাপ ওঠার পরই একটি গুহার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ওই গুহায় কয়েকজ সাধু সন্ন্যাসীর বাস ছিল। তাঁরা ধুনি জ্বেলে তারই আগুনের তাতে নিজেদের শীতের কষ্ট দূ করবার চেষ্টা করছিলেন। ওই পাহাড় জঙ্গলের দেশে তখন হাড়কাঁপানো মাঘের শীত। আ সেই শীতের দাপটকে উপেক্ষা করেও চারদিক থেকে যেন ছাপিয়ে উঠছে নিশাচ পশুপক্ষীদের ডাক। সমস্ত জায়গাটাই তখন যেন কিরকম ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

রাঙাবাবু গিয়ে মূল সন্ন্যাসীকে প্রণাম করতেই তিনি সস্নেহে তাঁর পাশে আসন গ্র করতে বললেন রাঙাবাবুকে।

রাঙাবাবু তাঁর পায়ের কাছটিতে বসতেই সন্ন্যাসী বললেন, 'ইত্‌নি রাত মে অচানক কাঁহা সে আ গয়ে তুম?''

রাঙাবাবু তখন সব বলল সন্ন্যাসীকে।

সন্ন্যাসী গম্ভীর হয়ে বললেন, ''লেকিন যাওগে ক্যায়সে?''

''যেতেই হবে বাবাজী।''

সন্ন্যাসীর একজন চ্যালা বলল, ''অন্য কিছু তো নয়, এই ত্রিকূট পাহাড়ে দিনের বেলাতেই জঙ্গল ভেদ করে যাওয়া যায় না। আমাদের এই আশ্রমও নিরাপদ নয়। ভালুক আর চিতার উপদ্রবে তটস্থ আমরা।''

রাঙাবাবু বলল, ''সে তো জানি। কিন্তু যেতেই হবে। আমাদের কিছু লোকজন আসছে তৈরি হয়ে। তারা এলেই রওনা দেব। আপনারা একটু সতর্ক থাকবেন। পুলিশ নজর রাখছে বড় রাস্তায়। দেওঘর থেকে ফোর্স এলে ওরাও যাবে হয়তো।''

গুহার ভেতরে রাঙাবাবুর সঙ্গে এইসব কথাবার্তা যখন হচ্ছিল তখন হঠাৎই দুজন আশ্রমিককে সেখান থেকে উঠে যেতে দেখলাম। তাদের একজন করল কি সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ উঠে দূরের দিকে একটু টর্চের আলো ফেলে ইশারা করতেই পর পর দুটি আলোর সংকেত দেখা গেল। ব্যাপারটা খুব সন্দেহজনক। আমি অন্ধকারের আড়ালে থেকে লক্ষ্য করতে লাগলাম ওদের। একটু পরেই একজন বন্দুকধারী ও দুজন লণ্ঠনধারী জঙ্গলের দিক থেকে এগিয়ে এল ওদের দিকে। তারপর চাপা গলায় ফিসফিস করে কী সব বলে বিদায় নিতেই সাহসে ভর করে ওদের পিছু নিলাম আমি।

বাঘের ভয়, ভালুকের ভয় সব কিছুকে করে জয়, ওদের অনুসরণ করতে লাগলাম আমি। কেন জানিনা আমার মন বার বার বলতে লাগল রুমিদিকে এরাই বন্দি করে রেখেছে। ওই আশ্রমিকরা এদের স্পাই।

যাচ্ছি তো যাচ্ছি, পথ আর ফুরোয় না।

হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা। তারপর ওদেরই ভেতর থেকে একজন সিটি দিলে দীর্ঘদেহ এক বলবান পুরুষ কাঠুরিয়াদের তৈরি একটি ঝোপড়ি ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, ''ওদিকের গোলমাল কতদূর?''

''পালাবার কোনও পথ নেই। তাছাড়া অনেকদিন পর রাঙাবাবুর পায়ের ধুলো পড়েছে বাবাজী মহারাজের কাছে।''

''বলিস কী?''

''সেও এসেছে ওই মেয়েটারই খোঁজে। ওর দলবল নিয়ে একটু পরেই রওনা হবে রাবণগুহার দিকে।''

''আমি জানতাম। সেই জন্যেই তো রাবণগুহা ছেড়ে এইখানে এসে নিশ্চিন্তে আছি।''

''তাতে কি বিপদ কমবে? কাল সকালে কী করবে তুমি? কোথা দিয়ে কীভাবে পালাবে? কাল দিনের আলোয় পুলিশ তো হন্যে হয়ে খুঁজবে তোমাকে। তাই বলি কি এখনও সময় আছে। মেয়েটাকে মুক্তি দাও।''

''তা হয় না। এতদূর এগিয়ে আর পিছনো যায় না।

''কিন্তু শিয়রে শমন তোমার।''

''আমি কখনও পিছু হটতে শিখিনি বীরভদ্র।''

"বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে চলতেও তো শেখোনি।"

আর একজন বলল, "মেয়েটাকে আমাদের হাতে তুলে দাও কুমার। ওকে আমরা বাবাজীর আশ্রমে রেখে আসি। সেই সুযোগে তুমি পালাও। তোমার সঙ্গীরা সবাই ধরা পড়ে গেছে।"

"আমি তো পড়িনি।"

"এইবারে পড়বে এবং বামাল সমেত।"

কুমার কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "এই রাত-দুপুরে কিছু করে কাজ নেই। কাল ভোরে পাহাড়ের পেছনদিক দিয়ে নেমে যাব। কেউ টের পাবে না।"

"কিন্তু ওই মেয়ে নিয়ে পাহাড় থেকে সমতলে নামলেই তো ধরা পড়বে তুমি।"

"অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব। তোরা ততক্ষণ আগন্তুকদের গতিবিধির ওপর নজর রাখ। বেগতিক দেখলেই গুলি করবি।"

"তবু তুমি মেয়েটাকে ছাড়বে না?"

"না। ওরকম সুন্দরী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। মেয়েটির মুখশ্রী দেখেছিস? যেন রাজকুমারী।"

"কিন্তু তোমাকে তো বাঁদরের মতো দেখতে! রাজকুমারী নিয়ে তুমি করবেটা কী? তোমাকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন চিড়িয়াখানার খাঁচার দরজাটা খোলা পেয়ে সবেমাত্র বেরিয়ে এসেছ।"

কুমার চিৎকার করে উঠল, "তবে রে শয়তানের বাচ্চা, এতবড় কথাটা আমার মুখের উপর বলতে পারলি?"

"যা সত্যি তাই বলেছি। আয়নায় নিজের মুখটা দেখেছ কখনও? একটা চামসে শকুনে আর তোমাতে কোনও তফাত আছে কী?"

বীরভদ্রর কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুমারের পিস্তল গর্জন করে উঠল। 'ডিস্যুম'।

বীরভদ্র লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়।

আর সেই মুহূর্তে আমি একটি পাথর কুড়িয়ে ছুড়ে মারলাম কুমারের মুখে। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। ছুঁচলো পাথরটা কয়েকপাটি দাঁত ভেঙে একেবারে ঢুকে গেল ওর মুখগহ্বরে।

বিপদ বুঝে ওদের সঙ্গীরা যে যেখানে ছিল সবাই হাওয়া।

গুলিবিদ্ধ বীরভদ্র সেই অবস্থাতেই কুমারের দিকে ওর বন্দুকের নিশানা করে ট্রিগারটা টিপে দিল সুদক্ষ হাতে।

একটা শুধু আর্তনাদ।

পরক্ষণেই চারদিক থেকে হই হই শব্দ।

মশালের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক।

হঠাৎ একটা ডাক আমার কানে এল, "সৌরভ—সৌরভ!"

এ তো রাঙাবাবুর গলা।

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর দিলাম, "রাঙাদা! ফাগু! আমি এখানে-এ-এ-এ।"

ওরা সবাই ছুটে এল।

রাঙাবাবু এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুই এখানে কী করে এলি? তোকে

ওবা নিশ্চয়ই তুলে এনেছে এখানে?"

"না। আমি স্বেচ্ছায় এসেছি। ওদের অনুসরণ করে। তোমাকে বলে আসবারও সময় পাইনি।"

"তোর সেই দিদিটি কোথায়?"

ফাগুও তখন ছুটে এসেছে, "কোথায় আমার দিদিমণি? তাকে দেখেছ তুমি?"

আমি কাঠুরিয়াদের সেই ঘরখানির দিকে এগিয়ে যেতে বললাম সকলকে।

ওরা ছুটে গিয়ে ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই দেখতে পেল রুমিদিকে। হাত পা মুখ বাঁধা রুমিদি তখন অসহায়ভাবে কেঁদেই চলেছে। আহা, কী কষ্ট রুমিদির।

ফাগু আর রাঙাবাবু রুমিদিকে মুক্তি দিতে সে কী আনন্দ তার। বলল, "তোমরা কী করে জানলে আমি এখানে আছি?"

আমি বললাম, "পরে সব শুনবে। এখন তো চল।"

রাঙাবাবু রুমিদির সঙ্গে বেশী কথা বলতে সাহস করল না।

রুমিদি রাঙাবাবুর সেই সৌজন্য অনুভব করে সত্যিকারেব বান্ধবীর মতো বলল, "আমাকে কিন্তু একটু ধরে নিয়ে যেতে হবে। আমি খুবই দুর্বল। অকথ্য অত্যাচার হয়েছে আমার ওপর। প্রচণ্ড মারধোর করেছে। এমন কি কিছু খেতে পর্যন্ত দেয়নি?"

রাঙাবাবু বলল, "সেকি! খেতে দেয়নি?"

"না।"

"এমন তো দেখা যায় না।"

ফাগু বলল, "কী আর বলব রাঙাবাবু! এরা কি মানুষ? আদমি থেকে জানোয়ার বনে গেছে সব।"

অনেক পরে যখন আমরা দলবদ্ধ হয়ে সেই গুহার কাছে সাধুর আশ্রমে ফিরে এলাম তখন অনেক রাত। সাধুবাবার নির্দেশে অত রাতেও আমরা গরম গরম খিচুড়ি প্রসাদ পেয়ে গেলাম।

ইতিমধ্যে গুলির শব্দ শুনে ছুটে এসেছিল কনস্টেবলরা। বীরভদ্র ও কুমারের গুলি বিনিময়ের কথাটাও শুনিয়ে দিলাম ওদের। ওরাও সেই রাতে দৌড়ঝাঁপ না করে আমাদের সঙ্গে পাতা পেড়ে খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে সকালের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

এরপর গল্প করতে করতেই কেটে গেল বাকি রাতটুকু।

ভোরের আলো ফুটে উঠলে একখানি পুলিশের গাড়ি এসে থামল। আমরা পুলিশকে সব কথা বলতেই ওরা ছুটল ডেডবডি দুটোর খোঁজে। এখন পুলিশের কাজ পুলিশ করুক। আমরা ঘরের দিকে রওনা হই।

পাহাড়ের কাছাকাছি এক জায়গায় রহমতের ঘোড়ার গাড়িটা রাখা ছিল। ফাগুরা ওই গাড়িতেই এসেছে।

ফাগু এসে হাঁকডাক করতেই রহমত তার ঘোড়াটা একজনদের আশ্রয় থেকে নিয়ে এসে গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দিল।

রুমিদি ফাগু আমি ও অন্যান্যরা ঘোড়ার গাড়িতে চাপলাম আর রাঙাবাবু তার মোটরবাইকটা নিয়ে সবার আগে চলল।

গোড়ার গাড়ির ভেতর থেকেই রুমিদি হাত নেড়ে বলল, "সাবধানে যাবেন কিন্তু।"

রাঙাবাবু হেসে বলল, "আমার জন্য চিন্তা কোর না।"

রাঙাবাবু এগিয়ে গেলে আমি চুপি চুপি গলায় রুমিদিকে বলললাম, "জানো তো রুমিদি। খুব শিগগির রাঙাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে।"

রুমিদি মৃদু ধমক দিয়ে বলল, "এই কদিনে তুই বড্ড ফাজিল হয়েছিস।"

"সত্যি বলছি। রাঙাদার আপত্তি নেই। তবে তুমি যেন গোঁয়ার্তুমি করে না করে দিও না।"

"আবাব।"

"আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?"

"ও কত বড়লোকের ছেলে। আর আমি?"

"তুমি আমার রুমিদি। রাঙাবাবুর রাঙা বউ।"

অনেক পর একসময় আমরা কুণ্ডাতে পৌঁছলাম।

তখন খুব ভালোভাবে সকাল হয়ে গেছে।

বাড়ির সামনে দু' দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে। ব্যাপার কী? কারা এল?

এ প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই পেলাম।

আনন্দের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে সবার আগে ছুটে এল গীতা। এসেই বলল, "এই সৌরভ! দেখবে এসো কে এসেছে?"

"কে? কে এসেছে?"

"আমার বাবা মা ভাই, সবাই।"

আমরা ভেতরে গিয়ে দেখলাম শুধু কি তাই? আমাব বাবা ফোনে খবর দিয়ে সবাইকে ডাকিয়ে এনেছেন। গীতার বাবা মা ছাড়াও এসেছেন রাঙাবাবুর মা বাবা। এতদিন বাদে ছেলেকে ফিরে পেয়ে সে কী আনন্দ ওঁদের।

রুমিদি সবাইকে প্রণাম করলে আমার মনও আনন্দে ভরে গেল। ওঃ। সে কী মধুব মিলন।

আমাদের সেই আনন্দ আরও নন্দিত হয়ে উঠল ফাগুর উল্লাসে। ফাগু তো দুহাত তুলে লাফাতে লাগল। লাফানোর কারণও আছে। কেননা ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটি গাড়িতে করে যাঁরা এলেন তাঁদের আসাটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। দাদু দিদা এবং দিদার মা।

উনি তাহলে বেঁচে আছেন? দেহান্ত হয়নি ওঁর?

ফাগু তো একাই জাপটে ধরে চ্যাংদোলা করে নামাল বুড়িকে।

আমার মা আর রুমিদি বিছানা ঠিক করে দিলে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে ফিক করে হাসতে লাগল বুড়ি। হাসতে হাসতে বলল, "কোথায়? আমার দাদুভাই কই? কোন্‌টি আমার দাদুভাই?"

আমি কাছে এগিয়ে গেলে বুড়ি আমাব মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ কবলেন।

দিদা বললেন, "মাকে যে এ যাত্রা ফিরে পাব তা আমরা ভাবিইনি।"

বুড়ি বলল, "নাঃ। ভাবলাম কাশী আব বৈদ্যনাথ কী আলাদা? সবই এক। ওইভাবে বিদেশ বিভুঁয়ে বেঘোরে মরার চেয়ে ঘরে এসেই মরণ ভাল, তাই চলে এলাম।"

আমরা সবাই একজোটে বললাম, "বেশ করেছেন।"

এরপর পরিচয় পর্বের পালা।

রাঙাবাবুরা অনুরূপবাবুদের পরিচিত। অপবিচিত শুধু আমাব বাবা মা আর গীতারা।

মুখ হাত ধুয়ে চা খেতে খেতে সব শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন ওনারা। বললেন, "যাঃ বাবা। এই কদিনের মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেল?" তারপব বললেন, "রুমির বাবা মাকে তাহলে খবর দিতে হয়। কেননা শুভকাজে আর তো দেরি করা উচিত নয়।"

মহেন্দ্রজী বললেন, "আমি এখনই পাঁজিপুথি দেখে দিনক্ষণ ঠিক করছি। ওদের কাজটা কিন্তু আমিই সম্পন্ন করব।"

রাঙাবাবুর মা রুমিদিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "এমনটি যে হবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ছেলের খোঁজে এসে সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মীকেও যে বরণ করে ঘরে তুলব এ দেবতার আশীর্বাদ ছাড়া কিছু নয়।" তারপর আমার বাবার মুখেব দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন, "কিন্তু ওই ব্যাপারটার কী হবে?"

আমার বাবা, মহেন্দ্রজী, অনুরূপবাবু সবাই একবাক্যে বলে উঠলেন, "ওটা আমাদের হাতেই ছেড়ে দিন।"

সে কী আনন্দ সকলের। আনন্দে চোখে জল এসে গেল। গীতা ওর ভাই মনু আর আমি আরও আনন্দে একেবারে ছাদে উঠে গেলাম। চারদিকের পাহাড় ও প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম আমরা। মাথার ওপরে যে আকাশ সেই আকাশটাকে এত বেশি নীল এর আগে আর কখনও মনে হয়নি। যেমন মনে হযনি একটি আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে এক সূত্রে গাঁথা মালার মতো এতগুলো মানুষ আমরা এমনভাবে এক হয়ে যাব বলে।

—ঃঃ—

কালপুরুষের আবির্ভাব

প্রথম পর্ব

এক

বহারের সিংভূম জেলার রাকা মাইনস থেকে একটি জিপে আমরা চারজন জঙ্গলের পথে [রে বেড়াচ্ছিলাম। জিপের চালক ছিলেন মাইনস এর সুপারভাইজার অর্বুদ সিং অরোরা। মামি তাঁর পাশেই বসেছিলাম। আর পিছন দিকের সিটে বসেছিলেন অন্ধ্রের মিঃ জি. ডি. াসেনু এবং গুজরাটের ওয়াই. ভি. মেহতাজী। এঁরা দুজনেই সুপ্রসিদ্ধ ভূবিজ্ঞানী। এঁদের াণ্ডিত্যের যেমন তুলনা নেই, গবেষণারও তেমনি শেষ নেই। অরোরা আমার বন্ধু। তারই সৌজন্যে ওঁদের সঙ্গে আমার পরিচয়। ওদের বিজ্ঞান গবেষণার কাজে রাকা মাইনস-এর পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

মিঃ মাসেনু এবং মেহতাজী নানারকম যন্ত্রপাতি বার করে কত কি যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন তার ঠিক নেই। অরোরা এবং আমি ঘুরে ফিরে শুধু প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগলাম। সিংভূম জেলার পাহাড় জঙ্গলের একটা আকর্ষণ আছে। এর রূপ রস গন্ধ মনকে ভরিয়ে দেয়। এর প্রাকৃতিক সম্পদও বড় কম নয়। এক জায়গায় জিপ রেখে আমরা ঘুরছি। এমন সময় হঠাৎ একটা আশ্চর্য জিনিস দেখে থমকে দাঁড়ালাম চারজনেই।

সেদিনটা ছিল কনকনে শীতের দিন। ডিসেম্বরের দশ তারিখ। ১৯৭২ সাল।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন। আমরা পাহাড় জঙ্গলে ঘুরে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তখনই সেই বিস্ময়কর এবং ভয়াবহ ব্যাপারটা আমাদের চোখে পড়ল। মেহতাজী আতঙ্কে নীল হয়ে বললেন—"লুকস দ্যাট।"

আমরা সভয়ে তাকিয়ে দেখলাম পাহাড় জঙ্গলের অন্ধকার পটভূমিকায় একটি বড় বড় পাথরের ওপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে এক দীর্ঘ পুরুষ। পৃথিবীর ইতিহাসে এই রকম বৃহত্তম মানবের অস্তিত্বের কোনও নিদর্শন আছে কিনা জানি না। তাই ভয়ে বিস্ময়ে আমরা শিউরে উঠলাম। তাকে মানুষ দানব প্রেত কী যে বলব তা ভেবে পেলাম না। শকুনির মতো পলকহীন চোখে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়েই আছে না তো, যেন চোখ দিয়ে লেহন করছে। তার দৃষ্টিশক্তিতেই আমাদের বুকের সবটুকু রক্ত যেন শুষে নিচ্ছে সে।

মিঃ মাসেনু চাপা গলায় বললেন—"ওয়াকা সেকেন্ড কোড়া এক্কাড়া ওগুটানকি বিলকাদু।" অর্থাৎ আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা উচিত নয়।

আমরা কী করব ভেবে না পেয়ে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

মাসেনু আবার বললেন—"তন্দারগা পারপওলে লেকুনটে প্রাণহানি জরুগুতাদি" (নাহলে যে কোনও সময়ে প্রাণহানি ঘটে যেতে পারে এখানে)।

মেহতাজী অত্যন্ত সাহসী লোক। এখন দেখলাম তিনিও ঘাবড়ে গেছেন। বললেন, "এই জঙ্গল সম্বন্ধে কিছুদিন আগে আমি অনেক রকম কথাবার্তা শুনেছিলাম। এখানে নাকি ভূত আছে। এখানকার পাহাড় জঙ্গলে অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটে থাকে। আজ স্বচক্ষে

তা দেখলাম। এটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। কেননা মানুষ কখনও এত দীর্ঘ হয় না।''

অরোরার হাতে তখন আসন্ন বিপদের মোকাবিলা করবার জন্য তার গুপ্তস্থান থেকে ঝকঝকে দোনলাটা সতর্ক হয়ে উঠেছে। গুলি ভর্তি পিস্তলটার সেফটি ক্যাচ অন করা। শুধু ট্রিগার টেপার অপেক্ষায় হাঁ করে আছে সেটা।

মিঃ মাসেনু এবং মেহতার হাতেও সাইলেন্সার লাগানো ৩৫৭ ম্যাগনাম রিভলবার

একমাত্র আমিই নিরস্ত্র। রিভলবার পিস্তল কেন একগাছা লাঠিও আমার হাতে নেই একটা বুনো শুয়োরেও আমাকে তাড়া করলে আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারব না।

কেননা আমি এই জঙ্গলের ভয়াবহতা সম্পর্কে একদম অবহিত ছিলাম না। স্রেফ দু'একদিনের অলস সময় কাটাতে রাকা মাইনস-এ অরোরা কোয়ার্টারে এসেছিলাম জঙ্গলের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে বা অপ্রত্যাশিত কোনও বিপদের মোকাবিলা করতে এখানে আসিনি। এখানে আসার পর মিঃ মাসেনু এবং মেহতাজীর আমন্ত্রণে তাঁদেরকে সঙ্গ দিতে গিয়েই এই জঙ্গল ভ্রমণে মেতে উঠেছি। আমরা কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে এবং ভয়ে ভয়ে সেই দানবাকৃতি মানবের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

অরোরা ওর ভাষায় যা বলল তা হল ওদিক থেকে কোনও আক্রমণ না এলে আমরা গুলি চালাব না।

মাসেনু বললেন, ''মি এস্‌টামে। আমিও এ বিষয়ে একমত।''

আমি বললাম, ''সেটা করাই ঠিক। ওইরকম অমানুষিক চেহারা এবং নিঃসন্দেহে সেইরকম শক্তি নিয়েও ও যখন আমাদের কিছু বলছে না তখন ওকে অযথা ঘাঁটানো আমাদের কোনও মতেই উচিত হবে না। কেননা গুলির শব্দে বা আঘাতে ও যদি সুপ্ত ভিসুভিয়াসের মতো জেগে ওঠে তখন আমরা এই চারজনে কেন একশোজনেও ওকে সামলাতে পারব না।''

আমরা চারজনে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে এইসব আলোচনা করতে লাগলাম বটে, কিন্তু আশ্চর্য! সেই ভয়ঙ্কর কিন্তু আমাদের চারটি প্রাণীকে তার ভ্রূক্ষেপেও আনল না। ভাবটা এই যে আমাদের সাধ্য কি ওর কিছু করি। এমনকি আমাদের আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কেও ওর বিন্দুমাত্র ভয় বা চিন্তা ভাবনা নেই। এটা যে ওর কোনও ক্ষতি করতে পারে এ রকম ধারণাও যেন করতে পারছে না ও। সে ঠিক আগের মতই একইভাবে তার পলকহীন চোখে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। তার বিশাল শরীর; হাত, পা, প্রকাণ্ড মাথা আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করল।

আমরা যখন বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারছি না বলে নড়াচড়া না করে দাঁড়িয়ে আছি তেমন সময় হঠাৎ দুটো জোরালো আলোর ছটা তার মুখের ওপর পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই নরদানব অত্যন্ত বিরক্ত এবং বিব্রত বোধ করল নিজেকে। এতক্ষণে সে উঠে দাঁড়াল এবং গাছপালার ডাল পাতা সরাতে সরাতে হারিয়ে গেল গভীর বনের অন্তরালে।

আমরা সচকিত হয়ে পিছন ফিরে সেই আলোর উৎসমুখে তাকালাম।

এ তো আমাদেরই জিপের আলো। আমরা চারজনেই এখানে। তাহলে এ আলো জ্বালল কে?

আমরা ছুটে গেলাম জিপের কাছে।

অরোরা স্যুইচ টিপে আলো নেভাল।

আমাদের হাতে কোনও টর্চ নেই। জ্যোৎস্নাপক্ষ। তবুও গাছপালায় একটা অন্ধকার আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর কারও অস্তিত্ব আমরা অনুভব করতে পারলাম না। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার যেটা তা হল জিপের মুখটা অন্যদিকে ঘোরানো ছিল। এবং সেটা ছিল আমাদের কাছ থেকে অনেকটা তফাতে। আমাদের অজান্তে নিঃশব্দে জিপটাকে এখানে টেনেই বা আনল কে?

অরোরা কঠিন গলায় বলল, "কে এই জিপটাকে এখানে টেনে আনল? কে জ্বেলেছে আলো? সামনে আ যাও ভাই। কৌন আয়া থা হিঁয়াপর?" প্রত্যুত্তরে সেই পাহাড় ও বনভূমি কাঁপিয়ে এক ভয়ঙ্কর পৈশাচিক হাসি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। সন্ধ্যা রাতের সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে পাখিরা কলরব করে চক্রাকারে ঘুরপাক খেতে লাগল আকাশে। আমরা একটুও সময় নষ্ট না করে দ্রুত পালিয়ে এলাম।

দুই

সেরাতে ঘুম এল না আমাদের কারও চোখে। আমরা প্রত্যেকে এই ব্যাপারটা নিয়ে জোর আলোচনায় মেতে উঠলাম। রীতিমতো সজ্ঞানে এবং সুস্থ শরীরে আজ আমরা যা দেখে এলাম তা কী বলে আমরা ধারণা করব!

সাধারণ মানুষ এটিকে ভৌতিক আখ্যা দেবে। কেননা ভূতুড়ে ব্যাপার ছাড়া এরকম

ঘটনা কী করে ঘটা সম্ভব? কিন্তু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মিঃ মাসেনু এবং মেহতাজীর বিজ্ঞা- ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। অথচ এটা রূপকথারও যুগ নয় যে এটাকে দৈত্য দানে বলে কল্পনা করে নেব। তাহলে কী মনে করব এটাকে? ওই বিশাল শরীর পলকহীন চোখ জিপের আলো জ্বলা। জিপটাকে নিঃশব্দে আরও ওপরে আমাদের কাছাকাছি টেনে আন এসব তো স্বপ্ন বলেও ভাবতে পারি না।

এই পাহাড় ও বনভূমি নিতান্তই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। কোল ভিল সাঁওতা- এবং হো-দের আধিক্য বেশি। 'হো'রা এখন এখানে প্রবল পরাক্রান্ত। এই আদিবাসি উপজাতি ১৮২০ থেকে ১৮২৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কে কাঁপিয়ে তুলেছিল ব্রিটিশকে। অথচ এরা এখনও আদিম সংস্কার মুক্ত নয়। এই স- আবির্ভাবকে এরা যথেষ্ট মান্য গণ্য করে এবং ভয় পায়। ওরা স্থিরভাবে বিশ্বাস করে ে এখানকার বনে পাহাড়ে অপদেবতারা বাস করে। এই সব অপদেবতারা বিভিন্ন সমে বিভিন্ন রূপে দেখা দেন। কাজেই অবিশ্বাস্য হলেও এই সমস্ত এলাকা সম্বন্ধে এইরক- অনেক গল্পই আমাদের শোনা ছিল। কিন্তু সেগুলো আমরা নিছক উপকথা বলেই ধ্যে নিয়েছিলাম। এবং বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে উড়িয়েও দিয়েছিলাম। কিন্তু আজকের এই ঘট- আমাদের সমস্ত ধ্যান ধারণাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিল।

অরোরা বলল, "আমি এখানে প্রায় বছর তিনেক আছি। কিন্তু এইরকম ঘটনা চোে দেখা তো দূরের কথা কানেও শুনিনি কখনও। কতবার বনে পাহাড়ে জ্যোৎস্না রাতে ঘুরেছি পিকনিক করেছি। কিন্তু এই দৃশ্য এই প্রথম দেখলাম আমি।"

মেহতাজী বললেন, "এতো আমারও কল্পনার বাইরে। পৃথিবীতে যত রকমের বিস্ম আছে তার সবেরই কিছু না কিছু পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু এ যেন সব কিছুকেই ছাড়িে গেছে। হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায় তুষার মানবের গল্প শুনেছি। তাকে চোখে কেউ দেখেনি কি- তার পদচিহ্নর প্রমাণ আছে। তুষার মানবকে নিয়ে কাগজে কলমে অনেক লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু বিহারের সিংভূমে এইরকম নরদানব আছে তা কে জানত?"

আমি বললাম, "সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে ওইরকম বিশাল শরীর নিয়ে ও দানব বা মানব যাই বলুন না কেন, থাকে কোথায়? ওর উপযুক্ত ঘর তো একটা থাকা চাই কিংবা কোনও বড় গুহা। কিন্তু গুহাবাসী হলেও আর একটা প্রশ্ন জাগে, ওর দেহ অমলি- নয় কেন? পরনের পরিধেয় বস্ত্র ও কোথায় পেল? মাথায় ঝাঁকড়া চুল নেই কেন সভ্যতার স্পর্শ ও পেল কী করে? এবং এই প্রচণ্ড শীতেও ও দিব্যি খালি গায়ে কী কে বসেছিল?"

মিঃ মাসেনু বললেন, "দিনু সংগতি পুরতিকা তেলুসুকুনটেনেগানি? নেনু একড় নুনডি কাদালানো।" অর্থাৎ আমি কিন্তু এই রহস্যের শেষ না দেখে যাচ্ছি না।

আমারও তাই ইচ্ছা। এই রহস্যের শেষ দেখতেই হবে। এমন জানলে তো একা ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে যেতাম।

মাসেনু বললেন, "মিঃ দেগ্‌গড়া কেমেরা উনদণ্ডী?" আপনার ক্যামেরা আছে?

"আছে। তবে কলকাতায়।"

অরোরা বলল, "আমার আছে।"

মেহতাজী বললেন, "তাহলেই হবে। কেননা ওর সঙ্গে এই যে আমাদের শেষ দে-

তা তো নয়। বিশ্বের এই বৃহত্তম মানুষটির উচ্চতা খুব কম করেও বিশ ফুট। কাজেই আর একবার ধান্দা লাগিয়ে ওর দর্শন পেতেই হবে। তারপর আমাদের মুখের কথা কেউ বিশ্বাস না করলে ক্যামেরার ওই ছবিই সে কথা বিশ্বাস করিয়ে দেবে সকলকে।"

অরোরা বলল, "এই ঘটনাটা কাগজে বের হওয়া একান্ত দরকার। খবরটা ছবি সমেত কাগজে ছেপে বেরোলে বন জঙ্গল তোলপাড় করে খুঁজে বার কবা হবে ওকে।"

অরোরার কথা শেষ হতে আমি বললাম, "তবে ভাই আমার মনে হয় এই ব্যাপারটার আসল রহস্য কী তা জানতে গেলে আমাদের এই নিয়ে হৈ হল্লা করলে চলবে না। এই ঘটনার কথা আমাদের চারজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা ভাল। আমরা কাল সকালে দিনমানে বরং আর একবার ওই স্পটে গিয়ে হাজির হই চল। সঙ্গে সারাদিনের খাবারদাবার জলের জায়গা ইত্যাদিও থাকবে। আজ যেখানে ওই দৃশ্য আমরা দেখেছি কাল ঠিক ওইখানেই জিপটাকে রেখে আমরা ওর আশ্রয়স্থল খোঁজ করব। কাছে পিঠে নিশ্চয়ই কোন বড় গুহা টুহা থাকবে। যদি থাকে তাহলে আশা করছি ওই নরদানবকে সেইখানেই আমরা পেয়ে যাব।"

অরোরা বলল, "কিন্তু যদি সে আমাদের আক্রমণ করে?"

"মনে হয় করবে না। তাহলে আজই করত। কেননা আমার মনে হয় যে ভাবেই হোক সভ্যতার আলো সে পেয়েছে। তাছাড়া আমরা তো এবার তৈরি হয়েই যাচ্ছি। তুমি যদি আমাকে ক্যামেরা ছাড়া একটা পিস্তল দিয়েও সাহায্য কর তাহলে আমরা চারজনেই সশস্ত্র থাকব। রাইফেল শুটিং আমিও করেছি। কাজেই বুঝতে পারছ তো, লক্ষ্যভ্রষ্ট হব না। চল কাল সবাই গিয়ে দিনের আলোয় একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখি। সন্ধের ঝুঁকি নেব না।"

মাসেনু বললেন, "না না। দরকার হলে দিনরাত অনুসন্ধান চালাব। তাতে দু'তিন দিন ওই বনের ভেতরে আমাদের থাকতে হয় তাতেও আমি রাজি।"

অরোরা বলল, "তা কী করে সম্ভব। আমি তো অত সময় আপনাদের দিতে পাবব না।"

মেহতাজী বললেন, "ফর হোয়াই? তোমার চাকরির অসুবিধা হবে এই তো? তোমাব অসুবিধা হলে তুমি শুধু আমাদের পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। তার পরের ব্যাপারটা আমবা বুঝে নেব।"

অরোরা কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর বলল, "সে যা হয় একটা ব্যবস্থা হবে। কাল সকালেই, আমি বুধনকে ডাকছি। ও হচ্ছে এখানকার ভিলদের সর্দার। ওকে একবাব চুপি চুপি ডেকে জিজ্ঞেস করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে ওই রহস্যময় নরদানবের ব্যাপারটা কী।"

আমি বললাম, "জিজ্ঞেস করতে পারো, তবে লাভ কিছু হবে না।"

"কেন?"

"এসব শুনলেই ওরা শিউরে উঠবে। এবং ওই একটিই কথা বলবে 'বোঙা' (অপদেবতা)। ওদের ঘাঁটাস না বাবু। ওদের বিরক্ত করিস না। তাহলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে তাহলে।"

আমার কথা শুনে সবাই চুপ করে রইল।

আমি বললাম, "তার চেয়ে তুমি বরং ওই ভিল সর্দারকে ডেকে গাইড হিসেবে

আমাদের সঙ্গে নেবে। আসল কথাটা ওকে কিছুতেই বলবে না। আমরা কেন কী উদ্দেশ্যে জঙ্গলে যাচ্ছি তা ওকে জানাবার দরকার নেই। জানতে পারলেই বেঁকে দাঁড়াবে। তার চেয়ে ঘটনার আকস্মিকতায় সব কিছু সে জানুক। নাহলে ভয়ে হয় সে আমাদের সঙ্গে আসবে না নয়তো যদি অন্য কোনও রহস্যময় ব্যাপার কিছু থাকে তবে চুপি চুপি গিয়ে সতর্ক করে দেবে।''

মাসেনু বললেন, ''আমি বলি, ওই ভিল সর্দারকে জড়াবার দরকারটাই বা কী? যা করবার আমরাই করব। আমরা চারজন ছাড়া পাঁচজন না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। কার মনে কী আছে তা কে বলতে পারে?''

''ঠিক। তবে এখানকার পাহাড় জঙ্গলের পথঘাট-জানা একজন লোকের একান্তই দরকার। সে হিসেবে ভিল সর্দারের উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা হঠাৎ মারাত্মক রকমের কোনও বিপদে পড়লে পালাবার পথটাও তো ওর সাহায্যে সংক্ষেপ করতে পারব।''

অবশেষে আমরা সকলেই আলোচনার মাধ্যমে স্থির করলাম অরোবার নির্বাচিত ভিল সর্দারকে নিয়ে কাল সকালেই অরণ্য অভিযানে রহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে রওনা হব আমরা। আরোরা তিন দিনের ছুটি নেবে। কেননা ও সঙ্গে না থাকলে ভিল সর্দার কাজ করতে চাইবে না।

সে রাতে মুরগির মাংস আর হাতে গড়া রুটি খেয়ে আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চিত্তে শয্যা নিলাম। একই ঘরে শুলাম আমরা। শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। ছটফট করলাম। এক অস্থির উত্তেজনায় ঘুম এল না চোখে।

রাত তখন কত তা কে জানে। ঘড়ির দিকে নজর করিনি। তবে সে এক ভয়ঙ্কর রাত।

হঠাৎ বাইরে শুকনো পাতার মস মস শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠলাম। আমরা চারজনেই ভয়ার্ত।

এমন সময় জানলায় টক টক শব্দ। এসেছে—এসেছে। নিশ্চয় সেই নরদানবই এসেছে। নাহলে কার এত সাহস এত রাতে জানলায় টোকা দেয়? যদিও আমরা ঘরের ভেতরে আছি তবুও ভয় কমল না। কেননা ওর একটা লাথিই ঘরের দেওয়াল ধ্বসিয়ে দিতে পারে, জানলা দরজা ভেঙে ফেলতে পারে, সব কিছু পারে।

অরোরা পিস্তল হাতে ধীরে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। কনকনে শীতের রাত। তাই সব কিছু বন্ধ ছিল। জানলাটা খুলতেই সেটা সশব্দে দু'হাট হয়ে গেল। মনে হল কেউ যেন বাইরে সজোরে ধাক্কা দিয়ে খুলে দিলে জানলাটা।

আমরা সভয়ে খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে কোনও ভয়ঙ্কর কিছু দেখবার প্রত্যাশা করতে লাগলাম কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। তবুও আমরা নিশ্চিন্ত হবার জন্য টর্চ হাতে বাইরে না বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে চারদিক লক্ষ্য করতে লাগলাম। কেউ কোথাও নেই। যে ভয়ঙ্কর দানবের প্রত্যাশা করেছিলাম আমরা সে কেন, আর কারও কোনওরকম অস্তিত্বই ছিল না সেখানে। তবুও সেটি একটি ভয়ঙ্কর রাত। কেননা এর পর ছাদ থেকে নেমে যখন ঘরে এসে ঢুকলাম তখনই ঘটে গেল সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা। আমরা স্বচক্ষে দেখলাম জানলার লোহার গরাদটা আস্তে আস্তে বেঁকে যাচ্ছে।

মাসেনু চিৎকার করে উঠল, "ক্লোজ দি উইনডো। এ্যান্ড গো অ্যাওয়ে ফ্রম দা রুম।"

মাসেনুর বলা কথাটা শেষ হওয়া মাত্র এক পৈশাচিক হাসিতে ঘর ভরে গেল—হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

আমাদের হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাবে বুঝি। ততক্ষণে জানলার লোহার গরাদটা বেঁকিয়ে এমন করা হয়েছে যে অনায়াসে সেটার মধ্য দিয়ে একজন লোক বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকে আসতে পারে।

তিন

পরদিন সকালে এক নিদারুণ সংবাদ পেয়ে আমরা বিচলিত হয়ে পড়লাম। কাল শেষ রাতে বুধনকে কে বা কারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এবং সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হল হত্যাকারী এমনই একজন, যাকে সাধারণ খুনিদের পর্যায়ে ফেলা যায় না। আর এই রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা খবরের কাগজে ছাপা হলে লোকে এটাকে স্রেফ একটা গাঁজাখুরি ঘটনা বলেই মনে করবে।

গতরাতে ভিল সর্দার বুধন তার নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। ঘরের দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ। অথচ কী এক আশ্চর্য উপায়ে এক অজ্ঞাত আততায়ী বুধনকে খুন করে ওর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু রহস্যের ব্যাপার হল এই যে আততায়ী ঘরের ভেতরে ঢুকলই বা কি করে আর গেলই বা কোথা দিয়ে? ঢোকার ব্যাপারটা অবশ্য ধরে নেওয়া যেতে পারে আততায়ী হয়তো বুধন সর্দারের আগেই প্রবেশ করে লুকিয়ে ছিল ঘরের ভেতর। কিন্তু খুন করে চলে যাবার পরও ঘরের দরজায় ভেতর থেকে খিল ও ছিটকিনি দেওয়া থাকে কী করে?

খবর পেয়ে আমরা সবাই ছুটে গেলাম।

মাসেনু এবং মেহতাজী খুব ভালভাবে সব কিছু দেখা শোনার পর বললেন, "এই খুন কিন্তু সাধারণ হত্যাকারীর নয়। কোনও গবেষক ডাক্তার অথবা বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ছাড়া এইভাবে ছুরি চালিয়ে কোনও মানুষের অঙ্গচ্ছেদ করতে পারে না। অথচ কি কৌশলে বা কোন জাদুমন্ত্রবলে এই কাজটা হল তা ভেবে দেখার মতো। একটা অলৌকিক শক্তি অতি সন্তর্পণে এখানে তার কাজ করে যাচ্ছে। ওই অমানুষিক মানুষ, কাল রাতের ওই পৈশাচিক হাসি, জানলার লোহার রডকে বেঁকিয়ে দেওয়া যার ইচ্ছায় হয়েছে সেই একই শক্তি যে ভিল সর্দারকে খুন করে তার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কে সেই সর্বশক্তিমান?"

ভিলেরা কিন্তু ব্যাপারটাকে পুরোপুরি অপদেবতার কোপ বলে মেনে নিয়েছে। তাই এই অবস্থায় তাদের যা যা করণীয় তা করে দলবদ্ধ হয়ে সর্দারের মৃতদেহ নিয়ে দাহ করতে চলে গেল তারা।

বিষয়টি যদিও পুলিশের নজরে আনা উচিত ছিল তবুও আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই ব্যাপারটা চেপে দিলাম। কারণ এখানকার এই বনে পাহাড়ে একটা কিছু ভৌতিক আধিভৌতিক বা অন্য কোনও রহস্যের এমন একটা প্রকাশ ঘটতে চলেছে যা আমাদের বিস্ময়ের সীমারেখাকে অনেক দূর টেনে নিয়ে গেছে। আমরা এই রহস্যের জটিলতায় এখনই পুলিশের পদধ্বনি শুনতে চাইলাম না।

আমরা যথারীতি গোছগাছ করে গত রাত্রের পরিকল্পনা মতো বন রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য রওনা হলাম। না। কোনও জিপ বা অন্য কোনও যানবাহনের সাহায্য আমরা নিলাম না। কারণ গভীর বনের আনাচে কানাচে এবং পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো অংশগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখার জন্য আমাদের এই অভিযানে কোনও পরিবহনই কাজে লাগবে না। যেখানে কোনও পথ নেই হয়তো সেখান দিয়েই আমাদের পথ করে নিয়ে চলতে হবে। তাই আমবা অন্যভাবে তৈবি হয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করলাম।

অরোরা আমি মিঃ মাসেনু এবং মেহতাজী ছাড়া আমাদের সঙ্গে মাল বইবার জন্য 'হো' জাতির একটি কুলিও ছিল। তাকে নিয়ে আমরা পাঁচজনেই রওনা হলাম রহস্যাভি ।। কুলি ছাড়া আমরা চারজনেই সশস্ত্র। আমার হাতে অরোরার দেওয়া নিকন ক্যামেবা। আমাদেব এই অভিযানেব মূল উদ্দেশ্য গত সন্ধ্যার সেই নরদানবের খোঁজ করা। এবং তার দেখা পেলে তার সঙ্গে সম্ভব হলে সদ্‌ভাব জাগিয়ে রহস্যের আবরণ উন্মোচন করা। অর্থাৎ আসল সত্যকে আবিষ্কার করা। সঙ্গে আমরা দিন সাতেকের মতো রসদ নিয়েছি। খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি। আর থাকার জন্য হাল্কা পলিথিনের তাঁবু এবং শোবার জন্য সামান্য কিছু বিছানাপত্তব। যাই হোক জঙ্গলের পথ ধরে আমরা আমাদের হাঁটা শুরু কবলাম। সিংভূমে এই পাহাড় জঙ্গলের রূপই আলাদা। আমি বৈজ্ঞানিক নই। গবেষকও নই। একজন প্রকৃতি প্রেমিক, চাকুরিজীবী উৎসাহী মানুষ।

এখানকার পাহাড় জঙ্গলের রূপ দেখে আমি মোহিত হয়ে গেলাম। তার ওপব রোমাঞ্চকর অভিযান। যা আমার জীবনে বলতে গেলে এই প্রথম। এইরকম সঙ্গী না পেলে এইরকম ঘটনা না ঘটলে এই অভিযানে কে আসত? অজানাকে জানার আকাঙ্খা বা রহস্যের সূত্র খুঁজে পাবাব আগ্রহ যেমন মনকে উদ্দীপ্ত করছিল তেমনি আকস্মিক কোনও ভয়াবহ পবিণতির কথা মনে পড়লেও ভয়ে বুক শুকিয়ে যাচ্ছিল। মনের মধ্যে কতরকম প্রশ্নের উদয় হচ্ছিল। ব্যাপারটা কি সত্যিই ভৌতিক? তা যদি না হয় তাহলে লোহার রডটা কি করে আপনা আপনি বেঁকে যাচ্ছিল? আর যে শক্তি ওই অসাধ্য সাধন করেছে সে যদি আমাদের এই দুঃসাহস দেখে বিরক্ত হয়ে তার অদৃশ্য শক্তি দিয়ে গলার টুঁটি টিপে ধরে তাহলে কী করব আমরা? তবুও মাসেনু এবং মেহতাজীর মতো বিজ্ঞানীর সঙ্গলাভ মনেব ভযকে দমন করছিল। এঁদের বেপরোয়া মনোভাবে সাহসও জাগছিল মনে। ভয়ও করছিল। যদিও জানি ওদের দুজনের দুটো রিভলবার এই বিপদের মোকাবিলা করবার জন্য যথেষ্ট। অরোরা নিজেও একজন ভালো শুটার। এক সময় মিলিটারির লোক ছিল। তাছাড়া আমাব হাতেও পিস্তল একটা এসে গেছে। কাজেই আকস্মিক কোনও বিপদের মোকাবিলা করতে আমরাও পিছুপা হব না।

আমরা প্রায় বেলা বারোটা নাগাদ ঠিক জায়গাটিতে এসে পৌছলাম অর্থাৎ গত সন্ধ্যায় যেখানে আমরা ওই নরদানবের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, আমরা সেখানেই আমাদেব তাঁবু ফেলব ঠিক করলাম।

'হো' জাতির যে লোকটি আমাদের মাল বইছিল তার নাম মীনোহাদাম। লোকটি অসম্ভব রকমের চটপটে। একটু বেঁটে খাটো চেহারা হলেও যথেষ্ট ভারবাহী। বড় একটি গাছের নীচে মাটিতে গজাল পুঁতে আমাদের হাল্কা ধরনের তাঁবুটা খাঁটিয়ে ফেলল।

প্রচণ্ড শীতের দিন। তাই আমরা বনের ঘাস পাতা ইত্যাদি নিয়ে তাঁবুর ভেতরে বিছিয়ে একটু গদির মতো করে নিলাম। এর ওপর শতরঞ্জি বিছিয়ে দিব্যি শোবার ব্যবস্থা কবা হল। যদিও এতে শুয়ে গায়ে কম্বল চাপা দিলে এখানকার শীতকে সারারাত ধরে জয় করা যাবে না, তবুও এছাড়া উপায়ই বা কী?

এখানে আসা মাত্রই অভিযানের গুরুত্ব উপলব্ধির বদলে কেমন যেন এক পিকনিক পিকনিক ভাব ফুটে উঠল। অরণ্যবাসের আনন্দে ভরে উঠল মন। আমাদের এই অরণ্যবাস আজ রাতেই হয়তো শেষ হয়ে যেতে পারে। অথবা সময় লাগতে পারে আরও বেশি। তবে আমরা এই অভিযানে তিন চারদিনের বেশি থাকব না। যদিও আমাদেব হপ্তা খানেকের মতো রসদ নেওয়া আছে।

যাই হোক। আমরা এখানে এসে প্রকৃতির মুক্ত মঞ্চে হাত পা ছড়িয়ে বসে মাখন রুটি আর ডিম সিদ্ধ খেয়ে জলযোগ সারলাম। এরপর দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

মীনোহাদাম বলল, "চাল ডাল তো বাবুদের সঙ্গে রয়েইছে। শুধু একটু ফুটিয়ে নেওয়া যাক। কি বলেন বাবু?"

মাসেনু বললেন, "না না। চাল ডাল দিয়ে খিচুড়ি পাকাতে হবে না তোমাকে। দুটো আলু দিয়ে ভাতে ভাত কর। ততক্ষণ আমি দেখছি কিছু শিকার পাওয়া যায় কিনা।"

বলতে ভুলে গেছি। মাসেনু সঙ্গে একটি ছররা বন্দুকও এনেছিলেন পাখি শিকারের জন্য।

মেহতাজী বললেন, "এখানে আপনি কী শিকার করবেন?"

"পাখি তো মারবই। তার ওপর যা জঙ্গল, দেখিই না যদি দু'একটা হরিণ টরিণ চোখে পড়ে।"

অরোরা বলল, "হরিণ এখানে পাবেন না। আমি এই এলাকায় যতদিন আছি শুধু পাখি ছাড়া শিকার করার মতো কিছুই দেখিনি। তা ঠিক আছে। আপনি বসুন। আমি দেখছি কোনও শিকার জোগাড় করতে পারি কিনা। এই শীতে মাংস ভাত নইলে জমবে না।"

অরোরাকে আমি কখনও হাতছাড়া করি না। তাই অরোরা যেতেই আমিও চললাম।

আমরা দুজনে জঙ্গলের সুঁড়ি পথ ধরে আরও গভীরে প্রবেশ করলাম। কিছু দূর যাবার পর এক জায়গায় ছর ছর শব্দ শুনতে পেয়ে বুঝলাম কাছে পিঠে কোথাও ঝরনা আছে। আমরা সেই শব্দ শুনে একটু এগোতেই চমৎকার একটি ঝরনা পেয়ে গেলাম। এখানে দিব্যি স্নান করা যাবে। এর জল খাওয়া যাবে। এবং এর গতিপথ ধরে কিছু দূর যেতে পারলে নিশ্চয়ই কোনও জলাভূমি চোখে পড়বে। আর সেখানে আমরা শিকার পাব। তবে এর ধারে কাছে এমন কোনও গুহা বা অন্য কোনও বড় ধরনের আশ্রয়স্থল কিছু চোখে পড়ল না যেটাকে আমরা সেই নরদানব বা অমানুষিক মানুষের আশ্রয়স্থল বলে মনে করতে পাবি।

জলের জায়গার সন্ধান তো পেলাম। এবার এর গতিপথ ধরে কিছুটা এগোতেই একটি নিম্নভূমি চোখে পড়ল। যেখানে আমাদের অনুমান মতো ঝরনার জল জমে জলাভূমির সৃষ্টি করেছে। আমরা পা টিপে টিপে সেদিকে এগোতেই অনেক পাখি চোখে পড়ল। অরোরার ছররা বন্দুক গর্জে উঠল। অমনি ঝাঁকের পাখি উড়ে পড়ল আকাশে। কয়েকটি অবশ্য গুলিবিদ্ধ হয়ে ছটফট করতে লাগল।

আমরা দুজনে মনের আনন্দে পাখিগুলোকে কুড়িয়ে আনলাম। মোট সাতটি পাখি মরেছে। আর দরকারই বা কি? পাঁচজন লোকের আহারের পক্ষে এই সাতটি পাখির মাংসই যথেষ্ট। যদিও মীনোহাদামের খাওয়া কিরকম তা জানি না।

পাখিগুলো নিয়ে ফিরে আসার সময়ই আমরা লক্ষ্য করলাম এখানকার ভিজে নরম মাটিতে এত অতিকায় মানুষের পায়ের ছাপ। মানুষটি এখানে কী করছিল? জল খেতে এসেছিল? কিন্তু এখানে এমন চমৎকার ঝরনা থাকতে জলায় এল কেন জল খেতে? যাই হোক, যে কাজের জন্য আমরা এসেছি অর্থাৎ সেই মানুষ অমানুষ বা নরদানবের সন্ধান পেতে তার একটু হদিশ অন্তত পেলাম। এই ঝরনা বা জলাভূমিকে কেন্দ্র করেই তার সাক্ষাৎ পেতে পারি আমরা।

অরোরা অনেকক্ষণ ধরে পদচিহ্ন লক্ষ্য করে বলল, "একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ কী? পায়ের ছাপটা কিন্তু জলাভূমির দিকেই নেমে গেছে ক্রমশ। উঠে আসার কোনও চিহ্ন নেই।"

আমি বিস্মিত হলাম, "সত্যিই তো! লোকটা না হয় জলায় নামল, তারপর গেল কোথায়?"

যাই হোক। আমরা পাখি শিকার করে এসেই দেখলাম মিঃ মাসেনু মস্ত একটি হরিণ শিকার করে বসে আছেন।

আমরা দুজনেই অবাক। অরোরা বলল, "এই বনে হরিণ! তাও এত বড়? এ অসম্ভব। একটি যখন মরেছে তখন এর দলে আরও অনেক আছে। কিন্তু—"

"কোনও কিন্তু নয়। এখন এটাকে ছাড়িয়ে ফেলার ব্যবস্থা কর। "মীনোহাদাম ও অরোরা হরিণের ছাল ছাড়িয়ে তার মাংস তৈরির ব্যবস্থা করতে লাগল।

আমি মৃত পাখিগুলোকে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মতন একপাশে ফেলে দিলাম।

চার

খাওয়া দাওয়ার পাট সাঙ্গ করতেই সন্ধে হয়ে গেল। এবার একটু বিশ্রাম না নিলে নয়। তাঁবুর ভেতরে ঘাসের গদিতে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। অরোরাকে বললাম, "বেশ তো ঘাঁটি গেড়েছি। রাত দুপুরে বাঘের পেটে যাব না তো।"

"না। সে ভয় নেই। গভীর জঙ্গলে ভালুক থাকতে পারে। কিন্তু বাঘ নেই। এখানে জঙ্গল গভীর হলেও মাইনস্-এর জন্যে অনেক লোক বসতি হয়ে গেছে। তাই জন্তু জানোয়াররাও দূরে সরে গেছে। তবে সাবধান থাকা ভাল। এখানে তো আমাদের পড়ে পড়ে ঘুমোলে চলবে না। আমরা এসেছি এক অজানা রহস্যের মুখোমুখি হতে। আর একটু পরেই তৈরি হতে হবে, হয়তো আমাদের বিপদ এবার ঘনিয়ে এল বলে। যদি সেই নরদানবের আবির্ভাব এখানে হয় তাহলে এখুনি আমরা তার মোকাবিলা করব।"

মীনোহাদাম খাওয়া দাওয়ার পর টুকটাক দু'একটা হাতের কাজ সেরে কুড়ুল কাঁধে নিয়ে কাঠ কাটতে যাবার জন্য তৈরি হল।

অরোরা বলল, "এই ভর সন্ধেবেলায় কেন, যা করবার কাল সকালেই করবে। এমন সময় কেউ জঙ্গলে কাঠ কাটতে যায়?"

মীনোহাদাম বলল, "জঙ্গলের মানুষ আমরা। জঙ্গলকে ভয় করি না বাবু। এসব

জায়গায় আমাদের অনেক দিনের যাতায়াত। এখন কাঠ কুটো না নিয়ে এলে চলে? সারারাত কী করব? একটু আগুন জ্বেলে রাখলে জঙ্গল বলে কথা, কত কি বিপদআপদ ঘটতে পারে।"

"যাও। তবে খুব সাবধানে যাবে।"

"ঠিক আছে বাবু।"

মীনোহাদাম অদূরেই জঙ্গলের ঘন গাছপালা যেদিকে আছে সেদিকে এগিয়ে গেল। নাঃ। লোকটার সাহস আছে বলতে হবে।

এখানকার জঙ্গলে যদিও হিংস্র জন্তু জানোয়ারের সচরাচর দেখা মেলে না তবুও একেবারে নেই বলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। বাঘ নেই। ভালুক আছে। হায়নাও থাকতে পারে। আর পাহাড় জঙ্গলে একেবারেই যে বাঘ থাকবে না একথাই বা জোর দিয়ে বলা যাক কি করে? রাতের অন্ধকারে এদিক সেদিক থেকে দু'একটা ছিটকে ছাটকে বেরিয়ে আসতে কতক্ষণ? কাঠ জ্বেলে তাঁবুর আশ্রয়ে সারারাত বসে থাকলে বরং অনেক কিছু দেখতেও পাব আর জন্তু জানোয়াররাও ধারে কাছে আসতে সাহস করবে না।

অরোরা আর আমি ঠিক করলাম এই পরিবেশে ঘুম তো হবে না তাই পালা করে রাত জাগব। অরোরা এবং আমি ঘুমিয়ে নিলে মাসেনু ও মেহতাজী পাহারা দেবেন। আবার ওরা দুজনে যখন ঘুমোবেন তখন আমরা জেগে পাহারা দেব। আর মীনোহাদাম সারা রাতই নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাবে। কেননা ও বেচারিকে আমাদের চেয়েও অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে। জল আনা। রান্না করা। কাঠ কাটা সব কিছুই করতে হবে ওকে। তার ওপর ঘাড়ে করে এই সমস্ত মালপত্তর বওয়া তো আছেই।

ঠিক করলাম আজকের রাতটা আমরা এখানে থাকব। যদি সেরকম কোনও বিভীষিকা না দেখি বা সেই মানুষটির সন্ধান না পাই তাহলে আমরা কাল সকালেই চলে যাব স্থানান্তরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ জটিল আকার ধরে ঘনিয়ে আসছে। অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল। মীনোহাদাম ফিরে আসছে না কেন? ওর কাঠ কাটার ঠক ঠক শব্দ শুনতে পাচ্ছি না কেন? আরও বেশি অন্ধকার হলে পথ চিনে তাঁবুর কাছে ফিরে আসাই দুষ্কর হবে ওর।

অরোরা দেশলাই জ্বেলে লণ্ঠন ধরাল।

মাসেনু বললেন, "নিশ্চয় কোনও বিপদ হয়েছে লোকটার।"

অরোরা বলল, "আমি বারণ করলাম। কিন্তু শুনল না যেমন আমার কথা।"

আমি বললাম, "শুনেই বা লাভ কি হোত? আগুন জ্বলত কীসে? তার চেয়ে এক কাজ করি চল। আমাদের তো টর্চ আছে। একটু বরং এগিয়ে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখি ওর।"

"তাই চল। আর দেরি করা উচিত নয়।" মাসেনু অরোরাকে বললেন, "তুমি থাক। আমি যাই। বলে তাঁর সাইলেন্সার লাগানো রিভলবারটার সেফটি ক্যাচ মুক্ত করে এক হাতে টর্চ নিয়ে এগিয়ে চললেন।"

বেশ কিছুদূর যাবার পর এক জায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম আমরা।

মাসেনু অস্ফুটে চিৎকার করে উঠলেন, "হাউ ডেঞ্জারাস। কী ভয়ানক! ইম্‌টি আক্কড়া।"

তাকিয়ে দেখলাম এক জায়গায় চাপ চাপ কিছু রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে এবং তার

পাশেই পড়ে আছে সেই কাঠ কাটা কুড়ুলটা। এ রক্ত তাহলে মীনোহাদামের। নিশ্চয়ই তাকে বাঘে খেয়েছে। মাসেনু হঠাৎ রেগে বললেন, "অরোরা আমাদের মিথ্যে কথা বলেছে। এই জঙ্গলে রীতিমতো হিংস্র জানোয়ার আছে। ও কোনও দুরভিসন্ধি নিয়েই আমাদের এনেছে এখানে। এ রকম হবে জানলে আমি শুধু রিভলবার নয়, রাইফেলও সঙ্গে আনতাম।"

"ডোন্ট মাইন্ড মিঃ মাসেনু। অরোরাকে আপনি ভুল বুঝছেন। আপনি এবং মেহতাজী আপনাদের গবেষণার কাজে এখানে এসেছিলেন। অরোরা আপনাদের সহযোগিতা করেছে মাত্র। ভেবে দেখুন, কাল সন্ধ্যায় এই জঙ্গলে এক নরদানবকে আমরা দেখেছিলাম। কাল রাত্রে জানলার রড বেঁকে যাওয়ার মতো অবাস্তব ঘটনাও আপনার চোখের সামনেই ঘটেছে। এর পরেও আপনি কী করে ওই কথা বলেন?"

মাসেনু কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "স্যরি। কিছু মনে করবেন না। আমি উত্তেজনার বশে মুখ ফসকে বলে ফেলেছি কথাগুলো। আমার এই মন্তব্য যেন অরোরার কানে তুলবেন না। তিনি তাহলে ক্ষুব্ধ হবেন আমার ওপর। আসুন আমরা রক্তের দাগ ধরে বরং আরও একটু এগিয়ে যাই।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "আমার কিন্তু সাহস হচ্ছে না। বাঘ যদি কাছে-পিঠেই থাকে?"

"থাকলেই বা। মীনোহাদাম যদি আমাদের জন্য তার জীবন দিতে পারে তাহলে আমরা পারব না তাকে উদ্ধার করার জন্য সামান্য একটু রিস্ক নিতে?"

"ঠিক কথা। মীনোহাদাম স্থানীয় লোক। সে জানত এখানে ভয়ের ব্যাপার কিছু নেই। তাই তার অসাবধানতায় আচমকা ঘটে গেছে দুর্ঘটনাটা। এখন প্রশ্ন এই, সে কি সত্যিই কোনও হিংস্র জানোয়ারের কবলে পড়েছে না সেই নরদানবই এসে তুলে নিয়ে গেছে তাকে?"

"আপনি ঠিক বলেছেন তো।"

"সেই জন্যেই বলছি অযথা বেশি রিস্ক না নেওয়াই ভাল। জীবনটা ছেলেখেলার নয়। কাজেই এটাকে নষ্ট করার অধিকারও আমাদের নেই। পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হল নিজেকে সুস্থ এবং অক্ষত রাখা।"

মাসেনু হেসে বললেন, "তাহলে মরতে জঙ্গলে এসেছিলেন কেন? ঘরে শুয়ে থাকলেই পারতেন।"

ঠিক কথাই তো। এসেছিলাম কেন? কথাটা তো আমিও অসংলগ্ন বলে ফেললাম। এবং নিজেকে কাপুরুষ প্রমাণিত করলাম। তাই বললাম, "বেড়াতে। অবশ্য বেড়াতে এসেছি বলে বিপদের ঝুঁকি নেব না, মানুষ হয়ে মানুষের কর্তব্য করব না তা তো নয়। আমি বলছিলাম কি অযথা সাহসের পরীক্ষা দেবার জন্য বোকার মতো পাহাড়ের চূড়া থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ার কোনও মানে হয় না। বিনা অস্ত্রে শুধু হাতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রু সৈন্যের মোকাবিলা করতে যাওয়ারও যেমন কোনও যুক্তি খুঁজে পাই না, তেমন একটি পিস্তল ও রিভলবারকে ভরসা করে কোনও হিংস্র জন্তু বা নরদানবের মোকাবিলা করতে যাওয়ারও কোনও মানে হয় না। অন্ধকারে গাছের ডালে কোথাও কোনও জন্তু যদি ওৎ পেতে থাকে, আচমকা পিছন থেকে যদি ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে, তাহলে রহস্যের সমাধান করবে কে? তাই বলি, তাঁবুতে ফিরে চলুন। মিঃ অরোরা এবং মেহতাজীকেও সঙ্গে নিন। ওদের

মতামতটাও একবার জানা দরকার। আমার মনে হয় রাত্রে তাঁবুতে বসে নজর রাখা এবং দিনের আলোয় অনুসন্ধান করাটাই ভাল।''

মাসেনু আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, ''ঠিক আছে। তাই করা যাবে। তবু আসুন না সামান্য একটু এগিয়ে দেখি। যদি মানুষটাকে উদ্ধার করতে পারি। আপনি পিছন দিকে লক্ষ্য রাখুন, আমি সামনের দিকে লক্ষ্য রেখে এগোতে থাকি।''

মাসেনুর একাগ্রতা দেখে এবং তার দরদী মনের পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। মনের মধ্যে যে ভয়ের মেঘ ছিল তা যেন কেটে গেল নিমেষে। বললাম, ''গো অ্যাহেড। আপনি সামনে দেখুন। আমি পিছনে লক্ষ্য রাখছি। ওর খোঁজ না নিয়ে যাব না।''

রক্তের দাগ ধরে যেতে যেতে সেই ঝরনার পাশ দিয়ে এগোতে লাগলাম আমরা। তারপর পথটা যেখানে নিম্নমুখী হয়ে জলাভূমির সৃষ্টি করেছে সেখানেই হঠাৎ দেখতে পেলাম একটি পাথরের ওপর পড়ে আছে মীনোহাদামের দেহটা। না। সেটা নড়াচড়া করছে না। তার মানে সে মরেই গেছে। কাছে গিয়ে দেখলাম বীভৎস ব্যাপার। মীনোহাদামের দুটো চোখ নেই। এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ছুরি চালিয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশগুলো কে যেন কেটে নিয়ে গেছে। কে! কে সে! এ তো কোনও বন্য হিংস্রতার ব্যাপার নয়। মাসেনুর কথা শুনে ভাগ্যে এসেছিলাম। নাহলে এই রহস্য তিমিরেই ঢাকা থাকত। কাল রাতে বুধন সর্দারকেও ঠিক এইভাবেই হত্যা করা হয়েছিল। আজ মীনোহাদামও সেই নৃশংসতার শিকার হল। এ কার কাজ? কী অদ্ভুত উপায়ে এইগুলো যে ঘটে যাচ্ছে তা ধারণারও বাইরে। আমরা আর সেখানে দাঁড়ালাম না। ধীরে ধীরে তাঁবুর কাছে ফিরে এলাম।

পাঁচ

এখন আমরা চারজন। হ্যাঁ চারজনই। এবার থেকে তাঁবু সমেত সমস্ত মালপত্তর আমাদের ভাগাভাগি করে বইতে হবে।

মীনোহাদামের ভয়াবহ পরিণতি আমাদের সকলেরই মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করল। আমার এক এক সময় মনে হচ্ছিল কোনও রকমে রাতটা কাটাতে পারলে কাল সকালেই এখান থেকে পালাব আমি। দরকার নেই অ্যাডভেঞ্চারের। ওই অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই করা আমাদের কর্ম নয়। একটা ভয়ানক কিছুর পাল্লায় যে আমরা পড়ে গেছি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাকে টেক্কা দেওয়া আমাদের পক্ষে সত্যিই অসম্ভব। ওঃ, কী ভয়ঙ্কর! কী দারুণ রোমাঞ্চকর সে।

আমরা তাঁবুর সামনে বসে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কীরকম হবে তাই নিয়ে আলোচনা করছি। এমন সময় হঠাৎ আগুনের হল্কার মতো কি যেন একটা স্যাঁৎ করে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ছিটকে গেল। কী ওটা? অন্যমনস্ক ছিলাম বলে সেটাকে আমরা ভাল করে লক্ষ্য করতে পারলাম না। তবে সেটা যে একটা ভয়ঙ্কর কিছু তা অনুমান করতে পারলাম।

বাইরে প্রচণ্ড শীতের দাপট। এ সময় সত্যিই একটু আগুন করার ব্যবস্থা হলে মন্দ হোত না। পাহাড়ের কনকনে ঠাণ্ডায় হাল্কা ধরনের এই তাঁবুর আশ্রয়ে সিংভূমের শীত

মানবে কেন? হাড় কনকন করতে লাগল তাই। এর ভেতরে সারাটি রাত নিদ্রাহীন রজনী যাপন করতে হবে আমাদের। কেননা আমরা যে কোনও মুহূর্তেই বিপদে পড়তে পারি।

আবাব—আবার আসছে সে। ওই এল।

হ্যাঁ। আগুনের হল্কা নিয়ে, কী ও? কোনও অগ্নিদানব? না আগুনের দেবতা? পাহাড়ের ওপ্রান্ত থেকে ছুটে এসে আমাদের তাঁবুর ওপর দিয়ে লাফিয়ে চলে গেল!

বুঝলাম আর রেহাই নেই।

এবার আমরা সেই ভয়ানক শক্তির দৃষ্টিগোচর হয়েছি। আমরা সকলেই তার শিকার। ওর মুখের গ্রাস ও নেবেই।

আবার—আবার—আসছে।

উঃ কী ভয়ানক। কী সাংঘাতিক। তার সারা গায়ে আগুন জ্বলছে। কেমন এক অস্থির উন্মাদনায় যেন ছুটোছুটি করছে সে। কিন্তু কী ওটা? প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ওরকম কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে কিনা সন্দেহ। অন্তত হয়নি। বাঘের মতো চেহারা অথচ একটি বড়সড় বাঘের একশো গুণ বড় শরীর। আর সেই শরীরে ভেতর থেকে তার লোমের ওপর থেকে চোখ ধাঁধানো আগুনের ফুলকির মতো, অভ্রে রোদ লাগলে যে রকম চিকচিক করে সেইরকম ঝিকমিক করছে। মনে হচ্ছে যেন শত শত কাঠকয়লার আগুনের ফুলকি ফুটছে। আব সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটি সাড়া শব্দ না দিয়ে শুধু অস্থির উন্মাদনায় বন জঙ্গল কাঁপিয়ে ছুটোছুটি করছে।

মিঃ মাসেনু আমাদেব সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, "চলুন, আমরা এখুনি তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। পাহাড়ের বড় বড় পাথরের আড়ালে কোথাও গিয়ে লুকোই আমরা না হলে আজ আমাদের নিস্তার নেই। কাম সুন উইথ মি। কুইক।

আমরা সশস্ত্র হয়ে প্রায় ধনুকেব ছিলার মতোই ছিটকে-ছাটকে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর যে যেখানে পারলাম পাথরের খাঁজে লুকিয়ে পড়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম আমাদের তাঁবুর দিকে। ভাগ্যে জ্যোৎস্না ছিল তাই রক্ষে। সব কিছুই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

অনেকক্ষণ পরে জন্তুটা আবার এল। সেটা যে কী তা এবারও ভাল করে লক্ষ্য করতে পারলাম না। কেননা সেটা এমনই দ্রুতগতি জানোয়ার যে চোখের পলকে দেখা দিয়েই ওপাশে পাহাড় জঙ্গলে হারিয়ে যায়। অর্থাৎ সব কিছুর আড়ালে দৃষ্টির বাইরে চলে যায় সে। মাসেনুর নির্দেশ মতো আমরা তৈরি। আমার সঙ্গে বোঝাস্বরূপ ক্যামেরাটা বৃথাই এনেছিলাম। কারণ এখন ওটা ব্যবহার করার চেয়ে পিস্তল ব্যবহার করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমরা চারজনেই আমাদের মারণাস্ত্র উঁচিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলাম। জন্তুটা তার চলার গতি মন্থর করলে বা থামলে আমরা এক সঙ্গে গুলি করব তাকে। চারজনের একজনের বুলেটও যদি লাগে তবু শিক্ষা হবে হয়তো।

আমরা অনন্ত ধৈর্য ধরে জন্তুটার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটু পরেই আবার দেখা গেল তাকে। ওদিকের পাহাড় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেই আমাদের তাঁবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটাকে কামড়ে হুক শুদ্ধ উপড়ে ফেলল। মুহূর্তের বিরতি। তারপর সেটা মুখে নিয়ে যেই না পালাতে যাবে অমনি আমাদের চারজনেরই রিভলবার পিস্তল এক সঙ্গে গর্জে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রাণান্তক চিৎকার। সে কী ভয়ঙ্কর ডাক। কাতর আর্তনাদ ও সুতীব্র গোঙানিতে বনভূমি কেঁপে উঠল। জন্তুটা হাত দশেক দূরে ছিটকে পড়ে ছটফট করতে করতে উঠে দাঁড়িয়েই তীর বেগে ছুটতে লাগল। আমরাও আর কাল বিলম্ব না করে তাকে ধাওয়া করলাম। যদিও এই অসমতল পাহাড়ি পথে ছোটা একেবারেই অসম্ভব তবুও আমরা দ্রুত ওকে ধরে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কেননা যেভাবেই হোক ওটাকে শেষ করতেই হবে। নাহলে ঘা খাওয়া হিংস্র জানোয়ার যদি একবার বদলা নিতে ফিরে আসে তো রক্ষে রাখবে না কারো।

আমরা বেশ কিছুদূর যাবার পর ঘন গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকা জন্তুটাকে দেখতে পেলাম। মাসেনু তার দিকে আবার রিভলবার তাক করা মাত্রই সেটা এক লাফে সেই জলাভূমির ওপর লাফিয়ে পড়ল।

এখানে চারিদিক ফাঁকা। তাই জন্তুটা আমাদের নাগালের মধ্যে। তার ওপরে তার বিশাল শরীর। কাজেই টিপ ফসকাবার কোনও চান্স নেই। আমরা আবার একই সঙ্গে গুলি করলাম জন্তুটাকে লক্ষ্য করে।

একটা বিকট আর্তনাদ করে জন্তুটা বেশ কয়েক হাত ওপরে শূন্যে ঘুরপাক খেয়ে ধড়াস করে একটি পাথরে আছড়ে পড়ল। তারপর ভয়ানক রকমের ছটফট করতে করতে উলোটি পালোটি খেতে লাগল। এতক্ষণে আমরা ভাল করে লক্ষ্য করলাম সেটা একটা অতিকায় বাঘ। কিন্তু একি! ছটফট করতে করতে বাঘটা ক্রমশ গুটিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে

কেন? আমরা ছুটে গেলাম সেটার কাছে। তারপর সবাই মিলে সেটার ওপর ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলাম।

মাসেনু বললেন, "আরে! এর গায়ে তো দেখছি ফসফরাস মাখানো আছে। তাই ওর গা থেকে অত আগুনের ফুলকির মতো জেল্লা বেরোচ্ছে। কিন্তু এটা এমন গুটিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে কেন?"

আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম সেটা ছোট হতে হতে ক্রমশ একটা বেড়ালে পরিণত হল। তারপর দু'একবার শূন্যে থাবা উঁচিয়ে স্থির হয়ে গেল সেটা। যাক। বাঁচা গেল। বাঘই হোক, আর বেড়ালই হোক, আমাদের কিছু যায় আসে না। শুধু একটি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। আর তখনই আমার মনে হল কালকের ওই নরদানবও কোনও সাধারণ মানুষের এক অসাধারণ পরিণতি নয়তো?

আমরা যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই রহস্যের কিনারা খুঁজছি তেমন সময় কে যেন বলে উঠল, "ছিঃ ছিঃ। চার চারজন বীরপুরুষ রিভলবার পিস্তল নিয়ে জঙ্গলে এসে শেষকালে বাঘ মারতে বেড়াল মারলেন? লজ্জার কথা।"

আমরা চমকে ঘুরে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না।

আমার কাছে যে ক্যামেরা ছিল সেকথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কণ্ঠস্বরই এবার মনে করিয়ে দিল, "কই নিন। একটা ছবি তুলুন। খবরের কাগজে ছাপালে কিন্তু নাম হয়ে যাবে আপনাদের। কারণ এরকম অভিনব শিকার আজ পর্যন্ত কেউ করেনি।"

মাসেনু চিৎকার করে বলল, "হু আর য়ু? নি উ অ্যাবডাউ? কে তুমি?"

"দেখবেন আমি কে? আমাকে দেখে ভয় পাবেন না তো? আমি কিন্তু অত্যন্ত সাংঘাতিক। আমাকে কেউ দেখতে চায় না। আমি ভূত নই, ভগবান নই, জন্তু নই, জানোয়ার নই।"

"তবে তুমি কী?"

"আমি কালপুরুষ। আমি কালকে জয় করতে পারি। আমি এক দারুণ বিভীষিকা। ওই দেখুন। জলের ওপারে লক্ষ্য করুন। আমাকে দেখতে পাবেন। ওই আমি আসছি। পালান পালান শিগগির পালান এখান থেকে।"

অরোরা ভয়ার্ত স্বরে চিৎকার করে উঠল, "পালাও পালাও। যদি বাঁচতে চাও তো পালাও।"

মাসেনু সেদিকে লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলি চালাতে চালাতে বললেন, "লেট আস মাই ফ্রেন্ড। কাম ব্যাক। কুইক। যে যেখানে পারো পাথরের খাঁজে লুকিয়ে পড়। নাহলে মৃত্যু অনিবার্য।"

আমরা দেখলাম জলের ওপার থেকে কয়েকটা বড় বড় গাছ, শিমুল, পলাশ ইত্যাদি তাদের ডালপালা মেলে আমাদের দিকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে।

আমরা প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম।

ছুটতে ছুটতে আমরা একটা বড় পাথরের খাঁজে লুকিয়ে পড়লাম। আর গাছগুলো ছুটে এসে আমাদের এমনভাবে ঘিরে ফেলল যে সেই ব্যারিকেড থেকে বেরিয়ে আসার কোনও রাস্তাই আমরা খুঁজে পেলাম না।

ছয়

অনেকক্ষণ ওইভাবে থাকার পর সেই কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেলাম আমরা, "কী! সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন তো? ভয় পাবার কিছু নেই। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের আমি এভাবে মারি না। তাছাড়া আপনারা এই জঙ্গলে আমার অতিথি হয়ে এসেছেন। আমি কখনও আপনাদের সঙ্গে দুব্যর্বহার করতে পারি? শুধু একটু মজা করছিলাম। আমি সরে যাচ্ছি। আপনারা বেরিয়ে আসুন।"

গাছগুলো এবার পিছু হটে খানিকটা সরে এসে পাহাড় থেকে ছিটকে ছাটকে লাফিয়ে পড়ল।

আমরা বিস্মিত চোখে চেয়ে রইলাম সেদিকে।

"আসুন, বেরিয়ে আসুন ওখান থেকে।"

"আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু আপনি কে?"

"আরে! এই তো দেখলেন আমি কে। আবার সেই একই প্রশ্ন করছেন? আসুন আসুন, আমার ঘরে আসুন। আপনাদের জন্যে যৎসামান্য খাওয়া দাওয়ারও আয়োজন করেছি। চলে আসুন।"

আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলাম।

"কোথায় যাব আমরা?"

"আসুনই না।"

আমরা বেরিয়ে এলাম।

"একটু বাঁদিকে নেমে এগিয়ে যান। সিঁড়ি পাবেন।"

আমরা বাঁদিকে একটু এগোতেই কয়েক ধাপ সিঁড়ি দেখতে পেলাম। সিঁড়ি ভেঙে নামতেই—।

"এবার ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে যে পাথরটা আছে ওটা ঠেলে সরিয়ে দিন।" আমরা পাথরটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

অরোরা বলল, "অসম্ভব। আপনি কি এখনও আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছেন? কোনও মানুষ কখনও পারে ওটাকে সরাতে?"

সত্যিই তো। প্রায় দু'আড়াইশো ফুট উঁচু একটা পাথর। যে পাথরটাকে শুধু পাথর না বলে পাহাড়ের একটা দেওয়াল বললেও অত্যুক্তি হবে না।

"তবু একবার চেষ্টা করেই দেখুন না। একেবারে না মরেই ভূত হয়ে যান কেন?"

"পারব না। আমরা তো চারজন। এরকম এক লক্ষ জন চেষ্টা করেও পারবে না।"

"তবু।"

তবু'র মর্যাদা দিতে আমরা চারজন সেই পাথরটাকে ধরে অকারণেই ঠেলাঠেলি করতে লাগলাম।

অমনি সে কী প্রচণ্ড হাসি, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

"একেবারেই ছেলেমানুষের মতো কাজ করছেন আপনারা। মিঃ মাসেনু! মি: মেহেতো এই আপনারা বৈজ্ঞানিক? আপনারা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেন অথচ মাথা খাটিয়ে এমন একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বার করতে পারলেন না যার দ্বারা এটাকে নড়াতে পারেন? এই

দেখুন আমি অতি সহজে সরিয়ে দেব। বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম অত বড় পাথরটা বলের মতো ঘুরে একপাশে কাত হয়ে গেল। আর পাথরটা সরে যেতেই দেখলাম, সেখানে এক বিরাট গহ্বর। আমরা বাইরে থেকেই টর্চ ফেলে তার ভেতরটা দেখতে লাগলাম।

"হ্যাঁ। দেখুন, বেশ ভাল করে দেখুন। এর ভিতরেই আমি থাকি। তবে আরও ভেতরে। এবার ঢুকে পড়ুন এক এক করে।"

আমি বললাম, "ঢুকছি। তবে আবার পাথর চাপা দিয়ে এটাকে বন্ধ করে দেবেন না তো? তাহলে কিন্তু বেরোতে পারব না।"

"এই রে। ভয় পেলে কি করে হবে?"

আমাদের ইতস্তত করতে দেখে কণ্ঠস্বর আবার বলল, "আচ্ছা থাক। এ পথে আপনাদের আসতে হবে না। আপনারা বরং সোজা পথে আসুন।"

বলার সঙ্গেই পাথরটা আবার ঘুরে গেল।

পথ আবার বন্ধ।

আমরা তবুও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি।

"চলুন ওই জলাটার কাছে চলুন। ওই দিক দিয়ে আর একটা পথ আছে আমার কাছে আসার। একটু তাড়াতাড়ি করুন, নইলে খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে আপনাদের।"

আমরা জলার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

"আসুন। এগিয়ে আসুন। ভয় নেই।"

মাসেনু চিৎকার করে উঠলেন, "হাউ ফানি ইউ আর। এখানে তো শুধু জল। থই থই করছে। যাব কী করে?"

"ওমা জল নাকি? তাই তো। আচ্ছা দাঁড়ান জলটা কমানোর ব্যবস্থা করছি।"

আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম জল কমার জায়গায় ক্রমশ বাড়ছে। সামনের পাথরটা ডুবে গেল। আমাদের পায়ের চেটো ডুবে গেল। এ কিরে বাবা! এবার ডুবিয়ে মারবে নাকি? বললাম, "জল কমার জায়গায় ক্রমশ তো বাড়ছে।"

"তাহলে নিশ্চয়ই জোয়ার এসেছে।"

মাসেনু বললেন, "চালাকি পেয়েছেন। পাহাড়ের ওপর ঝরনার জলে জোয়ার!"

"ওঃ হো। তাও তো বটে। এটা তো ঝরনার জল জমা হচ্ছে। এখানে জোয়ার হবে কোত্থেকে? আসলে আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে এসেছে। তা যাক গে। সব যদি জলে ডুবে থাকে তাহলে আপনারা আসবেনই বা কী করে? ঠিক আছে, জলটা তাহলে কমিয়ে দেওয়া যাক।"

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ কিরকম যেন ম্যাজিকের মতো জলটা কমে যেতে লাগল। খুব জোর দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় লাগল বোধ হয়। তারই মধ্যে জলাটা সম্পূর্ণ জলশূন্য হয়ে গেল।

"আসুন। এবারে চলে আসুন। কাদা নেই, কিছু নেই। এখানে সবই পাথর।"

জলশূন্য জলার নীচে বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি নামতেই দেখলাম একটা বড় বড় পাইপের মতো গর্ত। যেখান দিয়ে একটি মানুষ অনায়াসে গলে যেতে পারে। আর সেই গর্তে নামার জন্যে একটি চেনও রয়েছে দেখলাম। আমরা সেই চেন ধরে ঝুলে পড়লাম। তারপর এক এক করে চারজনেই নেমে এলাম একটি প্রশস্ত চত্বরে। বুঝলাম যে জায়গাটা

য়ে আমরা ঝুলে নামলাম ওইখান দিয়েই জলটাকে টেনে নেওয়া হয়েছে। এখন ওই াইপের মুখ এঁটে দিলে ঝরনার জলকে আবার ধরে রাখা যাবে। অথবা আর কোনও াইপের সাহায্যে এখান দিয়েই জল সরবরাহ করে জলাটিকে জলপূর্ণ করা যাবে।

যাই হোক। যেখানে আমরা নামলাম সে জায়গাটা এমনই সুসজ্জিত যে তাকে ানেকটা রেডিওর স্টুডিও বা জাহাজের কেবিনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মনে হল ঝন কোনও পাশ্চাত্য দেশে এসে হাজির হয়েছি। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য, এইরকম দুর্ভেদ্য াহাড় জঙ্গলের দেশে এমন গোপন স্থানে সুপরিকল্পিত উপায়ে এই সব করল কে?

এখানে দুপাশে মুখোমুখি অনেকগুলি ঘর। মধ্যে দালানের মতো লম্বা একটি পাথর সটিং পথ। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে কি করব ভাবছি। এমন সময় শোনা গেল, "আপনারা াচ নম্বর ঘরের সামনে চলে যান। ওখানেই আমি থাকি। তার আগে আপনারা খাওয়া াওয়া সেরে নিন। রুম নাম্বার সেভেনে চলে যান আপনারা। ওখানে আপনাদের খাবার বডি। খেয়ে দেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে আমার সঙ্গে কথা বলবেন।"

আমরা নীরবে রুম নাম্বার সেভেনে চলে গেলাম।

তারপর হাতল ঘুরিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখলাম একটি বামনাকৃতি চীনা ামাদের অভ্যর্থনা জানাল। তাকে দেখা মাত্রই চমকে উঠলাম। কোথায় যেন দেখেছি একে। নে করেও মনে করতে পারছি না। চীনাটা হেসে আবার আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। তবে থা বলল না। আর আশ্চর্য! হ্যাঁ, আশ্চর্য এই যে লোকটির চোখে পলক পড়ে না। মড়ার তো স্থির তার চোখ দুটো। এইবার একটু একটু করে মনে করতে পারলাম, হ্যাঁ গত সন্ধ্যায় যই মানুষকেই আমরা দেখেছিলাম। তবে এই চেহারায় নয়। এক ভয়ঙ্কর অতিমানুষ হসেবে।

সেই কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেলাম, "না না। ভয় পাবেন না। আসলে লোকটি কথা লতে বা চোখের পাতা ফেলতে পারে না। কেননা একশো বছর আগে ও মারা গেছে তা।"

আমাদের তো দম বন্ধ হবার উপক্রম। বলে কি! একশো বছর আগে মারা গেছে লাকটি! তাই যদি যাবে তাহলে আমাদের সামনে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? এই াঁড়িয়ে থাকার মানেটা কি?

মাসেনু ক্ষিপ্ত হয়ে হঠাৎ তাঁর রিভলবার উঁচিয়ে লোকটিকে গুলি করতে উদ্যত লেন। যেই না হওয়া অমনি এক ঝটকায় কে যেন রিভলবারটা ছিনিয়ে নিল তাঁর, হোয়াট ননসেন্স! কি করতে যাচ্ছিলেন? এতটুকু বুদ্ধি নেই? জানেন এই লোকটাকে কত ষ্ট করে পিকিং থেকে এখানে নিয়ে এসেছি? ডঃ সাভান্টোর চেম্বারে আরকে ডোবানো ছল লোকটি। আমি ওকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি। এখানে কোনও জিনিসের এতটুকু ক্ষতি রবার চেষ্টা করলে বাঁদর হনুমান করে জঙ্গলে ছেড়ে দেব।

একটা হিম স্রোত যেন বয়ে গেল আমাদের শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে।

একি শুনছি আমরা? বাঁদর হনুমান করে ছেড়ে দেবে জঙ্গলের মধ্যে? অথচ এই র্বশক্তিমানের অসাধ্য কিছু আছে বলে তো আমার মনে হয় না! কিন্তু এই মারাত্মক শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে আর কখনও কি বাইরের জগতে ফিরতে পারব? আর কি আমরা সেবন করতে পারব প্রকৃতির মুক্ত বায়ু? আর কি দেখতে পাবো চাঁদের আলো, সূর্যের

কিরণ? বেশ তো ছিলাম। কেন মরতে এলাম এখানে?

কণ্ঠস্বর এবার ক্রুদ্ধ এবং গম্ভীরভাবে বলল, "আর আমি আপনাদের একটুও বিশ্বাস করতে পারছি না। যার কাছে যা কিছু আছে অস্ত্রশস্ত্র সব নামিয়ে রাখুন।" তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আপনার ক্যামেরাটাও নামিয়ে রাখুন। ওটার আর দরকার নেই। নিন খাবার টেবিলে বসে খেয়ে নিন আপনারা।"

আমরা তাঁর নির্দেশ মতোই ক্যামেরা পিস্তল রিভলবার সব কিছু টেবিলে রেখে খেতে বসলাম। অধৈর্য মিঃ মাসেনুর দুর্বুদ্ধির জন্যই আমাদের আত্মরক্ষার একমাত্র অবলম্বনকেও হাতছাড়া করলাম আমরা।

ডাইনিং টেবিলে চেয়ার টেনে নিয়ে খেতে বসলে চীনাটা নিজে হাতে খাবার পরিবেশন করতে লাগল আমাদের।

আমরা নীরবে দমভর নানারকম সুখাদ্য খেয়ে মুখ হাত ধুয়ে যখন খাবার ঘর থেকে বিদায় নিলাম তখন চীনাটা আবার আগের মতো স্মিত হেসে বিদায় অভিনন্দন জানাল আমাদের।

আমরা রুম নাম্বার সেভেন থেকে বেরিয়ে রুম নাম্বার ফাইভের সামনে দাঁড়ালাম। দরজার মাথায় রেড লাইট জ্বলছে দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর নীল আলো জ্বলে উঠল। অর্থাৎ ভেতরে যাবার সংকেত।

আমরা ভেতরে ঢুকতেই দেখলাম এক অত্যন্ত রূপবান সুদর্শন পুরুষ একটি উঁচু জায়গায় উচ্চাসনে রিভলভিং চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর খস খস করে কী যেন লিখছেন। তাঁর সামনের সারিতে কতকগুলি দামী দামী গদি আঁটা চেয়ার রয়েছে দেখলাম। উনি লেখা না থামিয়ে মুখ না দেখেই ইঙ্গিতকে আমাদের বসতে বললেন।

আমরা চারজন যেই না হেলান দিয়ে চেয়ারের ওপর বসেছি অমনি চেয়ারে লাগোয়া দুটো করে লোহার হাত আমাদের শক্ত করে টিপে ধরল।

আমি সভয়ে বলে উঠলাম, "একি! এরকম হয়ে গেল কেন?"

এইবার উনি মুখ তুলে তাকালেন আমাদের দিকে। তারপর হেসে বললেন, "আপনারা এখানে বরাবরের জন্যই বন্দি হলেন।"

"তার মানে! এইভাবে আমাদের আটকে থাকতে হবে নাকি সারা জীবন?"

"না না। সব সময় নয়। যখন আমার সামনে বসে আমার সঙ্গে কথা বলবেন আপনারা শুধু তখনই এইভাবে বন্দি হতে হবে আপনাদের। অন্য সময় ছাড়া থাকবেন।"

আমার চোখে জল এল, শুধু আমার কেন আমাদের প্রত্যেকেরই চোখ ছল ছল করছে। ভয়ে বিবর্ণ মুখ। বোকার মতো ধরা দিয়ে ভুল করেছি আমরা। জেনে শুনে যখন বিষের পাত্রে চুমুক দিয়েছি তখন গরল আমাদের হজম করতেই হবে।

সাত

এইভাবে অনেক সময় কেটে গেল। আমরা ক্রমশই অধৈর্য হয়ে উঠছি। অথচ করার কিছু নেই। কেননা যে সাংঘাতিক লোকের খপ্পরে আমরা এসে পড়েছি তার থেকে উনি নিজে মুক্তি না দিলে মুক্তি পাবার আশা শুধুই দুরাশা মাত্র। অতএব বোকার মতো বসে বসে স

কিছু দেখছি। গম্ভীর মানুষটিও একমনে তাঁর কাজ করে চলেছেন।

রাত তখন একটা।

হঠাৎ বুঝি খেয়াল হল মানুষটির। বললেন, "আরে! আপনাদের আমি বসিয়ে রেখেছি না? ভারি লজ্জার কথা। কোথায় একটু আলাপ সালাপ করব, তার জায়গায়, ছিঃ ছিঃ।" বলে লেখা ফেলে উঠে পড়লেন তিনি। তারপর আবার বললেন, "শুনুন। আপনারা যাই মনে করুন না কেন, আপনাদের চারজনকে আমার দরকার। এবং মেহতাজীর ব্রেনটা আমাকে নিতেই হবে। আমি একজন বৈজ্ঞানিক হয়ে আর একজন বৈজ্ঞানিকের এই পরিণতির কথা ভাবতেই পারি না। তবুও একাজ আমাকে করতেই হবে। আশা করি যা আমি করতে চলেছি তা যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে মিঃ মাসেনু এবং মেহতাজী আমার এই সাফল্যের জন্য চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। দেশ বিদেশে যখন আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে তখন সহযোগী হিসেবে আপনাদের নামও ছড়িয়ে পড়বে লোকের মুখে মুখে।"

আমরা চারজনেই সভয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি এবার অরোরা এবং আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারাও আমার কাজে লাগবেন। অবশ্য আপনারা স্বেচ্ছায় রক্ত দান করলে আমি আপনাদের এখুনি ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু তা হলে হবে কি আপনারা থানা পুলিশ করে একটা বিরাট হইচই বাধিয়ে এমন কাণ্ড ঘটাবেন যে আমার সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে এবং এত কষ্টে গড়ে তোলা এই ঘাঁটিটাও নষ্ট হবে।"

আমি বললাম, "দেখুন, এ পর্যন্ত আপনার ক্ষমতার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে আপনি যে একজন বাজে লোক নন তা প্রমাণ হয়ে গেছে। যে অসাধারণ শক্তি আপনি সঞ্চয় করেছেন তা আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। আপনার বিজ্ঞান চর্চার যে কোনও সৃষ্টিমূলক কাজে আমি যদি এতটুকুও লাগতে পারি তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব। যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে কাগজ কলম নিয়ে আসুন, আমি স্বেচ্ছায় আত্মদানের কথা লিখে দিচ্ছি। মৃত্যু তো যে কোনও সময় হবেই। তাই মরতে আমি পাই না। তবে মরবার আগে জানতে চাই আপনি কী করতে চান।"

অরোরা বলল, "তাহলে আমিই বা বাকি থাকি কেন? আমিও মরতে চাই। কাগজ নিয়ে আসুন আমিও লিখে দিচ্ছি।"

তিনি বললেন, "আপনারা অভিনয় করছেন না তো আমার সঙ্গে?"

আমি বললাম, "না। তার কারণ আমরা আপনার কার্যকলাপ দেখে আগেই অনুমান করেছিলাম এখানে আশেপাশে কোথাও কোনও বিজ্ঞানী অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য নিশ্চয়ই কোনও গবেষণা করে যাচ্ছেন। তাই তাঁকে দেখব এবং জানব বলেই আমরা চারজনে এই জঙ্গলে কাউকে কিছু না জানিয়ে প্রবেশ করেছিলাম। অন্য কেউ হলে বুধন সর্দারের মৃত্যু রহস্যটা চাপা না দিয়ে রীতিমতো পুলিশ নিয়ে বন তোলপাড় করে ফেলত। যদিও তাতে লাভ হোত না কিছু। কেননা আপনার ঘাঁটিটা এমনই সুরক্ষিত যে এর প্রবেশ পথ জানা না থাকলে হাজার চেষ্টা করেও কেউ বার করতে পারত না।"

মিঃ মাসেনু বললেন, "যাক। ওসব কথা থাক। আমার এবং মিঃ মেহতাজীর ব্রেনটা যদি আপনার কোনও মহৎ সৃষ্টির কাজে লাগে তো লাগুক না। শুধু আপনার কেন, আমাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গও অন্যের কাজে লাগাতে পারেন। তবে আপনার

কাজের ধারাটা কি তা একবার আমাদের জানা দরকার।"

তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্যুইচ টিপতেই আমরা বন্ধনমুক্ত হলাম।

এবার তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "আমি জানতাম আপনারা রাজি হবেন। তবে আমিও বেইমানি করব না। আমার সাফল্যের সঙ্গে আপনাদের অবদানের কথাও আমি বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেব।"

মিঃ মাসেনু বললেন, "আগে আপনার কাগজ নিয়ে আসুন। আমাদের স্বীকৃতিটা লিখে দিই।"

"আরে মশাই ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? দেবেন দেবেন। পরে দেবেন। এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আজ আপনারা বিশ্রাম করুন। কাল সকালে আমি অপারেশন করব। তখনই দেবেন। তার আগে চলুন আমার ল্যাবরেটারিটা একটু দেখিয়ে আনি।"

আমি বললাম, "জাস্ট এক মিনিট। একটু জল পাওয়া যেতে পারে?"

"অফকোর্স। জল পাবেন না এটা কি একটা কথা হল। যান। রুম নাম্বার সেভেনে চলে যান। আচ্ছা দাঁড়ান। আপনাকে যেতে হবে না। আমিই ডাকছি লোকটাকে।"

"ও না না। তার দরকার নেই। এখানে যখন থাকবই তখন নিজেই গিয়ে খেয়ে আসছি।"

"তাহলে খুব ভাল হয়। নাহলে ও আসবে। ওকে বলব। ও আবার গিয়ে জল নিয়ে আসবে। তাতে দেবি হবে। তার চেয়ে নিজে গিয়ে খেয়ে আসাটাই ভাল।"

আমি দ্রুত সাত নম্বর ঘরের কাছে চলে গেলাম। তারপর দরজায় নক করে ঠেলে ঢুকতেই দেখলাম চীনাটা স্মিত হেসে অভিবাদন জানাতে এগিয়ে আসছে।

"প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অব ওয়াটার।"

লোকটির আমার দিকে পিছন হয়ে জল আনতে চলে যেতেই চোখের পলকে আমাদের রেখে যাওয়া পিস্তল ও রিভলবারগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর মাসেনুর রিভলবার ও আমার পিস্তলটা সেফটি ক্যাচ এঁটে দু'পকেটে ভরে নিলাম। এরপর জল এলে খেয়ে ফিরে এলাম যথাস্থানে। বললাম, "চলুন। আপনার ল্যাবরেটারিটা দেখে আসি।"

উনি চললেন আগে আমরা পিছনে। তারই মধ্যে হাতের কারসাজি হয়ে গেল। আমি মাসেনুকে এক চোখ টিপে তার হাতে রিভলবারটা পাচার করে দিলাম। আমারটা আমার কাছেই রইল। তাঁর পিছু পিছু গিয়ে ল্যাবরেটারি রুমে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম। একি বিচিত্র কাণ্ডকারখানা হয়ে রয়েছে এখানে? একি কোনও স্বপ্নলোকে এসেছি? তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল। একটি মানুষ কী করে এই অসম্ভব কাণ্ড করতে পারেন? কত বিচিত্র রকমের যন্ত্রপাতি, অদ্ভুত অদ্ভুত আসবাব রয়েছে যে-এখানে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না।

মিঃ মাসেনু এবং মেহতাজী তো আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন।

আমারও আনন্দ কম হল না। শুধু কৌতূহল রইল ওনার গবেষণার বিষয়বস্তুটি কী তা জানবার জন্য।

আমি বললাম, "কিছু মনে করবেন না। এতক্ষণ আপনার এখানে আছি অথচ *আপনার নামটাই আমাদের জানা হয়নি।"*

"আমি কালপুরুষ। এছাড়া আর অন্য কোনও নামই আমার নেই।"

"আপনার গবেষণার বিষয়?"

"মন দিয়ে শুনুন। আপনারা হয়তো আমাকে পাগল বলবেন কিন্তু আমি এক অভূতপূর্ব গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার গবেষণার কাজে প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছে গেছি আমি। এবং বিশ্বাস করুন শতকরা নব্বুই ভাগই আমি কৃতকার্য।"

"কিন্তু কী নিয়ে গবেষণা করছেন আপনি?"

"আমি কালকে জয় করতে চাই। আগমে একটা কথা আছে, 'ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে বৈ সন্তি কলেবরে'। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে যা যা গুণ আছে তার সবই আছে আমাদের শরীরে। তাহলে তা যদি হয়, তবে সেই উপাদান দিয়ে আমাদের শরীরকে জরা ব্যাধি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা নিশ্চয়ই কঠিন কাজ নয়। শরীরকে ব্যাধি মুক্ত করার নানা রকম উপায় আমরা ইতিপূর্বেই আবিষ্কার করেছি। শুধু জরা ও মৃত্যুকে জয় করতে পারিনি। আমি সেই অসাধ্যকেই সাধন করেছি। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি মানুষের শরীরের গোটাকতক কলকব্জাকে ধরে নাড়া দিতে পারলে মানুষের বার্ধক্যকে এড়ানো যায়। এবং বার্ধক্য এসে গেলেও আবার তারুণ্যে পৌঁছানো যায়। আর প্রতি দশ ও বিশ বছর অন্তর যদি হৃদযন্ত্রটিকে বদল করে নতুন হৃদযন্ত্র বসানো যায় তাহলে কি মানুষ কি জন্তু সবাই বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে পারে।

আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলাম।

কালপুরুষ আবার বললেন, "অর্থাৎ শরীরের বিশেষ বিশেষ কলকব্জাগুলো সময় মতো নাড়াচাড়া করলে এবং দশ বিশ বছর অন্তর হৃদযন্ত্র পরীক্ষা করে বদল করলে, দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হয়ে এলে চোখ পাল্টে নতুন চোখ নিলে এবং নতুন রক্ত সংযোজন করলে, পূর্ণ যৌবন নিয়ে অমরত্ব লাভ করা সম্ভব।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "বলেন কী!"

মিঃ মাসেনু বললেন, "তার মানে একটি মানুষকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনেকগুলি মানুষকে জীবন দান করতে হবে?"

"তা হবে। তবে পরে একসময় হয়তো এমন এক উন্নত পর্যায়ে চলে যাব যখন তা আর করতে হবে না। তবে এখনও পর্যন্ত আমি সেই পর্যায়ে পৌঁছতে পারিনি। এবার শুনুন, মড়া মানুষকেও আমি জীবন্ত করতে পারি।"

"কী ভাবে?"

"বললেও বুঝতে পারবেন না। ফর্মুলাগুলো আমার বিরাট পেপারে লেখা আছে। ওই যে চীনাটাকে দেখলেন, আজ থেকে একশো বছর আগে লোকটা মারা গেছে। শরীরটা সযত্নে রক্ষিত ছিল। তাই ওর খোল নলচে সব কিছু বদলে আমার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ওকে বাঁচিয়ে রেখেছি। তবে ও নিজের বুদ্ধিতে কোনও কাজ কর্ম করতে পারে না। ওকে যা বলা হয় তাই ও করে। শুধু ওকে দিয়ে আমি কথা বলাতে পারি না। আর ওর চোখের পলক ফেলাতে পারি না।"

অরোরা বলল, "আপনার এ কাজ সত্যিই প্রশংসনীয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম কখনও সম্ভব হয়নি।"

কালপুরুষ বললেন, "এটা আমার প্রথম পদক্ষেপ। এভাবে হয়তো পৃথিবীশুদ্ধ লোককে বাঁচানো যাবে না। তা সম্ভবও নয়। কিন্তু আমার ফর্মুলা ফলো করে আমার

পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা হয়তো একদিন এমন স্তরে পৌঁছবেন যেদিন কোনও মানুষকেই মরতে দেবেন না তাঁরা। আপাতত আমি যা করেছি তাতে দু'একজন মানুষকে এই পদ্ধতিতে যুগ যুগান্তর বাঁচিয়ে রাখা হবে। এই আবিষ্কার এর আগে যদি আর কেউ করতে পারত তাহলে আজ আমরা বুদ্ধকে, বিবেকানন্দকে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সবাইকে জীবিত দেখতে পেতাম। ভেবে দেখুন তো কি দারুণ ফ্যানটাস্টিক ব্যাপার হত তাহলে!"

আমি বললাম, "তা হত। কিন্তু তাদের ব্রেনটা কি কাজ করতে পারত? বুদ্ধের মাথায় যদি বুধন সর্দারের ব্রেন প্রয়োগ করতেন, রবীন্দ্রনাথের মাথায় যদি আমার ব্রেনটা বসত তাহলে লাভ কি হত? শেষ জীবনে নজরুলের যে দশা ঘটেছিল সেই দশা ঘটত না কি?"

"তা অবশ্য ঘটত। কারণ তাঁর দৃষ্টি শক্তি, হার্ট, ব্রেন এমন কি রক্তটি পর্যন্ত অন্যের দেহ থেকে নিতে হত। তবু মানুষটাতো থাকত।"

"তা থাকত। আচ্ছা আপনি কাল রাত্রে সর্দারকে বা আজ মীনোহাদামকে নৃশংসভাবে খুন করলেন—এর পিছনে আপনার কি উদ্দেশ্য আছে?"

"এ পর্যন্ত আমি খুব কম করেও শতাধিক খুন করেছি। উদ্দেশ্য ওই একটাই। সহস্রাধিক বা লক্ষাধিক লোককে যাতে ভবিষ্যতে মরতে না হয়। আমি নিজের চেষ্টায় সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ সৃষ্টি করতে চলেছি। আর সেইজন্যেই আমি মিঃ মাসেনু এবং মেহতার ব্রেন চাইছি। যাতে আমার সৃষ্ট মানুষ পরবর্তী যুগে আমার ফর্মুলা অনুযায়ী কাজ করতে পারে বা আমাকেও বাঁচিয়ে রাখতে পারে। ও আমাকে বাঁচাবে। আমি ওকে বাঁচাব।"

মিঃ মাসেনু বললেন, "আর মরব আমরা।"

কালপুরুষ সে কথা শুনেও না শোনার ভান করে বললেন, "এবার আমার আরও বিস্ময়কর অবদানের কথা বলি। বহির্ভারতের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকরা প্রায় সকলেই আমাকে এই ব্যাপারে নানা উৎসাহ দিয়েছেন। আমার এই যে ঘাঁটিটা দেখছেন এ সবই তাঁদের অনুদানে সম্ভব হয়েছে। ওই ঝরনা এবং জলাধার দুটোই আমার সৃষ্টি। মাটির নীচে থেকে পাম্পের সাহায্যে জল তুলে সেই জল ঝরনার আকারে বার করে কৃত্রিম ঝরনার সৃষ্টি করেছি। পাথরের খাঁজে খাঁজে সেই জলের পাইপগুলো এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছি যাতে কারও নজরে পড়বে না। ওই কৃত্রিম জলাধারে ওই জল গড়িয়ে এসে পড়ে। এখানে আসার সময় যে পাইপ দেখলেন তার মুখটা বন্ধ করে রাখি বলে জল ওইখানে আটকে থাকে। অবশ্য পাছে উপচে না পড়ে সেজন্য মাঝে মাঝে জল কমিয়েও দিই। ওই পাইপের ভেতর দিয়েও নতুন জলে জলাটাকে ভরিয়ে দেওয়া যায়। যে উপায়ে আপনারা হঠাৎ জল বেড়ে যেতে দেখেছিলেন।"

আমি বললাম, "সত্যি! আপনার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করে পারছি না।"

"প্রশংসা করতেই হবে। তবুও ওটা তো কোনও আবিষ্কার নয়। ও একটু বুদ্ধি খরচ করলে যে কেউ যে কোনও জায়গায় করতে পারে। হয়তো করেওছে কেউ কেউ। কিন্তু আমার ওই আবিষ্কারের কথা বলছি না।"

"তবে?"

"আমি শরীর থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারি।"

"বলেন কী?"

"এবং তখন আমি প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হই।"

"কীরকম?"

"আমার দেহটা নিশ্চল পড়ে থাকে এবং আত্মাটা দেহ ছেড়ে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে অনেক কিছু করতে পারে। আমি তখন বায়ু তরঙ্গে ভেসে খুব কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর যে কোনও মহাদেশ থেকে ঘুরে আসতে পারি। আমি তখন ঝড় হতে পারি। পাহাড় উল্টে দিতে পারি। দেখলেন তো কাল রাতে আমি কীরকম মিঃ অরোরার বাংলোয় গিয়ে লোহার রডটা বেঁকিয়ে দিয়ে এলাম? দেখলেন তো আজ রাত্রে আমি কীভাবে গাছগুলো উপড়ে আপনাদের কোণঠাসা করে দিলাম? অত বড় পাথরটাকে কীভাবে সরিয়ে ফেললাম অতি সহজে?"

"হ্যাঁ দেখলাম। খুবই অভিনব ব্যাপার।"

"আমার কাছে ওটা মোটেই অভিনব নয়। এরকম বিদ্যা ভারতীয়রা এর আগেও জানতেন। তাকে অবশ্য তখন বিজ্ঞান বলা হত না। বলা হোত যোগ। শঙ্করাচার্যের জীবনী পড়েননি? ১৯৬১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর রবিবারের আনন্দবাজার পত্রিকার একটা কপি যদি জোগাড় করতে পারেন তাতে দেখবেন ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন লেখক 'মহাকবি অমরু' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে উনি লিখেছেন জগৎগুরু শঙ্করাচার্য মন্ডন মিশ্রর স্ত্রীর সাথে বাদানুবাদে পেরে না উঠে যোগবলে নিজ দেহ ত্যাগ করে মৃত রাজা অমরুর দেহে নিজ আত্মাকে প্রবিষ্ট করান এবং তারপর তাঁর ঈপ্সিত জ্ঞান অর্জন করে আবার দেহ মুক্ত হয়ে স্বদেহে নিযুক্ত হন। এও ঠিক সেই রকমই ব্যাপার।"

আমরা হতবাক।

"আর ওই যে বড় বড় কাচের পাত্রে ওষুধগুলো দেখছেন ওগুলোই আসলে আমার প্রধান আবিষ্কার। ওই ওষুধে ইনজেকশনের প্রভাবে আমি মানুষকে জন্তু করতে পারি। একটি মানুষকে দানবে রূপান্তরিত করতে পারি। তবে তার মেয়াদ চার থেকে পাঁচ ঘণ্টার বেশি নয়। মানুষ জন্তু হয়ে গেলে পুনরায় ইনজেকশন না দেওয়া পর্যন্ত সে আর মানুষে রূপান্তরিত হবে না। তবে মানুষ দানব হলে অর্থাৎ শরীরের ফর্মটা বদল না হলে চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই সে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। কাল নরদানর রূপে ওই চীনাটাকেই আপনাদের দেখিয়েছিলাম। এবং গাড়ির হেড লাইট জ্বেলে তাকে ফিরে আসার সংকেত দিয়েছিলাম। আজও তো একটা বেড়ালকে অতিকায় বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর করে তুলেছিলাম। শুধু আপনাদের গুলিতে তার মৃত্যু ঘটায় নির্ধারিত সময়ের আগেই সে তার ফর্মে ফিরে এসেছিল।"

আমি বললাম, "যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনার দেহান্তরিত হওয়া ব্যাপারটা আমাকে দেখাবেন? আমি ঠিক ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারছি না।"

"নিশ্চয়ই দেখাব। ও আর এমন কি ব্যাপার! আমি তো দেখাতেই চাই। আসুন, এদিকে আসুন—" বলে এক জায়গায় একটা চেয়ারে বসে পড়লেন উনি। চেয়ারের সঙ্গে চামড়ার বেল্ট লাগানো ছিল। সেটা এঁটে নিয়ে বললেন, "দেখুন কেমন করে দেহমুক্ত হই। দশ মিনিটের জন্য হচ্ছি কিন্তু। বলে একটা স্যুইচ টিপতেই বেলটের ওপর যে লোহার পাতটা ছিল সেটায় লাল আলো জ্বলে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে নির্জীব হয়ে উঠলেন কালপুরুষ। আমাদের পিছনে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "এই দেখুন আমি এখানে। এই আমি চলে যাচ্ছি। আপনাদের অনুচর মীনোহাদামের দেহটা আমি এখুনি এখানে নিয়ে

আসব। তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।"

যেই না কণ্ঠস্বর বাইরে চলে গেল অমনি অরোরা আমাদের কিছু বুঝতে না দিয়েই কালপুরুষের দেহটার ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর তাকে চেয়ারসুদ্ধ টেনে এনে মারল এক আছাড়। অমনি কয়েকটা তারে টান পড়ল। এবং একটা বিশেষ তারের কানেকশান কেটে যেতেই এক পরিত্রাহি চিৎকার শোনা গেল, "এই! এই! কী করছেন। আপনাদের মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? শিগগির ওটা প্লাগ নম্বর টুয়লেভ-এ জুড়ে দিন। নাহলে আমি শক্তিহীন হয়ে পড়ব। আমি আর কোনওদিন নিজের শরীর ফিরে পাব না। মিঃ মাসেনু! প্লিজ, আমি আপনাদের পায়ে ধরছি। আমি কথা দিলাম আপনাদের চারজনকেই আমি মুক্তি দেব। আর এক মুহূর্ত দেরি করবেন না প্লিজ।"

আমি বললাম, "আপনি যতই কথা দিন। আপনাকে আর ফিরতে দিচ্ছি না। কারণ শতাধিক খুন যে-মানুষ করতে পারে তার খরচের খাতায় আরও চারটে প্রাণ যোগ করতে একটুও হাত কাঁপবে না।"

অরোরা ততক্ষণে দক্ষযজ্ঞ লাগিয়ে দিয়েছে। যেখানে যা কিছু ছিল সব ছিঁড়ে একশা করে ফেলল। বড় বড় কাচের পাত্রে ওষুধপত্তর যা কিছু ছিল সব নষ্ট করল।

মাসেনু গুলির পর গুলি করতে লাগলেন কালপুরুষের দেহটা লক্ষ্য করে।

এবার আমাদের পালানোর পালা। এবার আত্মরক্ষা করতেই হবে। আমরা ছুটতে ছুটতে সেই জলাধারের পথে গিয়ে দেখলাম সে পথ রুদ্ধ। অর্থাৎ এখান দিয়ে পালানো যাবে না। কারণ জলাধার আবার জলে ভরে গেছে। আমরা পাইপের মুখ ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। তখন শুরু হল আবার ছুটোছুটি।

কেননা অ্যাসিড বালব বার্স্ট করে ঘরের ভেতরে আগুন লেগে গেছে। শুধু তাই নয়, উন্মত্ত উত্তেজনায় অরোরা এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে যে শর্ট সার্কিট হয়ে বসে আছে চারদিকে। ল্যাবরেটরিময় দুম-দাম শব্দ। আর একটু দেরি করলে ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ভেতরের সব আলো নিবে গেছে।

টর্চের আলোয় পথ দেখে চারদিকে ছুটোছুটি করতে করতে এক জায়গায় কয়েক ধাপ সিঁড়ি আমরা দেখতে পেলাম। এটাও নিশ্চয়ই বাইরে যাবার পথ। সেই পথে সন্তর্পণে এগিয়ে যেতেই পেয়ে গেলাম একটি গুহামুখ। গুহামুখের বাইরে আসতেই প্রকৃতির আলো বাতাসের স্পর্শ পেলাম। এতো সেই গুহা। যার মুখের সামনে সুবৃহৎ প্রস্তরের দেয়াল আড়াল করা। এই রুদ্ধ দ্বার খুলল কে? কে সরাল পাথরটাকে?

মাসেনু বললেন, "কালপুরুষই সরিয়েছেন। মীনোহাদামের দেহটা আনতে গিয়ে এটা তাকে বাধ্য হয়েই সরাতে হয়েছিল। তারপর বিপদে পড়ে তাড়াতাড়ির মাথায় এটাকে আর রুদ্ধ করার কথা মনে হয়নি। ভাগ্যে করেননি। না হলে এই গুপ্ত কক্ষেই আমাদের কবর তৈরি হত! যাক খুব জোর বেঁচে গেলাম এ যাত্রা।"

আমরা চারজনেই লক্ষ্য করলাম একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি আর আগুনের হল্কা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে গুহামুখ থেকে। এবার হয়ত প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে। আমরা আর এক মুহূর্ত সেখানে না দাঁড়িয়ে এগিয়ে চললাম নিরাপদ স্থানের দিকে। রাত এখন তিনটে। আশা করি ভোরের আগেই আমরা অরোরার বাংলোয় পৌঁছতে পারব।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

এর ঠিক দু'বছর পরের কথা।

মিঃ মাসেনুর কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। সাংঘাতিক চিঠি। সেই চিঠিতে তিনি পরিষ্কার লিখেছেন 'আবার কালপুরুষের' আবির্ভাব হয়েছে। যেহেতু ওর ধ্বংসের মূলে আমরাই অতএব সাবধান।

আবার কালপুরুষ?

কথাটা বিস্ময়করই বটে। অথচ মিঃ মাসেনুর যে চিঠিটা আমার টেবিলের ওপর পড়ে আছে সেটা তো মিথ্যে নয়।

মিঃ মাসেনুর এই চিঠিটা পেয়ে কেন জানি না এক বিপদাশঙ্কায় মনটা আমার ভরে উঠেছে। কালপুরুষ যদি আবার জেগে ওঠে তাহলে? তাহলে আর কিছু হোক বা না হোক আমাদের চারজনের অবস্থা সত্যিই খারাপ করে ছাড়বে, কিন্তু কেমন করে এবং কীভাবে সে জাগল? তার বেঁচে ওঠার কোনও সম্ভাবনাকেই তো আমরা রেখে আসিনি। এমনকি তার কোনও অস্তিত্বকেও নয়। তবুও কালপুরুষ জেগে উঠল? এ জগতে অসম্ভব বলে কি কিছুই নেই?

এই একই চিঠি শুধু আমার কাছে নয় আমার বন্ধু অর্বুদ সিং অরোরা এবং গুজরাটের সুপ্রসিদ্ধ ভূবিজ্ঞানী মিঃ ওয়াই. ভি. মেহতাজীর কাছেও পাঠিয়েছেন মিঃ মাসেনু। রেফারেন্স হিসেবে সে কথাও এই চিঠিতে জানিয়েছেন তিনি।

অফিস থেকে ফিরে চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনের ভেতরটা কিরকম যেন তোলপাড় করতে লাগল। তার কারণ কালপুরুষ এক বিকৃত মস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিক। তার থিয়োরি হয়তো অভিনব কিন্তু তা মানুষের ভাল কাজের চেয়ে মন্দ কাজেই লাগবে বেশি। এবং সে যদি জেগে ওঠে তাহলে তার কর্মপন্থা যে কিরকম হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাই মিঃ মাসেনুর আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেননা কালপুরুষ অসাধারণ শক্তির ধারক। তার কোনও কিছু করবার এতটুকু ক্ষমতা থাকলে সে প্রথমেই বিনাশ করবে আমাদের। আমরা যেভাবে তার দীর্ঘদিনের সাধনার ক্ষেত্রকে ধ্বংস করে এসেছি বা তারও বিনাশ ঘটিয়েছি তাতে প্রতিশোধ না নিয়ে সে-ই বা ছাড়বে কেন?

কিন্তু কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না এই অসম্ভব কী করে সম্ভব হল। তাহলে কি কালপুরুষ মরেনি? আমরা তার মৃত্যু তো দেখিনি। চারদিক ধ্বংস হতে দেখে এসেছিলাম শুধু। কিন্তু না। মৃত্যু না দেখলেও কালপুরুষের দেহটার ওপর মিঃ মাসেনু গুলির পর গুলি তো করেছিলেন। তাহলে? যাই হোক, চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী মিঃ মাসেনু আগামীকাল আসবেন।

মেহতাজীকে কল করা হয়েছে।

অরোরা হয়ত আসতে পারবে না।

আমাকে থাকতেই হবে।

অনেক কষ্টে ভয়ে ভয়ে রাতটা কাটালাম। খুব ভোরেই ঘুমটা ভাঙল। চারদিকে আবছা অন্ধকার। এই সময় ঘুম থেকে উঠে স্টোভে চা বসিয়ে অকারণেই ছাদময় পায়চারি করতে লাগলাম।

আমার ঘরের সামনেই একটি খেজুর বাগান আছে। শেষ রাতের চাঁদ খেজুর পাতার আড়ালে তখনও উজ্জ্বল কিন্তু এই উজ্জ্বলতা অন্যদিনের মতো আমার মনকে তেমন দোলা দিতে পারল না। মনে আমার একটাই আতঙ্ক—আবার কালপুরুষ।

মাসেনু এলেন বেলা ঠিক দশটার সময়। কোন গাড়িতে কিভাবে এলেন কিছুই বললেন না। তাঁর আবলুস কাঠের মতো কালো চেহারার ওপর কয়লা পোড়া মুখ দেখে দারুণ উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ বলে মনে হল। অবশ্য এ রাগ যে কার ওপর তা জানি। আর এও জানি অসম্ভব জেদী, একরোখা এবং অসম সাহসী এই মানুষটি ক্ষেপলে কারও রক্ষে নেই। জগতের ব্রিলিয়ান্ট মানুষরা কি এইরকমই হন? যাই হোক, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষটিকে দেখলে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে আসে।

মিঃ মাসেনু এসে শুধু একটা কথাই বললেন, "না উত্তরম আন্দিনদেণ্ডি? অর্থাৎ আমার চিঠি পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ। কাল পেয়েছি।"

"না কোড়া মিরু অস্তাবাণ্ডি?" অর্থাৎ আপনি কি যেতে পারবেন আমাদের সঙ্গে?

"পারব। কোথায় যেতে হবে বলুন?"

"গিরিডিতে।"

"কত দিনের জন্য?"

মাসেনু এবার মাতৃভাষা ছেড়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "তা কি করে বলি বলুন? গড নোজ।"

"কখন যাবেন?"

"আজই রাতের গাড়িতে। তার আগে ওরা আসুক।"

মাসেনু অন্ধ্রের লোক। চায়ের থেকে কফি খুব পছন্দ করেন। তাই আমি ওনার জন্য কফি তৈরি করতে লাগলাম। এ বাড়িতে আমি একাই থাকি। কাজের লোক বলতে একমাত্র বাসন মাজার একজন মহিলা ছাড়া আর কেউ নেই।

আমি বললাম, "মিঃ মাসেনু, আমি বৈজ্ঞানিক নই। বিজ্ঞানও বুঝি না। কিন্তু একটা জিনিস বুঝি, যাহা সৃষ্ট হয় তাহাই ধ্বংস হয়। আবার যাহা ধ্বংস হয় তাহা অনুরূপ সৃষ্ট হয় না। এই ফর্মুলাকে যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে ধারণা করতে পারি যে একদিন এই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা সব কিছুই ধ্বংস হবে। তেমনি মৃত্যু এসে যদি দেখা দেয় অর্থাৎ জীবদেহ থেকে প্রাণবায়ু যদি একবার বেরিয়ে যায় তাহলে সেই প্রাণকে আবার ওই দেহে ফিরিয়ে আনা একটা অসম্ভব ব্যাপার—এও আমরা বিশ্বাস করি। কেননা মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার কৌশল যদি আমাদের জানা থাকত তাহলে দেশের খ্যাতনামা সবাইকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম। তা যখন পারিনি তখন মৃত কালপুরুষের জীবিত হওয়ার ব্যাপারটাও অবাস্তব নয় কি? আমার মনে হয় কোথাও একটা দারুণ ভুল হচ্ছে আমাদের।"

মাসেনু বললেন, "না মাটা উয়েনাণ্ডি (তাহলে শুনুন), বিজ্ঞানে যেমন অসম্ভব বলে কিছু নেই তেমনি আমাদের দেশের বেদ, পুরাণ ইত্যাদিও বিজ্ঞান ছাড়া নয়। প্রাচীন মত কি বলছে? আত্মার বিনাশ নেই। কিন্তু দেহ নষ্ট হয়। তাই স্ট্রাকচারটা একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত চালানো যায় মাত্র। তার বেশি নয়। ঘড়ি, রেডিও, ক্যামেরা ইত্যাদির মতো। দেহটাও তেমনি। এটি নষ্ট হয় এবং আত্মাটা তখন বাধ্য হয় অন্য শরীরের আশ্রয় নিতে। এই মত অবশ্য আপনি বিশ্বাস করতেও পারেন নাও পারেন। তবে শঙ্করাচার্যের কাহিনী মনে আছে নিশ্চয়ই। যোগ বলে যেমন তিনি দেহান্তরিত হয়ে রাজা অমরুর দেহে প্রবেশ করেছিলেন তেমনি সেইরকম শক্তির প্রভাব কালপুরুষের মধ্যেও স্মরণ করুন। আমরা যখন তাঁকে বিনাশ করছিলাম তখন কিন্তু তিনি তাঁর বিস্ময়কর শক্তির প্রভাবে দেহ ছেড়ে মীনোহাদামের দেহটা বয়ে আনতে গিয়েছিলেন মনে পড়ছে?"

আমি সভয়ে বললাম, "হ্যাঁ, তাই তো!"

"তাহলে কালপুরুষের কোন ক্ষতিটা করলাম আমরা? পড়ে থাকা রক্তমাংসের স্ট্রাকচার বা দেহটার ওপর গুলি করে কালপুরুষের আধারটাকে আমরা নষ্ট করতে পেরেছি। কি ্র কালপুরুষকে তো নয়।"

"কিন্তু মিঃ মাসেনু, কল্পনাটা একটু অবাস্তব হয়ে যাচ্ছে না কি?"

"হয়তো। তবে দেহমুক্ত কালপুরুষের সেই কণ্ঠস্বর যখন ইথার তরঙ্গে ভেসে আসছিল তখন তো আপনি ঘটনাস্থলেই ছিলেন। ব্যাপারটা কি তখন একটুও অবাস্তব মনে হচ্ছিল?"

"না?"

"তাহলে?"

আমি চুপ করে রইলাম।

মাসেনু বললেন, "আসলে শঙ্করাচার্যর ঘটনার নাম যোগ, কালপুরুষেবটা বিজ্ঞান। অর্থাৎ যোগও বিজ্ঞান ছাড়া নয়।" এরপর একটু থেমে মাসেনু আবার বললেন, "এ জগতে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। বুঝেছেন? একটি পুরুষ নারী হতে পারে, একটি ঘোড়ার ডানা গজাতে পারে, একটি কাদার তাল নির্মাণ কৌশলে দুর্গা প্রতিমা হতে পারে, একটি মানুষেব কণ্ঠস্বর চিরকালের জন্য একটি ক্যাসেটের মধ্যে ধরে রাখা যেতে পারে এবং ছায়াছবির সাহায্যে পঞ্চাশ বছর আগে মৃত কোনও মানুষকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে কথা বলানো যেতে পারে। মোদ্দা কথাটা হল সবই সম্ভব। শুধু প্রয়োগ নৈপুণ্যের ফর্মুলাটা জানা চাই। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে ঘরে বসে যুদ্ধক্ষেত্রের সম্যক বর্ণনার ব্যাপারটা মহাভারতকারের উদ্ভট কল্পনা বলে মনে হয়েছিল এক সময়। কিন্তু পরে রেডিওর রিলে শোনার পর সেই সত্যকে আর অবাস্তব মনে হয়নি। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের ব্যাপারটাও আজকের টি.ভি. বিজ্ঞান চোখে আঙুল দিয়ে সত্য বলে প্রমাণ করেছে। সেকালের পুষ্পক রথকে আজকের উড়োজাহাজ এবং ইন্দ্রের বজ্রকে অ্যাটম বলে মনে করলে ক্ষতি কি? যাক। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমার মতে যা কিছু কল্পনায় আসতে পারে এ জগতে তাই সম্ভব। এমন কি একটি হাতিও হঠাৎ বাষ্পে পরিণত হতে পারে। আবার একটা পাহাড়ও বিশেষ রাসায়নিক প্রভাবে হয়ে যেতে পারে গভীর সমুদ্র।"

আমি বললাম, "মিঃ মাসেনু, আপনার মতো পণ্ডিত এবং বিশ্বাসী লোকের সংস্পর্শে

এসে আমার জীবন ধন্য হয়েছে। কিন্তু কালপুরুষের আবির্ভাবটা আপনি টের পেলেন কি করে?"

"সেই কথা বলব বলেই তো আমি আপনাদের সকলকে একসঙ্গে এখানে ডেকেছি। এবারে আর কোনওরকম সুযোগকেই হাতছাড়া করব না আমরা। কালপুরুষকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমি এসেছি। আপাতত গিরিডির একটি কয়লাখনির কাটা খাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে সে।"

"কিন্তু...!"

"কী করে জানলাম, এই তো?"

এমন সময় দরজায় টক টক শব্দ।

আমি বিজ্ঞানীও নই, কিছুই নই। এমন কি কোনও গুরুত্বপূর্ণ লোকও নই। অতএব আমার বাড়িতে কলিং বেলও নেই। দরজায় শব্দ করেই লোকে আমায় ডাকে।

উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই অবাক। দেখলাম স্মিত হাস্যে অরোরা এবং মেহতাজী দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। মেহতাজীর আসবার কথা জানতাম। কিন্তু অরোরাকেও যে দলে পাব তা কল্পনাও করিনি। কেননা অরোরা মাইনস-এর কাজে এত ব্যস্ত থাকে বা এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছে যে তার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে শয্যাশায়ী না হওয়া পর্যন্ত ছুটি পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

অরোরা হাসিমুখে বলল, "ভেতরে আসতে পারি?"

"প্লিজ কাম ইন।"

মেহতাজী বললেন, "উই আর টু আরলি।"

মাসেনু বললেন, "মোটেই না। এটাই আপনাদের ঠিক সময়। নাহলে আমি ধরেই নিতাম আপনারা আসবেন না।"

আমি স্টোভে গরম জল বসালাম। আবার এক প্রস্থ কফি খেতে হবে।

কফি খেতে খেতেই শুরু হল গল্প।

মিঃ মাসেনু বললেন, "আপনারা সকলেই যখন এসে গেছেন তখন শুনুন আমাদের কী ভয়ঙ্কর এক অভিযানের প্রস্তুতি নিতে হবে। আপনারা আমার চিঠি পেয়ে যখন এখানে ছুটে এসেছেন তখন নিশ্চয়ই জেনেছেন কেন এবং কি জন্য আপনাদের ডাকা হয়েছে?"

মেহতাজী বললেন, "জানি। বিষয় কালপুরুষ।"

"ঠিক।"

অরোরা বলল, "কিন্তু...।"

"আপনার কিন্তুর জবাব আপনি পাবেন। এক এক করে সব বলছি আপনাদের, শুনুন।"

আমরা রুদ্ধশ্বাসে কান খাড়া করে শুনে যেতে লাগলাম।

মাসেনু বললেন, "কিছুদিন আগে আমি আমার বিজ্ঞান গবেষণার কাজে গিরিডি গিয়েছিলাম। পচম্বার শেষ প্রান্তে মিঃ ভার্মার বাড়িতে আমি উঠেছিলাম। আমি যাবার পরদিনই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।"

"কীরকম!"

মাসেনু বললেন, "সেদিন বিকেলবেলা মানে ঠিক সন্ধের মুখে চাষী সম্প্রদায়ের

একজন লোক ওখানকার মাঠে কাজ করতে করতে হঠাৎ বিকট চিৎকার করে উঠল। ওর কপালে রবারের মতো কি যেন একটা চটচটে পদার্থ আটকে বসেছে। সেটার আকৃতি অনেকটা খোলা ছাড়ানো ঝিনুকের মতো। নিশ্চয়ই কোনও বিষাক্ত পোকা। সেটা এমনইভাবে কামড়ে বসেছে যে কিছুতেই সেটাকে ছাড়ানো যাচ্ছে না। লোকটির চিৎকারে মাঠে অন্যান্য যেসব লোক কাজ করছিল তারাও হইহই করে ছুটে এল। তারপর সবাই মিলে টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল সেটাকে। কিন্তু না। কিছুতেই কিছু হল না। ক্রমে আস্তে আস্তে সেটার থেকে একটা চটচটে রস বেরতে লাগল। তারপর সেটা গলে গিয়ে সারা শরীরময় ছড়িয়ে পড়ে আলকাতরার মতো কালো একটা পাতলা আবরণে ঢেকে ফেলল সারা শরীরটাকে। পরে একটু একটু করে লোকটার শরীরের সমস্ত রস শুষে নিয়ে এমনকি মেদ মজ্জা পর্যন্ত অবশিষ্ট না রেখে হালকা একটা বায়বীয় পদার্থের মতো আকাশে হারিয়ে গেল।''

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ''সে আবার কী!''

মাসেনু বললেন, ''হ্যাঁ। এই রকম চমকপ্রদ ঘটনার কথা কেউ কখনও শুনেছেন? নেনু ইপ্রু এনোলেদু? আমি তো শুনিনি। আমার অনুসন্ধিৎসু মন ব্যাপারটাকে অস্বীকার করতে পারল না বা আমি সেটাকে মিথ্যা বলে উড়িয়েও দিলাম না বরং আমি নিজে একবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখ থেকে সব কিছু শুনে এলাম।''

''আর একদিন বেনিয়ারি খনি অঞ্চলে যখন আমি কাজ করছিলাম তখন আর এক কাণ্ড ঘটল। এই খনি ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের। এখানে কয়লা কোক করা হয়। তাছাড়া আলকাতরা, ন্যাফথলিন, সালফেট অব অ্যামোনিয়া আরও অনেক কিছুই তৈরি হয় এখানে। কাজ করতে করতে হঠাৎ দেখি মিঃ ভার্মার কুকুরটা বিকট একটা চিৎকার করে শূন্যে উড়ে গেল। দেখলাম ধূম্রবর্ণ কালো মেঘের মতো কী যেন একটা গ্রাস করল সেই কুকুরটাকে। সঙ্গে সঙ্গে আমার .৩৫৭ ম্যাগনাম রিভলবার গর্জে উঠল ডিস্যুম করে। পরক্ষণেই দেখলাম আধখাওয়া আধ চিবানো সেই মৃত কুকুরটাকে সেখানে ফেলে দিয়ে সেই ভয়ঙ্কর ধোঁয়াটে আতঙ্কটা জমাট বেঁধে ক্রমশ ছোট হতে হতে একটা ঝিনুকের শাঁসের মতো হয়ে চরকির মতো ঘুরপাক খেতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে নামতে লাগল খনির ভেতরে। তবে খনি বলতে সাধারণত আপনারা যা ভাবেন এখানে তা নেই। মাথার ছাদহীন বিশাল গহ্বর। গহ্বরের নীচে জল। কতটা গভীরতা জানি না। সেই পোকার মতো বস্তুটা ধীরে ধীরে খনি গর্ভে একটা দেয়ালের ওপর বসে বিঁপ বিঁপ শব্দ করতে লাগল। মনে হল যেন কোনও কিছুর সংকেত দিচ্ছে সে।''

আমরা বললাম, ''কিন্তু এর সঙ্গে কালপুরুষের সম্পর্ক কী?''

''আছে। এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন আমি পচম্বার অদূরে শ্লেট নদীর ধারে তাঁবু ফেলে আমার কাজ করছি এমন সময়...।''

মেহতাজী হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, ''রিভার শ্লেট?''

''হ্যাঁ। শ্লেটপাথরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী। যে পাথরে আগেকার দিনে অনেক বাড়িতেই ছাদ তৈরি হত। যাই হোক। তাঁবুর ভেতর বসে আছি এমন সময় একটি অর্ধদগ্ধ গলিত শব যেন চিতার আগুন থেকে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়াল।''

অরোরা বলল, ''স্ট্রেঞ্জ।''

"আমি আতঙ্কে নীল হয়ে গেলাম। সেই গলিত শব আমার কাছে এসে বলল—হাউ আর ইউ মিঃ মাসেনু?"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "হু আর ইউ?"

সঙ্গে সঙ্গে অতি পরিচিত সেই প্রাণ ফাটানো হাসি "হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ হাঃ। আমায় চিনতে পারলেন না? আমি কালপুরুষ।"

"কালপুরুষ।"

"হ্যাঁ। আমি আপনাদের বন্ধু সেই কালপুরুষ। আবার জেগে উঠেছি। তবে ভয়ঙ্করভাবে।"

"কিন্তু আমরা তো আপনাকে বিনষ্ট করেছি।"

"করবার চেষ্টা করেছিলেন। পারেননি।"

আমি হতবাক। আমার সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। তবু বললাম, "পারিনি?"

"না। পারেননি। আপনার কি মনে আছে, মিঃ অরোরা যখন চেয়ারের ওপর প্লেটে বাঁধা আমার দেহটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আমি তখন বারবার আপনাদের কাছে অন্তিম কান্নায় ভেঙে আবেদন জানিয়েছিলাম একটি বিশেষ তারকে প্লাগ নাম্বার টুয়েলভে জুড়ে দিতে? মনে করে দেখুন।"

"হ্যাঁ মনে পড়েছে।"

"কিন্তু আপনারা তা দেননি। উল্টে আপনি নিজে গুলির পর গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিলেন আমার অসহায় শরীরটাকে। শুধু তাই নয়, আপনারা সবাই মিলে আমার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে গড়ে তোলা ল্যাবরেটারিটাকে তছনছ করে এমন করলেন যে রীতিমতো একটা বিস্ফোরণে আমার চোখের সামনে সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল। আমার দেহটাও গলে পুড়ে বীভৎস হয়ে গেল তখন। শুধু সেই দুর্ঘটনার ভেতর দিয়েই হঠাৎ প্লাগ নাম্বার টুয়েলভ-এ সেই বিশেষ পয়েন্টটি জোড়া লেগে গেল। তাই আবার আমি আমার দেহকে আশ্রয় করতে পারলাম। দেহটা তখন প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বহুকষ্টে ওই দেহটাকে পচনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যা যা করা উচিত তাই করেছিলাম আমি। আপনাদের সকলের প্রতি আমার ঘৃণা এত বেশি যে আপনারা কেউ আমার হাত থেকে রেহাই পাবেন না। গভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে খুঁজে আনা এককোষি এক অ্যামিবার প্রতি আমি এখন যে মারাত্মক শক্তির সঞ্চার করেছি তার হাত থেকে আপনাদের কারও পরিত্রাণ নেই। সিংভূম থেকে বিদায় নিয়ে গিরিডিহির এক খনি গহ্বরে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে আমি আমার গবেষণার কাজ চালাই। আর দিনের আলোয় আমার এই বীভৎস দেহটাকে লুকিয়ে রাখি পরিত্যক্ত একটি খাদের গভীর গোপন সুড়ঙ্গের মধ্যে। আমার এবারের শক্তির নমুনা দেখলেন তো? তবে এখন আর আমি দেহান্তরিত হতে পারি না বা হতে চাই না। ওই অ্যামিবার আতঙ্ক দিয়ে সকলকে আমার ক্ষমতার পরিচয় দিতে চাই। সময় হলেই আপনারাও এর শিকার হবেন।

"পিস্তলটা হাতের কাছে ছিল না। তাই সেটা ব্যবহার করতে পারলাম না। কিন্তু আমার চোখের চাউনি দেখেই ও আমার মনোভাব বুঝতে পেরে আমি ওকে আক্রমণ করবার আগেই উধাও হয়ে গেল।"

মাসেনুর বক্তব্য শেষ হলে কিছুক্ষণ আমরা কোনও কথাই বলতে পারলাম না কেউ। ভয়ে বিস্ময়ে এবং এক অপ্রত্যাশিত বিপদাশঙ্কায় সকলেই খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়লাম।

নীরবতা ভাঙলেন অরোরা। বললেন, "তাহলে এখন আমাদের করণীয় কী?"

মাসেনু বললেন, "আমাদের এই মুহূর্তে গিরিডিতে গিয়ে কালপুরুষের মুখোমুখি হতে হবে।"

মেহতাজী বললেন, "অফ কোর্স।"

আমি বললাম, "কিন্তু কীভাবে মুখোমুখি হব?"

"সেটা অবস্থার ওপর নির্ভর করবে। তবে আমার মনে হয় কালপুরুষ ওই অ্যামিবার ভেতর দিয়ে নিজের পৈশাচিক প্রবৃত্তিকে অতি ভয়ঙ্করভাবে জাগিয়ে তুলতে চাইছে। উপযুক্ত মেশিনারির অভাবে হয়তো অনেক কিছুই করে উঠতে পারছে না। কিন্তু যেদিন পারবে সেদিন শুধু আমাদেরই নয় সমগ্র মানব জাতির অনিষ্ট করে ছাড়বে সে।"

অরোরা বলল, "হাউ ডেঞ্জারাস।"

মেহতাজী বললেন, "ও যা লোক, তা ও পারে। ঠিক আছে, চলুন আমরা আজই রাতের গাড়িতে গিরিডিতে যাই।"

মাসেনু বললেন, "থ্যাঙ্কস।"

আমরা নৈশ অভিযানের জন্য তৈরি হলাম।

দুই

দিল্লি এক্সপ্রেসে গিরিডি কোচের প্রথম শ্রেণীতে চারটে বার্থ পেতে আমাদের কোনও অসুবিধে হল না। সারারাত ট্রেনের কামরায় গল্প করে কাটালাম সকলে। বিশেষ করে মধ্যরাতে মধুপুরে বগিটা কেটে রেখে যাবার পর থেকে তো ঘুমই এল না কারও চোখে।

গিরিডি পৌঁছলাম খুব ভোরে। তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি। মিঃ ভার্মা আমাদের জন্য গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কাজেই আমাদের আর কোনও অসুবিধাই হল না।

পচম্বার শেষ প্রান্তে মিঃ ভার্মার বাড়িটা সত্যিই দেখবার মতো। তার ওপর আমাদের জন্য যে ঘরটি তিনি সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিলেন তার যেন তুলনাই হয় না।

ভার্মার বাড়িতে বসে রীতিমতো জলযোগান্তে চা খেতে খেতে কালপুরুষের ব্যাপারটা নিয়ে জোর আলোচনা চলল।

ভার্মা বললেন, "অ্যামিবার আতঙ্কে এখানকার জনজীবন এখন বিপর্যস্ত হতে বসেছে। আজ এর গরু নেই, কাল ওর মোষ নেই, পরশু কার পুকুরের মাছ নেই। ওই চ্যাটচেটে ছোট্ট অ্যামিবাটা যেন সবারই চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এ পর্যন্ত সাতজন শিকার হয়েছে তার। তবে ওই অশুভ আতঙ্ক একদিনে একবারের বেশি আতঙ্ক ছড়ায় না।"

মাসেনু বললেন, "আমরা যখন এসে পড়েছি তখন কোনও চিন্তা করবেন না আপনারা। ওই অ্যামিবার রহস্য উদ্‌ঘাটন আমরা করবই। আর আতঙ্কের মূলে যিনি আছেন তাঁকেও আমরা খুঁজে বার করব। এবং সেই জন্যেই আমাদের আসা।"

ভার্মা বললেন, "আতঙ্কের মূলে যিনি আছেন মানে? অর্থাৎ এসব কি কোনও ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল খুশিতে হচ্ছে?"

"অবশ্যই।"

"কিন্তু এটা তো এক ভয়ঙ্কর প্রাণী।"

"জীব জগতে এরকম কোনও প্রাণী কখনও ছিল না। এখনও নেই। তবে এই প্রাণীকে এক ক্ষুদ্র অ্যামিবার মাধ্যমে সঞ্চালন করা হয়েছে। এটা এক সুবিজ্ঞানীর বিজ্ঞান সাধনার বিস্ময়কর অবদান বলতে পারেন। তবে এই অবদান যেহেতু ক্ষতিকর সেই হেতু এর এবং এর সৃষ্টিকর্তার বিনাশের এখুনি প্রয়োজন।"

ভার্মা বললেন, "যা আপনারা ভাল বোঝেন তাই করুন।"

ভার্মার বাড়িতে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে চললাম আসল কাজের কাজ করতে। চারজনে একটা টাঙ্গা ভাড়া করে বেনিয়ারি কয়লাখনির দিকে এগিয়ে চললাম। বেশ কিছুদূর যাবার পর এক জায়গায় অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় দেখলাম। ভার্মাও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সেই জায়গায় একটি পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন দিন তিনেক আগে এই পাহাড়ের ওপরে এক কাঠুরের জীবন নষ্ট হয়েছে ওই অ্যামিবার গ্রাসে।

মাসেনু বললেন, "আজ এই মুহূর্তে আমরা সবাই ওই ভয়ঙ্কর অ্যামিবার খাদ্য হয়ে যেতে পারি।"

আমি বললাম, "মিঃ মাসেনু, কালপুরুষ যদি আমাদের ওপর দিয়ে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চান তাহলে সেদিন ওই অর্ধদগ্ধ শরীর নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করার পরও আপনার ক্ষতি না করে চলে গেলেন কেন?"

"তার কারণ অনেকগুলো হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে আমি নিজেও একটু চিন্তাভাবনা করেছি। আমার ধারণা ওর ওই অ্যামিবার আতঙ্ক এই এলাকার পরিধির মধ্যে পরিচালনা করা সম্ভব। সে কারণে আমাকে দেখা দিয়েও সে মারেনি। তবে শাসিয়েছে। কালপুরুষ জানে এই ঘটনার পরে উত্তেজিত হয়ে আমি সবাইকে ডেকে ডুকে এনে ওর মোকাবিলা করব এবং সেই সুযোগে ও আমাদের চারজনকেই এক সঙ্গে শেষ করবে।"

অরোরা বলল, "যদি আপনার ধারণা তাই হয় তাহলে তো এই মুহূর্তে আমাদের সমূহ বিপদ।"

"অবশ্যই।"

মাসেনু হঠাৎ শিরদাঁড়া সোজা করে টাঙ্গাওয়ালাকে টাঙ্গা থামাতে বললেন। তারপর বললেন, "মিঃ ভার্মা, আমরা একবার ওই পাহাড়টায় উঠব।"

"ওর ওপরে ওঠবার কোনও রাস্তা নেই। দেখছেন না চারদিক কেমন ঝোপ জঙ্গলে ভর্তি?"

"নিশ্চয়ই আছে। না হলে কাঠুরেটা উঠেছিল কি করে?"

ভার্মা চুপ।

আমরা একটু এদিক সেদিক করতেই এক জায়গায় পাহাড়ে ওঠবার একটা সুঁড়িপথ দেখতে পেলাম। আমরা সকলেই সেই পথে এবড়ো খেবড়ো পাথরের ওপর পা রেখে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। খুব ছোট পাহাড়। তাই উঠতে কোনও অসুবিধা হল না।

মাসেনু আর মেহতাজী পাহাড়ের ওপর বিশেষ কতকগুলো গাছ গাছালি পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ এক সময় ভ্রূ কোঁচকালেন। একটি বিশেষ গাছের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ গাছ এখানে এল কী করে? আফ্রিকা মহাদেশের গভীর জঙ্গলের গাছ এটি।

এ দেশের জল হাওয়ায় এই গাছ অসম্ভব। এ গাছ এই পাহাড়ে কী করে গজাল?"

মাসেনু গাছটিকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, "গাছটি শুধু গজায়ইনি। রীতিমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলেছে ওই গাছটিকে নিয়ে। আর সেই কারণেই এই পাহাড়ে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য ওই কাঠুরিয়ার জীবন নষ্ট করা হয়েছে। যাতে ভয়ে এই পাহাড়ে আর কেউ না ওঠে।"

আমি বললাম, "আপনি যখন খনি অঞ্চলে কাজ করছিলেন তখন মিঃ ভার্মার কুকুরটাকে কি ওই একই কারণে বিনাশ করা হয়েছিল?"

"হ্যাঁ। কুকুরটা ঘুরতে ঘুরতে কোনও কিছুর গন্ধেই হয়তো আসল জায়গার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। তাই সকলের চোখের সামনে মরতে হয়েছিল তাকে।"

ভার্মা বললেন, "তাহলে পচম্বার মাঠের সেই চাষী?"

"তাকে দিয়েই পরীক্ষা শুরু হয়েছিল নিশ্চয়ই। কালপুরুষের সেই তো প্রথম শিকার।"

"কিন্তু বুঝতে পারছি না ওর এই হত্যালীলার কারণটা কী?"

"ওই খুনে বৈজ্ঞানিকের ওটাই তো একমাত্র নেশা।"

"তাহলেও ওর আগেকার খুনগুলির মধ্যে একটা যুক্তি ছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সে নানা কাজে ব্যবহার করত। কিন্তু এই নরভূক অ্যামিবার সৃষ্টি করে সে কোন মহৎ কর্মটা সম্পন্ন করবে শুনি?"

আমরা নিজেদের মধ্যেই নানা রকম যুক্তি, তর্ক, আলোচনা করতে করতে নীচে নামলাম। কিন্তু নেমেই যা দেখলাম তা দেখব বলে কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা দেখলাম টাঙ্গায় ঘোড়াটা যেখানে ছিল সেখানে কী একটা চটচটে পদার্থ পড়ে আছে। আর টাঙ্গাওয়ালার আধ খাওয়া শরীরটা পড়ে আছে একটা ঝোপের ধারে। দেখামাত্র আমাদের সর্বাঙ্গে একটা হিম শিহরণ খেলে গেল। আমরা আর না এগিয়ে পিছু হাঁটা শুরু করলাম। খানিক আসতেই বেনিয়ারিরির দিক থেকে একটা দ্রুতগামী ট্রাককে আসতে দেখে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। তারপর হাত দেখিয়ে সেটা থামিয়ে কোনও রকমে উঠে পড়লাম সেটাতে। ট্রাক ড্রাইভার ভার্মাকে চিনত। বলল, "আপকা গাড়ি কাঁহা বাবু সাব?"

ভার্মা বললেন, "আমার গাড়ি আনিনি জগদীশ ভাই। এই বাবুদের টাঙ্গায় এসেছিলাম। যাক, তুমি আমার এই গেস্টদের নিয়ে একেবারে আমার বাড়ির দরজায় নামিয়ে দাও দেখি। খুব বিপদে পড়েছি আমরা।"

ট্রাক ড্রাইভার তাই করল। মিঃ ভার্মার কথামতো আমাদের পচম্বায় ভার্মার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিল।

আমরা আমাদের ঘরে ঢুকেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভার্মা ঘরে ঢুকেই ফোন করলেন, "হ্যালো, পুলিশ স্টেশন! হ্যালো...।"

ওদিক থেকে উত্তর আসতেই মিঃ ভার্মা বললেন, "আপ লোগ জলদি হিঁয়া চলা আইয়ে। হিঁয়া আনেকা বাদ সব কুছ বাতাউঙ্গা।"

একটু পরই পুলিশ এল।

মিঃ ভার্মা আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা পুলিশকে জানালেন। এমন কি আমাদের এখানে আসার ব্যাপারটাও জানিয়ে রাখলেন পুলিশকে। যাতে আমরা চাইলেই পুলিশের

সাহায্য পাই এমন ব্যবস্থাও করলেন। পুলিশ সব কিছু লিখে নিয়ে থমথমে মুখ করে চলে গেল।

আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

মিঃ মাসেনুকেও রীতিমতো চিন্তিত মনে হচ্ছে।

আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে কে জানে? বেনিয়ারি কয়লা খাদের ধারে কাছে যাবার সাহস বা প্রবৃত্তি আমাদের আর নেই। চোখের সামনে ওইরকম রোমহর্ষক মৃত্যু দৃশ্য দেখার পরও কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের লোক ওইখানে জীবনের ঝুঁকি নিতে যাবে?

ভার্মার দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে বেলা বারোটা ঘোষিত হল।

মাসেনু এবার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "আজ ঠিক রাত বারোটার সময় আমরা আমাদের অভিযান শুরু করব। আপনারা দুপুরে একটু ভাল করে ঘুমিয়ে টুমিয়ে নেবেন। কেননা হয়তো সারা রাত জাগতে হবে আমাদের। আর আজকের রাতই হয়তো আমাদের জীবেনের শেষ রাত।"

অরোরা বললেন, "তাহলে কি দরকার ছিল সুখে থাকতে ভূতে কিলোবার?"

মাসেনু বললেন, "আপনি ভুল করছেন অরোরাজী। জেনে রাখুন আমরা যে শুধু এক খুনে বৈজ্ঞানিকের হিংসা বৃত্তির মোকাবিলা করতে যাচ্ছি তা নয়। ভবিষ্যতে অনেক অমূল্য প্রাণ যাতে নষ্ট না হয় বা আমরাও কোনওরকম বিপদে না পড়ি সেই ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। ওকে জব্দ করতে না পারলে আমাদেরই তো সমূহ বিপদ। ওই অ্যামিবার শক্তিকে আরও বৃহত্তর শক্তিতে পরিণত করে এবং এই নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরেও তাকে ইচ্ছা মতো পরিচালনা করবার ক্ষমতা পেলেই ও আমাদের হত্যার জন্য তৎপর হবে। তাই যেভাবে হোক ওই রক্তচোষা অ্যামিবা এবং কালপুরুষকে ধ্বংস করতেই হবে।"

আমি বললাম, "আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ মাসেনু। যেভাবেই হোক আজই রাতের মধ্যে কালপুরুষের ঘাঁটির সন্ধান পেতেই হবে আমাদের।"

মিঃ মাসেনু বললেন, "ওর ঘাঁটিটা যে কোনখানে তা তো নিজেই ব্যক্ত করেছে সে শুধু যে কোনও উপায়ে চুপিসাড়ে ওখানে গিয়ে পড়তে হবে।" বলে বললেন, "আচ্ছা মিঃ ভার্মা, ওই বেনিয়ারিতে যাবার কোনও শর্টকার্ট রাস্তা আপনার জানা আছে?"

ভার্মা বললেন, "হ্যাঁ আছে। স্টেশনের সামনে দিয়ে রাজঘেরিয়া রোডের ওপারে যে মেঠো পথটা টিলা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে ওই পথেই। খুব তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছনো যায়। তবে পথটা বড় অপরিষ্কার। গাছপালায় বনজঙ্গলে ভরে আছে।"

মেহতাজী এতক্ষণে কথা বললেন, "তাহলে তো ওই পথই আমাদের কালপুরুষের সন্ধান দিয়ে দেবে। কালপুরুষের ঘাঁটি তৈরির এবং তার লুকিয়ে থাকার পক্ষে আদর্শ স্থান ওটি।"

ভার্মা বললেন. "অসম্ভব কিছু নয়।"

মাসেনু বললেন, "আজ রাতে আমাদের এই অভিযানে বেশ শক্ত সমর্থ একজন লোকেরও দরকার। যে কিনা কিছু মালপত্তর এবং দু'এক লিটার পেট্রোলও বয়ে নিয়ে যেতে পারবে।"

বার্মা বললেন, "পেট্রোল! পেট্রোল কি করবে?"

"ওই রক্তলোলুপ অ্যামিবাটাকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য পেট্রোলের একান্ত প্রয়োজন।"

"কিন্তু খনি অঞ্চলে দাহ্য বস্তু নিয়ে যাওয়া এবং তাতে অগ্নিসংযোগ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে মিঃ মাসেনু?"

"কেন হবে না? গোটা খনি অঞ্চলটা যেখানে দাহ্য পদার্থতে ভরা সেখানে আমরা একটা দাহ্য বস্তু নিয়ে গেলে কি খুবই অপরাধ হয়ে যাবে? অগ্নিসংযোগ বিপজ্জনক তা জানি। তবে কারও খেয়াল খুশির গ্রাসে প্রতিদিন একটি করে মানুষ অথবা পশুর জীবনহানি হওয়াটা আরও বিপজ্জনক।"

ভার্মা বললেন, "বেশ, যা আপনি ভাল বোঝেন তাই করুন।"

আমরা তখনকার মতো আলোচনা শেষ করে স্নানাহার করে নিলাম। মিঃ ভার্মার বাড়িতে দুপুরের আহারও রাজকীয়ভাবেই হল। কিন্তু মুশকিল যেটা হল সেটা হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার পর সন্ধে পর্যন্ত কেন জানিনা বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করেও চোখের পাতা এক করতে পারলাম না।

হঠাৎ একটা কটু গন্ধে গা-টা গুলিয়ে উঠল। কী বিচ্ছিরি আঁশটে ঘোলাটে পচা মাছের মতো দুর্গন্ধ। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে উঠে পড়লাম। আলো জ্বেলে ঘরের দরজা খুলে সিঁড়ির কাছে যেতেই দেখলাম কচ্ছপের মতো মুখ নিয়ে প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা এবং তিন ফুট চওড়া একটা সবুজ রঙের চ্যাটচ্যাটে জেলি ধীরে ধীরে উঠে আসছে আমাদের ঘরের দিকে। সেটা এমনভাবে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে যে তা কারও টের পাবার কথা নয়। সেটা এমনই জায়গায় রয়েছে যে সেখান দিয়ে ওই পিচ্ছিল মৃত্যুকে অবহেলা করে

পালাবারও পথ নেই। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু ততক্ষণে পিছন দিক থেকে একটা কঠিন বাহু আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করে আমার মুখ চেপে ধরেছে। নাকে একটা কিসের যেন কটু গন্ধ। চেতনা লোপ পেল।

তিন

রাত তখন কত তা জানি না। পাহাড়ের একটা গভীর সুড়ঙ্গের মধ্যে হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়েছিলাম। পাথরের দেওয়ালে একটি হুকে ছোট্ট একটি চিমনি জ্বলছিল। মাথা তুলে দাঁড়াতে গেলাম কিন্তু পারলাম না। গায়ে হাতে বেদনা অনুভব করলাম। আসলে সেটা একটা অপরিসর গুহা। এর ভেতরে কোনওরকমে বসা যায় কিন্তু দাঁড়ানো যায় না। গুহাটি মনে হয় লম্বায় সুদীর্ঘ। তবে এর প্রবেশ পথ কোন দিকে তা কে জানে? লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবু আমি বুকে হেঁটেই চলতে শুরু করলাম। একটু যাবার পরেই দেখলাম গভীর অন্ধকারে চারদিক ঢাকা। রাত এখন কত তা জানি না। আমি যে এখানে কী করে বা কীভাবে এলাম বুঝতে পারছি না তাও। যাই হোক, আমি এইভাবে বুকে হেঁটে খানিক যাবার পরই দেখলাম এক জলাশয়ের ধারে এসে পৌঁছেছি। বাইরে খোলা আকাশ। ছোট ছোট টিলা। কিন্তু সেই জলাশয় পার হবার মতো সাহস হল না। কি জল, তাতে সাপ বা কুমীর কি আছে কিছুই জানি না। তার ওপর হাত পা বাঁধা। কাজেই পার হব কী করে? এছাড়া সেই জলাশয়ের আকৃতি একটি ইঁদারার মতো। তার মানে আমি পাহাড়ের খাদে কোনও গর্তের ভেতরে আছি। আমি প্রথমেই আমার হাত পায়ের বাঁধন দাঁতে কামড়ে এবং পাথরে ঘষে খুলে ফেললাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম যে পথে এসেছি সেই পথে। বেশ খানিকটা আসার পর আবার পূর্বস্থানে ফিরে এলাম। মানে যেখানে আমি বাঁধা অবস্থায় পড়েছিলাম অচেতন হয়ে। দেওয়ালের চিমনিটা একটু উস্কে দিতে গেলাম। কিন্তু ফল হল উল্টো, হাতের ছোঁয়া পেতেই দপদপিয়ে নিভে গেল সেটা। যাই হোক, তবুও আমি সেই অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলাম। খানিক যাবার পরই বুঝতে পারলাম আমি ক্রমশ মুক্তির জগতে পৌঁছে যাচ্ছি। ওই তো আকাশ, চাঁদ, তারা, বনজঙ্গল সব কিছুই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় এবং কীভাবে এলাম? যাক। ওসব ভাববার সময় এখন নেই। আগে তো পালিয়ে বাঁচি। আমি কোনওরকমে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসতেই কে যেন পিছন থেকে আমার কাঁধে হাত রাখল।

চমকে উঠলাম আমি "কে! কে! কে তুমি!"

মূর্তিমান প্রেতের মতো এক বিভীষিকা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। বলল, "কোনও অসুবিধা হয়নি তো?"

সেই ভয়ঙ্কর দর্শন আধপোড়া ঝলসানো চেহারাটা দেখে প্রথমে ভয় পেলেও পরে বুঝলাম মানুষটি কে। বললাম, "আপনি কালপুরুষ?"

"আমাকে মহাকালপুরুষ বললেই বোধহয় ভাল করতেন। যাক। চিনতে পারার জন্যে ধন্যবাদ।"

"না চেনার কোনও কারণ তো নেই। ইতিপূর্বে মিঃ মাসেনুর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর মুখেই আপনার বর্তমান অবস্থার কথা শুনেছি।"

"শুনেই চলে এলেন আবার আমার অনিষ্ট সাধনের জন্যে। কেমন?"

"না। ঠিক তা নয়। এবার এসেছিলাম বন্ধুর ভূমিকা নিয়ে আপনাকে কিছু বোঝাতে। আমরা ঠিক করেছিলাম আপনাকে আলোয় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কেন আপনি বনে জঙ্গলে এইভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে আপনার গবেষণার কাজ করবেন? আপনি শুধু আপনার হত্যালীলাটা বন্ধ করুন। অযথা মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না। আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।"

কালপুরুষ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "সত্যিই কি আপনারা ওই মন নিয়ে এসেছিলেন?"

"নিশ্চয়ই।"

"আমি কিন্তু ওই ঘোড়েল শয়তানটাকে একদম বিশ্বাস করি না।"

"কার কথা বলছেন? মিঃ মাসেনুর?"

"হ্যাঁ।"

"ছিঃ। একথা আপনার মুখে শোভা পায় না। আপনি নিজে একজন বৈজ্ঞানিক হয়ে আর একজন বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে এইরকম মন্তব্য করলেন কী বলে?"

"উনি আমার কত ক্ষতি করেছেন তা কি আপনার জানা নেই?"

"জানি। শুধু উনি নন। আমরা সবাই করেছি। আপনার সম্বন্ধে আমরা যতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলাম এখনও ততটাই আছি। তখন আপনি সুপরিকল্পিতভাবে একটির পর একটি হত্যাকাণ্ড যেভাবে ঘটিয়ে চলছিলেন এবং বিশেষ করে আমাদের আটকে রেখে যা কর' চেয়েছিলেন তাতে শুধুমাত্র আত্মরক্ষার খাতিরেই ও কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলাম আমরা। এখনও আপনি সমানে সেই আগেরই মতোই মানুষ এবং পশুর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন।"

"এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। এর কি দাম আছে বলুন?"

"আছে বৈকি। তাই তো মানুষের কল্যাণের জন্য জগৎ জুড়ে এই বিশাল আয়োজন। তাই তো বাঁচার আশায় অসুখ করলে মানুষ ওষুধ খায়। তাই তো একের প্রাণ রক্ষায় অন্যে এগিয়ে আসে। অতএব মানুষের দাম নেই কে বললে আপনাকে?"

কালপুরুষ কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "আপনার কথা আমি অস্বীকার করছি না। তবে আমি যা করছিলাম তা তো আপনারা জানেন। আমার গবেষণার মূল লক্ষ্যই ছিল জরা মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা। আমার প্রসেস ফলো করলে কোনও মানুষই একদিন মরত না।"

"এও তো আপনার পাগলামি। সবাই যদি যুগ যুগান্তর ধরে বেঁচে থাকে তাহলে পুরাতন এবং নতুনের ভিড়ে পৃথিবীর অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?"

কালপুরুষ যেন চমকে উঠলেন।

আমি বললাম, "আপনি ওইসব সাধনা না করে ক্যানসারের ওষুধ বার করুন। এমন একটা বিধান বার করুন যাতে ব্লাড প্রেসার হবে না, ডায়াবেটিস হবে না, সহজে হার্ট অ্যাটাক হবে না, মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ হবে না। অথবা এমন কোনও টীকা তৈরি করুন যার প্রয়োগে খুব কম করেও বিশ বছর কেউ অসুস্থ হবে না। পারবেন? পারবেন ওইরকম কিছু করতে? যদি পারেন তো বলুন, আমরা সবাই হাতে হাত মিলিয়ে আপনার সঙ্গে কাজ করি।"

"পারব। নিশ্চয়ই পারব। পারতেই হবে। না না, হবে কেন? পেরেছি তো? গভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে খুঁজে আনা এককোষী এক ক্ষুদ্র অ্যামিবার শরীর পরীক্ষা করে দেখেছি তার রসালো শরীরের চ্যাটচ্যাটে জেলির মতো পদার্থগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্যানসারের প্রতিষেধক। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না একটা ঘেয়ো কুকুরের অঙ্গে সেই প্রলেপ দিয়ে আমি তার ঘা সারিয়ে তুলেছি।"

"তাহলে আসুন আমার সঙ্গে। মিঃ ভার্মার বাড়িতে গিয়ে আমার বন্ধু অরোরা, মেহতাজী এবং মিঃ মাসেনুকে নিয়ে আমরাই ঠিক করি আপনার গবেষণাগার কোথায় থাকবে, কী কী লাগবে।"

কালপুরুষ একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন, "তার আর প্রয়োজন হবে না। কেননা আমার সেই পিচ্ছিল আতঙ্কটা এতক্ষণে ওদের সবাইকে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে হয়তো।"

"সেকী! কী বলছেন আপনি?"

"আমি যা বলছি তা ঠিকই বলছি।"

এতক্ষণে আমার মনে পড়ল কচ্ছপের মতো মুখওয়ালা এবং জেলির মতো চ্যাটচ্যাটে সেই মরণদূতের কথা। যে মুহূর্তে আমি সেটাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম সেই মুহূর্তেই কে যেন আমাকে পিছন দিক থেকে চেপে ধরেছিল। তারপর নাকে একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ। আর কিছু মনে ছিল না।

"আপনিই কি আমাকে অজ্ঞান করিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার উদ্দেশ্য?"

"উদ্দেশ্য একটা ছিল। কিন্তু এখন আর তা নেই। মিঃ ভার্মারও ক্ষতি করতে আমি চাইনি। কেননা আমার রাগ ছিল আপনাদের চারজনের ওপর। বিশেষ করে অরোরা এবং মাসেনুকে আমি সহ্য করতে পারি না। ওরা আমার দীর্ঘদিনের সাধনার ক্ষেত্রকে ধ্বংস করেছেন এবং ওদের জন্য আমার সুন্দর সুপুরুষ চেহারাটি আজ বিকৃত হয়েছে। আমি আমার দেহান্তরিত হবার ফর্মুলাকে হারিয়েছি। এখন এই দেহটা যতদিন বয়ে বেড়াতে পারব ততদিনই আমি। তারপরই আর সবাইয়ের মতো ছাই আর মাটিতে এক হয়ে যাব। আমার প্রখর বুদ্ধিও আর আগেকার মতো কাজ করে না। তবুও আমার সফল সাধনার পূর্ণ বিকাশ ওই রক্তচোষা অ্যামিবা। কিন্তু সেটা এখনও ফিরে আসছে না কেন?"

হঠাৎ ঝোপ আর জঙ্গলের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "সেটা আর আপনার কাছে কখনই ফিরে আসবে না। আমরা তাকে যথাস্থানেই পাঠিয়ে দিয়েছি।"

কালপুরুষ চিৎকার করে উঠলেন, 'ইমপসিবল।"

বিজয়ীর গৌরব নিয়ে ঝকঝকে পিস্তল হাতে প্রথমেই এগিয়ে এলেন মিঃ মাসেনু। বললেন, "হে কালপুরুষ! সকল সৃষ্টিই ধ্বংস হয়। অতএব আপনার সৃষ্টিও ধ্বংস হয়েছে। এখন আপনিও ধ্বংস হবেন। আপনার শেষ মুহূর্তের জন্য আপনি তৈরি হন।"

এবার অরোরা মেহতাজী এবং কিছু পুলিশকেও দেখা গেল। সঙ্গে মিঃ ভার্মাও ছিলেন।

কালপুরুষের পালিয়ে যাবার আর কোনও পথ রইল না।

মাসেনু বললেন, "দুর্বুদ্ধি শুধু আপনিই নন আমরাও কেউ কেউ কিছু কিছু রাখি। আপনার সৃষ্ট ওই ভয়ঙ্কর বিভীষিকার যত তেজই থাক, আগুনের কাছে ও জব্দ। ওই ধরনের অ্যামিবার পিচ্ছিল শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক কিছু অ্যাসিড আমি সবার অলক্ষ্যে আমাদের ঘরের ভেতরে ছড়িয়ে রেখেছিলাম। আর বেশি করে মাখিয়ে রেখেছিলাম সিঁড়ির ওপরের ধাপে, প্রকাণ্ড বারান্দায়। আর ছিল আমার কাছে বাঘনখের মতো খুবলে নেবার একটা অস্ত্র। তাছাড়াও ছিল অ্যাসিড লিপ্ত একটা প্রজাপতি ধরা জাল। এগুলো অবশ্য ক্ষুদ্র বিভীষিকার জন্যে। কিন্তু যাই হোক, ভাগ্য ভাল বলতে হবে, ক্ষুদ্র বিভীষিকার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়নি। তার চেয়েও সাংঘাতিক বিভীষিকার মুখ থেকে আমরা রক্ষা পেয়ে গেলাম। ওই জেলির মতো পিচ্ছিল আতঙ্কটা অ্যাসিড ছড়ানো সত্ত্বেও ক্লান্ত শরীর নিয়ে

ওপরে উঠে আরও বেশি জ্বালাময় অ্যাসিডের প্রভাবে ঘরে ঢুকতে পারেনি। দু'চার লিটার পেট্রলও আমার সংগ্রহে ছিল। আমাদের এক বন্ধুর চিৎকারে সচকিত হয়ে বাইরে বেরিয়েই আপনার বোকামোর নমুনা দেখে শত্রুমুক্ত হবার চেষ্টা করলাম। অর্থাৎ সেই পেট্রল ওর শরীরের ওপর ঢেলে একটা দেশলাই কাঠি ধরিয়ে দিতেই সব শেষ। এতে অবশ্য ভার্মার একটু ক্ষতিই হয়েছে। তা হোক। তবু ওই ভয়ঙ্কর আতঙ্কের হাত থেকে তো আমরা রেহাই পেলাম। এরপর চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে আমরা এখানে এসে পড়েছিলাম। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তাই অপ্রত্যাশিতভাবে ধরা পড়ে গেলেন আপনি এবং আমাদের বন্ধুকেও এখানে পেয়ে গেলাম।"

কালপুরুষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আপনাদের কাছে আমি আমার পরাজয় স্বীকার করছি। শুধু একটা অনুরোধ—"

"কী অনুরোধ বলুন?"

"আমি ওই ভগ্ন দেহ নিয়ে খুব কষ্ট করেই বেঁচে ছিলাম। এখন আর মরতেও দ্বিধা নেই। শুধু বাসনা, আমার বর্তমান গবেষণার কিছু নমুনা আপনারা রেখে দিন, যা ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের কাজে লাগবে। ক্যানসার, গ্যাংগ্রিন এবং ক্রনিক কোনও ভয়ঙ্কর রকমের চর্মরোগের ওষুধও আমি এই ক্ষুদ্র অ্যামিবার মধ্য থেকে আবিষ্কার করেছি। আসুন আমার সঙ্গে, সেগুলো আপনাদের দিয়ে দিই।"

মাসেনু বললেন, "বেশ, চলুন। কিন্তু সাবধান। কোনও চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন আজকের রাতই আপনার জীবনের শেষ রাত।"

কালপুরুষ হাসলেন। বললেন, "না না। সে সব কিছু করব না। বিশ্বাস না হলে আমার হাতে হাতকড়া পরিয়েই নিয়ে চলুন।"

মাসেনু পুলিশকে নির্দেশ দিলেন হাতকড়া লাগাবার। আমি বললাম, "এটা কোন্ ধরনের ভদ্রতা হল মিঃ মাসেনু?"

"যা করছি ঠিকই করছি আমি। সাপকে বিশ্বাস করি। কিন্তু ওই মহাশয় ব্যক্তিটিকে নয়।"

কালপুরুষ হাতকড়া পরা অবস্থায় একবার ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখলেন মাসেনুকে। তারপর সেই গুহার মুখের কাছে এসে বললেন, "সকলকেই ভেতরে আসতে অনুরোধ করছি। মাথা হেঁট করে ভেতরে আসুন। নাহলে মাথায় আঘাত লাগতে পারে।"

আমরা ঢুকতে যাচ্ছিলাম। মাসেনু বললেন, "না না। অমন কাজটি করবেন না কেউ, ওনার ল্যাবরেটারি ওনারই থাক। দরকার নেই আমাদের ওই বিকৃত মস্তিষ্কের ব্রেন থেকে আবিষ্কৃত কোনও ওষুধের। আসুন আমরা প্রত্যেকেই এই গুহার সামনে দাঁড়িয়ে ওনার শরীরকে লক্ষ্য করে পিস্তল শুটিং প্র্যাকটিস করি।"

এই বলে মাসেনু পিস্তল উদ্যত করতেই পুলিশের লোকেরা বাধা দিল, "আপনি কিন্তু আপনার অধিকারের সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন স্যার। গুলি করার দরকার হলে আমরাই গুলি করব ওকে।"

ততক্ষণে আমাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন কালপুরুষ। আর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের দেওয়ালে একটা সুইচ পায়ে করে টিপে দিতেই ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণে গুহামুখ রুদ্ধ হয়ে গেল। পরে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে দেখতে পেলাম কালপুরুষের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহাবশেষ চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

আমরা স্তব্ধ বিস্মিত নির্বাক।

মিঃ মাসেনু বললেন, "দেখলেন তো ওই দুর্জনের কথা শুনে সবাই মিলে ভেতরে ঢুকে নিজেদের কী চরম সর্বনাশ ঘটাতে যাচ্ছিলেন?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। মানুষ চিনতে সত্যিই ভুল হয়েছিল। আসলে উনি চেয়েছিলেন আমাদের সবাইকে এক সঙ্গে নিয়েই নিজের মৃত্যু বরণ করতে। শুধু আপনার বুদ্ধিমত্তার জন্য তা হতে পারল না।"

অরোরা বলল, "কালপুরুষ নিঃসন্দেহে একজন উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক। কিন্তু তিনি

এরকম একটা ভয়াবহ অ্যামিবার সৃষ্টি করেও হঠাৎ আমার বন্ধুকে অপহরণ করবার মতলবটা কেন যে করলেন তা অবশ্য বুঝলাম না।”

মিঃ মাসেনু বললেন, “আসলে ইদানীং উনি একটু পাগলামি রোগে ভুগছিলেন। তার ওপর প্রতিশোধ নেবার স্পৃহায় উনি ছিলেন এমনই অন্ধ যে ভাল মন্দ বিবেচনা করার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলেন প্রায়।”

হয়তো তাই।

আমরা আর রাতের অন্ধকারে ওই জঙ্গলে বেশিক্ষণ না থেকে ভার্মার বাড়িতেই ফিরে এলাম। তবে পচম্বায় নয়, গিরিডি স্টেশনের কাছে মিঃ ভার্মার পুরাতন বসত বাড়িতে। রাত্রি তখন একটা।

—ঃঃ—

দুরন্ত তপাই

উৎসর্গ

শ্রীমান তারাশংকর মুখোপাধ্যায়
শ্রীমান সংকর্ষণ মুখোপাধ্যায়

—স্নেহাস্পদেষু

আমার ভাগনে তপাইয়ের কথা বলছি।

মাথার চুল উল্টিয়ে আঁচড়ানো। টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ। বড় সুন্দর চোখ দুটি। দেখলে একটু রাশভারি প্রকৃতির ছেলে বলেই মনে হয়। আসলে কিন্তু তা নয়। ওর সঙ্গে খুব সহজভাবে মিশলে বোঝা যায় ওর মতো মিশুকে ছেলে আর দুটি নেই। বয়স কত আর হবে? ষোলো কি সতেরো।

ছোটবেলা থেকেই তপাই খুব ডানপিটে।

মারপিট করে মারধোর খেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে ার মনে এমন দাগ কেটেছে ও, যে আমার অন্যান্য ভাগনাদের চেয়ে তপাই-ই সকলের কাছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসে আছে।

বাড়ির লোকেরা অনেক চেষ্টা করেও বাগে আনতে পারেনি তাকে। ছোটবেলা থেকেই ধরে বেঁধে পড়াতে বসালে বইয়ের দিকে চেয়ে বোবা হয়ে বসে থাকত। স্কুল যাবার নাম করে রেল লাইনের ধারে বসে রেল দেখত। মাথার পোকা নড়ে উঠলে বই খাতা মুদির দোকানে দিয়ে বাদাম চানাচুর কিনে খেত। সে ছেলের পেছনে কে কতক্ষণ আর লেগে থাকবে? কাজেই অনেক বিচার বিবেচনা করে ওকে বোর্ডিং-এ দেওয়া হল। কিন্তু না। সেখানেও ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে স্যারের টাকে ঢিল ছুঁড়ে এমন কীর্তি করল যে তারাও তিতিবিরক্ত হয়ে আমাদের ছেলে আমাদের কাছেই সসম্মানে ফেরত পাঠিয়ে দিল।

অতএব লেখাপড়াতেও ইতি।

ফোর ফাইভ পর্যন্ত বিদ্যে পেটে রেখেই লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হল ওকে।

তারপর সচরাচর যা হয়ে থাকে তাই হল।

কতকগুলো আজেবাজে ছেলের পাল্লায় পড়ে পুরোপুরি বখাটে মেরে গেল ও। তবে কি ও একটু গম্ভীর ও রাশভারি ধরনের ছেলে বলে একেবারে ছ্যাবলাটে মেরে গেল না। যা কিছু করত বেশ ডাঁটের সঙ্গেই করত।

যাই হোক, তপাই বরাবরই একটু মামা ভক্ত। তাই বাড়িতে বেধড়ক মারধোর খেলেই এবং কোথাও অঘটন কিছু ঘটিয়ে আসলেই পালিয়ে আসত আমার কাছে।

এ নিয়ে আমার দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে অনেকবার মনোমালিন্য হয়েছে আমার।

আসকারা দিয়ে আমিই ভাগনাটার মাথা খাচ্ছি এমন অপবাদও জুটেছে আমার কপালে। আমি অবশ্য ওসবে কিছু মনে করিনি। বরং বিপথগামী এই ছেলেটিকে শোধরাবার জন্য সব রকম চেষ্টা করি এবং আমার অন্যান্য ভাগনাদের চেয়ে ওকেই একটু বেশি ভালবাসি।

হোক তপাই বাজে ছেলে। হোক সে ডানপিটে। দামাল দুরন্ত দুর্দম দস্যি—তবু ওর চরিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলো গুণ আছে যা আমার অন্যান্য ভাগনাদের কেন অনেক আচ্ছা আচ্ছা ছেলের ভেতরেও নেই।

তপাইয়ের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সে ভয়ানক জেদি ও একরোখা। কিন্তু সে অত্যন্ত পরোপকারী। আর সবচেয়ে বড় গুণ, যে গুণটির জন্যই ওকে বেশি ভালবাসি সেটি হল কারও চোখে জল দেখলে ও আর থাকতে পারে না। এইখানেই ও বড় দুর্বল। আর

সেই কারণেই ওকে আমার খুব বেশি ভাল লাগে।

তপাই হল ওর অঞ্চলের পাড়ার মস্তান বা শের যা বল তাই। ওব উৎপাতে এবং দাপটের ঠ্যালায় সবাই অস্থির।

আবার অন্য গুণও আছে।

কারও মেয়ের পয়সার অভাবে বিয়ে হচ্ছে না, ডাক তপাইকে। দুরন্ত তপাই তখন সকলের কাছেই দেবতা তপাই হয়ে যায়। 'বল বাবা তপাইয়ের চরণে সেবা লাগে, বাবাগো!' বলে এসে হাজির হয় সকলে।

তপাইও অমনি তার দলবল নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা তুলে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়।

কারও বাড়িতে কেউ মরেছে। গরিব দুঃখী মানুষ হয়তো, দুঃস্থ। এমন কি পোড়াতে নিয়ে যাবারও লোক নেই। ডাক তপাই বাবাকে। তপাই তো তখন তপাই নয়। বাবা তপাই সবাই জানে সে-মড়ার সদ্গতি তপাই করবেই করবে। চাঁদা তুলে লোকজন ডেকে অথবা বন্ধুবান্ধব নিয়ে মৃতের সৎকার করে দায় উদ্ধার করে দেবে সে।

এই মড়া পোড়ানো ব্যাপারটা কেন জানি না তপাইয়ের কাছে খুবই উত্তেজনার। এতে যে কি আনন্দ পায় ও তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি নিজে মড়ার ধোঁয়া সহ্য করতে পারি না। মড়া পোড়ানো দেখতে পারি না। অথচ আমার ভাগনা তপাই বাবাজী মড়া পোড়ানোর নামে পাগল।

এ জন্যও বাড়িতে ওর লাঞ্ছনা গঞ্জনার অন্ত নেই।

সারাদিন টো টো করে ঘুরে দুপুরে স্নান সেরে খেতে বসেছে, এমন সময় খবর এল মড়া পোড়াতে যেতে হবে। আর তপাইকে পায় কে? মুখের গ্রাস ফেলে রেখেই নয়তো আধপেটা খেয়েই কোমরে গামছা বেঁধে ছুটবে সে।

বেশ কিছুদিন আগের কথা বলছি।

শেষ পৌষের কনকনে এক মধ্যরাতে খবর এল একজনকে আগুন পোয়াতে নিয়ে যেতে হবে। আগুন পোয়ানো মানে বুঝতেই পারছ, মড়া পোড়ানো।

দিদি তো শুনেই লাফিয়ে উঠলেন, "খবরদার বলছি, যাবি না তপাই।"

তপাই তখন এক পায়ে খাড়া।

দিদি বললেন, "তবু যাচ্ছিস?"

তপাই বলল, "যাও না। লেপ চাপা দিয়ে ঘুমোওগে না। আমার ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছ কেন?"

"এই রাতে মানুষ ঘর থেকে বেরোয়? একে দিনকাল খারাপ। যেতে হয় কাল সকালে যা।"

"ততক্ষণে মড়া যে ফুলে ঢোল হয়ে উঠবে সে খেয়াল আছে? কোন দুপুরে মরেছে।"

"তা এতক্ষণ কী করছিল ওরা? সারাদিনে খবর দিতে পারে নি? যে যায় যাক। তুই যাস না।"

তপাই তখন প্যান্ট শার্ট সোয়েটার পরে কোমরে গামছা বেঁধেছে।

দিদি বললেন, "তবু যাবি তুই?"

তপাই হেসে বলল, "তুমি কি ভুলে গেছ মা, আমার নাম তপাই? আমাকে বাধা দিয়ো না।"

দিদি হাল ছেড়ে দিলেন।

জামাইবাবু বিছানায় শুয়ে শুয়েই বললেন, "একদিন বেঘোরে মরণ আছে ওর কপালে যা বুঝতে পারছি।"

তপাই তখন রাস্তায়।

দিদি জামাইবাবুর দুশ্চিন্তার অন্য একটা কারণও অবশ্য ছিল। যে সময়কার কথা বলছি তখন সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এক ভয়াবহ সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে।

সন্ধে হলেই চারদিক থেকে দুম দাম গুলি ও বোমার আওয়াজ কানে আসত। আর শুরু হত মানুষ খুনের উৎসব। দিনমানেও খুন খারাপি হত। তবে রাতের অন্ধকারে যা হত তা তুলনাহীন।

ভয়ে কেউ ঘর থেকে বেরোতে পারত না। গুলি বোমার শব্দে কান রাখা যেত না।

সেই সময় সেই প্রচণ্ড শীতের রাতে একটা ছেলে ঘর থেকে বাইরে গেলে বাপ মায়েব একটা দুশ্চিন্তা হয় বৈকি। তা সে যতই বদ ছেলে হোক।

ঘর থেকে বেরিয়ে তপাই প্রথমেই ওদের আড্ডার ঘাঁটি নসীরামের দোকানে গিয়ে ঢুকল।

নসীরামের বাড়ি বিহারের ছাপরা জেলায়। এখানে ওর একটা ধোবিখানা আছে। নসীরামের ছেলেও ওর এক সাকরেদ। এই দোকানে বসে নেশা ভাঙ সব কিছুই চলে ওদের।

তপাই এসে দেখল ডিকে আর গৌতম ওর আগেই এসে গেছে। ডিকে গৌতম তপাই আর নসীরামের ছেলে এই নিয়ে ওরা চার জন। একটা মড়াকে পোড়ানোর জন্য বয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে চার জনই যথেষ্ট।

তপাই বলল, "মালকড়ি কিছু যোগাড় হয়েছে?"

ডিকে বলল, "ওই সব করতে করতেই তো রাত হয়ে গেল।"

হোক রাত। ওরা চার বন্ধুতে দোকানের এক কোণে বসে বিড়িতে কয়েকটা টান দিয়ে মড়া পোড়াতে চলল।

ক্ষীরোদতলার গলিতে এক কাজের বুড়ি মরেছে। কেউ কোথাও নেই তার। নাই থাক। তপাই বাবা তো আছে। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো তপাইবাবা পার করে গা।

এ অঞ্চলেব শ্মশান বলতে বাঁশতলার ঘাট।

শীতের সেই হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় 'তার কাটা' অন্ধকার রাতে নিস্তব্ধ নিঝুম চারদিক। শুধু রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরগুলো ছাড়া পথে কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই।

এত রাতে শ্মশানও নীরব।

ভ্রান্ত রাজনীতির শিকার হবার ভয়ে বিভ্রান্ত মানুষেরা রাত দুপুরে মড়া নিয়ে পোড়াতে যেতেও ভয় পেত। বাসি মড়া দাহ করার জন্য সকালে নিয়ে আসত তাই।

কিন্তু তপাইরা ডাকাবুকো। ওদের কাছে দিন আর রাত্রি একই ব্যাপার। ওদের কাববারই আলাদা। ওদের ভয় নেই। ডর নেই। লজ্জা নেই। ঘৃণা নেই। ক্লান্তি নেই।

এদিক সকালেও তপাইরা বালিটিকুরির একটি দুঃস্থ পরিবারের মড়াকে পুড়িয়ে গেছে। তখন লাইন দিয়ে পোড়াতে হয়েছে মড়া।

এখন আবার এসেছে।

এই মধ্যরাতে শ্মশান এখন ফাঁকা।

হোক ফাঁকা। এই ফাঁকা শ্মশানেই ধুনি জ্বালাবে ওরা। জ্বলন্ত চিতার আগুনে মড়াকে শুইয়ে দিয়ে আগুনের তাপে শীতের প্রকোপ দূর করতে করতে চারজনে বসে মা শ্মশানকালীর নাম নিয়ে বিড়ি ফুঁকবে। এ যে কি আনন্দ তা কে বুঝবে। ঘরের বিছানায় লেপের তলায় শুয়ে যারা রাত কাটায় তারা রাতের প্রকৃতির এই রূপ রস গন্ধ সব কিছু থেকেই বঞ্চিত হয়।

এমন কি এই অনাবিল আনন্দধারার কণামাত্রও পায় না তারা।

শ্মশানের মাটিতে মড়া নামিয়ে রাতের নীরবতা ভাঙার জন্য আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল তপাই, "ব্যোম কালী! শ্মশানকালী, মা! আবার একটাকে নিয়ে এসেছি তোর কাছে।"

যেই না বলা অমনি এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। সেই নিস্তব্ধ নিঝুম রাতে জনহীন শ্মশানে একটা ঝোপের ভেতর থেকে নারী কণ্ঠে নাকি সুরে কে যেন বলে উঠল, "এঁনেছিস বেঁশ কঁরেছিস, রেঁখে দিঁয়ে যাঁ।"

শুনেই তো পেটের পিলে মাথায় উঠে গেল। কে? কে বলল এই কথা! কেউ তো নেই এখানে।

তপাই গৌতম ডিকে আর নসীরামের ছেলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

চমকের ঘোর কেটে গেলে গৌতম বলল, "কী ব্যাপার বলতো তপাই? কে কী যেন বলল মনে হল না?"

তপাই বলল, "বলল মানে? স্পষ্টই তো শুনলুম।"

ডিকে বলল, "নেশার ঘোরে ভুল শুনলুম না তো?"

নসীরামের ছেলে বলল, "মোটেই না। ভুল শুনলে একজন শুনব। সবাই?"

গৌতম তখন মড়াটার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বেশ ভাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "আমার মনে হচ্ছে এই মড়াটাই বলেছে।"

ডিকে বলল, "তা কী করে হবে?"

নসীরামের ছেলে বলল, "না হবে কেন? যদি দানো পেয়ে থাকে?"

তপাই বলল, "তা যদি হয় তাহলে গলার স্বরটা তো এইখান থেকেই শুনতে পাব আমরা। ঝোপের ভেতর থেকে শোনা যাবে কেন?"

গৌতম বলল, "ঠিক বলেছিস। কণ্ঠস্বরটা ঝোপের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এল।"

তপাই বলল, "আচ্ছা দাঁড়া। আর একবার দেখি কোনও উত্তর পাই কিনা। তোরা মড়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক। আমি ঝোপের দিকেই তাকাই। যদি মড়ার মুখ নড়ে তাহলে জানবি মড়াটাই বলেছে। নাহলে জানব অন্য কেউ। বলেই চেঁচিয়ে উঠল, "মা. মাগো! চেয়ে দেখ মা। আবার কাকে নিয়ে এসেছি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, "এঁনেছিস বেঁশ কঁরেছিস, রেঁখে দিঁয়ে যাঁ।"

শোনামাত্রই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

ডিকে গৌতম নসীরামের ছেলে বলল, "কই মড়ার ঠোঁট তো নড়ল না।"

তপাই বলল, "শুনতে পেলুম ঝোপের ভেতর থেকে—।"

গৌতম বলল, "রাত দুপুরে একি ব্যাপার রে ভাই?"

ডিকে বলল, "এ নিশ্চয়ই ভূতুড়ে ব্যাপার।"

নসীরামের ছেলে বলল, "শনি মঙ্গলবারের মড়া। এইসব মড়ার সঙ্গে একটা অন্তত মোচা দিয়ে আনতে হয়। আমরা তো তা আনিনি। ওসব নিয়ম-কানুনও মানি না। এইবারে ফল ভোগ করতে হবে তার।"

ডিকে বলল, "আচ্ছা, আমরা তো ভূতের গলা মনে করে ভয় পাচ্ছি। আসলে মা কালী নিজেই বলেনি তো?"

গৌতম বলল, "মুখ্যু। মা কালী কখনও বলে? আর মা কালী বললে অমন খোনা গলায় বলবে কেন? স্পষ্টই বলবে। মন্দিরের ভেতর থেকে বলবে। ঝোপের ভেতর থেকে কেন?"

তপাই বলল, "এই শেষবার। আর একবার বলে দেখি কী উত্তর আসে। বলেই হাঁক পাড়ল, "মা! মাগো? চেয়ে দেখ মা, রাতদুপুরে আবার কাকে এনেছি।"

বলামাত্রই আবার সেই একই উত্তর ভেসে এল ঝোপের ভেতর থেকে, "এঁনেছিস বেঁশ কঁরেছিস, রেঁখে দিঁয়ে যাঁ।"

আর এক মুহূর্ত সেখানে নয়।

চারজনেই এক লাফে লম্বা।

ওরা চারজনেই তখন পড়ি কি মরি হয়ে প্রাণপণে দৌড় লাগাল বড় রাস্তার দিকে।

রইল পড়ে ঘাটের মড়া।

আগে তো প্রাণে বাঁচো।

আগেই বলেছি তখন ছিল খুব একটা খারাপ সময়। চারদিকে সি. আর. পি. পুলিশ আর মিলিটারির কড়া নজর তখন। যেখানে সেখানে যখন তখন মানুষ খুন হচ্ছে। গোলাগুলি ছুটছে। বোমার শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। ভ্রান্ত রাজনীতির উদ্‌ভ্রান্ত উল্লাসে গ্রাম শহর শিহরিত।

সেই পরিস্থিতিতে গভীর রাত্রে এইরকম একটা অঞ্চলে ওরা চারজন ভয়ের চোটে যখন খেঁচে দৌড় লাগিয়েছে তখন হঠাৎ একটা পুলিশ-ভ্যান ওদের সামনে এসে পড়ল কোথা থেকে। সঙ্গে একটি পুলিশের জিপ।

ওদের ওইভাবে ছুটতে দেখে দারোগাবাবু জিপের ভেতর থেকে হাঁক দিলেন, "হল্ট।"

ওরা চারজনেই নিয়ম-মাফিক দু'হাত ওপরে তুলে শ্রীগৌরাঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এই এলাকাটা হাওড়া থানার আন্ডারে। হাওড়া থানার দারোগাবাবু জিপে ছিলেন। জিপ থামিয়ে দারোগাবাবু জিপ থেকে নেমে রিভলবার উঁচিয়ে ওদের কাছে এসে বাজখাঁই গলায় বললেন, "রাতদুপুরে এমন করে ছুটছিস কেন রে সব? কোথায় গিয়েছিলি জামাই সেজে তার কাটতে?"

তপাই অতিকষ্টে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "ম-ম-মড়া পোড়াতে।"

"মড়া পোড়াতে, না কোন গুদাম পোড়াতে?"

গৌতম বলল, "সত্যি বলছি স্যার। মা কালীর দিব্যি। এই দেখুন আমাদের কোমরে গামছা বাঁধা আছে।"

দারোগাবাবু বললেন, "ও দেখে কি বোঝা যায়? ওটা তো ভেকও হতে পারে তোদের।"

ডিকে বলল, "না স্যার! সত্যিই আমরা মড়া পোড়াতে গিয়েছিলুম।"

"তাই যদি গিয়েছিলি তো এমন প্রাণের ভয়ে ছুটছিস কেন? কোনও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে? বদলা টদলা নিতে আসছে বুঝি?"

তপাই বলল, "না, না স্যার। তাও নয়।"

"তবে?"

"ভূ-ভূ ভূত।"

"ভূত! কোথায় ভূত?"

"শ্মশানে।"

ওদের সাজপোশাক বা কোমরে বাঁধা গামছার বহর দেখে দারোগাবাবু বুঝতে পারলেন ওরা সত্যি সত্যিই মড়া পোড়াতে এসেছিল। কাজেই রাজনৈতিক ব্যাপার যদি না হয় তাহলে কিছু একটা দেখে বেশ রীতিমতো ভয় পেয়েই যে ছুটছিল তা বোঝাই যাচ্ছে। তবু বললেন, "কী বললি? ভূত!"

"হ্যাঁ স্যার। ভূত।"

দারোগাবাবু হেসে বললেন, "হুঁ। বুঝেছি। তা একেবারে নিরামিষ, না নেশাটেশা কিছু করেছিলি?"

তপাই বলল, "না না। ওসব কিছু করিনি।"

"ঠিক বলছিস?"

"ঠিক নয়তো কি মিথ্যে?"

"তা কী ব্যাপার বলতো? কোথায় ভূত? কী হয়েছে? কী দেখে এত ভয় পেয়েছিস তোরা?"

তপাইরা তখন সব কথা খুলে বলল দারোগাবাবুকে।

শুনে দারোগাবাবু কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। তারপর পাকানো গোঁফজোড়ায় একবার তা দিয়ে বললেন, "হু। ভূতের গল্প অবশ্য ছোটবেলা থেকে অনেক শুনে আসছি। তবে চাক্ষুষ কখনও ভূত দেখি নি। তা তোদের কৃপায় আজ যদি একবার কল্পনার সেই ভূতকে দেখতে পাই তো মন্দ হয় না। চল তো দেখি কেমন ভূত।"

সাহস পেয়ে তপাইরা আবার ফিরে চলল শ্মশানে। ওদেরও কি কৌতূহল কম? ওদের তো ঝোপের ভেতরে ঢুকে দেখবার সাহস ছিল না। এবার পুলিশ গিয়ে ঝোপঝাড় তোলপাড় করলেই ভূত তো ভূত, ভূতের বাবাও বেরিয়ে আসবে।

ওরা যখন শ্মশানে ঢুকল, খাটিয়া শুদ্ধ মড়া তখন যেমনকার তেমনিই পড়েছিল। চারদিক সেই একই রকম নিস্তব্ধ। নিঝুম।

এখন তো শুধু তপাইরা নয়। সঙ্গে পুলিশ আছে দারোগা আছে। পুলিশরাও তখন বন্দুক উঁচিয়ে রেডি একেবারে। বলা যায় না তো কেউ হয়তো কোনও কু-কর্ম করছে। তাই ছেলেছোকরা পেয়ে ওদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে নিজের রাস্তা পরিষ্কার করছে সে। আর যদি

সত্যিই ভূত প্রেত কিছু হয় তাহলে সেও একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার। ভূত দেখার শখ পুলিশেরও আছে।

শ্মশানে ঢুকেই দারোগাবাবু বললেন, "কই কোথায় তোদের ভূত? যার জন্যে ভয়ে একেবারে মড়াটড়া ফেলে রেখে পালাচ্ছিলি?"

তপাই বলল, "ভূত তো আমরা চোখে দেখি নি।"

"তবে কেন ছুটছিলি?"

"ভূতের গলা শুনেছি।"

"হুম। ভূতের গলা শুনেছিস? কই একবার আমাকে শোনা তো দেখি?"

তপাই তখন আগের মতোই চেঁচিয়ে বলল, "মা, মাগো! আজ আবার একটাকে নিয়ে এসেছি মা।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই একই উত্তর ভেসে এল ঝোপের ভেতর থেকে, "এঁনেছিস বেঁশ কঁরেছিস, রেঁখে দিঁয়ে যাঁ।"

সত্যি চমকে ওঠার মতো ব্যাপার।

দারোগাবাবুর চোখ তো কপালে উঠে গেল, "আরে! তাই তো! খোনা খোনা নাকি সুরে মেয়েছেলের গলা এ তো মিথ্যে নয়। এই পরিবেশে রাতের অন্ধকারে এই গলা শুনে ছেলেগুলো ভয়ে ছুটবে এ আর এমন কি কথা? তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলধারী পুলিশ বাহিনীকে আদেশ দিলেন, "তোমরা এক্ষুনি চারদিক থেকে ঝোপটাকে ঘিরে ফেলো। তারপর আমি দেখছি।"

এই বলে টর্চ জ্বেলে রিভলবার হাতে ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ এবং তপাইরাও গেল।

ততক্ষণে মড়ি পোড়া বামুন, খাতা লেখার লোক এমন কি ডোমটাও এসে হাজিব হয়েছে পুলিশ দেখে।

কিন্তু এ কি!

ওরা ঝোপের দিকে এগিয়ে গিয়ে যা দেখল তা দেখে তো সবাই অবাক। ওরা দেখল জরাজীর্ণ অস্থিচর্মসার একটা পাগলি ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে সেই ঝোপের ভেতরে ঢুকে চিমনির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। তার মুখে টর্চের জোরালো আলো পড়তেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল সে।

দারোগাবাবু বললেন, "এই তোদের ভূত!"

তপাইরা অবাক। ওদের মুখে আর কথাটি নেই। মড়ি পোড়া বামুনটা তো একটা চ্যালাকাঠ নিয়ে তেড়ে গেল পাগলিটাকে।

পাগলিটাও তাড়া খেয়ে কাঁই মাই করতে খিল খিল করে হাসতে হাসতে পালাল।

দারোগাবাবু বললেন, "দেখলি তো, কেমন হাতে নাতে ভূত ধরলাম? তা যাক। আর ভয় নেই। এবার যত্ন করে পুড়িয়ে নে মড়াটাকে।"

তপাইরা এতক্ষণে যেন বুকে বল ফিরে পেল।

এরপর বাকি রাতটুকু ধরে মনের আনন্দে মড়াটাকে পুড়িয়ে সকালবেলা হাসতে হাসতে ঘরে ফিরল সব।

দুই

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরের কথা।

তখন শ্রাবণ মাস। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। সেদিন সকাল থেকেই আকাশ ভেঙে অঝোর ধারায় ঢল নেমেছে। সন্ধের পর বৃষ্টিটা থেমে গেল যদিও তবুও আকাশের গম্ভীর মুখ দেখে আর মেঘের গুরু গম্ভীর ডাক শুনে এটুকু বোঝা গেল যে-কোনও মুহূর্তে এই দুর্যোগ আবার ঘনিয়ে আসতে পারে।

তবু, এই দুর্যোগেও মড়া পোড়ানোর ডাক এল।

ইছাপুরে এক বুড়ি সকাল থেকে মরে পড়ে রয়েছে। একটি মাত্র সাত বছরের নাতনি ছাড়া আর কেউ নেই তার। অতএব নিয়ে যেতে হবে তাকে।

তপাই আজ সারাদিন ঘর থেকে বেরোয়নি। ছোট ভাই স্বপনের স্কুল লাইব্রেরি থেকে আনা একটি ডিটেকটিভ বইয়ের পাতায় চোখ রেখে শুয়েছিল সে। এমন সময় গৌতম এসে খবরটা দিল। বলল, "ডিকে আর নসীরামের ছেলে যেতে চাইছে না। শুধু তুই আর আমি। কি করবি তপাই?"

তপাই শুনে বই রেখে উঠে বসল। তারপর একটা আড়ামোড়া ভেঙে হাই তুলে বলল, "যেতে চাইছে না বললেই তো হবে না। অবশ্য তোকে ওরা না বলেছে। কিন্তু আমি গেলে দেখ কি বলে।"

আমার দিদি রান্নাঘরে ছিলেন। গৌতমকে দেখেই বুঝতে পারলেন খবর খারাপ। তবু একবার জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে রে গৌতম?"

গৌতম হেসে বলল, "কী আর হবে মাসিমা। আমাদের যা কাজ। সেই কাজের জন্য ডাক এসেছে আবার।"

"বলিহারি তোদের কাজকে। আর কি কোনও কাজ খুঁজে পেলি না তোরা? দিন নেই রাত নেই শুধু মড়া পোড়ানো আর মড়া পোড়ানো। ঘেন্না পিত্তি বলেও কি কিছু নেই তোদের? তাছাড়া কোন্ পাপটা মলো এই কুক্ষণে?"

"এখানকার নয়। ইছাপুরের।"

"তা না হয় হল। কিন্তু পোড়াবি কী করে? কাঠকুটো তো ভিজে জাব হয়ে আছে।"

গৌতম বলল, "মাসিমা, যত ভিজেই হোক, চিতার কাঠ একবার জ্বলে উঠলে তাকে নেভায় কে?"

তপাই ততক্ষণে তৈরি।

দিদি বললেন, "আজ তাহলে বাড়িতে খাবি না তো?"

তপাই বলল, "না।"

তপাই যা বলেছিল ঠিক তাই।

ডিকে আর নসীরামের ছেলে গৌতমকে না করে দিলেও তপাই যেতেই এক পায়ে খাড়া।

ডিকে বলল, "ভাবছিলুম নাইট শো'তে একটা সিনেমা দেখব। তার জায়গায় কি আপদ।"

তপাই বলল, "ধ্যুৎ। সিনেমা তো আড়াই ঘণ্টার ব্যাপার। এ হচ্ছে গিয়ে সারারাতের

এই বর্ষার রাতে বুড়িকে চিতায় শুইয়ে আগুন পোয়ানোও হবে। আর একটুকু ইয়েও করা যাবে। এ সুযোগ ছাড়ে কখনও?"

তপাইরা বুড়ির বাড়িতে গিয়ে বুড়ির ভাঁড়ারে যা কিছু ছিল নিয়ে তার ওপর আশপাশের বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে দু'দশ টাকা করে চাঁদা আদায় করে বুড়ির সদ্‌গতির ব্যবস্থা করে ফেলল। সব খরচ বাদ দিয়েও ওরা হিসেব করে দেখল গোটা চল্লিশেক টাকা ওদের হাতে থাকছে। সেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওরা বুড়িকে নিয়ে মনের আনন্দে শ্মশানে চলল পোড়াতে।

দিনকাল খারাপ বলে তো রাত্রের দিকে মড়া পোড়ানো এ অঞ্চলে বন্ধই হতে বসেছিল। কিন্তু তপাইদের কিবা রাত কিবা দিন।

ওরা যখন বুড়িকে নিয়ে বাঁশতলার শ্মশানে গিয়ে পৌঁছল তখন শ্মশানও খাঁ খাঁ করছিল অত রাতে। তা রাত তখন বারোটা তো বটেই।

ওরা মড়া নামিয়ে শ্মশানের লোককে ডেকে এনে খাতায় নাম লিখিয়ে কাঠকুটো যোগাড় করল প্রথমে।

তারপর ডিকে এবং নসীরামের ছেলে দুজনে দু-দিকে গেল। ডিকে গেল খাবার জিনিস আনতে আর নসীরামের ছেলে মেটে কলসি গঙ্গাজল ইত্যাদি আনতে।

শুধু তপাই আর গৌতম মড়া আগলে রয়ে গেল শ্মশানে।

শ্মশানের 'শ' তখন জলে ভর্তি।

তপাই বলল, "আয় গৌতম, দুজনে লেগে পড়ে ততক্ষণ 'শ' থেকে জলটা পরিষ্কার করে ফেলি।"

গৌতম বলল, "রাখ তো। তুই যেন খুঁজে খুঁজে কাজ বার করিস।"

তপাই বলল, "আসলে ব্যাপাব কি জানিস, চুপচাপ বসে থাকতে আমার ভাল লাগে না।"

গৌতম বলল, "চুপচাপ বসে থাকতে হবে না। বরং এই সময়টা একটা কিছু করা যাক।"

"কী করবি?"

"এই ধর আমাদেব দুজনের সাহসের পরীক্ষা।"

এমন সময় শ্মশানের নিমগাছ থেকে একটা প্যাঁচা ডাকল—শ্যাঁ-স্-স্। শ্যাঁ-স্-স্। শ্যাঁ-স্-স্।

গৌতম বলল, "ওই যে প্যাঁচাটা ডাকল, ওর ডাকে তোর মনে কোনও প্রতিক্রিয়া হল কী?"

"না।"

"আমরা এখানে দুজনে আছি তাই। ধর যদি এখানে তুই একা থাকতিস?"

"তাতে কি? থাকতাম।"

"তোর ভয় করত না?"

"না। কিসের ভয়?"

"এই ধর, ভূতের।"

তপাই বেশ গম্ভীর মেজাজে বলল এবার, "ভূত আবার আছে নাকি? আর ওই তো

সেবার দেখলি ভূতের গলা মনে করে আঁৎকে উঠে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল একটা পাগলি ছাড়া কিছু নয়।"

"সত্যি, তোর ভূতে ভয় নেই? আমার কিন্তু আছে ভাই। তোরা এখানে সঙ্গে আছিস তাই, নাহলে রাত বিরেতে একা আমি ঘুম থেকে উঠে বাথরুমেও যাই না।"

তপাই বলল, "ধ্যুৎ। তোর দ্বারা তাহলে কিচ্ছু হবে না। ভূতের ভয় আসলে মনের ভয়। তুই বল না আমি এখুনি শ্মশানের কোণে ওই যে নিমগাছটা আছে ওই নিমগাছের মগ ডালে উঠে বসে থাকছি। যতক্ষণ না ডিকে আর নসীরামের ছেলে আসে ততক্ষণ একা বসে থাকব ওখানে।"

গৌতম তপাইকে একটা বিড়ি দিয়ে নিজে একটা ধরাল। তার পর বিড়িতে জোরে একটা টান দিয়ে আয়েস করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "ওই যে চিমনিটা আছে দেখছিস?"

"হ্যাঁ, দেখছি। হাসপাতালের গাদার মড়া ওইখানে পোড়ানো হয়।"

"ওই চিমনিটার ডালা সরিয়ে—ওর ভিতরে ঢুকে চুপচাপ একা বসে থাকতে পারবি তুই?"

তপাই চিমনির দিকে তাকাল। মস্ত উঁচু চিমনিটাকে দেখলেই যেন বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। চিমনির আশপাশে বর্ষার আগাছা ও কালকাসুন্দের ঝোপ জঙ্গল। সেই ঠেলে একা ভেতরে যেতে হবে।

তপাই বলল, "এ আর এমন কথা কি? তবে ভয় হচ্ছে সাপে না চোটায়।"

গৌতম বলল, "থাক। বুঝেছি।"

"তার মানে?"

"সোজা কথাটা বল না বাবা, পারবি না। অনেক আচ্ছা আচ্ছা সাহসী লোক আমি দেখেছি।"

এই কথা শুনেই তপাইয়ের মেজাজ গেল বিগড়ে। বলল, "তুই আমায় বিশ্বাস করছিস না?"

"কী করে করব? এই একটু আগে তুই শ্মশানের কোণে জঙ্গলের মাঝে নিমগাছে উঠতে যাচ্ছিলি। আর যেই বললুম চিমনির ভেতরে ঢুকতে অমনি অজুহাত দিলি সাপের।"

তপাই বলল, "এই কথা? বেশ তবে দেখ, বাপ কা বেটা কাকে বলে। আমি একলাই যাব এবং ওর ভেতরে ঢুকব।"

গৌতম বলল, "সত্যি ঢুকবি তুই?"

"ঢুকব। দশ টাকা বাজি।"

"কুড়ি টাকা।"

তপাই এক লাফে উঠে পড়ল। তারপর কোমরের গামছাটা বেশ শক্ত করে বেঁধে নিয়ে একটা গাছের ডাল ভেঙে সেটাকে লাঠি করে সেই ঘন অন্ধকারে জঙ্গল নাড়া দিতে দিতে ঝোপ ঝাড় ঠেলে এগিয়ে গেল চিমনির কাছে। তারপর গায়ের জোরে চিমনির নীচের লোহার ডালাটা তুলে ভেতরে ঢুকতেই দড়াম করে সশব্দে পড়ে গেল ডালাটা। তপাই দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরেও ডালাটার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল না। আসলে ও ভাবতেও পারেনি অমন ধারা ঘটবে বলে। তাহলে পরের কথায় কিছুতেই এমন বিপদের ঝুঁকি নিত না। তপাই প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল ডালাটা ঠেলে ওপরে তোলবার। কিন্তু

না। ওর যথাশক্তি প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হল সে।

তপাই তখন অসহায় ভাবে ভেতর থেকে চিৎকার করতে লাগল, "গৌতম! গৌতমরে...। শিগগির আয়। ডালাটা তোল।"

কিন্তু না। ওর কোনও ডাকই গৌতমের কানে পৌঁছুল না। গৌতম চিমনির কাছ থেকে দূরে বসেছিল। তাই সে জানতেও পারল না তপাইয়ের বিপদ কতখানি মারাত্মক হয়েছে।

অরণ্যে রোদন করাই সাব হল তপাইয়ের। সে দীর্ঘক্ষণ লোহার ডালাটাকে নাড়াচাড়া করে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল এক সময়।

ওদিকে বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেলেও তপাই যখন ফিরল না তখন গৌতমও ভয় পেয়ে ডাকাডাকি শুরু করল, "তপাই! চলে আয় ভাই। আর থাকতে হবে না তোকে। আমার একা একা ভয় করছে খুব।"

কিন্তু কে দেবে সাড়া?

গৌতমের শত ডাকেও কোন প্রত্যুত্তরই পাওয়া গেল না তপাইয়ের কাছ থেকে। ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে যাবার পর গৌতমের বুক শুকিয়ে গেল ভয়ে। মুখখানাও ফ্যাকাসে হয়ে গেল এক অজানা আশঙ্কায়।

তবে কি সত্যিই কোনও বিপদ হল তপাইয়ের?

ওকে কি সাপে কাটল? না চিমনির ভেতরে গাদার মড়ার ভূত ঘাড় মটকালো ওর? গৌতম একেই ভীতু, তার ওপর এই সব অজানা আশঙ্কার কথা চিন্তা করে হাত-পা কাঁপতে লাগল ওর।

একে এই বর্ষার ঘন ঘোর রাত। তার ওপর বাঁশতলার নাম করা শ্মশান। কেউ কোথাও নেই। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। আছে শুধু একটা মড়া। যে মড়াটা এখুনি ভূতে পেয়ে উঠে বসে ওর গলাটাকে টিপে ধরতে পারে।

এমন সময় হঠাৎ মনে হল গৌতমের, তপাই যখন চিমনির ভেতরে ঢুকল তখন চিমনির ভারী লোহার ডালাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দটা সে শুনতে পেয়েছিল। তবে কি! তবে কি তপাই ওর ভেতরে আটকা পড়ে গেল?

কথাটা মনে হতেই ওর সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল।

তাহলে তো এতক্ষণে দম আটকে সব শেষ।

ওকে উদ্ধার করার কোনও আশাই তো এখন আর নেই।

তপাই যে ইচ্ছে করে আসছে না বা সাড়া দিচ্ছে না তা তো নয়। আসলে ও চেষ্টা করেও বেরোতে পারছে না।

গৌতম ভাবল একবার সে নিজে গিয়ে চেষ্টা করে দেখবে। কিন্তু সেই ভয়াবহ চিমনির আকৃতি আর অন্ধকারে ঝোপ জঙ্গলের চেহারা দেখে ভয়ে এগোতে পারল না। সে ভীতিবিহ্বল চোখে চিমনির দিকে তাকিয়ে বসে বসে ঘামতে লাগল। ইতিমধ্যে নসীরামের ছেলে ও ডিকে ফিরে এল।

ওরা এসে তপাইকে না দেখতে পেয়ে এবং গৌতমকে ওইভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার রে? কী হয়েছে তোর? তপা কই?"

গৌতমের মাথায় তখন একটা দুর্বুদ্ধি খেলা করে গেল। সে ভাবল সে যদি আসল

সত্য প্রকাশ করে এবং ওরা সবাই মিলে চিমনির ডালা তুলে দেখে তপাইয়ের প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে তাহলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। হয়তো খুনের দায়ে ধরা পড়বে ও। তাই সত্য গোপন করে সে নির্বিকারভাবে বলল, "কী জানি। তোরা যাবার পরই আসছি বলে আমাকে বসিয়ে রেখে সেই যে গেল এখনও আসবার নাম নেই।"

নসীরামের ছেলে বলল, "আশ্চর্য ব্যাপার তো। এমন তো কখনও করে না ও। তাছাড়া আমরা কি এখন গেছি? এই রাতে এ অঞ্চলে কোথায় কী দরকার থাকতে পারে ওর, যে এত দেরি হবে?"

ডিকে বলল, "এত রাতে তুই-ই বা ওকে যেতে দিলি কেন?"

গৌতম বলল, "আমি কি করব? ও কি কচি খোকা, যে ধরে রাখব?"

ডিকে বলল, "আমার মনে হয় ওর কোনও বিপদ হয়েছে। নাহলে এরকম করবার ছেলেই নয় ও।"

গৌতম বলল, "এমনও হতে পারে, ও হয়তো শ্মশানের বাইরে গিয়েছিল কোন কাজে, সেই সময় ওকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।"

নসীরামের ছেলে বলল, "শুধু শুধু শ্মশানের বাইরেই বা যাবে কেন ও? এই রাত দুপুরে কি দরকার ওর শ্মশানের বাইরে যাবার? তাছাড়া বিনা দোষে পুলিশই বা ওকে ধরতে যাবে কেন? ধরলেও ওর কোমরে গামছা বাঁধা। মড়া পোড়াতে এসেছে ও। পুলিশ ওকে ছেড়ে দিতই।"

ডিকে বলল, "খুবই রহস্যময় ব্যাপার! কী এমন হল ওর যে আসছি বলে বাইরে গেল আর ফিরে এল না?"

আকাশে তখন গুর গুর করে মেঘ ডেকে উঠল।

ডিকে আর নসীরামের ছেলে তবুও একবার শ্মশানের বাইরেটা দেখে এল। তারপর শ্মশানে এসেও চেঁচিয়ে ডাকল, "তপা! এই তপা! তপাই...?"

শ্মশানভূমি আগের মতই নীরব। সাড়া নেই শব্দ নেই। একটা মড়াখেকো কুকুর শুধু ওদের ডাকের রেশ মিলিয়ে যেতেই প্রত্যুত্তর দিল—ভৌ। ভৌ-উ-উ-উ।

ডিকে বলল, "আর অপেক্ষা করা যায় না। এদিকে আকাশের অবস্থা খারাপ। আবার যদি নামে তো দয়ে মজতে হবে একেবারে।"

নসীরামের ছেলে বলল, "হ্যাঁ। এবার শ'য়ে চড়ানো যাক বুড়িকে। জল ছেঁচে কাঠ সাজা।"

গৌতম বলল, "রাত দেড়টা বাজে।"

রাতের অন্ধকারে চিতা সাজিয়ে বুড়িকে চিতায় তুলে অগ্নি সংযোগ করতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চিতা।

ডিকে আর নসীরামের ছেলে চিন্তান্বিত হয়ে বসে রইল। গৌতম মাথা হেঁট করে বসে রইল চুপচাপ। গৌতম একবার চিমনির দিকে তাকাল। একবার চিতার আগুনের দিকে। আর একবার নসীরামের ছেলে ও ডিকের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করল ওরা ওকে সন্দেহ করছে কিনা। তারপর একবার ভাবল হয়তো সময় আছে। এখনও হয়তো মরেনি তপাই। সত্যি কথাটা এবার খুলে বললে কেমন হয়? ওরা সবাই মিলে ডালাটা টেনে তুললে তপাই নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে। এবং সেটা করাই হবে ওর বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু

যদি বিপরীত হয়? যদি এতক্ষণে ও সত্যিই দম আটকে মরে গিয়ে থাকে তাহলে? তাহলে কী হবে? বন্ধুরাই তো ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। নিজেরা বাঁচবার জন্যে ওকেই তুলে দেবে পুলিশের হাতে। তারপর হাজত জেল ফাঁসির দড়িতে লটকানো। মনে পড়লেই সারা শরীর ঝিমঝিমিয়ে ওঠে। বিশেষ করে ডিকেটা যা বিষখোবরা ছেলে, হয়তো রাগের চোটে ওকেই এখানে শেষ করে বুড়ির সঙ্গে একই চিতায় চড়িয়ে দেবে। তাই সব কিছু ভেবে-চিন্তেও চুপচাপ রইল সে। যে রহস্য অন্ধকারে রয়েছে তা অন্ধকারেই থাক। চিমনির ভেতর মরে পচে গলে শেষ হয়ে যাক তপাই। কোনও প্রমাণ থাকবে না, কিছু না। শুধু একটা ছেলের নাম নিরুদ্দেশের খাতায় লেখা হয়ে থাকবে। মাসখানেক মাস দেড়েক বাদে যখন গাদার মড়া পুড়তে আসবে চিমনিতে তখন ওই লোহার ডালা তুলে তপাইয়ের কঙ্কাল দেখে অনুমানও করতে পারবে না কেউ আজকের রাতের এই মর্মান্তিক পরিণতিকে। শুধু গৌতম জানবে আসল রহস্যটা কি। কিন্তু কাল ওর মাকে গিয়ে কি বলবে গৌতম? গৌতম নিজেই যে ওকে বাড়ি থেকে ডেকে এনেছিল।

এবার তপাইয়ের কথায় আসা যাক।

তপাই কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও হাল ছাড়ল না। সে লোহার ডালাটা প্রাণপণে তুলে ধরার অনেক চেষ্টা করেও যখন কিছুতেই কিছু করতে পারল না তখন ঘর্মাক্ত কলেবরে বসে পড়ল।

উঃ। কী দুর্গন্ধ।

কী বীভৎস নরক একটা।

ওর সারা গা ঘুলিয়ে উঠল।

আলো নেই। বাতাস নেই। এখান থেকে মুক্তি পাবার কোনও আশ্বাস নেই। শুধু দম আটকানো মৃত্যুর আলিঙ্গন রয়েছে এখানে। এখানে কবরের বিভীষিকা। এখানে বাঁচার জন্যে যতই হাত-পা ছোড়ো, যতই আর্তনাদ কর, যত জোরেই চেঁচাও, এ ডাক কেউ কোনওদিন শুনতে পাবে না। শুধু ভয়ঙ্কর মৃত্যুর নির্মম কালো হাত এক সময় গলার টুঁটি টিপে ধরবে।

কিন্তু তবুও হাল ছাড়ল না তপাই। সেই আলো বাতাসহীন দুর্গন্ধময় চিমনির ভেতর বসেও উর্ধ্বমুখে তাকিয়ে দুহাত বাড়িয়ে বাঁচবার চেষ্টা করল সে!

গাদার মড়ার চিতাভস্মে ওর সর্বাঙ্গ মাখামাখি। নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাকেমুখে ঢুকে যাচ্ছে সেই ছাই। গা ঘিন ঘিন করছে। তবু উপায় কী? মৃত্যু যখন আসবে তখন মরবে। কিন্তু তার আগে বাঁচার জন্য সব রকম চেষ্টা সে করে দেখবে।

মুক্তির উপায় খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একটা রাস্তা দেখতে পেল সে। ওইভাবে চেষ্টা করলে হয়তো বাঁচার আসা থাকতে পারে। তাই বুদ্ধিটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সচেষ্ট হল সে। এতে যথেষ্ট বিপদ আছে যদিও তবুও এছাড়া উপায় বা কী? চিমনির এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল মেপে দেখল সে। তারপর একবার ওঠার জন্যে সচেষ্ট হয়েই হঠাৎ কি ভেবে চারদিক হাতড়াতে লাগল।

গাদার মড়ার সব তো পোড়ে না। একটা অর্ধগলিত শবের হাত পেয়ে গেল তাই।

হাতটা কোমরের সঙ্গে গামছা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিল তপাই। একবার যদি কোনওরকমে এর ভেতর থেকে বেরোতে পারে তাহলে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারটা হাতে

হাতেই দিয়ে দেবে ও।

ওর সর্বাঙ্গ তখন চিতাভস্ম ও দেওয়ালের ভূষোতে মাখামাখি হয়ে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছে। এর বাইরের জগতে একবার গিয়ে পৌঁছতে পারলে সাক্ষাৎ শ্মশানভৈরব হয়েই দেখা দেবে সে।

এই ভেবে ভগবানকে স্মরণ করে চিমনির এক দেওয়ালে পিঠ এবং অপর দেওয়ালে পা দিয়ে একটু একটু করে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল।

প্রথম দিকে ওঠার সময় দু'একবার হড়কে নেমে এলেও বার বার চেষ্টার পর এক সময় সে বহু কষ্টে ওপরে উঠে পড়ল।

আর ভয় নেই। আচমকা বজ্রাঘাতে যদি মৃত্যু না হয় তো চিমনির জঠর থেকে, নরকের দুর্গন্ধ থেকে বেরিয়ে আসার পর মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত সে হতে পারবে। আঃ। কী নির্মল বাতাস। বাইরের জগতের আলো বাতাস যে এত সুন্দর হয় তা এই প্রথম অনুভব করল তপাই। ভেতরের ওই দুর্গন্ধমুক্ত হয়ে সে যেন নবজীবন লাভ করল। বাইরে তখন টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।

সেই বৃষ্টিতে ওর গায়ের ভূযো কালি ছাই মাখামাখি হয়ে চ্যাট চ্যাট করতে লাগল।

চিমনির মাথায় বসে তপাই একবার নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল চিতার আগুন জ্বলছে এবং ওরা তিনজনে নীরবে বসে আছে।

তপাই বুঝতে পারল গৌতম ব্যাপারটা একদম চেপে গেছে ওদের কাছে। ভয়ে কিছু বলে নি। বললে ওরা কখনোই ওইভাবে চুপচাপ বসে থাকত না। একটা কিছু ব্যবস্থা অন্তত করত।

তপাইয়ের মুখ থেকে অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এল 'ব্যাটা বেইমান'। রাগে ওর সারা শরীর রী রী করতে লাগল। মাথাটা যেন জ্বলে উঠল প্রতিহিংসা নেবার উল্লাসে।

এবার ও নীচে নামার চেষ্টা করল।

বাইরের দিক থেকে নীচে নামাটা অবশ্য কোনও কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। নীচে থেকে একদম ওপর পর্যন্ত একটা লোহার সরু মই চিমনির দেওয়ালে আঁটা আছে।

তপাই সেই মই বেয়েই তর তর করে নেমে পড়ল নীচে।

নীচে নেমেও তপাই কিন্তু ওদের সঙ্গে দেখা করতে গেল না। এখন সর্বাগ্রে যা করতে হবে তা হল প্রতিশোধ নেওয়া।

শ্মশানের পাঁচিলের কাছে একটা চৌবাচ্চা আছে। সেখান থেকে জল নিয়ে শ্মশানযাত্রীরা চিতায় ঢালে। তপাই করল কি সেই চৌবাচ্চার ধারে ঘন অন্ধকারে কতকগুলো ঘেঁটু ও মানগাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল চুপ করে। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা কামড়াল ওকে। পায়ের ওপর দিয়ে টিকটিকি চলে গেল। ও কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করল না সেদিকে। হোক কষ্ট। তবু ও বদলা নিতে ছাড়বে না। এমন ভয় দেখাবে যে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে বাছাধনের।

যথাসময়ে মড়া পোড়ানো শেষ হল। এবার জল ঢালার পালা।

তিনজনেই এগিয়ে এল কলসি নিয়ে।

প্রথমে ডিকে। পরে নসীরামের ছেলে। তারপর গৌতম।

গৌতম ভয়ে ভয়ে এসে চৌবাচ্চায় নামার আগে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল

চিমনিটার দিকে। কি ভাবল সে কে জানে? তারপর যেই না কলসিটা জলে ডোবাতে যাবে অমনি তপাই কোমরের সঙ্গে গামছায় বেঁধে আনা সেই দুর্গন্ধযুক্ত আধপচা মড়ার হাতটা ওর পিঠের ওপর রেখে দিল।

যেই না দেওয়া অমনি সেই হিম শীতল দুর্গন্ধময় মৃত হাতের পরশে শিউরে উঠল গৌতম। তারপর চমকে উঠে মুখ তুলেই কালি ঝুলি মাখা একটা কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখে গোঁঙিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল সে।

গৌতমের গোঙানিতে ডিকে আর নসীরামের ছেলে ছুটে এল। ওরা এসে যা দেখল তা আরও ভয়ঙ্কর। ভয়ে ওদেরও হাত পা পেটের ভেতর ঢুকে গেল। প্রেত কি পিশাচ কিছুই বুঝতে পারল না ওরা। দুজনে হাঁ করে চেয়ে বোবা হয়ে গেল।

ওরা দেখল রাতের অন্ধকারে ভয়ঙ্কর একটা কিছু অচৈতন্য গৌতমকে পাঁজাকোলা করে উঠিয়ে নিয়ে আসছে চৌবাচ্চা থেকে।

নসীরামের ছেলে সভয়ে জড়িয়ে ধরল ডিকেকে। ডিকেও জাপটে ধরল নসীরামের ছেলেকে। জড়াজড়ি করে ধরে থাকলেও ওদের মনে হল এখনই পড়ে যাবে ওরা।

গৌতমকে ওপরে উঠিয়ে প্রেতটা বলল, "ভয় নেই রে। আমি তপাই। বিশ্বাসঘাতকতার বদলা নিলাম।"

এ তো তপাই।

এ গলা তো ওদের বহু পরিচিত।

ডিকে আর নসীরামের ছেলে অবাক হয়ে বলল, "তপাই তুই!"

"হ্যাঁ আমি।"

"তোর এ রকম অবস্থা হল কী করে?"

"এই বিশ্বাসঘাতকটা বেইমানি করে আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। নেহাৎ ভগবানের দয়ায় আর নিজের আপ্রাণ চেষ্টায় এ যাত্রা বেঁচে গেছি আমি।"

ডিকে বলল, "আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"এখন বোঝাবুঝির সময় নয়। ওর মুখে চোখে জল দে। তারপর গঙ্গায় গিয়ে স্নান করি চল। কাল সকালে সব বলব।"

ওরা কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে তপাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তিন

এই ঘটনার পর থেকে তপাই আর মড়া পোড়াতে যায় নি। ওর বন্ধুরাও দলছুট হয়ে গেল তাই। নসীরামের ছেলে তার বাবার ধোবিখানা দেখাশোনা করতে লাগল। গৌতম পাড়ায় একটা চায়ের দোকান দিল। ডিকে ভিড়ে গেল সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকারদের দলে। আর তপাই? একদম চুপচাপ।

মড়া পোড়ানোর মতো অপকর্মটা যে ওর মাথা থেকে নেমেছে এই দেখে ওর বাবা মা খুব খুশি। তপাই দিব্যি খায় দায় ঘুরে বেড়ায় সিনেমা দেখে। আর পাড়ায় মস্তানি করে। ইদানিং লবা নামে ওর এক সঙ্গী জুটেছে। লবার ভাল নাম নবনী। নবনী থেকে নব। আর নব থেকে লবা। লবা নতুন ড্রাইভারি শিখেছে। এখনও লাইসেন্স পায় নি। তাই জটুদার গ্যারেজে দিন রাত হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। জটুদা পাকা ট্যাক্সি ড্রাইভার। লবাকে স্টিয়ারিং

ধরতে সেই শিখিয়েছে। লাইসেন্স বার করার দায়িত্বও তার।

সেদিন দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে পান চিবোতে চিবোতে তপাই জটুদার গ্যারেজে যেতেই লবা বলল, "তপাই তারকেশ্বর যাবি? বাবার মাথায় জল দিতে?"

তপাই প্রস্তাব শুনে লাফিয়ে উঠল, "নিশ্চয়ই। কিন্তু কি করে যাব?"

লবা চোখ কপালে তুলে বলল, "কী করে যাবি মানে? যে ভাবে সবাই যায় সেই ভাবেই যাবি। অর্থাৎ এখান থেকে বাসে চেপে হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে শ্যাওড়াফুলি। শ্যাওড়াফুলি থেকে বাঁকে করে জল নিয়ে ব্যোম্ ব্যোম্ তারক ব্যোম্ করতে করতে তারকেশ্বর।"

তপাই হেসে বলল, "তুই তো বেশ মুখস্থ নামতার মতো গড় গড় করে বলে গেলি। কিন্তু মালকড়ি আসবে কোত্থেকে? পকেট তো গড়ের মাঠ। বলি টাকা পয়সা চাই না?"

"তা তো চাই। তবে তুই মন করলে টাকার অভাব? তোলা তোল।"

"না। এই সেদিন চাঁদা তুলে বামুন পাড়ার একটা মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। আবার চাঁদা চাইতে গেলে মারতে আসবে লোকে।"

"তোকে!"

"হয়তো মুখে কিছুই বলবে না। কিন্তু এই সব ঝুট মুট ব্যাপারে চাঁদা তুলতে থাকলে আসল কাজের সময় কিন্তু চাঁদা চেয়েও পাব না আর। কাজেই ও ব্যাপারে আমি নেই ভাই।"

"তবে তো যাওয়াই হল না। জটুদারও ছেলের অসুখ বলে দেশে গেছে। নাহলে জটুদার কাছেই চাইতাম।"

তপাই অনেকক্ষণ ধরে গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "দেখ, আমাদের রজনীখুড়ো কিন্তু দিলদার লোক। একবার গিয়ে দেখব খুড়োর কাছে? যদি কিছু টাকা ধার দেয় আমাদের?"

"রজনীখুড়ো! মানে গৌতমের জ্যাঠামশাই?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু গৌতমের সঙ্গে তোর সেই ব্যাপারটার পর থেকে যে কথাবার্তা নেই শুনেছিলুম।"

"কে বলল! আসলে সেটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। আমি কথাবার্তাও বলি, ওর দোকানে বসে মাঝে মধ্যে আড্ডাও দিই। তবে কিনা আমাদের মড়া পোড়াতে যাওয়ার উৎসাহটা মরে গেছে।"

লবা বলল, "তাহলে একবার চল না গিয়েই দেখি খুড়োর কাছে।"

"চল তবে।"

ওরা দুজনে তখন গুটি গুটি গিয়ে হাজির হল খুড়োর ওখানে।

খুড়ো তখন টালির ঘরের দালানে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ভুর ভুর করে গড়গড়ার নলে টান দিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন। এমন সময় তপাইদের দেখে ফোকলা মুখে একগাল হেসে বললেন, "কে র‍্যা!"

"আমি তপাই। আর এ হচ্ছে লবা।"

"অ। তপা! তোকে চিনি। কিন্তু ওটাকে তো চিনলুম না।"

"ও আমার নতুন দোস্ত।"

"বেশ বেশ। তা কী মনে করে?"

তপাই আবদার করে বলল, "খুড়ো একটা কথা বলব? তোমার তো অনেক টাকা। গোটা পঞ্চাশেক টাকা আমাদের ধার দেবে?"

"শোধ করবি কোত্থেকে? তার কেটে?"

"কী যে বল খুড়ো। শোধ তোমাকে ঠিক করে দেব। আমার নাম তপাই। তুমি তো চেনো আমাকে।"

খুড়ো হেসে বলল, 'টাকা ধার দেওয়ার ব্যাপারে আজকাল কাউকেই আমি বিশ্বাস করি না। যাকে ধার দিই সে তো ধার শোধ করেই না উপরন্তু আবার এসে ধার চায়। তবে তুই যখন বলছিস...।"

"বাবার দিব্যি। বাবা তারকনাথের দিব্যি। আমরা দুজনে বাবার মাথায় জল ঢালতে যাব তাই টাকার দরকার। আসলে বামুনপাড়ার একটা মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে পকেট একদম খালি হয়ে গেছে।"

খুড়ো এবার শিরদাঁড়াকে সোজা করে বসে বলল, "শোন, পরের উপকার করা খুব ভাল। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে নিজেদের একেবারে ফতুর করিস না বুঝলি? ঠিক আছে। পঞ্চাশ টাকা কেন তোদের আমি একশো টাকা দেব। আমার একটা কাজ করে দিবি তোরা?"

"কী কাজ বল? কাউকে ধরে পিটিয়ে দিতে হবে? এখুনি দিচ্ছি।"

"আরে না না। ওসব নয়। কাছে আয়, কানে কানে বলি।"

তপাই খুড়োর দিকে ঝুঁকে আসতেই খুড়ো ফিস ফিস করে বলল, "তোরা তো এত লোকের বে দিচ্ছিস। এবার আমার একটা বে দে দিকিনি।"

তপাই তো এক লাফে লম্বা, "বল কি খুড়ো! তুমি বিয়ে করবে? রসিকতা করছ না তো?"

"রসিকতা নয় রে, রসিকতা নয়। সত্যি সত্যিই বলছি। আমার এত টাকা খাবে কে? ভাইপো ভাইঝিরা কেউ দেখছে না। সব সময় দিন নেই ক্ষণ নেই শুধু টাকা দাও, টাকা দাও। দিলে ভাল না দিলেই মন্দ। টাকা নিলে ফেরৎ তো দেয়ই না উপরন্তু এখন দিই না বলে কেউ দেখেও না। ওরা শুধু দিন গুণছে কবে আমি মরব। আমি মরলেই ওদের পোয়া বারো। সব টাকা ওদের হয়ে যাবে। তাই আমি ঠিক করেছি আমার এক পয়সাও যাতে ওরা না পায় সেই ব্যবস্থা করে যাব! আর সে ব্যবস্থা করতে গেলে এই বুড়ো বয়সে একটা বে না করা ছাড়া উপায় নেই।"

"কিন্তু খুড়ো, এই বয়সে বিয়ে করে পাড়ায় তুমি মুখ দেখাতে পারবে?"

"ক্যানো পারবুনি? কার খাই পরি?"

"তা তো বটেই। কিন্তু খুড়ো তোমার বয়সটা?"

"বয়েস বেশি নয়। আমাকে যতটা বুড়ো দেখায় ততটা আমি নই। এখন আমার বাহাত্তর বছর বয়েস। আমি লব্বুই বছর বাঁচব।"

"তুমি শতায়ু হও খুড়ো। তবু আমি বলি কি বিয়ে করে তুমি গ্রামের দিকে চলে যাও। কিছু পুকুর বাগান কিনে ভোগ দখল কর। নাহলে এখানে থাকলে নানা লোকে নানা কথা

বলবে। কেউ টিটকিরি মারবে। হাসাহাসি করবে। বরং গ্রামের দিকে থাকলে তোমার শরীর মন মেজাজ সবই ভাল থাকবে।''

খুড়ো শুনেই ফোঁস করে উঠল, ''কী বললি? টিটকিরি মারবে? কে! কে মারবে? তাহলে জেনে রাখ, তোরা কী মস্তান। তোদের থেকেও ঢের বেশি মস্তান আমি। এই বুড়ো হাড়েও আমি স্ট্যাব করতে পারি। হাজতবাসের ভয়ও আমার নেই। কদিন হাজতে রাখবে আমাকে? আমায় তো সকালে ঢোকালে বিকেলে মরব। আমার সঙ্গে লাগলে কেটে চ্যালা করে ফেলব না একেবারে। যদি পারিস তো ব্যবস্থা কর। পাড়াশুদ্ধ লোককে আমি নেমন্তন্ন করে খাওয়াব কথা দিলুম। আমার আত্মীয় স্বজনদের মুখে যদি আমি ছাই না দিই তো কি কথাই বলেছি। তবে কাজটা হবে খুব চুপি চুপি।''

তপাই বলল, ''সে কথা আবার বলতে? আমি এক মাসের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।''

''কর। যদি আমার জন্যে সত্যিই কিছু করতে পারিস তাহলে তোকে আমি এক হাজার টাকা দেব। ওই টাকা নিয়ে ব্যবসা করবি তুই।''

তপাই উল্লসিত হয়ে বলল, ''ঠিক দেবে তো খুড়ো?''

''অবিশ্বাস হচ্ছে? দেখবি আমার কত টাকা? দেখ। বলে ঘরে ঢুকে ঘরের কোণে এগিয়ে গেল। তারপর ময়লা কাপড় ঢাকা টেবিলের মতো একটা জায়গার ওপর থেকে ছেঁড়া বই পত্তরের গোটাকতক গোছ নামিয়ে কাপড়টা সরাল। কাপড়টা সরাতেই বোঝা গেল সেটা একটা সিন্দুক। খুড়ো কোমরের কসি থেকে চাবি বের করে সিন্দুক খুলতেই দেখা গেল বেশ কয়েকটা পাঁচ দশ টাকার বান্ডিল শোভা পাচ্ছে সেখানে।

তপাই আর লবা হাঁ করে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

খুড়ো বলল, ''দেখলি তো? আরও আছে। এর একশো গুণ। সে সব পোস্ট অফিসে জমা আছে। কাজেই মিথ্যে কথা আমি বলছি না। এই বলে দশ টাকার দশটা নোট বার করে তপাইয়ের হাতে দিয়ে খুড়ো বলল, ''যা। বাবার মাথায় জল ঢেলে আয়। তবে আমার কথাটাও মনে রাখিস কিন্তু। তোর এই বন্ধুর সামনেই বলে রাখলুম, এক হাজার টাকা তোকে আমি দেব।''

টাকা নিয়ে তপাই আর লবা তো প্রায় নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল রাস্তায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল পৌনে দুটো। রইল এখন বাবার মাথায় জল ঢালা। নবরূপমে 'পকেটমার' হচ্ছে। দেবানন্দের বই। ছোট্ ছোট্। ডিকে তো আছেই। তার ওপর পকেট ভর্তি টাকা। কাজেই টিকিটের আর ভাবনা কি?

সন্ধের সময় আমি অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি তপাই আর লবা বসে আছে। ওদের পুলকিত মুখ দুটি দেখেই বুঝলাম কিছু একটা আনন্দ সংবাদ আছে নিশ্চয়ই। যাই হোক, আমি বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে বললাম, ''কী খবর তপাই?''

''খবর আছে মামা। খবর আছে। আগে চা রুটি খান, তারপর বলছি। এখন আপনার ওপরই আমাদের সব কিছু নির্ভর করছে।''

''আমার ওপর!''

''হ্যাঁ। আমাদের পাড়ার এক বাহাত্তর বছরের বুড়োর বিয়ে হবে। এবং সে বিয়ে

আমাদেরকেই দিতে হবে। অতএব আপনার সাহায্য চাই।''

শুনেই তো চোখ কপালে উঠে গেল আমার, ''বলিস কীরে!''

লবা তো হেসে গড়িয়ে পড়ল।

আমি আমার ঘরে ঢুকে তক্তাপোশে গুছিয়ে বসে বললাম, ''কী তামাশা করছিস রে ভর সন্ধেবেলা?''

''তামাশা নয় মামা, তামাশা নয়। সত্যি সত্যিই। আপনাকে বরকর্তা হতে হবে। বরযাত্রী যেতে হবে।'' বলে আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল তপাই।

''কিন্তু কনে? কনে কোথায় পাবি?''

''সেই জন্যেই তো আপনার কাছে ছুটে এসেছি মামা। তবে একান্ত না পাওয়া যায় আমাদের বন্ধু বান্ধবের ভেতর থেকেই কাউকে সাজিয়ে নিয়ে ঝামেলাটা চুকিয়ে দেব।''

''সে কি!''

''তাছাড়া বাহাত্তর বছরের বুড়োর বিয়ে ছেলেদের সঙ্গে হবে না তো কাদের সঙ্গে হবে বলুন?''

আমি একবার ঘাড় মাথা চুলকে নিয়ে বাইরে এসে পায়চারি করে বললাম, ''দেখ ব্যাপারটাকে তোরা হয়তো খুব মজা হিসেবে নিয়েছিস। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। আমি কিন্তু এটাকে ঠিক সেইভাবে নিতে পারছি না। যে মানুষটা সারা জীবন বিয়ে থা না করে কাটিয়ে দিল, আজ এই বুড়ো বয়সে কেন সে বিয়ের কথা চিন্তা করছে তা একবার ভেবে দেখেছিস? যে কোনও মানুষেরই বৃদ্ধ বয়সে একা থাকা খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। আদর যত্ন সেবা শুশ্রূষা, রাত-বিরেতে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ওঠা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর জন্যে প্রতিনিয়ত একজন মানুষের সাহায্যের খুবই দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সুস্থ সবল মানুষেরা ওইসব অসহায় মানুষদের কষ্টের কথা একবারও চিন্তা করে দেখি না। কাজেই সত্যসত্যই বুড়োর জন্যে এখন এমন একজনকে দরকার যে সেই সব দিকগুলো বিবেচনা করে বুড়োকে দেখা শোনা করবে। অন্য কোনও দেখা শোনার লোক রাখলে তারা টাকার লোভে মেরেই ফেলবে বুড়োকে। কিন্তু বুড়োর বিয়ে করা বউ তো তা পারবে না। অতএব কোনওরকম ফাজলামি নয়। বিয়ে দিতেই হবে বুড়োর। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কিছু কি করা যাবে?''

''করতেই হবে মামা। দেখুন না, আপনাদের অফিস টফিসে সে রকম কেউ নেই?''

আমি লাফিয়ে উঠলাম, ''ওরে বাবা। ওসব অফিসের ব্যাপার নয়। দুস্থ দরিদ্র অনাথা এবং অসহায় গোছের কারও খোঁজ করে দেখতে হবে।''

''সেরকম কেউ আছে?''

''এখুনি বলি কি করি!''

''একটু চেষ্টা করে দেখুন না মামা। কেননা এই বিয়েটা দেওয়াতে পারলে এক হাজার টাকা পাব আমি।''

''ঠিক আছে। তোরা নিজেরা এ ব্যাপারে আর এগোস না। আমিই ব্যবস্থা করছি। কাল বিকেলে বাড়ি থাকিস। আশা করি উপায় একটা বাতলে দিতে পারব।''

তপাই আর লবা চলে গেল।

ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। হাওড়া জেলার সাঁকরাইলে এই রকম একজনের খোঁজ আমার জানা ছিল। স্বামী পুত্র হীনা। কেউ কোথাও নেই তার। কিছুদিন আগে আমাদের বাড়ি এসেছিল এখানে থাকা খাওয়ার বিনিময়ে কাজকর্ম করবে বলে। কিন্তু আমাদের একটা অসুবিধা থাকায় আমরা রাজি হইনি। এখন হঠাৎ তার মুখটা মনে পড়ে গেল। দুটো পেট ভরে খাবার জন্যে সে কি কান্না তার। তাই ভাবলাম সকালে অফিস না গিয়ে সরাসরি তার ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বললে বুড়োরও উপকার হবে এবং সে বেচারিও বর্তে যাবে। আর বুড়োর যে রকম টাকা পয়সার কথা শুনলুম তাতে বুড়ো মরে গেলেও অসুবিধে হবে না তার।

এই ভেবে পরদিন সকালেই আমি সাঁকরাইলে চলে গেলাম। তারপর অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করালাম তাকে। একজনের টাকা ব্যাঙ্কে পচবে। পাঁচ ভূতে খাবে। আর একজন ক্ষুধার জ্বালায় তিল তিল করে মরবে এ তো হতে দেওয়া যায় না। কাজেই ব্যবস্থা একটা করতেই হয়।

অতএব ব্যবস্থা করে সোজা চলে এলাম কদমতলায় দিদির বাড়ি।

দিদি জামাইবাবু দুজনেই লাফিয়ে উঠলেন আমার কথা শুনে, "বলিস কীরে! রাজি হল?"

"না হবার কি আছে?"

জামাইবাবু বললেন, "যেমন ভাগনা তেমন মামা তো। তা আমরাও নেমন্তন্ন পাচ্ছি তো এ বিয়েতে?"

"শুধু আপনারা কেন, পাড়া শুদ্ধু লোক সবাই নেমন্তন্ন পাবে।"

তপাই বলল, "তাহলে মামু, এবার উঠে পড়ে লাগা যাক। চলুন আমরা খুড়োর ওখানে যাই।"

তপাইয়ের সঙ্গে আমি খুড়োর ওখানে যেতে খুড়ো তো দারুণ খুশি। বলল, "তপা! মামাবাবু যখন এসেছেন তখন মামাবাবুর জন্য কিছু মিষ্টি আনতে হয় যে। যা মোড়ের দোকান থেকে দশ টাকার রাজভোগ নিয়ে আয়। ওই বালিশের তলায় টাকা আছে। নিয়ে যা।"

তপাই চলে গেলে আমি বললাম, "খুড়ো, আপনার সঙ্গে এই প্রথম আলাপ হচ্ছে আমার। পরে অবশ্য আরও আসব যাব। তবে—।"

"এর ভেতরে কোনও তবে টবে নেই। আমার সব দায় দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে মামা। এরা নেহাতই ছেলেমানুষ।"

"কিন্তু আমার ভাগনাকে যেটা দেবেন বলেছিলেন সেটা ঠিক দেবেন তো?"

"ওমা! সে কি কথা। ভদ্দরলোকের ছেলে কখনও কথার খেলাপ করতে পারি? বে'র দিন সকালেই আমি দিয়ে দেব।"

"ঠিক আছে।"

"তবে আমি কিন্তু মামা সব আপনার ওপরই ছেড়ে দিলাম। এ পাড়ার কোনও লোক যেন নেমন্তন্ন থেকে বাদ না যায়। সবাইকে দমভোর খাওয়াব। আমার তো দিন শেষ। কী করব মামা অত টাকা আগলে রেখে? তাই ভাবছি এই উপলক্ষে পাড়ার লোকগুলোকে একটু আনন্দ করে খাইয়েই দিই। বুড়ো বয়সে বে থা করার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু

অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলুম এছাড়া আমার উপায়ও নেই। যে আমার দেখা শোনা করবে সেই পাবে আমার সম্পত্তি টাকা পয়সা। অথচ এই সবের লোভ দেখিয়ে কাউকে এনে রাখতেও সাহস হয়নি আমার। যদি কেউ রাত্তিরবেলা দম আটকিয়ে মেরে দেয়? আর বউ তো তা পারবে না। আমার ভাইপোরা এই বার জব্দ হবে। ওরা ভেবেছিল আমি মরলেই লুটে পুটে খাবে সব। কিন্তু সেটি হচ্ছে না। দুঃখের কথা কি বলব মামা জ্বর হলে একটু ওষুধ এনে দেয় না। টাকা ভাঙিয়ে কিছু আনতে দিলে ভাঙানি ফেরৎ দেয় না। সেদিন রাত্তিরবেলা কি দারুণ পিপাসা পেয়েছিল। জল জল করে মরে গেলুম তা আমার মুখে কেউ একটু জল দিলে না মামা। টাকা পয়সা চাইলে যদি ধার না দিই তো বলে কিনা আমার পোস্ট অফিসের বই কাগজ পত্তর সব পুড়িয়ে দেবে।"

আমি নীরবে সব শুনলাম। তারপর বললাম, "ওসব ব্যাপার নিয়ে আর চিন্তা করবেন না! আপনি যা করতে চলেছেন এই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। এবার দেখবেন পাড়ায় আর মুখ দেখাতে পারবে না আপনার ভাইপোরা। লোকে ছিঃ ছিঃ করবে। গায়ে থুতু দেবে।"

আমার কথা শুনে বুড়ো তো বেজায় খুশি। একটু পরেই তপাই রাজভোগ নিয়ে এলে মনের আনন্দে মিষ্টি মুখ করলাম। তারপর সেদিনকার মতো বিদায় নিয়ে চলে এলাম বাড়িতে।

কয়েকদিনের চেষ্টায় সব ব্যবস্থাই পাকা হয়ে গেল। পাড়ার লোকেরা সবাই সপরিবারে নিমন্ত্রিত হলেন। আমার জামাইবাবু নীলমণি বাঁড়ুজ্যে এসব ব্যাপারে খুব পাকা লোক। তিনিই সমস্ত কিছু কেনা কাটা, হালুইকর ডাকা, ভাল মন্দ কি কি খাওয়া যায় সে সবের ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

রজনীখুড়োর এই বিয়ের ব্যাপারটা মজার হলেও নেমন্তন্ন পেয়ে পাড়ার লোকেরা সবাই খুশি হল খুব। অফিস কামাই করেই কাজে লেগে গেল অনেকে। বুড়োর আত্মীয় স্বজনরা লজ্জায় মুখ ঢাকতে দেশে পালাল।

বিয়ের দিন বরযাত্রী যাবার জন্যে চ্যাংড়াও জুটল প্রায় ডজন খানেক। সেই দেখে আমরা বড়রা তো সবাই গা ঢাকা দিলাম। দাদু দিদিমার বিয়েতে নাতিরাই আনন্দ করুক।

জটুদার গ্যারাজ থেকে জটুদার ভাড়া খাটা ট্যাক্সিটা ম্যানেজ করে নিয়ে এল লবা। সেই গাড়ি সাজানো হল ফুল দিয়ে! পুরুতের কাজটা আমার বড় ভাগনা শংকরই করে দিল বই দেখে। তারপর কোনও এক অশুভক্ষণে বরের গাড়ি নিয়ে রওনা হল ওরা।

অশুভক্ষণে বলছি এই কারণে যে ওই আনন্দের মাঝেও বিষাদের কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। আমরা বড়রা কেউ সঙ্গে থাকলে অতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারত না। আসলে ছেলেগুলো চ্যাংড়া, তার ওপর জটুদা থাকায় এবং এ বিয়ে তো অন্য বিয়ের মতো নয় কাজেই উৎসাহিত না হয়ে বরযাত্রীর ব্যাপারটা আমরা এড়িয়ে যাওয়ায় অঘটনটা খুব সহজেই ঘটে গেল।

বুড়োকে নিয়ে একটি ট্যাক্সিতে দশজন উঠেছিল। প্রত্যেকটাই চ্যাংড়া দি গ্রেট। কিছুদূর যাবার পরই জটুদার একটু গলা ভেজাবার দরকার হয়ে পড়ে। তাই একজায়গায় ট্যাক্সি থামিয়ে শুরু হল গলা ভেজানোর পালা। বুড়ো নিজেও বাদ যায় না। আর সব কিছু তো

তারই পয়সায় হচ্ছে। জটুদার মতো মাতাল পরের পয়সায় নেশা করতে পেলে ছাড়বে কেন? তপাইরাও বাদ গেল না। এই করতে করতে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে কারও আর হুঁশিয়্যিদিগ্যি নেই। ঘোর একটু কাটলে এক সময় তপাই আর লবা ধরাধরি করে সবাইকে ট্যাক্সিতে ঢুকিয়ে নিজেরাও উঠে বসল। জটুদার তো একদম সাড়া শব্দ নেই। লবা বলল, "কুছ পরোয়া নেই। স্টিয়ারিং আমিই ধরছি।"

তপাই বলল, "লবা, তুই কিন্তু বলেছিলি আমাকে গাড়ি চালানো শেখাবি। ফাঁকা রাস্তা। কেউ কোথাও নেই কিন্তু। এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর হতেই পারে না। দিবি শিখিয়ে?"

লবা বলল, "ও ইয়েস। এখন না দিলে দেব কখন। নে ধর। স্টিয়ারিং ধর।"

তপাই স্টিয়ারিং ধরল।

"নে এবার এইখানটায় টেপ।"

"টিপেছি।"

"এইখানে চাপ দে।"

"এই তো—এই তো গাড়ি চলছে।"

"সবে তো শুরু। গাড়ি এবার উড়বে। আরও জোরে চাপ দে।"

"কিন্তু গাড়িটা রাস্তা থেকে নেমে যাচ্ছে যে।"

"যেতে দে না। অত ভয় পেলে ড্রাইভারি শেখা যায় না। সময় হলেই ও আবার রাস্তায় উঠে পড়বে'খন।"

কিন্তু না। গাড়ি আর রাস্তায় উঠল না। সোজা খাদের ধারে একটা পানাপুকুরে গিয়ে পড়ল।

ভাগ্যিস কিছু লোকের নজরে পড়েছিল তাই। সবাই হই হই করে ছুটে গিয়ে যখন উদ্ধার করল ওদের, তখন ভয়ানক ব্যাপার। তপাই লবা এবং আরও তিনজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হল। রজনীখুড়ো, জটুদা এবং তপাইদের আরও দুজন বন্ধু স্পটেই শেষ।

রাত বারোটার সময় এই দুর্ঘটনার খবর যখন পেলাম তখন আর করার কিছুই নেই। প্রায় দিন পনেরো হাসপাতালে থাকার পর ছেলেগুলো বাড়ি ফিরল সব। পরে তপাইয়ের মুখে সেদিনের ঘটনার কথা শুনে খুব বকাবকি করলাম ওকে। থানা পুলিশের ঝামেলা মিটল আরও কিছুদিন পর। দুঃখের বিষয় বুড়োর দেওয়া এক হাজার টাকা তপাইয়ের পকেটেই ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার পর সে টাকা কোথায় উধাও হল তা বলতে পারল না কেউ। তবে ছেলেটা যে আরও দৌরাত্মি করার জন্য প্রাণে বাঁচল আমাদের কাছে এই ঢের।

চার

নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় দীর্ঘদিন তপাইয়ের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ ছিল না। যে ছেলেটা হুট করতেই 'মামা' বলে এসে হাজির হত, অনেকদিন তার সাড়া শব্দ না পেয়ে খুবই চিন্তিত হলাম।

এক রবিবার বিকেলে ওদের বাড়ির দিকে চললাম তাই।

ওদের বাড়ির কাছাকাছি যখন এসেছি তখন ছোটখাটো একটি ভিড় আমার নজরে

পড়ল। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি একজন লোকের মাথা ফেটেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে লোকটি। আর তাকে ঘিরে পাড়াশুদ্ধু লোকের হইচই ও ব্যস্ততা। যে লোকটির মাথা ফেটেছে তাকে আমি ভালভাবেই জানি। তপাইদের পাড়ার লোক। নামের সঙ্গে পরিচয় নেই। কিন্তু মুখ চেনা বহুদিনের। বেশ যণ্ডামার্কা গাঁট্টাগোট্টা ভোম্বল দাসের মতো চেহারা। সবসময় রকটি আলো করে বসে থাকে। এর মাথা ফাটালো কে! এর যা চেহারা তাতে এরই তো লোকের মাথা ফাটিয়ে বেড়াবার কথা।

যাই হোক। আমি আসা মাত্রই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল এখানে। দেখলাম সেই ভিড়-ভাট্টার মধ্যে যত লোক দাঁড়িয়েছিল সবাই হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। সকলেরই চোখ আমার দিকে। ভাবটা এই, যেন রক্তারক্তির আমিই নায়ক!

সবাই আমার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল যে রীতিমতো অস্বস্তি হতে লাগল আমার। কেউ সরাসরি তাকাল। কেউ আড়চোখে দেখতে লাগল। কেউ বা একে অন্যের কানে ফিসফিস করে কী সব বলতে লাগল।

যে লোকটার মাথা ফেটেছে সেও দেখলাম এক হাতে মাথার একপাশ চেপে ধরে বোকার মতো আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি অবস্থা ভাল নয় বুঝে ঘাড় হেঁট করে ওদের এড়িয়ে চলে এলাম। ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পারলাম যে এ আর কিছুই নয়, আমার ভাগনা-ঘটিত ব্যাপার। তাই আমার গুণধর ভাগনার মামাকে দেখেই পাড়ার লোকেদের এই ফিসফিসিনি।

দিদির বাড়িতে যখন এসে পৌঁছলাম তখন দেখলাম বাড়ির পরিস্থিতিও থমথম কবছে। দিদি জামাইবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। আমার বড় ভাগনি মীনা এসেছিল দাঁইহাট থেকে। তারও ম্লান মুখে কথাটি নেই। কী ব্যাপার। ব্যাপার কী! সবাই দেখলাম ভয়ে ভয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল মারাত্মক কিছু শোনার আশায়! কেননা আমি তো বাইরে থেকে আসছি। যদি কিছু শুনে থাকি। তাই ওদের মুখাবয়ব দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল? এইভাবে বসে কেন সব? পাড়াতেও খুব গণ্ডগোল দেখছি।"

দিদি বললেন, "আর বলিস কেন ভাই। বাইরে কিছু শুনিস নি?"

"না। শুনিনি তো।"

"সেকি! কিছু দেখতে পাসনি?"

"একটা লোকের মাথা ফেটেছে দেখলাম। দর দর করে রক্ত ঝরছে। আর সবাই একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখছে আমাকে। চারদিকে লোকের ভিড়। জটলা। অবশ্য সে ভিড়ে তপাইকে দেখতে পেলাম না।"

দিদি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

বড় ভাগনি বলল, "এইজন্যেই আসি না মামা এখানে। যখনই আসি তখনই দেখি একটা না একটা ঝামেলা লেগেই রয়েছে এ বাড়িতে।"

আমি বললাম, "সব তো বুঝলাম। কিন্তু হয়েছেটা কি শুনি?"

দিদি বললেন, "কী হয়েছে জানি না ভাই। বল খেলা নিয়ে ক্লাবের সঙ্গে ঝগড়া। তারপর চেঁচামেচি, গালাগালি। এখন তো শুনছি কার যেন মাথা ফেটেছে।"

"হ্যাঁ। মাথা তো ফেটেছে। বেশ ভাল রকমই ফেটেছে মাথা। তাতে হয়েছেটা কি?"

"কী আর হবে? থানা পুলিশ হবে। সবাই তো বলছে আমাদের গুণধর ছেলেরই কাজ।"

"ও বুঝেছি। সেইজন্যই সব তাকাচ্ছিল আমার দিকে। তপাই কোথায়?"

"কী করে জানব? সত্যি। এই ছেলেকে নিয়ে কী যে করি। যত ঝামেলা ওকে নিয়েই। ওর জন্যে এক এক সময় আমার বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছে করে।"

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বেশ রীতিমতো ঝামেলার ব্যাপার। এর ওপরে যদি থানা পুলিশ হয় তাহলে তো কথাই নেই! তপাই হচ্ছে ফাঁকা মাঠের বেড়াল। ওকে ধরা অত সহজ নয়। কিন্তু যদি ধরা পড়ে তখন বাড়ির লোকদের ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি জামিন হওয়া অনেকদূর গড়াবে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করবার জন্য দরজার কাছে এগিয়ে এলাম।

আশপাশের বাড়ির ছাদে বারান্দায় লোকজন ভর্তি। রাস্তাতেও লোকজনের ভিড়। আমি দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই সবার চোখ পড়ল আমার দিকে। আমি লক্ষ্য করলাম সকলেরই চোখের তারায় যেন নীরব অভিযোগ খেলা করছে।

এমন সময় হঠাৎ চারদিকে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। চোখের পলকে ভিড়ও পাতলা হয়ে গেল খানিকটা। দেখলাম কালো প্যান্টের পায়া মুড়ে জামার আস্তিন গুটিয়ে একটা সাইকেলের চেন হাতে ছুটতে ছুটতে আসছে তপাই। ওর সর্বাঙ্গ সপ সপ করছে ঘামে। রাগে হিংস্র হয়ে উঠেছে মুখ। ঠিক এই রকম মূর্তিতে এর আগে আর কখনও দেখিনি ওকে। ওর পিছু পিছু জনা দশ বারো ছেলেও রয়েছে দেখলাম। প্রধান সাকরেদ ডিকে আর গৌতম রয়েছে। ছিল না শুধু নসীরামের ছেলেটা।

দিদিও কখন যেন এরই মধ্যে দরজার কাছে আমার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, "ওকে ডেকে নে ভাই। আজ ও চণ্ডাল হয়েছে। না'হলে এখুনি আবার খুনোখুনি করে মরবে।"

আমি দরজার কাছ থেকেই হাঁক দিলাম, "এই তপাই।"

কিন্তু কে দেবে উত্তর?

তপাই একবার শুধু তাকিয়ে দেখল আমাকে। তারপর গৌতমকে বলল, "তুই একটু নজর রাখ ওদিকে। যদি দেখিস থানা পুলিশ হচ্ছে তাহলে খবর দিবি। আমি এদিক সামলাচ্ছি।"

ডিকে বলল, "তুই থামতো। কে খবর দেবে পুলিশে?"

"যদি ওরা সত্যিই থানায় যায়?"

গৌতম বলল, "থাম দেখি। পুলিশে অমনি খবর দিলেই হল? তুই ঘরে যা তপাই। তোর মামু এসে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক আমরা সামলাচ্ছি। আর পুলিশে যদি খবরই দেয় তো হবেটা কি? পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে যাবে। মারবে, এই তো?"

তপাই হাতের আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম চেঁছে হন হন করে বাড়ির দিকে এগিয়ে এল। তারপর বাড়িতে এসে কয়লা রাখার জায়গায় হাতের চেনটা ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল কুয়োতলায়। দড়ি-বাঁধা বালতিটা ডুবিয়ে কুয়োর জল তুলে মুখ হাত পা বেশ করে ধুয়ে উঠোনের তারে ঝোলানো গামছায় জল মুছে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। ভাবটা এমন,

যেন কিছুই হয়নি। হেসে বলল, "তারপর মামু! কতক্ষণ?"

আর মামু। বললাম, "এই কিছুক্ষণ হল এসেছি তা কি ব্যাপার রে তোর?"

তপাই একবার ওর বাবার দিকে তাকিয়েই আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপল, "পরে সব বলব। আপনি যখন বাড়ি যাবেন আমিও যাব। সাইকেলে করে পৌঁছে দিয়ে আসব আপনাকে।"

দিদি অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তপাইয়ের দিকে।

তপাই হেসে বলল, "আর তাকিয়ে কি করবে? এবার একটু চা করে দাও খাই। মামা চা খেয়েছেন?"

"কখন খাব? যা কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছিস।"

জামাইবাবু দালানে একটা মোড়ায় বসে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে এতক্ষণ তপাইয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। এবার গম্ভীর গলায় ডাকলেন, "তপাই শোন।"

তপাই এগিয়ে গেল, "কি!"

"তুই চেন নিয়ে ঘুরছিলি কেন রাস্তায়?"

"কী হয়েছে কি তাতে?"

"কী হয়েছে তাতে? চেন নিয়ে কারা ঘোরে জানিস?"

তপাই একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "কী করব। যেমন জায়গা সেরকম করতে হয়।"

"বুঝলুম। কিন্তু আজ যা করলি তুই এর পরে আর মুখ দেখাতে পারবি পাড়ায়? সব লোক চেয়ে চেয়ে দেখছে আর হাসছে।"

"যারা হাসছে তাদের হাসতে দিন।"

"কী বললি?"

"ঠিকই বলেছি। কে কী করবে না করবে তার দোষ চাপিয়ে দেবে আমাদের ঘাড়ে? আমি অমনি সেটা মুখ বুজে মেনে নেব! বাঃ।"

জামাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ব্রজর মাথা কে ফাটাল? তুই না?"

এতক্ষণে জানলাম লোকটির নাম ব্রজ।

তপাই অমনি চেঁচিয়ে উঠল, "আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তো। শুধু শুধু লোকের মাথা ফাটিয়ে বেড়াব।"

"তাহলে ফাটালোটা কে?"

"আমি কী করে জানব?"

জামাইবাবু বললেন, "কিন্তু সব্বাই তো বলছে এই বাড়ির ছেলে ফাটিয়েছে।"

তপাই রেগে লাল হয়ে বলল, "সেই জন্যই তো এতক্ষণ চেন নিয়ে ঘুরছিলুম। ভিড়ের ভেতর কে কি করল না করল দোষ পড়ল আমাদের ঘাড়ে। শুধু তাই নয়, ঝগড়া হচ্ছে ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে ইট পড়বে কেন? একটুর জন্য বাচ্চা মেয়েটা রক্ষে পেয়ে গেল সেটা জানেন না বোধ হয়?"

আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, "ইট ফেলেছে! কোথায়?"

তপাইয়ের হয়ে আমার ভাগনিই উত্তর দিল, "আর বোলো না মামা। তোমার নাতনিকে উঠোনে কাঁথা পেতে শুইয়ে আমরা কথা বলছি এমন সময় এই এত্ত বড় একটা ইট এসে পড়ল মেয়েটার মাথার পাশে।"

আমি চমকে উঠলাম, "সেকি!"

"দেখবে ইটটা?" বলেই অদূরে পড়ে থাকা ইটটা কুড়িয়ে এনে আমাকে দেখাল

ইটটা হাতে নিয়েই শিউরে উঠলাম আমি। এই ইট সত্যিই যদি এসে পড়ত মেয়েটার গায়ে তাহলে কী অবস্থা হত!

তপাই বলল, "'এর পর আর মাথার ঠিক থাকে?"

বললাম, "না। এই জন্যেই কি ওর মাথা ফাটিয়েছিস?"

তপাই বলল, "মামা, অমন কাঁচা কাজ আমি করি না। আছি ভাল। কিন্তু রাগলে আমি বিষখোবড়া। আমি তখন এখানে থাকলে ওর মাথা ফাটাতাম না। হাত দুটোকেই ছিঁড়ে আনতাম। আমার নাম তপাই।"

"তাহলে ফাটালো কে!"

"কে জানে? ওরা স্বপনের নাম বলছে বলে অত রেগে গিয়েছিলুম।"

"স্বপন!"

"হ্যাঁ। ওরা বলছে স্বপন ওর মাথা ফাটিয়েছে।"

স্বপন আমার ছোট ভাগনা। বারো তেরো বছরের ছেলে। সে কি করে মাথা ফাটাবে ওই ষণ্ডা গুণ্ডাটার? এও কি সম্ভব? তাছাড়া স্বপন অতি শান্ত ও মেধাবী ছেলে।

দিদি বললেন, "স্বপন কোথায়?"

"জানি না। বোধ হয় ক্লাবে গিয়ে জটলা করছে।"

জামাইবাবু বললেন, "কিন্তু এত লোক থাকতে স্বপনের নামই বা করছে কেন ওরা?"

"তাহলেই বুঝে দেখুন। ভিড়ের ভেতর কে গিয়ে মাথা ফাটাল আর দোষ চাপল একটা বাচ্চা ছেলের ঘাড়ে। এর পরেও মাথা গরম না হয়ে যায়?"

দিদি নিজের মনেই বলতে লাগলেন, "জানি না বাবা, কী যে আছে কপালে। কপালগুণে জুটেওছে সব এসে আমার কাছে।"

আমার ভাগনি কথাবার্তার ফাঁকেই চায়ের জল বসিয়েছিল। এবার তৈরি চা নিয়ে এসে কাপে কাপে ঢেলে দিলে সবার হাতে।

সবে এক চুমুক দিয়েছি চায়ে এমন সময় এক মধ্য বয়সী মহিলা এসে হাজির হলেন সেখানে। কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন, "তপাই কোথায় গো, তপাই?"

জামাইবাবু মোড়ায় বসেছিলেন। উঠে এসে বললেন, "আসুন কাকিমা। তপাই এই তো ঘরে।"

মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "তোমরা কেন মিছি মিছি মাথা গরম করছ বাবা? আমরা তো কিছু বলিনি তোমাদের। শুধু শুধু লাশ ফেলে দেব, বিলা করে দেব, এসব কি কথা। তা যাকগে। আমার ছেলের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। আর কিছু কোর না তোমরা। আমার ছেলের দোষ আছে জানি। তোমরাও তো মাথা ফাটিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছ। ব্যাপারটার এখানেই শেষ হোক। না কি গো মামা?"

আমি আর কি করি। বললাম, "সে তো বটেই। রাগারাগির মাথায় যা হবার তা হয়ে গেছে। আর একে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।"

তপাই রেগে বলল, "আবার আপনি ওই একই কথা বলছেন, আমরা মাথা

ফাটিয়েছি?''

মহিলা বললেন, ''আমি তো চোখে দেখিনি বাবা। আমার ছেলে বলল, তোমার ছোট ভাই মাথা ফাটিয়েছে। তাই বলছি।''

তপাই বলল, ''আপনি আর একবার ভাল করে জিজ্ঞেস করে আসুন. আমার ছোট ভাই ফাটিয়েছে না আমার মামা ফাটিয়েছে।''

মহিলা গালে হাত দিয়ে বললেন, ''ওমা সেকি কথা। তোমার মামা এই তো এলেন। সে ভদ্রলোকের ছেলের নামে দোষ দেব কেন? এভাবে গায়ে পড়ে দোষ দিয়ো না। যা সত্যি তাই বললুম।''

''ওই জন্যই তো চেন নিয়ে ছুটেছিলুম। আমাব ভাই একটা বাচ্চা ছেলে, সে গিয়ে তোমার ওই চল্লিশ বছরের ধেড়ে ইঁদুরের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে এল এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা?''

দেখলাম কথা কাটাকাটি উত্তরোত্তর চরমে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। তাই ব্যস্ত হয়ে বললাম, ''আচ্ছা ঠিক আছে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন ব্যাপারটা কি হয়েছে দেখছি।'' বলে তপাইকে জিজ্ঞেস করলাম, ''স্বপন কোথায়?''

জামাইবাবু বললেন, ''যেখানেই থাকুক। ওর কানটাকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসো দেখি?''

এমন সময় দেখা গেল আমার বড় ভাগনা শঙ্করই ওকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

জামাইবাবু রাগে কাঁপতে কাঁপতে ওর কাছে গিয়ে ঠাস করে মারলেন এক চড়। তারপর এক হাতে চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, ''বল কেন এই সব গুণ্ডামি করেছিস? বল শিগ্‌গির। খুনে হবি? ডাকাত হবি? বল কেন মাথা ফাটিয়েছিস ব্রজর?''

স্বপন রেগে ধনুকের মতো বেঁকে দাঁড়িয়ে বলল, ''আমি ফাটিয়েছি! আপনি দেখেছেন?''

''আমি দেখব কেন? সবাই তো বলছে।''

স্বপন বলল, ''এ পাড়ায় মানুষ আছে নাকি? যত সব মিথ্যেবাদীর দল। যে বাপের ব্যাটা হবে সে আমার সামনে এসে বলবে।''

এর ওপর দিদি এসে এক ঘা বসিয়ে দিলেন, ''এ পাড়ায় সব মিথ্যেবাদীব দল। আর একা তুমি যুধিষ্ঠির না? পাড়াশুদ্ধু লোক সবাই মিথ্যে বলছে?''

স্বপন রেগেমেগে মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গর গর করতে করতে কুয়োতলায় গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে কোচিং-এ পড়তে চলে গেল।

স্বপন চলে যাবার পর মহিলাও চলে গেলেন।

জামাইবাবু বললেন, ''আপনি যান কাকিমা। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'' বলে জামা-কাপড় পাল্টে জামাইবাবুও চলে গেলেন।

জামাইবাবু চলে যাবার পর দিদি বললেন, ''সত্যি করে বল তো তপাই, ব্রজর মাথা কে ফাটিয়েছে?''

তপাই ফিক করে একটু হাসল। সে হাসির অর্থ সবাই বোঝে।

আমার তো চোখ কপালে উঠে গেল।

তপাই বলল, "স্বপনই ফাটিয়েছে।"

"বলিস কিরে!"

তপাই বলল, "মামা, আমি একটা দাগী ছেলে। আমার কথা ছেড়ে দিন। তবে আপনার ওই ছোট ভাগ্নাটিকেও কিছু কম বলে মনে করবেন না।"

"কিন্তু স্বপন ওইটুকু ছেলে...!"

"ও একটা মিচকে শয়তান। থাকে নিরীহ প্রাণীটির মতো। কিন্তু রাগলে কারও নয়। তবে আজকে ও যা করেছে তা ঠিক করেছে। আপনি একবার ভেবে দেখুন তো, ওই অতবড় ইটটা যে বাড়ির ভেতর পড়ল যদি কারও মাথায় লাগত!"

"সে তো বটেই। তবে ব্যাপার কি জানিস, হুট করে রাগের মাথায় সহসা কোন কাজ করতে নেই। ধর স্বপনের ইটের ঘায়ে লোকটা যদি মরে যেত? যদি ওরা এই ব্যাপার নিয়ে থানা পুলিশ করত?"

তপাই বলল, "হিম্মৎ থাকে তো এখনও করুক না। ইট তো তোলাই আছে। পুলিশ এলে দেখাব।"

"কিন্তু স্বপন ওর মাথাটা ফাটাল কি করে?"

তপাই বলল, "তাহলে ব্যাপারটা গোড়া থেকেই শুনুন। এই মাঠে আমাদের দুটো গ্রুপ আছে। একটা ছোটদের একটা বড়দের। ছোটরা যখনই মাঠে খেলে বড়দের তখনই চোখ টাটায়। আজ বিকেলে ছোটরা যখন খেলছিল, বড়রা তখন মাঝে মাঝে এসে নানারকম মন্তব্য করছিল। তবে খারাপ কেউ কিছু বলেনি। এমন সময় ব্রজদা হঠাৎ কোথা থেকে এসে গালাগালি শুরু করে দিল। তারপর কোথাও কিছু নেই গা-জোয়ারি করে গোল পোস্টটাকেই উবড়ে ফেলে দিল। তাইতেই কে যেন একজন মুখ খারাপ করে কি বলেছে সেই রাগে কোথাও কিছু নেই দুম-দাম ইট ছুঁড়তে আরম্ভ করে দিল ব্রজদা। স্বপন তখনও কিছু বলেনি। কিন্তু যেই একটা ইট এসে আমাদের বাড়িতে পড়েছে অমনি ওর মাথা গেছে গরম হয়ে। তার ওপর বাড়ি এসে যখন দেখল আর একটু হলেই দিদির মেয়েটা শেষ হয়ে যেত তখন আর থাকতে পারল না। ওই ইটটা ও নিয়ে গিয়ে ওরই মাথার ওপর বসিয়ে দিল এক ঘা। একেবারে মোক্ষম ঘা যাকে বলে।"

দিদি বললেন, "অথচ স্বপন আমাকে বলল ইটটা আমি পাড়ায় দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। কী শয়তান ছেলে বল দেখি?"

আমি বললাম, "ও কিছু না। ছোটবেলায় একটু আধটু ডানপিটে অনেকেই থাকে। বড় হলে বুঝতে শিখলে ঠিক হয়ে যাবে। ওর জন্যে তোমার চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

আলোচনা শেষে চুপচাপ বসে রইলাম আমরা। মুখের কথা আর হাতের ঢিল একবার বেরিয়ে গেলে আর তো তাকে ফেরানো যাবে না। অগত্যা চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া উপায় বা কি?

তপাই এবার ঘরে ঢুকে জামা প্যান্ট ছেড়ে আমাকে ইশাবা করল। অর্থাৎ কিনা চলুন এবার।

আমিও 'আসি' বলে উঠে দাঁড়ালাম।

ছোট ঘর থেকে সাইকেলটা বের করল তপাই।

আমি ওকে চুপি চুপি বললাম, "চল। তবে সামনে দিয়ে নয়। নতুন রাস্তা দিয়ে ঘুরে

নাহলে আবার যদি সবাই দেখতে আরম্ভ করে তো ভারি বিশ্রী ব্যাপার হবে।"

তপাই বলল, "সে কথা আবার বলতে? এই আমি যে যাচ্ছি রাত এগারোটার আগে কি আমি ঘরে ঢুকব?"

আমি তপাইয়ের সাইকেলে সামনের দিকে বসলাম। ও ডবলক্যারি করে আমাকে মধ্য হাওড়ায় আমাদের বাসস্থানের দিকে নিয়ে চলল।

পরদিন সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে এসেই দেখি শঙ্কর এসে বসে আছে। শঙ্কর আমার বড় ভাগনা। এদের দু'ভাইয়ের থেকে একেবারেই অন্যরকম। লেখাপড়া মন দিয়ে করে না। তবে কোনও ঝামেলাতেও বড় একটা থাকে না।

শঙ্করকে দেখে বললাম, "কী ব্যাপার রে?"

"মা একবার দেখা করতে বলেছে আপনাকে। খুব দরকার। সাইকেল এনেছি। রাত্রিবেলা পৌঁছে দিয়ে যাব।"

"বেশ যাব। এই তো এলাম। আগে একটু চা-টা খাই।"

"সে খান না। আমিও তো খাব।"

আমি অফিসের পোশাক ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এলে মামা ভাগনা দুজনেই এক সঙ্গে চা-রুটি খেলাম। তারপর ওর সাইকেলে চেপেই চললাম ওদের বাড়ি।

দিদি জামাইবাবু আমার বড় ভাগনি সবাই ছিল।

আমি ঢুকেই জিজ্ঞেস করলাম—"হঠাৎ এমন জরুরি তলব কেন?"

দিদি বললেন, "তোর কাছ থেকে একটা পরামর্শ নেব বলে ডেকেছি তোকে।"

"কি রকম!"

"ভাবছি তপাইটাকে এখান থেকে কোথাও সরানোর ব্যবস্থা করি। নাহলে ওই বিষবৃক্ষ আমার সব ছেলেদেরকে নষ্ট করে দেবে।"

আমার দিদির ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে মেয়ে। তারপর ছেলে অর্থাৎ শঙ্কর। শঙ্করের পর তপাই। তারপর স্বপন। দিদির কথা শুনে হেসে বললাম, "হঠাৎ আবার কী ভূত মাথায় চাপল তোমাদের? কালকের ওই ব্যাপারটা নিয়ে? তাই যদি হয় তাহলে তপাইয়ের এখানে দোষ কোথায়?"

জামাইবাবু বললেন, "আছে, দোষ আছে। কাল কী ভাবে লোকটার মাথা ফাটিয়েছে তা তুমি ভাবতেও পারবে না। হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে লোকটাকে।"

"কিন্তু ওর মাথা তো আপনার ছোট ছেলে ফাটিয়েছে।"

"মূলে তো তপাই। নাহলে এত সাহস পায় কোত্থেকে? তপাইয়ের মূর্তি দেখলে না কাল?"

"দেখলাম তো।"

"তবে!"

"ওর পাল্লায় পড়েই স্বপনটা ওই রকম হয়েছে। নাহলে ওইটুকু ছেলের কী দুঃসাহস। এখনই যদি এইরকম নিষ্ঠুর হয় তো পরে কী হবে?"

আমি হেসে বললাম, "দেখুন, ছেলে আপনাদের। তাকে ভাল করবার জন্য যত রকম চেষ্টা করা যায় করুন আপনারা। তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে আমাদের

বর্তমান সমাজব্যবস্থা যে রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে দুদিন বাদে আপনাকেও হয়তো...?"

জামাইবাবু রেগে বললেন, "এই জন্যেই আমি ডাকতে চাই না তোমাকে। তুমি সবসময় হেঁয়ালি করে কথা বল। আমার ছেলেদের তুমিও যথেষ্ট আস্কারা দাও।"

দিদি বললেন, "তুই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস না। স্বপনের এখন ধারণা হয়েছে কি জানিস, যা কিছুই করুক না কেন সে, তার মস্তান দাদা তপাই তো আছে। তপাইয়ের ভয়ে কেউ কিছুই বলবে না। সেইজন্যই অত সাহস। তার চেয়ে ওকে যদি এখান থেকে বিদেয় করতে পারি তো সবকিছুর শান্তি।"

আমি কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। বাবা মা কতখানি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলে তবে ছেলেদের ওপর এতখানি রেগে যান তা বুঝলাম।

দিদি আবার বললেন, "ও ছেলে ঘরে থাকলে আমার আব দুটো ছেলে নষ্ট হয়ে যাবে। দিন রাত শুধু মড়া পোড়ানো আর ঝুটঝামেলা করা। ওর জন্যে পাড়ায় আমরা মান-ইজ্জত সব খুইয়েছি। তাই ভাবছি আমাদের আর দুটো ছেলের মুখ চেয়ে ওকেই সরাই।"

কথাটা বড়ই মর্মান্তিক। শুনে বুকের ভেতরটা টন টন করে উঠল। অথচ ছেলেটাকে শোধরাবার জন্য কিছু একটা করতে তো হবে।

ভাগনি বলল, "আমি বলছিলুম কি মামা ও আমার সঙ্গে বরং দাঁইহাটেই চলে যাক।"

"বেশ তো। এ তো খুবই ভাল কথা। সঙ্গগুলো একটু ত্যাগ করিয়েই দেখ না যদি কিছু হয়।"

দিদি বললেন, "কিন্তু ও তো যেতে চাইছে না।"

"কেন কী বলছে ও?"

"ও বলছে কুটুমবাড়িতে ও থাকবে না।"

"তাহলে তোমাদের দেশে পাঠাও।"

"সে তো আর এক জায়গা। সেখানেও যা সব আছে গোটাকতক তার ওপর উনি ভিড়লে তো একেবারে মণি-কাঞ্চন যোগ হয়ে যাবে।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, "ওর ছোট পিসি তো তারকেশ্বরে থাকে। সেখানে রেখে এলে হয় না?"

"হয়। তবে ওদেরও অভাবের সংসার। তপাই কিন্তু ওখানেই যেতে চাইছে। তোর জামাইবাবু রাজি হচ্ছে না।"

"ওরা কিন্তু খুব ভাল লোক। আমার কথা যদি শোনো তো ওকে ওখানেই পাঠাও। মাঝে মধ্যে কিছু খরচা নাহয় পাঠিয়ে দিয়ো।"

জামাইবাবু বললেন, "অসুবিধেটাতো সেইখানেই। ওরা কি খরচ-খরচা নেবে?"

এমন সময় তপাই এল। কোথায় আড্ডা মারছিল কে জানে? উঠোনের জবা গাছের কাছে সাইকেলটা রেখে দালানের সিঁড়িতে হাত পা ছড়িয়ে বসে বলল, "আমার বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠেছে। শুনেছেন তো মামা। আমি এখন এ বাড়ির আপদ বালাই। মাছের কাঁটার মতো আমি আটকে আছি প্রত্যেকের গলায়। তবে মামা আমিও বলে রাখছি, এই পাড়া থেকে আমি চলে গেলে এদের অবস্থাটা একবার কি হয় দেখে রাখবেন। এদের যদি ছাগলে মুড়িয়ে না খায় তো আমার নাম তপাই নয়। আমার ভয়ে এখানে কেউ ট্যাঁ ফোঁ

করে না। এইবার দেখবেন কথায় কথায় ঝাড় খাবে কিরকম! যাক। ভালই হল। এদের উঁচু মাথা আরও উঁচু হোক। এ সব পাড়াকে তো এরা চেনে না। পায়ে পা তুলে যখন ঝামেলা লাগাবে তখন বুঝবে। আমি তখন 'ভোলে বাবার' ডেরায় বসে মজা দেখব। তাছাড়া সত্যি বলতে কি আমারও খুব একঘেয়ে লাগছিল এখানে। এবার আমিও একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। তবে এই যে আমি বাড়ি ছাড়ছি, আর আমি এ মুখো হব না কোনওদিন।"

দিদি রেগে বললেন, "দরকার নেই তোর এ মুখো হবার। তোর মুখ দেখলে আমার গা ঘিন ঘিন করে।"

তপাই হেসে বলল, "বেশ তো। আমি বিদেয় হই, তারপর রোজ দুবেলা তোমার অন্য ছেলেদের মুখ ধুয়ে তুমি জল খেয়ো। কেমন?"

আমি দুপক্ষকেই সামলালাম। দিদিকে বললাম, "দেখ, যতই দুরন্ত হোক, তবু তোমার ছেলে। ও কথা বলতে নেই।"

দিদি মুখের ওপরই বললেন, "তুই বিশ্বাস কর, ও মরে গেলেও আমার চোখ দিয়ে এতটুকু জল পড়বে না।"

এর ওপরে আর কথা নেই। তপাইকে বললাম, "অভিমান করিস না তপাই। তোব ভালব জন্যেই তোকে এখান থেকে সরানো হচ্ছে।"

তপাই হোঃ হোঃ করে হেসে বলল, "অভিমান! কার ওপর? মা বাবার ওপর? মামা, মড়া মানুষকে চিতায় তোলা আমাব নেশা। মানুষগুলো যখন আগুনের আঁচে ফুট ফাট করে পোড়ে আমি তখন হাসি। মনে মনে বলি, এই তো তোমাদের অন্তিম পরিণতি। এব জন্যে এত কিছু?"

আমি বললাম, "ও সব কথা রাখ। জীবন সম্বন্ধে নির্বিকার হওয়া ভাল। তবে এখনও বলছি তোর পরিবেশ পরিবর্তন করা একান্ত দরকাব। তাছাড়া দিনকাল একে খারাপ। এর ওপর দুদিন ছাড়াই এই সব ঝামেলা হতে থাকলে মানসিক অবস্থারও অবনতি হবে। আসলে তুইও ভাল ছেলে। কিন্তু এই নোংরা পরিবেশের জন্যে আজ তুই এইরকম হয়ে গেছিস। ভাল জায়গায় যা, ভাল পরিবেশে থাক, দেখবি কত পরিবর্তন হয়েছে তোর। তাছাড়া অন্য পরিবেশে গেলে নিজেও একটু শান্তি পাবি। ভাল না লাগে ফিরে আসতে কতক্ষণ?" এই বলে আমি চলে এলাম।

তপাই গুম হয়ে বসে রইল।

পরদিন সকালে দিদি নিজে গিয়ে তপাইকে তারকেশ্বরের কাছে একটি গ্রামে ওর পিসির বাড়িতে রেখে এলেন।

হাওড়ার এই ঘিঞ্জি শহরের বাইরে হুগলি জেলার ছায়া সুনীবিড় ওই গ্রামখানি তপাইয়ের মন্দ লাগল না। পুকুর বাগান ধানক্ষেত ফাঁকা মাঠ—মাঠের মেঠো গন্ধ, তপাইয়ের মন প্রাণ ভরিয়ে দিল।

আমরা ভেবেছিলাম শহরের এই পরিবেশ ছেড়ে তপাই কিছুতেই গ্রামে থাকতে পারবে না। দুদিন কি চারদিন থাকার পর একদিন হয়তো ঠিকই পালিয়ে আসবে। কিন্তু না। তপাই আমাদের সকলের ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দিল।

মা বাবা যতই বকা ঝকা করুন না কেন, হাজার হলেও ছেলে তো। প্রতিদিন খাওয়া

দাওয়ার পর ওর জন্য দুটো ভাত তরকারি আলাদা রাখা থাকত। কি জানি কোনদিন হঠাৎ যদি দিন দুপুরে ছেলেটা এসে হাজির হয়।

কিন্তু না। ওর আশা করাই বৃথা হল সকলের। গ্রামের পরিবেশে গিয়ে তপাই এমনভাবে গ্রামকে ভালবেসে ফেলল যে শহরকেই ভুলে গেল এক সময়। কোথায় গেল ডিকে, কোথায় গৌতম, কোথায় নসীরামের ছেলে। সেখানে গিয়ে দু'-চারদিন ভিজে বেড়ালের মতো থাকার পর আবার নতুন সঙ্গী পেয়ে মেতে গেল।

এখনকার গ্রামও তো আর আগেকার সেই গ্রাম নেই। প্রতিটি গ্রামেই এখন ডজন ডজন তপাই জন্মায়। কাজেই লাইনের ছেলে বেশ কয়েকটা জুটে যেতে খুব একটা দেরি হল না তপাইয়ের।

দু'চারদিন মাঠে ঘাটে একা-একা ঘোরা ফেরা করতেই নজরে পড়ে গেল সকলের।

একদিন কয়েকজন ছেলে এসে ধরল ওকে, "কী ভায়া! কোত্থেকে আমদানি হলে?"

তপাইয়েরও নিজস্ব কিছু ভাষা আছে। সেই ভাষাতেই সেও জবাব দিল, "আমি হাওড়ার মাল। দেখে বুঝতে পারছিস না?"

ওরা বলল, "গুরু গুরু। তা এখানে কী ব্যাপারে?"

"নির্বাসন।"

"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ। যেখানে থাকতুম সেখানে, মানে আমার বাড়িতে পাড়ায়, নিজের গুণের জন্যে সকলের কাছে একটু অসহ্য হয়ে উঠেছিলুম। তাই আমার বাড়ির লোকেরা এখানে আমাকে আমার পিসির বাড়িতে নির্বাসন দিয়ে গেছে।"

"বল কী! তবে তো তোমার সঙ্গে হাতে হাত মেলাতে হচ্ছে ভাই।"

তপাই হাত মেলাবার জন্য হাত এগিয়ে দিল।

ওরা হাতে হাত মিলিয়ে বলল, "তোমার নাম কি ভাই?"

তপাই বলল, "আমার ভাল নাম তপন। তোমরা আমাকে তপাই বলেই ডেকো। কেননা ঘরে বাইরে পুলিশের খাতায় ওই নামেই আমি বিখ্যাত।"

"গুরু গুরু। তা গুরু, একটা কথা আগেই বলে রাখি। তোমার বাড়ির লোক তোমাকে তাড়াতে পারে, পাড়ার লোক দূর দূর করতে পারে, বন্ধুরা প্রত্যাখ্যান করতে পারে, আমরা কিন্তু তোমাকে ছাড়ব না। এই যে আমাদের কটি যন্ত্রকে দেখছ, সবাই আমরা একই সুতোয় গাঁথা মালা।"

"বাঃ শুনে খুশি হলাম।"

"খুশির এখন হয়েছে কী। আরও খুশি হবে শুনে, আমরাও তোমারই মত বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো ছেলে। আমরা তোমাকে বুকে করে রাখব। আমরা শুধু খাবার সময় ঘরে যাই আর বাকি সময় হই হই করে বেড়াই।"

তপাই খুশি হয়ে বলল, "বেড়ে মজা তো।"

"মজা হবে না কেন? আমাদের তো তোমাদের মতো রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে চাল কিনে খেতে হয় না। জমি জমা যা আছে তাতে সকলের দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে হয়ে যায়। আর তুমি যদি বরাবরের জন্য থেকে যাও গুরু, তাহলে আজ এর বাড়ি কাল ওর বাড়ি করে পেটটা ঠিক চলে যাবে তোমার।"

"ঠিক বলছ?"

"বাবা তারকনাথের দিব্যি।"

তপাই বলল, "তবে ভাই একটা কথা। এই হই হল্লার ফাঁকে ফাঁকে আমি আরও একটা কাজ ওখানে করতাম। তোমাদেরও কিন্তু আমার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সেই কাজটা এখানেও করতে হবে।"

"কি রকম!"

"এই ধরো চাঁদা তুলে এখানেও গরিবের মেয়ের বিয়ে দেওয়া। কোনও দুঃস্থ মানুষের মৃতদেহ দাহ করা। এইসব কাজ আর কি।"

"আরেব্বাস! তুমি যে দেখছি হিন্দি ফিল্মের হিরো। ঠিক আছে। রাজি আছি।"

"সেইসঙ্গে আরও একটা কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ বল?"

"এই গ্রামে আমরা কজন এমন একটা দল গড়ে তুলব যে আশপাশের লোকেরা যেন আমাদের রীতিমতো ভয় করে। আমাদের ভয়ে রাত বিরেতে এই গ্রামে চোর-ডাকাত ঢুকতেও ভয় পায় যেন।"

"গুরু গুরু। আবার হাতে হাত মেলাও। সবাই রাজি আমরা। তুমি গুরু একেবারে হিরোর মতো এসে হাজির হয়েছ। জয় বাবা তারকনাথ।"

সবাই তখন তপাইকে পেয়ে এমনভাবে মেতে উঠল যে ওকেই ওদের লিডার করে ফেলল। আসলে তপাইয়ের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাতে খুব সহজেই ও অন্যকে বশ করে ফেলতে পারে।

আলাপের প্রথম দিনই তারকেশ্বরে গিয়ে একটা হিন্দি ছবি দেখে এল ওরা।

তারপর একদিন গেল চাঁপাডাঙায় দামোদরের বাঁধ দেখতে। দামোদরের বাঁধ কী চমৎকার।

সবচেয়ে চমৎকার এখানকার পরিবেশ। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে মাঠে ঘোরা আর পাখির ডাক শোনা। তারপর চা-মুড়ি খেয়ে বন্ধুদের আড্ডায়। বেলা বারোটা পর্যন্ত আড্ডা মেরে বাড়ি ফেরা। এরপর পুকুরে টুপ টুপ করে ডুব দিয়ে মাটির দাওয়ায় বসে পেট পুরে খাওয়া। ডাল-ভাত তরকারি। বরাত যেদিন ভাল থাকে সেদিন চুনোপুঁটি ল্যাটা পোনাও জোটে। খাওয়া শেষে পান মুখে আবার বন্ধুদের আড্ডায় গিয়ে হাজির হওয়া। তারপর কখনও খড়ের গাদায়, কখনও গাছতলায়, কখনও বা ক্লাবঘরে শুয়ে তেড়ে ঘুম। বিকেলবেলা ইউরিনের মতো এক কাপ চা। তারপর আবার সেই বিশ্ববখাটেদের দলে ভেড়া। মাঠে মাঠে ঘুরে, আশপাশের গ্রামগুলোকে চষে, কখনও বা নাইট শো'তে তারকেশ্বর অথবা চাঁপাডাঙায় সিনেমা দেখে, কোনও পুকুরপাড়ে অথবা বাঁধের ধারে নেশা করে পড়ে থাকা। যেদিন ওইসব করা সেদিন আর ঘরে ফেরা নয়। কী চমৎকার জীবন। কাজ করতে হয় না। কিছু করতে হয় না। শুধু খাও-দাও আড্ডা দাও টোটো করে ঘোরো আর স্ফূর্তি কর। কী মজা। এমন জীবন কে না চায়? এত সুখ যে স্বর্গেও নেই।

একদিন ওরা রাত্রিবেলা চাঁপাডাঙা থেকে সিনেমা দেখে ফিরছিল। এমন সময় হঠাৎ আকাশ কালো করে মেঘ উঠল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়। ওরা ছুটতে ছুটতে বাঁধ থেকে নেমে কাছেই শ্মশান যাত্রীদের জন্য তৈরি একটা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল।

বেশ বড়সড়ো কোঠা ঘর। জানলা দরজা সবই আছে। শুধু আলোর কোনও বা
নেই। শ্মশান যাত্রীরাই যে যার লণ্ঠন বাতি সঙ্গে নিয়ে আসে। যাই হোক। ওরা ঝড়জ
হাত থেকে বাঁচবার জন্য সেই শ্মশান ঘরেই গিয়ে ঢুকল। একটু পরেই নামল বৃষ্টি। বৃষ্টি
নয়। প্রবল বর্ষণ। যেমনি ঝড় তেমনি জল। সে কী প্রচণ্ড বেগ। ওরা ঝড় জলের হা
থেকে রক্ষা পাবার জন্য সমস্ত জানলা বন্ধ করে দিল।

কিন্তু কী আশ্চর্য।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই হুট হাট করে খুলে গেল জানলা দরজাটা।

ভারি মজার ব্যাপার তো।

দরজায় খিল আছে। জানলায় ছিটকিনি আছে। তবু খোলে কি করে?

তপাই বলল, "নিশ্চয়ই আমাদের ভেতর থেকে কেউ গিয়ে বদমায়েশি করে খু
দিয়েছিস?"

বন্ধুরা বলল, "না। কে খুলবে আমাদের ভেতর থেকে? আমরা তো সবাই পাশাপা
বসে আছি। ঝড়ের দাপটেই খুলে গেছে নিশ্চয়ই।"

একজন বলল, "ঝড়ের দাপটে জানালা খুলে গেলেও দরজা খোলে কি করে, দরজা
তো খিল দেওয়া ছিল।"

আর একজন বলল, "আমি কিন্তু ভাল বুঝছি না। এই জায়গাটার খুব বদনাম আছে
অনেকদিন আগে একটা লোক এই ঘরে গলায় দড়ি দিয়েছিল। তারপর থেকে এই জায়গ
সম্বন্ধে অনেকের মুখে অনেক কথাই শুনেছি। আমার মনে হচ্ছে ওই রকমই কিছু।"

বন্ধুরা বলল, "তা হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু মুশকিল হল এই ঝড় জলে এখানকা
এই আশ্রয় ছেড়ে যাই-ই বা কি করে?"

তপাই বলল, "দেখ ভাই, পোড়ো বাড়িতে রাত কাটানো বা শ্মশানের বিভীষিকা
সঙ্গে পরিচয় আমার নতুন নয়। আমার মনে হয় তাড়াতাড়িতে আমরা দরজায় খিল দি
বা জানলায় ছিটকিনি লাগাতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

এমন সময় হঠাৎ ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দের সঙ্গে সশব্দে জানলা দরজাটা বন্ধ হ
গেল।

তপাই বলল, "ভালই হল।" বলে নিজেই উঠে গিয়ে অন্ধকার হাতড়ে দরজায় খি
দিল, জানলায় ছিটকিনি আঁটল। তারপর নিশ্চিন্ত মনে এসে বসল দেওয়ালে ঠেস দি
বলল, "আজ যা অবস্থা দেখছি তাতে আর বাড়ি ফিরতে হচ্ছে না। আজ সারারাত এখানে
পেট কোলে করে বসে থেকে কাল সকালে ঘর মুখো হওয়া যাবে।"

বাইরে তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। সেই সঙ্গে ঝড়ের দাপট। থেকে থেকে গোঁ গোঁ ক
শব্দ হচ্ছে। এইরকম হতে হতে হঠাৎ এক সময় ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁচ। আর সেই শব্দের স
সঙ্গেই খিলটা আপনা থেকে খুলে গিয়ে সশব্দে দুহাট হয়ে গেল দরজাটা।

যেই না যাওয়া সকলেরই তখন চক্ষুস্থির। বসেছিল সবাই। মারল টেনে এক লাফ
তারপর কেউ আর কোনওদিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েই দৌড়—দৌড়—দৌড়

বড় বড় গাছপালার ফাঁক দিয়ে কর্দমাক্ত পথ ধরে ছুটে গিয়ে বাঁধে উঠল সবাই
ভিজে সপ সপ করছে সর্বাঙ্গ। কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল সব। সবাই সবাইয়ের মুখে
দিকে তাকায় আর ঠক ঠক করে কাঁপে। না কাঁপবেই বা কেন? যা দেখল তার পরে ভয়

পাওয়াটা কি অস্বাভাবিক?

তপাই বলল, "দেখ ভাই, আমি এখনও বলছি ওইসব আমি বিশ্বাস করি না। তবুও যা দেখলাম তাকেও অবিশ্বাস করতে পারি না। আমি নিজে হাতে যে খিল লাগিয়ে দিয়ে এলাম সে খিল খুলল কি করে? ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়।"

বন্ধুরা বলল, "ওকেই আমরা ভুতূড়ে ব্যাপার বলি। তোরা শহরের ছেলেরা তো বিশ্বাস করিস না এসব। গ্রামে ঘরে এইরকম কিন্তু প্রায়ই হয়।"

তপাই বলল, "আমাব জীবনে এ রকম ঘটনা এই প্রথম।"

বন্ধুরা বলল, "আসলে অপদেবতারা যে সব সময় দেখা দেয় তা নয়। এই রকম অদ্ভুত কিছু দেখিয়ে প্রথমেই মানুষকে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়। এসব দেখেও যদি কেউ কোনও গোঁয়ার্তুমি করবার চেষ্টা করে তখন তারা নানাভাবে ভয় দেখায় বা ক্ষতি করে।

তপাই সব শুনল। কিন্তু কিছু বলল না। কিই বা বলবে? এরকম অভিজ্ঞতা তো এই প্রথম। যাই হোক। ওরা অনেক রাতে ঝড় জল মাথায় করে ঘরে ফিরল।

পরদিন সকালে এই নিয়ে তপাইরা একটা জোর আলোচনায় বসল। শ্মশানঘরের ওই ক্ষণিকের বাসিন্দাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা সকলেই জেনে গেল প্রায়। সবাই বলল, "ওই ঘরটার এইসব ব্যাপারে একটু বদনাম আছে। অবশ্য লোকের মুখে শোনা। ওই জন্য সচরাচর রাত্রিবেলা দলে ভারি না হয়ে কেউ মড়া পোড়াতে গিয়ে ওই ঘরে ঢোকে না। তবে যা হয়েছে হয়েছে। আর যেন কেউ ভুলেও ও ঘরে যেয়ো না। খুব ভাগ্য ভাল যে বেঁচে ফিরে এসেছ সব।"

কথাটা তপাইয়ের পিসিমা পিসেমশাইয়ের কানেও উঠল। পিসেমশাই তো খুব বকাবকি করলেন তপাইকে। বললেন, "দেখো বাবা, তুমি যাতে ভাল হও, বদ সঙ্গে না মেশো সেইজন্যে তোমার মা বাবা তোমাকে আমার এখানে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এখানে এসেও তুমি যা আরম্ভ করেছ তাতে তো আমি রীতিমতো ভয় পাচ্ছি। কাজ কর্ম না কর দুঃখ নেই! খাও দাও টো টো করে ঘোরো। শুধু দয়া করে নেশাটি কোর না। আর ওই বদ ছেলেগুলোর পাল্লায় পড়ে যেখানে সেখানে যেয়ো না। ধরো দৈবাৎ যদি কোনও অঘটন ঘটে যেত কাল তাহলে তোমার মা বাবার কাছে কি কৈফিয়ৎ দিতাম আমি? রাত ভিত যে এইভাবে যেখানে সেখানে ঘোরো যদি সাপেই কামড়ায়।"

পিসিমা বললেন, "সত্যি বলছি, তুই যদি ভালভাবে না থাকিস তাহলে কালই আমি চিঠি লিখব তোর বাবাকে।"

তপাই বলল, "রাগ করছ কেন পিসি? কী থেকে কি হয়ে গেল কাল। ভূত প্রেত ওসব কিছুই নয়। আসলে দমকা হওয়ার ধাক্কাতেই খিলটা খুলে যাচ্ছিল।"

"তা সে যাই হোক বাবা। আর কখনও যাস না সেখানে! আর একটা কথা, আজ থেকে সন্ধে হলেই ঘরে ঢুকবি। প্রত্যেকে নিন্দে করছে তোর। সবাই বলছে, বামুনের ছেলে, ভদ্দর লোকের ছেলে এই বয়সে নেশা ভাঙ করা কি? ছিঃ। তোর কি লজ্জাও নেই বাবা? কী হয় ওইগুলো সব গিলে?"

তপাই বলল, "আমি তোমার পা ছুঁয়ে আর বাবা তারকেশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি আজ থেকে ওসব আমি একদম ছোঁব না। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি আমি আজ আছি কাল নেই। আমিও বুঝি এগুলো খারাপ। শুধু শুধু আমার জন্যে তোমরা কেন বদনামের

ভাগী হবে। তার চেয়ে ওসব আর একদমই ছোঁব না আমি।"

পিসেমশাই বললেন, "আজ আছি কাল নেই মানে? সারাজীবন থাক না তুই এখানে। খা দা জমি জমা দেখা শোনা কর। তোর বিয়েথা দিয়ে ঘর সংসার করে দেব আমরা। অযথা বয়ে যাবি কেন? জীবনটা কি ছেলেখেলার জিনিস? জীবনের দাম নেই?"

তপাই বলল, "ঠিক বলেছেন পিসেমশাই। আমি খুব ভুল করেছি এতদিন। এবার থেকে আমি সত্যিই ভাল ছেলে হব। অনেক বদমায়েশি করেছি। অনেক জ্বালাতন করেছি। আর নয়। বাবা তারকনাথের দিব্যি।"

তপাই সকালে আর ঘর থেকেই বেরল না। সারাটা দিন শুধু ঘুমিয়েই কাটাল।

বিকেলবেলা একবার শুধু একা একা দীঘির পাড়ে বেড়াতে গেল।

এমন সময় কেষ্ট মালিকের সঙ্গে দেখা। কেষ্ট মালিকের বয়স হয়েছে। তা ষাট-পঁয়ষট্টি তো বটেই। মাথা ভর্তি টাক। রোগা খেঁকুরে চেহারা। ঘরামির কাজ করে। তপাইকে দেখেই ডাকল, "তপা, তপারে!"

তপাই এগিয়ে বলল, "কী ব্যাপার কেষ্টদা, তুমি এখানে?"

"এই কাজ থেকে ফিরে চান টান করে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। তা তুই এখানে একা একা কি করছিস?"

তপাই বলল, "সবে ঘুম থেকে উঠলুম। কাল অনেক রাতে শুয়েছি। ভাল ঘুম হয়নি।"

কেষ্টদা বলল, "তা হ্যাঁরে, কী সব যেন শুনছিলুম, তোরা নাকি বাঁধের ধারে ওই শ্মশান ঘরে ভূতের পাল্লায় পড়েছিলি?"

"ভূত কি তা জানি না কেষ্টদা। তবে এই-এই ব্যাপার হয়েছিল।" বলে তপাই সব কথা খুলে বলল কেষ্টদাকে।

কেষ্টদা তো হেসেই অস্থির! বলল, "ওরে পাগল, ওটা হল জীবদান কাঠ। এক এক রকম গাছের কাঠ থাকে যেগুলো আপনা আপনি নড়াচড়া করে। তাতে ফার্নিচার করে ঘরে বসালেও সেটা ঘটাং ঘটাং করে শব্দ করবে। নয়তো একটু একটু করে স্থানান্তরে সরে যাবে। আমার মনে হয় ওই ঘরের খিল বা দরজা জানলাগুলো সম্ভবত ওই কাঠের।"

তপাই বলল, "যে কাঠেরই হোক। বেশ রহস্যময় ব্যাপার।"

"কাঁচকলা।"

"না কেষ্টদা, আমি নিজে চোখে দেখেছি।"

"গুষ্টির মাথা। কিছু নেশা-টেশা করেছিলি?"

"তা একটু করেছিলুম। তবে বেশিরকম কিছু নয়। জ্ঞান ছিল। তাছাড়া বৃষ্টিতেও ভিজেছি খুব। কাজেই নেশার ঘোরে নয়। সত্যিই দেখেছি।"

কেষ্টদা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "দেখ, তুই আমার ছেলের বয়সি। শহরে থাকিস। আর আমি এই গ্রামে ঘরে মানুষ হয়ে এত বড়টা হলাম। আমার তিনটে মেয়ে সাতটা ছেলে। কিন্তু আমি কখনও ভূত দেখলুম না, আর তোরা সেদিনের ছেলে ছোকরারা এসে যা বলবি তাই বিশ্বাস করে যাব? আমি এখনও বলছি ভূত নেই। ওসব তোদের মনের ভ্রম।"

"তুমি যদি বিশ্বাস না কর তো কি বলব কেষ্টদা। ভূত আমিও বিশ্বাস করি না। কিন্তু কাল যা দেখলুম তাকে অবিশ্বাস করি কী করে?"

কেষ্টদা বলল, "যাক। মরুক গে। ভূত থাকুক আব না থাকুক তাতে তোরই বা কি আমারই বা কি? তা তুই যখন আছিস তখন একা একা কেন খাই। বেশ কটকটে করে শোল মাছের ঝাল তৈরি করিয়ে এনেছি। আয়, তাই খেতে খেতে দুজনে একটু গলা ভেজাই।"

"না কেষ্টদা। ওসব আমি আর খাব না। এবার থেকে আমি ভাল ছেলে হব। বাবা তারকনাথের দিব্যি দিয়েছি আমি। তাব চেয়ে বরং তুমি খাও আমি দেখি।"

কেষ্টদা ভুরু কুঁচকে বলল, "তার মানে?"

"বললুম তো। এবার থেকে আমি ভাল ছেলে হব।"

"ভাল ছেলে হবি? তাই যদি হবি তো খারাপ ছেলে হতে গিয়েছিলি কেন? কপালে 'আগ' মার্কা ছাপ মেরে এখন ভাল হতে চাইছিস? খা বলছি।"

"না। ওসব আর খাব না। পিসিমা খুব বকাবকি কবছিল। পিসেমশাইও বেশ দুকথা শুনিয়ে দিয়েছে আজ।"

"সেইজন্যে খাবি না।"

"হ্যাঁ। সেইজন্যে আমি বাবার দিব্যি দিয়েছি। আর ছোঁব না ওইসব।"

"তাহলে এক কাজ কর। বাবাকে বল, বাবা আজকের দিনটা তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আজ খাই। কাল থেকে আর খাব না।"

"খেলেই কিন্তু ওরা জানতে পারবে।"

"এখন ঘরকে যাবার দরকারটা কী? ট্যাঁটামো করিস না। একটু বোস। সন্ধেটা উত্তীর্ণ হোক। বেশটি করে খেয়েদেয়ে রাত করে যাবি। এখন এইখানে ঘাসের ওপর আরাম করে শো দিকিনি।"

আবার মাথার পোকা নড়ে উঠল।

কেষ্টদার সঙ্গে দীঘির পাড়ে বসে গল্প করতে করতে সন্ধে গড়িয়ে গেল। তারপর অন্ধকার একটু গাঢ় হলে একটা গাছতলায় যেখানে কেষ্টদা ওর নেশার জিনিস কলাপাতায় ঢেকে রেখে দিয়েছিল সেখানে এগিয়ে গেল। তপাইও গেল সঙ্গে। তারপর শুরু হল পান ভোজনের পালা। একটু করে গলা ভিজোয় আর শোল মাছের ঝাল খায়। আঃ কি অপূর্ব।

দমভোর খেয়ে নেশায় চুর হল দুজনেই। কেষ্টদা হঠাৎ বলল, "তপাই একবার যাবি সেখানে?"

"কোথায়?"

"ঘোগের বাসায়।"

"ঘোগের বাসা! সেটা আবার কোনখানে?"

কেষ্টদা রসিকতা করে বলল, 'হুঁ হুঁ। বুঝলি না তো। বাঘের গ্রামে ঘোগের বাসা। মানে সেই শ্মশান-ঘরে ভূতের ডেরায়।"

"অর্থাৎ কাল যেখানে গিয়েছিলুম?"

"হ্যাঁ। আজ আমি আছি সঙ্গে। দেখি তো কে এসে দরজা জানালা খোলে। ওই দরজার খিল যে খুলবে তার খাল আমি খেঁচে দেব একেবারে। চলতো দেখি।"

তপাই বলল, "ঠিক বলেছ কেষ্টদা। আজ তো আর ঝড়-জল নেই। আজ দেখব খিল কে খোলে। ভূত তো ভূত, ভূতের বাপের নামও ভুলিয়ে দেব আজ।"

"চল তবে।"

"চলো।"

"'তুই আমার পেছনে থাক। আমি সামনে। আমি ইঞ্জিন হই। তুই রেলের কামরা আমি কু-ঝিক ঝিক শব্দ করতে করতে এগোব আর তুই ঘটাং ঘটাং করবি। ঠিক মনে করবি যেন আমরা মার্টিন কোম্পানির রেলগাড়ি।"

তপাই বলল, "বহুৎ আচ্ছা। তুমি স্টার্ট দাও আগে।"

কেষ্টদা নেশার ঘোরে খুব জোরে মুখ দিয়ে আওয়াজ করল, "কু-উ-উ-উ-উক্।" তারপর শুরু করল, "ভকস্ ভক্, ভকস্ ভক্, ভক্ ভক্ ভক্ ভক্ ভক্ ভক্।"

তপাইও তখন তপাইয়ের মধ্যে নেই। সে আনন্দে মশগুল হয়ে বলতে লাগল, "ঘট ঘট ঘটাং ঘট ঘট ঘটাং।"

নড়ে উঠল দুজনেই। তারপর চলা শুরু করল। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর জোরে ছুটে। দু'তিন বার আছাড় খেয়ে পড়ল। তাতেও চেতনা নেই। আবার ছুটল।

বাঁধের ধারের শ্মশান, দীঘির পাড় থেকে প্রায় মাইল খানেকের পথ। ওরা এইভাবে গিয়ে একসময় সেই শ্মশানঘরের কাছে পৌঁছুল। তারপর দুজনে সেই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে শুরু করল ভূতেদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালাগালি। কেষ্টদা একে মিস্ত্রী মানুষ। তার ওপর নেশার ঘোরে তার মুখ দিয়ে এমন সব ভাষা বেরোতে লাগল যে তা বলার নয়। কেষ্টদার মুখ আর পায়খানা এক হয়ে গেল। এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে গালাগালি করার পর একসময় কেষ্টদা থামল। তারপর বলল, "দেখি বাবা ভূতের পো, কত মায়ের দুধ খেয়েছ তুমি। আমার নাম কেষ্ট মালিক। হিম্মৎ থাকে তো আমাকে আটকাও দেখি।" বলেই দরজায় মারল এক লাথি।

দরজাটা ভেতর থেকেই বন্ধ ছিল। কাজেই কেষ্টদার লাথিতে কিছুই হল না। বরং কেষ্টদাই পায়ে ব্যথা পেল একটু।

তপাই বলল, "তুমি বুড়ো মানুষ। তুমি পারবে না কেষ্টদা। আমি কেমন লাথাই দেখো একবার।" বলেই মারল এক লাথি।

কিন্তু না। সে লাথিতেও কিছু হল না।

ওরা দুজনে তখন প্রাণপণ শক্তিতে গায়ের জোরে ঠেলতে লাগল দরজাটা। দরজা তবুও খুলল না।

কেষ্টদা বলল, "আমার মনে হয় দরজাটা ভেতর থেকে খিল দেওয়া। কেউ ভেতরে বসে আছে নিশ্চয়ই। খিল দিয়ে বসে বসে মজা দেখছে। ঠিক আছে। আমারও নাম কেষ্ট দিচ্ছি দরজায় শিকল দিয়ে।" বলে যেই না দরজায় শিকল দিতে যাবে অমনি দরজাটা আপনা থেকেই দু'হাট হয়ে খুলে গেল।

ওরা দুজনে তখন খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই দেখল একটা লোক গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে।

কেষ্টদা বলল, "ঝোলো বাবা, একেবারে বৃন্দাবনের কেষ্ট ঠাকুরটি হয়ে ঝোলো! তা এত যে লাথি মারলুম দরজায়, এত দেরি করলে কেন খুলতে!"

তপাই বলল, "দেরি করুক আর যাই করুক। শেষ পর্যন্ত খুলতে তো হল।"

কেষ্টদা বলল, "তা হল। কিন্তু দেরি ও করল কেন? এর জবাব ওকে দিতে হবে এতক্ষণ ধরে ধাক্কাধাক্কি করার একটা মেহনত নেই।"

তপাই বলল, "কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন রে? বল কেন দেরী হল?"

কেষ্টদা বলল, "না বললে ওই দড়িতেই ঝুলতে হবে সারা জীবন। ওখান থেকে নামাচ্ছি না আমরা! চেল্লে চেল্লে গলা ফেটে গেল। আমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি!"

তপাই বলল, "ঠিক আছে। কথা না বলে না বলবে। অত গরজ আমাদের নেই। কেষ্টদা, চলো তো আমরাও জব্দ করি ব্যাটাকে।"

কেষ্টদা বলল, "কী করে জব্দ করি বলতো?"

তপাই বলল, "ও যেমন ঝুলছে ওকে তেমনি ঝুলতে দাও।"

"তারপর?"

"তারপর? তারপর আমরা ঘরের বাইরে গিয়ে দরজায় শিকল দিয়ে পালাই চলো। দেখি ও ব্যাটা কি করে ঘর থেকে বেরোয়।"

কেষ্টদা বলল, "হ্যাঁ। ঠিক বলেছিস তুই। আমরা শিকল দিয়ে পালাই আর ও ব্যাটা ঘরে আটকে থাকুক।" এই বলে দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে যেই না আসতে যাবে অমনি একটা কনকনে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল শরীরের ওপর দিয়ে। সেই সঙ্গে হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া। আর তার পরই পাশের একটা আম গাছেব মোটা ডাল সশব্দে ভেঙে পড়ল কেষ্টদার মাথায়।

কেষ্টদা চিৎকার করে গাছের ডাল চাপা পড়ে ছট ফট করতে লাগল সেখানে।

তপাই অনেক চেষ্টা করল কেষ্টদাকে বাঁচাবার। কিন্তু পারল না। ওই দারুণ শক্ত মোটা ডালটাকে কিছুতেই নড়াতে পারল না সে। অগত্যা গ্রামে ফিরে লোকজন ডেকে এনে কেষ্টদাকে যখন উদ্ধার করল কেষ্টদা তখন মৃত।

সে রাত্রে প্রচণ্ড জ্বর এল তপাইয়ের।

পরদিন ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাইয়ে ওর জ্বর একটু কম হলে পিসেমশায় তপাইকে নিয়ে সোজা চলে এলেন হাওড়ায়। তারপর ঘরের ছেলেকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে দায়মুক্ত হয়ে ফিরে এলেন।

পাঁচ

তপাইয়ের যে সময়কার ঘটনা নিয়ে আজকের এই গল্প তখন দেশের সর্বত্র চরম একটা বিশৃঙ্খলা চলছে। খুবই ভয়াবহ দিন ছিল তখন। সেই সময় সম্ভবত সেটা কোনও ছুটির দিন। খেয়ে দেয়ে দুপুরে একটা গল্পের বই নিয়ে শুয়েছি এমন সময় দিদি এসে হাজির। কাঁদো কাঁদো মুখ। তাই চমকে উঠে বললাম, "কী ব্যাপার! এমন অসময়ে তুমি হঠাৎ?"

"তোকে একবার আমার ওখানে যেতে হবে ভাই।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"কাল রাত্রে পুলিশ এসে তপাইকে ধরে নিয়ে গেছে।"

"সেকি!'

"হ্যাঁ। মিলিটারি দিয়ে কার্ফু করিয়ে রাতের অন্ধকারে গোটা পাড়াটাকে ঘিরে ফেলে সব বাড়ি থেকে বেছে বেছে একটা দুটো করে ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে! সেই সঙ্গে তপাইকেও।"

দুঃসংবাদ নিঃসন্দেহে। অথচ করবার কিছুই নেই। ভ্রান্ত রাজনীতির এক উদ্‌ভ্রান্ত রূপ

হঠাৎ এমনভাবে মোড় নিয়েছে যে যারা সত্যিকারের একটা সুস্থ চিন্তাধারা নিয়ে এই পথে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরাও দেখে শুনে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে মাতব্বরি করে দিয়েছিল সমাজবিরোধীরা। ব্যক্তিগত রাগ-রোষ এবং চুরি ডাকাতির সুবিধার জন্য অবাধ খুন জখম শুরু হয়ে গিয়েছিল। শেষকালে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে এপাড়ার লোক ওপাড়ায় যেতে পারত না। দিবারাত্র গুলি আর বোমার শব্দে কান পাতা দায় হত। কী রাজনৈতিক দলের লোক, কী পুলিশ, কী নিরপরাধ সাধারণ মানুষ, কে যে কখন কোন মুহূর্তে খুন হবে বা যত্রতত্র নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে জখম হবে তা কেউ জানতেও পারত না। এমন অবস্থায় তপাইয়ের মতো ডানপিটে একটি ছেলেকে পুলিশ ধরবে তাতে আর আশ্চর্য কী! তবে এটুকু জানি তপাই শুধুই ডানপিটে। ওকে যা সন্দেহ করা হচ্ছে তা ও নয় কিন্তু সেকথাই বা পুলিশকে এখন বোঝাবে কে? মার খেতে খেতে পুলিশও এখন এমন মরিয়া যে তাদের কাছে যে যাবে সাফাই গাইতে তাকেই ঢুকিয়ে দেবে।

এই সমস্ত খারাপ পরিস্থিতি এবং গোলমালের জন্যে আমিও দীর্ঘদিন দিদির বাড়ির দিকে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিলাম। দোকান বাজার অফিস আর ঘর ছাড়া কোনও সময়ই বাইরে থাকতাম না। আর দিন রাত গুলি ও বোমার শব্দ শুনতে শুনতে পুলিশের পদধ্বনি প্রত্যাশা করতাম। কেননা আমার ভাইটি সবে একটু ডাগর হয়েছে। কাজেই ভয় ছিল কখন বলতে কখন ওকেই না ধরে। কেননা অল্প বয়সী ছেলে ছোকরা দেখলেই পুলিশ সন্দেহ করত এবং তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করত।

যাই হোক, তপাই অ্যারেস্ট হয়েছে শুনে যেতেই হল দিদির বাড়িতে। আমার বাড়ি থেকে দিদির বাড়ির দূরত্ব একেবারে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। তবে এই এলাকাতেই এবং আধঘণ্টার হাঁটা পথে।

দিদির বাড়ি যেতেই জামাইবাবু আমাকে দেখে বললেন, "কী ব্যাপার হে! তোমার যে পাত্তাই নেই?"

"কী করে থাকবে? এই দুর্দিনে বেঘোরে মরার জন্যে কেউ ঘর থেকে বেরোয়? কে কোথায় কখন কোনখানে ইনফরমার মনে করে রাস্তার মাঝখানে শহীদ করে দেবে তার ঠিক কী?"

"তা অবশ্য ঠিক। এদিকে কী কাণ্ড হয়েছে শুনেছ তো? তোমার গুণধর ভাগনা দুটিকে তো কাল রাত্রে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। আমার তো ভাই হাত-পা কাঁপছে ভয়ে। তোমার দিদিকে নিয়ে যাও। গিয়ে একটু দেখো ছাড়িয়ে আনতে পার কিনা। নাহলে মিসা টিসা দিয়ে দেয় তো বারোটা বাজিয়ে দেবে। ছোটকাটাকে আজ সকালে ছেড়েছে। কিন্তু তপাইকে ছাড়ে নি।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "ছোটকা মানে! স্বপনকেও ধরেছিল নাকি?"

"কেন শোননি?"

"না। এই তো শুনছি। দিদি তো শুধু তপাইয়ের কথাই বলল।"

"শোনো তবে—এই বলে জামাইবাবু যা শোনালেন তা হল এই—

রাত তখন একটা কি দুটো। হঠাৎ চারদিক থেকে হ্যাট ফ্যাট শব্দ। আর তারপরেই দরজায় কড়া নাড়া। সেই সঙ্গে দমাদ্দম বুটের লাথি। ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলেই দেখি থিক থিক করছে সি. আর. পি. এবং এখানকার পুলিশ ও দারোগা।

মেজো দারোগা স্বয়ং এসেছিলেন। বললেন, "ছেলেরা কোথায়?" বলেই পাশের ঘরে মানে যে ঘরে শঙ্কর, তপাই আর স্বপন শুয়েছিল সেই ঘরে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন।

শঙ্কর উঠে দরজা খুলতেই মেজো দারোগা ঠাস করে মারলেন ওর গালে এক চড়। একেই একটু দুর্বল ছেলে। তার ওপর সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটু শুয়েছিল বেচারি। চড় খেয়ে কঁকিয়ে উঠল তাই। চড় মারার পর মেজো দারোগা চিনতে পারলেন শঙ্করকে। বললেন, "ও তুই! তোকে দরকার নেই। তিনি তোকে।" চেনবার অবশ্য কারণও একটা ছিল। শঙ্কর তখন থানার পাশেই একটি গুঁড়ো চা পাতার দোকান দিয়েছিল। মেজো দারোগা বললেন, "আর কে আছে ঘরে?"

তপাই একটি শর্ট প্যান্ট পরে শুয়েছিল। সেই অবস্থাতেই উঠে এল।

মেজো দারোগা বললেন, "আরে তপাইবাবু যে। এই কি ডাকাতি করে ফিরছ নাকি?"

তপাই বলল, "দেখতেই তো পাচ্ছেন ঘুমোচ্ছিলাম। শুধু শুধু আলফাল বকছেন কেন?"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই এক চড়। তারপর ওকে ঘর থেকে টেনে বের করে এনে কনস্টেবলদের হাতে তুলে দিতেই কোমড়ে দড়ি পরাল তারা। এরপর ঘরে ঢুকে বিছানার মশারি ওঠাতেই মেজো দারোগা স্বপনকে দেখতে পেলেন। ক্রোধান্ধ দারোগাবাবু চুলের মুঠি ধরে টেনে আনলেন তাকেও।

স্বপন কেঁদে বলল, "আমি কি করলুম! আমাকেও ধরে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?"

"তুমি কিছু করনি বাবা। শুধু আমাদের এই বরযাত্রীদের দলে লোক একটু কম আছে বলেই তোমাকেও নিয়ে যাচ্ছি। আজ রাত্রিটা লক আপে থাকবে। তারপর কাল যথাস্থানে পাঠিয়ে দেব তোমাদের। এসো মানিক এসো।" বলে দুটো ছেলেকে সম্পূর্ণ বিনা দোষে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গেল ওরা। শুধু যে আমাদের বাড়ি তা নয়। সব বাড়ি থেকেই একটা দুটো করে নিয়ে গেছে এইভাবে। যাই হোক, থানায় নিয়ে যাবার পর একজন কনস্টেবলের সঙ্গে স্বপনের চেনা ছিল তাই রক্ষে, সেই মেজো দারোগাকে বলে কয়ে ওকে ছাড়ান দেয়। কিন্তু তপাইকে ওরা কোনওমতেই ছাড়বে না বলেছে। এখন একবার তুমি গিয়ে দেখো যদি ওকে ছাড়াতে পার। কেননা তোমার তো অনেক সোর্স আছে। আর ভাগনা তোমারই।"

আমি সব শুনে গুম হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

দিদি বললেন, "শুধু কি ওদের ধরে নিয়ে যাওয়া? পুলিশের সেই মূর্তি যদি একবার দেখতিস তুই তো কী কথাই বলব তোকে। আমি কাঁদছিলুম বলে আমাকে পর্যন্ত যা তা কথা বলে গেছে।"

"বল কি! এত সাহস? পুলিশ ভেবেছে কী? নিরপরাধ ছেলেগুলো ঘরে শুয়ে আছে পুলিশ এসে তাদের তুলে নিয়ে যাবে, বাড়ির লোককে যা তা বলে যাবে। এটা মগের মুলুক নাকি? চলো তো থানায়। দেখি কি ব্যাপার। প্রতিকার না হলে ডি. এম.-কে জানাব। কমিশনারকে চিঠি দেব এবং দরকার হলে মামলা করব।"

রাগের মাথায় বললাম বটে কিন্তু মনে মনে জানি কিছুই করব না। কেননা এই

বিশেষ সময়টিতে পুলিশের ওপর এমন ক্ষমতা দেওয়া আছে যে পুলিশ দরকার হলে পুলিশকেই গ্রেপ্তার করবে। পাবলিক তো কোন ছাড়। কাজেই এই মুহূর্তে ওসব নয়। মনের রাগ মনে চেপে দিদি জামাইবাবু দুজনকে নিয়েই থানায় গেলাম।

মেজো দারোগা একবার আড়চোখে চেয়ে দেখলেন আমাদের দিকে।

তপাই সহ প্রায় দশ বারোজন লক আপে রয়েছে দেখলাম।

আমরা সরাসরি ও.সি-র ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

এক ভয়ঙ্কর চেহারার ও.সি বসে ছিলেন নিজের ঘরে। আমাদের দেখেই বাজখাঁই গলায় বললেন, "কী চাই?"

আমি একটু রাগত স্বরে বললাম, "আপনাদের মেজো দারোগাবাবু কাল রাত্রে বিনা দোষে আমাদের ছেলেকে তার মায়ের কোল থেকে তুলে নিয়ে এসেছে। আমরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।"

"কী নাম?"

"তপাই ব্যানার্জী।"

"ওকে ছাড়া যাবে না।"

"ওর অপরাধ?"

"সে কথা আপনাদের বলা প্রয়োজন মনে করি না।"

আমি তখন দারুণ রেগে গেছি! বললাম, "দেখুন, আপনারা কিন্তু বড্ড বাড় বেড়েছেন। আজকের এই বিশেষ সময়টিতে আপনাদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বলে সেই ক্ষমতাকে আপনারা সম্পূর্ণ অন্যভাবে কাজে লাগাচ্ছেন।"

আমার কথা শেষ হতেই ও.সি বোমার মত ফেটে পড়ে টেবিলে একটা ঘুসি মেরে বললেন, "বেরিয়ে যান। বেরিয়ে যান এখান থেকে। আপনাদের ছেলেকে আমি মিসায় দেব। আর এক সেকেন্ড এই ঘরে থাকলে আপনাকে পর্যন্ত অ্যারেস্ট করব আমি।"

ভয়ে এবং অপমানে আমারও মুখ লাল হয়ে উঠেছে তখন। বললাম, "এটা তো খুব সোজা কাজ। আমি আপনার ঘরে দাঁড়িয়ে আছি, আপনার লোক এসে আমাকে অ্যারেস্ট করবে। তবে আমার সঙ্গে কিছু করবার আগে আপনি কিন্তু একটু ভেবে দেখবেন। আমি হচ্ছি 'অমুকের' লোক। অ্যারেস্ট করে বেশিক্ষণ কিন্তু আপনি রেখে দিতে পারবেন না আমাকে। আমি ঠিক বেরিয়ে যাব।"

ও.সি এবার শান্তভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। তারপর ভদ্রভাবেই বললেন, "বসুন।"

দিদি জামাইবাবু এবং আমরা তিনজনেই বসলাম।

"উনি কে হন আপনার? যার নাম করলেন?"

"কেউ না। তবে আমি তাঁর অত্যন্ত পরিচিত। আমাকে তিনি এতই ভাল ভাবে চেনেন যে আমি আশা রাখি আমি কখনও এই ধরনের কোনও বিপদে পড়লে তিনি নিশ্চয়ই আমার জন্য কিছু অন্তত করবেন। কারণ তিনি জানেন আমি কোনও গর্হিত কাজ করতে পারি না।"

"আপনার নাম?"

আমি নাম বলে পরিচয় দিলাম।

ও.সি হেসে বললেন, "অ। তাই বলুন। আপনি তো মশাই-এ অঞ্চলে খুব পপুলার। আমার নাতিরা আপনার লেখা পেলে খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে। আর সত্যিকথা বলতে কি সাহিত্য বা সাহিত্যিকদের প্রতি আমার নিজেরও একটু দুর্বলতা আছে।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

সেই ভয়ঙ্কর মানুষটি যেন নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। তাঁর চোখে মুখে বিনীত এবং ভদ্র এক মানুষের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। বললেন, "আসলে, কি জানেন, সকাল থেকেই ঝামেলা। এইসব ছেলেগুলোর বাড়ির লোকেদের আবেদন নিবেদন এবং সুপারিশের ঠ্যালা সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।"

আমি বললাম, "দেখুন, অন্যের ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না। তবে আপনাদের মেজ দারোগাবাবু কিন্তু আমাদের বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ দুটি ছেলেকে তুলে এনেছেন কাল। একজন ছাড়া পেয়েছে। আর একজনের জন্যে অন্যরকম ব্যবস্থা হচ্ছে শুনলাম। এমনিতে ও ছেলেটি একটু ডানপিটে। তবে ওকে যা সন্দেহ করছেন আপনারা ও কিন্তু তা নয়। সব চেয়ে দুঃখের কথা রাস্তাঘাটে কোনও দুরন্তপনার সময় ওকে ধরলে আমাদের কিছু বলার ছিল না। তবে কিনা যে ছেলে রাত্রিবেলা ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে তাকে এইভাবে ধরে এনে আটকে রাখার পিছনে যে কি যুক্তি থাকতে পারে আপনাদের তা বুঝলাম না। শুধু তাই নয়। আমার দিদি কাঁদছিলেন বলে আপনাদের মেজবাবু তাঁকে পর্যন্ত যা তা কথা বলে এসেছেন।'

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এ ব্যাপারে আমি মেজবাবুকে সতর্ক করে দেব। তবে আপনার অনেক অভিযোগ তো আমি শুনলাম। এবার আপনি অনুগ্রহ করে আমার দু'একটা কথা শুনবেন কি?"

"বলুন।"

"এই যে চারদিকে এত খুন জখম বোমাবাজি অবাধে চলছে, এত ভয়ের ব্যাপার ঘটছে এগুলো এইভাবেই চলুক এই কি আপনারা চান?"

"না।"

"তাহলে এইগুলো রোধ করবার জন্য প্রশাসনকে যদি কোনও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয় তাকে নিশ্চয়ই আপনারা সমর্থন জানাবেন?"

"জানাব। তবে রাতের অন্ধকারে কিছু ঘুমন্ত নিরপরাধ ছেলেকে তুলে নিয়ে এসে তাদের নামে গোটাশতক মিথ্যে কেস লিখিয়ে যদি সেই ব্যবস্থা নেন তাহলে কিন্তু সমর্থন জানাতে আপত্তি আছে।"

"ওঃ হোঃ। আপনাকে নিয়ে পারা গেল না মশাই। আপনার প্রসঙ্গেও আমি আসছি। আপনার তাহলে পুরোপুরি ধারণা যে আমরা নিরীহ ছেলেগুলোকে ধরে নিয়ে এসে পেটাই বা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কেস দিই।"

"সবাইকে নাহলেও কারও কারও বেলায় দেন।"

"যেমন আপনার ভাগনের বেলায় হয়েছে। এই তো?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার বাড়ি কোথায়? শুনেছি আপনি শিবপুরের দিকে থাকেন।"

"আমি মধ্য হাওড়ায় থাকি।"

"বাড়িতে কে কে আছেন আপনার?"

"মা বাবা ভাই।"

"ভাই কি করে? বয়স কত?"

"স্কুলে পড়ে। তেরো চোদ্দ বছর বয়স।"

"পুলিশের খাতায় নাম আছে?"

"তার মানে! ওইটুকু ছেলের শুধু শুধু পুলিশের খাতায় নাম থাকতে যাবে কেন? তাছাড়া আমরা তাকে যথেষ্ট চোখে চোখে রাখি।"

"খুব ভাল কথা। আমি বলতে চাইছিলাম এই যে আপনার ভাগনার মতো তাকেও কোনওদিন পুলিশ রাত্রিবেলা তুলে নিয়ে যায় নি তো?"

"এখনও পর্যন্ত যায় নি।"

"সেকি! আপনি যে এলাকায় থাকেন ওটা তো এখন রীতিমতো বিপজ্জনক এলাকা। ওই এলাকা থেকে প্রতিদিনই খুন জখম আর বোমাবাজির রিপোর্ট আমরা পাই। এমন কি দিনমানেও ওই অঞ্চলে পুলিশের গাড়ি ঢুকতে পারে না। ওখান থেকে প্রায় রাত্তিরেই কার্ফু করিয়ে বহু ছেলেকে ধরে আনা হয়। অথচ আপনার ভাই ধরা পড়েনি এ ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো!"

ও.সি. কি বলতে চাইছেন কিছু বুঝলাম না। তবু বললাম, "না, এখনও পড়েনি।"

ও.সি. হেসে বললেন, "যাক, পুলিশ তাহলে একটা ভাল কাজও করেছে যে আপনার নিরীহ ভাইটাকে ধরে নি। পুলিশ তাহলে মাঝে মাঝে এরকম ভুলও করে? এবার সত্যি করে বলুন তো আপনি যে পাড়ায় থাকেন সেখান থেকে যে সব ছেলেদের পুলিশ ধরে নিয়ে আসে তারা ঠিক কি রকমের ছেলে? সত্যি কথা বলবেন।"

আমি আর উত্তর দিতে পারলাম না।

"আপনি আরও একটা কথার উত্তর দিন আমাকে। আপনি তো মশাই আপনার ভাগনাকে ছাড়াবার জন্য হন্যে হয়ে ছুটে এসেছেন এখানে কিন্তু আপনি কি জানেন আপনার ভাগনাটি কি মাল?"

"আমি তো আগেই বলেছি আমার ভাগনা দুরন্ত দামাল। ভয়ানক ডানপিটে। কিন্তু আপনারা যা ভাবছেন ও তা নয়।"

ও.সি. এবার কঠিন গলায় বললেন, "তাহলে আমি ধরে নেব আপনি চাকরি বাকরি করেন না। এবং বাড়িতেও থাকেন না। দিনরাত শুধু দিদির বাড়িতে থেকে আপনার এই আদরের ভাগনাটিকে পাহারা দেন। তাই না?"

আমি নীরব।

ও.সি. এবার আমার দিদি জামাইবাবুকে বাইরে যেতে বলে আমাকে বললেন, "শুনুন, আপনার নিরীহ ভাগনাকে কোনও রাজনৈতিক ব্যাপারে ধরা হয় নি। তবুও তাকে রাত্রিবেলা ঘুম থেকে তুলে এনে কেন লক আপে রাখা হয়েছে জানেন? এই দেখুন।" বলে ড্রয়ারের ভেতর থেকে একখানি 'গণ অভিযোগ পত্র' বের করে আমার সামনে মেলে ধরলেন।

তাকিয়ে দেখলাম এই অঞ্চলের কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক অভিযোগ পত্রের মাধ্যমে কিছু ছেলেকে অবিলম্বে মিসায় গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন। স্বাক্ষরকারীরা সকলেই আমার পরিচিত। এই অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এনারা। এঁদের নির্দেশ অমান্য করার

সাধ্য পুলিশের নেই। আর সেই নামের তালিকায় আমার দুটি ভাগনারই নাম জ্বল জ্বল করছে।

আমার হাত থেকে কাগজটা খসে পড়ল।

ও. সি. বললেন, "এর পরও এইসব ছেলেদের গ্রেপ্তার না করে আমাদের উপায় আছে? আমরা জনসাধারণের সাহায্য চাইছি। তাঁরা এই নামগুলি আমাদের হাতে পৌঁছে দিয়েছেন। তবু দেখুন আপনার দুটি ভাগনেকে ধরে এনেও একটিকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ ওকে ভুল করে ধরা হয়েছিল। কেননা এতে যে স্বপন ব্যানার্জীর নাম রয়েছে ও সে স্বপন নয়। সে ছেলেটি এখন ফেরার।" এরপর একটু থেমে বললেন, "দেখুন, আমরা পুলিশের চাকরি করি বটে কিন্তু আমাদেরও ছেলে মেয়ে আছে। কাজেই গোটা কতক নিরীহ ছেলেকে ধরে নিয়ে এসে আমরা অযথা পেটাই, তাদের নামে মিথ্যে কেস লেখাই এগুলো কিন্তু ঠিক নয়। তবে কোনও ভিড়ভাট্টায় বা কোনও গোলমালের মুখে যে দু'চারটে নিরীহ ছেলে বা লোক ধরা পড়ে না তা নয়। পরে উপযুক্ত প্রমাণ পেলে আমরা তাদের ছেড়েও দিই।"

আমি এবার উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, "তাহলে আমার ভাগনার ব্যাপারে কি ঠিক করলেন?"

"এখনও কিছু ঠিক করিনি। আপনিই বলুন না কী করা যায়?"

"কী বলি বলুন? শুধু করযোড়ে আপনার কাছে আমি একটিই অনুরোধ করছি। অনুগ্রহ করে ওকে আপনি এবারের মতো ছেড়ে দিন। ওকে আমরা নজরবন্দী করে রাখব। এরপর ভবিষ্যতে যদি আপনি কখনও ওর নামে কোনও অভিযোগ পান বা কোনও কারণে ও গ্রেপ্তার হয়, তাহলে আমি অন্তত ওর ব্যাপারে আর আসব না।"

"ভবিষ্যতে নয়। আপনি এখনও এর ব্যাপারে থাকবেন না। আপনি তো এই এলাকার বাইরে থাকেন। কাজেই আপনি জানেন না আপনার এই ভাগনাটি কি ডেঞ্জারাস। তবে আপনার অনুরোধ আমি রাখব। এবং আজ ওকে ছেড়েও দেব। কিন্তু একটি শর্তে।"

"বলুন কী শর্ত?"

"এখান থেকে ছেড়ে দেবার পর টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে ওকে আপনারা হাওড়া কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দেবেন। যদি তা না করেন তাহলে কিন্তু আপনার এই ভাগনাটিকে আর জীবিত দেখতে পাবেন না। কেননা ওর দলের ছেলেরা জেলে পচবে আর ও খুঁটির জোরে বুক ফুলিয়ে পাড়ার মধ্যে ঘুরে বেড়াবে তা তো হয় না। ওরাই ওকে শেষ করে দেবে। কাজেই এখান থেকে আপনারা ওকে সরিয়ে নিয়ে যান। ওকে ভাল হবার শেষ সুযোগ করে দিলাম আমি। যদি এর অন্যথা হয় তাহলে কিন্তু ভাল হবে না। আমি নিজেও এত খেপে আছি ওর ওপর যে এরপর রাস্তায় ঘাটে যেখানে দেখব আমি ওকে সেখানেই গুলি করে মারব। আর ধরে এনে লক আপে রাখব না। এবার যা ভাল বোঝেন তাই করবেন।" বলেই বেল বাজিয়ে লোক ডাকলেন।

একজন কনস্টেবল এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

"তপাই ব্যানার্জীকে ছেড়ে দাও। তবে এখুনি নয়। সন্ধের পর।" তারপর আমাকে বললেন, "দিনের বেলা নিয়ে যাওয়াটা নিরাপদ নয়। রাত্রিবেলা ওর বাবাকে বলবেন ট্যাক্সি করে নিয়ে যেতে। আর ওর সম্বন্ধে পাড়ায় কোনও আলোচনা করবেন না। এখানেও অন্য

বন্দীরা কেউ টের পাবে না ও ছাড়া পেল কি কোথায় গেল। যান।"

আমরা নীরবে থানা থেকে বেরিয়ে এলাম।

এরপর দিদির বাড়িতে গিয়ে খুব একচোট ঝগড়া করলাম দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে। রেগে মেগে বললাম, "তোমরা তোমাদের নিজেদের ছেলেকে কনট্রোল করতে পার না, ছেলেরা কী করে বেড়াচ্ছে না বেড়াচ্ছে খোঁজ খবর রাখো না, অযথা আমাকে ডাকিয়ে এনে কেন অপদস্থ করালে?"

দিদি জামাইবাবু দুজনেই মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর জামাইবাবুই বললেন, "আচ্ছা, আমাদের তখন বাইরে আসতে বলে ও.সি. কি বলছিলেন তোমাকে?"

"সে কথা আপনাদের বলা যাবে না। তবে উনি এমন কিছু আমাকে দেখিয়েছেন যাতে বুঝতে পারলাম আপনাদের ছেলেকে বিনা দোষে পুলিশ ধরে নি।"

দিদির মুখ থেকে অস্ফুটে শুধু বেরিয়ে এল, "সেকি রে!"

"হ্যাঁ। খুব সাবধান।"

এরপর আমার ছোট ভাগনা স্বপনকে ডেকে নিয়ে গেলাম পাশের ঘরে। ঘরের দরজা বন্ধ করে মামা ভাগনা মুখোমুখি হলাম। অনেক বুঝিয়ে বাঝিয়ে বকে ঝকে মোচড় দেবার পর স্বপন যা বলল তার অর্থ হল এই, ওদের পাড়ার ধোঁকাদা, মানে যিনি রেগে গেলে হুট করতেই গায়ে হাত তোলেন। অর্থাৎ ঠ্যালাওলা রিক্সাওলার ওপর যাঁর হাতের কাজের আধিপত্যটা বেশি তাঁরই নির্দেশে ওরা রাত্রিবেলা দেওয়ালে গিয়ে লেখালিখি করে। তপাই এবং অন্যান্যরা লেখে। স্বপন এবং ওর সমজুটিরা পাহারা দেয়। তারপর ধোঁকাদার দল যখন বেপাড়ার কারও ওপর হিস্যা নেন তখন সেইসব অস্ত্রশস্ত্র তপাই এবং দলবল গোপন স্থানে সরিয়ে রাখে। আর—

এই পর্যন্ত শুনেই কানে হাত চাপা দিলাম। বললাম, "ব্যস। আর কিছু বলতে হবে না। বুঝে গেছি।" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আসল সত্য প্রকাশ করলাম।

দিদি শিউরে উঠে বললেন, "বলিস কিরে! কিন্তু তুই বিশ্বাস কর ভাই, আমরা এসবের কিছু জানি না। রাত্রিবেলা ওরা তিনটেতে ও ঘরে শোয়। মাঝরাতে কখন যে চুপি চুপি ঘুম থেকে উঠে ওইসব করে তা কে জানত। ভাগ্যিস তুই চেপে ধরলি নাহলে কিছুই জানতাম না।"

আমি বললাম, "ওসব জানাজানির কথা থাক। তপাইয়ের ব্যাপারে এবার কি ঠিক করলে বল? ছেলের গুণ তো বেরলো আর পুলিশের বক্তব্য শুনলে। সময় মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। তার ভেতরে যা করবার করে ফেল।"

"কী করি বলতো? আমার তো মাথায় কিছু আসছে না। ওকে যেখানে পাঠাব ও তো সেখানেই উপদ্রব করবে। সেবার পিসির বাড়ি পাঠালাম, সেখানে গিয়েও যা করে এল তাতে সেখানেও আর ঠাঁই হবে না। তাই ভাবছি এবার ওকে দাঁইহাটে মীনার বাড়ি পাঠাই। মীনা দিদির বড় মেয়ে। ওইখানেই ও জব্দ। কেননা কুটুম বাড়ি। বেশি বাড়াবাড়ি করতে সাহস করবে না। পরে একটু ভেবে চিন্তে দেখব আর কোথায় ওকে পাঠানো যায়।"

"তাই দেখো। তবে আপাতত ওকে দাঁইহাটেই পাঠাও। কাল খুব ভোর ভোর উঠে ফার্স্ট ট্রেনেই পাঠিয়ে দাও ওকে। আর একটা কথা। ভুলেও কারও কাছে যেন গল্প কর না

ও ছাড়া পেয়েছে বলে।"

জামাইবাব বললেন, "ওকে নিয়ে যাবার তাহলে কী হবে? কে রেখে আসবে ওকে?"

"কে আবার? আপনার ছেলে আপনিই নিয়ে যাবেন। আমি ওসবের ভেতরে নেই।" এই বলে বাড়ি ফিরে এলাম আমি।

মনে মনে দুঃখও পেলাম খুব। তপাইটা শেষকালে এই লাইনে চলে গেল!

কোনও কোনও মানুষ আছে যাদের জন্ম লগ্নে এমন কিছু গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান থাকে যাতে তারা আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপ পায়। বিনা দোষে দোষী হয। অন্যের বোঝা নিজে বয়। কিন্তু তপাইয়ের জীবনে এমন কিছু গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব আছে যার ফলে ও কক্ষচ্যুত হয়ে বিপথে চলে গেলেও সেই গ্রহের প্রভাব ওকে সব সময় বিপদ মুক্ত করে। কোনও এক অদৃশ্য শক্তি দিনের পর দিন রক্ষা করে যায় ওকে। বাস্তব যতই বিপজ্জনক ভাবে ওর সামনে এসে উপস্থিত হোক না কেন সেই গ্রহচক্র তার ধারালো চাকায় সব কিছু ছিন্নভিন্ন করে ওকে বাঁচাবেই বাঁচাবে। নাহলে যেভাবে ওকে আমি থানা থেকে বের করে এনেছি সেইভাবে সেই সময়ে একটা ছেলেকে বের করে আনা অত সহজ ছিল না।

যাই হোক, তপাই দাঁইহাটে গিয়ে ওর দিদির বাড়িতে আশ্রয় পেল। মা বাবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আত্মীয় স্বজনরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। চারদিকের এই গোলমালের বেড়াজাল থেকে ছেলেটাকে যে বের করে আনা গেল এই যথেষ্ট। ছেলেপুলের এমনি দুরন্তপনা সহ্য হয় কিন্তু রাজনীতি না করেও রাজনীতির তকমা আঁটা বদমায়েশি ভয়ের কারণ হয়ে যায় কিনা। বিশেষ করে এই রকম একটি দুঃসময়ে।

তপাই চলে যাবার প্রায় মাস তিনেক পরের কথা। ছুটির দিনের এক দুপুরে আমি কুন্তীঘাট যাচ্ছিলাম। কুন্তীঘাট হল হাওড়া কাটোয়া লাইনের একটি স্টেশন। ব্যান্ডেলের পর বাঁশবেড়িয়া। তারপর ত্রিবেণী। তারপর কুন্তীঘাট। সেখানে নয়াসরাই খেয়াঘাটে কুন্তী ও গঙ্গার মিলন স্থলের পাশে উঁচু ডাঙায় দেড় কাঠা জমি কিনে আমি একটি ছোট বাড়ি তৈরি করেছিলাম। মাঝে মধ্যে ছুটিছাটা পেলেই আমি সেখানে যেতাম। সেদিনও তাই যাচ্ছি। দুপুরবেলা বারহারোয়া প্যাসেঞ্জারে বসে আছি। ট্রেন ছাড়তে তখনও একটু দেরি আছে। এমন সময় জানালার ধার থেকে সেই পরিচিত গলার স্বর শুনতে পেলাম, "ও মামা!"

চেয়ে দেখি তপাই। দেখেই তো চোখ কপালে উঠে গেল। বিস্মিত হয়ে বললাম, "কী ব্যাপার রে! তুই এখানে?"

"কোথায় যাচ্ছেন? কুন্তীঘাট?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তুই এখানে কি করছিস?"

"কিছু করিনি। দাঁইহাট যাব বলে এসেছি।"

"তোকে না হাওড়ায় আসতে মানা করেছি। ফের এসেছিস তুই? কবে এসেছিলি?"

"আজই ভোরে এসেছিলুম।"

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তার ওপর দিনের বেলায়। পাড়াশুদ্ধু লোক দেখল তো? সব জানাজানি হয়ে গেল।"

"পাড়ায় যাই নি তো আমি।"

"সেকি! বাড়ি যাস নি? কোথায় এসেছিলি তবে?"

"এইখানেই একটু কাজে এসেছিলুম। তাছাড়া বাড়ি থেকে যখন তাড়িয়েই দিয়েছে

তখন কোন্ মুখে আর সেখানে যাব?"

"বাড়ি থেকে তোকে তাড়িয়ে দেবে কেন? তুই কি জানিস না যে কাজ তুই করেছিস তারপর তোকে সরানো ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।"

তপাই হেসে বলল, "এখনও তো কিছুই করিনি মামা। ঘরে থেকে কিছুই করা যাচ্ছিল না। বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। জমানা বদলে যাচ্ছে। সারা দেশে আগুন জ্বলবে এবার।"

আমি তো লাফিয়েই উঠলাম প্রায়, "ও সর্বনাশ। তুই বুঝি বিপ্লবী হয়েছিস? তাই বল। তা বাবা জেনে রাখ, এইভাবে বিপ্লবকে ডেকে আনা যায় না। বিপ্লব যখন আসে তখন আপনা থেকেই আসে। যে সব প্রতারকরা তোদের এই সব শিখিয়েছে আসল সময়ে দেখবি তারা সবাই গা ঢাকা দেবে। মাঝখান থেকে মার খেয়ে মরবি তোরাই।"

তপাই বলল, "না মামা, যা ভাবছেন আপনি তা নয়। যে মন্ত্রে আমরা দীক্ষা নিয়েছি তাতে একের জন্যে অন্যে আমরা জীবন দিয়ে দেব। সবাই আমরা এক মন এক প্রাণ।"

"তাই নাকি? তা বাবা যেদিন তুমি লক আপে ছিলে সেদিন তোমার এক মন এক প্রাণরা কোথায় ছিল বাবা? সেদিন তো কাউকেই দেখিনি। আমার যতদূর মনে পড়ে আমিই তোমাকে পুলিশের খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম।"

এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একটা বোতল এগিয়ে এল আমার মুখের কাছে "মামাবাবু কোকোকোলা!"

চমকে উঠলাম, "কে!"

"আমি ডিকে। চিনতে পারছেন না?"

"ডিকে! একি অবস্থা তোর? কবে ছাড়া পেলি তুই?"

"ছাড়া পাইনি। সেন্ট্রাল জেলে ছিলুম। কাগজে দেখেন নি একদিন জেল ভেঙে কিছু কয়েদি পালিয়েছিল। আমিও ছিলুম তাদের দলে।"

বুকের ভেতরটা ঢিপ করে উঠল।

তপাইয়ের বন্ধু ডিকে। জগদ্ধাত্রীর মুণ্ডু কাটার জন্য এই অঞ্চলে সে বিখ্যাত হয়ে আছে।

এই বছরই জগদ্ধাত্রী পুজোর এক হপ্তা পরে স্থানীয় একটি ক্লাবে গিয়ে ঝামেলা পাকায় ও। সঙ্গে তপাইও ছিল। তবে পুরোভাগে ছিল ডিকেই স্বয়ং। ক্লাবের সেক্রেটারির কাছে গিয়ে ওরা বলেছিল ওদের পুজোর চাঁদার টাকা থেকে কিছু টাকা দিতে। কিন্তু সেক্রেটারি তাতে রাজি হয়নি। বলেছিল, "মায়ের পুজোর টাকা থেকে নেশার খোরাক জোগাব তোদের? বলতে লজ্জা করল না? যা বেরিয়ে যা এখান থেকে।"

ডিকে ফোঁস করে উঠে রক্তচক্ষু দেখিয়ে বলেছিল, "খবরদার বলছি, রঙ নিয়ে কথা বলবি না। একেবারে পুরোপুরি বিষখোবরা ছেলে আমি। যদি খেপি তো এই মা জগদ্ধাত্রী বাঁচাতে পারবে না তোকে।"

সেক্রেটারিও ক্রুদ্ধ প্রত্যুত্তর দিয়েছিল, "ঠাকুর দেবতা নিয়ে ছেলেখেলা? এই মা তোর থেকেও অনেক বেশি বিষখোবরা বুঝলি?"

ডিকে আরও রেগে বলল, "ছেলেখেলা আমি করছি? না তোরা করছিস? কবে পুজো হয়েছে আর কতদিন ঠাকুর রেখেছিস। দশ দিনের ওপর হয়ে গেল সে খেয়াল

আছে? পরের টাকা নিয়ে ফূর্তি মারবি তোরা আর আমরা চাইলেই যত দোষ না? শিগগির টাকা দিবি। নাহলে এক্ষুনি প্যান্ডেলে আগুন ধরিয়ে দেব।"

"তাই নাকি? যদি মরবার ইচ্ছে থাকে তাহলে এসব করবি।"

"কে মারবে? তোদের এই মা? বেশ। আমি তো মায়ের বখাটে ছেলে। দেখি মা আমায় কি করে মারে। তোদের মা যদি সত্যিই থাকে তাহলে আমাকে রুখবে। আর যদি ওটা স্রেফ কাদামাটির পুতুল হয় তাহলে কিছুই করতে পারবে না আমার। মা যদি সত্যিই থাকত তাহলে এতদিনে তোদের আর রক্ষে রাখত না। বুঝলি?" বলেই তপাইকে বলল, "তপাই! যন্তরটা নিয়ে আয় তো।"

তপাই অমনি ছুটে গিয়ে মোড়ের মাথার চায়েব দোকান থেকে লুকিয়ে রাখা ভোজালিটা এনে হাজির করল।

পূজা কমিটির সেক্রেটারি হাঁ হাঁ করে উঠল, "এই! এই! কি হচ্ছে কি? খুব খারাপ হবে কিন্তু।"

কিন্তু কাদের বলা?

তপাই ভোজালিটা ডিকের হাতে দিতেই ডিকে পাশেই পড়ে থাকা একটা মই কুড়িয়ে এনে জগদ্ধাত্রীর বুকে ঠেকিয়ে চড় চড় করে উঠে গিয়ে মারল এক কোপ।

ডিকের খড়্গাঘাতে দেবীর মস্তক ভূলুণ্ঠিত হল।

তারপর সেই ভোজালিটা সেক্রেটারির মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে নাচাতে নাচাতে ডিকে বলল, "কিরে ব্যাটা দেখলি তো? ওই কাদা মাটির পুতুলটার কি অবস্থা করলুম। পারল আমার কিছু করতে? ওর ভেতরে মা থাকলে নিশ্চয় মা-ই আমাকে কেটে ফেলত।"

সেক্রেটারি রাগে দুঃখে এবং ক্ষোভে গায়ের জোরে ডিকের তলপেটে মারল এক লাথি। কিন্তু একজন পেশাদার মার খাইয়ের ওই লাথিতে কী হবে? কিছুই হল না তাই। উল্টে ডিকেই ওর পেটের মধ্যে গুঁজে দিল ভোজালিটা।

তারপর হইহই রইরই ব্যাপার।

ডিকেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। এবং বিচারে ওর দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল। সেই ডিকে এখন জেল ভেঙে পালিয়ে এসে একেবারে আমার সামনে।

আমি ডিকের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি তো বোতলের জল খাই না বাবা।"

ডিকে অবাক হয়ে বলল, "এ তো কোকোকোলা।"

"না বাবা। হাওড়া স্টেশনের কোকোকোলা আর ড্রেনের জল একই ব্যাপার।"

"সেকি মামা! এত লোক খাচ্ছে!"

এমন সময় আর এক মক্কেল এসে হাজির হল, "কী মামু, ভাল তো?"

"তুই কে রে? তোর মুখটা যেন চেনা চেনা লাগছে।"

"আমি শান্ত। একবার তপার সঙ্গে আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলুম মনে নেই? সেই সরস্বতী পুজোর সময়। আপনি কত গল্প শোনালেন।"

"তা কি ব্যাপার বলতো? তোরা সব যাচ্ছিস কোথায়?"

"আমরা দাঁইহাট যাচ্ছি।"

তপাই বলল, "মামা, মাকে যেন বলবেন না। ওখানে গিয়ে পুরোপুরি একটা গ্যাঙ তৈরি করে ফেলেছি। আমি এদের নিয়ে যাব বলে এসেছিলাম। আপনি একদিন আসুন না

আমাদেব ওখানে? এই বলে একটা ব্যাগ এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, "এটা আপনার সিটের নিচে লুকিয়ে রাখুন তো মামা।"

"কী ওটা!"

"ওতে মাল মশলা আছে। পেটোর মশলা। দারুণ একটা মওকা পেয়েছি মামা।"

"কিন্তু এটা আমার এখানে কেন বাবা? কোনও বিস্ফোরক কিছু নেই তো?"

"না না। ভয় নেই। আসলে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে বোধহয় কারও নজরে পড়ে গেছি আমরা। মনে হচ্ছে কোনও আই. বি.-র লোক ফলো করছে আমাদের।"

"সে কীরে! টিকিট কেটেছিস?"

"কী হবে টিকিট কেটে? টিকিট আমরা কাটি না।"

"কেন কাটিস না? একে তোদের রেকর্ড খারাপ। তার ওপর যদি বিনা টিকিটে ধরা পড়িস তাহলে কিন্তু কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে।"

"মামা, আমরা তৈরি। কোনওরকমে ব্যান্ডেলটা যদি পার হতে পারি তাহলে আর আমাদের পায় কে? তারপর যে আমাদের টিকিট চাইতে আসবে তাকে আর ঘরে ফিরতে হবে না। অবশ্য চায়ও না কেউ। চেকাররাও চেনে আমাদের। চোখের চাউনি দেখলে পালায় তারা।"

"সে তো তোদের ড্যারায়! এর মধ্যে যদি ধরা পড়িস?"

"এইখানটাই একটু খারাপ জায়গা। কোনওরকমে ব্যান্ডেলটা পার হতে পারলে—।"

"সে যাক। কিন্তু যখন নিজেরাই সন্দেহ করছিস তোরা নজরবন্দী হয়ে গেছিস তখন এই মালটা কি আমার ঘাড়ে না চাপালেই নয়? আমাকেও যদি তোদেরই লোক মনে করে ধবে, তখন?"

"এঃ। ধরলেই হল নাকি? আসলে আমাদের হাতে ঝোলা ঝুলি দেখলেই সন্দেহ করবে। কিন্তু এখানে থাকলে টেরও পাবে না কেউ। আপনি আছেন তাই। নাহলে অন্য ব্যবস্থা করতাম।"

একটু পরেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

ভাগ্য ভাল তাই ব্যান্ডেল পর্যন্ত কেটে গেল নিরাপদেই। ট্রেনের যাত্রাপথে দুপাশের দৃশ্য দেখতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম সেই তপাই এই কয়েক মাসের মধ্যে কি থেকে কী হয়ে গেল। বেশ তো মড়া পুড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। কে বলেছিল ওকে এইসব করতে? কে বলেছিল ওকে অন্ধকারে দেওয়ালে লিখতে? কিন্তু কপালের লেখা। খণ্ডাবে কে?

যাই হোক। ব্যান্ডেল পেরোতেই তপাই এসে বলল, "তারপর মামু! খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তো? আর ভয় নেই। এবার আমরা আমাদের রাজত্বে ঢুকে পড়েছি। এ গাড়ি এবার আমাদের।"

আমি বললাম, "খুব ভাল কথা। তোমরা এবার রামরাজত্ব কর বাবা। আমি নেমে পড়ি। আমার স্টেশন এসে গেছে।"

কুন্তীঘাট আসতেই আমি নেমে পড়লাম। তারপর ঘুরে বেরিয়ে রাত্রিবেলা বাড়ি ফেরার পথে একবার দিদির বাড়িতে গিয়ে জানিয়ে এলাম তপাইয়ের বৃত্তান্ত। দিদি তো শুনেই লাফিয়ে উঠলেন 'সেকিরে' বলে। গালে হাত দিয়ে বললেন—"আবার ওই মুখপোড়াগুলো গিয়ে জুটেছে?"

আমি বললাম, "স্বচক্ষে দেখে এলাম আমি।"

দিদি সেই রাত্রেই ছুটলেন দাঁইহাটে। অনেক বারণ করলাম রাত ভিত ট্রেন জার্নি করে না যেতে। কিন্তু হাজার হলেও মায়ের প্রাণ তো। রাতের প্যাসেঞ্জারে চেপে একাই চললেন। পৌঁছুতে সেই কাল ভোরবেলা। তবু চললেন।

এবার তপাই প্রসঙ্গে আসা যাক।

দাঁইহাটে এসে প্রথম কিছুদিন তপাই চুপচাপই ছিল। তারপর গ্রামের আনাচে কানাচে ঘুরতে ঘুরতে এখানকার যে সব লাইনের ছেলে ছিল তাদের দলে ভিড়ে গেল। দেওয়াল লিখন, বোমাবাজি, প্রকাশ্য দিবালোকে ভোজালি পাইপগান ইত্যাদি নিয়ে রাবণের মতো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ানো, কোনও কিছুই বাদ দিল না।

আবার সেই পুরানো ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

খাওয়া দাওয়া আর টো টো করে ঘোরা। কোনওদিন ঘরে ফেরা বা না ফেরা। সবই ওর ইচ্ছা মাফিক চলতে লাগল। এখানেও সেই একটু আধটু বদমায়েশি করতে করতে একেবারে পাকা বদমাশ হয়ে উঠল। আবার সেই মস্তানি। জ্বালাতন পোড়াতন। লোকের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করল। কাজেই কেউ আর ভয়ে ঘাঁটাল না ওকে। আর সেই সুযোগে আরও বেড়ে উঠল ও। লাইনের ছেলেদের পাল্লায় পড়ে আবার এক বাস্তু ঘুঘু তৈরি হল। দিদির বাড়ি নাম কা ওয়াস্তে থাকা। প্রতি বাড়ি থেকে দলের ছেলেদের জন্য পালা করে খাবার দাবার যা আসে তাই খায়। হোটেল, ক্যানটিন, খাবারের দোকান আশপাশে যেখানে যত ছিল সর্বত্রই ফ্রি। মাঝে মাঝে তোলার টাকা আসে। সাধারণত দোকানদার এবং বাজারের ব্যাপারীরাই তোলার টাকা দিত। সেই টাকায় ঢালাও হাত খরচা চলত। কী সুখের জীবন। স্বর্গ যেন হাতের মুঠোয় নেমে এল। এখানকার ছেলেরা পেটো বাঁধায় খুব একটা পোক্ত ছিল না।

তপাই বলল, "আরে আমি তো আছি। পেটো বাঁধার ওস্তাদ কারিগরদের নিয়ে আসছি আমি।"

ছেলেরা বলল, "তাই নিয়ে এসো গুরু। ওদের সব খরচ খরচা আমরাই দেব।"

তপাই অমনি ছুটল। দাঁইহাট থেকে হাওড়া আর কতদূরের পথ। একবার শুধু মাটিতে পা দেওয়ার অপেক্ষা। পেটোর বিশ্বকর্মা ডিকে তো আছেই। তপাই গিয়ে ধরে আনল ডিকেকে। ডিকে এসে পেট ভরে সন্দেশ রসগোল্লা খেয়ে পেটো বাঁধা শেখাতে লাগল এদের। ডিকের জয় জয়কার পড়ে গেল এখানে।

বোমা তৈরি হলে প্রথম বোমাটি আনন্দ করে ফাটানো হল কাটোয়ার এক সিনেমা হলে। দুজন লোক গুরুতর আহত হল। একজন ঘটনাস্থলেই মরল। ওদের ভাষায় অবশ্য মায়ের ভোগে গেল। এরপর বোমা পড়ল একটি পুলিশ ভ্যানে। মৌচাকে ঢিল যাকে বলে। পুলিশ তো মারমুখি হয়ে উঠল। এলোপাথারি গুলি চালাল। কিন্তু সে গুলি লাগলে তো! অনেক চেষ্টা করেও পুলিশ ওদের ধরতে না পেরে নানা কৌশলে ফাঁদ পাততে লাগল। কিন্তু না। বৃথা হল। ওদেরও ফুর্তি তখন দেখে কে। কারণে অকারণে অযথাই চোর পুলিশের লুকোচুরি খেলার মতো যেখানে সেখানে প্যানিক সৃষ্টি করে পালিয়ে গিয়ে মজা দেখতে লাগল। পুলিশ ওদের ধরবার জন্যে চেষ্টা করে। কিন্তু গোলমাল বাধিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ে ওরা তার হদিশও পায় না।

তপাই মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে। চীনা বাজার থেকে বোমা তৈরির মাল মশলা কেনে। তারপর ডিকে এবং সম্ভব হলে আরও দু'একজন অভিজ্ঞ বোমাবিশারদকে সঙ্গে নিয়ে দাঁইহাটে ফেরে। ওদের দিয়ে কাজ করিয়ে আবার ছেড়ে দেয় ওদের। তারপর আবার শুরু করে নিজেদের কাজ।

সেদিন পূর্ব পরিকল্পনা মতোই ডিকে এবং শান্ত দুই খ্যাতিমান বোমাবিশারদকে নিয়ে পেটো বাঁধবার কাজে বসিয়ে দিল তপাই। ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি ভাঙা মন্দিরে চলতে লাগল কাজ।

আর তপাইরা তখন সশস্ত্র হয়ে এগিয়ে চলল ওদের আসল কাজ করতে গ্রামের শেষ প্রান্তে বনমালি বণিকের বাড়ি। প্রচণ্ড ধনী লোক। বন্ধকী কারবারে এবং চড়া সুদে টাকা খাটিয়ে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছেন। তপাইরা জনা দশেক ছেলে মিলে সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির। রাত্রি তখন আটটা কি নটা। শীতের রাত।

দরজায় কড়া নাড়তেই বণিকের গলা শোনা গেল, "কে!"

"আমরা। দরজা খুলুন।"

বণিককন্যা দরজা খুলেই অবাক। দেখল ভোজালি পাইপগান হাতে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে সব। ভয়ে চিৎকার করে পিছিয়ে গেল মেয়েটি।

তপাইরা ঘরে ঢুকল।

বনমালিও চিৎকার করে উঠল ওদের দেখে, "কী চাই তোমাদের? একেবারে বাড়িব ভেতরে ঢুকে পড়েছ কেন? তোমাদের হাতে ওই সব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র, ব্যাপার কি!"

"ব্যাপার কিছুই নয় বনমালিবাবু। বহুৎ দিন ধরে তুমি বহু গরিবের রক্ত শোষণ করেছ। আজ আমরা এসেছি তোমার রক্তপান করতে।"

বনমালি বণিকের স্ত্রী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। এই কথা শুনেই ফিট হয়ে গেল সে।

বনমালি বলল, "তার মানে?"

"তুমি শয়তান। তুমি জোতদার। তুমি মহাজন। তুমি সুদে টাকা খাটিয়ে মানুষের রক্ত শোষণ করছ।"

বনমালি করযোড়ে বলল, "শোনো বাবারা। তোমাদের পায়ে পড়ি। আমার একটা কথা অন্তত শোনো তোমরা। আমি সুদের কারবার করি ঠিক। কিন্তু অনেকে আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে সুদ তো দূরের কথা আসলও দেয় না। তাছাড়া কোনও গরিব দুঃখী লোক তাদের কারও ছেলে মেয়ের হঠাৎ বিয়ে বা মরণাপন্ন কোনও রোগী চিকিৎসার জন্য আকুল প্রার্থনা জানিয়ে যখন আমার পায়ের ওপর এসে পড়ে তখন যে আমি থাকতে পারি না। তখন সেই টাকার বিনিময়ে কিছু আমি নিই। তা বাবা এই গ্রামে তো অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি রয়েছে। সেই অসময়ে তারা যদি সুদ না নিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করত ওদের, তাহলে তো ওরা এসে আমাকে বিরক্ত করত না। আমাকে সুদখোর তো এরাই করেছে বাবা। অথচ আমার এই টাকায় কত মেয়ের সুখের ঘর তৈরি হয়েছে, কত মানুষের সম্পত্তি রক্ষা হয়েছে। কত রোগী রোগমুক্ত হয়ে তার জীবন ফিরে পেয়েছে। আমি একজন সুদখোর এটাই তোমরা দেখলে। আমার অবদানটা তোমাদের নজর এড়িয়ে গেল? মানুষের বিপদে মানুষকে টাকা দিয়ে সাহায্য করে আমি হলুম সুদখোর। আর যারা একটি পয়সাও সাহায্য না করে এক একটি অমূল্য জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল তারা হল মানুষ!"

তপাই চিৎকার করে বলল, "চোপ্ হারামজাদা। আমাদের গণ আদালতের বিচারে তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি। সেই থেকে অনেক বড় বড় লেকচার শুনলুম তোমার। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তাহলে এখুনি পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাদের হাতে তুলে দেবে। নাহলে মৃত্যুর জন্যে তৈরি হও।"

বণিক বলল, "তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই মুহূর্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি কোথায় পাব? এই বাজারে অত টাকা কেউ ঘরে রাখে? টাকা তো ব্যাঙ্কে।"

"তোমাদের টাকা ব্যাঙ্কেও থাকে, ঘরেও থাকে। বের কর শিগ্গির।"

"দোহাই বাবারা। তোমরা বিশ্বাস কর।"

"আমরা কিছুই বিশ্বাস করব না। টাকা না পেলে এই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেব আমরা।"

"তা তো দেবে। কিন্তু বাবা আমার তো পাপের পয়সা। গরিবকে শোষণ করা টাকা। এই টাকা তোমরা দেশপ্রেমিকরা কি করে নেবে বাবা? তোমাদের হাত কাঁপবে না?"

"না। ও টাকা আমরা নেব না। ও টাকা আমরা গরিবদের মধ্যেই বিলিয়ে দেব।"

"তোমরা মিথ্যে কথা বলছ। তা যদি হত তাহলে এইভাবে রাতের অন্ধকারে তোমরা এই কয়েকজনে আসতে না। দিনের আলোয় সমস্ত গরিব লোকদের নিয়েই আসতে। তা বেশ। আমাকে তোমরা প্রাণে মেরো না। কাল সকালে সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো। আমার যেখানে যা কিছু আছে সব আমি নিজে হাতেই সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে চলে যাব এখান থেকে।

তপাই বলল, "তুমি বহুৎ ধান্দাবাজ তা বুঝতেই পারছি। আমরা কাল সকালে ওইসব কবব আর সেই তালে তুমি আমাদের পুলিশে ধরিয়ে দেবে। 'ওটি হচ্ছে না। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তাহলে এখনও সময় আছে। টাকাগুলো বের করে দাও। তিন ঘণ্টা ভেবে দেখার সময় দিলুম। এর ভেতরে কি করবে ঠিক কর। আমরা একটু ঘুরে আসছি। কিন্তু সাবধান। বেশি চালাকি করতে যেয়ো না। বাড়ি থেকে পালাতে গেলে বা পুলিশে খবর দিতে গেলেই বিপদে পড়বে। বাইরে আমাদের কড়া পাহারা থাকবে এইটি শুধু মনে রেখো।"

"তোমরা তিন ঘণ্টা সময়ই দাও আর সারারাতই দাও। আমাকে মেরে ফেললেও টাকা তোমরা পাচ্ছ না। কেননা ঘরে আমার কিৎসু নেই।"

"বেশ। আছে কি না আছে পরে দেখা যাবে। আমরা ঘুরে আসছি। সময় কিন্তু তিন ঘণ্টা।"

এই বলে তপাইরা চলে এল বণিকের বাড়ি থেকে।

তারপর আবার সেই ভাঙা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। পেটো বাঁধা তখন শেষ পর্যায়ে। ডিকে আর শান্ত তাড়াতাড়ি পেটো বাঁধার কাজ শেষ করে বলল, "আমরা আজ রাতের ট্রেনেই পালাব ভাই। ট্রেন কটায়?"

"রাত বারোটায়।"

"বারোটার ট্রেনেই যাব। দিনমানে নয়। কেননা রাতের ট্রেনে গেলে ভোরে হাওড়ায় নেমে গা ঢাকা দেবার সুবিধে হয়।"

তপাই বলল, "তা অবশ্য ঠিক।"

এরপর সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে ওরা সকলে দল বেঁধে স্টেশনের দিকে চলল। যেতে যেতে ডিকে বলল, "বণিকের ওই পঞ্চাশ হাজার টাকার কেসটা কি হল তপাই?"

"হবে। তবে ব্যাটা খুব পাঁয়তাড়া কষছে। তিন ঘণ্টা সময় দিয়েছি। না দিতে পারলেই ভোগে পাঠাব।"

"যেভাবেই হোক টাকাটা আদায় করতেই হবে।"

"সে কথা আবার বলতে? ওটা পেলে আমাদের বম্বে যাওয়া আটকায় কে?"

"কিন্তু আমি কি করে খবর পাব?"

"খবর পৌঁছে যাবে ব্রাদার। খবর আমিই গিয়ে দিয়ে আসব।"

"ঠিক আছে। তবে লক্ষ্য রাখিস টাকাটা এখানেই না হাপিস হয়ে যায়।"

ওরা কথা বলতে বলতে জোর কদমে হেঁটে স্টেশনে এসে পৌঁছুল। প্লাটফর্মে উঠে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চষে বেড়াতে লাগল সব। তপাইয়ের দলে ওর ভগ্নিপতির খুড়তুতো ভাইও ছিল। ওর নাম জগা। জগা বলল, "তপাইদা, আমরা যখন এতজন এখানে আছি আর সবাই যখন সশস্ত্র তখন একটা কাজ করলে হয় না?"

"কী কাজ বল?"

"এখন যে গাড়িটা এখানে আসবে সেটা হল ফারাক্কা প্যাসেঞ্জার। এই গাড়িতে ভেন্ডার কম্পার্টমেন্টে ছানার ব্যাপারীরা কলকাতায় যায়। সেখানে একটু ঠেপ মেরে দেখলে হয় না?"

দলের সবাই লাফিয়ে উঠল, "হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। এ তো মন্দ প্রস্তাব নয়। এখন আমাদের প্রচুর টাকার দরকার।"

ডিকে বলল, "যা করবি সাবধানে করবি। আমরা এতে অংশ নিতে পারছি না। কেননা আমাদের ফিরতেই হবে। নাহলে একটু হাত লাগাতাম।"

তপাই বলল, "কোনও দরকার নেই। আমাদের ফুল ব্যাটেলিয়ান এখানে রেডি। এমন প্যানিক সৃষ্টি করব এখানে যে কালকের কাগজের প্রথম পাতার খবর হবে এটা। ট্রেন ডাকাতি আমার জীবনে এই প্রথম। কাজেই যা করব তা ইতিহাসে লিখে রাখার মতোই করব।"

তপাইয়ের পিঠ চাপড়ে ডিকে বলল, "সাব্বাস।"

এমন সময় দূরে ট্রেনের আলো নজরে পড়ল। আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল ওরা। আসছে—আসছে—ওই তো আসছে ট্রেন। ফারাক্কা প্যাসেঞ্জার। এখানে স্টপেজ নেই। কিন্তু ইদানিং থামছে। প্লাটফর্মে কোনও যাত্রীও নেই। স্টেশন জনমানব শূন্য। প্রচণ্ড শীতের রাত। তায় দুদিনের বাজার। লোকজন এমনিতেই তো ভয়ে ঘর থেকে বেরোয় না। কাজেই বাধা দেবারও কেউ নেই। জয় গুরু। ট্রেনটা যেন আজও থামে।

ট্রেন এল। থামল। ডিকে আর শান্ত উঠে পড়ল ট্রেনে।

তপাইদের ব্যাটেলিয়ানরাও এদিকে রেডি। একজন গার্ডের বুকে পাইপগান ঠেকাল, আর একজন ড্রাইভারের বুকে। বলল, "খবরদার। আমরা নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ট্রেন ছাড়বে না।"

অন্যান্যরা উঠল ভেন্ডারদের কামরায়। এই গাড়ির বিশেষত্ব হচ্ছে গাড়িতে আলো পাখা ইত্যাদির কোনও ব্যবস্থা নেই। এককালে হয়তো ছিল। কিন্তু সমাজবিরোধীদের

দৌরাত্মে সেগুলো হাপিস হওয়ার পর থেকে আর লাগানো হয়নি। কাজেই ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার। তপাইরা দলবদ্ধ হয়ে কামরায় ঢুকে বলল, "কেউ চেঁচামেচি করবে না বা গোলমাল বাধানোর চেষ্টা করবে না। যার কাছে মালকড়ি যা কিছু আছে দিয়ে দাও।"

ব্যাপারীরা তো মালপত্তর নিয়ে কেউ ঢুলছিল কেউ ঘুমোচ্ছিল। এই না শুনে পেটের পিলে মাথায় উঠে গেল তাদের। সভয়ে জোর হাত করে বলল, "আপনারা দয়া করুন বাবারা, কোনও মালকড়িই আমাদের নেই। একেবারে কপর্দক শূন্য আমরা! কলকাতায় যাচ্ছি, বিক্রি বাটা করে যখন ফিরব তখন আসবেন দেব। এখন এই ক্ষীর ছানা রসগোল্লা কাঁচা গোল্লা যা আছে যদি নেন তো কিছু নিন।"

তপাইরা দেখল পদক্ষেপটা খুব ভুল হয়ে গেছে। সত্যিই তো। এখন তো ব্যাপারীদের কাছে টাকা পয়সা থাকবার কথা নয়। তবু বলল, "সে তো বুঝলুম। এখন তাহলে কি দেবে দাও।"

"ক্ষীর নিয়ে যান! ছানা তো খেতে পারবেন না। ক্ষীর খান।" এই বলে একজন ক্ষীরের হাঁড়ি ধরিয়ে দিল হাতে।

জগা বলল, "এক হাঁড়িতে কি হবে। আরও দু'হাঁড়ি দাও।"

লোকটি এবার হাতে পায়ে ধরল ওদের, "মরে যাব বাবারা। গরিব মানুষ আমরা। এই বেচে খাই। এই নিয়েই সন্তুষ্ট হও মহাপ্রভুরা।"

জগা বলল, "কোনও কথা শুনতে চাই না। আর দুটো হাঁড়ি দিবি কিনা বল। নাহলে এই যে দেখছিস ভোজালি, একেবারে পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দেব।"

জগার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গুলির শব্দ শোনা গেল। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড কোলাহল আর মার মার রব।

তপাইরা লাফিয়ে প্লাটফর্মে নেমেই দেখল সর্বনাশ। চারদিকে থিক থিক করছে সি. আর. পি.।

চ্যাংড়ার মরণ সব। ফারাক্কা প্যাসেঞ্জারে এসেছে ডাকাতি করতে। এই গাড়ি যে ফারাক্কা থেকে সি. আর. পি. আর মিলিটারিতে বোঝাই হয়ে প্রতিদিন হাওড়ায় আসে তা ওরা জানত না। জানলেও হয়তো সেই কুক্ষণে মনে আসেনি কারও।

ওরা যখন ভেন্ডার কম্পার্টমেন্টে চড়াও হয়ে হম্বি তম্বি করছিল সেই সময় ব্যাপারীদের একজন চুপি চুপি উল্টোদিকের দরজা দিয়ে নেমে সি. আর. পি.-দের খবর দেয়। ফলং সঙ্কট চরমংতমং।

সি. আর. পি.-দের টর্চের আলোয় আলোকিত চারদিক। সেই সঙ্গে ধর পাকড় আর প্রচণ্ড মার। দলের আট দশটি ছেলে তখন গুলিতে প্রাণ হারিয়ে পড়ে আছে প্লাটফর্মে। ভোজালি পাইপগান ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে ইতস্তত।

ডিকে আর শান্ত বাড়ি যাবে বলে এসেছিল! কাজেই ট্রেন আসার পর গাড়িতে উঠে যাত্রীদের দলে মিশে যাওয়ায় এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল তারা। বাদ বাকিরা কেউ ধরা পড়ল। কেউ মরল। যে গুলো ধরা পড়ল সে গুলোকে সি. আর. পি.-রা বন্দুকের বাঁট দিয়ে এমন মার মারল যে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দিল তাদের।

তপাই আর জগা ট্রেন থেকে নামা মাত্রই ক্ষুধিত নেকড়ের মতো হাঁ হাঁ করে ছুটে এল সি. আর. পি.-রা। জগা ছিল সামনে। মারল বন্দুকের বাঁটের বাড়ি এক ঘা। এক অদৃশ্য শক্তি

এবারেও রক্ষা করল তপাইকে। অন্য এক সি. আর. পি. এসে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিল তপাইয়ের গালে। তারপর ওর চুলের মুঠি ধরে লাথি মারতে মারতে টেনে নিয়ে এল ওদের কম্পার্টমেন্টে। এরপর এক এক করে পাঁচ ছ'জনকে। প্রত্যেকের অবস্থাই সঙ্গীন। ওদিকে জগাকে প্ল্যাটফর্মের ওপর ফেলে তার ওপর উন্মত্ত উল্লাসে লাফাতে লাগল সি আর. পি.-রা। তারপর ওর সংজ্ঞাহীন দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে এসে কম্পার্টমেন্টের গাদায় ফেলল। শুধু কয়েকটি তাজা লাশ পড়ে রইল প্লাটফর্মের ওপর। চারদিক রক্তে ভেসে যেতে লাগল।

অন্ধকার কম্পার্টমেন্টে সি. আর. পি.-রা আবার এসে নিশ্চিন্ত মনে যে যার জায়গায় বসে পড়ল। অর্ধমৃত ছেলেগুলো গাদা করা রইল একপাশে। তপাইও অচৈতন্য হওয়ার ভান করে পড়ে ছিল তাদের পাশে।

একটু পরেই ট্রেন ছাড়ল। তারপর শ্লথ গতিতে চলতে চলতে একটা স্টেশন পার হবার পর মাঠের মধ্যে এক জায়গায় সিগ্‌ন্যাল না পেয়ে থেমে যেতেই একটা মওকা পাওয়া গেল! তপাই দেখল সি. আর. পি.-দের মধ্যে তখন কারও নাক ডাকছে। কেউ ঢুলছে। ওর পাশেই যে বসেছিল ওর বুকে বন্দুক রেখে, তার রীতিমতো নাক ডাকছে তখন। তপাই আস্তে আস্তে বন্দুকটা সরিয়ে সোজা হয়ে বসল। ভাগ্যে কম্পার্টমেন্টে আলো নেই। কিন্তু মুশকিল হল পালাবে কোনখান দিয়ে? দরজাটা লক করা। সেখানে যেতে গেলে এলোমেলো ভাবে শুয়ে থাকা সি. আর. পি.-দের কারও না কারও পা লেগে যাবার খুবই সম্ভাবনা। আবার জানলা দিয়ে পালাতে গেলেও ধরা পড়ার ভয়। কেননা শীতের জন্য সব জানলার সার্শি নামানো। তবুও ও জীবনের ঝুঁকি নিয়েই আস্তে আস্তে একটা জানলার সার্শি টেনে তুলল। ট্রেন তখন আবার চলতে শুরু করেছে। তবে গতি খুব কম। এরাও ঘুমে অঘোর। তপাই দেরি না করে সেই চলন্ত ট্রেন থেকেই লাফিয়ে পড়ল বাইরে। খোয়ায় পড়ে হাত পা কেটে ছিঁড়ে একসা হয়ে গেল। তবু সেই অবস্থাতেই পিছনদিকে ছুট-ছুট-ছুট।

এদিকে তপাই লাফিয়ে পড়ার পরই খোলা জানলার কনকনে ঠাণ্ডায় সি. আর. পি.-দের ঘুম ছুটে যায়। তারপর টর্চের আলোয় যেই না দেখে একজন আসামী ভাগলবা তখনই হই হই রই রই। চেন তো নেই যে ট্রেন থামবে। তবু চেঁচামেচি করে আলোর সঙ্কেত দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে বহু কষ্টে অনেক দূরে যাবার পর ট্রেন থামাল। ট্রেন থামলে দলে দলে সব ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে টর্চের আলো ফেলে সে কি দারুণ তল্লাসি। বেগতিক বুঝে সেই কনকনে ঠাণ্ডাতেই পাশের জলায় নেমে পড়ল তপাই। তারপর গ্যাং কুলিদের পরিত্যক্ত একটা পোড়া দুর্গন্ধ হাঁড়ি মাথায় দিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করল। এইভাবে অনেকক্ষণ থাকার পর যখন একটু নিরাপদ মনে করল, তখনই উঠে এল জল থেকে।

ওদিকে রাতের অন্ধকারে হুইশিল বাজিয়ে কালো ধোঁয়া ছেড়ে ফারাক্কা প্যাসেঞ্জার ছুটে চলল হাওড়ার দিকে। আর তপাইও শীতে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল দাঁইহাটে।

দাঁইহাটে ফিরে এলেও ও কিন্তু স্টেশনের দিকে গেল না। অন্ধকারে আত্মগোপন করে সোজা হাজির হল ওর দিদির বাড়িতে। সেখানে তখন কান্নার রোল। কেননা ওই দুঃসংবাদ তখন দাঁইহাটময় ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে জগার খবরটা তো এ বাড়িতে একটা অভিশাপের মতো। মা বাবার ওই একটিই মাত্র ছেলে সে। সবাই তখন কান্নায় ভেঙে পড়েছে। তপাইদের দলের দুটি ছেলে যারা ড্রাইভার ও গার্ডকে আক্রমণ করেছিল,

গোলমালের শুরুতেই তারা কোনওরকমে পালিয়ে এসে বাড়ি বাড়ি খবর দেয়।

তপাই সেই আবছা অন্ধকারে ওর দিদির বাড়িতে আসতেই মীনা ছুটে এল, "হ্যাঁরে, তবে যে শুনলুম তোকেও ওরা ধরে নিয়ে গেছে।"

"আমি কোনওরকমে ওদের খপ্পর থেকে পালিয়ে এসেছি দিদি।"

"জগা কই?"

"সে বোধ হয় বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলেও তার অবস্থা খুবই খারাপ। বন্দুকের বাঁট দিয়ে ওকে এমন মেরেছে যে মাথার ঘি বেরিয়ে গেছে। সে যাক। তুই আমাকে তাড়াতাড়ি একটা জামা কাপড় দে। এগুলো ছেড়ে ফেলি।"

তপাইকে ওর জামাইবাবুর একটা প্যান্ট আর শার্ট দেওয়া হল।

"একটা চাদর দিবিরে দিদি?"

"এই নে। কিন্তু তুই এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যা তপাই। না তুই এ বাড়িতে আসবি না এদের এই সর্বনাশ হবে। এরা সবাই তোকেই দোষারোপ করছে। সবাই বলছে বউমার ভাইয়ের জন্যেই ছেলেটা উচ্ছন্নে গেল। এটা আমার শ্বশুরবাড়ি। এরপর আমি এখানে কোন মুখে ঘর করব বলত? তুই আমার এ সর্বনাশ কেন করলি তপাই?"

"দিদি!'

"না। তুই আমাকে দিদি বলে ডাকিস না। আমি জানব আমার তিনটে ভাইয়ের একটা ভাই মরে গেছে। আমি তোর মুখ দেখতে চাই না। তুই আর কখনও এ বাড়িতে আসিস না তপাই। তুই দূর হ। তুই দূর হ। তুই দূর হ।"

তপাই কেঁদে বলল, "তুই আমায় অমন করে যেতে বলিস নারে দিদি। আমি ভাবতেও পারিনি ঠিক এইরকম একটা অঘটন ঘটে যাবে বলে। আমি তোর পা ছুঁয়ে বলছি দিদি আর কখনও এ কাজ আমি করব না। এবার থেকে আমি ভাল হব।"

"তাতে আর কিছুই লাভ হবে না রে। এদের যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। তুই এখুনি পালা। নাহলে এরাই তোকে পুলিশের হাতে তুলে দেবে।"

তপাই একটুও দেরি না করে জামা প্যান্ট বদলে একেবারে রাস্তায়। কিন্তু রাস্তায় নেমেই চমকে উঠল সে, "একি! মা তুমি? তুমি এত ভোরে কী করে এলে?"

"তার আগে বল কোথায় যাচ্ছিস তুই?"

"তা জানি না মা। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব।"

"তোর মামার মুখে খবর শুনে রাতের গাড়িতে এসেছি আমি। এই মাত্র স্টেশনে নেমেই শুনলাম দারুণ গোলমাল হয়ে গেছে এখানে। কাল রাতে নাকি প্রচণ্ড গোলাগুলি চলেছে। আমার গাড়ি যখন কালনায় তখন দাঁইহাট থেকে ধরা কয়েকটা আধমরা ট্রেন ডাকাতকে ডাউন ট্রেন থেকে আপ ট্রেনে তুলে দিল কাটোয়া পৌঁছে দেবার জন্য। এখানেও স্টেশনে লোক হই হই করছে। দু' একজনের মুখ থেকে তোর নামও শুনতে পেলাম।"

"তুমি ঠিকই শুনেছ মা। আমিও ওই দলে ছিলাম। আমি ধরা পড়েও বেঁচে গেছি। আমাকে এখুনি পালাতে হবে এখান থেকে! তবে দাঁইহাট দিয়ে নয়। গঙ্গা পার হয়ে কৃষ্ণনগর অথবা বেথুয়াডহরি দিয়ে পালাব আমি।"

"কোথায় পালাবি তুই?"

"তা জানি না। যে দিকে দু চোখ যায় সেদিকে চলে যাব। তুমিও এসো না মা।

আমাকে এবারের মতো শেষ বিদায় দেবে। দিদির বাড়িতে একদম যেয়ো না। আমার জন্য খুব বিপদ হয়ে গেছে ওদের। জগাটা অ্যারেস্ট হয়েছে। বেঁচে আছে কি তারও ঠিক নেই এখন তোমার ও বাড়িতে না যাওয়াই ভাল।"

দিদি আর কাল বিলম্ব না করে তপাইকে নিয়ে গঙ্গা পার হলেন। তারপর মেটেরিতে গিয়ে নতুন দিনের নতুন সূর্য উঠলে তপাই সূর্যসাক্ষী রেখে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে বলল, "এই তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি মা। এবার থেকে আমি সত্যিই ভাল ছেলে হব। তোমাকে আমি কৃষ্ণনগরে গিয়ে ট্রেনে উঠিয়ে দেব। তারপর...।"

—তারপর?

—"তারপর যেখানেই থাকি না কেন ভাল ছেলে হয়েই থাকব আমি। ঘরে ফেরার পথ তো আমার নেই। নতুন দেশে নতুন করে নতুন জীবন শুরু করতে যাব।"

মাকে নিয়ে গঙ্গা পার হল তপাই।

তারপর বাসে চেপে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত গেল। সেখানে গিয়ে টিকিট কেটে মাকে ট্রেনে চাপিয়ে চোখের জলে বিদায় নিল সে।

মাও সজল চোখে ছেলেকে বিদায় দিলেন। এ ছেলে পেটে ধরলেও এর ওপর কোনও অধিকার তো তাঁর নেই। আমাদের সমস্ত অধিকার আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিসর্জন দিয়েছি। হিংস্র-রাজনীতির শিকার হয়ে আমরা বিসর্জন দিয়েছি আমাদের মনুষ্যত্বকে। মা বিসর্জন দিয়েছে তার সন্তানের অধিকারকে। স্ত্রী বিসর্জন দিয়েছে তার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখার সম্ভাবনাকে। আর—। আর থাক। না বলাই ভাল।

তপাই সেই যে গেল আর তার খোঁজই পেলাম না কেউ।

ছয়

এরপর বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে। বাংলার ভাগ্যাকাশ থেকে দুর্দিনের কালো মেঘ সরে গেছে। স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দিনও শেষ হয়ে গেছে কবে। তপাইয়ের খোঁজে আমিও দেশ দেশান্তর চষে বেরিয়েছি। কথায় আছে যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই। সেই ভাবেই খুঁজেছি ওকে। কিন্তু না। সেই নষ্টনক্ষত্র কোথায় কোনখানে যে খসে পড়েছে তা টেরও পাইনি কেউ।

অথচ তপাইকে এখন খুবই দরকার।

খবরের কাগজে 'নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র' বিভাগে ওকে ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়ে অনেক বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছি। তার কারণ ইতিমধ্যে আমার বড় ভাগ্না শংকর নেফ্রাইটিসে মারা গেছে। জামাইবাবুও মারা গেছেন কিছুদিন আগে। ছোট ভাগ্না স্বপন বিয়ে করেছে। দিদি কখনও আমার কাছে, কখনওবা দাঁইহাটে মীনার বাড়িতে থাকেন। স্বামী এবং দুই পুত্রের শোকে দিদিরও একটু মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে। এই সময় তপাইকে ফিরে পাওয়ার প্রয়োজনটা যে আমাদের কাছে কতখানি তা আমরাই জানি। কিন্তু কোথায় তপাই? সেই চন্দ্র আছে, সূর্য আছে, আকাশ আছে, পৃথিবী আছে। নেই শুধু তপাই। সে শুধু থেকেও নেই। কোনও খোঁজখবরই নেই তার। তপাই বলেছিল, "যেখানেই থাকি না কেন ভাল ছেলে হয়েই থাকব।" সে কী সত্যিই ভাল ছেলে হয়ে আছে? তপাই বলেছিল, "ঘরে

ফেরার পথ তো আমার নেই। তাই নতুন দেশে নতুন করে নতুন জীবন শুরু করতে যাব।"
সে কী নতুন দেশে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করেছে? সেই নতুন দেশ কোথায়? নতুন জীবন কী? এই সব প্রশ্নগুলো মনের মধ্যে নিয়তই তোলপাড় করে। কিন্তু না, তপাই যেন তার সমস্ত স্মৃতি সত্তা নিয়ে রহস্যের অন্ধকারে বরাবরের জন্যই হারিয়ে গেল।

এই ভাবেই দিন যায়।

তপাইয়ের আশা মন থেকে যখন মুছেই ফেলেছি তখন হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা পিওন এসে একটি রেজেস্ট্রি চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিতে যে ঠিকানা ছিল সেটি আমার পুরাতন বাসার। তখন আমি মধ্য হাওড়াতেই একটি বারো ঘর এক উঠোনের বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। এখন রামরাজাতলা স্টেশনের কাছে নিজস্ব মাথা গোঁজার একটু ড্যারা করে চলে এসেছি। তবে আমার একটু অন্য পরিচয় থাকার ফলে নতুন ঠিকানায় চিঠি আসতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। চিঠিটা এসেছে জামালপুর থেকে। শ্যামলালপ্রসাদ নামে আমার এক বিহারী বন্ধু তাঁর মেয়ের বিয়েতে সপরিবারে যাবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। ব্যস। পত্র পাঠ যাবার মনস্থির করে ফেললাম। শিয়ালদহ থেকে আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে জামালপুর পর্যন্ত একটি বার্থ রিজার্ভ করে দিব্যি চেপে বসলাম তাতে। তবে বন্ধুর অনুরোধ মতো সপরিবারে নয়। একাই চললাম নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

দিব্যি ঘুমোতে ঘুমোতে যাচ্ছি। হঠাৎ মাঝরাতে ঘুমটা ভেঙে গেল। একটি কোমল স্পর্শ পায়ের ওপর অনুভব করলাম। আর সেই সঙ্গে শুনতে পেলাম, "শুনিয়ে।"

চমকে উঠে বসলাম। দেখলাম অল্পবয়সী একটি মেয়ে কোলে বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার পায়ের কাছে। মেয়েটিকে দেখে খুবই দীন বলে মনে হল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা গায়ের রঙ। কিন্তু কী সুন্দর তার চোখ দুটো। বয়স কোনও মতেই পনেরো ষোলোর ঊর্ধে নয়। দেখে মায়া হল খুব। বললাম, "কী চাই?"

"আপনার ওই জলের জায়গাটা থেকে একটু জল দেবেন? বাচ্চাটাকে খাওয়াব। এর খুব তিয়াস লেগেছে। গলাটা শুকিয়ে গেছে একেবারে।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে জলের জায়গাটা এগিয়ে দিলাম ওর দিকে।

মেয়েটি জলের জায়গার ছিপি খুলে শিশুটির মুখের কাছে ধরল। কী সুন্দর শিশু। টুক টুক করছে গায়ের রঙ। ফোলা ফোলা গাল। বছর দু'য়েকের হবে হয়তো। একটু অপরিচ্ছন্ন। শিশুটি জল দেখে মুখটা একবার চকিয়ে নিয়ে চুক চুক করে জল পান করতে লাগল। একদমে অনেকটা জল খেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বেচারি।

জল খাওয়া হলে জলের জায়গাটা আমাকে ফেরৎ দিয়ে চলে গেল মেয়েটি। তারপর গেটের কাছে টয়লেটের গা ঘেঁষে বসে পড়ল চুপ চাপ। জলটা এঁটো হয়ে গেছে। তার ওপর শিশুটির লালা লেগে আছে বটলের মুখে। তাই এ জল আমি খাব না। তবু ঘৃণা হল না। বরং আমার সযত্নে রাখা এই জলটুকু একটি শিশুর তৃষ্ণা নিবারণ করল দেখে মনের মধ্যে এক অপার আনন্দ পেলাম।

আবার শুয়ে চোখ বুজেছি। ট্রেনের দুলুনিতে ঘুমিয়েও পড়েছি আবার। ফের সেই কোমল করস্পর্শ।

এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, "আবার কী?"

"আর একটু জল দেবেন আমাকে?"

আমার পাশের বার্থের একজন ভদ্রলোক ধমকে উঠলেন, "যা ভাগ এখান থেকে যত্তো সব ভিখিরির বাচ্চা বিনা টিকিটে গাড়িতে উঠবে তাও আবার বেছে বেছে থ্রি-টায়ারে অন্য বগিতে যেতে পারিস না?"

মেয়েটি করুণ কণ্ঠে বলল, "গিয়া থা। লেকিন চড়নে নেহি সকা। খুব ভিড় আছে কিনা গাড়িতে।"

"সেইজন্যে একেবারে থ্রি-টায়ারে ঢুকে পড়েছিস? মজা মন্দ নয়। তার ওপর সাহসও তো কম নয় দেখছি। রাত দুপুরে লোকের ঘুম ভাঙিয়ে জল চাইছিস?"

মেয়েটি বলল, "মাফ করবেন। বাচ্চার বাবার খুব জ্বর। তাই জল চাইছি একটু।"

আমি ওয়াটার বটল্‌টা ওর হাতে দিয়ে বললাম, "ঠিক আছে। এটা নিয়ে যা তুই। যেটুকু জল আছে খাইয়ে দে। আর এটা তোর কাছে রেখে দে। আমাকে ফেরৎ দিতে হবে না।"

মেয়েটির চোখ দুটো কৃতজ্ঞতায় চকচকিয়ে উঠল যেন। পলিথিনের জলের জায়গাটা নিয়ে চলে গেল সে।

লোকটি গজ গজ করতে লাগল, "রেলের কন্ডাকটার গার্ডগুলোও যে কোথায় যায় তা কে জানে। এগুলো গাড়ির ভেতর ঢোকে কী করে?"

আর একজন ঘুমের ঘোরেই পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, "শেলদা থেকে যিনি উঠেছিলেন তিনি বর্ধমানেই নেমে গেছেন। তারপর থেকে আর কেউ ওঠেনি। দরজাগুলোও ভাল করে লক করে দিলে এইসব আপদগুলো ঢুকতে পারত না। কিন্তু তা দেবে না কেউ। এখন আর খচ খচ করলে কী হবে? চুপচাপ শুয়ে থাকুন।"

ভদ্রলোকও আর কথা না বাড়িয়ে নাক ডাকতে লাগলেন।

আমিও চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝ রাতে শিশুর কান্নার শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। একটানা প্রাণান্তকর সেই চিৎকারে কান পাতা দায়। দু'একজন যাত্রী বিরক্ত হয়ে শুয়ে শুয়েই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল।

সেই শিশু। কিশোরী মাতার বুকের নিধি।

মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—ও-না না-ন্‌-না।

কিন্তু শিশুর কান্না থামবার নয়। আসলে প্রচণ্ড ক্ষুধায় চিৎকার করছে বেচারি।

যাত্রীদের বিরক্তিকর মন্তব্য শুনে শিশুর পিতা এবার ধমকে উঠল শিশুটিকে, "চোপ্‌। এক আছাড় মেরে মেরে ফেলব। গলা টিপে শেষ করে দেব এখুনি।"

একজন অবাঙালি ভদ্রলোক ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় ভয়ানক রেগে বললেন, "আরে ভাই, বাচ্চা সামালো। নেহী তো চেন পুলিং করকে উতার দুঙ্গা।"

কিন্তু ততক্ষণে আমার মাথার ব্রহ্মতালুতেও শিহরণ লেগে গেছে। আমি আপার বার্থে শুয়েছিলাম। এক লাফে নেমে পড়লাম নীচে। তারপর ছুটে গেলাম শিশুটির পিতার কাছে এই কণ্ঠস্বর কার? এ যে আমার বহু পরিচিত গলার স্বর। এতো ভুল হবার নয়। গিয়ে দেখলাম ময়লা একটা চাদর আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়ে মেঝের ধুলোয় শুয়ে আছে কে যেন কে-ও? আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "এ কৌন শো রহা হ্যায়? কে শুয়ে আছে এখানে?"

"আমার স্বামী।"

"কী হয়েছে ওর?"

"বহুৎ বেমার। খুব জ্বর হয়েছে।"

এতক্ষণে শিশুর পিতার হুঁশ এল যেন। মুখের ঢাকা সরিয়ে বলল, "কে রে কাজল?"

আমি ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললাম, "আমি।"

"মামা!"

"আমাকে চিনতে পারছিস?"

"আপনাকে চিনব না?"

"একি দশা হয়েছে তোর? এই দেখব বলে কি এই গাড়িতে উঠেছিলাম আমি?"

তপাই কোনওরকমে উঠে বসে আমার পায়ের ধুলো নিল। ওর বউও হেঁট হয়ে প্রণাম করল আমাকে। শিশুটি কান্না ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। আমি তপাইয়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে ওর। ক্ষীণ চেহারা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কেমন যেন সর্বহারার ভাব। জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় যাবি?"

তপাই বলল, "সুলতানগঞ্জ। বাচ্চাটার মাথার চুল দিতে। খুব ভোগে ও। তাই মানসিক ছিল।"

"এইরকম শরীরের অবস্থা নিয়ে এইভাবে না এলেই কি চলত না?"

"আমি আর বাঁচতে চাই না মামা। বিশ্বাস করুন, একেবারে শেষ হয়ে গেছি।"

"সেকি! তুই যদি এ কথা বলিস তাহলে তোর বউটার কি হবে? বাচ্চা মানুষ হবে কী করে?"

"সব ঠিক হয়ে যাবে মামা। কারও জন্যে কারও আটকায় না।"

'তুই আসছিস কোথা থেকে?"

"আমি বারহারোয়া থেকে আসছি।"

বউটি এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওর মুখে আপনার নাম অনেক শুনেছি মামাবাবু। আপনি সাচ্চা আদমি আছেন। আপনি ওর দেবতা।"

"আমি সাচ্চা কি-ঝুটা সে হিসাব পরে হবে। তবে ওর এই রকম হাল দেখব এ আমি আশা করিনি। সেইসঙ্গে তোমাদের।"

এতক্ষণে তপাই ঘরের কথা জিজ্ঞেস করল, "ওরা সব ঠিক আছে তো?"

বললাম, "ওদের কথা জেনে কি করবি? দুঃখ পাবি। সংসারের চেহারাটাই এখন অন্যরকম হয়ে গেছে। জামাইবাবু নেই, শঙ্কর নেই।"

প্রায় চমকে উঠে কাঁদো কাঁদো স্বরে তপাই বলল, "বড়দা নেই?"

"না।"

"কী হয়েছিল বড়দার?"

"নেফ্রাইটিস।"

"আর বাপির?"

"তারও হাজার রকমের রোগ।"

"মা তাহলে...?"

"মা ভাল আছে।"

"আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন?"

"বিয়ে বাড়ি। তবে আর যাচ্ছি না। এখন আমি তোর সঙ্গে সুলতানগঞ্জেই যাব। তারপর বাচ্চাটার মুণ্ডন হলে তোদের সবাইকে নিয়ে যাব ঘরে।"

তপাই বলল, "জীবন যুদ্ধে আমি হেরে গেছি মামা। তাই কোন মুখ নিয়ে যাব সেখানে? তাছাড়া এখানেই তো আমার কাজ কর্ম। বাড়ি গেলে খাবটা কী?"

"এখানে তোর কিসের কাজ?"

"আমি ট্যাক্সি ড্রাইভারি করি।"

"ওখানে গিয়েও তাই করবি।"

তপাই হাসল। বলল, "তার আগে ফলিডল খাব। এ মুখ আমি কাউকে দেখাব না।"

"আচ্ছা সে দেখা যাবে। কিন্তু এত জ্বর নিয়ে তুই আজই আসতে গেলি কেন?"

"এলাম বলেই তো আপনার দেখা পেলাম। আসলে শরীর খারাপ নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম। ট্রেনে ওঠার পর কাঁপ দিয়ে জ্বর এল। কোনও ওষুধ আছে আপনার কাছে?

আমি উঠে গিয়ে আমার ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা জ্বর কমাবার ওষুধ নিয়ে এলাম। সর্দি জ্বর পেটের অসুখ ইত্যাদির ওষুধগুলো বাইরে বেরোলেই সঙ্গে থাকে আমার।

ওষুধটা মুখে দিয়ে অবশিষ্ট জলটুকু খেয়ে নিল তপাই। আমি আর বার্থে গেলাম না। নীচে ওর পাশেই বসে রইলাম চুপ করে।

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে এল।

সকালও হয়ে গেল একসময়। তপাই একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসল। ট্রেন থামল ভাগলপুরে।

ভাগলপুর বড় স্টেশন। ওখানে কলা বিস্কুট ইত্যাদি কিনে শিশুটিকে দিলাম। আমরা আমাদের জন্য চা নিলাম। ভাগলপুরের পর সুলতানগঞ্জ। তারপর জামালপুর। বিয়েবাড়ি মাথায় থাক। এখন এদের আগে সামলাই। আমি ওদের নিয়ে সুলতানগঞ্জেই নেমে পড়লাম।

সুলতানগঞ্জ ছোট্ট জায়গা। কিন্তু ভারি সুন্দর। এর আগে আমি এখানে আসিনি কখনও। এইখানে পুরাণের জহ্নুমুনির আশ্রম ছিল। ভগীরথ যখন গঙ্গা নিয়ে আসছিলেন তখন মুনির পাতার কুটির জলের তোড়ে ভেসে যায় বলে জহ্নুমুনি এক গণ্ডুষে সব জলটুকু পান করে নেন। পরে ভগীরথের অনুরোধে এবং তাঁর কান্নাকাটিতে সন্তুষ্ট হয়ে মর্তভূমে গঙ্গাবতরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে জানু চিরে গঙ্গাকে মুক্তি দেন। এই সেই স্থান। এইখানে গঙ্গার গর্ভে শিবলিঙ্গাকৃতি একটি পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ে আছেন গৈবীনাথ। ইনি দেওঘরের বৈদ্যনাথের গুরুদেব। এইখান থেকে বাঁকে করে জল নিয়ে দু'তিনদিনের পথ হেঁটে তীর্থযাত্রীরা দলে দলে বৈদ্যনাথে যান।

যাই হোক, সুলতানগঞ্জে নেমে পায়ে হেঁটেই আমরা নিকটবর্তী একটি ধর্মশালায় গেলাম। অসময় বলে ধর্মশালায় যাত্রী ছিল না। তাই যাওয়া মাত্রই ঘর পেয়ে গেলাম। ধর্মশালাটার অসুবিধে এর ঘর মাত্র দুটি, বাকিটা দালান। আর বাথরুমের কোনও ব্যবস্থা নেই। সে যাই হোক, আমাদের প্রয়োজনে ঘর তো একটা পাওয়া গেল।

ওদের ঘরে বসিয়ে কাছাকাছি একটি দোকান থেকে কিছু সিঙাড়া কচুরি প্যাঁড়া ইত্যাদি নিয়ে এলাম।

তপাই বলল, "মামা! আপনি আনলেন বটে কিন্তু বাচ্চাটার চুল দিতে এসে পুজো দেওয়ার আগেই খেয়ে নেব?"

ওকে বুঝিয়ে বললাম, "তুই এখন অসুস্থ। এই অবস্থায় খালি পেটে থাকলে দুর্বল হয়ে পড়বি। তাছাড়া মানত পুজোর সঙ্গে উপবাসেব কোনও সম্পর্ক নেই। নিঃসঙ্কোচে খা। খেয়ে আর একটা জ্বরের ওষুধ খেয়ে নে।

তপাইয়ের বউ ওর মুখের দিকে তাকাল।

বললাম, "দেখছ কী! তুমিও খাও। কোনও দোষ নেই এতে। তারপর চল যে কাজের জন্য এসেছ।"

আমরা সবাই জলযোগ সেরে বাইরে এলাম। এসে আর এক প্রস্থ চা খেয়ে চলে এলাম গঙ্গার তীরে। ধর্মশালাটাও গঙ্গার ধারে। শুধু সামান্য একটু ঢালু বেয়ে নামলেই বালি আব বালি। এইখানে বালির চরায় সারি সারি হোগলার ছাউনি দেওয়া দহি চূড়ার দোকান। খাট্টা দই, লাল লাল মোটা চিড়ে আর প্যাঁড়া। ছোট ছোট মেয়েরা হোগলার ছাউনির নীচে দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে বসে আছে আর খদ্দের ডাকছে "আ যা বাবু, দহিচূড়া খা লো...।"

আর সেই বালুচরের প্রান্ত ঘেঁষে কাকের চোখের মতো জল। পতিতপাবনী মা গঙ্গা। গঙ্গার ঠিক মাঝখানে মোচাকৃতি একটি পাহাড়। যেন গঙ্গার গৌবীপট্টে একটি বিশাল শিবলিঙ্গ বসানো আছে। আমরা একজন নরসুন্দরকে ডেকে শিশুব মুণ্ডন করালাম। তারপর গঙ্গায় স্নান করে নৌকোয় চাপলাম। মন্দির পাহাড়ের ওপর। পাহাড় নদীর মাঝখানে। ঠিক যেন একটি দ্বীপ। সেখানে যেতে গেলে নৌকো ছাড়া গতি নেই। গৈবীনাথ আছেন পাহাড়ের একেবারে চূড়ায়। আমরা ওপরে গিয়ে পাহাড়ে উঠলাম। তারপর মন্দিরে পুজো পাঠ সেরে আবার যখন নীচে এলাম তখন অনেক বেলা হয়েছে।

আমি বললাম, "তপাই! এব আগে আমি গৈবীনাথের নাম শুনেছিলাম কিন্তু চোখে দেখিনি। আজ তোর ছেলের কল্যাণে গৈবীনাথও দেখা হল। সব চেয়ে বড় কথা এই ভাবে যে কখনও তোঁকে ফিরে পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ এই ধর্মশালাতে আমরা বিশ্রাম নিই। কাল সকালে বাড়ি ফেরবার ব্যবস্থা করব।"

"কিন্তু মামা...।"

"কোনও কিন্তু না। তোর মায়ের মুখ চেয়ে তোকে অন্তত একটিবারের জন্যও বাড়ি ফিরতে হবে। তুই বিয়ে করেছিস। এখন তোর একটা দায়িত্ব আছে। ছেলেটাকেও মানুষ করতে হবে। তাছাড়া তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই খুব কষ্টে আছিস। এই অবস্থায় ছেলেকে নিয়ে এই বিদেশ বিভুঁয়ে... না না, এ হতে পারে না।"

"কেন পারে না মামা? কষ্টে আছি তো কী হয়েছে? এখানে যারা আছে তারা কি মানুষ হয় না?"

"তা হবে না কেন? তবু বাংলায় বাঙালির যে কালচার তার সঙ্গে তো মিলবে না।"

তপাই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল এবার। তারপর বলল, "বাঙালির কালচার? আমিও তো বাংলায় বাঙালির কালচারের মধ্যেই জন্মেছিলাম। কিন্তু আমার কী হল?"

"কী হয়েছে তোর? মানুষের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে তোর মতো ছেলে হয়? তবে ভ্রান্ত রাজনীতি তোকে বিপথগামী করেছিল। এখন তোর পরিবর্তন হয়েছে। ঘরের ছেলে ঘরে আয়।"

"আমি গেলেও তোমরা কি আমাকে ক্ষমা করবে? আমার সারাটা জীবনের পুঞ্জীভূত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে আমি কী করে সেখানে ফিরে যাব? বড়দা কত কষ্ট পেয়ে মরে গেল, আমি তার পাশে থাকতে পারলাম না। বাপি আমাকে ভুল বুঝে চলে গেলেন, তার কাছেও ক্ষমা চাইতে পারলাম না। তাছাড়া মায়ের ওই অবস্থা আমি কী করে দেখব মামা।"

"সব বুঝলাম। কিন্তু একেই বলে ভবিতব্য। তুই এই কবছরে একটা চিঠিও তো দিসনি। বিয়ে যে করলি সেটাও কি জানাতে পারলি না কাউকে? আমিও কি তোর কাছে পর হয়ে গেছি?"

"আসলে আমার জীবনের সব কিছুই অন্যরকম। তাই এই বিয়েটাও একটা দুর্ঘটনার মধ্যে হয়ে গেল।"

আমি হেসে বললাম, "এইটাই ঘটনা।"

এতক্ষণে তপাইয়ের বউ বলল, "মামাবাবু! অনেক বেলা হয়েছে। এখন একটু আরাম করুন। পরে বিকেল বেলা বরং ওইসব আলোচনা করবেন।"

তপাই বলল, "হ্যাঁ ভাল কথা। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা হবে?"

আমি বললাম, "স্টেশনের কাছেই একটা ভাল হোটেল দেখে এসেছি।"

তপাইয়ের বউ বলল, "আমি বলছিলাম কি, তা না করে নিজেরাই একটু ভাত ডাল রেঁধে নিলে হত না? এদের এখানে সব কিছু ভাড়া পাওয়া যায়। আপনারা চট করে কিছু কিনে কেটে আনুন। আমি রেঁধে দিচ্ছি।"

তপাই বলল, "মামাকে যেতে হবে না। আমিই নিয়ে আসছি সব।"

আমি পকেটে হাত দিতেই তপাই বলল, "আমার কাছে আছে। আপনি বরং আপনার বউমার সঙ্গে একটু কথাটথা বলুন।"

তপাইয়ের শিশুপুত্রটি তখন ধর্মশালার দালানে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে টলে টলে চলছে।

আমি বললাম, "ছেলেটার নাম কী রেখেছ?"

"বাবুয়া। ভাল নাম অজয়। আপনি তো আমার নাম জানতে চাইলেন না?"

"তোমার নাম আমি আগেই জেনেছি। কাজল। ট্রেনের কামরায় তপাই তোমাকে ওই নামেই ডেকেছিল।"

কাজল হেসে বলল, "আপনার কান খুব সজাগ তো। ওর মুখে আপনার কথা শুনে কত যে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল আপনাকে। ওর মা বাবার কোলে ছেলেটাকে তুলে দেবারও কত স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু সুখের ঘর তো আমার জন্যে নয়।"

"কেন মা? আমার ভাগ্নাকে বিয়ে করে তুমি কি সুখী নও?"

"তা নয়। তবে—।"

"তবে কি?"

"জীবনটাকে ও ইচ্ছে করে নষ্ট করছে মামা। নিজেকে নিজেই ও নির্দয়ভাবে শাস্তি দিচ্ছে। আমি ওর সব কিছু মেনে নিতে পারি। কিন্তু আমিও তো মা। আমি তো নিশ্চয়ই চাইব আমার ছেলেটা মানুষ হোক। ভাল খেয়ে পরে বেঁচে বর্তে থাকুক। শুধু এইটাই ওকে আমি বোঝাতে পারি না।"

"তোমার বাড়ি কোথায়?"

"কৃষ্ণনগর।"

"বাড়িতে কে কে আছেন তোমার?"

"মা আছে, বাবা আছে, দাদা আছে। সবাই আছে আমার। কিন্তু তারাও যে কে কীভাবে আছে জানি না তাও।"

"সেকি! বাড়ি যাওনা তুমি? তাদের খোঁজ খবর রাখো না।"

"ও খোঁজ-খবর রাখতে দেয় না। এমন কি যেতেও দেয় না আমাকে।"

"কেন দেয় না?"

"জানি না।"

"এ ভারি অন্যায়।"

ততক্ষণে তপাই এসে পড়েছে।

কাজল চোখের ইশারায় এইসব কথা ওকে বলতে মানা করে দিল।

আমিও ওকে অভয় দিলাম।

এইটুকু সময়ের মধ্যে কত কী-ই না নিয়ে এসেছে ও। আসলে বাজার তো বেশি দূরে নয়। ধর্মশালার সামনেই পাওয়া যাচ্ছে সব কিছু। তাই দেরি হয়নি।

তপাই এসে সব গোছগাছ করে দিয়ে নিজেই বসে গেল বউয়ের সঙ্গে রান্নার কাজে। চোখ মুখের ঘোর দেখে মনে হল জ্বরটা কমেছে অথবা ছেড়েছে। শরীরটাও একটু সুস্থ।

আমি ওর ছেলেটাকে নিয়ে ধর্মশালার বাইরে এলাম। এখন মাথা ন্যাড়া করিয়ে সাবান মাখিয়ে স্নান করানোর পর বেশ লাগছে ছেলেটিকে। তার ওপর নতুন প্যান্ট শার্টও পরানো হয়েছে।

আমি ওকে কোলে নিয়ে নানা রকমের সাজানো গোছানো দোকান পত্তর দেখতে দেখতে এদিক সেদিক করতে লাগলাম। ছেলেটি আমার গলা জড়িয়ে গালে গাল ঠেকাল। হামি খেল। ওকে আদর করে বুঝলাম ও খুব কোল ঘেঁসা ছেলে। একটুও কাঁদুনে নয়। মন আমার ভরে উঠল। সেই তপাই। দুর্বার দুরন্ত তপাই। এই সুন্দর ফুটফুটে শিশুটি তারই। একি ভাবা যায়? আমরা বেঁচে থাকতে ব্যাটা কোথায় কার কোলে ঘুরছে আদর খাচ্ছে কে জানে? আর ছাড়ছি না। সত্যি! একে পেলে দিদি কত খুশিই না হবে। সব দুঃখ ভুলে যাবে বেচারি। পুনর্জন্ম পরজন্ম বা জন্ম-জন্মান্তর যদি থাকে তাহলে শংকরও কি ঘুরে আসতে পারে না এর ভেতর দিয়ে?

যাই হোক, ওকে নিয়ে অনেকক্ষণ এপথ সেপথ করে গঙ্গার ধার ধরে ধরে আবার ধর্মশালার দিকে ফিরে চললাম। কিন্তু ফিরলে কি হবে? ব্যাটা এত দুষ্টু যে কিছুতেই ঘরে ফিরতে চায় না। একেবারে বাপ কা ব্যাটা। যত আমি ধর্মশালার দিকে মুখ করি ও ততই উল্টো দিকে মুখ করে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয় চ-চ।

দুপুরের খাওয়াটা মন্দ হল না। ডাল ভাত আর আলু কপির তরকারি। কাজলের রান্নার হাতও ভাল। খেয়ে দেয়ে সামান্য একটু বিশ্রাম নেবার পর তপাই বউকে বলল, "তুই দরজায় খিল দিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে শুয়ে থাক। আমি একটু মামুকে নিয়ে গঙ্গার ধারে যাই। যদি আমাদের ফিরতে দেরি হয়, তাহলে তুইও চলে যাস ঘাটে। কেমন?"

কাজল ঘাড় নাড়ল।

আমরা দুজনে পায়ে পায়ে বালিয়াড়িতে নেমে এলাম। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য যে কী মনোরম তা যে না দেখেছে সে ধারণা করতে পারবে না। আমরা একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে বসে আমাদের অন্তরের কথাবার্তা বলতে লাগলাম।

তপাই এক এক করে বলে চলল ওর জীবনের ইতিহাস।

ও বলতে লাগল। আর আমি শুনতে লাগলাম। সে এক আশ্চর্য কাহিনী। শুনতে শুনতে এমনই তন্ময় হয়ে গেলাম যেন আবার সেই অতীতের দিনগুলোতে ফিরে গেলাম আমি। আমার চোখের সামনে ছায়াছবির দৃশ্যের মতো সব কিছু যেন ফুটে উঠতে লাগল।

মাকে কৃষ্ণনগরের ট্রেনে উঠিয়ে দেবার পর তপাই কী যে করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। ক্লান্তিতে সারা শরীর যেন ভেঙে পড়ছে। গভীর ঘুমে দু'চোখ বুজে আসছে ওর। প্রচণ্ড ক্ষুধায় পেটের ভেতর চন চন করছে। পকেট হাতড়ে দেখল গোটা পাঁচেক টাকা সামান্য কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছুই ওর নেই।

তার ওপর কৃষ্ণনগর জায়গা হিসেবেও খারাপ। ওর বয়সী কোনও ছেলের পক্ষে এখানে লুকিয়ে থাকাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। এই মুহূর্তে ওর কী যে করণীয় তা ও ভেবে পেল না।

যাই হোক, তপাই ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় একটি ছোট্ট চায়ের দোকানে এসে বসল।

দোকানদার ওর মুখের দিকে এক নজর তাকিয়েই বলল, "কী ভাই, কোথাও কোনও খুন খারাপি করে এসেছ নাকি? মুখ একেবারে তুলসী পাতা যে?"

তপাই বলল, "না না, সে সব কিছু নয়। এক কাপ চা আর একটা পাঁউরুটি দাও দেখি।"

"বুঝে গেছি। চা পাঁউরুটি অবশ্যই দেব। দামও নেব না। কিন্তু খাওয়া হলেই কেটে পড়বে। নাহলে বিপদে পড়ে যাবে কিন্তু। এই এলাকায় তোমাকে নতুন দেখছি। আসলে এখানে চারদিকেই আই. বি.-র লোকেরা ঘোরাফেরা করছে। বিশেষ করে চায়ের দোকানগুলোর উপরেই ওদের নজর বেশি। কাজেই—"

তপাই বলল, "তুমি মুখ দেখে মনের কথা বেশ ভাল বুঝতে পার দেখছি।"

দোকানদার বলল, "দিনরাত দেখছি ভাই। দেখে দেখে চোখ পেকে গেছে। তা যাক বাড়ি কোথায় তোমার?"

তপাই মিথ্যে করে বলল, "বর্ধমান।"

দোকানদার চা আর পাঁউরুটি দিতে দিতে বলল, "বেশ তো কার্তিক ঠাকুরের মতো চেহারা। তা মরতে এ লাইনে কেন এলে?"

তপাই হেসে বলল, "তাও কি বলে দিতে হবে? আমি একা নই। আমার মতো অনেকেই এসেছে। হাজারে হাজারে।"

"কিন্তু তোমরা কি বুঝতে পারছ না, যে সর্বনাশা খেলায় তোমরা মেতেছ সে খেলার পরিণামটা কী?"

"বুঝতে পেরেছি বলেই তো আর এই খেলা খেলতে চাইছি না দাদা। কিন্তু এখন আমি এমন এক জালে জড়িয়ে পড়েছি যে ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে বসে থাকলেও আর আমার বাঁচার কোনও পথ নেই।"

দোকানদার একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "শোনো তাহলে বলি। যদি তুমি সত্যিই বাঁচতে চাও, ভাল হতে চাও, আমি তোমাকে একটা উপায় বলে দিতে পারি।"

তপাই দোকানদারের মুখের দিকে তাকাল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই চাপদাড়িওয়ালা এক যুবক ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "সর্বনাশ হয়ে গেছে বাঁকাদা। সুব্রত সাধুখাঁর আড়তে হানা দিতে গিয়ে কুশলদা দলবল সমেত ধরা পড়ে গেছে।"

"সেকি!"

"হ্যাঁ। তোমার দোকানে যেগুলো রাখা আছে সেগুলো আমাকে দিয়ে দাও। আমি অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলি। নাহলে হয়তো এখুনি পুলিশ এসে তল্লাশি চালাবে।"

বাঁকাদা বলল, "সেই ভাল। তুই ওগুলো নিয়েই যা ভাই। ওই ওদিকে পলিথিন চাপা আছে। এসব আর এখানে রাখিস না। এমন কিছু করিস না যাতে আমি জড়িয়ে পড়ি।"

ছেলেটি ছুটে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে যন্তরগুলো নিয়ে এল। তারপর বলল, "আচ্ছা বাঁকাদা! ওরা কী করে টের পেল বলতো?"

"কে জানে ভাই। তবে এমনও হতে পারে দিনকাল খারাপ পড়েছে, সেইজন্যে ওরা হয়তো আচমকা কোনও আক্রমণ প্রত্যাশা করে আগে থেকেই তৈরি ছিল।"

"হয়তো তাই। তবে কিনা আলোচনাটা আমাদের গোপনে হয়েছিল।"

"তোদের ভেতর থেকেই কেউ অসাবধানে কারও কাছে লিক করে ফেলেনি তো?"

"কার কাছে করবে? কাল দুপুরে তোমার দোকানে বসে লুটের পরিকল্পনা হল। তারপর এইটুকু সময়ের মধ্যে কী করে টের পেল ওরা?"

"ভগবান জানে।"

"ভগবান জানে কিনা জানিনা। তবে তুমি কিন্তু জান।"

বাঁকাদা চমকে উঠে বলল, "তার মানে?"

"কাল রাত দশটার সময় সাধুখাঁর ওখানে তুমি কী করতে গিয়েছিলে? ওই সময় তো ওখানে তোমার যাবার কথা নয়।"

বাঁকাদা বলল, "তোরা কী আমাকে সন্দেহ করছিস?"

"হ্যাঁ। এবং এখন মনে হচ্ছে গোপনে পুলিশকেও তুমি সমস্ত খবরাখবর পৌঁছে দাও।"

"তোরা আমাকে ভুল বুঝিস না বিশে। কাল রাতে আমি সাধুখাঁর বাড়ি কেন গিয়েছিলাম তা তোরা বুঝবি না। আমি ইনফরমার নই।"

যুবক ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, "এক গলা গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে একথা বললেও তোমাকে আর আমরা বিশ্বাস করব না। আমাদের গোপন আদালতের রায় বেরিয়ে গেছে। আমি তারই পরোয়ানা নিয়ে এসেছি।"

বাঁকাদা শিউরে উঠল। আসন্ন মৃত্যুভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ। তাই কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "বিশে! মানুষ চিনতে শেখ। এমন ভুল করিস না বিশে।"

কিন্তু ততক্ষণে সেই যন্তরগুলোর ভেতর থেকে বিশে একটা কিছু বের করে সজোরে আঘাত করেছে বাঁকাদাকে। বাঁকাদা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। রক্তে ভেসে গেল দোকানঘর।

যুবক একবার তাকিয়ে দেখল তপাইকে। তারপর বলল, "তুমি কে?"

তপাই বলল, "আমিও তোমারই মতো একজন। কিন্তু এখন অন্যজন হয়ে গেছি।"

"তার মানে?"

"বুঝতে পারলে না?" বলে হাসতে হাসতে যুবকের দিকে এগিয়ে তার হাত থেকে সেই মারণ অস্ত্রটা কেড়ে নিয়েই ঢুকিয়ে দিল ওর পেটের ভেতর।

যুবকটি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল।

তপাই বলল, "এখন থেকে আমার আদালতের রায় এই রকমই হবে।"

তপাই যুবকের কাছ থেকে একটি রিভলভার উদ্ধার করল। তারপর সেটি নিয়ে নেমে এল পথে।

দূরে দাঁড়িয়ে এই হত্যাকাণ্ড যারা দেখেছিল তারা আর সে তল্লাটে কেউ রইল না। আশপাশের দোকানগুলোও প্রকাশ্য দিবালোকে এইসব দেখে ঝাঁপ বন্ধ করে কেটে পড়ল যে যার।

তপাই ভাবল, এ কোন দেশে বাস করছি আমরা? এই দেশের মানুষই নাকি একদিন স্বাধীনতার নামে রক্ত দিয়েছিল? হায় স্বাধীনতা। মুক্তির মন্দিরের সোপানে দাঁড় করিয়ে কাপুরুষত্বের এই শিকল তুমি কেন পরিয়ে দিলে আমাদের পায়ে? কেন আমরা রুখে দাঁড়াতে ভুলে গেলাম? হে ঈশ্বর! যদি তুমি সত্যিই থাক, তাহলে তোমার কাছে আমার একটিই অনুরোধ—যেন এইরকম অধঃপতন কোনও জাতির কখনও না হয়।

তপাই যখন উদাসভাবে পথ চলছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে একটা সাইকেল ওর গায়ের ওপর এসে পড়ল। সাইকেলে যে ছিল সে বলল, "এইভাবে পথ চলে বন্ধু? তোমার সারা গায়ে রক্তের দাগ। তুমি তো নিজেই নিজেকে চিনিয়ে দিচ্ছ। চারদিকে পুলিশ দৌড়াচ্ছে। এখুনি ধরা পড়বে তুমি।"

"পড়লেই বা।"

"হাসালে ভাই। এসো উঠে পড় আমার সাইকেলে।"

তপাই ওর সাইকেলে চেপে বসল। সাইকেল ওকে নিয়ে গেল এক গভীর জঙ্গলে।

যে ওকে সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে এল সে ওরই বয়সী এক যুবক। বলল, "আমি দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। ওই বাঁকাদার মতো লোক হয় না। আর ওই যে ছেলেটিকে তুমি মারলে ওই ছেলেটি ইংলিশে অনার্স। প্রথমে বেশ ভালই রাজনীতি করছিল। এখন লুট আর খুনের নেশায় মেতে উঠেছে। মেয়েদের ওপরও চড়াও হচ্ছে আজকাল। ওর উপযুক্ত শাস্তিই তুমি দিয়েছ ওকে।"

"কিন্তু তুমি কে?"

"আমি তোমার বন্ধু। আমার দাদাকে ওদের ওই দলটা শুধুমাত্র সামান্য একটু কথা কাটাকাটির রাগে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। কাল দুপুরে বাঁকাদার দোকানে বসে ওরা যা আলোচনা করেছিল আমি তা আড়ি পেতে শুনেছি। আমিই সতর্ক করে দিয়েছিলাম সাধুখাঁদের। ওরা রাত্রিবেলা বাঁকাদাকে তুলে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল কথাটা সত্যি কিনা? বাঁকাদা প্রথমে অবশ্য স্বীকার করেনি। পরে চাপে পড়ে করেছিল। একেবারে নির্দোষ বেচারি। যাই হোক, ওদের পুরো গ্যাঙটা ধরা পড়েছে। বাকি ছিল ওই শয়তানটা। ওরও পালাবার পথ ছিল না। পুলিশের গুলিতে মরত। মরল তোমার হাতে। তা যাক। যে

প্রতিশোধ আমি বা আমরা নিতে পারছিলাম না সেটা আমাদের হয়ে তুমিই নিয়েছ। তাই আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, তার আগে তুমি কে? তোমার নাম কি? এইসব পরিচয় দাও। আমি কিন্তু প্রথমে তোমাকে ওদেরই একজন ভেবেছিলাম। পরে হঠাৎ তুমি অন্য মূর্তি ধরতেই ব্যাপারটা রহস্যময় হয়ে উঠল আমার কাছে।"

তপাই এক এক করে ওর সব কথা খুলে বলল।

সব শুনে ছেলেটি বলল, "তোমার নাম তপাই। আমার নাম বুবাই। ভালই হয়েছে। সব চেয়ে খুশি হয়েছি তোমার মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে দেখে। এখন তুমি এক কাজ কর। আমাদের বাড়ি চল। আমি তোমাকে আমার জামা প্যান্ট দেব, সেগুলো পরে এগুলো কেচে ফেল। স্নান খাওয়া সেরে দুপুরে বিশ্রাম নাও। তারপর রাত্রিবেলা ব্যবস্থা করব তোমার।"

বুবাই ওকে সাইকেলে চাপিয়েই অন্য পথে একটু ঘুরে নিয়ে এল ওদের বাড়ি।

মধ্যবিত্ত পরিবার। ছোট্ট সংসার। চার কামরার নতুন একতলা একটি বাড়ির কাছে এসে বুবাই দরজার কড়া নাড়ল, "কাজল।"

ভেতর থেকে সাড়া এল, "যাচ্ছি।"

"একটু তাড়াতাড়ি।"

ওদেরই বয়সী স্কার্ট পরা একটি কিশোরী এসে দরজা খুলল। ঘন কালো গায়ের রঙ। কিন্তু কী অপূর্ব তার মুখশ্রী। তপাই দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেল।

মেয়েটিও বিস্ময় ভরা চোখে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে। তারপর বলল, "ও কে দাদা! ওর গায়ে রক্তের দাগ কেন?"

বুবাই ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে বলল, "চুপ। ওকে একটা লুঙ্গি আর জামা দে। আর চটপট কেচে দে ওর জামা প্যান্টগুলো।"

"তুমি কি জানো দাদা, বাঁকাদা খুন হয়েছে। আর যে খুন করেছে তাকেও খুন করেছে আর একজন!"

"জানি।"

"আচ্ছা দাদা, বড়দাকে খুন করবার সময় ওই খুনিটাও দলে ছিল, না?"

"হ্যাঁ। শুধু ছিল না, ও নিজেও হাত লাগিয়েছিল।"

"কিন্তু ওকে কে খুন করল বলতো? ওকে যে খুন করেছে পুলিশ নাকি খুব চেষ্টা করছে তাকে ধরবার। এরই মধ্যে চারদিকে এমন জাল পেতেছে যে সে যাতে কৃষ্ণনগর থেকে বেরোতে না পারে। আমি তো খবরটা শোনার পর থেকেই ভগবানকে ডাকছি, হে ভগবান! ওকে যেন পুলিশে কখনও না ধরতে পারে।"

বুবাই বলল, "ঠিক বলছিস? তাহলে আমাদের দাদার হত্যাকারীকে যে খুন করেছে তাকে একটু বেশি রকম তোয়াজ কর। সে তোর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।"

খবর শোনা মাত্রই বুবাইয়ের মা-বাবাও ছুটে এলেন।

কাজল কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না। সে আনন্দের উচ্ছ্বাসে তপাইয়ের হাত দুটো মুঠো করে ধরল। তারপর ওর পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে সে কী কান্না।

বাবা বললেন, "ছেলেটাকে যে নিয়ে এসেছিস কেউ দেখেনি তো?"

বুবাই বলল, "মনে হয় না। তবে খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখতে হবে ওকে।"

"ওকে এখান থেকে পাচার করবি কী করে?"

"এখন এসব কথা থাক। ওকে সরিয়ে দেওয়াটা খুব সহজ উপায়েই হয়ে যাবে। বেচারি আগে একটু স্নান খাওয়া করুক। বিশ্রাম নিক। ওকে একটু ঘুমোতে দিতে হবে। ওর সব কথা শুনেছি আমি। আমার জীবন দিয়েও ওকে আমি রক্ষা করব।"

মা এসে ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, "দীর্ঘজীবি হও বাবা। আমার ছেলের হত্যাকারীকে তুমি যে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছ তাতে আমি আশীর্বাদের চেয়ে বড় উপহার তোমাকে আর কিছুই দিতে পারব না। ভগবানের কাছে কামনা করি কেউ যেন তোমার গায়ে একটি আঁচড়ও না কাটতে পারে।"

তপাই বুঝতে পারল এইটাই হচ্ছে তার সত্যিকারের নিরাপদ আশ্রয়। সে ঝুঁকে পড়ে সেই মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

কাজল ওকে বাথরুম দেখিয়ে দিল।

তপাই বাথরুমে গিয়ে বেশটি করে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে স্নান করে নিল। ওর জামা প্যান্ট নিজেই কাচতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাধা দিল কাজল। সে ওর দাদার লুঙ্গি আর হাওয়াই শার্ট এগিয়ে দিল একটা।

তপাইয়ের যেন পুনর্জন্ম হল। স্নান করে শুদ্ধ হয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে গরম গরম লুচি, আলুভাজা আর হালুয়া খেয়ে প্রথমেই ওর ক্ষুধার নিবৃত্তি করল। তারপর একটা আলাদা ঘরে মানে যে ঘরটা এ বাড়ির বড় ছেলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেই ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে রইল। ঘরের দেয়ালে বড় ছেলের একটি ফোটো টাঙানো ছিল। ও একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দু'চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। দরজায় টক টক শব্দ শুনে।

তপাই ঝেড়ে উঠে বসল। বুকের ভেতরটা ছলাৎ করে উঠল একবার। পরক্ষণেই মনে হল, ভয় কী! সে তো কোনও শত্রুপুরীতে নেই। সে সুসজ্জিত গৃহকোণে নিরাপদ আশ্রয়ে আছে।

দরাজ খুলেই দেখল বুবাই দাঁড়িয়ে।

"কী! ঘুম হল?"

"সে কথা আবার বলতে? কতদিন যে এমন শান্তিতে ঘুমোইনি।"

"আমি আরও দু'বার ডেকেছিলাম। তুমি খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলে। কাজল একবার ডেকেছিল। তা বেলা যে অনেক হল বন্ধু। এবার দুটো ভাত মুখে দাও। ঘরের ভাত যে কতদিন পেটে পড়েনি তা বেশ বুঝতেই পারছি, এসো।"

তপাই চোখে মুখে জল দিয়ে দালানে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় বসল। বুবাইও বসল ওর পাশে। বসে বলল, "দেখো ভাই! কোনও কোনও মানুষ কোনও কোনও মানুষের মধ্যে তার এক পরমাত্মীয়কে খুঁজে পায়। আমিও তোমার মধ্যে ঠিক তেমনই একজনকে পেয়েছি। তোমাকে আমি সহজে ছাড়ছি না। দু'চারদিন থাক তুমি আমাদের বাড়িতে। তারপর তোমার অন্য ব্যবস্থা আমি করব। আর সেই হবে আমার বন্ধুত্বের প্রতিদান।"

তপাই কোনও কথা বলল না।

কাজল খেতে দিল ওদের।

মা এসে পাশে বসলেন।

বুবাই বলল, "আমার এই যে বোনটিকে দেখছ। কত ছোট্ট বোনটি আমার। কিন্তু অত্যন্ত কাজের। তুমি কি ভাবতে পার, এই সমস্ত রান্না ও নিজে করেছে।"

তপাই একবার চেয়ে দেখল কাজলকে।

কাজল বিনয় মিশ্রিত নম্রতা মুখে এনে রান্না ঘরে চলে গেল।

সত্যি! কত কী-ই না করেছে। আলুভাজা, বেগুনভাজা, পালম শাকের ঘণ্ট, ফুলকপির তরকারি, মাছের ঝাল, টমেটোর চাটনি। পেট ভরে তৃপ্তি করে খেল তপাই।

বুবাই বলল, "ও পড়াশোনাতেও খুব ভাল। ক্লাস এইট-এ পড়ছে। ফার্স্ট সেকেন্ড না হলেও স্কুলে ভাল রেজাল্ট করে ও। আর রান্না তো মুখে দিয়েই দেখলে। ভগবান ওকে সব দিয়েছেন। যেমনি গুণ, তেমনি সুন্দর মুখশ্রী। শুধু গায়ের রঙটাকেই যা কালো করে পাঠিয়েছেন। তবে ভাই আমার এই আদরের বোনটি যার হাতেই পড়ুক না কেন, তার সুখের ঘর আলো করে দেবে।"

মা বললেন, "তোমার কোনও দাদা টাদা নেই?"

"আছে। আমার চেয়ে দু'বছরের বড়।"

"তোমার মতো সুন্দর? কী করে সে?"

তপাই বলল, "কী আর করবে। একটা চা পাতার দোকানে সামান্য মাইনের কাজ করে। আসলে বসে না থেকে ব্যাগার খাটে।"

"তোমরা তো ব্যানার্জী। আমরাও মুখার্জী। তাই ভাবছিলাম যদি তোমার দাদার সঙ্গে মেয়েটার ব্যাপারে একটু কথাবার্তা বলা যেত।"

তপাই হেসে বলল, "বললে আমার বাবার সঙ্গেই বলবেন। দাদা আর ও ব্যাপারে কী বলবে। তাছাড়া বিয়ে করে খাওয়াবে কী?"

বুবাই বলল, "মা! এখন এসব কথা থাক। আগে আমি বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে ওর একটা ব্যবস্থা করি। যেভাবেই হোক ওকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। নাহলে দুদিনে গৃহবন্দী থেকে হাঁফিয়ে উঠবে বেচারি।"

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে আবার দরজা জানলা বন্ধ করে তেড়ে একটা ঘুম। সন্ধে পর্যন্ত ঘুমোবার পর রাত্রে আলসে ঘেরা খোলা ছাদে শুয়ে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগল তপাই। কৃষ্ণনগরের কথা এর আগে অনেকের মুখে অনেকবার শুনেছে ও! কিন্তু সেই কৃষ্ণনগর যে এমন গাছপালায় ভরা সুসজ্জিত নগরী তা ও জানত না! সবচেয়ে নিরাপদ হল এদের এই বাড়িটা। শহরের ঘন বসতি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। কাজেই এইখানে গাছপালার শোভাও একটু বেশি। তপাইয়ের মন ভরে গেল।

ও যখন বসে বসে নারকেল পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদ ওঠার দৃশ্য দেখছে তেমন সময় চা নিয়ে ওপরে এল কাজল। বাংলার মাজা কালো শ্যামলাবরণ গায়ের রঙ। অপূর্ব মুখশ্রী। একটু বেঁটেখাটো চেহারা। মাথা ভর্তি চুল। ক্লাস এইট-এ পড়ে। কী উচ্ছল। তপাইয়ের মনটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল ওকে দেখে। ও ভাবল আজ যদি ও বিপথগামী না হত, ও যদি সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন করত তাহলে নিশ্চয়ই ও অন্য কোনও স্বপ্ন দেখত। কিন্তু ও যে নষ্ট হয়ে গেছে। ওর যে কোন নিরাপত্তা নেই। কিন্তু কেন এমন হল? ওদের পাড়ার কত মেয়েকে তো দেখেছে। নিজের মায়ের পেটের বোন ছাড়া তাদের কাউকে ওর অন্য কিছু বলে কখনওই মনে হয়নি। কিন্তু কাজলকে দেখে ওর অন্যরকম মনে হচ্ছে কেন? তবে কি

তপাই আর ছোটটি নেই? এখন কি ও ভেতরে ভেতরে অনেক বড় হয়ে গেছে?

কাজল এসে হাসি হাসি মুখ করে ওর সামনে বসে বলল, "কী এত ভাবা হচ্ছে? দস্যি ছেলে! দাদার মুখে আমি আপনার কথা সব শুনেছি।"

"তাহলে তো তুমি নিশ্চয়ই জেনে গেছ আমি কত খারাপ ছেলে।"

"কিন্তু আপনিই তো বলেছেন এখন থেকে আপনি ভাল ছেলে হয়ে যাবেন।"

"বলেছি। কিন্তু কেউ কি সে কথা বিশ্বাস করবে?"

কাজল তপাইয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে তাকে বলল, "আমি করব।"

তপাইয়ের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বলল, "শুনেও সুখী হলাম।" তারপর বলল, "জানো কাজল, তোমাকে এর আগে কখনও তো দেখিনি, কিন্তু এখন এই একবার দেখেই মনে হচ্ছে তুমি আমার কত আপনজন।"

কাঁপা কাঁপা গলায় কাজল বলল, "আমারও।"

"সত্যি!"

কাজল তপাইয়ের হাতে হাত রেখে বলল, "গা ছুঁয়ে বলছি।"

"আমি যদি খুনি না হতাম, আমি যদি পলাতক না হতাম, যদি আমি ভাল ছেলে হতাম, তাহলে আর একটু বড় হয়ে আমি ঠিক বিয়ে করতে চাইতাম তোমাকে।"

কাজল তপাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে করুণভাবে বলল, "আপনাকে এমন সুন্দর দেখতে আর আমি একটা কালো মেয়ে।"

"তোমার এই কালোর মধ্যেই যে আমি আলো দেখেছি কাজল।"

কাজল হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালাল সেখান থেকে। আর তপাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ওর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে। ওর মনের মধ্যে যেন সমুদ্রের ঢেউ তোলপাড় করতে লাগল। একি হল ওর! কখনও কোনও অনাত্মীয় মেয়ের সঙ্গে এইভাবে তো কথা বলেনি ও? যে নিয়তি ওর নিষ্ঠুর হাতে ছুরি তুলে দিয়েছে সেই নিয়তিই ওর সামনে কেন নিয়ে এল এই কুসুমকলিকে? তপাই জেদি ছেলে। তাই মুহূর্তে মনকে শক্ত করে ফেলল। না, এইভাবে নিজেকে দুর্বল ও করবে না। আর এখানে থাকবে না ও। যাকে একবার দেখলেই ভাল লাগে তার কোনও অনিষ্ট কখনও করবে না। তাই কাজলের প্রতি মন আরও বেশি দুর্বল হবার আগেই এখান থেকে চলে যাবে। কারও কোনও সাহায্যই ও নেবে না। রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি ও চলে যাবে এখান থেকে। ফাঁকা মাঠের বেড়াল ও। একবার মুক্ত পথে বেরিয়ে পড়লে আর ওকে পায় কে?

কাজল চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই বুবাই এল। বলল, "তোমার একটা ব্যবস্থা করে এলাম বন্ধু।"

হাসি মুখে তপাই বলল, "কি রকম?"

"আজ রাতে তুমি এখানে থাক। কাল সকালে সাধুখাঁদের ভ্যান গাড়ি করে তোমাকে বিহারে পাচার করে দেব। গাড়িটা তোমাকে ধানবাদ অথবা বরাকরে পৌঁছে দেবে। ওখান থেকে তুমি গয়ার দিকে চলে যেয়ো। গয়া অথবা পাটনার একটা ঠিকানা তোমাকে দেওয়া হবে। সেখানে গেলে ছোটখাটো একটা কাজ এবং আশ্রয় দুই-ই পেয়ে যাবে। পরে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করে অন্য ব্যবস্থা করব। খুশি তো?"

তপাই বলল, "এমন একটা সুখবর। খুশি না হয়ে পারি?"

রাত দশটা নাগাদ খাবার ডাক পড়ল। আবার সেই চোর্বচোষ্য খাওয়া। কিন্তু এবারে আর কাজলকে ধারে কাছে দেখা গেল না কোথাও। মা-ই খেতে দিলেন। হয়তো কাজল আগে ভাগে খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তা-ই কী! তপাই তো মনস্থির করেই ফেলেছে। তবু আর একবার দু'চোখ ভরে ওকে দেখবার খুব ইচ্ছে হল ওর। মেয়েটি বড় ভাল।

সাত

খেয়ে দেয়ে বিছানায় এসে শুলেও তপাইয়ের চোখে ঘুম কিন্তু এল না। ও কেবলই চেষ্টা করতে লাগল নিঃশব্দে এখান থেকে কেটে পড়বার। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকবার পর বাথরুম যাবার অছিলায় তপাই দরজা খুলে চুপি চুপি বেরলো একবার। দালানে এসে বুঝল সবাই এখনও ঘুমিয়ে পড়েনি।

পাশের ঘর থেকে কাজলের বাবার গলা শোনা গেল, "দেখ বুবাই! এত তাড়াতাড়ি খুব বেশি কাউকে বিশ্বাস করাটা ঠিক হচ্ছে না। কে যে কোন ছলে আসে তা কি কেউ জানে?"

"কিন্তু বাবা, ও তো নিজে থেকে আসেনি। আমিই নিয়ে এসেছি ওকে।"

"ঠিক করোনি। আর কখনও এমন কাজ কোর না। কথায় আছে 'অজ্ঞাত কুলশীলস্য বাসো দেয়ঃ ন কস্যচিদ্' তাছাড়া এই পথে একবার যারা আসে তারা কখনও ভাল হয় না। ভাল হবার মানসিকতা যাদের থাকে তারা এ পথে আসে না।"

"তবে আমার মনে হয় এ ছেলেটি ..।"

তপাই আর কিছু শুনল না। শোনবার প্রয়োজনও মনে করল না। ঠিক। বিপথগামী ছেলেকে কেউ বিশ্বাস করে না। তবে আর কেনই বা মিথ্যে মায়ায় পড়ে থাকা? ওর এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। আর একটু রাত্রি হোক। ও পাড়ি দেবে নিরুদ্দেশের পথে। চায়ের দোকানে বাঁকাদার হত্যাকারীর কাছ থেকে একটা রিভলবার উদ্ধার করেছে ও। সেটিকে সঙ্গে নিয়েই ও মিশে যাবে অন্ধকারে। হারিয়ে যাবে চিরতরে।

আবার ঘরে এসে অন্তহীন প্রতীক্ষা। তারপর যখন চারদিক নিশুতি হয়ে গেল তখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আস্তে আস্তে দালান পার হয়ে আলতো করে দরজার খিল খুলে রাস্তায় নামল।

এইভাবে আসাটা হয়তো ওর ঠিক হল না। তবু উপায়ও নেই। হঠাৎ যদি বাড়িতে কোনও চুরি ডাকাতি হয় তাহলে নিশ্চয়ই ওরা ওকে ভুল বুঝবে। ভাববে অজ্ঞাতকুলশীলকে ঘরে থাকতে দিয়েই এই কাল হল। দুঃখ পাবে কাজল। ভুল বুঝবে ওকে। একটা যে চিঠি লিখে যাবে সে উপায়ও নেই। ও কিছু সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হন হন করে এগিয়ে চলল অন্ধকার পথ ধরে। একটু হেঁটে আসার পরই জঙ্গলে এসে পড়ল। এখানকার পথ ঘাট কিছুই তো চেনে না। যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে যাবার জন্যই পা দুটোকে এগিয়ে দিল। খানিক আসার পরই ওর মনে হল শুকনো পাতা মাড়িয়ে কেউ যেন ওকে অনুসরণ করছে। ও যখনই থামে সেই পদশব্দও থেমে যায়। ও চললেই আবার শুরু হয় পথ চলা। এইভাবে যেতে যেতে হঠাৎ একসময় থমকে ঘুরে দাঁড়াল তপাই। ডান হাতে তখন শোভা পাচ্ছে সেই উদ্যত রিভলবার। ওর মনে হল থেমে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউ যেন চকিতে লুকিয়ে পড়ল একটি গাছের আড়ালে।

তপাই বলল, "কে তুমি! সাহস থাকলে আমার সামনে এসো।"

কোনও সাড়া নেই। শব্দ নেই।

"চুপ করে আছ কেন? উত্তর দাও। এগিয়ে এসো আমার সামনে।"

এতক্ষণে কাজ হল। এগিয়েই এল সে। ধীর পায়ে ভয়ে ভয়ে।

তপাই বলল, "কে তুমি!"

"ভাল করে তাকিয়ে দেখো। তাহলেই চিনতে পারবে।"

তপাইয়ের কণ্ঠ যেন রোধ হয়ে এল। হাত থেকে খসে পড়ার উপক্রম হল রিভলভারটা। তবু বিস্ময়ভরা গলায় বলল, "কাজল!"

"তুমি এমন চোরের মতো পালিয়ে এলে কেন?"

"তোমার ভালর জন্যে। কিন্তু তুমি এখানে কেন?"

"তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব বলে।"

"আমি অজ্ঞাতকুলশীল। আমাকে বিশ্বাস কোর না। আমাকে যেতে দাও। ফিরে যাও তুমি।"

"আমি তো ফিরে যাব বলে আসিনি।"

"কিন্তু কাজল, আমাদের এখনও সে বয়স হয়নি। আমার হাতে পড়লে তোমার দুর্গতির শেষ থাকবে না।"

কাজল বলল, "আমার ভাবনা পরে ভাববে। আমি জানি কোনও ভুল আমি করছি না। যতদিন না তুমি কিছু একটা কর ততদিন আমরা ভাইবোনের মতো থাকব। তারপর যা কপালে আছে তাই হবে। কিছু টাকাও সঙ্গে এনেছি। কয়েকটা দিন চলে যাবে এতে। ভেবেছিলাম সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রিবেলা তোমার সঙ্গে দেখা করব। কেননা দাদা বাবা তোমাকে সাধুখাঁদের মোটর ভ্যানে বিহারে না কোথায় যেন পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। আমি সজাগ ছিলাম। এমন সময় দেখি তুমিই চলে যাচ্ছ চুপি চুপি। তাই তোমার পিছু না নিয়ে পারলাম না।"

তপাই বলল, "তুমি আমার পাশে থাকলে আমি অত্যন্ত খুশি হব কাজল। কিন্তু আমার পথ তোমার জন্য নয়।"

"তোমার যে পথ সে পথ তো হারিয়ে গেছে। এখন তোমাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। আমি তোমাকে আদর্শ ছেলে হিসেবে গড়ে তুলব।"

"বুঝলাম। কিন্তু এখনও সময় আছে। তুমি ফিরে যাও।"

"না। আর সময় নেই। ওই দ্যাখো দূরে টর্চের আলো। জঙ্গলে তল্লাশি চালাতে পুলিশ আসছে। ওরা তোমাকে দেখলেই ধরবে। এসো আমার হাত ধরো। আমি তোমাকে ঠিক পথে নিয়ে যাব। আমি এখানকার মেয়ে। সব আমি চিনি।"

"কাজল!"

"দেরি কোর না। ধরো হাত।"

তপাই ওর হাত ধরল। দুজনে হাতে হাত রেখে সেই অন্ধকার বনপথে ছুটে চলল অনির্দিষ্ট পথে। আঁকা বাঁকা উঁচু নিচু অনেক বন্ধুর পথ পার হয়ে ওরা এসে এমন এক জায়গায় পৌঁছল যেখানে ওরা অনেকটা নিরাপদ মনে করল নিজেদের। এখানে শুধু দিগন্ত

বিস্তৃত ধানকাটা মাঠ আর তারই বুক চিরে পিচ ঢালা পথ। ওরা রাস্তার ধারে একটি গাছের অন্ধকার ছায়াতলে চুপচাপ বসে রইল। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর বহুদূরে একটি লরি অথবা বাসের জোরালো সার্চ লাইটের আলো দেখতে পেল ওরা। তপাইকে বসিয়ে রেখে কাজল নিজেই রাস্তায় নেমে হাত দেখিয়ে থামাল গাড়িটাকে। গভীর রাতে রাজপথে অল্পবয়সী এক কিশোরীকে এই অবস্থায় দেখলে যে কেউ গাড়ি থামাবেই। এ গাড়িও থামল। ভাগ্যক্রমে এটি ছিল দূর পাল্লার একটি বাস। ফারাক্কায় যাবে। বাস থামলে কাজল বাসের কনডাক্টারকে মিথ্যা এটা কাল্পনিক কাহিনী শুনিয়ে নিজেদের ঘোর বিপদের কথা বলে তপাইকে নিয়ে উঠে পড়ল সেই বাসে।

পরদিন সকালে যখন ফাবাক্কায় বাস থেকে নামল তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তবুও পুলিশ এবং অন্য লোকে যাতে ওদের সন্দেহ না করে, বিশেষ করে তপাইকে অন্যরকম না ভাবে সেইজন্যে সকলের কাছেই রটিয়ে দিল, বাবা মার অমতে ওরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে এবং কোথাও একটু আশ্রয় বা কাজের সন্ধান পেলে ওরা বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করতে পারে। এই রটনার ফলে সবাই ওদের অন্য চোখে দেখতে লাগল। তপাইয়ের দিক থেকেও হিংস্র রাজনীতির সন্দেহের মেঘটা কেটে গেল। ও যে একজন খুনি আসামী, ও যে পলাতক, একজন প্রথম শ্রেণীর বাস্তুঘুঘু সে কথা চিন্তাও করল না কেউ। সবাই ভাবল অল্পবয়সী ছেলে মেয়েদের ভেতর আজকাল তো এরকম হামেশাই হচ্ছে। এও ঠিক সেইরকম।

যাই হোক, কথায় আছে যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন। এক্ষেত্রেও তাই হল। এক অবাঙালি ভদ্রলোক সব শুনে দয়াপরবশ হয়ে বললেন, "শুনো! তুম দোনোনে ইয়ে কাম আচ্ছা নেহি কিয়া। ঘর সে নিকালনা ঠিক নেহি।"

তপাই মিথ্যে করে বলল, "সে জানি। কিন্তু কী করব শেঠজী! এই মেয়েটা বড্ড গরিব। ওর কেউ নেই। লোকের বাড়িতে বাসন মাজে। পাড়ার ছেলেরা বিরক্ত করে। অথচ মেয়েটা খুব ভাল, তাই আমি বিয়ে করতে চাই ওকে। কিন্তু আমার মা-বাবা রাজি নন। এই অবস্থায় পালিয়ে না আসা ছাড়া উপায় কি বলুন?"

শেঠজী বললেন, "তো ঠিক হ্যায়। তুম এক কাম কর। মেরা চিঠ্‌টি লে কর ভাগলপুর চলা যাও। হুঁয়া হামারা এক আদমি হ্যায়। উধার এক-দো মাহিনাকে লিয়ে কামরা মিলে গা। ও আদমি নাথনগর জুটমিলমে ক্যান্টিন বয় কা এক নোকরি দেগা তুমকো। তিন চারশো রুপিয়া তনখা মিলে গা, যাও। লেকিন আভি তুম দোনা সাদী কর। নেহি তো আদমি বুরা সমঝে গা।"

ব্যস। ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। তপাই কাজলকে নিয়ে সেইদিনই চলে এল ভাগলপুরে। তারপর শেঠজীর চিঠি নিয়ে যথাস্থানে দেখা করতেই থাকার জায়গা এবং সেই সঙ্গে নাথনগরে ক্যান্টিন বয়ের চাকরিটাও পেয়ে গেল।

ভাগলপুরের পাশেই সুলতানগঞ্জ। শেঠজীর সেই ভদ্রলোক চিঠিতে সব কিছু জেনেছিলেন। তাই বন্ধুবান্ধব নিয়ে সস্ত্রীক তপাই ও কাজলের বিয়ে দিলেন গৈবীনাথের মন্দিরে। মাসখানেক থাকবার পর তপাই কাজলকে নিয়ে চলে এল নাথনগরে। কিন্তু এলে কী হবে। চিরকাল যে লোককে রক্তচক্ষু দেখিয়ে এসেছে অন্যের চোখ রাঙানি সেই বা সহ্য করবে কেন? ক্যান্টিনমালিকের সঙ্গে একদিনের সামান্য একটা কথার বচসায় মেরে ধরে

এক-সা করে চাকরি ছেড়ে চলে এল তপাই। এরপর কিছুদিন জামালপুরের কাছে কালীপাহাড়িতে এক টিম্বার মার্চেন্টের ঠিকাদারের সঙ্গেও কাজ করল। সে কাজও বেশিদিন করতে পারল না। তবে এইখানে থাকতে থাকতেই ড্রাইভারি শিখে লাইসেন্স বের করে চলে এল বারহারোয়ায়। গঙ্গার ধারে একটা কলোনিতে ঘর ভাড়া নিয়ে শান্তির নীড় রচনা করল। বেশ একটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এল তপাই। বাঁধা কোনও কাজ কর্ম না পেলেও যখন যেমন পারে তেমনই করে। মাঝে মধ্যে সুলতানগঞ্জে আসে গৈবীনাথের পুজো দিতে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন অশান্তির কালো মেঘ ঘনিয়ে এল।

মুঙ্গের থেকে কামালপাশা নামে এক দুর্বৃত্ত তার দুই সাগরেদকে নিয়ে এসে হাজির হল ওদের এলাকায়। এদের মধ্যে একজনের নাম ঈশা খাঁ আর একজনের নাম কাল্লে খাঁ। যেমন ভয়ানক দেখতে তাদের, তেমনই হিংস্র প্রকৃতি। এরা এসে ওদের সেই শান্ত পল্লীটিকে অশান্ত করে তুলল। সারা এলাকা জুড়ে মারপিট খুনজখম এমন শুরু করল যে সৎ এবং ভদ্র মানুষের টেকা দায় হয়ে উঠল।

তপাইয়ের রক্তের বারুদে আবার জ্বলে উঠল আগুন। মগ্ন মৈনাক জেগে উঠল আবার। ও শুধু সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। ও বুঝল আবার লড়াই করতে হবে তবে এবারে আর নিরীহ শান্তিকামী মানুষের সঙ্গে নয়। তাদের হিতার্থে কিছু দুষ্কৃতির সঙ্গে। এই তার শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে হয় সে বাঁচবে, নয়তো শেষ হয়ে যাবে চিরতরে কেননা ওরা তিনজন ও একা।

কামালপাশার দল প্রথমে ভয় দেখিয়ে তোলা আদায় করত। তারপর লুঠপাট। চুরি ছিনতাই রাহাজানি। যখন দেখল বস্তির লোকগুলো নির্বিবাদে সব কিছুই মেনে নিচ্ছে তখন ওরা আরও এক ধাপ এগিয়ে এল।

ওদের কলোনিতে প্রভুদয়াল নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন। সবাই তাঁকে দয়ালদা বলে ডাকত। বেশ ধার্মিক এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। সেই দয়ালদার একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী। ওর নাম ছিল সুরভী। পীরপৈঁতি নামে সুলতানগঞ্জের কাছে একটি জায়গা আছে। সেইখানে মেয়েটির বিয়ের সব ঠিকঠাক। বিয়ের আগের দিন কামালপাশার চিঠি নিয়ে ঈশা খাঁ আর কাল্লে খাঁ এসে হাজির। সে এক সর্বনাশা চিঠি। চিঠিতে লেখা ছিল "মেয়ের বিয়ের জন্যে সংগ্রহ করা সমস্ত টাকা এবং সোনার গহনা সব যেন কামালপাশার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এবং কামালপাশার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এই বস্তির কোনও মেয়ের যেন বিয়ের চেষ্টা না করা হয়।"

চিঠি পেয়েই তো মাথায় হাত। সস্ত্রীক দয়ালদা ঈশা খাঁ ও কাল্লে খাঁর পা দুটি জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু কোনও লাভ হল না। ওরা একটু ভেবে দেখার সময় দিয়ে চলে গেল।

সারা বস্তি জুড়ে শোক ও অশান্তির ছায়া নেমে এল। নিরীহ মানুষগুলো প্রতিবাদ করতে রুখে দাঁড়াল না কেউ।

রাত্রিবেলা গাড়ি গ্যারেজে রেখে তপাই এসে যে মুহূর্তে এই কথা শুনল অমনি আবার গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠল ওর। কাজল ওর জন্য মাছের ঝোল আর ভাত রেঁধে রেখেছিল, তা আর মুখে দেবার সময় পেল না। কারণ গলির মুখে তখন দারুণ হই হট্টগোল। কী ব্যাপার? না, এই মাত্র ওরা এসে সুরভীকে নিয়ে গেল।

তপাই একটুও দেরি না করে ওর গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখা সেই রিভলভারটা বে

করে কাজলকে বলল, "দরজা বন্ধ করে শুয়ে থেকো। যদি না ফিরি চিন্তা কোর না।"

কাজল শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ওকে। বলল, "না। এ কাজের জন্যে তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না। ওই সর্বনাশা জিনিসটা তোমার হাতে উঠলে আবার তুমি আগের মতো হয়ে যাবে। তাছাড়া ওরা তিনজন। তুমি একা। ওদের সঙ্গে তুমি পেরে উঠবে না।"

তপাই বলল, "আমাকে বাধা দিয়ো না কাজল। এই যদি আমার নিয়তি হয়, তাহলে তাকে তুমি খণ্ডাতে পারবে না। বাবা গৈবীনাথের কসম। ওদের তিনটেকেই আমি শেষ করব।"

"না। আমার কসম ও কাজ তুমি করতে পারবে না।"

তপাই বলল, "কাজল, এমনও তো হতে পারে আজ ওরা সুরভীকে নিয়ে গেল। কিন্তু কাল তোমাকে নিয়ে যাবে।"

কাজল শিউরে উঠল। বলল, "ন্ না।"

"তাহলে? এ জীবনে আমার আর ভাল হওয়া হল না। দেখি, এবার অন্যের ভালর জন্যে যদি আমি আরও খারাপ হতে পারি।"

কাজল আর বাধা দিল না।

তপাই ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দয়ালদার ঘরে গিয়ে দেখল স্থাণুর মতো উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে বসে আছেন দয়ালদা। পাশেই মেয়ের শোকে আছাড় কাছাড় করছেন তাঁর স্ত্রী। আর বস্তি শুদ্ধু মেয়ে পুরুষ সবাই জড় হয়ে তাঁদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং উপদেশ দিচ্ছেন ভবিতব্যকে মেনে নেবার।

ক্রুদ্ধ সাপের চোখে তাকিয়ে তপাই যখন দয়ালদার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন তাকে দেখলে যমেও শিউরে উঠত বুঝি।

দয়ালদার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল ওকে দেখে, "আমার সুরভীকে ওরা নিয়ে গেল। কিন্তু এই এতগুলো মানুষ এখানে ভিড় করে আছে কেউ বাধা দিতে পারল না ভাই।"

তপাই বলল, "কতক্ষণ আগে এসেছিল ওরা?"

"দশ মিনিটও হয়নি।"

দরজার কাছে এক মধ্যবয়সী মহিলা দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছছিলেন। তপাই জিজ্ঞেস করল তাঁকে, "গুল্টু কাঁহা হ্যায় মৌসী?"

"ও বাহার খাড়ি হ্যায়।"

বাহার খাড়ি হ্যায় মানে গলির মোড়ে। তপাই হন্তদন্ত হয়ে গুল্টুর কাছে গিয়ে বলল, "ক্যা তামাসা দেখ্ রহে হো দোস্ত?"

গুল্টু বলল, "আরে ভাই শুনা? সুরভীকো লে কর ভাগা বেটা বদমাশ কা বাচ্চা।"

তপাই বলল, "শুনেছি। লেকিন তেরি মা আর বহেন কো কোঈ দিন কিসিনে উঠাকে লে যায় তো? তব ভি অ্যায়সা মাফিক তামাশা দেখোগে?"

বিস্মিত গুল্টু বলল, "কভী নেহি। ম্যায় উসকো জিন্দা নেহি ছোড়ুঙ্গা।"

"তো আভি যাকে তেরা মোটরবাইক তুরন্ত লে আ।"

"যাতে হেঁ। লেকিন ও বহুৎ খতরনাক হ্যায়।"

"আজ মালুম হোগা কি উসসে ভি জায়দা খতরনাক আভি জিন্দা হায়। যা, দের মাত কর। জলদি আ যা।"

গুন্টু চোখের পলকে ছুটে গিয়ে ওর মোটরবাইকটা নিয়ে এল।

তপাই বলল, ও লোগ কিধার গিয়া মালুম হ্যায় কুছ?''

''গড়কালীকা মন্দির মে গিয়া হোগা জরুর।''

গুন্টুকে পিছনে বসিয়ে তপাই 'জয় বাবা কি' বলে বিপজ্জনকভাবে বাইকটাকে ছুটিয়ে দিল।

গুন্টুর অনুমানই ঠিক। গঙ্গার ধারে একটা উঁচু টিবির ওপর গড়কালীর ভগ্ন মন্দির। সেখানে না আছে দেবতা, না হয় পুজো পাঠ। সন্ধের পর দুষ্ট চক্রের ঘাঁটি বসে সেখানে। সাট্টা জুয়ার আসর বসে। আরও অনেক নোংরা কাজও হয়।

ওরা গড়কালীর মন্দিরের কাছাকাছি এসে এক জায়গায় একটি গাছের আড়ালে বাইকটাকে রাখল। তারপর চুপি চুপি দুজনে হামাগুড়ি দিয়ে একটু একটু করে অন্ধকারে মিশে উঠতে লাগল সেই গড়কালীর মন্দিরে। গুন্টু প্রথমে যেতে খুব ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু পরে তপাইয়ের হাতে ওই ভয়ঙ্কর মারণ যন্ত্রটি দেখে সাহসে বুক বাঁধল।

এ ঘরের দরজাও নেই। জানালাও নেই। তাই ঘরে ঢুকতে বাধাও নেই। ঘরের ভেতর এবং দালানে বাতি জ্বলছে।

হঠাৎ ধুপ করে একটা শব্দ হতেই ঈশা খাঁ আর কাল্লে খাঁ ছুটে এল, ''কৌন হ্যায়?''

তপাই বলল, ''তেরা দুশমন।''

ঈশা খাঁ কাল্লে খাঁ ভেবে পেল না কে বলল এবং কোথা থেকে বলল কথাটা।

ঈশা খাঁ বলল, ''তুম যো কোঈ হো মেরে সামনে মে তো আও।''

তপাই পিছন দিক থেকে রিভলভারের নলটা ওর ঘাড়ের কাছে ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপল। গুড়ুম।

এবার কাল্লে খাঁর পালা। সে এই অন্ধকারে ব্যাপারটা কি হল বুঝতে না পেরে যেই না পালাতে যাবে গুন্টু অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তারপর ওর শক্ত আঙুলগুলো দিয়ে গলার নলিটা এতো জোরে টিপে ধরল যে কিছুক্ষণ মুরগির মতো ছটফট করেই নেতিয়ে পড়ল কাল্লে খাঁ।

তপাই ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতর।

ঘরের ভেতর এক কোণে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সুরভী। আর এক পাশে শিকারি বাঘের মতো গোঁফ ফুলিয়ে বসে আছে কামালপাশা।

তপাই ঘরে ঢুকতেই সুরভী ছুটে এল, ''তুম ঘর চলা যাও তপাইদাদা। নেহি তো এ শয়তান মেরা বাবুজী মাজীকো মার ডালে গা। তুমকো ভি মারে গা এ লোক।''

তপাই বলল, ''তুম চুপ রহো বহিন। ইয়ে বদমাশ বহৎ জ্বালায়া হাম সবকো। আজ ইসকা টায়ার হাম পাংচার করকে তব যায়েগা।''

উন্মত্ত কামালপাশা তখন রুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দাঁড়ালে কি হবে। সে তখন নিরস্ত্র। দিনের পর দিন বাধা না পেয়ে সদা সতর্ক থাকতে বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিল সে। তাই তপাইয়ের হাতে উদ্যত রিভলভার দেখে আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে উঠল, ''ঈশা খাঁ! কাল্লে খাঁ! জলদি আ যাও।''

তপাই বলল, ''ওদের মরা বাবাও আর আসছে না ব্রাদার। একটু আগেই তো একটা গুলি খরচা করলাম তোমার সাগরেদের জন্যে। শুনতে পেলে না?''

কামালপাশা ভয়ে ঘাড় নাড়ল, ''না।''

ততক্ষণে গুল্টুও এসে দাঁড়িয়েছে।

কামাল বলল, ''মুঝে মাৎ মারো। ম্যায় মাফি মাংতা হুঁ। আভি হাম হিঁয়াসে বহৎ দূর চলা যায়েগা।''

তপাই বলল, ''হাঁ। যানাহি হোগা বহৎ দূর। লেকিন উইদাউট টিকট মে মাৎ যাও।''

''ও টিকট কাঁহা মিলে গা?''

''ইধার।''

তপাই একটুও সময় নষ্ট না কবে আর একটা গুলি খরচা করল। গুড়ুম। কিছুক্ষণের ছটফটানি। তারপরেই সব শেষ।

কাছেই গঙ্গা। গড়ের ওপর থেকে গঙ্গার জলে তিনটে লাশকে ফেলে দিতে সময় লাগল না একটুও।

সুরভী 'দাদা' বলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তপাইকে। এরপরে ওই মোটরবাইকে চেপেই তিনজনে ফিরে এল বস্তিতে।

দয়ালদা এবং তাঁর স্ত্রী অক্ষত শরীরে মেয়েকে ফিরে পেয়ে কী যে করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না।

কাজলও খুশি হল তপাই ফিরে আসায়। তপাইকে প্রণাম করে সে বলল, ''আমার একটা অনুরোধ তুমি রাখবে?''

''বল?''

''কাল সকালেই ওই রিভলভারটাকে তুমি গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে এসো।''

''সেকি!''

''হ্যাঁ। আমার কথা শোনো। ভাল হবে। কেননা ওই জিনিসটা যতদিন তোমার হাতের কাছে থাকবে ততদিন তোমার ভেতর থেকে খুনের নেশাটা যাবে না। এবং বিপদও হঠাৎ করেই আসবে।''

এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই যা হবার তা হয়েছিল। অর্থাৎ গুল্টু ব্যাপারটা পুরোপুরি চেপে যাওয়ায় খুনের ঘটনাটা যেমন জানাজানি হয়নি তেমনি থানা পুলিশের ঝামেলাও পোহাতে হয়নি কাউকে। তবে দুঃখের বিষয় সুরভীর বিয়েটা ভেঙে গিয়েছিল। তা যাক, বাবা মায়ের বুকে তাদের হারানিধি যে ফিরে এসেছিল এটাই যথেষ্ট। ওর বাবা দযালদা এই ঘটনার পর মেয়েকে নিয়ে এখানকার পাট চুকিয়ে বেগুসরাইতে তাঁদের দেশের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। এবং সেই থেকে ওই কলোনির মধ্যে আর কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।

এরপর সুখে দুঃখে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। ওদের সুখী গৃহকোণ আলো করে এক সুন্দর শিশু জন্ম নিল। তপাই এখন ঘোর সংসারী। তবে ঠিকমতো কাজকর্ম না থাকায় আর্থিক অনটন লেগেই থাকে প্রায়। গাড়ি যখন চলে তখন বেশ রমরমা। আর গাড়ি বসে গেলেই অবস্থা যে কে সেই। এর ওপর রোগ নাড়া ঢুকলে তো কথাই নেই। তবে শত দুঃখেও তপাই আর কোনওরকম খারাপ কাজ করে না। কেননা ও জেনেই গেছে অসৎ উপায়ে উপার্জন করার অর্থই হচ্ছে যত অনর্থের মূল। কিন্তু সৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থে সংকুলান না হলেও শান্তি এবং মুক্তির পথ।

এই পর্যন্ত বলে তপাই থামল।

আমি গঙ্গার ওপারে গৈবীনাথের মন্দিরের দিকে চেয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ তারপর বললাম, "ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভাগ্যিস নাটকীয়ভাবে তোর সঙ্গে আমার দেখা হল। তাই তো এত সব জানতে পারলাম। তোর ভেতরে যে হিংস্র পশুটি জন্মেছিল সে এখন মরে গেছে। কাজলের সংস্পর্শ এবং ভগবানের অগ্নি পরীক্ষায় তুই এখন অগ্নিশুদ্ধ। তোর জীবনের যত কিছু অন্যায় অপরাধ সবের মুক্তিস্নান হয়েছে সেদিন, যেদিন থেকে তুই রুখে দাঁড়াতে শিখেছিস। তোর প্রথম মুক্তি হয়েছে কৃষ্ণনগরে বঙ্কাদার হত্যাকারীকে হত্যা করে তাই তুই ভগবানের আশীর্বাদ হিসেবে না চাইতেই পেয়ে গেছিস কাজলের মতো সদ্‌বংশজাত একটি মেয়েকে। ওকে না পেলে তুই হয়তো আরও ভেসে যেতিস। আর তোর চিরমুক্তি হয়েছে সুরভীকে ওর মা-বাবার বুকে যেদিন ফিরিয়ে দিয়েছিস সেদিন। তাই তো খুশি হয়ে ভগবান এক চাঁদের মতো ফুটফুটে শিশুকে উপহার দিয়েছেন তোদের কোলে দেবতার আশীর্বাদে ওর জন্ম। আমি ওর নাম রাখব দেবাশিস। আর এও জেনে রাখিস এই যে পতিতপাবনি মা গঙ্গা, ওই যে বাবা গৈবীনাথ—এই পুণ্য তীর্থে এসে এবং পুণ্যসলিলে স্নান করে সর্বপাপতাপহর হয়ে তুই এখন শুচিশুদ্ধ। তোর পুনর্জন্ম হয়েছে তপাই। ঘরে ফেরার এই তো শুভক্ষণ। নাহলে কি এইভাবে তোর সঙ্গে আমার দেখা হবার কথা? এখন তোর একটি মাত্র কাজ বাকি। সেটি হল মায়ের চোখের জল মোছানো।"

তপাই বলল, "কিন্তু মামা, এতদিন বাদে দেশে ফিরব। তাও কপর্দকহীন হয়ে?"

আমি হেসে বললাম, "তোর ছেলেটা আমাকে বিক্রি করবি? আমি তোকে এক লাখ টাকা দেব।"

"মামা!"

"তাহলে? কে বলে তুই কপর্দকহীন? ওরে! বিপ্লব আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছিল কিন্তু বিনিময়ে নিয়ে গেছে আমাদের মনুষ্যত্ব। আর বিপ্লবী হয়ে রিভলভারের নলে গুলি পুরে সেই মনুষ্যত্বকেই আবার তুই ফিরিয়ে আনতে পেরেছিস। আজ তোর চেয়ে বিত্তবান কে? মার্বেল পাথরের একটা বাড়ি আর গোটাদুই মারুতি থাকলেই কি মানুষ ধনী হয়? কুঁড়ে ঘরে থেকে মাটির প্রদীপ জ্বেলে যে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে সেই হচ্ছে সত্যিকারের ধনী। তুই তোর মায়ের কাছে ফিরে যা। কাজলকে নিয়ে যা তার বাবা মায়ের স্নেহ নীড়ে। ওই দেখ। বেলা বয়ে যায়। পাখিরা নীড়ে ফেরে কত গান গেয়ে। গৈবীনাথের শেষ খেয়া ধীরে ধীরে এপারে আসে। আরতির শঙ্খ ঘণ্টা ওই শোন মন্দিরেতে বাজে। নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। তপাই! প্রকৃতিস্থ হ।"

তপাই নিরুত্তর। অনেকক্ষণ নিরুত্তর থেকে এক সময় বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন মামা। এইখানে এইভাবে পড়ে থাকলে ছেলেটা মানুষ হবে না। আমি যাব। কাল সকালেই যাব আমি।"

"সে তো যেতেই হবে। সকালই তো যাবার সময়। অন্ধকার যতই গাঢ় হোক সকালকে সে ঢেকে রাখতে পারে না। কারণ সকালেই যে আলোর প্রকাশ। তোর জীবনের অন্ধকারও কেটে গেছে তাই। কাল সকালে তোরও জীবনপ্রভাত শুরু হবে। নতুন দিনের নতুন সূর্য উঠবে নবদিগন্ত উদ্ভাসিত করে। দেখবি যা কিছু অন্ধকার তা সবই পড়ে থাকবে তোর পেছনে। যা কিছু উজ্জ্বল তা উদ্ভাসিত হবে সম্মুখে। কাল থেকেই শুরু হোক তোর

আলোকাভিসার। তোর জয় হোক।''

আমরা যখন আমাদের কথালাপ শেষ করে ফিরে আসতে যাচ্ছি তখন ছেলেটিকে বুকে নিয়ে ধীর পায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে কাজল।

ও কাছে এসে বলল, ''আপনারা এখানে?''

তপাই বলল, ''আমি তো বলেই ছিলাম আমরা গঙ্গার ধারে থাকব।''

''ছেলেটা বড্ড বায়না করছিল। আর ধরে রাখতে পারছিলাম না ওকে।'''

''আরও আগে আসতে পারতে। মামুর সঙ্গে কত কথা হল।''

আমি বললাম, ''বউমা! কালই আমরা কলকাতায় ফিরব। এখন চল সবাই মিলে একবার স্টেশনে যাই। ওখানে গিয়ে কখন কোন গাড়ি পাব না পাব সব খোঁজ খবর নিয়ে আসি। অমনি একটু চা-টাও খাওয়া যাবে।''

আনন্দে কাজলের চোখ দুটো যেন চক চক করে উঠল। বলল, ''সত্যি!''

''সত্যি না তো কি মিথ্যে? আমি কি অমনি ট্রেন থেকে নেমে পড়লুম!''

কাজলের দু'চোখ বেয়ে আনন্দের অশ্রু নামল। বলল, ''আমি জানতাম আমার তপস্যা কখনও বিফলে যাবে না। আমি কখনও কোনও অন্যায় করিনি। অধর্মর আশ্রয় নিই নি। যার জন্য ঘর ছেড়ে এসেছি সে দুঃখ পাবে বলে ঘরের খবরও রাখিনি কখনও। এমন কি লুকিয়ে একটা চিঠিও দিইনি ওদের।''

''কেন মা?''

''আমার যে তপোভঙ্গ হবে। জীবন সাধনায় নিষ্ঠা না হলে কি চলে? তাই জয় হল আমারই। সব আমি ফিরে পেলাম।''

আমি অবাক হয়ে গেলাম কাজলের কথা শুনে। কতই বা বয়স কাজলের? আজকের দিনেও এমন এক ত্যাগী, যোগী, মহৎপ্রাণা মেয়ে যদি আমাদের দেশে থাকে তাহলে কে বলে যে সে দেশ রসাতলে গেছে? দেশ হতে দেশান্তরে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে যাঁর কৃপাদৃষ্টি তাঁর সৃষ্টি কি রসাতলে যাবার? তাঁর সৃষ্টিতেই যে মুহূর্তে একজন মরে, সেই মুহূর্তে একজন জন্মায়, এক ফুল ঝরে, এক ফুল ফোটে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত মেঘ রোদ্দুর রাত্রি দিন সবই হয়। তাহলে?

তপাই ওর ছেলেটাকে কাজলের বুক থেকে নিজের বুকে নিল। তারপর চুমোয় চুমোয় মুখখানি ভরিয়ে দিয়ে বলল, ''দিদার কাছে যাবি? কিরে দুষ্টুটা?''

শিশু কি বুঝল কে জানে? ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

আমি হাত বাড়ালাম। হেসে মুখ সরিয়ে নিল। আমার কাছে এল না পাজিটা।

গঙ্গার ধার থেকে উঠে আসতেই আমরা আলো ঝলমল রাজপথে এসে পৌঁছলাম। সমস্ত সাজানো গোছানো দোকান পত্তরগুলো আলোয় ঝলমল করছে। আমার কাছে যা টাকা ছিল তাইতে কাজলের জন্য মানানসই শাড়ি কিনলাম একটা। সেই সঙ্গে সাবান সিঁদুর আলতা। তারপর একসময় এসে পৌঁছলাম স্টেশনে।

কথায় আছে কপাল যখন খোলে তখন দু'হাট হয়েই খোলে। তাই ভাগ্যের চাকাও ঘুরে চলল বনবন করে।

স্টেশনে আসতেই আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি এখানকার এ. এস. এম। বললেন, ''হাওড়ায় যাবেন? একটু দাঁড়ান। গাড়ির পজিশন কি জেনে বলছি।

বলে আমাদের সকলকে তাঁর অফিসে বসিয়ে টেলিফোন ধরে অনবরত কি সব খটাখট করতে লাগলেন। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বললেন কার সঙ্গে। অনুমানে বুঝলাম জামালপুরের স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। কথোপকথনে বুঝলাম আশার আলো রীতিমতো আছে।

আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম তাঁর মুখের দিকে।

রিসিভার নামিয়ে তিনি বললেন, "আজকের গাড়িতে যদি আপনাদের জন্য তিনটে বার্থের ব্যবস্থা করে দিই তাহলে অসুবিধে নেই তো?"

"কী যে বলেন? কোন গাড়ি?"

"মুঘলসরাই এক্সপ্রেস। আগে যেটা আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ছিল। গাড়িটা অবশ্য একটু বেশি রাতে। রাত দুটোয়। যদি কাল যান তাহলে সে ব্যবস্থা হতে পারে। নতুন একটা জামালপুর এক্সপ্রেস চালু হয়েছে, তাতে হয়ে যাবে।"

আমি বললাম, "ক্ষেপেছেন? এই বিদেশে অযথা খরচা বাড়িয়ে লাভ কি? আজ রাতে আমাদের ধর্মশালায় পড়ে থাকাও যা স্টেশনে থাকাও তাই। আপনি আজকের গাড়িতেই করে দিন।"

ভদ্রলোক আবার ফোন ধরলেন, "হ্যাঁ। সুলতানগঞ্জ বলছি। আপনাদের জামালপুর কোচে যে তিনটে বার্থের কথা বলেছিলুম, সেগুলো ফাঁকা রাখবেন।"

ও দিক থেকে কি উত্তর এল বোঝা গেল না।

"আমার বন্ধুলোক। রিলেটিভের মতোও বলতে পারেন। কত নম্বর বললেন?"

ওদিক থেকে আবার কি উত্তর এল।

"এস ওয়ান? আমি তাহলে টিকিট ইস্যু করে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাত দুটো যখন কালকের তারিখই হবে।"

টেলিফোন রেখে ভদ্রলোক বললেন, "ব্যস। হয়ে গেল। এখন টিকিটটা কেটে নিন। গাড়িতে যে কোচ অ্যাটেনডেন্ট আছেন উনি বার্থের চার্জ নিয়ে রসিদ দেবেন। আমি আজ সারারাতই স্টেশনে আছি। কোনও অসুবিধে হবে না। তবে এটা একটা ছোট্ট স্টেশন তো আর দেহাতিদের ভিড় বেশি। তাই ওয়েটিং রুম খুব একটা পরিচ্ছন্ন পাবেন না। আপনারা আমার অফিস ঘরেই বিশ্রাম করবেন।"

তপাই বলল, "তাহলে মামু, নাইট শো'তে একটা সিনেমা দেখলে কেমন হয়? সময়টাও কেটে যেত।"

ভদ্রলোক বললেন, "না না, ওই কাজটি করবেন না মশাই। ছারপোকার কামড়ে অস্থির হয়ে যাবেন। শরীরের সব রক্ত শুষে নেবে একেবারে। এর চেয়ে চুপচাপ বসে থাকুন, দেখবেন এমনিই সময় কেটে যাবে।"

সিনেমা দেখব বললেই সিনেমা দেখছে কে? তার ওপর কাল থেকে রাত জাগা। ঘুমে তখন দু'চোখ লুটিয়ে আসছে। এখন একটু বিশ্রামের দরকার। হাত পা টান করে শুয়ে ঘুম একটা এখুনি চাই। শুধু ঘরে ফেরার টানে এই ভাবে কষ্ট স্বীকার করেও এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

আমরা টিকিট কেটে একটা দোকানে এসে রাতের খাওয়া সেরে নিলাম। গরম গরম রুটি তরকারি রাবড়ি আর প্যাঁড়া। তারপর ধর্মশালায় গিয়ে যা কিছু ছিল সঙ্গে নিয়ে বাচ্চা

দুধ ভরে আবার স্টেশনে চলে এলাম। সকলের হৃদয় থেকে কত কথাই না কুল কুল করে বের হতে লাগল।

কাজল বলল, "কতদিন যে মা বাবাকে দেখিনি। দাদার কোনও খবর নেই। মামাবাবু, আপনি আমাদের পৌঁছে দিয়েই আমাদের বাড়িতে একবার চলে যাবেন। বুঝিয়ে বলবেন বাবা মাকে। পারেন তো দাদাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন। এতদিনে দাদা বিয়ে করেছে কিনা জানি না। করেছে নিশ্চয়ই।"

আমি বললাম, "তোমাকে কোনও চিন্তা করতে হবে না মা। ওখানে পৌঁছেই আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলব।"

এইভাবেই সময়ের তরী বয়ে চলল।

রাত দুটো। ট্রেন যথাসময়ে এল। এস. ওয়ান. বগিতে আমরা উঠতেই এ. এস. এম ভদ্রলোক গাড়ির কনডাক্টার গার্ডকে আমাদের কথা বলে উঠিয়ে দিলেন আমাদের। ট্রেন ছাড়ল। মাত্র দু'মিনিট স্টপেজ। তাই থেমেই ছাড়ল ট্রেন।

আমরা যে যার বার্থে শুয়ে পড়লাম শোওয়া মাত্রই ঘুম। সেই ঘুম ভাঙল বোলপুরে এসে। এ গাড়ি হাওড়ায় যাবে না। তাই বর্ধমানে নেমে গাড়ি বদল করলাম। কর্ড লাইনের লোক্যাল ট্রেনে একেবারে হাওড়ায়। ট্রেন থেকে নেমে তপাই বলল, "এ যে একেবারে ভোল পাল্টে গেছে মামা। হাওড়া স্টেশনের এত উন্নতি হয়েছে? চেনাই যাচ্ছে না যে!"

আমি ওকে বললাম, "তুই বউমাকে নিয়ে একটু দাঁড়া, আমি এক্ষুনি আসছি। বলেই চট করে রামরাজাতলার তিনটে টিকিট কেটে ওদের বললাম, "চল, বারো নম্বরে পাঁশকুড়া লোক্যাল দাঁড়িয়ে আছে। উঠে পড়।"

তপাই অবাক হয়ে বলল, "কোথায় যাবেন?"

"কেন? আমার ওখানে।"

"সে তো জানি। কিন্তু ট্রেনে উঠব কেন?"

আমি বললাম, "ওঃ হো। তোকে তো বলাই হয়নি। এখন আর আমি মধ্য হাওড়ায় নেই। রামরাজাতলা স্টেশনের কাছে ছোট্ট একটা বাড়ি করেছি।"

"বলেন কি? দিদিমা! দিদিমা কেমন আছে?"

"ভাল আছে।"

"আর কোনও খবর আছে?"

"তোর মামী হয়েছে। আমি তিন কন্যার পিতা হয়েছি। আর কি জানতে চাস বল?"

তপাইয়ের সে কী আনন্দ। আনন্দের আবেগে সে যে কী করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। বলল, "মামা। এত উত্থান পতন কোনও কিছুতেই আমরা তাহলে হারিয়ে যাইনি কি বলুন?"

"হারিয়ে গেলেই হল? ভগবান বলে একজন আছেন না?"

রামরাজাতলায় এসে পায়ে হেঁটেই বাড়ির কাছাকাছি এলাম। এলাকায় ঢুকতেই খবর পেলাম আজই সকালে দিদি মীনার বাড়ি থেকে এসেছেন আমার এখানে। তাই হঠাৎ চমকে দেবার জন্য তপাইকে গলির মোড়ে দাঁড় করিয়ে কাজল ও ছেলেকে নিয়ে বাড়ি এলাম।

আমাকে এইভাবে ফিরে আসতে দেখে তো যারপরনাই অবাক হয়ে গেল সকলে। তার ওপর এই অল্পবয়সী বউ আর ঐ ফুটফুটে শিশুকে দেখে সবারই চোখে বিস্ময়।

মা বললেন, "কী হল তোর বিয়েবাড়ি?"

আমার স্ত্রী মায়া বলল, "এরা কারা!"

"সব বলছি। আগে মুখ হাত ধুই, ধুয়ে ঠাণ্ডা হই। তবে তো। বলে ছেলেটিকে দিদি কোলে দিয়ে বললাম, "বাচ্চাটার খিদে পেয়েছে বোধ হয়। একটু দুধ টুধ খেতে দাও দেখি।"

দিদি একেই ছেলেপুলে ভালবাসেন তাই এই শিশুর পরিচয় না পেলেও আদরের অ রইল না তার।

কাজলও টুক-টুক করে প্রণাম করে নিল সকলকে।

আমি ততক্ষণে হাত মুখ ধুয়ে পোশাক পরিবর্তন করে ফেলেছি। কাজলকে বসিয়ে ঘরের ভেতর।

মায়া বলল, "এরা কারা! চিনলাম না তো?"

"তার আগে বল এরা এখানে থাকলে তোমার কোনও অসুবিধে হবে কি না?"

"তোমার বাড়ি। তুমি নিয়ে এসে কাউকে রাখলে আমার কিসের অসুবিধে?"

"মনে কর এ এক দুখিনী মেয়ে। আমাদের মেয়ের মতন। স্বামীটা বাউন্ডুলে। তা আজ থেকে যদি ও ছেলেকে নিয়ে আমাদের এখানে থাকে তাহলে?"

"থাকুক না। কে আর মানা করছে।" বলে মায়া কাজলকে ওর একটা আলাদা শা পড়তে দিয়ে চা করতে বসল।

আর দিদি সমানে ছেলেটাকে আদর করতে করতে বলতে লাগলেন, "কী সুন্দ ছেলে রে। কেমন ননীচোরা গোপালের মতন ফিক ফিক করে হাসছে দেখ! যেন ক দিনের চেনা। কী নাম ওর?"

বললাম, "দেবাশিস।"

"আমি বাবু ওর নাম রাখব গোপাল।"

আমার তিন মেয়ে তুলতুলি, টুঙ আর বাবুনি তখন ছেলেটাকে কোলে নেবার জ কাড়াকাড়ি করছে।

দিদি বললেন, "সত্যি করে বলতো কে? আমি ঠিক চিনতে পারছি না। নিশ্চয়ই চে জানা কেউ। নাহলে একেবারে রাস্তা থেকে কাউকে তুলে আনার পাত্র তুমি নও।"

কাজল তখন চোখের ইশারায় আমাকে আর রহস্য না করতে মানা করছে।

আমি বললাম, "খুব ভাল করে একবার তুমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো চিনতে পার কিনা?"

দিদি বললেন, "আমি সত্যিই চিনতে পারছি না রে।"

"আবার দেখো।"

"তুই আর হেঁয়ালি করিস না। বল কে?"

"যদি বলি তোমার শংকর আবার তোমার কোলে ফিরে এসেছে?"

দিদি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ছেলেটাকে আবেগে বুকে জড়িয়ে বললেন, "তার মানে তুই হঠাৎ একথা বললি কেন?"

"যা সত্যি তাই তো বললাম।"

"এ তাহলে...?"

"তোমার নাতি। আর এই হল তোমার বউমা।"

দিদি বললেন, "সে কোথায়? সেই হতভাগাটা? তাকে আনতে পারলি না? আমার পর অভিমান করে সে বোধহয় আসে নি?"

তপাই তখন দোরগোড়ায়। বলল, "তোমার ওপর অভিমান-করতে পারি? স্বর্গাদপি গরীয়সী তুমি। কিন্তু তোমার এই বেশ কখনও দেখতে হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি মা। বাপি নেই। বড়দা নেই।"

আমি বললাম, "কে বললে শংকর নেই। তোর এই শিশুটির মধ্য দিয়েই তো তার প্রকাশ ঘটেছে।"

দিদির তখন সে কী আনন্দ। দীর্ঘদিন পরে হারানো সন্তানকে ফিরে পেয়ে সব দুঃখই ভুলে গেলেন বুঝি। তপাইয়ের ছেলেকে বুকে নিয়ে কী যে করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না। তপাই মাকে দিদিমাকে প্রণাম করে আমাদের সবাইকে প্রণাম করল।

ততক্ষণে চা হয়ে গেছে। চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, "তোমরা এবার ভাল করে একটু রান্না খাওয়ার আয়োজন কর। দু'রাত ভাল করে ঘুমোইনি। আমি পোস্ট অফিসে গিয়ে একটা টেলিগ্রাম করে আসি বউমার বাড়িতে। সুখবরটা ওদেরও তো জানানো দরকার। তারপর দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়ে সন্ধেবেলা খবর দেব স্বপনকে।"

দিদি বললেন, "অমনি পাঁজিতে একটা শুভদিন দেখবি। সেইদিন আমি আমার ছেলে বউ নাতিকে নিয়ে কদমতলায় চলে যাব। আমার শূন্যঘর আবার পূর্ণ হয়ে উঠবে। খোলা উঠোনে গোপাল আমার ছুটাছুটি করবে। একটা পোস্ট কার্ড নিয়ে আসবি। মীনাকেও একটা চিঠি দেব।"

আমাদের বাড়িতে যেন একটা আনন্দের উৎসব লেগে গেল। সবাই জেনে গেল এক দুখিনি মায়ের অশান্ত ছেলে শান্ত হয়ে আবার ফিরে এসেছে।

—ঃঃ—

অম্বর চ্যাটার্জির গোয়েন্দাগিরি

আমার বন্ধু ওমপ্রকাশ মাকিন পাঞ্জাবের অধিবাসী হলেও আমরা দুজনে একই স্কুলে পড়েছি। একসঙ্গে খেলাধূলা করেছি, সিনেমা দেখেছি, বড় হয়েছি। কিন্তু কেন কে জানে, আজ এতদিনেও ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের চিড় খায়নি। আসলে ওমপ্রকাশ খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির ছেলে। বেশ হাসিখুশি এবং প্রাণোচ্ছল। স্কুলের ছেলেরা ওকে পেঁইয়া বলে রাগালে ও রাগত না। ওর ভাষার বিকৃত অনুকরণ করে কেউ ওকে ভ্যাংচালে ও কিছু মনে করত না। কিন্তু ওর পাগড়িতে ঠাট্টার ছলেও কেউ সামান্য একটু হাত দিলে ওর চোখ দুটো অসম্ভব রকমের লাল হয়ে উঠত। আমি বুঝতে পারতাম ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটবে এবার। তাই সেসময় আমিই ওকে সামলাতাম। ওকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে শান্ত করে অন্যদের ভর্ৎসনা করতাম এবং বাধা দিতাম। ওমপ্রকাশ বুঝত। শান্ত হোত। একটি ভালো জাতের হিংস্র কুকুর যেমন তার মনিবের কথা শুনে বিরক্তিকর দেশি কুকুরগুলোর ওপর প্রতিশোধ না নিয়েই ফিরে আসে, ঠিক সেইভাবেই চলে আসত সে আমার কাছে। ও জানত আমি অন্য ছেলেদের মতো নই। নম্র, ভদ্র, একটু অন্যরকম। আমি কখনো ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের এবং ওর সরলতার সুযোগ নিয়ে ওর মর্যাদায় লাগে এমন কোন রসিকতা করিনি। তাই ও আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিল।

ওমপ্রকাশের বাবা কুন্দনপ্রকাশ একটি পেট্রল পাম্পের মালিক। অত্যন্ত রাশভারি এবং ব্যস্ত লোক। বছরের অধিকাংশ সময়ই উনি বাইরে বাইরে কাটান। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং গাম্ভীর্য এমনই যে তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের তুলনা করা চলে। সামনে দাঁড়াতে ভয় হয়, কথা বলতে রোমাঞ্চ।

ওমপ্রকাশের মা নেই। তবে একটি বোন আছে। নাম নীতা। খুব ভালো বাংলা বলতে পারে। বাংলা স্কুলে লেখাপড়া করে। ভালো মেয়ে। আমাকে ঠিক ওর নিজের দাদার মতোই ভালবাসে। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি মিষ্টি ওর ব্যবহার। প্রতিবছর ভাইফোঁটার দিন ও আমাকে আমাদের প্রথামতো ফোঁটা দেয়। আর আমি ওকে প্রতিবছর একটি করে বাজারের সেরা ডায়েরি উপহার দিই। সেই ডায়েরিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে ও ওর দিনলিপি লিখে রাখে। ফুটফুটে কিশোরী মেয়েটি শিক্ষায়দীক্ষায় রূপেগুণে সবার সেরা।

সেদিন দুপুরে কহকর্মীদের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় অফিসারের ঘরে হঠাৎ একটি ফোন এল। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে 'হ্যালো' করতেই পিনপিনে কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"আমি ওমপ্রকাশ বলছি।"

"অম্বর চ্যাটার্জি স্পিকিং।"

"অম্বর! তুই ভাই এক্ষুনি একবার আমাদের বাড়িতে চলে যা। নীতা তোকে একটা জিনিস দেবে। সেটা নিয়ে তুই একটুও দেরি না করে সোজা ধানবাদে চলে যাবি। সেখানে গোলার মোড়ে আমার নাম করে যে তোর কাছে আসবে তুই ওটা দিয়ে দিবি তাকে।"

আমি দারুণ বিস্মিত হয়ে বললাম, "তুই কোথা থেকে ফোন করছিস ওম হ্যাল্লো...!"

আর কোন উত্তর এল না। রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনতে পেলাম।

মনে কেমন একটা খটকা ধরে গেল। এইরকম ফোন এর আগে আর কখনো আসেনি আমার কাছে। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এখুনি না হয় ওর বাড়িতে আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু নীতা কী দেবে আমায়? কী দিতে পারে? সেটা কী এমন মহামূল্য বস্তু যা নিয়ে এখুনি আমাকে ধানবাদে যেতে হবে? ভেবে কোন কূল পেলাম না। ধানবাদের ওপর দিয়ে এর আগে অনেকবার গেছি, তবে নামিনি কখনো। গোলার মোড় কতদূরে তা জানি না। নামটা যদিও শোনা, তবু ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। আমি কিছুই বুঝতে না পেরে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম।

অফিসে আমার সঙ্গে পদস্থ অফিসার ও সহকর্মীদের কেন জানি না এক মধুর সম্পর্ক আমার অজান্তেই গড়ে উঠেছে। ওরা আমাকে এত বেশি ভালবেসে ফেলেছে যে আমার একটা মৌখিক আবদারের আধিপত্য বিস্তৃত হয়ে গেছে ওদের মধ্যে। তাই আসা-যাওযাব ব্যাপারে অবাধ একটা স্বাধীনতা আমি অর্জন করে ফেলেছি। যাই হোক, সহকর্মীদের বলে আমি প্রথমেই চলে এলাম মৌড়িগ্রামে আমার নিজের বাসায়।

সম্প্রতি আমি নিজের জন্য একটি স্থায়ী আস্তানা তৈরি করেছি এখানে। চার কাঠা জমির চারদিকে গাছপালা লাগিয়ে মধ্যিখানে নিজের জন্য একটি মাঝাবি ধরনের ঘর তৈরি করেছি। অ্যাটাচড্ বাথ। সুগৃহ। এখানে আমার ঠাণ্ডা মাথার কাজগুলো বেশ নির্বিঘ্নেই হয়। ঘরে এসে জামাকাপড় বদলে গুপ্তস্থানে রাখা অটোম্যাটিকটাও সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে এলাম নীতাদের বাড়ি—শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনের কাছে ওদের মার্বেল প্যালেসে।

দরজায় ডোর-বেল টিপতেই নীতা এসে দরজা খুলে দিল। ওর মুখ কেমন যেন থমথমে। আচমকা দেখলে মনে হবে, কোন ভারি অসুখ থেকে উঠেছে। পূর্ণিমার চাঁদে গ্রহণ লাগলে যেমন হয় ঠিক তেমনটি।

"ওম কোথায়?" আমি যেন কিছুই জানি না এমনভাবে প্রশ্ন করলাম ওকে।

নীতা আমার সে কথার উত্তর না দিয়ে ম্লানমুখে আমাকে একটা সোফায় বসতে বলে তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর থেকে একটা অ্যাটাচি বার করে আনল। তারপর সেটা আমাব হাতে দিয়ে বলল, "দাদার ফোন পেয়েছেন নিশ্চয়ই! না পেলে এই ভরদুপুরে অসময়ে আসতেন না!"

"হ্যাঁ পেয়েছি।"

"তাহলে এটা যাকে দেবার দিয়ে দেবেন। আর. ।"

"আর? এ কি! তোর মুখ এমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল কেন? তোর চোখে জল, কী হল তোর?"

নীতা অবরুদ্ধ কান্নাকে চেপে রাখবার বৃথা চেষ্টা করে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'পারেন তো দাদাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন।"

"তার মানে?"

নীতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "দাদার খুব বিপদ।"

"বুঝেছি। তোর বাবার খবর কী?"

"বাবা এখনো ফেরেননি গোয়া থেকে।"

"কিন্তু ব্যাপার কী নীতা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!"

নীতা অপলকে আমার মুখেব দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তাবপর আবার এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেইরকম কান্নাধরা গলায় বলল, "বেল্‌চেম্বার।"

নামটা শুনেই আঁতকে উঠলাম আমি, "স্ট্রেঞ্জ। কিন্তু তার সঙ্গে ওমের সম্পর্ক কী?"

"আছে আছে। বেলচেম্বার আমাদের দীর্ঘদিনের শত্রু। আমার দাদাকে ও কিডন্যাপ করেছে। এই অ্যাটাচিটা হল দাদার মুক্তিপণ। এর ভেতরে যা আছে তা পেলেই ছেড়ে দেবে ও।"

"তা কী করে সম্ভব? আজ থেকে দশ বছর আগে যে লোক জেল ভেঙে পালাতে গিয়ে জেলরক্ষীদের গুলিতে মারা গেছে সে কী করে তোব দাদাকে গুম করবে নীতা? আমার মনে হয়, কোথাও তোদের মস্ত একটা ভুল হচ্ছে। নিশ্চয়ই তোরা অন্য কোন চিটারের হাতে পড়েছিস!"

মরা চাঁদের মতো ম্লানমুখে একটু হাসল নীতা। তারপর বলল, "বেলচেম্বার মারা যায়নি অম্বরদা।"

"ইম্‌পসিবল্‌! পুলিশ রিপোর্ট বলছে সে মারা গেছে।"

"সবাই তা জানে, আমরাও জানতাম। কিন্তু পুলিশ রিপোর্টে বেলচেম্বার মৃত বলে ঘোষিত হলেও সে মরেনি। ওর মৃত্যু নেই। ও কখনো বাংলাদেশে, কখনো পাকিস্তানে, কখনো নেপালে, কখনো অন্যদেশে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। আর মাঝে মধ্যে এখানে এসে আমাদের মতো কিছু লোককে জ্বালাতন করে।"

বেলচেম্বারের নামে আমার কপালে ঘাম দেখা দিল। রাগে ফুলে উঠল রগের শিরাগুলো।

কলকাতার রিপন স্ট্রীটের একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবারের এক বিপথগামী যুবক বেলচেম্বার। চুরি ডাকাতি স্মাগলিং খুন কিছুই ওর কাছে কঠিন নয়। একসময় কলকাতার বাঘা বাঘা পুলিশকেও ঘামিয়ে তুলেছিল সে। একবার মেট্রোর সামনে এক সিন্ধি দম্পতিকে খুন করার অভিযোগে বহু চেষ্টার পর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এসব বছর দশেক আগেকার কথা। সেই সময় কিছু দুষ্কৃতী জেল ভেঙে পালাতে গেলে জেলরক্ষীরা গুলি চালায়। বেলচেম্বার তখনই জেলরক্ষীদের গুলিতে মারা গেছে বলে জানত সবাই। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ তার এই আবির্ভাব অপরাধ জগতে এক অশনিসংকেত ছাড়া কিছুই নয়। যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে নীতার কাছ থেকে অ্যাটাচিটা নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এতে কী আছে রে?"

নীতা চুপ করে রইল।

"বল আমাকে?"

"দাদার মুক্তিপণ।"

"সে তো জানি। কিন্তু এর ভেতরে কী আছে বলবি না? আমার কাছে কিছু লুকোস না নীতা। তোদের ভালোর জন্যই বলছি।"

নীতা তবুও নীরব। ভয়ে বিব্রত বোধ করতে থাকে। কী যেন বলি-বলি করে, কিন্তু বলতে পারে না।

আমি ওকে অভয় দিয়ে বললাম, "কোন ভয় নেই তোর। এই গোপনীয়তা আমি রক্ষা করব। তোর এই দাদাটার ওপর সেটুকু ভরসা অন্তত রাখতে পারিস।"

জলমগ্ন ব্যক্তি যেভাবে অন্যের সাহায্য চায় নীতা ঠিক সেইভাবেই বলল, "অম্বরদা, আমার দাদাকে বাঁচান!"

আমি সান্ত্বনার সুরে বললাম, "বোকা মেয়ে! বাঁচাবো বলেই তো এসেছি আমি। নইলে কে আসত এই ভরদুপুরে?"

"আপনি পুলিশে খবর দেবেন না তো?"

"না। পুলিশের সঙ্গে আমার কাজকর্ম হয় ঠিকই, তবে সব ব্যাপারে আগেভাগে আমি পুলিশকে জানাই না। তাতে অনেকসময় পাকা ঘুঁটিও কেঁচে যায়।"

"এই অ্যাটাচিতে আমার মায়ের অনেক দামী দামী গয়না আছে। আর আছে দশ হাজার টাকা।"

"হুম। এইটা তাহলে আমাকে নিয়ে যেতে হবে, এই তো?"

"ঠিক তাই।"

"তোর দাদাকে বেলচেম্বার কোথায় কিভাবে ধরল কিছু অনুমান করতে পারিস?"

"পারি। দাদা একটা দরকারি কাজে বরাকর গিয়েছিল। মনে হয় সেখানেই ওর খপ্পরে পড়ে যায়।"

"বেল কি ওই অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়েছে?"

"তা ঠিক জানি না তবে ওই অঞ্চলে এবং বাজারাপ্পার আশপাশেই মাঝে-মধ্যে দেখা যায় ওকে।"

আমি কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে একমনে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলাম।

নীতা বলল, "আপনার ট্রেনের সময় হয়ে আসছে অম্বরদা! আপনি কোলফিল্ডে যাবেন তো?"

"না। আর একটু দেরি করে কালকায় যাব। কিন্তু নীতা, আমার যে আরো কিছু জিজ্ঞাস্য আছে!"

নীতা ঘামছে। ঘামবে নাই বা কেন? কতই বা বয়স ওর? তেরো কি চোদ্দ! এখনো ফ্রক চুড়িদার পরে। ভয়ে ফ্যাকাসে মুখে আঠা-জড়ানো গলায় বলল, "বলুন কী জানতে চান?"

"তোর বাবা তো দীর্ঘদিন কলকাতার বাইরে আছেন। এইসময় ওমের এমন কী কাজ পড়ল বরাকর যাবার? বিশেষ করে তোকে এই বাড়িতে একলা রেখে? ওমের মুক্তিপণ চেয়ে বেলচেম্বারই যে এইসব দাবী করছে তারই বা প্রমাণ কী? আর...।"

"আর কী জানতে চান বলুন?"

"অত টাকা ওম চাওয়ামাত্র তুই-ই বা পেলি কোথায়?"

নীতা এবার ধপ করে সোফার ওপর বসে পড়ল। তারপর বলল, "বলব বলব। সব কথা খুলে বলব আপনাকে। আর না বলে উপায় নেই। আপনাকে না জানালে ওদের এই জাল থেকে আমরা কিছুতেই কেটে বেরোতে পারব না।"

আমি সস্নেহে নীতাকে বললাম, "দেখ নীতা, আমার বোন নেই। তুই আমার বোনের মতো। শুধু বোনের মতো কেন, একমাত্র বোন। তোদের পরিবারের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের যোগাযোগ। কাজেই তোদের কোন বিপদ হলে আমি জীবন দিয়ে লড়ব। পেশাদার না হলেও গোয়েন্দাগিরিতে আমার যথেষ্ট সুনাম আছে। থানা-পুলিশও সেই সূত্রে হাতের

মুঠোয়। এখনো চেষ্টা করলে হয়ত কিছু করা যাবে। খুলে বল তো ব্যাপারটা কী?''

দেওয়ালে একটা টিকটিকি তখন একটা আরশোলাকে ধরবার জন্য এগোচ্ছে।

নীতা বলল, ''অম্বরদা, আপনি তো জানেন আমার বাবা একটি পেট্রল পাম্পের মালিক। এবং বাবা বছরের প্রায় বেশির ভাগ সময়ই এখানে ওখানে ঘোরেন। আসলে বাবার এই ব্যবসাটা ছাড়াও অন্য একটা ব্যবসা আছে।''

''কী সেই ব্যবসা?''

একটু চুপ করে থেকে নীতা বলল, ''আমার বাবা একজন জুয়েল থিফ। পাকা স্মাগ্‌লার। কেউ তা জানে না। হীরের চোরাচালানে আমার বাবা...।'' বলেই আমার দিকে আরো এগিয়ে আসতে গেল যেই অমনি অস্ফুট একটু আর্তনাদ করে সোফার ওপর গড়িয়ে পড়ল নীতা। চোখের পলকে দালানের জানলার দিক থেকে বুলেট এসে মাথাটাকে চুরমার করে দিয়েছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম ওধারে।

গিয়ে দেখলাম ভেতরের দরজায় শিকল দেওয়া। অতএব পাশের ঘরে ঢুকে অপর একটি দরজা খুলে যখন ওধারে পৌঁছলাম পাখি তখন ফুরুৎ।

শুধু কয়েকটি ভারি বুটের ছাপ, একটি মরা বোলতা, একটি রুমাল আর একটি ডট পেন ছাড়া কিছুই সেখানে নেই।

জুতোর ছাপ পুলিশে নেবে। কিন্তু এই রুমাল আর ডট পেনটা? হ্যাঁ, এ দুটোই খুব বেশি কাজে লাগবে আমার। সম্ভবত উত্তেজনায় ঘাম মুছতেই রুমালটা বের করেছিল আততায়ী। আর রুমাল বার করতে গিয়েই অসতর্কতায় পড়ে যায় পেনটা।

আমি নীতার কাছে এলাম।

ওর দেহটা তখন একেবারেই নিথর হয়ে গেছে।

ওর এই শোচনীয় মৃত্যুতে চোখে জল এল আমার। ও যে আমার বোন, আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনে একটিমাত্র বোন পেয়েছিলাম—তাকেও হারালাম। এ দুঃখ কী কম! আর কোন ভাইফোঁটায় ওর এই শুভ্রসুন্দর মুখে নির্মল জ্যোছনার হাসি দেখতে পাবো না। ওর হাতের ওই চম্পাকলির মতো আঙুলের ফোঁটা আমার কপালে আর কখনো চাঁদ আঁকবে না। আমার বুকটাকে খালি করে চলে গেল ও!

ওর সারামুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কতকটা যেন নিজের মনেই বললাম, এই হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবোই নীতা। যদি এই হত্যাকারীকে আমি ধরতে না পারি, তাহলে জেনে রাখিস, এই আমার শেষ গোয়েন্দাগিরি।

নীতাদের বাড়িতে টেলিফোন ছিল।

আমি রিসিভার তুলে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলাম, ''হ্যালো, পুলিশ স্টেশন? অম্বর চ্যাটার্জি স্পিকিং...''

ওয়ান আপ দিল্লি কালকায় ফার্স্ট ক্লাসের এম.জি. এস কোচে রান করছি। রাতের অন্ধকার ভেদ করে ট্রেনটা যেন উল্কার বেগে ছুটছে। ছোটার গতিতে অসম্ভব দুলছে ট্রেন। এক এক সময় মনে হচ্ছে ট্রেনটা দুলুনির চোটে এখুনি বুঝি ছিটকে পড়বে লাইন থেকে

আমার হাতে নীতার দেওয়া অ্যাটাচিটা আছে। ওটা বেশ শক্ত করেই ধরে রেখেছি আমি। কেননা আমার এই যাত্রার কারণে এইটাই সবচেয়ে মূল্যবান।

ট্রেনের দুলুনিতে দুলে দুলে বার বার নীতার কথাই মনে পড়ছিল আমার। কী সুন্দর ফুলের মতো মুখ। অমন পবিত্র নিষ্পাপ ঢলঢল কচি মুখ খুব কমই দেখেছি আমি। ওর ভদ্র সভ্য মার্জিত ব্যবহার আমাকে দারুণ মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু নিঠুর নিয়তি অকালেই ঝরিয়ে দিল তাকে। একটু আগেও জানতে পারিনি বিধাতাপুরুষ অমন নির্মম পরিহাস করবেন বলে। মৃত্যুরূপী মহাকাল যে অতি সন্তর্পণে এসে এক লহমায় ছিনিয়ে নেবে ওকে তা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। নীতার সেই অস্ফুট আর্তনাদ, ওর সেই লুটিয়ে পড়া, রক্তে ভাসা মুখ বার বার মনে পড়ল আমার। একটা প্রতিশোধের স্পৃহা আমার মনের মধ্যে এমনভাবে তোলপাড় করতে লাগল যে উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগলাম আমি।

ট্রেন ছুটছে। স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। মনকে শক্ত করে ধৈর্য ধরে তবুও বসে রইলাম। কেননা এখুনি আমার ভেঙে পড়লে চলবে না, ওমকে বেলের খপ্পর থেকে উদ্ধার করতেই হবে। তারপর টুঁটি ধরে টেনে আনব নীতার হত্যাকারীকে। ট্রেনে ওঠবার আগে একবার ভেবেছিলাম ওমের ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়ে আসি। কিন্তু ভেবেও তা করলাম না, কারণ রঙ্গমঞ্চ স্টেটের বাইরে। ওখানকার পুলিশকে জানালেও বিশেষ কোন সুবিধা হত না। তাছাড়া ওই ব্যাপার নিয়ে পুলিশ হয়তো কাজ দেখাবার জন্য চারদিক তোলপাড় করে অযথা এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসত যা ওমের মুক্তির ব্যাপারে খুবই ক্ষতিকর হত। তাই কোনরকম ঝুঁকি না নিয়েই শুধুমাত্র সাহসে ভর করে এগিয়ে চললাম এই কাজে।

মধ্যরাতে ধানবাদে নেমে গোলার মোড়ে যাবার কোন ব্যবস্থাই করতে পারলাম না। গোলা যে কোথায় কতদূরে তা জানা ছিল না। অনুসন্ধানে জানলাম গোলা এখান থেকে নব্বুই কিলোমিটারেরও বেশি পথ। এই রাতে ওই পথে যাবার কোন পরিবহনই নেই।

হতাশ হয়ে স্টেশনের ওয়েটিংরুমে ফিরে আসতে যাচ্ছি যখন তখন হঠাৎ একটি ট্রাকের সন্ধান মিলল। সেটা যাচ্ছিল রামগড়ের দিকে। হাজারিবাগ জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান রামগড়। কয়লাখনি অঞ্চলের জন্যও গোলা বিখ্যাত। যাই হোক, ড্রাইভারকে কিছু টাকা 'রসগুল্লা খানেকে লিয়ে' দিতেই ড্রাইভার আমাকে তার পাশে বসিয়ে নিতে রাজি হল।

আমি উঠে বসতেই ট্রাক ছাড়ল।

ঝড়ের গতিতে রাতের অন্ধকারে ছুটে চলল ট্রাক।

এই অঞ্চলে চারদিকে বন পাহাড় আর পথের ধারে অগণন কয়লাখনি। বিহারের এই অঞ্চলের তাই এত নামডাক। চারদিকে আগুন আর কালো কয়লার ধোঁয়া।

কাঁচা কয়লা পুড়ছে কত। এক জায়গায় দেখলাম আলোয় আলো চারদিক।

ড্রাইভার বলল, "রাস্যো ইন্দো ভেঞ্চার।"

"তার মানে??"

"বোখারো ইস্পাত কারখানা। দেখছেন না কী দারুণ শিল্পযজ্ঞ চারদিকে। যেন অলকাপুরী!"

ট্রাক বোখারোর সীমানা ছাড়িয়ে আরো অনেকদূর গিয়ে এক জায়গায় থামল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল? থামলে যে?"

"গোলার মোড়ে নামবেন যে আপনি! এই তো এসে গেছেন!"

জায়গাটা ঘন অন্ধকারে ঢাকা।

ড্রাইভার বলল, "এত রাতে কোথায় যাবেন?"

"কোথাও না। এইখানেই আমার দরকার।"

"বেশ নামুন তবে। এই দেখুন, ডানদিকেব পথটা চলে গেছে রাজারাপ্পায়, আর বাঁদিকের পথ রামগড় হয়ে রাঁচিতে। এখন আপনার যেখানে মন চায় যান।"

আমি ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই ঘন অন্ধকারে অ্যাটাচি হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম সাহসে ভর করে।

জায়গাটা ঠিক কিরকম তা বুঝতে পারলাম না। তবে চারদিকে বেশ বড় বড় গাছপালা আছে বুঝতে পারলাম। স্থান নির্জন হলেও মাঝে-মধ্যে দু'চার মিনিট অন্তরই দ্রুত দ্রুতগতি ট্রাকের আনাগোনাও আছে। তাড়াতাড়িতে টর্চটা আনতে ভুলে গেছি, তাই কোনদিকে যে কী আছে কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা ভটভট শব্দ আমার কানে এল। শব্দটা আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে তুলল যেন। গা-টা শিরশির করতে লাগল।

একটু সন্ধানী দৃষ্টি, তারপর একটা মোটর বাইকের হেডলাইটের আলো রোডের ওপর দেখতে পেলাম। সেই সঙ্গে ভট ভট ভট ভট।

মোটর বাইকটা ঠিক আমার সামনেই এসে থামল। বাইকের আরোহী একজন বলিষ্ঠ চেহারার কালো পোশাক পরা লোক। কোনরকমেই তার মুখ দেখে বোঝবার উপায় ছিল না সে কে।

আগন্তুক আমাকে বলল, "আর ইউ রিপ্রেজেন্টেটিভ অব মিঃ মাকিন?"

"ইয়েস মিঃ বেলচেম্বার।"

'ননসেন্স! বেলচেম্বার হ্যাজ বিন ডেড টেন ইয়ার্স এগো। আয়্যাম জন হেন্ডরিক। লিডার অব মাই পার্টি।"

আমার হাতটা তখন ধীরে ধীরে পকেটের ভেতর ঢুকছিল।

আগন্তুক বলল, "ডোন্ট টাচ এনিথিং ইন ইয়োর পকেট জেন্টল্ম্যান! আপনার পকেটে যে জিনিস রাখিয়াছেন ও জিনিস হামার পকেটেও আছে। তাছাড়াও এই অন্ধকারে হামার আরো দুইজন লোক পিস্তল রেডি করিয়া তাকাইয়া আছে আপনার দিকে। ইফ ইউ ডিস্টার্ব মি, ও লোক গোলি করিয়া ডিবে। প্লিজ গিভ মি দ্য অ্যাটাচি অ্যান্ড গো ব্যাক সুন।"

আমি অ্যাটাচিটা এগিয়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করলাম, "বাট হোয়্যার উজ মাই ফ্রেন্ড?"

উত্তর এল, "আই ডোন্ট নো!"

আগন্তুক হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে অ্যাটাচিটা নিয়েই বাইকে স্টার্ট দিল।

আমিও অমনি হিতাহিত ভুলে পেছনদিক থেকে বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ঘাড়ে। সেই মুহূর্তে আমি ভুলে গেলাম আমার পেছনদিকে পিস্তল উঁচিয়ে থাকা আরো দুজন লোকের কথা। তবে এটুকু বুঝলাম এই অবস্থায় গুলি চালাতে কিছুতেই সাহস করবে না ওরা।

শুরু হল প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি।

কী অমানুষিক শক্তি ওর গায়ে!

আমাকে এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে বাইক নিয়ে পালাল সে। আমি পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম।

তবুও হাল না ছেড়ে শুয়ে দু'হাতে অটোমেটিকটা শক্ত করে ধরে পলাতকের উদ্দেশে গুলি ছোটাতে লাগলাম।

প্রথম দুটো ফসকে গেলেও তৃতীয়টা ফসকালো না। দূর থেকে 'আঃ' করে একটা আর্তনাদ আমি শুনতে পেলাম।

এমন সময় আমার মাথার ওপর দিয়ে সশব্দে একটা বুলেট ছুটে গেল।

এতক্ষণ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ওই দুজন লোকের কথা। যারা নাকি আড়াল থেকে আমাকে লক্ষ্য করছে।

আমি চোখের পলকে শোলমাছের মতো পিছলে অন্ধকার খাদে নেমে গেলাম। তারপর পিছু হটে নিজেকে নিরাপদ করলাম একটা গাছের আড়ালে গিয়ে। তবে যাবার আগে 'আঃ' করে মিথ্যে একটা আর্তনাদ করে যেতেও ভুললাম না। যাতে ওরা মনে করতে পারে ওদের গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

এমন সময় ঝড়ের বেগে রাস্তার ওপর দিয়ে একটা ট্রাক অন্ধকার বিদীর্ণ করে হারিয়ে গেল।

তারপরই দেখলাম দুজন লোক রাস্তায় নেমে এসে টর্চের আলোয় কী যেন খুঁজছে।

বুঝলাম আমাকেই খুঁজছে ওরা।

আমরা আর্তনাদ ওদের কানে গেছে। তাই ওরা আমার হত বা আহত শরীরটাকে একবার দেখতে চায়।

এমন সময় অপরদিক থেকে আসা আরো একটি দ্রুতগামী ট্রাকের হেডলাইট ওদের গায়ে পড়তেই সুবিধে হল আমার। আমি সেই গাছের আড়াল থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে ওদের জন্য দুটি গুলি খরচ করলাম। দুটি গুলিই ওদের অসতর্কতার জন্য ঠিক বুকের মাঝখানে গিয়ে লাগল ওদের।

দুজনেই লুটিয়ে পড়ল পথের ওপর।

এদিকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসা ট্রাকও গতিক সুবিধের নয় বুঝে গতিবেগ একটুও না কমিয়ে ডেড বডির ওপর দিয়েই চালিয়ে দিল।

সে এক বীভৎস দৃশ্য।

অমন দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। দেখে গা শিউরে উঠল আমার। নরকেও এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখা যায় না বুঝি। রাস্তার বেওয়ারিস কুকুরগুলো চাপা পড়লে যেমন পিচের ওপর থেঁৎলে যায়, ঠিক সেইভাবেই ওদের মুখ দুটো থেঁতো হয়ে পিচে কামড়ে একাকার হয়ে গেছে।

আমি কোনরকমে ওদের দেহ দুটো টেনে রাস্তার পাশে খাদে নামালাম। তারপর ওদের দুজনের দুটো রিভলবার আর টর্চ সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলাম আমার শিকারের দিকে। নিশ্চয়ই পথের ধারে কোথাও বাইক নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সে।

আমি টর্চ না জেলে অন্ধকারেই গাছপালার ছায়ার আড়ালে এগোতে লাগলাম।

এখানে পথের দু'পাশে বনজঙ্গল পাহাড় বা ফাঁকা মাঠ কী যে আছে তা ঠিক বুঝতে পারছি না। চারদিকেই অন্ধকার আর অন্ধকার। এই অন্ধকারে অভিযান করতে গিয়ে বার

বার বেচারী নীতার কথা মনে পড়তে লাগল আমার।

বেলের দুজন লোক নিহত হলেও আসল লোককে তো ধরতে পারলাম না।

আর ওম? যাকে উদ্ধার করতে এখানে আসা সেই বা কোথায়?

পাছে ওমের কোন ক্ষতি হয় সেই ভয়ে আমি পুলিশকে পর্যন্ত কিছু না জানিয়ে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু যে ভয় করলাম তাই হল। অর্থাৎ আমি অনেক বুদ্ধি ধরেও বেলচেম্বারের বুদ্ধির প্যাঁচে চমৎকারভাবে প্রতারিত হলাম। মন মেজাজ দারুণ খিঁচড়ে গেল। রাগে দুঃখে ক্ষোভে নিজের মাথার চুল নিজেরই ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করল। কেন যে অমন বোকামি করলাম। অথচ এছাড়া উপায়ই বা কী ছিল?

আমি বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে আসার পরও সেই মোটর বাইক কিংবা আহত কাউকেই দেখতে পেলাম না। তবে এখানে এক জায়গায় বড় বড় কয়েকটি পাথরের আড়াল রয়েছে দেখলাম। যেখানে স্বচ্ছন্দে আত্মগোপন করা যায়। আমি এইরকম একটি পাথরের আড়াল বেছে নিয়ে টর্চের আলোয় চারদিক দেখতে লাগলাম।

না, কোথাও কিছু নেই।

তবু প্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে এক হাতে অটোম্যাটিকটা শক্ত করেই ধরে রইলাম। বলা যায় না, আমার গুলিতে বেল যদি সত্যিই না মরে থাকে তাহলে আহত সিংহ সে, আমার জন্য সে অপেক্ষা করবেই। এবং অলক্ষ্য হতে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে একটুও দ্বিধাবোধ করবে না।

যা ভাবলাম তা অবশ্য ঘটল না যদিও, তবুও নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমি সেই বড় বড় পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে টর্চের আলোয় চারদিক লক্ষ্য করতে করতে এগোতে লাগলাম।

হঠাৎ টর্চের আলোয় এক জায়গায় কিছু রক্তের দাগ আমার চোখে পড়ল। সেই দাগ লক্ষ্য করে একটু এগোতেই দেখলাম আমার আনা সেই অ্যাটাচিটা একপাশে পড়ে আছে। আর তার পাশেই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে ওমপ্রকাশ। রক্তে ওর সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে।

আমি ছুটে গিয়ে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলাম, "ওম!"

কোন সাড়া পেলাম না।

গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, গা একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা না হলেও প্রাণহীন নিস্পন্দ নিথর দেহ।

আমার সব যেন কিরকম গোলমাল হয়ে গেল।

অ্যাটাচিটা চাবিসমেত পড়েছিল। তাড়াতাড়ি সেটা খুলে যা দেখলাম তা দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। দেখলাম হীরের নেকলেসসহ বেশ কিছু সোনার গহনা ও কয়েক বাণ্ডিল টাকা রয়েছে তাতে। যা আমি ওমের মুক্তিপণ হিসেবে অতদূর থেকে বয়ে এনেছিলাম।

এখন রহস্যটা এই, ওমের হত্যাকারী কে?

মোটর বাইকে চেপে আমার কাছ থেকে অ্যাটাচিটা আনতে কি ওমই গিয়েছিল ছদ্মবেশে? ওম কি তাহলে আমারই গুলিতে মৃত্যুবরণ করেছে? নাকি স্বয়ং বেলচেম্বারই ওমের হত্যাকারী? তা যদি হয়, ওমের হাত থেকে ওই অ্যাটাচিটা নিয়ে যেতেই বা সে

ভুলল কেন?

আমার প্রথম চিন্তাটা অবান্তর। কেননা ওম ছদ্মবেশে আমার কাছে কিসের স্বার্থে আসবে এবং কেনই বা আসবে? আমি গুলি করেছিলাম পেছনদিক থেকে, কিন্তু ওমের আঘাত বুকে। তাছাড়া আমার গুলিতে ওমের মৃত্যু হলে বাইকটাও কাছাকাছি পড়ে থাকত।

এখন ভাবা যেতে পারে ওম কোনরকমে বেলের খপ্পর থেকে নিজেকে উদ্ধার করে এখানে এসে লুকিয়ে থাকে এবং আমার গুলিতে আহত বেল এই পথে আসার সময় ওম তাকে আক্রমণ করে অ্যাটাচিটা ছিনিয়ে নেয়। এইসময়ই বেলের গুলিতে ওম নিহত হয়। কিন্তু ওমের আঘাতে বেল এমনই আহত হয় যে এখান থেকে পালাবার সময় এই অ্যাটাচিটা নিয়ে যাবার মতো মনোবলও সে হারিয়ে ফেলে! অথবা এর ভেতরে যা কিছু আছে তার সবই নকল! আবার এও হতে পারে, হয়তো অদূরেই কোথাও বেলের মৃতদেহ পথের ধারে পড়ে আছে।

যাই হোক, আমি নিজেকে বিপন্ন করবার জন্য আর এই অচেনা জায়গায় অযথা অনুসন্ধান করতে না গিয়ে নিকটবর্তী থানায় আমার পরিচয়পত্র দেখিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করলাম। তারপর অ্যাটাচিটাও জমা দিয়ে ভোরবেলা রাঁচী হয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়।

বাড়ি ফিরেই আমি পুলিশের সাহায্য নিয়ে সর্বপ্রথম নীতাদের মার্বেল প্যালেসে গেলাম। রাতারাতি একটি পরিবার যে কিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম আমি। এই সাদা বাড়ি যে একদিন কালো অন্ধকারে ডেকে যাবে তা কে জানত?

নীতাদের বাড়ি এখন পুলিশের হেফাজতে।

পুলিশ তালা খুললে বাড়িতে প্রবেশ কবলাম।

এরপর অনুসন্ধিৎসু চোখে তন্ন তন্ন করে চারদিক খুঁজতেই একসময় পেয়ে গেলাম আমার ইপ্সিত বস্তুটি। অর্থাৎ নীতার ডায়েরিটা। যেটা এইবছরই আমি আমার প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ উপহার দিয়েছিলাম নীতাকে।

সোফায় বসে ডায়েরির পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় এসে থেমে গেলাম। প্রবল উত্তেজনায় কপালে ঘাম দেখা দিল আমার।

নীতা লিখেছে...''বাবা তো চিরকালই ওইরকম। অত ভালোমানুষ তবু কেন ওইসব করে বেড়ান তা জানি না! আমাদের কী টাকার অভাব?

'এতদিন জানতাম বেলচেম্বার মরে ভূত হয়ে গেছে। কিন্তু এখন শুনছি সে জীবিত। তাহলে উপায়? ওর মৃত্যুসংবাদ কি তাহলে ভুল প্রচারিত হয়েছিল? দাদার মুখে শুনলাম, বেল নাকি আমাদেরই এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গা-ঢাকা দিয়েছিল। এখন জন হেনড্রিক নাম নিয়ে আবার ফিরে এসেছে। রাজারাপ্পার জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়েছে সে।'

এরপর আবার কয়েকটি পাতা উল্টে এক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম—

'বেল আমাদের চিরশত্রু। শয়তানটাকে আমি একদম সহ্য করতে পারি না। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন একবার ও আমাকে দুদিন লুকিয়ে রেখেছিল। ওঃ, সে কী কষ্ট! তারপর প্রচুর অর্থ এবং বাবার স্মাগলিং বিজনেসের পার্টনারশিপের বিনিময়ে আমাকে মুক্তি দেয়। বেলের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হবার পর ভেবেছিলাম বাবা হয়তো একটু শোধরাবেন, কিন্তু না, দিনের পর দিন বাবা আরো বেশি অর্থ-লোলুপ এবং আরো অসামাজিক কাজে

লিপ্ত হতে লাগলেন। অথচ দাদা কত ভালো। কিন্তু ইদানীং দাদাকেও আমার সন্দেহ হচ্ছে দাদা কেন যে জেনেশুনে বেলের এলাকায় যায়? তবে কী...?'

অপর একটি পাতায় লেখা আছে—

'ইদানীং অম্বরদার এই বাড়িতে আসা-যাওয়াটা বাবা খুব একটা ভালো চোখে দেখছেন না। যেদিন থেকে অম্বরদা গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছেন সেদিন থেকেই বাবা অম্বরদাকে এড়াতে চাইছেন। অম্বরদার সঙ্গে বেশি কথা বললে বাবা আমাকেও বকেন। বাবার ধারণা, আমি হয়তো কথায় কথায় আমাদের গুপ্তকথা অম্বরদাকে বলে ফেলব অথবা অম্বরদা কথার প্যাঁচে আমার পেট থেকে কথা বের করে নেবেন। এত সোজা? উনি যতই কেন আপনজন হোন না, তবুও আমি কি এমন কাজ কখনো করতে পারি যার সুযোগ নিয়ে অম্বরদা বাবার হাতে হাতকড়া পরাবেন।'

ডায়েরির পাতায় আর এক জায়গায় লেখা আছে—

'দাদা আজ নিজের থেকেই বলল, আমি ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করছি বেলের দলে ভেড়বার। কেননা ওকে সরাতে না পারলে বাবাকে কনট্রোল কবা যাবে না। বেলচেম্বার জেলরক্ষীদের গুলিতে মরেনি বাবা এ কথা জানতেন। কিন্তু আমাদের কাছে প্রকাশ করেননি কখনো। যাই হোক, বেলকে আমি নিজেব হাতে খুন না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।'

ডায়েরিব যে অংশটার ওপব এবার আমার নজর পড়ল তা আরো গুরুত্বপূর্ণ। নীতা লিখেছে—

'ইদানীং দাদা খুব বিমর্ষ। প্রায়ই বলে, আমরা একটা চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়ছি নীতা। ভাবছি একবার অম্বরকে সব কথা খুলে বলি। আমাদের এই দারুণ বিপদে একমাত্র ওই হয়তো সাহায্য করতে পারে। কিন্তু বাবার মুখ চেয়ে পারছি না। কেননা এই পাপচক্রে বাবা এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছেন যে বাবাকে বাঁচানোর কোন রাস্তাই আর নেই। অথচ বাবার কিছু হওয়া মানেই আমাদের এই প্রতিপত্তি সব কিছুর ধ্বংস হয়ে যাওয়া। এক এক সময় ভয় হয়, বেল বাবাকেই না খুন করে। তবে ও যে আমাদের ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছে তা বেশ বুঝতে পারছি। তাই একটা অ্যাটাচিতে কয়েকটি নকল গয়না ও কিছু জাল নোট রেখে দিলাম। বেল হয়তো কোন না কোন সময়ে হয় তোকে, নয়তো আমাকে গুম করে কিছু মুক্তিপণ চেয়ে বসবে। আমি মনেপ্রাণে চাইছি ওই ভুলই ও করুক। যদি তোকে সরায়, তাহলে ওর মোকাবিলা আমিই করব। আর যদি আমাকে সরায়, তাহলে সোজা অম্বরের হাতে এই অ্যাটাচিটা তুলে দিয়ে সব কথা খুলে বলবি ওকে। ও নিশ্চয়ই তার পরের কাজটা খুব সুসংহত ভাবেই করবে এবং আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবে আমাদের।'

এরপর ডায়েরিতে অনেক কিছুই লেখা ছিল। সেগুলো অপ্রাসঙ্গিক। আমার কোন কাজে লাগবে না। শুধু এইটুকুই বুঝতে পারলাম, ওমপ্রকাশ দুঃসাহসিকতার জন্য বেলচেম্বারের ফাঁদে পা দিয়ে ওর খপ্পরে পড়ে। তারপর ওদেরই সাহায্য নিয়ে পূর্বপরিকল্পনামতো নীতাকে এবং আমাকে ফোন করে। আমি মুক্তিপণ নিয়ে যাই।

সম্ভবত এই মুক্তিপণ নিতে আসবার সময়ই সংঘর্ষ বাধে। এবং তখনই বেল হত্যা করে ওমকে। নাহলে ওমকে আমার হাতে তুলে দিয়েই বেল তার মুক্তিপণ আদায় করত। পরে আমার কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ফেরবার সময় আমার আক্রমণের আঘাতে

বুঝতে পারে আমরা ওর মোকাবিলার জন্য তৈরি। অতএব অ্যাটাচির মধ্যে যা কিছু আছে তা আসল নাও হতে পারে। এবার সে ওই পাথরের আড়ালে এসে ভেতরের জিনিসগুলো পরীক্ষা করতে দেখে এবং ভুয়া মাল বুঝতে পেরেই ফেলে দিয়ে চলে যায়। —এসবই আমার অনুমান। কেননা এছাড়া অপর কোন্ সিদ্ধান্তেই বা আসতে পারি আমি?

এ তো গেল একদিক।

কিন্তু বেল? বেলের কী হবে?

জেল-পলাতক এই নৃশংস কয়েদী একবার পালিয়ে বাঁচলেও বারবার কি সে অপরাধ করে পার পাবে? না, তা হয় না। হতে পারে না। এবং আমার মনে হয়, এবারে সে বেশিদূরে পালাতেও পারবে না। তার কারণ আমার গুলির জবাবে যে করুণ আর্তনাদ তার শুনেছি তা অভিনয় নয়। প্রাণে না মরলেও বেশ ভালোরকমই জখম হয়েছে সে। এতএব গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ডাক্তার বা হাসপাতালের শরণ তাকে নিতেই হবে।

কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, নীতার হত্যাকারী তাহলে কে? নীতার মৃত্যুর সঙ্গে বেলের কি সত্যিই কোন সম্পর্ক আছে? আমার তো মনে হয় না!

তবে কে? কে তাহলে নীতার হত্যাকারী?

পুলিশ জোর তদন্ত চালাচ্ছে হত্যাকারীকে ধরবার জন্য। আমিও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যেভাবেই হোক, নীতার হত্যাকারীকে আমি খুঁজে বার করবই।

এই ঘটনার প্রায় একমাস পরের কথা।

পুলিশের ফোন পেয়ে সোজা চলে এলাম মার্বেল প্যালেসে। কুন্দনপ্রকাশ মাকিন ফিরে এসেছেন। সেই বুদ্ধিদীপ্ত কর্মঠ বলিষ্ঠ মানুষটির আজ এ কী দশা! দেখে চেনবারও উপায় নেই। হতাশ হয়ে সোফায় গা এলিয়ে পড়ে আছেন।

স্ত্রী গত হয়েছেন বহুদিন।

দুটিমাত্র সন্তান। দুর্ভাগ্য তাদের দুজনকেই ছিনিয়ে নিয়েছে অকালে। নিয়তির পরিহাসে আজ তিনি সর্বহারা।

আমি আগের মতোই কাছে এসে বললাম, "কাকাবাবু, সব শুনেছেন তো? এত দেরি করে এলেন কেন আপনি?"

একটা অবরুদ্ধ কান্না যেন বুকে ফেটে বেরিয়ে এল কুন্দনপ্রকাশের। ওইরকম একজন মানুষ যে কাঁদতে পারেন, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বললেন, "কী থেকে কী হয়ে গেল আমার! ওমকে হারালাম, নীতাকে হারালাম। কিন্তু এভাবে যে হারাবো তা আমি ভাবতেও পারিনি। শয়তান বেল আমার সর্বনাশ করে চলে গেল!" বলে একটু থেমে, হাহাকারের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন কুন্দনপ্রকাশ। আমার চোখের দিকে চোখ রেখে বললেন, "পারবে? পারবে তুমি ওই শয়তানটাকে ধরতে? শুধু তুমি নও, যে পারবে আমার ছেলেমেয়ের হত্যাকারীকে ধরে দিতে, তাকেই আমি আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে দেবো।"

আমি আমার সঙ্গে আসা পুলিশের লোকেদের বললাম, "আপনারা যান। মিঃ মাকিনের সঙ্গে আমার একটু ব্যক্তিগত কথাবার্তা হবে।"

ওরা চলে গেলে কুন্দনপ্রকাশকে বললাম, "যদি আমিই ধরে দিই সেই হত্যাকারীকে, তাহলে?"

"তাহলে তোমাকেই দেবো। তাছাড়া তুমি তো আমার ছেলের বন্ধু। নীতার দাদা। এখন তুমি ছাড়া আমার কে আছে বলো! হত্যাকারী ধরা পড়লেই আমি সব তোমার নামে লিখে দিয়ে এখান থেকে চলে যাব।"

"সে কি।"

"হ্যাঁ। এই বাড়িতে আর আমার মন টিকছে না। ওদের হারিয়ে আর আমি কিছুতেই থাকতে পারছি না এ বাড়িতে। এখানকার সর্বত্রই যে ওদের স্মৃতিতে মাখা।"

আমি ম্লান হেসে বললাম, "তা অবশ্য ঠিক, এখানে আর থাকা যায় না।"

"এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব অম্বর।"

"এ বাড়িতে আজকাল আপনি এমনিতেই তো খুব কম থাকতেন, তাই না?"

"হ্যাঁ, ব্যবসার কাজে আমাকে সবসময় বাইরে বাইরে থাকতে হোত।"

"কিসের ব্যবসা আপনার?"

"পেট্রলের। কেন আমার পেট্রল পাম্প তুমি দেখোনি?"

"শুধুই কি পেট্রলের? তার সঙ্গে আর কিছুর নয়?"

"আর কিছুর! আর কিসের হবে?" বলে কুন্দনপ্রকাশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "নীতা কি তোমাকে কিছু বলেছে?"

"না। কারণ সে চায়নি আমার হাত দিয়ে তার বাবার হাতে হাতকড়া পড়ুক।"

কুন্দনপ্রকাশ সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকালেন।

আমি সেদিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে বললাম, "তবে অন্যসূত্রে আমি সবকিছু জেনেছি।"

ভয়ে কুন্দনপ্রকাশের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল।

আমি বললাম, "ভয় নেই কাকাবাবু, নীতার ইচ্ছা আমি পুরণ করব। তার বাবাব হাতে হাতকড়া পরাবো না। তবে তার হত্যাকারীকে আমি ধরবই।"

কুন্দনপ্রকাশ বললেন, "হ্যাঁ, ধরো। আমার যা কিছু সব আমি তোমাকে দিয়ে দেবো। এই মার্বেল প্যালেসটাই তোমার নামে লিখে দেবো আমি।"

আমি হেসে বললম, "এত বড় প্যালেস নিয়ে আমি কী করব? নিজেকে বিক্রি করেও যে এর ট্যাক্স দিতে পারব না।"

"তবু দেবো।"

"তার প্রয়োজন হবে না। কারণ কোন প্রাপ্তির বিনিময়ে আমি আমার বোনেব হত্যাকারীকে ধরতে চাই না। শুধু কর্তব্য এবং মনুষ্যত্বের খাতিরে তাকে ধরব। তবে কিনা ধরেও সেই হত্যাকারীকে ছেড়ে দেব আমি।"

"তুমি কি বলছ আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তোমার কথার ঘেরও পাচ্ছি না আমি। তুমি কী বলতে চাও ঠিক করে বলো তো?"

"আমি বলতে চাই তাকে ধরেও আমি পুলিশের হাতে তুলে দেব না। ফাঁসির মঞ্চে ওঠাব না। শুধু তার শাস্তি তাকে নিজেকে দিয়েই দেওয়াবো।"

"আমার সব কিছু কিরকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

"ও কিছু না। সব ঠিক হয়ে যাবে। কাকাবাবু, নীতার মুখ চেয়ে আপনি আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?"

"বলো কী অনুরোধ? নিশ্চয়ই রাখব আমি।"

"ঠিক তো?"

"তোমাকে কথা দিলাম।"

"তাহলে যে পিস্তল দিয়ে আপনি নীতাকে খুন করেছেন, সেই পিস্তল দিয়ে আগে নিজেকে শেষ করুন আপনি।"

"তার মানে? কী বলতে চাও তুমি?"

"আমি বলতে চাই আপনি এই মুহূর্তে স্যুইসাইড করুন। অবশ্য তার আগে আপনার অপরাধের কথাটা স্বীকার করে একটা কাগজে কিছু লিখে রাখুন আপনি।"

"এ তুমি কী বলছ?"

"হ্যাঁ কাকাবাবু, আপনার ভালোর জন্যই বলছি। বিবেকের দংশনে তিল তিল করে জ্বলে মরার চেয়ে, ফাঁসির দড়িতে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর লম্বা হয়ে ঝোলার চেয়ে এটা অনেক বেশি আরামের হবে। কপালের মাঝখানে নলটা একবার ঠেকিয়ে দিয়ে ট্রিগারটা একটু টিপে দেবেন শুধু। দেখবেন এত উৎকণ্ঠা, এত জ্বালা সব কেমন নিমেষ জল হয়ে যাবে। একটু কিছু লিখে রেখেই এ কাজ করুন। এতে পুলিশেরও হয়রানি বন্ধ হবে, অপনিও রেহাই পাবেন। অযথা জেলের ঘানি তো টানতে হবেই না, বরং আপনার আদরের মেয়ে নীতারও আত্মার শান্তি হবে।"

ঘরের মধ্যে সূচ পড়লেও তখন বুঝি শব্দ শোনা যেত। সে কী দারুণ নিস্তব্ধতা! দেওয়ালের ঘড়িটা শুধু টিক টিক করে বেজেই চলেছে।

কুন্দনপ্রকাশ মড়ার মতো মুখ করে বললেন, "এ তুমি কী বলছ অম্বর! আমি আমার আদরের নীতাকে খুন করেছি!"

"হ্যাঁ।"

"কোন বাবা কখনো পারে তার সন্তানকে এইভাবে হত্যা করতে?"

"না।"

"তাহলে? এই সত্য তুমি কখনো প্রমাণ করতে পারবে?"

"না। তবুও আমি আপনাকে এই কাজটি করতে বলব। আমি জানি, সবাই জানে, কোন বাপ কখনোই তার সন্তানকে সুস্থমস্তিষ্কে হত্যা করতে পারে না। কিন্তু মিঃ মাথিন্দ, ভুলে যাবেন না, আমি আপনার ছেলের বন্ধু হলেও একজন গোয়েন্দা। নীতা যখন আপনার গুণের কথা আমাকে বলতে যাচ্ছিল, আপনি তখনই ওর মুখ বন্ধ করবার জন্য আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি গুলি চালানোর ফলে অথবা নীতা ঝুঁকে পড়ায় দৈবক্রমে গুলিটা আমাকে না লেগে নীতাকে লাগে, অথবা একটি বোলতার হুল ফোটায় আপনার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সেটা নেহাৎই একটা দুর্ঘটনা। দিস ইজ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট!"

"তুমি ভুল করছ অম্বর, নীতার যেদিন মৃত্যু হয় আমি সেদিন পানজিমে, অর্থাৎ গোয়ায়।"

"না, আপনি সেদিন হঠাৎই এখানে এসে পড়েছিলেন। আপনি খুন করতে আসেননি, কিন্তু আপনি না এলে নীতা মরত না। আপনি ওর নিয়তি।"

"অম্বর!"

"সেদিন আপনি বাড়িতেই ছিলেন এবং লুকিয়ে ছিলেন। ওমের খবর শুনে খুবই

বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন আপনি। তবে নীতার মুখ থেকে যখন শুনলেন আমি যাচ্ছি মুক্তিপণ নিয়ে, তখন অবশ্য আপনি একটু আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন আমি মুক্তিপণ নিয়ে চলে গেলেই আপনি অনুসরণ করবেন আমাকে। তারপর গোলার মোড়ে লেনদেন হবার পর আমার জন্য একটি বুলেট খরচ করে আপনার পথের কাঁটাকে আপনি সাফ করবেন। কিন্তু আপনি আমাকে কেন আপনার পথের কাঁটা ভাবতেন? আমি কিন্তু ভুলেও কখনো সন্দেহ করিনি আপনাকে। তাছাড়া রোজ নয়, আমি তো সপ্তাহে মাত্র একটি দিন আসতাম আপনার বাড়িতে।''

''কী যা-তা বলছ তুমি?''

''আমি বলছি না, নীতার ডায়েরি বলছে। মৃত্যুর দিন দুপুরেও ডায়েরি লিখেছে নীতা।''

''কী লিখেছে?''

''ও যা লিখেছে তা আপনাকে অবশ্যই পড়ে শোনাব।'' বলে কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে নীতার ডায়েরিটা বার করলাম। নীতা লিখেছে, 'রোজ রাত্রে শোবার সময় আমি ডায়েরি লিখি। আজ দুপুরেই লিখছি। আমার মনে হচ্ছে, বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমাদের দু' ভাইবোনকেই হয়তো আত্মাহুতি দিতে হবে একদিন। আজ হঠাৎ বাবা ফিরে এসেছেন। দাদার খবর শুনেই লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, সর্বনাশ হয়েছে!'

'কেন বাবা?'

'ওম যে বেলকে শেষ করবার জন্য উঠিপড়ি করে লেগেছে, বেল সেটা টের পেয়েছে।'

'সে কী! তাহলে উপায়?'

'একে আমি নেই, তার ওপরে শিকার তার হাতের মুঠোয়। অতএব কী হবে ভাবতে পারিস? যাক, ঠিক আছে, আমি যখন এসে পড়েছি তখন আমি নিজেই যাবো ছদ্মবেশে। যে মুহূর্তে বেলের হাতে অ্যাটাচিটা তুলে দেব, ঠিক তার পরমুহূর্তেই শেষ করব তাকে। তাতে অবশ্য আমি নিজেও পার পাব না, তবু ছেলেটা তো রক্ষা পাবে।'

'কিন্তু বাবা, বেল যদি নিজে না এসে অন্য কাউকে পাঠায়?'

বাবা একটু চিন্তা করে বললেন, 'হ্যাঁ, তা অবশ্য হতে পারে। তাছাড়া—'

'তার চেয়ে তুমি এখানেই আমার কাছে থাকো। আমি বরং অম্বরদাকে পাঠাই অম্বরদা নিশ্চয়ই অবস্থাটার মোকাবিলা করতে পারবে।'

বাবা একটু যেন ভরসা পেয়ে বললেন, 'অম্বরকে পাঠাবি? পাঠা! তবে ভুলেও যেন আমাদের ভেতরের কথা কিছু ফাঁস করিস না ওর কাছে। আমি জড়িয়ে পড়ব তাহলে।'

'বেশ তাই হবে। তবে আমার মনে হয়, এখনো সময় আছে। অম্বরদাকে সব কথা খুলে বলা উচিত। অম্বরদা নিশ্চয়ই এই চক্রান্তের জাল থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারবে।'

'খবরদার! তুই কি আমাকে বিপদে ফেলতে চাস?'

অগত্যা আমি বাবার কথাতেই রাজি হলাম। কিন্তু আমার মন বলছে, মুক্তি পেলেও আমার দাদা ফিরতে পারবে না। বাবাও পার পাবেন না বেলের হাত থেকে। আর আমি? বাবা-দাদার অবর্তমানে আমাকেই কি ছেড়ে দেবে সে? তাই ভাবছি সব কথা অম্বরদাকে

আমি খুলে বলবই। অবশ্য বলবার সুযোগ যদি না পাই, তাই সব কথা এই ডায়েরিতেই লিখে রাখলাম।"

এই পর্যন্ত বলে আমি বললাম "আপনি কি আরো প্রমাণ চান?" পকেট থেকে ডট পেনটা বার করে বললাম, "এই নিন আপনার রুমাল। এই আপনার ডট পেন। ডোতাড়িতে আপনি ফেলে গিয়েছিলেন সেদিন। আর আপনার জুতোর ছাপ, সেটা আছে পুলিশের কাছে। আমার কাছে আছে একটা মরা বোলতা। যেটাকে আপনি পা দিয়ে টিপে মেরেছিলেন। এর পরও কি বলবেন, আপনি নীতার হত্যাকারী নন? আমার দিকে তাক করে গুলিটা ছুঁড়েই, ধরা পড়বার ভয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে আপনি পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আমার আগেই গোলাব মোড়ে পৌঁছে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, আমার সঙ্গে চরম মোকাবিলা করবার জন্য। কিন্তু যখন দেখলেন বেল মুক্তিপণ নিতে এল, কিন্তু সঙ্গে আপনার ছেলেকে নিয়ে এল না, তখন আপনার মধ্যেই আর আপনি রইলেন না। আতঙ্কে ভয়ে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলেন। একে তো মেয়েকে নিজের হাতে খুন করেছেন, তার ওপর ছেলেরও হদিশ নেই। কাজেই আপনি তখন আর কাউকে হত্যা না করে নিজের ছেলেকে উদ্ধার করবার জন্যই পাগল হয়ে উঠেছিলেন। ইতিমধ্যে বেলকে আমি আক্রমণ করি। ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ি। আমার গুলি ওর কাঁধে লাগে। বেল সেই অবস্থাতেই পালাতে গেলে আড়াল থেকে আপনিও গুলি ছোঁড়েন। সে গুলি লাগে ওর পায়ে।"

মিঃ মাকিন একটিও কথা না বলে, কোনরকম প্রতিবাদ না করে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম, "এই ঘটনার দশদিন পরে বেলকে ইউ পি পুলিশ গোরক্ষপুরের কাছে গ্রেফতার করে। বেল এখন পুলিশ হাসপাতালে খুব সঙ্গীন অবস্থায় আছে। কলকাতা পুলিশও এই ফেরারি আসামীর এতদিন বাদে একটা সঠিক সংবাদ পেয়ে খুব উল্লসিত। আপনার ছেলের হত্যাকারী তো ধরা পড়েছে, আশা করি আপনিও খুব খুশি হবেন এতে। এ কি, আপনি এরকম করছেন কেন? কী হল আপনার?"

কুন্দনপ্রকাশ মাকিন আমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ ধীরে ধীরে সোফার ওপর গড়িয়ে পড়লেন। না, স্যুইসাইড নয়। ডাক্তার না হলেও যে কেউ বুঝতে পারে, এটা সেরিব্রাল থ্রম্বসিস। কী সাংঘাতিক পরিণাম!

এখন তো আমার হাসপাতালেই ফোন করা উচিত।

গোয়েন্দা তদন্ত

সে এক প্রচণ্ড দুর্যোগের রাত।

মৌড়িগ্রামে আমার চার কাঠার চৌহদ্দির মধ্যে নিজের ঘরে বসে তন্ময় হয়ে একটা গল্পের বই পড়ছি। অবশ্যই ভূতের গল্প। কেননা রসিক লোকেরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে ভূতের গল্প উদ্ভট হলেও বর্ষার রাতে এ ধরনের গল্প মনের মধ্যে বিশেষ একটা ইমেজ সৃষ্টি করে।

পাশেই কেরোসিন স্টোভে ছোট্ট একটা হাঁড়িতে খিচুড়ি বসিয়েছি। রাত এখন ন'
পঁয়তাল্লিশ।

বাইরে প্রবল বর্ষণ।

এমন সময় ঘরের কোণ থেকে টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। বই মুড়ে রেখে উঠে গেলাম টেলিফোনের কাছে।

রিসিভার তুলে নিয়ে বললাম, "হ্যালো! অম্বর চ্যাটার্জি স্পিকিং...।"

"আমি ভোলা ট্যান্ডন কথা বলছি।"

"ভোলা! ও মাই গুড্ লাক.. হাউ আর য়ু?"

"আমি খুব বিপদে পড়ে তোমাকে ফোন করছি ভাই।"

"কী হয়েছে?"

"আমার ফ্ল্যাটে একটা খুন হয়েছে।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ। আমার নীচের তলার ফ্ল্যাটে রঘুবীর প্রসাদ নামে এক ভদ্রলোক ভাড়া থাকেন। আমি একটু দরকারি কাজে তার ঘরে গিয়ে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভাড়াটিয়াদের ডেকে সেই দৃশ্য দেখিয়ে পুলিশের ফোন করেই তোমার শরণ নিচ্ছি। প্লিজ হেল্প মি!"

"পুলিশে ফোন করেছ বেশ করেছ, কিন্তু আমি গিয়ে কী করব? তুমি কি হত্যাকারীকে ধরতে চাও?"

"অফ কোর্স।"

"বেশ বসে বসে গল্পের বই পড়ছিলাম, দিলে তুমি মুডটাকে নষ্ট করে!"

"কী বই পড়ছিলে? হেডলি চেজ?"

"না, একটা ভূতুড়ে বই।"

"তা হোক ভাই। আমার জন্যে একটু কিছু করো তুমি। একটু কষ্ট করো। এ আমার ফ্ল্যাটের বদনাম।"

"কিন্তু...।"

"কোন কিন্তু নয়, প্লিজ! খুনী আমাদের হাতের মুঠোয়। যদিও সে এখন পলাতক, তবুও আমি আশা করি পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাকে খুঁজে বার করতে তোমার খুব একটা বেগ পেতে হবে না।"

"তার মানে খুনী তোমার পরিচিত?"

"হ্যাঁ। জয় বিশোয়াল নামে একটি ছেলে রঘুবীর প্রসাদের গৃহভৃত্য ছিল। সেই ছেলেটি এই খুনের পর রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছে। অতএব বুঝতেই পারছ, খুনী নিজেই নিজেকে চিনিয়ে দিচ্ছে সে খুনী বলে!"

"স্ট্রেঞ্জ।"

"তোমাকে যেভাবেই হোক ছেলেটাকে খুঁজে বার করতে হবে। ব্যাটা শয়তান, আমার ফ্ল্যাটের দুর্নাম করিয়ে দিল। এই ফ্ল্যাটে আর কেউ ভাড়া আসতে চাইবে? তাছাড়া রঘুবীর প্রাসাদের মতো একজন ভালো লোককে...ছিঃ ছিঃ ছিঃ।"

"বেশ রহস্যময় খুন তাহলে।"

"তুমি রেডি থেকো। আমি গাড়ি নিয়ে তোমাকে আনবার জন্য এক্ষুণি রওনা হচ্ছি।"

আমি আর কিছু বলার আগেই রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনতে পেলাম।

এই প্রচণ্ড দুর্যোগের রাতে ঘর থেকে বেরোতে হবে শুনেই গায়ে জ্বর এল। বই পড়তে পড়তে এমনিতেই ঘুম নেমে আসছিল চোখে, ভাবছিলাম পেট ভরে গরম খিচুড়ি আর ডিমভাজা খেয়ে বেশ জমপেশ করে তেড়ে একটা ঘুম দেবো, তার জায়গায় এ কি উৎপাত! তাছাড়া ভোলার ওখানে যাওয়া মানেই কথায় কথায় বাত কাবার। অথচ ভোলার আমন্ত্রণ এড়ানো যাবে না। ও আমরা দীর্ঘদিনের বন্ধু। তার ওপর এই মৃত্যুটাও যখন স্বাভাবিক নয়, তখন স্বভাবতই একজন গোয়েন্দা হিসাবে আমার একটা কর্তব্য আছে। একজন মানুষের পৃথিবীবাস চিরদিনের জন্য মুছিয়ে দেওয়ার মতো সামাজিক অপরাধ আর কী বা হতে পারে! তাই আমি অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়ে ভোলার গাড়ি এসে পৌঁছনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর ভোলার গাড়ি এল।

সেই গাড়িতে চেপে মধ্য কলকাতার ওদের ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছলাম তখন অনেক রাত।

চারতলার এই ফ্ল্যাটের সব ঘরেই ভাড়া আছে।

ভোলা নিজেও থাকে এই ফ্ল্যাটেরই দোতলায়।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকতেন রঘুবীর প্রসাদ।

সেই প্রচণ্ড দুর্যোগের রাতে রুম নম্বর ওয়ানে আমি আসার আগেই পুলিশ এসে তাদের কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে রঘুবীর প্রসাদের ঘরে ঢুকেই দেখলাম একটি সোফায় আধশোয়া হয়ে রঘুবীর প্রসাদ শুয়ে আছেন। তাঁর মাথায় কোন একটি ধারালো অস্ত্রের ঘা দেওয়া। প্রচুর রক্তক্ষরণের মধ্যে সে এক ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে।

রাত অধিক হওয়ার জন্য এবং বৃষ্টিপাতের দরুন সম্ভবত বাইরের লোকের কোন ভিড় নেই সেখানে। শুধু ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাই পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে জটলা করছেন। প্রত্যেকেরই চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ও ভয়-ভীতির ছাপ।

আমি তাঁদের উদ্দেশ করেই বললাম, "আপনারা যে যার ঘরে চলে যান। এখানে দাঁড়িয়ে কোন আলোচনা করবেন না। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরাই আপনাদের ডাকব। বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়ে এবং মহিলাদের এখানে একদম আসতে দেবেন না। কেননা এই সব দৃশ্য দেখলে তাদের মনে হয়তো অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হবে। বুঝেছেন?"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই জটলা থেমে গেল।

সবাই যে যার ঘরে গিয়ে খিল দিলেন।

এদিকে পুলিশ তার কাজ করতে থাকলে আমিও আমার কাজ শুরু করলাম। গোটা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে যা কিছু দেখবার দেখে ভোলাকে জিজ্ঞেস করলাম, "রঘুবীর প্রসাদ কি এখানে একা থাকতেন?"

ভোলা বলল, "হ্যাঁ, না, মানে জয় বিশোয়াল নামে ওনার এক চাকর এখানে থাকত।"

"প্রসাদজী কতদিন আছেন এ ফ্ল্যাটে?"

"তা ধরো বছর দশেক।"

"এই দশ বছব ধরে একা? ফ্যামিলি নেই ওনার?"

"হ্যাঁ, স্ত্রী পুত্র কন্যা সবাই আছে। তারা মাঝে-মধ্যে আসে, থাকে। এই তো রঘুবীর প্রসাদেব স্ত্রী এবং দুই ছেলে প্রায় মাসখানেক এখানে থাকার পর গত সপ্তাহে দেশে গেল।"

"কোথায় দেশ ওনার?"

"বিকানীরে।"

আমি আরো ভালো করে চারদিক থেকে এক জায়গায় একটি ছোট্ট জিনিস কুড়িয়ে পেলাম।

সবার অলক্ষ্যে টুপ করে সেটি পকেটে পুরেই আবার প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, রঘুবীর প্রসাদ বিজনেসম্যান ছিলেন নিশ্চয়ই? কিসের ব্যবসা ছিল বলো তো?"

"হার্ডওয়াবের। ক্যানিং স্ট্রীটে দোকান আছে।"

'হুঁ' বলে আর একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। কাদায় রক্তের দাগে চারদিক প্যাচপ্যাচ করছে।

উত্তরের জানলাটা খোলা থাকায় জলের ঝাপটা ঢুকে ঘরের একদিক ভেসে যাচ্ছে।

আমি জানালাটা বন্ধ করতে করতে বললাম, "যে ছেলেটা এখানে কাজ কবত তার নাম কি যেন বললে?"

"জয় বিশোয়াল।"

"ছেলেটা তাহলে পলাতক?'"

"হ্যাঁ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ কাজ তাবই।"

"কিন্তু একটা কথা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, খুনী কোন্ জিনিসের সাহায্যে হত্যা করল প্রসাদজীকে? এই ধরনের খুন করে খুনী অস্ত্র লুকনোর বুদ্ধি রাখে না।"

ভোলা বলল, "তা ঠিক, তবে কী জান চ্যাটার্জি, খুনের পর ভয়ে খুনীর মনের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে প্রমাণ লোপের নানারকম ফন্দি তার মনের মধ্যে আপনা থেকেই এসে যায়। বিশেষ করে চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলে! এন্তার হিন্দি সিনেমা দেখে! এসব কাজে পাকা তো সে হবেই।"

পুলিশ তখন বডি সরাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল। আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আর কিছু দেখতে চান?"

"না।"

"ডেড বডি নিয়ে যেতে পারি?"

"হ্যাঁ, নিয়ে যান।" বলে ভোলাকে বললাম, "চলো, ওপরে চলো। তোমার ঘরে যাই। পুলিশের কাজ পুলিশ করুক। আমরা গিয়ে একটু চা-টা খাই। খুনের কিনারা করতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। পুলিশই ধরবে ব্যাটাকে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওই ব্যাটারই কাজ এটা।"

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে ভোলার ফ্ল্যাটে যখন প্রবেশ করলাম তখন মনে হল যেন স্বর্গে প্রবেশ কবেছি।

কী চমৎকার সাজানো ঘর!

ভোলা ঘরে ঢুকেই ডাকল, "তপতী।"

পাশের ঘর থেকে ওর বউ হাসিখুশি মুখে বেরিয়ে এল। এসেই দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানাল আমাকে, "ভালো আছেন চ্যাটার্জি?"

"হ্যাঁ। তোমার বাচ্চারা ভালো আছে তো?"

"দু'টোকেই বোর্ডিং-এ দিয়েছি।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ, বড় দুরন্ত হয়েছে। একদম বাগ মানাতে পারছি না।"

ভোলার বউ তপতী বাঙালি মেয়ে। আমারই আব এক বন্ধুর বোন। ছোট থেকেই ওকে দেখেছি। খুব ভালো মেয়ে। আগে দু'বেলা পেটভরে খেতে পেত না, এত গরিব ছিল। এখন ভাগ্যের জোবে মধ্য কলকাতার এই চমৎকার ফ্ল্যাটের মালিকানী। কয়েক লক্ষ টাকার মালিক। যাক, ঘরে ঢুকে একটি সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বললাম, "আমাকে এই বাদলার বাজারে আর কিছু নয়, স্রেফ একটু চা অথবা কফি খাইয়ে দাও।"

তপতী সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা করতে রান্নাঘরে চলে গেল।

আমি আয়েস করে পায়ের ওপর পা তুলে বললাম, "আচ্ছা, ভোলা, এইবার একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি। দাঁড়াও, তাব আগে একবার বাথরুমের কাজটা সেরে আসি।"

"এক মিনিট! আলোটা জ্বেলে দিই।"

ভোলা সুইচ টিপলে আমি বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখ জল দিতে গিয়েই কেমন যেন শিউরে উঠলাম। হঠাৎ রঘুবীর প্রসাদের সেই রক্তে ভাসা মুখখানা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। আমি আর এক মুহূর্ত সেখানে না থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার হাত পা যেন কাঁপছে।

ভোলা বলল, "কী হল চ্যাটার্জিদা?"

"কিছু না। হঠাৎ মাথাটা কি রকম ঘুরে গেল।" বলে আবাব সোফায় বসে বললাম, "আসলে ঘুমের ঘোরটা কাটিয়ে বাত্রিজাগরণ তো! তা যাক, আসল কথায় আসি।"

"বলো।"

"জয় বিশোয়াল প্রসাদজীব কাছে কতদিন ছিল?"

"অনেক দিন।"

"তবু?"

"আগের কথা বলতে পারব না, তবে প্রসাদজী ওকে সঙ্গে নিয়েই আমার ফ্ল্যাটে এসেছিলেন।"

"অ। তাহলে একেবারে নতুন নয়, পুরাতন ভৃত্য।" বলে কিছুক্ষণ পায়ের ওপর পা রেখে না নাড়তে লাগলাম। তারপর বললম, "পুরাতন ভৃত্যরা কিন্তু শুনেছি খুবই বিশ্বাসী হয়। সচরাচর তারা এরকম করে না!"

"এ ক্ষেত্রে তো করেছে!"

"এটা ব্যতিক্রম। অবশ্য কার মনে যে কখন কী মতলব আসে তা কেউ বলতে পারে না।"

"ব্যাপার কি জানো, যখন ছোট ছিল তখনকার কথা আলাদা। কিছু বুঝত না। এখন বুঝতে শিখেছে। টাকাপয়সার মূল্য, জিনিসপত্তরের দাম সম্বন্ধে অবহিত হতে পেরেছে।

বিশেষ করে ওকে সন্ধেবেলা আমি ঘর গুছাতে দেখেছি।''

"আচ্ছা!"

"তবে বলছি কি? তার পরই খুন! এবং খুনের সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি উধাও। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সিন্দুকটাও খালি!"

"সে কি!"

"তাহলেই বোঝো, আর কী সন্দেহের অবকাশ থাকে? খুন-টুন করে পাখি হয়তো এখন দিল্লি কি বম্বের দিকে উড়ছে!"

"কিন্তু ও ঘরে কোন সিন্দুক দেখলাম না তো আমি!"

"দেখনি?"

"না।"

"ওঃ হো, ওটা তো কভার দিয়ে ঢাকা ছিল। দেখবে?"

"নিশ্চয়ই।"

"চলো তবে।"

আমরা নেমে এলাম। সব কাজ শেষ করে পুলিশ তখন যাবার উদ্যোগ করছে।

আমি বললাম, "এক মিনিট।" বলে ভোলার সঙ্গে ঘরে ঢুকলাম।

ভোলা ঘরের এক কোণে গিয়ে ঢাকা সরিয়ে সিন্দুকের তালা খুলতেই দেখলাম স ফর্সা। শূন্য সিন্দুক খাঁ খাঁ করছে।

"স্ট্রেঞ্জ।"

"এর ভেতরে টাকাপয়সা সোনা-দানা সব কিছুই ছিল। কিন্তু না হলেও দশ বি হাজার টাকা তো সব সময়ই থাকত প্রসাদজীর কাছে। তাছাড়া সামনেই প্রসাদজীর মেয়ে বিয়ে। প্রচুর গয়নাগাটিও সেই উপলক্ষে কিনেছিলেন তিনি। কিছু স্ত্রী এসে নিয়ে গেছে। বি ছিল। প্রসাদজীর স্ত্রী একটি বহুমূল্য নেকলেস পালিশের জন্য এবং হীরে সেটিংয়ের জ রেখে গিয়েছিলেন। সেটিও নেই। জয় বিশোয়াল ছাড়া এই ঘরের গোপন সামগ্রীর ক কেউ জানত না। আমাদের ঘরে জয় মাঝে মাঝে আসত এবং তপতীর কাছে বলত, ত আমরা এসব জানি। অতএব বুঝতে পারছ তো খুনী কে?"

"পারছি। কিন্তু কিভাবে খুন হল সেটাই আমাকে দেখতে হবে।"

পুলিশের লোকেরা বাইরে তখন অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। তাই বললাম, "আপনা এবার যেতে পারেন। আমি বাকিটা তদন্ত করছি।"

ওরা চলে গেলে আমি ভোলাকে বললাম, "আচ্ছা ট্যান্ডন, এবার বল তো ভা তোমার ফ্ল্যাটে মোট কতজন ভাড়াটে আছে?"

"তা ধরো টু-রুম ফ্ল্যাট তো, নিচে প্রসাদজী এবং সুকুলজী।"

"সুকুলজী!"

"হ্যাঁ, সামনের দিকে থাকে।"

"কি করেন ভদ্রলোক?"

"ট্যাক্সি ড্রাইভার। নিজেরই ট্যাক্সি অবশ্য। ইউ.পি.র লোক। ওর পরিবারবর্গ নিয়েই থাকে।"

"হুম। তোমরা থাকো দোতলায়। তোমার সামনের ঘরে তো ডঃ ভট্টাচার্য থাকে

খুবই ভদ্র। আলাপ হয়েছিল একবার।''

''শুধু ডঃ ভট্টাচার্য কেন? সত্যি কথা বলতে কি ভাই, আমার ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা প্রত্যেকেই খুব ভদ্র। তারা কেউই সন্দেহজনক নয়। সুকুলজীই যা একটু নেশা-ভাঙ করে। তাছাড়া লোকটার আর কোন দোষ নেই। এইসব খুনটুন—। ওবে বাবা, এ ওর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।''

আমি হেসে বললাম, ''ক্রিমিন্যাল কেসে—আমার অভিজ্ঞতায় অসম্ভব বলে কিছু নেই।''

এমন সময় সিঁড়ির কাছ থেকে তপতীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ''মিঃ চ্যাটার্জি, আপনার কফি রেডি।''

তপতী আমাকে কখনো মিঃ চ্যাটার্জি কখনো চ্যাটার্জিদা বলে। তপতীব ডাক শুনে ট্যান্ডনকে বললাম, ''চলো। আবার ওপরে যাওয়া যাক।''

আমরা দু'জনে ঘরের দরজায় শিকল দিয়ে ওপরে উঠলাম।

ট্যান্ডন বলল, ''তুমি ইচ্ছে করলে আজ রাতে অথবা কাল সকালে এসে আমাব ভাড়াটিয়াদের জবানবন্দী নিতে পারো।''

আমি হেসে বললাম, ''তার কোন প্রয়োজন দেখছি না। দুই আব দুইয়ে চারের মতোই হিসাব এখানে পাকা। এখন যে ভাবেই হোক জয় বিশোয়ালকে গ্রেপ্তার করতে হবে।''

আবার ঘরে এসে সোফায় গা এলিয়ে কফির পেয়ালায় চুমুক দিলাম। রাত শেষ হয়ে আসছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনটে বাজতে দু'মিনিট বাকি।

কফি খেতে খেতেই তপতীর দিকে চেয়ে হেসে বললাম, ''মেনি থ্যাঙ্কস্। এই রকম একটি দারুণ মুহূর্তে কফি খাওয়ানোর জন্য অশেষ ধন্যবাদ।''

তপতীও হেসে বলল, ''ঠিক এই রকম অনুরোধ আমিও আপনাকে দিতে পারি, যদি অনুগ্রহ করে আপনি আজ রাতে আর বাড়ি ফিরে না যান।''

আমি হেসে বললাম, ''আসলে ব্যাপার কি জান তপতী, আমি একটু বেলা অব্দি ঘুমোই। আর একা থেকে থেকে এমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে আমার যে অন্য কোথাও রাত্রিবাস করাটা ঠিক পোষায় না। আমি শুধু তোমাদের আর দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করেই পালাব এখান থেকে। মনে হচ্ছে দুর্যোগও একটু একটু করে কেটে আসছে।''

ট্যান্ডন বলল, ''থাকতে পারতে আজকের রাতটা।''

''তুমি তো আমাকে জান ভাই। তবে কেন অনুরোধ করছ? তা যাক, তুমি তাহলে বলছ তোমার ভাড়াটিয়ারা মোটেই সন্দেহজনক নয়?''

''আমি এর আগেও বলেছি। এখনো বলছি। একেবারেই না।''

''তাহলে ঘুরেফিরে সন্দেহটা জয় বিশোয়ালের ওপরই পড়ছে। ওর দেশ নিশ্চয়ই ওড়িশা?''

''তুমি কী করে জানলে?''

''সারনেমই বলে দিচ্ছে।''

''হ্যাঁ, ওড়িশায়।''

''ঠিকানা জান?''

''না ভাই। অন্যের বাড়ির চাকরের ঠিকানা কে কবে জেনে রেখেছে বলো? তবে এটুকু জানি বালাশোর ডিস্ট্রিক্ট-এ ওর বাড়ি।''

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ।

নীরবতা ভেঙে এক সময় আমিই বললাম, ''প্রসাদজীর বাড়িতে খবর পাঠানোর কি হবে?''

''আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে একটা টেলিগ্রাম করব। তাছাড়া পুলিশকে তো সব বলেছি। পুলিশ নিশ্চয়ই খবর দেবে। সত্যি, কী দুর্ভাগ্য বলো তো? এই গত সপ্তাহে ওর বউ ছেলে দেশে গেল। সামনেই মেয়ের বিয়ে। আর এদিকে কী সর্বনাশ। এই জনাই কোন স্থায়ী ঝি-চাকর বাড়িতে রাখতে নেই।''

''ঠিক আছে, কালপ্রিটটাকে খুঁজে বার করছি। কিন্তু আশ্চর্য, এত বড় একটা মার্ডার হয়ে গেল অথচ তোমরা কেউ একটা আর্তনাদও শুনতে পেলে না?''

''কী করে শুনব? যা দুর্যোগ। সবারই ঘরের জানালা দরজা তো বন্ধ।''

''তবু রক্ষে যে তুমি টের পেয়েছ। নাহলে সারারাতেও কেউ জানতে পারতে না।''

''আমিও টের পেতাম না। দিব্যি ঘরে বসে রেডিওতে বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান শুনছি। তপতী উল বুনছিল, হঠাৎ-ওই বলল, আচ্ছা নীচের ঘর থেকে যেন প্রসাদজীর চিৎকার শুনতে পেলাম।''

''সে কি! বলে রেডিও বন্ধ করে আর কিছু শোনা যায় কিনা তা শোনবার জন্য কান খাড়া করে রইলাম। তবুও তপতীর জেদাজিদিতেই নিচে নেমে গিয়ে দেখি সর্বনাশ কাণ্ড। সকলকেই তখন ডেকে দেখাই। থানায় ফোন করি। তোমাকেও জানাই।''

''ব্যস ঠিক আছে। এখন চলো তো, আর একবার ঘরটা দেখি।''

''এই নিয়ে তিনবার হবে।''

''একটা কথা আছে জানো তো, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই—।''

''সত্যি, তোমরা গোয়েন্দারা পারোও বটে। ধৈর্য বটে তোমাদের।''

''তুমি বিরক্ত হোচ্ছ না তো?''

''আরে না না। কী যে বলো। চলো।''

আমি তপতীকে বললাম, ''আজ যাচ্ছি। কাল দুপুর অথবা সন্ধ্যায় আবার আসব। আমাকে আর একবার কফি খাওয়াতে রাগ করবে না নিশ্চয়ই!''

''তা করব না। তবে আপনার এই চলে যাওয়ার জন্য ভীষণ রাগ করব।''

আমি ট্যান্ডনকে নিয়ে আবার প্রসাদজীর ঘরে ঢুকলাম।

এটা শোবার ঘর। ও পাশে কিচেন। তারপর বাথরুম।

আর সেদিকে যেতে গিয়েই দেখি হঠাৎ এক জায়গায় চাপ চাপ রক্ত।

এ ঘরে একটি ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হলেও এখানে এত রক্ত কী করে এল? তাই অবাক বিস্ময়ে ডাকলাম, ''ভোলা! কুইক!''

ট্যান্ডন ছুটে এলো আমার কাছে, ''কী হয়েছে?''

''লুকস্ দ্যাট।''

''এ তো রক্ত!''

''রক্ত, কিন্তু এত রক্ত এখানে কী করে এলো?''

"তাই তো!"

রক্তটা কিচেনের মধ্যেই চাপ চাপ বেশি। তারপর বিন্দু বিন্দু ধাবায় বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেছে।

বাথরুমের ভেতরেও রক্ত।

অথচ আর কোথাও নেই।

ট্যান্ডন বলল, "আমার মনে হয় প্রথমে প্রসাদজীকে খুন করে বাথরুমে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তারপরে আর যে কোন কারণেই হোক প্রাসাদজীকে টেনে এনে সোফার ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়।"

"ঠিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে সোফা পর্যন্ত একটু রক্তের ধারা তো মেঝেতে আশা করতে পারি।"

"পারো। কিন্তু খোলা জানালা দিয়ে জলেব ঝাপটা এবং অত পুলিশের বুটের কাদায় সব তো মাখামাখি হয়ে গেছে ভাই।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, "ঠিক।"

ভোলা বলল, "আর কিছু দেখবে?"

"নাঃ। ভেরি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। ঠিক আছে চলো। এখন তো বাড়ি ফেরা যাক। কাল সকালে ভেবেচিন্তে দেখব কতদূর কি সিদ্ধান্তে আসা যায়।"

ট্যান্ডনের গাড়ি আবার আমাকে যখন আমার বাড়িতে পৌছে দিয়ে গেল তখন ভোর হতে আর দেরি নেই।

যদিও রাত শেষ করে ভোরের আগে বাড়ি পৌঁছলাম তবুও শোওয়া মাত্রই যত রাজ্যের ঘুম এসে চোখে ভর করল। কাল সারারাত ধরে যা সব দেখেছি তা দেখলে কোন সুস্থ এবং সাধারণ মানুষের চোখে ঘুম আসবে না। কিন্তু আমি ওইরকম ভয়াবহ দৃশ্য দেখে এতই অভ্যস্ত যে ওসবে আর মনের মধ্যে কোন প্রভাব বিস্তার করে না।

পরদিন প্রায় বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে মুখ হাত ধুয়ে চা খেতে খেতে প্রসাদজীর ঘবে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসটা পকেট থেকে বার করে আর একবার নেড়েচেড়ে দেখলাম।

এটা আমার খুবই পরিচিত। তাই বিস্ময়ের ঘোরে বারবারই নানারকম কথা চিন্তা করতে লাগলাম। কিছুতেই ভেবে পেলাম না এটা কি করে ওখান যেতে পারে।

যাই হোক, আমি সেটা আবার যথাস্থানে রেখে সকালের কাগজটার দিকে মন দিলাম।

না, প্রসাদজীর খুনের খবর কোথাও এতটুকুও ছাপা হয়নি। হয়তো কাল হবে।

অথচ এটা একটা দারুণ খবর।

আমি কাগজ রেখে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলাম, 'হ্যাল্লো। লালবাজার!"

ওদিক থেকে উত্তর এলো, "ইয়েস।"

"একটু হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টকে দিন না?"

অপারেটর সঙ্গে সঙ্গে কানেকশন দিয়ে দিল।

"হ্যাল্লো! অম্বর চ্যাটার্জি স্পিকিং। ...কে! মিঃ কাঞ্জিলাল? কাল রাত্রে প্রসাদজীর ওই খুনের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছি। তালতলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যেটার তদন্ত কবা

হয়েছিল...কী বললেন? চাকরটাকে অ্যারেস্ট করার সব রকম ব্যবস্থা করে ফেলেছেন? দেশের ঠিকানা পেয়েছেন ওর? আচ্ছা পায়ের ছাপ-টাপ কিছু পাননি? তাহলে? হ্যাঁ, জানলাটা তো খোলা ছিল। জলের ঝাপটায় সব নষ্ট হয় গেছে? যাক প্রসাদজীর বাড়িতে একটা খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।" এই বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে গুম হয় বসে রইলাম কিছুক্ষণ।

কাল রাতের খুনের ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবনা-চিন্তা করতে লাগলাম। অনেক রকম সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। প্রথমেই যেটা মনে হল সেটা হল খুনটা কখনই কাঁচা হাতের নয়। বরং বেশ পাকা হাতের। দ্বিতীয়ত খুনটা যদি কিচেনের মধ্যেই হয়ে থাকে তাহলে কিচেন থেকে লাশটাকে বাথরুম পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাথরুমেও চাপ চাপ রক্ত পাওয়া গেছে। অথচ সোফার কাছ পর্যন্ত লাশটাকে টেনে নিয়ে যাবার পথে কোথাও এতটুকুও রক্ত নেই। ধরা যেতে পারে বাথরুমে অনেকক্ষণ ফেলে রাখার জন্য রক্তক্ষরণ শেষ হয়ে গেছে। তা যদি হোত তাহলে তারও অনেক পরে সোফাটা রক্তে ভেসে গেল কি করে? তৃতীয়ত খুনী লাশটাকে বাথরুমে ঢুকিয়ে আবার কিসের স্বার্থে সেটাকে টেনে এনে সোফায় বসাবে? চতুর্থ সন্দেহ, যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রসাদজীকে হত্যা করা হল সেটা ঘরের ভেতর নেই কেন? বিশেষ করে হত্যাকারী যেখানে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে পলাতক? হত্যাকারী কেন মারাত্মক অস্ত্রটিকেও বোঝা স্বরূপ নিয়ে ঘুরবে? পঞ্চম সন্দেহ, যেটা আমার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে তো আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কেননা ওই বাড়িতে খুনের তদন্ত করতে গিয়ে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তা ভাবলেও গা-মাথা ঝিমঝিম করে।

আর ভাবতে পারলাম না।

উঠে গিয়ে ডায়াল করলাম, "হ্যাল্লো?"

ওদিক থেকে তপতীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম..."কে? মিঃ চ্যাটার্জি?"

"হ্যাঁ। ভোলাকে একবার ডেকে দাও তো?"

"কী হল হঠাৎ?"

"বিশেষ জরুরি দরকার।"

"একটু ধরুন, ও বোধ হয় বাথরুমে গেছে।"

ধরে রইলাম।

একটু পরেই ট্যান্ডনের গলার স্বর ভেসে এলো, "বলো। কী ব্যাপার!"

"তোমার গাড়িটা এক্ষুণি একবার পাঠিয়ে দাও। যত তাড়াতাড়ি পারো।"

"হঠাৎ?"

"বিশেষ দরকার।"

"এক্ষুণি পাঠাচ্ছি। কোন সূত্র পেলে নাকি?"

"সব বলব। এসব কথা ফোনে হয় না।"

আমি রিসিভার নামিয়ে রেখে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম। উত্তেজনায় রগের শিরাগুলো জ্বলছে আমার।

তৈরি হয়ে একবার ফোন করলাম লালবাজারে।

ওদিক থেকে মিঃ কাঞ্জিলালের গলা শোনা গেল, "কে, মিঃ চ্যাটার্জি? বলুন?"

"আপনি এখুনি কিছু পুলিস সঙ্গে নিয়ে মিঃ ট্যান্ডনের ফ্ল্যাটে চলে আসুন।"

"কী ব্যাপার?"

"একটা চমৎকার সিদ্ধান্তে আমি এসেছি।'

"ডোন্ট মাইন্ড মিঃ চ্যাটার্জি, এটা আপনার প্রথম পরাজয়!"

"তার মানে?"

"আপনি যে সিদ্ধান্তেই এসে থাকুন না কেন, হত্যাকারী এখন পুলিশ মর্গে।"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "কি রকম!"

"রঘুবীর প্রসাদজীর হত্যাকারী জয় বিশোয়াল কাল রাতে খুন করে পালাবার সময় আপনাদেরই হাওড়ার ব্যাকল্যান্ড ব্রিজে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে।"

"বাক্‌ল্যান্ড ব্রিজে! ওখানে তো এখন গাড়ি চলাচল বন্ধ!"

"আরে মশাই, বাক্‌ল্যান্ড ব্রিজে মানে ওর পাশেই নতুন যেটা হল।"

"অর্থাৎ বঙ্কিম সেতুতে?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি। গাড়ির চাকায় মাথাটা গুঁড়িয়ে গেছে একেবারে। সে এমনই বীভৎস দৃশ যে দেখলে শিউরে উঠবেন, চেনা যাচ্ছে না একদম।"

"তাহলে আপনারা চিনলেন কী করে?"

"আপনার বন্ধু ভোলাবাবুই সনাক্ত করেছেন তাকে।"

"বলেন কী!"

"হ্যাঁ।"

এমন সময় বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল।

আমি রিসিভার নামিয়ে রেখে চেঁচিয়ে বললাম,"যাচ্ছি।"

"হাতের সামনেই স্যুটকেসটা ছিল। সেটা চটপট গুছিয়ে নিয়ে আমার অ্যাটাচিটাও যথাস্থানে নেওয়া হয়েছে কিনা দেখে বাইরে এসে দরজায় তালা লাগালাম।

ট্যান্ডনের গাড়ি নিয়ে ওর ড্রাইভার এসেছে। তাকে হেসে বললাম, "কী ব্যাপার, বাবু খুব ব্যস্ত নাকি?"

"হ্যাঁ, বাবু তো পুলিশ-ঘর করছে। কাল যা হয়ে গেল!"

"কাল আপনি কোথায় ছিলেন?"

"আমি তো বাড়িতেই ছিলাম। কিছুই জানি না আমি। বৃষ্টি-বাদলার দিন দেখে বাবু বললেন, আজ আর কোথাও বেরবো না। তুমি আর মিছিমিছি কষ্ট করো কেন? যাও তোমার ছুটি। তাই আমি বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। আজ সকালে এসে শুনি রাতে এত সব কাণ্ড হয়ে গেছে। অথচ বাবু বিশ্বাস করুন, জয় বিশোয়াল যে এ কাজ করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ছেলেটা খুব বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু পাপের পরিণাম কিরকম হাতে হাতে পেয়ে গেল দেখুন!"

"সবই কপাল।" এই বলে গাড়িতে উঠতে গিয়েই বললাম, "এই যাঃ, খুব ভুল হয়ে গেছে। আপনি এক কাজ করুন জগদীশদা, এই নিন চাবি। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে স্যুটকেসটা টেবিলের ওপর রেখে এসেছি। আপনি ঘরে ঢুকেই দেখবেন ডানদিকে টেবিলের

ওপর চামড়াব ·একটা স্যুটকেস রাখা আছে। সেটা নিয়ে আসুন। কিছু মনে করলেন না তো?''

''না না, কি মনে করব? আপনি কত বড় মানুষ। আমি সামান্য একজন...।''

জগদীশদা চলে গেলে আমি পায়চারি করতে লাগলাম। তারপর গাড়ির পিছনে এসে ডালা তুলে দেখলাম স্যুটকেসটা ভেতরে রাখা যাবে কিনা। হ্যাঁ, ভেতরটা ফাঁকা। জগদীশদা স্যুটকেস নিয়ে এলে স্যুটকেসটাকে পিছনে রেখে ডালা বন্ধ করে গাড়িতে উঠলাম।

এরপর প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই ট্যান্ডনের ফ্ল্যাটে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন দেখলাম নীচের ঘবে চাবি দেওয়া। এবং ওপরের ঘরে তপতী, ট্যান্ডন ও মিঃ কাঞ্জিলাল রীতিমতো খোশগল্পে মেতে উঠেছেন। তার ওপর আমি গিয়ে উপস্থিত হওয়ায় আনন্দের আর অবধি রইল না।

ট্যান্ডন বলল, ''তুমি নিশ্চয়ই খবর পেয়েছ, ভাই, কালপ্রিট ধরা পড়েছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, ফাঁসির দড়িটা ব্যাটার গলায় লটকাতে পারা গেল না।''

কাঞ্জিলাল বলল, ''তা না যাক, তার চেয়েও অনেক বড় শাস্তি সে পেয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা ব্যাটা মরে বাঁচিয়েছে আমাদের। কী বলেন মিঃ চ্যাটার্জি।''

আমি হেসে বললাম, ''আমি আর কী বলব বলুন? এরকম নাটক তো এর আগে আর কখনো দেখিনি।'' তাবপর তপতীর দিকে চেয়ে বললাম, ''কালকের কথাটা মনে আছে নিশ্চয়ই?''

''কী কথা?''

''এক পেয়ালা কফি। এবং গরম গরম।''

''ওঃ হো। শুধু কফি কেন? আজ সারাদিন এখানে থাকতে হবে আপনাদের। আপনার এবং মিঃ কাঞ্জিলালের নেমন্তন্ন এখানে। গরম ভাত আর মুর্গির মাংস না খেয়ে যেতেই পারবেন না এখান থেকে।''

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, ''ওরে বাবা, ওসব আজ নয়। আমাকে এক্ষুণি বর্ধমানের ট্রেন ধরতে হবে। আমি একেবারে তৈরি হয়ে বেরিয়েছি।''

''বর্ধমান! হঠাৎ?''

''দেশ থেকে একটা চিঠি এসেছে। খুবই জরুরি। কাজেই যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। দু'তিন দিন থাকতেও হবে। পরে এসে একদিন খেয়ে যাব। মিঃ কাঞ্জিলাল বরং...।''

মিঃ কাঞ্জিলাল বললেন, ''তা কি করে হয়? আপনার বন্ধুর বাড়ি, আপনি থাকবেন না, অথচ ..। আমিও তাহলে পরেই খাবো।''

তপতী কফি নিয়ে এলে কফি খেয়েই উঠে পড়লাম।

ট্যান্ডন বলল, ''আমার গাড়ি তাহলে পৌঁছে দিক তোমাকে।''

আমি কাঞ্জিলালকে বললাম, ''আপনার জিপ আছে তো?''

''হ্যাঁ, মোড়ের মাথায় রেখে এসেছি।''

''আমি আপনার জিপেই লালবাজারে যাবো। একবার ছোকরার লাশটা দেখে স্টিফেন হাউসে একটা কাজ সেরে ওখান থেকেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাবো।''

ট্যান্ডন বলল, ''আমি কত আশা করেছিলাম তোমাদের দু'জনকে আজ দম-ভর খাওযাবো!''

"তাতে কী হয়েছে? আমি তো তিন-চারদিন বাদেই আসছি।" এই বলে বিদায় নিলাম।

নীচে নেমে এসে ট্যান্ডনের অস্টিনের পেছন থেকে আমার স্যুটকেসটাকে বার করে কাঞ্জিলালের জিপে উঠলাম।

জয় বিশোয়ালের মৃতদেহটা দেখার পর আমার স্যুটকেসটা কাঞ্জিলালকে দেখিয়ে বললাম, "দেখুন তো এটা কিসের দাগ?"

কাঞ্জিলাল শিউরে উঠলেন, "এ কি! এ তো রক্তের দাগ দেখছি!"

"ঠিকই দেখছেন। এই স্যুটকেসের গায়ে লেগে থাকা রক্ত আর জয় বিশোয়ালের শরীরের রক্ত এক কিনা একটু পরীক্ষা করিয়ে দেখা যায় কি?"

"কেন যাবে না?"

"খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু!"

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ চ্যাটার্জি। কী ব্যাপার বলুন তো?"

আমি এক চোখ টিপে এমন এক অদ্ভুতভাবে হাসলাম মিঃ কাঞ্জিলালের দিকে চেয়ে যে তার অর্থ তিনি একজন দুঁদে পুলিশ অফিসার এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোক নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন।

কলিংবেলে মৃদু চাপ দিতেই ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের স্বর শোনা গেল, "কে।"

তপতীর কণ্ঠস্বর।

আমি সাড়া না দিয়েই আবার বেল টিপলাম।

একটু দেরি করেই দরজাটা খুলল তপতী। তারপর আমাকে দেখেই চমকে উঠল।

ট্যান্ডনও অবাক বিস্ময়ে আমাকে দেখছে।

"ভেতরে আসতে পারি?"

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ট্যান্ডন এবং তপতী দু'জনে মুখে হাসি আনাবার চেষ্টা করে বলল, "নিশ্চয়ই।"

ট্যান্ডন বলল, "তুমি বর্ধমানে গেলে না?"

"না, গেলাম না। তবে হঠাৎ ফিরে এসে তোমাদের খুব বিব্রত করলাম না তো?"

"আরে না না। তবে তুমি খুব ভালো সময়ে এসে পড়েছ। আর একটু পরে এলে আমাদের পেতে না। একটু বেরোবার তোড়জোড় করছিলাম। কিন্তু তোমাকে যেন কেমন কেমন দেখাচ্ছে, কী হয়েছে তোমার?"

"কিছুই না। বরং আমারও তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন খুব অসময়ে তোমাদের এখানে এসে পড়েছি।"

"যাঃ, কী যে বলো!"

"দু'জনে ঝগড়াঝাঁটি করছিল না তো?"

"না না। লালবাজারে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ! সত্যি, কী বীভৎস দৃশ্য! চোখে দেখা যায় না। যাক, একটা সিগারেট দাও তো?"

ট্যান্ডন ওর সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা দামী সিগারেট বার করে আমার দিকে

এগিয়ে দিতে দিতে বলল, ''আশ্চর্য! আমি যতদূর জানি তুমি সিগারেট খাও না।''

আমিও বিস্মিত হয়ে বললাম, ''সত্যিই তো। আমি তো স্মোক করি না। হঠাৎ এরকম খেয়াল হল কেন বল তো? আরে একি! ভোলা, তোমার হাতের আংটির ওপর যে দামী পাথরটা বসানো ছিল সেটা কোথায়?''

হঠাৎ লক্ষ্য পড়ায় ট্যান্ডনও চমকে উঠল। ভয়ে ওর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে সে বলল, ''তাই তো! গেল কোথায় পাথরটা?''

''যেখানেই যাক, তুমি অত বিমর্ষ হয়ে পড়লে কেন ভাই!''

ট্যান্ডন বলল, ''চ্যাটার্জি, আমার হাত পা কাঁপছে। তুমি বিশ্বাস করো, দামী পাথর বলে নয়, এই পাথরটা আমাদের তিন পুরুষের। আমাদের মধ্যে একটু সংস্কার আছে যে এই পাথর হারানো মানেই একটা দারুণ বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আসা।''

''ওসব বাজে কথা। বিপদের মেঘ তো কেটেই গেল বরং। আর তাই যদি ভাবো, তাহলে দেখ তো এই পাথরটা তোমরা আংটিতে লাগানো যায় কিনা।''

পাথরটা দেখেই চমকে উঠল ট্যান্ডন, ''আরে! এ তো সেই পাথর। এ তুমি কোথায় পেলে?''

''কাল রাত্রে প্রসাদজীর ঘর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি।''

ট্যান্ডন হাসির অভিনয় করে বলল, ''তা হবে। কাল তো দু'জনে ঢুকেছিলাম ওই ঘরে। ওই সময়েই হয়তো পড়ে থাকবে।''

''যখনই পড়ে থাকুক, তোমার জিনিস তুমি ফিরে পেলে তো? আশা করি বিপদের মেঘ এবার কেটে গেল।''

ট্যান্ডন বলল, ''না না, বিপদ আবার কী? তা যাক কী খাবে বলো? গরম ভাত, মুর্গীর মাংস, আর কি? দই সন্দেশ নিশ্চয়ই চলবে?''

''নাঃ, আজ ভাবছি কিছুই খাবো না। ওই বীভৎস দৃশ্য দেখার পর আর কিছুই খেতে মন চাইছে না। দু'দুটো মানুষকে এক রাতে যে ভাবে হত্যা করা হল তাতে—''

''চ্যাটার্জি!'' প্রায় চিৎকার করে উঠল ট্যান্ডন, ''কী বলছ তুমি! দু'দুটো খুন হবে কেন? জয় বিশায়ালের কেসটা স্রেফ একটা অ্যাক্সিডেন্ট!''

''না, জয় বিশোয়ালকেও খুন করা হয়েছে। এবং পরে তাকে নির্জন সেতুর ওপর ফেলে একটা মোটরের চাকায় বার বার পিষ্ট করা হয়েছে। যাতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় ওটা অ্যাক্সিডেন্ট। এখন যে ভাবেই হোক সেই অজ্ঞাত আততায়ীকে খুঁজে বার করতেই হবে।''

''অসম্ভব। এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। তবে কিছুদিন আগে সুকুলজীর সঙ্গে জয় বিশোয়ালের প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে—।''

''সুকুলজীকে তুমি কেন সন্দেহ করছ?''

''এ ছাড়া মোটর এখানে কারই বা আছে?''

''একটু মনে করে দেখবার চেষ্টা করো তো? মোটর কার কার আছে বা থাকতে পারে? আর একটা কথা তুমি এবার পরিষ্কার করে বলো দেখি, কাল রাতে ঠিক কী কী হয়েছিল? তুমি যখন আমাকে ফোন করেছিলে তখন বলেছিলে তুমি কি একটা দরকারি কাজে রঘুবীর প্রসাদের ঘরে গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাও। পরে আবার আমাকে

তোমার ঘরে কফি খাওয়ার সময় বললে রেডিও শুনতে শুনতে তোমার স্ত্রী হঠাৎ আর্তনাদ শুনতে পেয়ে তোমাকে নীচে পাঠায়। যে যুক্তিতে বর্ষার রাতে দরজা-জানালা বন্ধ থাকায় তোমার অন্য ভাড়াটেরা প্রসাদজীর আর্তনাদ শুনতে পায়নি, সেই যুক্তিতে ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ থাকা এবং ফুল ভল্যুমে রেডিও চলা সত্ত্বেও প্রসাদজীর আর্তনাদ তোমার স্ত্রী কি করে শুনতে পেল তা ভেবে পাচ্ছি না।"

ট্যান্ডন লাফিয়ে উঠল, "তার মানে তুমি কি আমাদের সন্দেহ করছ?"

"বসো বসো, অত উত্তেজিত হয়ো না। যা ঘটেছিল ঠিক ঠিক বলো। আমার মনে হচ্ছে তুমি কিছু একটা আমার কাছে লুকোচ্ছো। আচ্ছা বল তো, জয় বিশোয়াল রঘুবীর প্রসাদকে মার্ডার করে না হয় পালাল, কিন্তু সে যে তার যথাসর্বস্ব সিন্দুক ভেঙে পালিয়েছে তা তুমি জানলে কি করে? সিন্দুক তো ঘরের এক কোণে কভার ঢাকা থাকে। ও তো তোমার দেখবার কথা নয়।"

"তুমি বড় রহস্যময় হয়ে উঠছ। প্লিজ, একটু খুলে বলো কী তুমি বলতে চাও। আমার মনে হচ্ছে এই খুনের ব্যাপারে তুমি আমাকে জোর করে জড়িয়ে দিতে চাইছ।"

"আমি শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করছি তোমাকে। যাক গে, তোমার যখন শুনতে কষ্ট হচ্ছে তখন আগে কথাতেই ফিরে যাই। সুকুলজী ছাড়া তোমাদের পরিচিতদের মধ্যে আর কার গাড়ি আছে বললে না তো?"

"আমি এই মুহূর্তে কিছু মনে করতে পারছি না।"

"তোমার নিজেরও তো একটা গাড়ি আছে!"

"আছেই তো। সেজন্যে কি ওই অপরাধের বোঝাটা আমাকেই মাথা পেতে নিতে হবে?"

"না না, তা কেন? আমি কিন্তু ঘটনাকে এইভাবে খাড়া করেছি। একটু মন দিয়ে শোনো তো, ঠিকমতো হয়েছে কিনা? কাল রাতে দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে এক অজ্ঞাত আততায়ী বন্ধুর মুখোশ পরে প্রসাদজীর ঘরে ঢোকে। সে এমনই এক বন্ধু যে প্রসাদজীর সিন্দুকের সম্পদ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত ছিল। তারপর সে বেশ মোটাসোটা কোন লৌহদণ্ড অথবা ভোঁতা কুড়ুল জাতীয় কিছু দিয়ে সোফায় বসে থাকা প্রসাদজীর মাথায় সজোরে এমনভাবে আঘাত করে যাতে টুঁ শব্দটি করবার একটুও সুযোগ না পায় প্রসাদজী। এবং তারপরই বন্ধুবর কিচেনে ঢুকে অতিথি সৎকারের আয়োজনে রত জয় বিশোয়ালকেও ওই একইভাবে আক্রমণ করে। অপেশাদার খুনী লোভের বশবর্তী হয়ে কি করবে কিছু ভেবে না পেয়েই জয়কে টেন বাথরুমে রাখে। তারপর সিন্দুক ভেঙে সব কিছু আত্মসাৎ করেই আগাগোড়া সমস্ত পাপ জয় বিশোয়ালের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজে বাঁচবার চেষ্টা করে। এবং সেই জন্যই মোটরের পেছনদিকের ডালা তুলে তাকে তার ভিতরে রাখে। পরে বর্ষণমুখর রাতে নির্জন বঙ্কিম সেতুর ওপর তার প্ল্যান খাটায়।"

"অর্থাৎ তুমি বলতে চাও সেই অজ্ঞাত আততায়ী আমি নিজে?"

"তা বলছি না। তবে তোমার মোটরের পেছনদিকে বেশ কিছু চাপ চাপ রক্ত পড়ে আছে।"

ট্যান্ডন চিৎকার করে উঠল, "প্লিজ স্টপ! তুমি আগাগোড়া বন্ধুর মুখোশ পরে আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছ। তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু হলে এমনটি কি ভাবতে

পারতে না আমাকে বিপদে ফেলার জন্য আমার গাড়িটা নিয়ে কেউ ওরকম করেছে?''

''আরে তাই তো আমি ভাবছি। নাহলে তো তুমি এতক্ষণে অ্যারেস্ট হয়ে যেতে?''

''সত্যি, সত্যি বলছ তুমি?''

''তুমি বড় ঘাবড়ে যাচ্ছো ভোলা। এত নার্ভাস হবার কী আছে?''

''আমার যে মাথা ঘুরছে।''

''এরকম সময়ে ওরকম হয়। কাল তোমার বাথরুমে ঢুকে বেসিনে রক্ত দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বাথরুমে এক কোণে তোমাব রক্তমাখা জামাকাপড়ও আমি জড়ো করা অবস্থায় দেখতে পেয়েছি।''

তপতী হঠাৎ উঃ মাগো' বলে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

আমি বললাম, ''এতক্ষণ তো আমি বকলাম, এবার তোমার কি বক্তব্য একটু শুনি?''

''বক্তব্য আমার একটাই। তোমার অনুমান ঠিক। হঠাৎ লোভের বশবর্তী হয়ে খুন আমিই করেছি। আমি তোমাকে অনেক টাকা দেবো চ্যাটার্জি, প্লিজ, এ যাত্রা আমাকে বাঁচাও।''

''টাকা নিয়ে আমি কি করব ভাই? প্রসাদজীর মতো নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনব?''

''তা কেন? দু'হাতে লোককে বিলোবে। এই দেখ কত টাকা আমার।'' বলেই খাটের ওপর বালিশের পাশে বেড-কভার ঢাকা স্বর্ণালঙ্কাবসহ প্রচুর টাকা আমাকে দেখাল ও।''

''ও টাকা নিশ্চয়ই প্রসাদজীর?''

''হ্যাঁ, আগে তাই ছিল। তারপর আমি নিয়েছিলাম। এখন ওসব তোমার। ওগুলো নিয়ে তুমি আমাকে রেহাই দাও।''

''আরে কী আশ্চর্য! প্রসাদজীর মেয়ের বিয়ে, ও টাকা আমি নিয়ে কী করব? তাদের টাকা তাদের ফেরৎ দিতে হবে না?''

''তার মানে তুমি আমাকে ফাঁসির দড়িতে লটকাতে চাও?''

''সেটা তো আদালত ঠিক করবে।''

ট্যান্ডন হঠাৎ ওর টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা রিভলবার বার করে তাক করল আমার দিকে। এত তাড়াতাড়ি এবং আচমকা যে আমি কিছু বার করবার সময়ই পেলাম না। ট্যান্ডন রিভলবারটা আমার কপালে ঠেকিয়ে বলল, ''তাহলে জেনে রাখো বন্ধু, আজই তোমার শেষ দিন; কেননা যে মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় এক রাতে দু'দুটো খুন করতে পারে তার কাছে তৃতীয় খুনটাও কিছু কঠিন নয়। সবাই জানে তুমি বর্ধমানে গেছ, কিন্তু আমি তোমাকে মেরে টুকরো টুকরো করে বস্তায় পুরে পাথর বেঁধে হাওড়ার ব্রিজ থেকে গঙ্গার জলে ফেলে দেবো। অবশ্য এখনই নয়। গভীর রাতের অন্ধকারে।''

''বলো কী! কিন্তু ট্যান্ডন তুমি বড়ই নির্বোধ। আমাকে মেরেও কি তুমি রেহাই পাবে ভেবেছ? আমার লাশ নিয়ে তুমি ঘর থেকে বেরোবে কী করে? একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখো, চারদিকে থিক থিক করছে পুলিশ। তোমাদের মতন দুটি সোনালী মাছকে ধরাবার জন্য কি চমৎকার জাল আমরা পেতেছি দেখো। আর এই দরজাটা খোল, খুললেই দেখবে মিঃ কাঞ্জিলাল হাতে হাতকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তোমার জন্য।''

ভোলা ট্যান্ডন আমার কপাল থেকে রিভলবারের নলটা সরিয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে

উঁকি মেরে দেখতে গেল আমার কথা সত্যি কিনা। দেওয়াল ঘড়িতে তখন টিক টিক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছিল না সেই দারুণ নিস্তব্ধতায়।

সুন্দর তদন্ত

ঘাটশিলায় আমি অনেকবার গেছি। তবুও ঘাটশিলার আকর্ষণ আমার কমেনি। যত দিন যায় ততই নতুন নতুন রূপে ঘাটশিলাকে দেখি। ঘাটশিলা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে বহরাগোড়াটা কিছুতেই দেখা হয় না। কি যে আছে সেখানে জানি না, তবে বহরাগোড়া নামটার সঙ্গে একটা আরণ্যক পরিবেশ কল্পনা করি। চারদিকে পাহাড়, শালবন, মাঝে আদিবাসী অধ্যুষিত ছোট্ট একটি গ্রাম, এ নিয়েই হয়তো বহরাগোড়া। তাই বহরাগোড়ার আকর্ষণ আমার খুব।

রাত্রি তখন ন'টা। আমার মৌড়িগ্রামের বাড়িতে ইজিচেয়ারে বসে মৌজ করে একটা রোমহর্ষক উপন্যাস পড়ছি, এমন সময় ডোরবেলটা বেজে উঠল। এত রাতে কে রে বাবা!

মৌড়িগ্রামে আমার নিরালাবাসে রাত ন'টা অনেক রাত। সন্ধের পর থেকেই এখানে শেয়ালের ডাক শোনা যায়। কখনো দিনদুপুরেও ডাকে। এই অসময়ে কে আসে? যাই হোক, বই মুড়ে রেখে ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেলাম—"এ কি, পলাশবাবু।"

পলাশবাবু আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। বয়সেও দু'চার বছরের বড়। কাঁধে একটি ঝোলা ব্যাগ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

"আসুন, ভেতরে আসুন।"

পলাশবাবু ঘরে ঢুকে কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে আমার সোফা কাম বেডে দেহটা এলিয়ে দিয়ে বললেন, "ভগবানকে ডাকতে ডাকতে আসছি, আপনার যেন দেখা পাই!"

বললাম, "আপনার অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেখছি। আপনি ভগবানকে ডেকেছেন এটা কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।"

"বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সত্যিই ডেকেছি। সামনে চারদিন ছুটি। এই গুমোট গরমে ঘরে থাকা অসম্ভব। আপনারও ছুটি নিশ্চয়ই। তাই চলুন আজ রাতে অথবা কাল সকালে, দিন চারেকের জন্য কোথাও একটু কেটে পড়ি।"

"অসম্ভব।"

"প্লিজ! আমি উইথ ব্যাগ এ্যান্ড ব্যাগেজ ঘর থেকে বেরিয়েছি, আপনি না গেলে আমি একাই যাব। অনুগ্রহ করে এই চারদিন আপনি আমাকে সঙ্গ দিন।"

"কিন্তু...।"

"কোন কিন্তু রাখবেন না ব্রাদার। আপনি আমাকে অনেকবার বলেছিলেন ঘাটশিলা নিয়ে যাবেন, এই সুযোগ।"

"সবই বুঝলাম। তবে মুশকিলটা কি জানেন? এই ভয়ঙ্কর ভ্যাপসানি গরমে কোথাও গিয়ে শান্তি পাবেন না। আর কোথাও গিয়ে যদি একটু খোলা মন নিয়ে খোলা হাওয়ায়

প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘুরে বেড়াতে না পারি তাহলে ঘর থেকে বেরিয়েই বা লাভ কি বলুন।''

''ভুলে যাচ্ছেন, এটা কিন্তু ভাদ্রের শেষ। শরৎকাল।''

''ঠিক আছে। কিন্তু শরৎ কি এ বছর শরতের রূপে দেখা দিয়েছে? আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। গুমোট গরম। অসম্ভব চড়া রোদ। তার ওপর নদীগুলো শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারাপাতে দু'কূল ভরা।''

''বেশ, তাহলে আমি একাই যাচ্ছি। আপনি টাইম টেবল দেখুন। আজ রাতে ঘাটশিলা যাবার কোন গাড়ি আছে কিনা দেখে বলুন।''

আমি বললাম, ''আরে মশাই, গেলে দুজনেই যাব। একা আপনি যাবেন কেন? তবে এই গরমে চড়া রোদ্দুরে একটুও ঘুরতে পারবেন না। সুবর্ণরেখায় নাইতে পারবেন না।''

''তবুও যাবো।''

''তাহলে আজকের রাত্রিটা বিশ্রাম নিন। কাল সকালেই যাব আমরা।''

''আঃ বাঁচালেন।''

আমি স্টোভ জ্বেলে চা বসালাম। পলাশবাবু ডিম খেতে ভালবাসেন, তাই দুজনের জন্য দুটো ডিমের ওমলেট আর চা।

পলাশবাবু বললেন, ''আপনিও অবিবাহিত, আমিও বিয়ে করিনি। তবু মশাই আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। সরকারি চাকরি করেন। বেসরকারিভাবে গোয়েন্দাগিরি করেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু আমরা জীবনটা বড়ই মিজারেবল। নিজে বিয়ে না করেও ভাইয়ের সংসার টানছি। আর সব চেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন, যাদের জন্য সারাজীবন ধরে তিল তিল করে নিজেকে সার করলাম, তারাই এখন উপার্জন কম করি বলে আমাকে সন্দেহ করে। ওদের ধারণা আমি নাকি ইচ্ছে করে কম খরচ করি। আমার ব্যাঙ্কে যে ক'টা টাকা আছে, সেগুলো আত্মসাৎ না করা পর্যন্ত ওদের শান্তি নেই। আমার ভাইপো বম্বে যাবে বলে আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছিল। আমি দিইনি বলে আজ আমাকে কি অপমানটাই না করেছে। আপনি বিশ্বাস করুন চ্যাটার্জিবাবু, এক এক সময় মনে হয় আমি স্যুইসাইড করি। যখন মরিশন কোম্পানিতে চাকরি করতাম তখন দু'হাজার টাকা মাইনে পেতাম। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে দু'হাজার টাকার দাম নেহাৎ কম ছিল না। তখন সব টাকা ওদের ধরে দিয়েছি। নিজের বলতে কিছু রাখিনি। এখন ছ'শো টাকা মাইনে পাই। পাঁচশো টাকা ওদের দিই, তাতে ওদের মন ভরে না। দুপুরে দুটি ভাত আর রাত্রে চারখানা রুটি খেতে দেয়। জলখাবার পাই না, চা পাই না। অথচ কোলেপিঠে-বুকে করে মানুষ করেছি ওদের, তাই ছেড়েও যেতে পারি না। এ অবস্থায় বেঁচে থেকে লাভ কি বলুন? কদিন ধরে কেবলই মনে হচ্ছিল, এই চার দেওয়ালের গণ্ডির বাইরে কোথাও থেকে একটু ঘুরে আসি। সামনে চারদিন ছুটি। এটাকে কাজে লাগাতে চাই। মনে হ'ল আপনার কথা, চলে এলাম তাই।''

আমি পলাশবাবুর দিকে ওমলেট আর চা এগিয়ে দিয়ে নিজেও খেতে লাগলাম। খেতে খেতেই বললাম, ''সব মানুষের জীবনেই একটা না একটা ট্র্যাজেডি আছে। আমারও যে নেই তা নয়, তবে এখন আমি মুক্ত। বিয়ে-থা করিনি, কারণ গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে বিভিন্ন চক্রান্তের জালে যখন তখন এমনভাবে জড়িয়ে পড়ি, যাতে যে-কোন সময় জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই বেশ আছি।''

"তাহলে যাওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত তো?"

"এর পরে আর না বলি কি করে? আমি নিজেও একজন ভ্রমণরসিক লোক। ঘোরার ব্যাপারে আমার কোন ক্লান্তি নেই। চলুন দু'দিন ঘুরে আসি। রোদ্দুরের সময় বাইরে না বেরোলেই হল।"

"আমার অনেক দিনের আশা ছিল ঘাটশিলা যাবার।"

"আমিও ঘাটশিলা থেকে একবার বহরাগোড়া যাবার কথা ভাবছিলাম। চলুন, এই সুযোগে বহরাগোড়াটাও ঘুরে আসি।"

"আপনি আমাকে যেখানে যেতে বলবেন সেখানেই যাব।"

"সে আমি জানি এবং সেইজন্যই সঙ্গী হিসাবে আপনাকে পেলে আমার খুব আনন্দ হয়। তাছাড়া আপনার মানসিকতার সঙ্গে আমরা মানসিকতাও মিলে যায়। আপনি আমার উপযুক্ত ভ্রমণসঙ্গী।"

গল্প করতে করতে এবং সবকিছু গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে অনেক রাত হয়ে গেল। তাই ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে শুয়ে পড়লাম দুজনে।

ঠিক সাড়ে তিনটে নাগাদ এলার্ম বেজে উঠল।

আমরা উঠে মুখ-হাত ধুয়ে একটু চা খেয়ে নিয়ে চললাম ট্রেন ধরতে। মৌড়িগ্রাম থেকে চারটে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ নাগাদ হাওড়া যাবার একটি লোক্যাল ট্রেন পাওয়া যায়। সেই ট্রেনে হাওড়া গিয়ে সকাল ছ'টা দশের ইস্পাত এক্সপ্রেস ধরতে হবে। গাড়ি লেট না করলে দশটার মধ্যেই পৌঁছে যাব ঘাটশিলায়।

ঘাটশিলা।

নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন এসে ঘাটশিলায় থামল। আমরা ট্রেন থেকে নেমে দু'পায়ের রাস্তা হেঁটে মাড়োয়ারি ধর্মশালায় গিয়ে উঠলাম। ধর্মশালাটি মন্দ নয়। আলো পাখা তক্তাপোষ সবকিছুই আছে এখানে। দৈনিক ভাড়া পাঁচ টাকা।

যাই হোক, আমরা ধর্মশালায় ঘর নিয়ে ইঁদারার জলে স্নান করে স্টেশনের কাছেই একটি হোটেলে পেটভরে খেয়ে বহরাগোড়ার মিনিতে উঠলাম। উঃ, সে কি প্রচণ্ড গরম! গলগল করে ঘাম ছুটতে লাগল গা দিয়ে। মাথা ঘুরতে লাগল।

এক সময় মিনিবাস ছাড়ল। এইবার একটু হাওয়া লাগল গায়ে। মিনিবাস ছেড়ে ফুলডুংরি পাহাড়ের পাশ দিয়ে কাশীদার ওপর দিয়ে তামুকপাল ছুঁয়ে ক্রমশ ধলভূমগড়ের দিকে এগোতে লাগল।

স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে যেতে লাগল ক্রমশ।

যত যাচ্ছি ততই পাহাড়-জঙ্গল ফাঁকা হয়ে আসছে। একজন সহযাত্রী আমাদের কথাবার্তা শুনে বললেন, "আপনারা আর বেড়াতে যাবার জায়গা পেলেন না মশাই? কী আছে কি বহরাগাড়ায়? মুঠোর মধ্যে ধরা যায় এমন একটি ছোট্ট গ্রাম ছাড়া কিছুই নেই সেখানে। তার চেয়ে আপনারা বরং ধলভূমগড়ে নেমে যান। অথবা নরসিংগড়ে। সেখানে পুরোনো রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখলে অতীত স্মৃতিতে মন ভরে যাবে।"

পলাশবাবু বললেন, "কী করবেন তাহলে?"

বললাম, "কিছুই না। টিকিট কেটে উঠে যখন পড়েছি তখন বহরাগোড়ার চেহারাটা

একটু দেখেই যাই। ভালো যদি না লাগে তাহলে এই বাসেই ফিরে আসব। আর হাতে সময় থাকলে নরসিংগড়টাও ঘুরে আসব একটু।"

ভদ্রলোক বললেন, "খুব সময় থাকবে। এখন ভাদ্র মাসের বেলা। তাছাড়া রাত ন'টা পর্যন্ত বাস চলে এই পথে।"

আর একজন সহযাত্রী বললেন, "আজকে ন'টা অব্দি চলবে না। আজ মহরম। অনেক বাস বন্ধ আছে আজকে।"

"তবু সন্ধে পর্যন্ত ঘুরলে একটা না একটা বাস পাবেনই। মিনি, টেম্পো, বাস কিছু না পেলে লরিও আছে।"

আমি বললাম, "বাস রাস্তা থেকে নরসিংগড়ের রাজবাড়ি কতদূর?"

"সামনেই। দশ মিনিটের পথ, যাকে বলবেন, সেই দেখিয়ে দেবে। তাছাড়া আমি তো ওখানকারই লোক।"

পলাশবাবু বললেন, "তাহলে তো কথাই নেই। ফেরার বাস না পেলে আপনার বাড়িতেই উঠব।"

ভদ্রলোক অমায়িকভাবে হেসে বললেন, "সে সৌভাগ্য কি হবে আমার? আপনারা যদি আসেন তো বলুন, আমি আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করি।"

পলাশবাবু বললেন, "আমরা যাবোই, আপনি ব্যবস্থা করুন। যদি ফেরার বাস না পাই তাহলে আপনার ওখানেই উঠছি কিন্তু। মহাশয়ের নাম?"

"আমার নাম বাসুদেব চক্রবর্তী। আপনাদের?"

"আমার নাম পলাশ মজুমদার। আর আমার এই বন্ধুটির নাম অম্বর চ্যাটার্জি। আমি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। আর ইনি সরকারি চাকরি করেন। সেই সঙ্গে করেন সখের গোয়েন্দাগিরি।"

বাসুদেববাবু অবাক-বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সত্যি!"

"আপনাকে মিথ্যে বলে লাভ?"

বাসুদেববাবু উঠে দাঁড়ালেন এবার। বললেন, "আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব কিন্তু। অনুগ্রহ করে আসবেনই। নরসিংহগড় আসছে, আমি নেমে যাই।"

বাস থামল। বাসুদেববাবু বাস থেকে নেমে আবার বললেন, "দেখবেন, যেন ভুলে যাবেন না।" তারপর কেমন যেন করুণ চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন চ্যাটার্জিবাবু। অনুগ্রহ করে গরিবের বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দেবেন। আমার খুব বিপদ। আপনি এলে সব বলব। যদি আপনি বাঁচাতে পারেন আমায়।"

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। বাস ছাড়লে পলাশবাবুকে বললাম, "আপনি মশাই একেবারে ছেলেমানুষ। সকলকে সব কথা বলে কখনো? এলাম কোথায় বেড়াতে, তা না এখানেও রহস্যের জাল?"

'কী আর করবেন বলুন? কথায় আছে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। এড়িয়ে যেতে চান, না নামলেই হবে।"

"তাই কি পারি? মানুষকে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করি কী করে?"

কিছু সময়ের মধ্যে আমরা বহরাগোড়ায় পৌঁছে গেলাম। সত্যি-সত্যিই মুঠোর মধ্যে ধরা যাবে এমন একটি গ্রাম। হয়তো এ জায়গাটার এমন বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে, যা

আমরা জানি না। কিন্তু সেই গুরুত্বের কথা জানতে চাইও না আমরা। এই নামটার সঙ্গে যে আরণ্যক গন্ধ ছিল তাও বিলীন হয়ে গেল। একেবারে ফাঁকা জায়গা। ধারে-কাছে কোন অরণ্য নেই যা দেখে চোখ জুড়োয়, এমন কোন প্রাকৃতিক শোভাও নেই। টিলা পাহাড় তো দূরের কথা, টিলা পাহাড়রে একটু অস্পষ্ট রেখাও এখানে চোখে পড়ে না।

পলাশবাবু বললেন, "এই আপনার বহরাগোড়া? কী আছে এখানে?"

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ! দারুণ ঠকলাম তো। এই অসহ্য রোদের উত্তাপ নিয়ে এতদূর আসাটাই বেকার হয়ে গেল। ঠিক আছে, এখানে আর অযথা সময় নষ্ট করা নয়, চলুন এই বাসেই ফিরে যাই।"

"কোথায় যাবেন? নরসিংগড়?"

"হ্যাঁ। বাসুদেববাবুর নিমন্ত্রণটা রক্ষা করে আসি।"

সময় কাটাবার জন্য একটি দোকান বসে এক কাপ করে চা খেয়ে আমরা সেই বাসেই নরসিংগড়ে ফিরে এলাম।

বাস থেকে নামতেই চমৎকার পটভূমি দেখে মনটা ভরে উঠল। লাল মাটির আঁকাবাঁকা পথ গাছপালার ফাঁক দিয়ে গ্রামের বুকে হারিয়ে গেছে।

গ্রামে পৌঁছে বাসুদেববাবুর নাম করতেই একজন লোক আমাদের বাসুদেববাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিল।

বেশ অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি। মনে হয় একসময় এনারা হয়তো এখানকার জ[illegible] ছিলেন। বাসুদেববাবু দোতলার জানলা থেকে আমাদের দেখতে পেয়েই হন্তদন্ত হয়ে [illegible] এলেন অভ্যর্থনা করতে, "আরে আসুন আসুন। কী সৌভাগ্য আমার! আপনারা যে সত্যিই আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন তা কিন্তু ভাবতেও পারিনি।"

আমরা বাসুদেববাবুর সঙ্গে ভেতর-বাড়িতে গেলাম। বাইরের থেকে ভেতরটা আরো চমৎকার। দেখে মুগ্ধ হয়ে বললাম, "আপনি তো দেখছি রাজা লোক মশাই!"

বাসুদেববাবু হাসলেন। বললেন, "এক সময় ছিলাম। তবে এখন তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। কলসীর জল গড়িয়ে খেতে খেতে সব শেষ।"

পলাশবাবু বললেন, "এখানে যে পুরোনো রাজবাড়ি দেখতে আসে লোকে, সে কি আপনাদেরই?"

বাসুদেববাবু বললেন, "আরে না না। ও হল ধলভূমগড়ের রাজাদের প্রাসাদ। আমরা তাদের দাসানুদাস। তবে একসময় কেউকেটা ছিলাম। এখন এই সম্পত্তি রক্ষা করাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"সে কি! সরকার নিয়ে নিচ্ছে নাকি?"

"না, না। এটা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। একটু জল-টল খান, বিশ্রাম করুন। রাত্রিবেলা সব বলব আপনাদের। আমি এখন এমনই এক পরিস্থিতির মধ্যে আছি যে, আমার জীবনও এখন বিপন্ন। আমার ভাই, নিজের মায়ের পেটের ভাই—"

এমন সময় এক মধ্যবয়সী সুন্দরী মহিলা খাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তারপর টেবিলের ওপর সেগুলো নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, "আসুন, একটু এদিকে আসুন আপনারা। মুখ-হাত ধুয়ে নিন। তারপর খেতে খেতে যত ইচ্ছে গল্প করবেন।"

বাসুদেববাবু বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন উনি। চলুন কলঘরটা ওদিকে, মুখহাত

ধোবেন চলুন।"

আমরা তাঁদের কথামত কল ঘরে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে খাবার টেবিলে এসে বসলাম। অতি উপাদেয় হালুয়া পুরী আর রসগোল্লা প্লেটে সাজানো ছিল। তাই খেয়ে চা খেলাম।

বাসুদেববাবু বললেন, "আমার স্ত্রী সৌদামিনী। আমার অবর্তমানে কী যে হবে বেচারি তা কে জানে!"

"আপনি এখনই এত অধীর হচ্ছেন কেন? মরবার বয়স এখনো হয়নি আপনার।"

"কী যে বলেন আপনি! সত্যিই ছেলেমানুষ। মরার কী বয়স লাগে মশাই? অনেক সময় একটা হাই তুলতে গেলেও মানুষের স্ট্রোক হয়ে যায়। বিশেষ করে আমার জীবন এখন পদ্মপাতায় জলের মত। সব বলব আপনাকে। বলব বলেই এত করে আসতে অনুরোধ করেছি। চলুন এখন বেলা থাকতে থাকতে রাজবাড়িটা আপনাদের দেখিয়ে আনি। খুব ভালো লাগবে। ভোর হলেই পাখি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে যখন আমি মর্নিং ওয়াক করতে চলে যাই ওই রাজবাড়ির দিকে, তখন পুরোনো ইতিহাসের পাতায় মন আমার হারিয়ে যায়। কী দারুণ সুখের দিন ছিল সেসব। যাক, কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে আসছে। চলুন আমরা যাই।"

আমরাও যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

দরজার আড়াল থেকে সৌদামিনী দেবী বললেন, "বেশি সন্ধে কোর না যেন। আমাব বাপু ভয় করে।"

আমি বললাম, "কিসের ভয়?"

"আমার ভাই আমাকে খুন করার হুমকি দিয়েছে, তাই ইদানীং ও আমাকে খুব চোখে চোখে রাখে।"

পলাশবাবু বললেন, "ঠিকই করেন। কেউ যদি কিছু করব বলে শাসিয়ে থাকে তাহলে একটু সাবধানে চলাফেরা করাই ভাল। কেননা এখনকার মানুষকে বিশ্বাস নেই।"

আমি এই ব্যাপারটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা ভাবতে ভাবতে বাসুদেববাবুর সঙ্গে পথ চলতে লাগলাম। এপথ সেপথ করে সামান্য একটু যাবার পর একটি মন্দির চোখে পড়ল। শিবমন্দির। স্থানীয় মহিলারা পুজো দিতে এসেছেন কেউ কেউ। সে মন্দির বাঁয়ে রেখে বাঁদিকে একটু বেঁকে এক আদিবাসী পল্লী পার হতেই ধলভূম রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপের কাছে এসে পৌঁছলাম। সত্যিই রমণীয় স্থান। রাজাদের পুরোনো রাধাকৃষ্ণ মন্দিরটি আজও আছে। নিত্য পূজা হয় সেখানে। তারপর সবই ভেঙে চুরে পড়ে আছে। রাজবাড়ির মূল প্রাসাদটিরও অবস্থা তথৈবচ। তবে এটি একেবারে ভেঙে পড়েনি। এর দোতলার ছাদে কিছু ছেলেমেয়ে খেলা করছে দেখলাম। শুনলাম বাড়িটিতে স্থানীয় অনেক লোকজন এখন ভাড়া থাকেন।

রাজবাড়ি দেখে ফিরতেই সন্ধে হয়ে গেল।

সৌদামিনী দেবী আনচান করছিলেন, আমরা যেতেই বললেন, "শশাঙ্ক এসেছিল। বলল, আমার পেছনে সি.আই.ডি. লাগানো হয়েছে? ওঁরা এলে বলে দিও, যদি ওঁরা নিজেদের মঙ্গল চান তাহলে যেন আজই চলে যান এখান থেকে।"

বাসুদেববাবুর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন, "তাই নাকি?"

সৌদামিনী দেবী বললেন, "আসলে তুমি একটি বোকা লোক। বাড়িতে কে আসছেন

না আসছেন সেকথা লোকের কাছে বলতে যাও কেন?"

বাসুদেববাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, "কী আশ্চর্য, আমি কাউকে কিছুই বলিনি!"

"ও তাহলে জানতে পারলে কি করে?"

আমি বললাম, "সম্ভবত ঘাটশিলা থেকে যে বাসে আমরা বহরাগোড়া যাচ্ছিলাম, সেই বাসেই ওর কোন লোক ছিল। আমাদের আলাপ-পর্ব হয়তো সে শুনেছে।"

পলাশবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তা হতে পারে। তাহলে এখন আপনারা আমাদের কী করতে বলেন?"

বাসুদেববাবু বললেন, 'কী বলি বলুন তো! চলেই যান বরং। "আমার ভাই তো নয়, সাক্ষাৎ শয়তান। যদি কিছু করে বসে!"

সৌদামিনী দেবী বললেন, "আমিও তাই বলি। পরের ছেলে বেড়াতে এসে কেন বিপদে পড়বেন?"

পলাশবাবু বললেন, "অবজেকশন! আমি কিন্তু ছেলে নই। এখন আমি রিটায়ার্ড ম্যান। তবে অম্বরবাবুর ব্যাপার আলাদা, স্মার্ট ইয়ংম্যান।"

আমি বললাম, "আপনাদের এখানে মুরগী পাওয়া যায়?"

"কেন বলুন তো?"

"যদি আপনাদের দিক থেকে কোন অসুবিধা না থাকে তাহলে মুরগীর মাংস আর ভাত রান্না করুন। আজ রাত্রে পেট ভরে মাংস-ভাত খেয়ে এখানে ঘুমুবো।"

"তাহলে আপনারা যাবেন না?"

পলাশবাবু চাপা গলায় বললেন, "কী ছেলেমানুষি করছেন? অযথা পরের ব্যাপারে নাক গলিয়ে লাভ কি? এলাম কোথায় বেড়াতে, এখন কেটে পড়ুন তো মশাই!"

আমিও চাপা গলায় বললাম, "এসে যখন পড়েছি আর তা হয় না। বাসের ভেতর লোককে শুনিয়ে পরিচয় দিতে কে বলেছিল? আমি? এখন ঠ্যালা সামলান!"

"সত্যি, এমন যে হবে তা আমি ভাবিনি চ্যাটার্জিবাবু!"

আমি বললাম, "সবকিছুরই শেষ আছে। কাজেই যা হবার তা হোক। আমরা এখানে থেকেই যাচ্ছি। মনে হচ্ছে নাটক এখানে ভালই জমবে।"

বাসুদেববাবু আনন্দে অধীর হয়ে আমাদের দোতলায় নিয়ে গেলেন। তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। তবে এ বাড়িতে ইলেকট্রিক থাকায় আলোর অভাব হল না। একটি বড় ঘর দেখিয়ে বললেন, "এটাতে আপনাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছি।"

বনেদি বড়লোকের ঘর-বাড়ি যেমন, এ বাড়িটিও ঠিক তেমনি। মেহগনি কাঠের খাট আলমারি। দেওয়ালে পিতৃপুরুষদের তৈলচিত্র সবই আছে। ঘরে ঢোকার মুখে দরজার মাথায় শিংওয়ালা হরিণের মুখ। একসময় এসব অঞ্চলে প্রচুর হরিণ ছিল। সেই হরিণ শিকার করে এঁদেরই পূর্বপুরুষরা কেউ ওভাবে সাজিয়ে রেখেছেন ওটিকে।

সেরাতে আমরা তিনজনে জোর গল্পে মেতে উঠলাম। বাসুদেববাবু সত্যিই মিশুকে এবং অমায়িক লোক। কয়েক ঘণ্টা আগে যে কেউ কাউকে চিনতাম না তা বলে মনেই হল না। যাই হোক, ওঁর ভাইয়ের ব্যাপারে বাসুদেববাবু যা বললেন তা হল এই—

বাসুদেববাবুরা চার ভাই। বড় ভাই সর্পাঘাতে মারা গেছেন। মেজো আমেরিকায়। বাসুদেববাবু সেজো। আর ছোট ভাই শশাঙ্ক যৌবনে এক বিবাহিত

নিয়ে দেশ ছেড়ে যায়। এই শশাঙ্কই এখন ধূমকেতুর মত হঠাৎ ফিরে এসে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। অর্থাৎ বাসুদেববাবু তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে এই বাড়িকে রক্ষণাবেক্ষণের পর ভাই এসে বাড়ির অংশ দাবি করছে।

সব শুনে পলাশবাবু বললেন, "করুক না। পৈতৃক সম্পত্তির ওপর সকলেরই সমান অধিকার। তার অংশটা তাকে দিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।"

বাসুদেববাবু বললেন, "যায় না। তার কারণ এ বাড়িতে তার কোন অংশ নেই।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ। আমার বড়দা মারা যাবার পর সম্পত্তির দাবিদার আমরা তিন ভাই। মেজদা আমেরিকায় নাগরিকত্ব পেয়ে বসবাস করছেন। উনি লিখিতভাবে জানিয়েছেন, এ দেশে আর কখনো ফিরবেন না এবং সম্পত্তির কোন অংশ নেবেন না। আর ছোট ভাই? সে যাবার আগে আমাদের পিতৃপুরুষের সঞ্চিত সমস্ত সোনা-দানা এবং নগদ টাকা প্রায় দেড় লাখের মতো নিয়ে পালিয়ে যায়। এর ফলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাই আমরা। ছোটভাই চলে যাবার আমার মা আত্মহত্যা করেন। আর বাবা? সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিয়ে হৃদরোগে পর মারা যান। সেই উইল এখনো আমার কাছে আছে।"

আমরা অবাক হয়ে সব শুনলাম।

বাসুদেববাবু বললেন, "বিশ্বাস করুন, ভাই আমাদের সর্বস্বান্ত করে দিয়ে চলে গিয়েছিল। ও চলে যাবার পর কয়েকটা বছর যে কি ভাবে কাটিয়েছিলাম, আপনারা তা ভাবতে পারবেন না। এমনই দুঃসময় গেছে যে, না খেয়েই অনেকদিন কেটেছে। অথচ না পেরেছি কুলিগিরি করতে, না লোকের কাছে ভিক্ষে চাইতে। তারপর যাই হোক ভগবানেব কৃপায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। সুন্দরী বউ পেয়েছি। আর এই এতবড় বাড়িটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করছি। এই বাড়িটাকে একবার হোয়াইট ওয়াশ করতে গেলে বিশ হাজার টাকা খরচ হয়। এর জানালা-দরজা দেখছেন? এইসব কাঠ আর পাওয়া যাবে? এবার বলুন তো কত টাকা খরচ করলে এইসব দরজা জানলাকে রং করা যায়? সব আমার নিজের টাকায় করেছি, এখন কেন আমি সম্পত্তির ভাগ দেবো?"

পলাশবাবু বললেন, "না, দেওয়াটা উচিত নয়। তবে একটা কথা, নিজের ভাই তো। ও আপনার ছেলে হলে কি করতেন? তাকে কি ফিরিয়ে নিতেন না? সেই রকমই ভেবে ওকে ক্ষমা করে কিছু অংশ ওকে দিয়ে দিন। তাহলে দেখবেন ওর রাগও কমবে এবং আপনারও জীবন বিপন্ন হবে না। আপনার ছেলেমেয়ে কটি?"

"আমার দুই ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলে দুটি বরোদায় থাকে। একজন এল. আই.সিতে এবং অন্যজন ব্যাঙ্কে কাজ করে। মেয়েটির এক বছর হল বিয়ে দিয়েছি। ও এখন ওর শ্বশুরবাড়ি দুর্গাপুরে আছে। ভাইকে সম্পত্তির অর্ধেক অংশ দেবার কথা বলছেন? প্রাণ থাকতে দেবো না, কারণ এই সম্পত্তি তাকে লিখে দিলেই সে তার অংশ বিক্রি করে দেবে। ইতিমধ্যে দু'বার বিয়ে করেছে সে। অতএব তার চরিত্রটা যে কি রকম তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তাছাড়া কেনই বা দেবো বলুন তো? এই প্রাসাদকে যক্ষের মত এতদিন ধরে আগলে রেখেছে কে? কে এর দেখা-শোনা করেছে? আমি না দেখলে এই প্রাসাদও একদিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হত।"

আমি বললাম, "ঘটনা যদি এইরকমই হয়, তাহলে বলব এ বাড়ি আপনি দেবেন না।

তবে সাবধানে থাকবেন একটু। রাতে, ভোরে, অন্ধকারে অযথা নির্জনে যাবেন না। তা আপনার ভাই এখন কোথায় আছে জানেন?''

''না। তবে ও এখন একটা খারাপ দলের সঙ্গে মিশে চুরি ডাকাতি রাহাজানি এইসব করে বেড়াচ্ছে।''

''তাই নাকি?''

''হ্যাঁ।''

''ঠিক আছে! আশা করি আমরা দু'একদিন থাকলে ওর মোকাবিলা করতে পারব।''

পলাশবাবু লাফিয়ে উঠলেন, ''আপনি পাগল হয়ে গেলেন নাকি মশাই?''

''উঁহু। আমার মাথা গোল এবং পা লম্বা ঠিকই আছে! আপনি কাল সকালেই ঘাটশিলা থেকে আমাদের মালপত্তরগুলো নিয়ে চলে আসুন। এখানে আমরা দিনকতক থাকব।''

পলাশবাবু বললেন, ''আপনি থাকুন মশাই। আমি ওসবের ভেতরে নেই। বাসুদেববাবু যদি কোন লোককে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেন, আমি তার হাতে আপনার মালপত্তরগুলো পাঠিয়ে দেবো। কাল সকালেই আমি চলে যাবো এখানে থেকে।''

সেরাতে আমবা আর আলোচনা না বাড়িয়ে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লাম। আঃ. কী গভীর ঘুমে দু'চোখ বুজে এলো আমাদের!

খুব ভোবে বাসুদেববাবু ঘুম থেকে উঠেই আমাদের ডেকে তুললেন। বললেন, ''চলুন না একটু, বেড়িয়ে আসি। এই ভোরে পাখির ডাক শুনে গাছপালার সবুজ গন্ধ শুঁকে মনটাকে তাজা করে আনি। একা বেরোতে ভয় হয়। আজ যখন আপনারা আছেন তখন সে ভয় আর নেই।''

আমি বললম, ''বেশ তো, চলুন না। ভোরে বেড়ানোর একটা আনন্দ আছে বৈকি।''

পলাশবাবু ঘুমোনোর ভান করে পড়েছিলেন, এবার একবার আড়মোড়া ভেঙে বললেন, ''দয়া করে আমাকে বাদ দেবেন না স্যার। আমাকেও সঙ্গে নিন।''

আমি বললাম, ''সে কী মশাই! আপনার তো আজ ঘাটশিলায় ফিরে যাবার কথা। আপনি আমাদের সঙ্গে গিয়ে কী করবেন?'''

''আরে ঘাটশিলায় তো এখুনি যাচ্ছি না। বেলায় দেখা যাবে। এখন আপনাদের সঙ্গটা ছাড়ি কেন? আসলে আমি মশাই বেড়াতে এসেছি। কোন ঝুট-ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে সময় নষ্ট করাটা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করি না। তবে ঘটনাচক্রে জড়িয়ে যখন পড়লাম তখন আপনাকে এখানে একা রেখে আমি যাই কী করে?''

এই এত ভোরেও বাসুদেববাবুর স্ত্রী সৌদামিনী আমাদের চা খাওয়ালেন। চা খেয়ে আমরা প্রাতঃভ্রমণে বেরোলাম। ভাদ্রের গুমোট গরম এখন নেই। শরতের শিশির-ভেজা পথে এখন শিউলির ও বনপুষ্পের সৌরভ। তাছাড়া নতুন নতুন সবুজ পাতাযুক্ত গাছপালার গন্ধও মন-প্রাণ যেন ভরিয়ে তুলল।

আমরা মেঠো পথ ধরে নরসিংগড়ের রাজপ্রাসাদের দিকে এগোতে লাগলাম। কিছু পথ আসার পর রাজবাড়ির কাছাকাছি একটি ভাঙা মন্দিরের পাশে আগাছার জঙ্গলে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম আমরা। দেখলাম একটু গর্তমত অংশে বুনো ঝোপঝাড়ের ওপর একটি মানুষের দেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

"আশ্চর্য তো: কী করছে লোকটি ওখানে? জীবিত না মৃত?"

বাসুদেববাবু বললেন, "মনে হচ্ছে নেশা করে পড়ে আছে কেউ!"

পলাশবাবু বললেন, "উঁহু। আমার তো মনে হচ্ছে ডেডবডি ওটা।"

"অসম্ভব। ডেড বডি ওখানে কি করে আসবে?"

"যে ভাবে আসে সেইভাবেই এসেছে। অর্থাৎ কেউ খুন-টুন করে ফেলে রেখে গেছে।"

বাসুদেববাবু বললেন, "না না, এ আমি বিশ্বাস করি না। এখানে এরকম কোন ব্যাড এলিমেন্টস্ নেই। অবশ্য আমার নিজের ব্যাপারটা ব্যক্তিগত। ভাই-ভাই শত্রুতা। জানেন তো, জ্ঞাতিশত্রু বড় শত্রু, ভাইশত্রু মহাকাল।"

আমি বললাম, "যুক্তি এবং তর্কের কোন দরকার নেই। ওটা ডেড বডিই। দেখছেন না, নড়াচড়া করছে না। চলুন তো কাছে গিয়ে দেখি।"

আমরা দ্রুতপায়ে সেইদিকেই এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কাছাকাছি যেতেই দেখলাম বাসুদেববাবু কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেছেন। তাঁর মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেল। তিনি ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে সেই দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলেন নির্বিকার হয়ে।

আমি বললাম, "কী মশাই, চেনেন নাকি?"

বাসুদেববাবু ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লেন, "হ্যাঁ। আমার ছোট ভাই শশাঙ্ক।"

বিনামেঘে বজ্রপাত হলে লোকে যে ভাবে চমকায়, আমরাও ঠিক সেইভাবেই চমকে উঠলাম, "আপনার ভাই শশাঙ্ক!"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু এটা কি করে সম্ভব! ও-ই তো আপনাকে খুন করবার জন্য শাসাচ্ছিল। মাঝখান থেকে ও নিজেই খুন হয়ে গেল!"

পলাশবাবু বললেন, "ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আপনার তো ভালোই হল মশাই। এখন থেকে আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন।"

বাসুদেববাবু বললেন, "কিন্তু পুলিশ? পুলিশ আমাকে নিশ্চিন্তে থাকতে দেবে? ওর সঙ্গে সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে এই বিরোধের কথা এখানকার সবাই জানে। এমন কি পুলিশের কাছেও এই ব্যাপারে রিপোর্ট পেশ করা আছে। এইসময় ওর এই খুন হয়ে যাওয়াটা আমার পক্ষে খুব একটা মঙ্গলজনক কি? সবাই তো আমাকেই সন্দেহ করবে। ভাববে খুনটা আমিই করিয়েছি।"

পলাশবাবু বললেন, "সেজন্য তো আমার বন্ধু আছে। তাছাড়া কাল সারারাত আমরা আপনার বাড়িতে ছিলাম, এর চেয়ে সাক্ষ্য আর কি হতে পারে?"

আমি বললাম, "পলাশবাবু, আপনি ভুল করছেন। এই সাক্ষ্যের কী দাম আছে পুলিশের সন্দেহের কাছে? না হয় থাকলামই আমরা ওনার ঘরে, কিন্তু মাঝরাত্তিরে উনি যে চুপি চুপি উঠে গিয়ে কাজটা সেরে আসেননি তা কে বলতে পারে? আমরা সারারাত ছিলাম ঠিক কথা, কিন্তু জেগে তো ছিলাম না। তাছাড়া ওনার নিযুক্ত কোন লোকের দ্বারাও তো খুনটা হওয়া সম্ভব। এখন চলুন, খুনটা কি ভাবে হয়েছে একটু দেখে আসি।"

আমরা মৃতদেহের খুব কাছে গিয়ে বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করতে লাগলাম, কিন্তু না. কোথাও কোন রক্তপাতের ব্যাপার নেই। অথচ মানুষটা মৃত।

পলাশবাবু বললেন, ''ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়। তবে এমনও হতে পারে যে আদৌ এটা খুন নয়।''

বাসুদেববাবু বললেন, ''তার মানে কী বলতে চান আপনি?''

''হয়তো স্ট্রোক হয়েছে।''

আমি বললাম, ''হতে পাবে। তবে আশপাশের পদচিহ্নগুলি দেখে মনে হচ্ছে না কি যে মৃতদেহটিকে বেশ কিছু লোক টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে।''

সবাই এবার ভালো করে চারদিক দেখে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। আশপাশে বেশ কিছু ভারি পায়ের দাগ শিশির-ভেজা মাটির ওপর চেপে বসেছে। কিন্তু মৃত্যুটা কিভাবে ঘটল তা ভেবে পেলাম না। কারণ মুখে কোন বিকৃতি নেই, কোথাও কোন রক্তের ছিটেফোঁটাও নেই। যদিও দেহটাকে নেড়েচেড়ে সনাক্তকরণ সম্ভব হল না, তবুও বুঝলাম অনুমান ঠিক। এটি খুন। ঠিক কোন অযন্ত্রণাদায়ক উপায়ে। তবে মৃতদেহের এক পায়ে চটি দেখলাম, কিন্তু অপর পা খালি। তার মানে এটিকে টেনে আনার সময় আর এক পাটি চটি খুলে পড়ে গেছে কোথাও।

আমি বললাম, ''চলুন তো, একটু খুঁজে পেতে দেখি।'' তারপর বাসুদেববাবুকে বললাম, ''আপনি মশাই থানায় যান। ঘরে গিয়ে পাশাপাশি বাড়ির কোন একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে এখুনি পুলিশ ডেকে আনুন।''

বাসুদেববাবু চলে গেলে অনেক কষ্টে পায়ের ছাপ দেখে এগোতে লাগলাম। এইখানে পায়ের ছাপ স্পষ্ট হলেও অন্যসব জায়গায় অস্পষ্ট। তাছাড়া আকাশ এখনো ভালো করে পরিষ্কার হয়নি বলে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখাও সম্ভব হল না।

দু'দশ মিনিটের মধ্যেই অবশ্য আবছা ভাবটা কেটে গিয়ে ভালো করে আলো ফুটে উঠল। আমরা পদচিহ্ন লক্ষ্য করে একটি ভাঙাবাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। বাড়িতে ঢুকে দেখলাম, সেখানে কিছু খালি বোতল ইত্যাদি পড়ে আছে। আর এইখানেই পাওয়া গেল আর এক পাটি চটি। কিন্তু এরপর অনেক চেষ্টা করেও কোথাও কোন পদচিহ্ন দেখতে পেলাম না। রাঙা মাটির মালভূমি অঞ্চল বৃক্ষলতায় শোভিত হয়ে বহুদূরে মিলিয়ে গেছে।

আমরা যখন কোনরকম সূত্র সন্ধান করতে না পেরে সেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছি, তখন হঠাৎ এক বিশাল শরীর যুবক আমাদের পথরোধ করে দাঁড়াল। যুবকটি সন্দেহের চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে,''আপনারা এর ভেতরে কি করছিলেন?''

আমি লোকটির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, ''দেখছিলাম এর ভেতরে কিসের আড্ডা বসে।''

''কিন্তু আপনাদের তো কোনদিন দেখিনি এখানে?''

''আমরা এখানে নতুন এসেছি। বাসুদেব চক্রবর্তীর বাড়ি।''

''অ, বাসুদেব চক্রবর্তী? যিনি ভাইয়ের সম্পত্তি মেরে নিজে সব কিছু আগলে বসে আছেন?''

''সে কি!''

''তবে আর বলছি কি? আপনারা বাইরের লোক। কী আর বলব আপনাদের। বাস্তুঘুঘু একখানি। সাবেক কালেব জমিদারবাড়ি। ওর প্রতিটা থামের ভেতরে সোনা আর

টাকার কাঁড়ি লুকনো। ব্যাটা ভাঙছে আর খাচ্ছে। তবে লোক লেগে গেছে পেছনে। দুদিন বাদেই দেবে সাবাড় করে।"

আমি বললাম, "ওর ভাই এখন কোথায়? সম্পত্তি পাবার জন্য সে কি কোন মামলা করেছে?"

"তা অবশ্য করেনি। কারণ বেচারী গরিব মানুষ। এক গাদা ছেলে-মেয়ে নিয়ে খুব কষ্ট পাচ্ছে।"

"শুনেছি সে তো একজন নামকরা ক্রিমিন্যাল। ওয়াগন ভাঙা থেকে আরম্ভ করে সবকিছুতেই সিদ্ধহস্ত।"

"পেটে ভাত না জুটলে কে সাধু যুধিষ্ঠির হবে মশাই? যা করে ঠিক করে।"

আমি লোকটির আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখে বললাম, "আপনি কি এইখানেই থাকেন?"

"হ্যাঁ। এই নরসিংগড়েই আমার সাতপুরুষের বাস।"

'কী করেন আপনি? চাকরি না চাষবাস?"

"এত কৈফিয়ৎ তো আমি বাইরের লোককে দেবো না মশাই।"

"না দিলে কিন্তু দিতে বাধ্য করাব।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। ও যে এইরকম করবে তা জানতাম। তাই চকিতে নিজেকে সরিয়ে নিয়েই ওর চোয়াল লক্ষ্য করে মারলাম এক ঘুষি।

যুবকটি ছিটকে পড়ল একটু দূরে। পরক্ষণেই দ্বিতীয়বার আক্রমণ করবার জন্য রুখে দাঁড়াল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ওর হাতে এসে গেছে একটি স্প্রিং দেওয়া ছুরি।

আর আমার হাতেও তখন শোভা পাচ্ছে আমার অটোম্যাটিকটা। লোকটি নেতিয়ে গেল আমার ওই চেহারা দেখে।

বললাম, "এক পা এগিয়েছ কি গুলি করব।"

"আ-আ-আপনি কি পুলিশের লোক?"

"পুলিশের লোক কি কিসের লোক একটু পরেই বুঝতে পারবে। আগে বলো এই ঘরে কী হয়?"

"এখানে একটু সাট্টা-ফাট্টা চলে বাবু। নেশা-টেশা হয়।"

"কারা আসে এখানে?"

"নাম বললেও কি আপনি চিনবেন?"

"তুমি আসো নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ, তা মাঝে মধ্যে আসি বৈকি।"

"তুমি যদি এই গ্রামেরই লোক হও আর ওইসব নেশার প্রবৃত্তি যদি তোমার থাকে তাহলে মাঝে মধ্যে নয়, রোজই আসো তুমি।"

লোকটি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

"কী নাম তোমার?"

"আজ্ঞে, জয়দেব মণ্ডল।"

"কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে?"

"কাল আমি এখানে ছিলাম না বাবু! কলকাতা গিয়েছিলাম।"

"কখন গিয়েছিলে?"

"আজ্ঞে, রাত্রেই গিয়েছিলাম।"

"রাত্রেই গিয়েছিলে? আবার ভোরেই আগেই ফিরে এলে? হেলিকপটারে গিয়েছিলে বুঝি?"

"না বাবু। ট্রেনেই গেছি। ন'টার গাড়িতে।"

"শোনো, মিথ্যে কথা বলে নিজেকে বাঁচাতে যাবার চেষ্টা কোর না। যে-কোন গাড়িতেই হোক, ধলভূমগড় থেকে হাওড়া যেতে খুব কম করেও চার-পাঁচঘণ্টা সময় লাগে। তাহলে ন'টার ট্রেনে চাপলে রাত দুটোয় কলকাতা পৌঁছেছ। এবার কলকাতার কাজ সেরে কটার গাড়িতে চেপে এত তাড়াতাড়ি এখানে ফিরে এলে বাবা বল তো দেখি!"

যুবকটি আর কথা বলতে পারল না। মাথা হেঁট করে বলল, "সত্যি বলছি বাবু, আমি কাল বাড়িতে ছিলাম না। তবে কলকাতায় যাইনি।"

"যাক, কোথায় গিয়েছিলে তা জানবার দরকার নেই আমার। এখন বলো তো, শশাঙ্কবাবুকে কে খুন করেছে? তুমি না অন্য কেউ?"

দেখলাম বিশাল শরীর হলে কি হবে, ভয়ে যুবকটির পা দুটি কাঁপছে। বলল, "আমি ওসব খুন-টুনের মধ্যে নেই স্যার। তাছাড়া আমি জানিই না ও খুন হয়েছে বলে।"

"ঠিক করে বলো, তুমি ছাড়া দলে আর কে কে ছিল?"

যুবকটি হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, "স্যার, পালিয়ে আসুন—কেউটে সাপ!"

আমি সভয়ে সরে এলাম সেখান থেকে। মুহূর্তের অন্যমনস্কতা। যুবক সজোরে আমার হাতের কব্জিতে একটা ঘুষি মারতেই অটোমেটিকটা ছিটকে পড়ল কোথায় যেন। আর সেই সুযোগে প্রাণপণে ছুটতে লাগল সে।

পলাশবাবু আর আমি চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজে যখন উদ্ধার করলাম সেটাকে, যুবক তখন নাগালের বাইরে।

ব্যর্থ হয়ে আমরা ফিরে এলাম। এসে দেখলাম বাসুদেববাবু থানা থেকে দারোগা পুলিশ নিয়ে হাজির।

পুলিশের অসাক্ষাতে লাশ ছোঁবার অধিকার কারো নেই। তাই শশাঙ্কর ডেড বডিতে হস্তক্ষেপ করিনি এতক্ষণ। এবার সবাই মিলে পরীক্ষা করতে লাগলাম সন্ধানী দৃষ্টিতে। না, কোথাও কোনরকম ক্ষতচিহ্ন নেই। অথচ মানুষটা মৃত।

ওখানকার পুলিশের যিনি বড়বাবু, তিনি সদাশয় লোক। বললেন, "দেখুন আমি যতদিন আছি এই এলাকায় ততদিন কোনরকম খুনখারাপি হতে দেখিনি এখানে। তাছাড়া এখানকার মানুষগুলোও খুব ভালো। তবে ইদানীং এনাদের দুই ভাইয়ের বিরোধকে কেন্দ্র করে কিছু ব্যাড এলিমেন্টস্-এর আবির্ভাব ঘটেছে এখানে। কিন্তু সাধারণ লোকের ওপর অত্যাচার বা ঝুটঝামেলায় এরা থাকে না বলে আমরাও ঘাঁটাইনি ওদের। কিন্তু এখন যখন একটা খুনের ঘটনা ঘটে গেল তখন ভালোভাবেই নজর রাখতে হবে দেখছি এদিকটাতে।"

আমি তখন ইতিপূর্বের সেই ভাঙা বাড়ির ঘটনার কথা খুলে বললাম ওঁদের। তারপর বললাম, "জয়দেব মণ্ডল নামের ওই লোকটাকে সর্বাগ্রে খুঁজে বার করতে হবে। এই নামের কোন লোককে আপনারা চেনেন?"

পুলিশ বললে, "না।"

ইতিমধ্যে আশপাশ থেকে প্রচুর লোক এসে জমা হয়েছে সেখানে। কিন্তু হলে কি হবে, এই ঘটনাকে স্থানীয় লোকেরা কেউই খুনের ঘটনা বলে মানতে রাজি নন। তবে পুলিশের কাজ পুলিশ করল, ডেডবডি পাঠিয়ে দিল ময়না তদন্তের জন্য। এবং সকলের মুখে খোঁজখবর নিয়ে প্রথমেই গিয়ে হাজির হলাম জয়দেব মণ্ডলের বাড়ি। কিন্তু জয়দেব মণ্ডল নামে যিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁর সঙ্গে সেই বিশাল শরীর লোকটির তো কোন মিল নেই। অথচ স্থানীয় লোকেরা বললেন, ইনি ছাড়া এই নামের আর কোন লোকই এখানে থাকে না। এমন কি এ-ও বললেন, ওই ভাঙা মন্দিরে সন্ধের পর কেউই কোনরকম অপকর্ম করতে ঢোকে না। অবশ্য বহিরাগত কুখ্যাত কেউ যদি রাতদুপুরে আস্তানা গাড়ে তাহলে সেকথা আলাদা, কিন্তু গ্রামের কোন যুবক বা কোন দুষ্ট লোক সাপের ভয়ে ভুলেও ঢোকে না ওখানে।

ঘটনাটা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল। একে তো মৃতদেহে কোন ক্ষতচিহ্ন নেই, যদি ওটাকে খুন বলে মনে না করি তাহলেও প্রশ্ন জাগে শশাঙ্কবাবুর ওই দেহটা ওখানে ফেলে গেল কে? অতগুলো পায়ের চিহ্নই বা কাদের? ভাঙা মন্দিরে এক পাটি জুতো পড়ে থাকার কারণই বা কি? এবং জয়দেব মণ্ডল নামের ছদ্মবেশী ওই যুবকটাই বা কে? যে আমার মতো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে বেমালুম কেটে পড়ল!

ওর ঘুঁষির আঘাতে এখনো আমার হাতের কব্জিটা টন্ টন্ করছে।

পুলিশকে বিদায় দিয়ে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমরা বাসুদেববাবুর বাড়িতে ফিরে এলাম। পলাশবাবুকে পাঠিয়ে দিলাম ঘাটশিলা থেকে আমাদের মালপত্তরগুলো নিয়ে আসতে। আর বাসুদেববাবু? তিনি শুধু একটা কথাই বললেন, "এবার আমার পালা!"

"কারণ?"

"আমার ধারণা, আমাদের পরিবারের সবকিছু জেনে শশাঙ্কর দলের লোকেরাই ওকে খুন করেছে। ওরা ভেবেছিল খুনের দায়টা আমার ঘাড়েই চাপাবে। তারপর চালাকি করে আমাকে জেলে পাঠিয়ে ওরা এসে তছনছ করবে গোটা বাড়ি। এখন যখন সে চাল ভেস্তে গেল তখন আমাকে সরানো ছাড়া ওদের সামনে আর কোন রাস্তাই খোলা নেই।"

"আপনাদের বাড়ির এই মোটা মোটা থামের ভেতরে বা অন্য কোন চোরা কুঠুরিতে সত্যিই কি প্রচুর ধনরত্ন লুকনো আছে?"

বাসুদেববাবু বললেন, "ছোটবেলায় বাবার মুখে তাই শুনেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, যদিও কিছু থেকে থাকে তো আমরা কেউই জানতাম না। তাহলে আমার বাবা শেষ বয়সে অমন দারিদ্র্যতা মাথায় নিয়ে মরতেন না। আমাদের সঞ্চিত ধন-সম্পত্তির মধ্যে সোনা-দানা যেখানে যা ছিল, সব ওই ভাই নিয়ে পালিয়েছিল। তারপর সেও জাহান্নমে গেল, আমরাও ভিখারি হলাম। আপনি একজন ডিটেকটিভ। পুলিশের সঙ্গে আপনার হৃদ্যতা আছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি পুলিশ এনে গোটাবাড়ি সার্চ করান। দরকার হলে মেসিন বসিয়ে বা কোন যন্ত্রের সাহায্যে যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে তাও বার করে নিয়ে যান। ওতে আমার লোভ নেই এবং সেটা করলে আমিও বিপদমুক্ত হব। সবাই যদি জেনে যায় এই পুরোনো অট্টালিকায় মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও কিছু মিলবে না, তাহলে কিন্তু আমি শান্তিতে থাকব।"

বাসুদেববাবুর স্ত্রী এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে বোধ করি সব কথা শুনছিলেন, এবার

কাছে এসে বললেন, "আপনাকে আমার একটাই অনুরোধ—"

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কী?"

"আমার স্বামীকে একটু বুঝিয়ে বলুন, আর এক দণ্ড এখানে না থেকে আমাকে নিয়ে এই বাড়ি ছেড়ে উনি যেন আমার ছেলেদের কাছে চলে যান। পড়ে থাক আমার পৈতৃক ভিটে। কী হবে বলুন তো এই শত্রুপুরীতে ধুকুপুকু প্রাণ নিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে। এখানে এইভাবে থাকলে একদিন তো আমরা বেঘোরে মরব।"

আমি বাসুদেববাবুকে বললাম, "কথাটা কিন্তু উনি খুব একটা খারাপ বলেননি। আমার মনে হয় আপনাদের আর এই বাড়িতে না থাকাই উচিত।"

বাসুদেববাবু বললেন, "এখন আর তা হয় না চ্যাটার্জিবাবু।"

"কেন হয় না?"

"এই বাড়ির জন্য আমি আমার জীবনের শেষ রক্তবিন্দুও দিতে রাজি আছি। এই বাড়িতে আমি জন্মেছি, এই বাড়িতেই মরব। অতএব মৃত্যুভয়ে এখান থেকে সরে যেতে আমি রাজি নই।"

দেওয়াল ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে ন'টা বাজল।

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এলো। আমি রীতিমত তৈরি হয়ে একাই আবার ঘটনাস্থলে এলাম। দিনের আলায় চারদিক তখন ঝলমল করছে। ঘটনাস্থলের আশপাশে তখনও কিছু লোকের জটলা ছিল। তাদেরই একজনকে ডেকে বললাম, "আচ্ছা, এই যে শশাঙ্কবাবু মারা গেলেন, এঁর বউ-ছেলে কোথায় থাকে বলতে পারেন?"

লোকটি বললে, "শুনেছি গিধনির কাছে কোথায় যেন।"

"তারা কি খবর পেয়েছে?"

"তা কী করে জানব বলুন? সেখানকার ঠিকানাটা তো আমরা কেউই জানি না।"

"তাহলে গিধনির কাছে আছে এটা জানলেন কী করে?"

"ও নিজেই একবার বলেছিল।"

"ও তো এখানকারই ছেলে? তা ওর বন্ধুবান্ধব কেউ নেই এখানে?"

"সেরকম কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। কেননা বহুদিন দেশ-ছাড়া। হালে এই কয়েকমাস ওকে মাঝে-মধ্যে এখানে দেখা যাচ্ছে। তবে পালানদার চায়ের দোকানে কিছুক্ষণ আড্ডা দিত, আপনি সেখানে গিয়ে একটু খোঁজখবর নিতে পারেন।"

"আমাকে একটু নিয়ে চলুন তো। কেননা মৃত্যু যে ভাবেই ঘটে থাকুক, ওর বাড়িতে একটা খবর পৌঁছে দেওয়া খুবই দরকার।"

"সে খবরতো বাসুবাবুই দিতে পারেন।"

"উনি তো বলছেন ওর ঠিকানা জানেন না।"

লোকটি মুখ ভেংচে বললে, "ন্যাকা শিবু! সব জানে। ওর ভাই যেদিন গ্রাম ছেড়ে পালাল, সেদিনই যেখানে যা ছিল সব লুকিয়ে রেখে ভাইয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। এখন ছেলেদের বাইরে পাঠিয়ে নিজেরা কর্তা-গিন্নিতে যখের ধন আগলাচ্ছে। জানে না আবার!"

"তাই নাকি?"

"তাছাড়া কী? চলুন পালানদার দোকানে যাই। ওর মুখেই সব শুনবেন।"

আমি লোকটির সঙ্গে পালানদার দোকানে গেলাম। এসব ব্যাপারে প্রথমে কেউই মুখ খুলতে চায় না, তাই উনি কিছু বলতে চাইলেন না। অবশেষে চাপে পড়ে বললেন, "দেখবেন মশাই, গরিব মানুষ যেন কোন ঝামেলায় জড়িয়ে দেবেন না। শশাঙ্ক যাকে নিয়ে পালিয়েছিল এই গ্রাম থেকে, তার একটি ছেলে ছিল। ছেলেটির নাম লখাই। সে এখন গ্যালুডিতে থাকে। কয়লার ব্যবসা করে। তার ধারণা শশাঙ্ক ওর মাকে বিষ খাইয়ে মারে এবং আবার বিয়ে করে ঘর-সংসার ফাঁদে। সোনাদানা বা টাকাকড়ি আত্মসাতের ব্যাপারে শশাঙ্কর যে দুর্নাম তা আমরা মানতে রাজি নই। কারণ শশাঙ্ক নিজেই তার দুঃখের কথা আমাকে বলেছে। এবং এ-ও বলেছে—কিছু সে নিয়ে পালালেও সব নিয়ে যায়নি, এবং ওঁর দাদা বাসুদেববাবু বাবাকে ভুল বুঝিয়ে সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে।"

আমি বললাম, "দেখুন, এগুলো হচ্ছে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বাবা যখন লিখে দিয়েছেন তখন করবার কিছু নেই। আর শশাঙ্কবাবু যে কাজ করে পালিয়েছেন, সেটাও একটা জঘন্যতম নোংরা কাজ। এই কাজ যিনি করতে পারেন, তিনি যে সত্যিই এদের সর্বস্বান্ত করে যাননি তার কি মানে? যে মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য অন্যেরও ঘর ভাঙতে পারে, সে যে নিজের ঘরেও আগুন দেয়নি এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?"

পালানদা বললেন, "হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলছেন বাবু। আসলে শশাঙ্কর কথাই আমি বলছি। কে কি করেছে না করছে তা তো আমার জানবার কথা নয়। তবে বাবু একটা কথা বলি, শশাঙ্ক হচ্ছে বাসুদেববাবুর ছোট ভাই। সে যে ওইভাবে মরল তা ওর মনে এতটুকু শোকের ছায়া দেখেছেন?"

"তা অবশ্য দেখিনি!"

"একদিন সে যা করেছে তা করেছে। এতদিন বাদে সে যখন ফিরে এলো দাদার কাছে, তার কি উচিত ছিল না তাকে ঘরে নেওয়া?"

"ছিল। কিন্তু সে তো শুনেছি অসৎসঙ্গে মিশত। চুরি ছিনতাই ডাকাতি করত। একবার সেই লোককে বাড়িতে ঢোকালে বাড়ির অবস্থাটা কি হত? সেই লোককে সম্পত্তির ভাগ দিলে সে সম্পত্তি কি সে রাখতে পারত? যে অত টাকা সোনাদানা আত্মসাৎ করেও সবকিছু খুইয়ে বসেছে, তার পক্ষে ওই বাড়ির এক অংশ বিক্রি করে দেওয়া কতক্ষণের ব্যাপার?"

পালানদা একটু চুপ করে থেকে বিষয়টা একটু বুঝে দেখবার চেষ্টা করল। তারপর বললে, "শশাঙ্কর বউ ছেলেমেয়ে সব গিধনিতে আছে। আর ওই লখাইও তো এখন কয়লার ব্যবসা করছে আর মস্তানি করছে। ও একটু বেশি রকম বিরক্ত করত শশাঙ্ককে। কয়েকবার মারধোরও করেছে। মাঝে-মধ্যে অসম্ভব রকমের টাকা দাবি করত। আমার যতদূর মনে হয় বাবু, ও ওই লখাইটার কাজ।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে। আর আমার কিছু জানবার নেই। শশাঙ্কবাবুর ছেলেমেয়ে কটি?"

"দুটি। মেয়েটির বিয়ের বয়স হয়েছে, ছেলেটিও বছর পনেরোর।"

আমি সোজা পালানদার দোকান থেকে স্টেশনে চলে এলাম।

স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আজ ভোরে কোন বিশাল শরীর যুবক গ্যালুডি অথবা গিধনির টিকিট কেটেছে কিনা।

কাউন্টারবাবু হেসে বললেন, "খুনের ব্যাপারে পুলিশি তদন্ত বুঝি? তাহলে শুনুন, এই ধরনের লোকেরা টিকিট কেটে ট্রেনে ওঠে না। তবে আপনি যে রকম চেহারার কথা বলছেন, ওইরকম চেহারার একজনকে আমরা প্রায়ই এখানে নামা-ওঠা করতে দেখি। আজও দেখেছি। ও সকালের প্যাসেঞ্জারে চলে গেছে।"

আমি এবার সোজা চলে এলাম বাসুদেববাবুর বাড়ি। ইতিমধ্যে বাসুদেববাবু তাঁর ছেলেমেয়েকে টেলিগ্রাম করে এখানে আসতে লিখেছেন। আমি যেতেই বললেন, "পুলিশ রিপোর্ট পেয়ে গেছি।"

"সে কি! এত তাড়াতাড়ি?"

"হ্যাঁ। পুলিশ রিপোর্ট বলছে এটি খুনের ঘটনা নয়। ইন্টারন্যাল হ্যামারেজ।"

আমি অবাক হয়ে বাসুদেববাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। খুব ভালোভাবে বোঝবার চেষ্টা করলাম লোকটিকে। মিটমিটে শয়তান নয় তো? টাকার জোরে হয়তো নিজেই ভাইকে মেরে টাকার জোরেই পুলিশকেও ম্যানেজ করে ফেলেছেন। তবু বললাম, "তাহলে বলছেন এটি খুনের ঘটনা নয়?"

"না। তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "দেখুন, যত অপরাধই করুক, হাজার হলেও মার পেটের ভাই। যতক্ষণ বেঁচেছিল ততক্ষণ সে শত্রু ছিল। এখন কিন্তু ও আবার আমার সেই হারানো ভাই। তাই দুজন লোককে পাঠিয়ে দিয়েছি ওর বউ ছেলেমেয়েকে নিয়ে আসবার জন্য। শুধু তাই নয়, আমি ঠিক করেছি এখন থেকে ওরা এই বাড়িতেই থাকবে। এতবড় বাড়িতে আমরা দুটিমাত্র প্রাণী। সত্যি বলতে কি, হাঁপিয়ে উঠেছি মশাই। তাছাড়া আমার স্ত্রীরও তাই ইচ্ছে। হয়তো এখানে থাকলে ওর ছেলেটা মানুষ হয়ে যাবে, মেয়েটারও বিয়ে-থা দেওয়া দরকার। তাছাড়া এই বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে এখানকার অনেক লোকেরই ধারণা, আমি নাকি আমার ভাইকে বঞ্চিত করে সবকিছু ভোগ-দখল করছি। কিন্তু ওরা তো ভেতরের ব্যাপার জানে না। এখন দেখুক ওরা আমাকে যা ভাবে আমি তা নই।"

"আপনি তাহলে আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে সবকিছুই জানতেন?"

"সব জানতাম। কোথায় থাকে না থাকে সব। এক এক সময় ভাবতাম, যাই ওর বউ-ছেলেমেয়েগুলোর পাশে গিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাঁড়াই। কিন্তু যে মুহূর্তে ওর ওই চণ্ডমূর্তির কথা মনে পড়ত অমনি ঘৃণায় এবং রাগে সারা শরীর চনমন করে উঠত।"

"আপনার এই মনোভাবের কথা কিন্তু গোড়ায় আপনি আমাকে বলেননি। যাই হোক, আপনার অন্তরের যথার্থ পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হলাম। এর চেয়ে সুন্দর সলিউশান আর হতে পারে না। এখন তাহলে কি করবেন?"

"লোকজন সব তৈরি রেখেছি। ওর বউ-ছেলেমেয়ে এখানে এসে হাজির হলেই দাহকার্যটা শেষ করে ফেলব। আমার ছেলে-মেয়েদের আসতে অবশ্য দেরি হবে। মেয়ে এলে সন্ধের আগে আসতে পারবে না। ছেলেদের আসতে দু'একদিন দেরি হবে।"

সৌদামিনী বললেন, "আপনি তাহলে—।"

আমি বললাম, "আপনারা চাইলে আমি আজই চলে যেতে পারি। আমার বন্ধু বিকেল নাগাদ এসে পড়বে আশা করি।"

বাসুদেববাবু বললেন, "না না, এ কি কথা! আমরা চাইব কেন?"

সৌদামিনী বললেন, "কিছু মনে করবেন না, মানে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। আসলে অশৌচের বাড়ি তো। আপনাদের আতিথেয়তার অনেক ত্রুটি হয়ে যাবে হয় তো।"

আমি বললাম, "আমাদের জন্য ভাববেন না। আমরা তো কুটুম নই। যে কাজের জন্য আসা, সেই কাজই যখন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত শেষ হয়ে গেল তখন এখানে থেকেই বা কি করব। বন্ধু এসে পড়লে যদি সময় থাকে তাহলে আজই চলে যাব। নয়তো কাল সকালে আমরা যাচ্ছিই। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করবেন না, বাজারে খেয়ে নিতে পারব।"

বাসুদেববাবু বললেন, "ও ব্যাপারে আপনাকে একটুও বলতে হবে না। সে দায়িত্ব আমার। বরং আপনি থেকে আজকে আমাদেব পরিবারের মিলনটা দেখে যান।"

আমি সানন্দে এই প্রস্তাব মেনে নিলাম। পাশের বাড়ির একটি মেয়ে এসে আমাকে চা-টোস্ট দিয়ে গেল। নিয়মানুযায়ী এ বাড়িতে এখন উনুন জ্বলবে না।

দুই আর দুইয়ে চারের মতই সব হিসেব ঠিকঠাক হয়ে গেল। পলাশবাবু সন্ধের পর এলেন। শশাঙ্কবাবুর বউ-ছেলেমেয়ে এল রাত্রিবেলা। ওর ছেলেই মুখাগ্নি করল বাবার। তবে এই বাড়িতে থাকাথাকির প্রস্তাবটা ওর বউ মেনে নিতে পারল না। সে বলল, "যার সঙ্গে সম্পর্ক, সেই যখন চলে গেছে তখন এ বাড়িতে আমি কোন অধিকারে থাকব? তবে মেয়েটা আমার কাছে থাকুক। আর ছেলেটাকে আপনারা রাখুন। হাজার হলেও বংশের ছেলে। লেখাপড়া শিখে যেন মানুষ হয়। বাবার মতো না হয় যেন। আর এই মৃত্যু যে ভাবেই ঘটে থাকুক না কেন, আমার এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই। কারণ যেসব লোকেদের সঙ্গে ও মিশত, তাতে অপঘাত মৃত্যুই ওর অবধারিত এ আমি জানতাম। আর সেইজন্যই আমরা মা-মেয়েতে সেলাই-বোনার কাজ শিখে সংসারটা চালিয়ে নিচ্ছিলাম।"

অভিযোগ যেখানে নেই, সেখানে কোন তদন্তও সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও আমার মনে হতে লাগল শশাঙ্কবাবুর ইন্টারন্যাল হ্যামারেজ কি করে হল? এক পাটি জুতো ওই ভাঙা বাড়ির মধ্যেই বা পাওয়া গেল কেন? এবং সেই বিশাল শরীর যুবক আসলে কে?

পলাশবাবু সব শুনে বললেন, "ছেড়ে দিন তো মশাই! মিটে যখন গেছে তখন অযথা আর কাদা ঘোলা করে লাভ কি? কাল সকালই কেটে পড়ি চলুন।"

"সে তো যাবই। তবে সবকিছুর শেষ না দেখে তো আমি যাই না। তাই ওই বিশাল শরীর যুবকের মুখোমুখি একবার আমাকে হতেই হবে। কাল ফার্স্ট ট্রেনেই একবার গ্যালুডি যাই। লখাই নামে ছেলেটির একবার খোঁজ করে আসি।"

পলাশবাবু বললেন, "পাগলের পাল্লায় যখন পড়েছি যেতে তখন হবেই। কথায় আছে না, বাঁশ কেন ঝাড়ে, আয় আমার ঘাড়ে।"

যাই হোক, সে রাতে ঘুম তো হল না। কোন রকমে ভোরের আলো ফুটে উঠতেই বাসুদেববাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললাম। তারপর টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে সকাল আটটার মধ্যেই গ্যালুডি।

এত সহজে যে রহস্যের আবরণ উন্মোচন হবে তা ভাবিনি। দীর্ঘদেহ লখাই ওর কয়লার দোকানে একটি লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে নাক ডাকছিল। আমরা গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে ওকে তুলতেই ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল সে। এত ভয় পেয়ে গেল যে, রীতিমত কাঁপতে লাগল।

আমি আমার মরণযন্ত্রটা ওর বুকে ঠেকিয়ে বললাম, "আমাকে চিনতে পারছ?"

লখাই ভয়ে ভয়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।"

"তোমাকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হবে।"

লখাই কেঁদে আমার পা জড়িয়ে ধরে বললে, "দোহাই স্যার, আমার কথাটা আগে শুনুন! আমি ওকে খুন করিনি।"

"তা না করলেও তুমি একজন গোয়েন্দাকে আঘাত করে মিথ্যে কথা বলে পালিয়ে এসেছো। তোমার তো বাঁচার কোন রাস্তা আমি দেখতে পাচ্ছি না। পুলিশ এবং ডিটেকটিভের গায়ে হাত দেওয়ার শাস্তি কি তা তুমি জান?"

"জানি না, জানতে চাইও না। আমি আপনার পায়ে ধরছি, আমাকে এবারের মতন ক্ষমা করুন।"

"ক্ষমার ব্যাপারটা পরে আসছে। এখন যা যা জিজ্ঞেস করব, তার ঠিকঠাক উত্তর দেবে; এবং মিথ্যা কথা বলবার বা পালাবার চেষ্টা করবে না। যদিও পালাতে তুমি পারবে না, কারণ চারদিকে সাদা পোশাকের পুলিশ তোমার জন্য ফাঁদ পেতে আছে। পালাতে গেলেই ধরা পড়বে তুমি। প্রয়োজনে গুলি চলবে।"

"না, আমি সে চেষ্টা করব না।"

"ঠিকানা খুঁজে এই জায়গায় যখন এসে পড়েছি তখন বুঝতে পারছ, নিশ্চয় পুলিশের খাতায় তোমার নাম কতখানি জায়গা জুড়ে লেখা হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"এখন বল তো দেখি, সে রাত্তে ঠিক কী হয়েছিল? এবং কিভাবে তুমি শশাঙ্কবাবুকে খুন করলে?"

লখাই কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, "আমি ওকে মারিনি হুজুর, বিশ্বাস করুন। আমি খুনী নই।"

"তাহলে ওই দিন ওখানে তুমি কী করছিলে?"

"ওকে মারব বলেই গিয়েছিলাম।"

"কেন?"

"আপনি হয়তো জানে না, ওই লোকটির জন্য আমি সারাজীবন আমার মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।"

"আমি সব জানি। তোমার মা নিজেই তোমাকে তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। তার জন্য ওই লোকটা দায়ী নয়। কেন তিনি তোমাকে ছেড়ে চলে যান?"

"আমার বাবার অত্যাচারের সুযোগ নিয়ে আমার মাকে ও আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু পরে আমার মাকে ও বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে।"

"প্রমাণ আছে তোমার কাছে?"

"আছে বৈকি। তাই আমিও ওর পেছনে দীর্ঘদিন শনির মত লেগে থেকে একসময় মেরে ফেলব ঠিক করেছিলাম। বাড়িতে ও খুব কমই আসত। একটা জুয়াচোরের পাণ্ডা ছিল ও। চুরি ছিনতাইও করত। কাল যেখানে ভাঙা মন্দিরের কাছে আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়, ওইখানেই মাঝে-মধ্যে ওরা ঘাঁটি গাড়ত। এইসব খবর দেবার কিছু লোকও ওখানে আছে আমার। তাই সুযোগ সুবিধা পেলেই ওখানে যেতাম এবং ভয় দেখিয়ে ওর

কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করতাম। এমন কি কখনো কেড়েও নিতাম। আসলে আমি চেয়েছিলাম ওকে দুষ্টগ্রহের মত ভয় দেখিয়ে তিল তিল করে শেষ করতে। দীর্ঘদিন ধরে ওর লোকেরা চেষ্টা করছিল বাসুদেববাবুকে খুন করে ওই বাড়ির দখল নেবার। তা সেদিন যখন ওরা পাকাপাকিভাবেই ওই কাজটা করে ফেলার মতলব নেয়, তখন আমিই ওকে খুন করার জন্য এগিয়ে যাই।''

''তারপর?''

''আমি ওখানে পৌঁছে ওদের গোপন ঘাঁটিতে আড়ি পেতে শুনি ওদের পরিকল্পনাটা বানচাল হতে বসেছে। ওরা ঠিক করেছিল, ভোরে যখন বাসুদেববাবু প্রাতঃভ্রমণে বেরোবেন খুনটা তখনই করবে। কিন্তু হঠাৎ ওরা জেনে ফেলেছে, কলকাতা থেকে নাকি দু'জন গোয়েন্দাকে এনে কাজে লাগানো হচ্ছে ওদের জব্দ করবার ব্যাপারে। তাই ওদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। ওরা চারজন। আমি একা। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বলতে কিছুই ছিল না ওদের। শুধু একটা লোহার রড ছিল সঙ্গে। যাইহোক, ওদের পরিকল্পনা বানচাল হলেও আমার মাথায় খুন ছিল। ভেবেছিলাম আমার এই শাবলের মত হাত দুটি দিয়ে ওর গলার টুঁটি টিপে মেরে ফেলব ওকে। তা আমাকে দেখামাত্রই ভয়ে শিউরে উঠল ওরা। একজন রুখে দাঁড়িয়ে বাধা দিতে এলে তাকে বেশ করে ঘা-কতক দিই। সেই সুযোগে ওরা পালাতে থাকে। তখন আমিও ওদের তাড়া করি। কিছুদূর গিয়েই ধরে ফেলি সব কটাকে। সেখানে আমাদের মধ্যে রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। একজনের হাত থেকে লোহার রডটা ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিই। তারপর একজনের মুখ লক্ষ্য করে ঘুষি মারতে গেলে ঘুষিটা দৈবক্রমে শশাঙ্কবাবুরই ঘাড়ের পেছনে লাগে। আর সেই আঘাতেই ছিটকে পড়ে দু'একবার ছটফট করে স্থির হয়ে যায় ও। ওকে যেভাবে মারবার ইচ্ছে ছিল আমার, সেইভাবে কষ্ট দিয়ে মারতে না পেরে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। অপর লোকটি তখন আমার হাত থেকে রেহাই পেয়ে পালিয়েছে। আমি আর কি করি? ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে চলে এলাম সেখান থেকে। অত রাতে গাড়ি তো নেই। তাই আশপাশেই লুকিয়ে রইলাম। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, আমার একটা প্রচণ্ড কৌতূহল হল—এই ঘটনাকে পুলিশ কী ভাবে নেয় তা জানবার। এই সময় আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। আর সত্যি বলতে কি, আপনাকে দেখেই কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম আমি। কী যে সব আলফাল বকলাম কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন স্যার! আমার মৃতা মায়ের দিব্যি, আমি আর কখনো কোন খারাপ কাজ করব না।''

আমি যন্ত্রটা যথাস্থানে রেখে বললাম, ''ভয় নেই তোমার। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, তোমার কথা যদি ঠিক ঠিক হয় তাহলেও শশাঙ্কবাবুর চটিজুতোটা ওই ভাঙা মন্দিরে গেল কি করে? তোমাকে দেখে ভয়ে পালাবার সময়ে ছেড়ে গেলেও এক পা খালি এবং এক পায়ে চটি পরে নিশ্চয়ই উনি ছুটতেন না। অপর পাটি পথেই পড়ে থাকত।''

লখাই বলল, ''এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারব না স্যার। আসলে তখন মনের অবস্থা এমনই ছিল যে, কে কী পরেছিল না ছিল তা খেয়ালই করিনি।''

আমি বললাম, ''ঠিক আছে। ধরে নিলাম ওই চটিজুতোটা ঘটনাস্থলেই পড়েছিল। হয়তো কোন কুকুরে মুখে করে নিয়ে গেছে।''

''হতে পারে।''

"কিন্তু শশাঙ্কবাবুর দলের ওই লোকগুলোর ব্যাপারে তুমি কি কিছু বলতে পারবে?"

"স্যার, ওদের সবাইকে আমি চিনি। ধরিয়েও দিতে পারি। কিন্তু দল ওদের বিরাট। কান টানতে গেলে যদি মাথা এসে যায়, তাহলে কিন্তু আমাকে আপনি ক্ষমা করলেও ওরা বাঁচতে দেবে না। তবে আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, বাসুদেববাবুর কোন ক্ষতি আমি হতে দেবো না। যদি এর পরেও কেউ ওনার কোনরকম ক্ষতি করে তখন আমি নিজে গিয়ে পুলিশকে সব কথা খুলে বলবো। আর আমার ঠিকানা তো আপনাদের জানা। আমি তো ওদের মত উড়ো খৈ নই যে পালিয়ে বেড়াব।"

আমি লখাইয়ের পিঠ চাপড়ে বললাম, "এই কথাই রইল কিন্তু। কোন ভয় নেই তোমার। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। আর শোন, অপ্রয়োজনে ওই অঞ্চলে তোমার আর যাবার প্রয়োজন নেই। তোমার আসল শত্রু তো নিপাত গেছে।"

লখাই আনন্দে আমাদের দুজনের পায়ের ধুলো মাথায় নিল।

আমরা ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। বাইরে কোথাও কোন পুলিশ প্রহরা ছিল না। ওকে ভয় দেখাবার জন্য মিথ্যে কথা বলেছিলাম।

যেতে যেতে পলাশবাবু বললেন, "এটা কি রকম গোয়েন্দাগিরি হল? ও যা বললো, ওর কথায় বিশ্বাস করে ওকে ছেড়ে দিলেন?"

আমি হেসে বললাম, "মনে হয় মিথ্যে বলেনি। আর বলেই বা ওর লাভ কি! বলার মধ্যে ওর অপরাধের স্পষ্ট স্বীকৃতি তো রয়েইছে। তাছাড়া সব সময় প্রতিশোধ নিয়ে বা লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়ে সবকিছুর সমাধান হয় না। বিশেষ করে শশাঙ্কবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেখানে ঘটনার জোয়ারে ভাঁটা পড়েছে, সেখানে কী লাভ অযথা থিতনো জলকে ঘোলা করে?"

পলাশবাবু বললেন, "এখন তাহলে আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"আপাতত কোথাও একটু জলযোগ সেরে আবার ঘাটশিলায়।"

আমরা দুজনে হেঁটে হেঁটে স্টেশনের কাছে এসে একটি চা-দোকানে বসে চায়ের অর্ডার দিলাম। পলাশবাবু পাশের একটি দোকান থেকে একগাদা শিঙাড়া কিনে আনলেন।

রহস্য তদন্ত

অমন সুন্দর চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না। ঘাড় অব্দি লটকানো চুল। টানা টানা চোখ। আর টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ। ঠিক যেন চাঁপাফুলের পাপড়ির মতো। বয়সও খুব বেশি নয়। ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে। একেবারে গৌরাঙ্গ অবতার যাকে বলে ঠিক তাই। অথচ এইরকম একটি রূপবান ছেলের হাতে হাতকড়া দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফৌজদারি কোর্টে। তার অপরাধ? একটি অষ্টধাতুর মূর্তি চুরি এবং বাড়ির গৃহিনীকে খুন। ভাবতেও অবাক লাগে এই রকম একটি ফুটফুটে তাজা কিশোর খুন করেছে বলে। যার বাইরের রূপ অমন নির্মল জ্যোৎস্নার মতো তার ভেতর ওইরকম পাশব প্রবৃত্তি কী করে জাগে?

ব্যাপারটা আমার মনকে বেশ নাড়া দিল। আমার এক উকিল বন্ধুর কাছে একটি

বিশেষ কাজে হাওড়া কোর্টে গিয়েছিলাম। সেখানেই দেখলাম দৃশ্যটা। উকিল বন্ধু বললেন, "আমরা ওরকম কত দেখছি ভাই। তুমি দেখো। আসলে লোভ এমনিই জিনিস যে লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ করতে পারে না এ জগতে এমন কিছুই নেই।"

উকিল বন্ধুর কথায় কিন্তু আমার মন ভরল না। তাই ওর বিচার দেখতে গেলাম।

আমার মনের মধ্যে যা হচ্ছিল ছেলেটির মুখ দিয়েও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাই ব্যক্ত হল। ছেলেটি আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বললো, "না না না, আমি খুন করিনি। আর ওই মূর্তি? আমি ওর নিত্য সেবা করি। ও মূর্তি চুরি করে আমার লাভ? তাছাড়া করবই বা কেন?"

বিচারক জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যদি সত্যি এ কাজ না করে থাকো তাহলে অনুমান করতে পারো কে করেছে বা করতে পারে?"

"তা কি করে জানব হুজুর! তবে আপনি বিশ্বাস করুন, ও কাজ আমি করিনি।"

"কিন্তু পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট বলছে হেমপ্রভা দেবীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এবং সেই অস্ত্রের হাতলে তোমার হাতের ছাপ। শুধু তাই নয়, বাড়ির মালিক সুধাকান্তবাবুও তোমাকেই সন্দেহ করছেন। এর পরও তুমি বলবে তুমি খুন করোনি?"

ছেলেটি এবারও কেঁদে কেঁদেই বলল, "হ্যাঁ, এর পরেও আমি বলব আমি খুন করিনি, আমি চুরি করিনি। কে করেছে তাও জানি না। আমি সন্ধের সময় শীতল আরতি করব বলে ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখি মূর্তি নেই। আর মা ঠাকুরণ ঘরের মেঝেয় মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর। মা ঠাকুরণের বুকের মাঝখানে একটা ছোরা গাঁথা। আমি নিজের হাতে সেটা বুক থেকে তুলে নিই। আর ঠিক সেই সময়ই বাবু বাইরে থেকে বেরিয়ে এসে ঠাকুরঘরে প্রণাম করতে গিয়ে ওই দৃশ্য দেখেই অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর তো থানা পুলিশ অনেক কিছুই হল। পুলিশ আমার কোন কথাই বিশ্বাস করল না। আমাকে ধরে নিয়ে আটকে রাখল।"

শুনানি সেদিনের মতো মুলতুবি রেখে জজ সাহবে উঠে চলে গেলেন।

আমি আমার মনোযোগ ছেলেটির প্রতি আরো বেশি করে নিবদ্ধ করলাম। ছেলেটির মুখ দেখে বা তার বক্তব্য শুনে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হল যে ছেলেটি নির্দোষ। আমি মনে মন প্রতিজ্ঞা করলাম ছেলেটি যদি সত্যিই নির্দোষ হয় তাহলে যে ভাবেই হোক বাঁচাবো তাকে। আর সেই সঙ্গে আমি নিজে পূর্ণ তদন্ত করে আসল ঘুঘুকে খাঁচায় পুরে লটকে দেব ফাঁসির দড়িতে।

সেরাতে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলাম ছেলেটির কথা। ওর সরলতায় ভরা মুখখানি বার বার ভাসতে লাগল চোখের সামনে।

আইনের চোখে ও হয়তো নাবালক। কিন্তু শিশু ও কিশোরদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে বিচার করতে গিয়ে আমি যেটুকু জেনেছি তাতে একেবারে বেওয়ারিশ রাস্তার ছেলে ছাড়া এই বয়সের কিশোরদের মধ্যে বড় একটা খুন করার প্রবণতা জাগে না। এক্ষেত্রেও ছেলেটি বার বার বলছে সে খুনী নয়। এবং এই অপরাধ সে করেনি। ছেলেটি সত্যিই যদি খুনী না হয়, তাহলে তাকে বাঁচানো মানুষ হিসাবে আমার একটা পবিত্র কর্তব্য নয় কি?

আমি সরকারি গোয়েন্দা নই, প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কোথাও কোন রহস্যের গন্ধ

পেলে ছুটে যাই। এবং সাধ্যমতো জট ছাড়াবার চেষ্টা করি। ঈশ্বরের কৃপায় এখনো পর্যন্ত ব্যর্থ হইনি আমি। তাই এই ছেলেটির ব্যাপারেও আশা করি সফল হতে পারবো।

আমার উকিলবন্ধু রণেন্দুশেখরকে বলেছি যেভাবেই হোক ছেলেটিকে জামিনে ছাড়িয়ে আনতে হবে। পুলিশকেও ফোনে অনুরোধ করেছি এই ব্যাপারে তাঁরাও যেন আমার সঙ্গে সহযোগীতা করেন।

ছেলেটির সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে যা জেনেছি তা হল, ছেলেটি নিরাশ্রয় এবং পিতৃমাতৃহীন। বর্তমানে সুধাকান্ত রায় নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকত। তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হোত। কোচবিহারের মহারাজার দেওয়া একটি অষ্টধাতুর মূর্তির সেবা-পূজা করত ছেলেটি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে ওই অষ্টধাতুর মূর্তিটি চুরি করে এবং চুরির জন্যই খুন করে বাড়ির গৃহিণীকে। যদিও মূর্তিটি ছেলেটির কাছ থেকে পাওয়া যায় নি।

রাত এখন দশটা। আজ আর কোন রকম পড়াশুনায় মন বসাতে পারলাম না। ঘরের কোণে কেরোসিন জনতায় ভাত ফুটছে। দুটো ডিম ছিল। একই সঙ্গে সিদ্ধ হতে দিয়েছি। খেয়ে শুয়ে পড়া যাব।

ছেলেটির পক্ষেও কোন আইনজীবী নেই যে তা নয়, সরকারি উকিল একজন যিনি আছেন ওকে রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁরও কোন আগ্রহ নেই। নেহাত দাঁড়াতে হয় তাই দাঁড়িয়েছেন। এখন একমাত্র আমি যদি এই জটিল রহস্যের জট খুলে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারি তো বাঁচে ছেলেটি।

এমন সময় ক্রিরিরিরিরিং....ক্রিং...।

আমি উঠে গিয়ে ফোন ধরলাম। রিসিভার কানে লাগিয়ে বললাম, "হ্যাল্লো! অম্বর চ্যাটার্জি স্পিকিং।"

"আমি রণেন্দু বলছি।"

"হ্যাঁ বলো। কী খবর? জানতে পারলে কিছু?"

"তার আগে বলো কেসটা কি তুমি সত্যিই নিচ্ছ?"

"প্লিজ, এর মধ্যে আর কোন কিন্তু রেখো না। ওর ব্যাপারে তদন্তটা আমিই করব। পুলিশকেও আমি সে কথাটা জানিয়ে দিয়েছি। আর উকিল হিসেবে ওর হয়ে তোমাকেই দাঁড়াতে হবে। তুমি 'না' কোরো না।"

"ব্যাপার কি বল তো? হঠাৎ তুমি ছেলেটির প্রতি এত সদয় হয়ে উঠলে, কেন?"

"তা জানি না ভাই। তবে সত্যি কথা বলতে কি, ছেলেটিকে দেখে আমার খুব মায়া হচ্ছে। আর বিশ্বাস করো, ওর ওই অসহায় অবস্থা এবং চোখের জল দেখে আমি থাকতে পারছি না। তাছাড়া কেন জানি না আমার মন বার বার বলছে ছেলেটি খুনী নয়। ও চুরি করেনি।"

"আমি কালই ওকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু ছেলেটাকে তুমি রাখবে কোথায়?"

"কেন, আমার বাড়িতেই!"

"তোমার বাড়িতে? তুমি কি জান, ছেলেটি যদি সত্যিই খুনী হয়, তাহলে ও যখন বুঝবে গোয়েন্দা হয়ে তুমি ওর খুনের তদন্ত করছ তখন হয়তো তোমাকেই খুন করে বসবে। তার চেয়ে আমি বলি কি, ও পুলিশের হেফাজতেই থাকুক। তুমি বরং ওর সঙ্গে দেখা করে

কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে তোমরা তদন্ত চালাও। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কাঁচা কাজ করতে যেও না।" এই বলে রণেন্দু ওর ফোন নামিয়ে রাখলো।

আমিও ঠিক কী যে করব তা ভেবে পেলাম না। ও একজন বুদ্ধিজীবী মানুষ। কথা যা বললো তা মিথ্যে নয়। কে বলতে পারে যে, ছেলেটির ঐ অসামান্য রূপের ভেতরেও একটা কদর্য রূপ নেই? ছেলেটি তো সত্যিই খুন করে থাকতে পারে! বিশেষ করে ওর যখন কেউ কোথাও নেই তখন ওর কাছে আমার এই মৌড়িগ্রামের ঘরখানিও যা কয়েদখানাও তাই।

আমি আর দেরি করলাম না। গরম ভাতে ঘি আর ডিমসিদ্ধ দিয়ে খেয়ে নিলাম। তারপর ঠিক কোন কোন পদ্ধতিতে এই কেসটা নিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করব সে বিষয়ে ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে যখন আমি পুলিশ হেফাজতে ছেলেটির সঙ্গে দেখা করব বলে গেলাম তখন ওখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার রহমন সাহেব আমার সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করলেন।

রহমন সাহেব এখানে নতুন এসেছেন। কিন্তু মানুষটি খুব ভালো। বললেন, "আমারও মশাই মায়া হচ্ছে ছেলেটিকে দেখে। তবে কিনা এইসব ক্রিমিনালদের ধরণধারণ যে কতরকমের হয় তা বোঝা মুশকিল। মনে করুন ঘরের ভেতর কেউ নেই, শুধু এই ছেলেটি এবং হেমপ্রভা দেবী ছাড়া। বহুমূল্য একটি অষ্টধাতুর মূর্তি উধাও এবং সেই সঙ্গে গৃহকর্ত্রী খুন। ছোরার হাতলে ছেলেটির হাতের ছাপ। তার ওপর ছেলেটি ওদের অনাত্মীয়। যদিও ভয় দেখিয়ে বা মারধোর করে কোন রকমে ওর মুখ থেকে কোন কথা আমরা বার করতে পারিনি, তবুও ছেলেটি নিরপরাধ এমন কোন প্রমাণও আমরা পাইনি। অতএব বাধ্য হয়েই সন্দেহভাজন হিসেবে ওকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। এবং বিচারকের কাছে নিয়ে গেছি। সবচেয়ে আশ্চর্য, ওই বাড়ির যিনি মালিক অর্থাৎ সুধাকান্তবাবু পর্যন্ত ওর ব্যাপারে হ্যাঁ বা না কিছু বলছেন না।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, উনি কেবলই বলছেন আপনারা যা ভালো বোঝেন তাই করুন। আমার কি রকম সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

"আচ্ছা এমন কি হতে পারে না, সুধাকান্তবাবু নিজেই খুন করেছেন স্ত্রীকে?"

"হতে পারে। তবে বর্তমানে বয়সের ভারে উনি এত বেশি অক্ষম হয়ে পড়েছেন যে এখন আর তাঁকে সন্দেহ করা যায় না!"

"উনি কি চলাফেরা করতে পারেন না?"

"সব পারেন। লাঠি ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামা-ওঠাও করেন। পার্কে গিয়ে বসেন। তবুও বড় দুর্বল।"

"আমি এ ব্যাপারে ছেলেটির সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

"বেশ তো বলুন!"

আমি উঠে গিয়ে গরাদের ফাঁক দিয়ে ছেলেটিকে দেখলাম। এক কোণে বসে বসে কাঁদছিল ছেলেটি।

গরাদের তালা খুলে ওকে বার করে আনতেই ছেলেটি আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তারপর কেঁদে বলল, "আমাকে বাঁচান। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি চুরি করিনি, আমি খুন করিনি। বিনা দোষে আমার জেল হবে, ফাঁসি হবে। আমাকে সবাই বলছে আপনি নাকি আমাকে রক্ষা করবেন বলে এগিয়ে এসেছেন।"

"সবাই কারা?"

"এই তো পুলিশরা। এরা বলছে—যে লোক তোর হয়ে দাঁড়িয়েছে তোর আর ভয় নেই। এবার তুই ছাড়া পাবি।"

"ওরা ঠিকই বলছে! আমি দাঁড়াচ্ছি তোমার জন্যে। কিন্তু বাবা আমি যা জিজ্ঞেস করব তার ঠিকমতো উত্তর যদি দাও তো সহজেই বেরিয়ে আসতে পারবে। নাহলে আমারও কিছু করবার থাকবে না। কেননা পুলিশই বলো আর গোয়েন্দাই বলো, আমরা তো আইনের উর্ধ্বে নই। আগে বলো, তোমার নাম কি?"

"আমার নাম রাখহরি চক্রবর্তী।"

'রাখহরি! এ নাম তো তোমাকে মানায় না। এ তো চাকরবাকরদের নাম। তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল রাধামোহন, গৌরাঙ্গসুন্দর—এই রকম।"

ছেলেটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "কী করব বলুন, মা বাবা আদর করে যে নাম রেখেছেন তাই রয়েছে। শুনেছি আমার দু'তিন দাদা জন্মাবার পরই মারা যান বলে আমার নাম হয়েছে রাখহরি। হরি আমাকে রক্ষা করেছেন।"

"হরি এবারও তোমাকে রক্ষা করবেন যদি তুমি সত্যি কথা বলো বা নির্দোষ হও।"

"আমি নির্দোষ।"

"তোমার মা বাবা বেঁচে আছেন?"

"না। আমি যখন খুব ছোট তখনই মারা যান তাঁরা। এক বছরের মধ্যে মা বাবা দুজনেই।"

"তাঁদের কারো কথা মনে পড়ে তোমার?'"

"মায়ের কথা আমার আজও মনে পড়ে। কী সুন্দর দেখতে ছিল আমার মাকে। দুধে-আলতায়-গোলা গায়ের রঙ। আমরা খুব গরিব ছিলুম। সেজন্যে পেট ভরে খেতে দিতে পারতেন না বলে আমাকে বুকে নিয়ে কত কাঁদতেন আমার মা।"

"যাক, বাবার কথা তাহলে মনে পড়ে না তোমার?"

"খুব আবছা। কেননা বাবা তো বর্ধমানে কাজ করতেন। মাঝে মাঝে বাড়ি আসতেন!"

"দেশ কোথায় তোমার?"

"আমাদের দেশ জৌগ্রাম। সেখানে অবশ্য কিছুই নেই এখন। কেউ কোথাও নেই।"

"হুঁ। সুধাকান্তবাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় কী করে হলো? কী ভাবে তুমি ওনার বাড়িতে এলে?"

আমার জেরার উত্তরে ওর মুখ থেকে যা শুনলাম তা হল এই—

রাখহরির যখন সাত বছর বয়স তখন ওর বাবা মারা যান। আট বছর বয়সে মা। তারপর থেকে এর-ওর বাড়িতে মানুষ ও। বাবা-মা'র কৃপাতেই গ্রামের পাঠশালায় বর্ণপরিচয় যা হবার তা হয়েছিল। তারপর বছর তিনেক কেটে যাবার পর এগারো বছর

বয়সে ওর গ্রামসুবাদে এক কাকা ওকে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং কালীঘাটে পৈতে দিয়ে এক ঠাকুরবাড়িতে রেখে যান। সুধাকান্তবাবু সেখান থেকেই আবিষ্কার করেন ওকে।

ওর ফুটফুটে চেহারা এবং ঢলঢল নিষ্পাপ মুখখানি দেখে অপুত্রক সুধাকান্তবাবু এবং তাঁর স্ত্রী ওকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এসে ছেলের মতো আদর-যত্নে রেখে দেন। সুধাকান্তবাবুর স্ত্রী হেমপ্রভা দেবী তাঁর বহুমূল্য অষ্টধাতুর বিগ্রহের সেবাপূজার দায়িত্ব রাখহরিকেই দেন। রাখহরিও নিষ্ঠার সঙ্গে তার কাজ করতে থাকে। সুধাকান্তবাবুরা রাখহরির সৎ-চরিত্রের নিদর্শন পেয়ে এবং তার আনুগত্যে বিগলিত হয়ে ঠিকই করেছিলেন, তাকে তাঁরা আইনগতভাবে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং তাদের বিষয়সম্পত্তি সব কিছু তাকেই দিয়ে যাবেন। বিনিময়ে রাখহরি ওদের দুজনকে মা বাবা বলে ডাকবে এবং তাঁদের মৃত্যুর পর ছেলের কাজ করবে, অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিকৃত্য ইত্যাদি।

কিন্তু হঠাৎ কিছুদিন আগে সুধাকান্তবাবুর এক ভাগনা পাটনা থেকে এসে সব কিছু গোলমাল করে দিল। সে এসে প্রায় মাসখানেক এই বাড়িতে বসে রইল। এবং রাখহরিকে তাড়িয়ে দিয়ে যাতে তাকে এখানে রেখে দেওয়া হয় এইরকম আবদারও ধরল। শুধু তাই নয়, এও বলল এইসব অজ্ঞাত-কুলশীল ছেলেরা কখনো পোষ মানে না। এবং সুযোগ পেলেই এরা গৃহস্থের বুকে ছুরি মেরে পালায়। যাই হোক, হেমপ্রভা দেবী এবং সুধাকান্তবাবু দুজনেই তাকে সহ্য করতে পারতেন না। কারণ তার চালচলন কথাবার্তা ছিল লোফারদের মতো। একদিন হেমপ্রভা দেবী খুব যা-তা করে অপমান করলেন তাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। ভাগ্‌নাবাবুটি বিদায় নিল। তবে যাবার আগে রাখহরিকে শাসিয়ে গেল, সে যদি এক মাসের মধ্যে স্বেচ্ছায় এবাড়ি থেকে চলে না যায় তাহলে তার কপালে নাকি অনেক দুঃখ আছে।

আমি ধৈর্য ধরে রাখহরির সব কথা শুনছিলাম এতক্ষণ। এইবার তাকে প্রশ্ন করলাম, "সুধাকান্তবাবুর সেই ভাগনেবাবুর নাম কি?"

"ভালো নাম জানি না। তবে ওকে রাজা বলে ডাকা হোত। ওর নাম রাজা রায়।"

"রাজা রায় এই বাড়ি থেকে বিদায় নেবার কতদিন পরে খুনটা হয়েছে?"

"তা ধরুন চার-পাঁচ দিনের মাথায়।"

"আচ্ছা এই খুনের ব্যাপারে তুমি কি কাউকে সন্দেহ করো?"

"কাকে করব বলুন? রাজাবাবু থাকলে ওকেই সন্দেহ করতাম। কেননা ওর যা চালচলন তাতে এ কাজ করা ওর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।"

"তা এই খুনের মামলায় সুধাকান্তবাবু তোমাকেই বা অভিযুক্ত করলেন কেন?"

"সেটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। মা ঠাকরণ খুব ভোরে উঠে পূজার আয়োজন করতেন। আমিও সাতটা নাগাদ পুজো শেষ করে পড়তে যেতাম। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে চলে যেতাম স্কুলে। ফিরতাম বিকেলবেলা। তারপর একটু ঘুরে বেরিয়ে এসে সন্ধেবেলা শীতল দিয়ে আবার পড়াশুনা করতে বসতাম। এই ভাবেই দিন চলছিল। এরই মাঝে রাজাবাবু এলেন। তবে রাজাবাবু চলে যাবার পর বাবা যেন কি রকম হয়ে গেলেন। সেদিন সন্ধেবেলা আমি যখন ঠাকুরঘরে শীতল দেবো বলে গেছি তখন দরজা খুলে আলো জ্বেলেই দেখি, সর্বনাশ, চারদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছে আর মা ঠাকরুণ মেঝেতে পড়ে আছেন। তাঁর বুকে একটা ধারালো ছোরা গাঁথা আছে। আমি ছুটে গিয়ে সেই ছোরাটা বুক থেকে

যখন টেনে তুললাম তখন মা-ঠাকরুণ মরে গেছেন। আর ঠিক সেই সময়ই বাবুও বাইরে থেকে এসে পড়লেন। এসে আমার হাতে ছোরা ও মা ঠাকরুণের ওই অবস্থা দেখে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। বাবুর চিৎকারে লোকজন সব হৈ-হৈ করে ছুটে এলো। তারপর থানা-পুলিশ অনেক কিছুই গড়াল। আমিও অ্যারেস্ট হলাম।''

''সবই তো বুঝলাম। শুধু বুঝতে পারছি না, সুধাকান্তবাবুর তোমাকেই বা সন্দেহ করছেন কেন? ঠিক আছে, তুমি নির্ভয়ে থাকো। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব তোমাকে বাঁচাবার।'' বলে রাখহরির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেব বাসায় চলে এলাম।

হাওড়া শহরের উপকণ্ঠে সুধাকান্তবাবুর বাড়ির সামনে যখন এসে পৌঁছলাম, বেলা তখন দশটা। সাবেক কলের বনেদি বাড়ি। কড়িবরগা দেওয়া ঘর। পাঁচিল-ঘেরা বাগান, পুকুর। এক পাশে ঠাকুরঘর। ঘরের দরজায় শিকল দেওয়া। সুধাকান্তবাবু দোতলায় থাকেন।

আমি যেতেই এক ঘোমটা-টানা মহিলা বললেন, ''কাকে চাই?''

''সুধাকান্তবাবু আছেন?''

''হ্যাঁ, ওপরে যান।''

আমি ওপরে ওঠার আগে থেমে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ''তুমি কে মা?''

''আমি এ বাড়ির ঝি।''

''অ। কতদিন কাজ করছ এখানে?''

''তা ধরুন না কেন, বছর দশেক।''

''আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমায়, এখানে রাখহরি নামে যে ছেলেটি থাকত সে ছেলেটি কি রকম? শুনলুম সে নাকি খুনের দায়ে—।''

''তা কী করে বলব বলুন? এমনিতে তো খুব ভালো, কিন্তু তার মনে যে এই ছিল তা কি কেউ জানত? ঘরের ছেলের মতোই ছিল। হঠাৎ কী যে মতিচ্ছন্ন হল!''

''হুঁ। তোমার ঘরে কে কে আছে?''

''আমার একটি ছেলে ছাড়া কেউ নেই বাবা।''

''আচ্ছা, রাজাবাবু নামে কাউকে চেনো তুমি?''

''কেন চিনবুনি? বাবুর ভাগ্নে তো। সে কিন্তু ঠিক কথাই বলেছিল. পরের ছেলেকে এইভাবে ঘরে ঢুকিও না, একদিন খুন করে পালাবে। ঠিক তাই হল।''

আমি মহিলাকে বেশ ভালো করে এক নজর দেখে নিয়ে বললাম, ''তুমি কোথায় থাকো?''

''ওই তো, ওই আমার ঘর—ওই যে টিনের চালাটা দেখা যাচ্ছে। আপনি কে বাবু?''

''আমি তোমাদের বাবুর একজন বন্ধু।''

আমি দোতলায় উঠলাম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বারান্দার গায়ে প্রথম যে ঘরটা সেই ঘরের খাটে একটি পরিষ্কার বিছানায় শুয়েছিলেন সুধাকান্তবাবু, আর বেশ গাঁট্টাগোট্টা গোছের ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সের একটি ছেলে খুব যত্ন করে তাঁর পা টিপে দিচ্ছিল।

আমি যেতেই ছেলেটি বলল, ''বাবু, কে এসেছেন!''

''কে?''

আমি বললাম, "আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম অম্বর চ্যাটার্জি। আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।"

"অ। তাই নাকি? আসুন আসুন। আস্তে আজ্ঞা হোক। ওরে ভোলা, বাবুকে বসতে জায়গা দে।"

ভোলা আমাকে একটা চেয়ার এনে দিল।

আমি চেয়ারে বসে বসলাম, "তুমি কে?"

"আজ্ঞে, আমি বাবুকে একটু দেখাশোনা করি। আমার মা এ বাড়িতে কাজ করে।"

"একটু আগে যে মহিলাকে নীচে নেমে যেতে দেখলাম উনিই কি তোমার মা?"

"হ্যাঁ।"

আমি এবার সুধাকান্তবাবুকে বললাম, "আচ্ছা আপনার বাড়িতে রাখহরি নামে যে ছেলেটি থাকত, আপনার কি ধারণা ওই ছেলেটিই আপনার স্ত্রীকে খুন করেছে?"

"দেখুন, রাখহরি আমাদের ছেলের মতন হয়ে গিয়েছিল। কাজেই কোন কিছুর লোভে ও যে আমার স্ত্রীকে খুন করবে এ হতে পারে না।"

"অথচ পুলিশকে তো আপনি অন্য কথা   ছে৹।?'

"মোটেই না। পুলিশকে আমি কোন কথাই বলিনি। সেদিন ওই দৃশ্য দেখার পর আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখলাম আমার ঘর পুলিশে ভর্তি। আমার তখন উঠে বসারও ক্ষমতা নেই। ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি কি দেখেছি। তা যা দেখেছি তাই বললাম। ওরা তখন একটা কাগজে কী সব লিখে আমাকে সই করতে বলল। আমি করলাম। পরে শুনলাম রাখহরিকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।"

"ও, এই ব্যাপার! আচ্ছা এবারে বলুন তো, ওই মূর্তি চুরির ব্যাপারে আপনি কাউকে সন্দেহ করেন কিনা?"

"কাকে করব? তবে রাখহরি নেয়নি, ও নিতে পারে না।"

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, "ছেলেটির ওপর আপনার এত ভাল ধারণা থাকা সত্ত্বেও ওকে যে জেল খাটানোর ব্যবস্থা হচ্ছে সে ব্যাপারে আপনি নীরব কেন?"

"কী করতে পারি বলুন? এখন আমার উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তার ওপর পুলিশ ওকেই সন্দেহ করছে। ছোরার হাতলে ওর হাতের ছাপ আছে। তা পুলিশ যা করার তাই করুক।"

"সে কি! ছোররা হাতলে হাতের ছাপ আছে বলেই ছেলেটি অপরাধী হয়ে যাবে? ও তো আপনার স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে ওটাকে টেনে তুলতেও পারে? তাছাড়া আপনি তো নিজেই বলছেন এ মূর্তি ও চুরি করতে পারে না। ঘটনায় এও জানা যাচ্ছে, খুনের অপরাধে রাখহরিকে যখন ধরা হয়েছিল তখন মূর্তি তার কাছে ছিল না। অর্থাৎ এটা বেশ পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে, চোর মূর্তি চুরি করে পালিয়ে যাবার সময় আপনার স্ত্রীর দ্বারা বাধা পায় এবং নিরুপায় হয়েই আপনার স্ত্রীকে খুন করে পালায়।"

"আপনার অনুমানই ঠিক। আমিও কিন্তু মনে মনে ওই রকমই চিন্তা কবছি।"

আমি হেসে বললাম, "আপনার ভাগ্নাবাবুর খবর কি?"

"সে তো চলে গেছে।"

"আপনার কি মনে হয় না, এই খুনের পেছনে তারও কোন হাত থাকতে পারে?"

সুধাকান্তবাবু বললেন, "তার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই তো, সে সেই পাটনা থেকে এখানে এসে সামান্য একটু বিষয়সম্পত্তির লোভে আমার স্ত্রীকে খুন করবে! কী যে বলেন মশাই! এ কোন ছিঁচকে চোরের কাজ।"

আমি আর এই ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করে মোটামুটিভাবে একটা খসড়া তৈরি করে তাইতে সই করালাম সুধাকান্তবাবুকে। খসড়ার বিষয়বস্তু হল এই যে, রাখহরির প্রতি সুধাকান্তবাবুর কোন রকম সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে তিনি যে স্টেটমেন্টে সই করেছেন তা না জেনে। এই চুরি ও হত্যাকাণ্ড বহিরাগত কারো দ্বারাই সম্ভব।

সুধাকান্তবাবুর কাছ থেকে আমি রাজা রায়ের ঠিকানা নিয়ে সেদিনের মতো ফিরে এলাম সেখান থেকে।

দিনকয়েকের মধ্যেই রাজা রায়কে অ্যারেস্ট করে কলকাতায় নিয়ে আসা হল। বেশ সুদর্শন চেহারা। তবে একটু লোফার ও মস্তান প্রকৃতির। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা রাজাবাবু, সুধাকান্তবাবু আপনার কে হন?"

"মামা।"

"হুঁ। আপনি কিছুদিন আগে এখানে এসে মামা-মামীর সঙ্গে খুব ঝগড়া করে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। কারণ আমাকে আমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল। আমি থাকতে অন্য একটি ছেলেকে এ বাড়িতে রেখে মানুষ করে তার হাতে সব কিছু তুলে দেবার দরকার কী? তাহলে কেন আমি ঝামেলা করব না বলুন? কেন আমি আমার অধিকার ছেড়ে দেবো? আর এ সবই হচ্ছিল আমার মামার যোগসাজসে।"

'কিন্তু আপনাকে বঞ্চিত করার কারণটা কী?"

"তা কী করে জানব? তবে মামী আমাকে একদম সহ্য করতে পারতেন না। আসলে ইনি তো মামার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। এই বিয়ে নিয়ে আমার মায়ের সঙ্গে মামার প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। তারপর থেকে প্রায় বছর দশেক মুখ দেখাদেখি ছিল না। কিন্তু যখন শুনলাম ওরা অন্য একজনকে পোষ্যপুত্র নিয়ে সব কিছু লিখে দেবার মতলব করছে তখন আমি এখানে এসে হুজ্জোতি করি।"

"এবং পরে এখান থেকে অষ্টধাতুর মূর্তিটা হাতিয়ে নিয়ে মামীর বুকে ছুরি মেরে কেটে পড়েন, এই তো? দু'এক দিন আশেপাশে গা-ঢাকা দিয়ে থেকে কাজটা করেন, যাতে দোষটা পরের ছেলের ঘাড়েই চেপে যায়, কী বলুন?"

"এসব কী বাজে কথা বলছেন আপনি?"

"ঠিকই বলছি। সুধাকান্তবাবুর স্ত্রীকে আপনিই খুন করেছেন। রাখহরির বদলে আপনাকেই ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হবে। আর সেই সঙ্গে সুধাকান্তবাবুকেও বুড়ো বয়সে বেশ কিছুদিন জেলের ঘানি টানাব। সম্পূর্ণ ন্যাকা সেজে একটি নিরীহ ছেলের ক্ষতি হচ্ছে জেনেও বুড়ো ভাম হয়ে বসে থাকার মজা দেখাচ্ছি আমি।"

"সে যা করবেন করুন, তবে আমার নামে মিথ্যে বদনাম দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি খুন করিনি, চুরিও করিনি। ওই রাখহরি ছেলেটাই আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্য এই সব করেছে।"

আমি এখন রাজাবাবুকে না ঘাঁটিয়ে আবার রাখহরির কাছে গেলাম। রাখহরি আমার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে বলল, "কী, কিছু হল? আমাকে ছাড়িয়ে আনার কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন?"

আমি হেসে বললাম, "ব্যবস্থা হচ্ছে। তছাড়া ছাড়া পেয়েই বা তুমি করবে কী? যাবে কোথায়? মা ঠাকরুন তো নেই। সুধাকান্তবাবুও নিশ্চয়ই তোমাকে বাড়িতে ঢোকাবেন না। থাকবে কোথায়?"

"ফুটপাতে থাকব। মোট বইব। তবু একটা স্বাধীন জীবন আমার চাই।"

"আচ্ছা রাখহরি, তোমার মা ঠাকরুণের সঙ্গে বাবুর সম্পর্ক কি রকম ছিল? মানে কোন ঝগড়াঝাঁটি হোত কি?"

"না। বরং মা ঠাকরুণকে নিয়ে বাবুর খুব চিন্তা ছিল, তাঁর অবর্তমানে মা ঠাকরুণের কী হবে? তিনি কি একা সব কিছু সামলাতে পারবেন?"

"আচ্ছা ওই বাড়িতে যে ভোলার মা কাজ করে সে কি রকম?"

"কেন, ভালোই তো। ওর ছেলেটাও ভালো। বড় গরিব ওরা।"

"আচ্ছা তোমার মা ঠাকরুণকে সুধাকান্তবাবু কোন কারণে খুন করতে পারেন না?"

"অসম্ভব। আমি যখন ঘরে ঢুকে মা ঠাকরুণকে ওই অবস্থায় দেখে তাঁর বুক থেকে ছোরা টেনে বার করি, বাবু তখন সবেমাত্র বাইরে থেকে এসেছেন। এই সময় রোজই উনি ঠাকুর প্রণাম করে ওপরে যান। তা ওই দৃশ্য দেখেই তিনি যেভাবে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন তাতে ওনার পক্ষে এ কাজ করা কোনমতেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে এই বয়সে উনি কিসের স্বার্থে এ কাজ করতে যাবেন বলুন?'''

"আচ্ছা এমনও তো হতে পারে রাজাবাবুই এখানে কাছেপিঠে কোথাও দু'একদিন লুকিয়ে থেকে ওই কাজ করে তারপর পাটনায় চলে যায়?"

"হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে হ্যাঁ-না কিছুই আমি বলতে পারব না আপনাকে।"

জিজ্ঞাসাবাদ যতই চলছে অবস্থা ততই ঘোরালো হয়ে উঠছে। রাজাবাবু, সুধাকান্তবাবু এবং রাখহরির মধ্যে কে যে আসল অপরাধী তা কে জানে? তবে সুধাকান্তবাবু মানুষটি বড়ই রহস্যময়।

সে রাত্রিটা এক ভয়ঙ্কর উত্তেজনার মধ্যে কাটল আমার। মনে মনে যত রকম ছক তৈরি করি সবই কিরকম এলোমেলো আর অসার বলে মনে হয়। রাজা রায় যে যুক্তি দেখিয়েছে তা নেহাৎ ফেলে দেবার মতো নয়। আপাতদৃষ্টিতে রাখহরিকে নির্দোষ বলেই মনে হয়। আর সুধাকান্তবাবু কি ওই বয়সে নিজের স্ত্রীকে এইভাবে হত্যা করবেন? এ হতে পারে না। বিশেষ করে ওই দৃশ্য দেখার পর যে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায় তাঁকে সন্দেহ করারও কোন অবকাশ নেই।

সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপার হল মূর্তিটা গেল কোথায়? এই অঞ্চলে বহু অনুসন্ধান করেও ওই অষ্টধাতু মূর্তির কোন হদিশ পাওয়া যায় নি। মূর্তিটা হয় এখানেই লুকোনো আছে কোথাও, নয়তো স্থানান্তরে বহুদূরে চলে গেছে।

পরদিন সকালে রহমন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে এবং কিছু পুলিশসহ সুধাকান্তবাবুর বাড়ি, বাগান, পুকুর তল্লাশি করতে চললাম। মেন গেট বন্ধ ছিল। অনেক ডেকেও সাড়া না

পেয়ে পিছনদিকে গিয়ে বাগানের পাঁচিলের ভাঙা অংশটা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম, কিন্তু ভেতরে ঢুকে যা দেখলাম তাতে শিউরে উঠলাম। বারান্দার নীচে মাটিতে ঘাসের ওপর সুধাকান্তবাবু উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। মুখের কাছে নাকের কাছে চাপ-চাপ রক্ত। না, খুন নয়। খুব সম্ভবত বারান্দার রেলিং-এ কোন কারণে ভর দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেছেন। সুধাকান্তবাবুর এই মর্মান্তিক পরিণতি সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

যাক, পুলিশ গোটা ঘর তল্লাশি করেও কিছুই পেল না।

ভোলা বা ভোলার মা কারো পাত্তা নেই।

রহমন সাহেবের চার্জে সব কিছু রেখে একজন কনস্টেবলকে নিয়ে ভোলাদের বাড়ি গেলাম।

আমাকে দেখেই এবং সঙ্গে পুলিশ দেখে আঁতকে উঠল ওরা।

আমি ভোলার মাকে বললাম, "কী ব্যাপার! এখনো কাজে যাওনি যে?"

ভোলার মা ফ্যাকাশে মুখে ম্লান হেসে বলল, 'আমি একটু দেরি করেই ও বাড়িতে যাই। কিন্তু আপনারা কোন দিক দিয়ে এখানে এলেন বাবু?"

"মেন গেট বন্ধ, তাই পেছনদিক দিয়ে এলাম। কিন্তু সুধাকান্তবাবুকে ঘরে দেখতে না পেয়েই এখানে এলাম আমরা—কোথায় উনি?"

ভোলার মা চমকে উঠল, "সে কি! উনি ঘরে নেই?"

"না। তুমি ও বাড়িতে কাজ করো। তোমার ছেলেও ওনার দেখাশোনা করে, অথচ মানুষটা যে বাড়িতে নেই একথা তোমরা জান না? তাছাড়া সেদিন যখন বেলা দশটা নাগাদ আমি এখানে এসেছিলাম, তুমি তখন কাজ করে ফিরে আসছিলে, আর আজ বেলা দশটা বেজে গেল এখনো তুমি কাজে গেলে না কেন?" তারপর ভোলাকে বললাম, " তা বাবা ভোলানাথ, সেদিন সকাল গিয়ে তো দেখলাম দিব্যি বসে বসে বাবুর পদসেবা করছিলে, আজ এখনো এখানে যে? ব্যাপারটা কী?"

ভোলা কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "বিশ্বাস করুন বাবু, কাল সারারাত খুব পেটের যন্ত্রণা হয়েছে। বিছানা থেকে একদম উঠতে পারিনি। এই এখনই যাব ভাবছিলাম।"

"তা এত বেলা হল, তুমি যে সকাল থেকে যেতে পারলে না সেকথা তোমার মাও একবার গিয়ে বাবুকে বলে আসার দরকার মনে করল না? তাহলেই তো টের পেতে মানুষটা আছেন কি নেই?"

ভোলার মা বলল, "বাবু, সত্যি কথা বলতে কি আমরা গরিব লোক। কাল ছেলেটার খুব শরীর খারাপ ছিল। তাই ও রাত্রেও শুতে যেতে পারেনি। আমি বাবুকে রাত্রিবেলা খাইয়েদাইয়ে সেকথা বলে এসেছিলাম। কিন্তু আজ সকালে বাবুকে দেখতে গিয়ে দেখি—"

"বাবু বারান্দার রেলিং ভেঙে নীচে পড়ে গিয়ে মারা গেছেন, এই তো?"

'হ্যাঁ।"

"আর সেই ভয়ে পাছে বাইরের লোক কেউ এসে দেখে ফেলে তাই মেন গেট বন্ধ করে মা-ব্যাটায় ঘরে ঢুকে বসে আছ! কেউ যেন টের না পায়! বলিহারি বুদ্ধি!"

"হ্যাঁ বাবু।"

"তা বাবা ভোলানাথ, তোমাকে যে এবার থানায় যেতে হবে আমাদের সঙ্গে!

ওঠো।"

ভোলা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে দাঁড়াতেই বললাম, "এ কি! তোমার পায়ে এত পানা লেগে কেন?"

"ও কিছু নয় বাবু। কাল সন্ধেবেলা পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম।"

আমার মনের মধ্যে বিদ্যুৎচমকের মতো এক ঝলক সন্দেহ উঁকি দিল। বললাম, "কই, কোথায়? কোন পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলে? আমায় একটু দেখাবে চল তো?"

ভোলা বলল, "চলুন।"

আমি ভোলাকে সঙ্গে নিয়ে পুকুরপাড়ে এলাম।

"এবার বলো কোনদিকে তুমি মাছ ধরেছিলে?"

ভোলা তখন একটা জায়গা দেখিয়ে দিল।

আমি ভালো করে জায়গাটা লক্ষ্য করে বললাম, "না, তুমি ঠিক বলছ না। এখানে তুমি আসনি। এখানকার ভিজে মাটিতে কাদায় তোমার পায়ের কোন ছাপ দেখছি না।"

ভোলা তখন ন্যাকা সাজার ভান করে বলল, "তাহলে কোন দিক দিয়ে এসেছিলাম কে জানে!"

"তোমাকে আর জানাতে হবে না, আমিই জেনে নিচ্ছি।" বলে আমার সঙ্গের কনস্টেবলকে বললাম, "লোকটাকে একটু নজরে রাখো তো। মনে হচ্ছে বেশ রীতিমতো গোলমাল আছে। লকআপে পুরে রহমন সাহেবকে দিয়ে বেশটি করে ঘাকতক দেওয়ালেই সব কথা বেরিয়ে যাবে ওর মুখ থেকে।"

ভোলার মুখে আর কথাটি নেই।

মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখ।

আমি তখন তন্ন তন্ন করে চারদিক খুঁজতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে একদিকে আবিষ্কার করলাম পুকুরে নামার অনুপযুক্ত এই জায়গাটা দিয়ে কেউ নেমেছে উঠেছে। সেই পথ ধরে আমিও নীচে নেমে গেলাম। দেখলাম এক জায়গায় পুকুরের নরম মাটি কাদায় পায়ের গভীর ছাপ। আর পুকুরের এক কোণে লম্বালম্বিভাবে একটি কঞ্চি পোঁতা আছে। জলের মতই পরিষ্কার, কোন কিছু লুকনো আছে ওখানে!

আমি ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এসে ভোলার বুকে পিস্তল তাগ করে বললাম, "ওখানে কী লুকিয়ে রেখেছিস বল?"

"কী-কী—কিছুই রাখিনি বাবু।"

"ঠিক করে বল, নাহলে তোর বাঁচার কোন রাস্তা নেই।"

ভোলা মাথা হেঁট করে বলল, "ওখানে মা ঠাকরুণের গয়নাগুলো একটা বাক্সয় করে রাখা আছে।"

"হুঁ, গয়না তুই পেলি কোথায়?"

"কাল রাতে বাবু ঘুমিয়ে পড়লে আমি বালিশের তলা থেকে চাবি বার করে সিন্দুক খুলে মা ঠাকরুণের সমস্ত গয়না চুরি করে নিই। তারপর সব নিয়ে যখন পালাতে যাই, বাবু তখন জেগে ওঠেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো নিভিয়ে দিই। উনি তখন চোর চোর বলে চেঁচিয়ে যেই না ঘর থেকে বেরোতে যাবেন আমি অমনি বাবুকে ধাক্কা দিয়ে পালাতে যাই, আর সেই ধাক্কায় বাবু টাল সামলাতে না পেরে বারান্দার রেলিং টপকে মুখ থুবড়ে

পড়ে যান। অমনি হয়ে যায় ওই বিপজ্জনক কাণ্ড। নাহলে সত্যি বলছি বাবু বিশ্বাস করুন, খুন করবার মতলব নিয়ে কিছু আমি করিনি।"

"তা না হয় হল, এইবার বল তো বাবা, অষ্টধাতুর মূর্তিটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?"

"ওটার ব্যাপারে আমি কিছু জানি না, বিশ্বাস করুন।"

রহমন সাহেব যে কখন কথার ফাঁকে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তা লক্ষ্য করিনি, হঠাৎ রাগের মাথায় ভোলার তলপেটে একটা লাথি কষিয়ে বললেন, "বল শিগগির!"

লাথি খেয়ে কঁকিয়ে উঠল ভোলা। দু'হাতে পেট ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি জানি না বাবু, বিশ্বাস করুন। সত্যি বলছি, আমি জানি না।"

"বিশ্বাস করাচ্ছি, দাঁড়া।" বলেই রহমন সাহেব বললেন, "এই, আমার রুলটা নিয়ে আয় তো গাড়ি থেকে। বেশ করে ঘাকতক দিই। না দিলে মুখ খুলবে না।"

ভোলার মা কাছেপিঠেই কোথাও ছিল বোধ হয়। ছুটে এসে রহমন সাহেবের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বলল, "ও না বলুক, আমি বলছি বাবা। দয়া করে ওকে মেরো না। মূর্তিটা আসলে রাজাবাবুর কাছে আছে।"

"রাজাবাবুর কাছে? সেকি।"

"হ্যাঁ বাবু, রাজাবাবু যেদিন পাটনা চলে গেলেন, তার পরদিনই আমাদের এখানে এসে হাজির।"

"তারপর?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "এ কি রাজাবাবু! আপনি বাড়ি যান নি?"

রাজাবাবু বললেন, "না। তবে আমি যে এখানে এসেছি তা যেন কেউ জানতে না পারে। বলেই আমার হাতে একশোটা টাকা দিয়ে বললেন, যেভাবেই হোক ঠাকুরঘর থেকে অষ্টধাতুর মূর্তিটা এনে দিতে। কেননা রাখহরিকে মিথ্যে মামলায় না জড়ালে বা ওর প্রতি মামা-মামীর মন বিরূপ করতে না পারলে এই সম্পত্তি তাঁর হবে না। রাজাবাবুর মতলব ছিল, মূর্তি চুরির পর এটা নিয়ে যখন খুব হৈ-চৈ হবে সেইসময় মূর্তিটা রাখহরির ঘরে কোথাও লুকিয়ে রেখে পুলিশকে খবর দেওয়া। আমি প্রথমে রাজি হইনি বাবু। রাজাবাবু তখন আমাকে অনেক লোভ দেখালেন। বললেন, রাজাবাবু যদি এই সম্পত্তির মালিক হন তাহলে আমাদের আর কোন অভাব রাখবেন না। আমার ভোলাকে সব সময় তাঁর কাছে কাছে রাখবেন এবং মাস গেলে মোটা টাকা মাইনে দেবেন।"

"সেই লোভে সুধাকান্তবাবুর স্ত্রীকে খুন করে ওই মূর্তি তুমি রাজাবাবুর হাতে তুলে দিয়েছিলে, তাই না?"

"না, আমি খুন করিনি বাবু। সেদিন সন্ধেবেলা ঠাকুরঘর মোছবার অছিলায় চাবি খুলে ঘরে ঢুকে যেই না মূর্তির গায়ে হাত দিয়েছি অমনি দেখি মা-ঠাকরুণ দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছেন।"

"আচ্ছা, সন্ধেবেলা কেন? তুমি তো মূর্তি চুরি করতে রাত্রিবেলাও আসতে পারতে?"

"রাত্রিবেলা কি করে আসব বাবু? চাবি যে ঠাকরুণের কাছে থাকত। আমি সন্ধেবেলা চাবি খুলে ঘর মুছতাম। আর মা ঠাকরুণ আরতির ব্যবস্থা করে দিতেন। তারপর রাখহরি

ঠাকুরের শীতল দিয়ে চলে গেলে মা নিজে হাতে ঘরে তালা দিয়ে চলে যেতেন। কাজেই ওই সময়টাই ছিল মূর্তিচুরির আসল সময়।"

"তারপর কী হল বল?"

"হ্যাঁ, মা ঠাকরুণ তো আমাকে দেখেই অবাক হয়ে বললেন, এ কি, সরলা তুই? একি করছিস? ঠাকুর তুলেছিস কেন? ভয়ে আমার হাত থেকে তখন মূর্তিটা পড়ে যায় আর কি, আর ঠিক সেই সময়ই কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার হাত থেকে মূর্তিটা ছিনিয়ে নিল। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি মা-ঠাকরুণ মেঝেয় পড়ে কাতরাচ্ছেন। তাঁর বুকে ছুরি গাঁথা। চেয়ে দেখি দরজার পাশে রাজাবাবু। আমাকে বললেন, হাঁ করে দেখছিস কি? শিগগির পালা! একথা কাউকে বলবি না। তাহলে তোদের মা-ব্যাটা দুজনকেই পুঁতে ফেলব।"

আমরা অবাক বিস্ময়ে সব কিছু শুনলাম।

ভোলার মা এবার গড় গড় কর বলে চলল, "রাজাবাবু বড় সাংঘাতিক লোক বাবু। তাই ভয়ে আমরা মুখ খুলিনি। বিনাদোষে রাখহরিকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল, তাও চোখে চেয়ে দেখলাম। বাবুও দু'তিন দিন অজ্ঞান-অচৈতন্যর মতো পড়েছিলেন। তারপর জ্ঞান হলে একদিন বললেন, দেখ ভোলার মা, আমার কি মনে হয় জানিস, রাখহরি তোর মা-ঠাকরুণকে খুন করেনি, এ ঠিক ওই শয়তানটার কাজ---রাজাই ওকে খুন করেছে। অথচ আমাব দিদির ওই একটিই মাত্র ছেলে। যদি ধরিয়ে দিই তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। দিদি আমার বাঁচবে না। বুড়ো বয়সে হার্টফেল করবে। জামাইবাবু বেঁচে নেই, ওই ছেলেটিই দিদির সব। তবে যাক, আমার সম্পত্তির ভাগ ওকে আমি দিচ্ছি না। যে কটা দিন বেঁচে আছি, তোরা যদি আমার দেখাশোনা করিস তো তোদের নামেই লিখে দিয়ে যাব। তবে মুখে সেকথা বললেও কাগজে কলমে বাবু কিছু করে যাননি। অবশ্য করে গেলেও ওই সম্পত্তির ওপর আমাদের খুব একটা লোভ ছিল না। কারণ ওই সম্পত্তি ভোগ করলে রাজাবাবু আমাদের ছাড়ত না। তাই আমরা মা-ব্যাটাতে যুক্তি করে মা ঠাকরুণের গয়নাগুলো চুরি করেছিলাম। ভেবেছিলাম একদিন চুপি চুপি এখান থেকে পালিয়ে যাব।"

আমি বললাম, "থাক, এবারে যা কিছু বলবার থানায় গিয়ে বলবে। তোমাদের কথাগুলো ওখানে টেপ করা দরকার। চলো সব।"

একজন কনস্টেবল পুকুর থেকে মা-ঠাকরুণের গয়নাগুলো উদ্ধার করে আনলে পুলিশ ভোলা ও ভোলার মাকে থানায় নিয়ে গেল।

মর্গ থেকে লোক এলো সুধাকান্তবাবুর মৃতদেহ ময়না তদন্তে নিয়ে যাবার জন্য। আমিও আর দেরি না করে সোজা আমরা উকিলবন্ধু রণেন্দুশেখরের বাড়িতে চলে এলাম।

আমি সেইদিনই রাখহরিকে জামিনে খালাস করলাম। তারপর পরম আদরে তাকে নিয়ে এলাম আমার মৌড়িগ্রামের বাড়িতে। অনেকদিন ধরে মনে মনে এই রকম একটি ছেলেকেই খুঁজছিলাম আমি, এতদিনে পেলাম। রাখহরিও আমার বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে দারুণ খুশি হল। আদালতের বিচারে রাখহরি বেকসুর খালাস পেলেও বিচারক ভোলা ও ভোলার মায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং রাজা রায়ের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলেন।

অম্বর তদন্ত

মধ্যরাতে হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেল। এরকম মাঝে-মাঝেই হয়। আমি তখন অকারণে একটু পায়চারি করি। বাথরুমে যাই। আবার শুয়ে পড়ি। আজও ঘুম ভাঙতেই উঠে পড়লাম। দেওয়ালঘড়িতে রাত এখন একটা। রাখহরি একপাশে ক্যাম্পখাটে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মাত্র কয়েকমাস হল আমার কাছে এসেছে ও। সারাদিনে কত কাজই না করে। আমাব এই মৌড়িগ্রামের চাব কাঠার চৌহদ্দির মধ্যে ছোট্ট বাড়িটাকে কী সুন্দর ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছে। ওরই পরিচর্যায় বাগানেব গাঁদা গাছগুলি ফুলে ফুলে ভরে আছে। আমার মতো লোকের বাড়িতে এইরকমই একজনের দরকার ছিল, পেয়েছি। এখন ওকে পেয়ে আমার অবসর সময়ও বেশ ভালই কাটে।

আমি উঠে আলো জ্বেলে বাথরুমে যাচ্ছি, এমন সময় ডোরবেলটা বেজে উঠল। থমকে দাঁড়িয়ে সাড়া নিলাম, "কে?"

"দরজাটা একবার খুলবেন?"

"কে আপনি?"

"আপনার সাহায্যপ্রার্থী।" বালিশের তলা থেকে অটোম্যাটিকটা বার করে বললাম, "এক মিনিট।" তারপর এক টানে দরজা খুলতেই দেখলাম এক সুদর্শন ভদ্রলোক ক্রাচে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে হাসিমুখে বললন, "আপনিই অম্বর চ্যাটার্জি?"

"সব জেনেই এসেছেন দেখছি। কী ব্যাপার বলুন তো?"

'বলব বলেই এসেছি আপনার কাছে। আমার বড় বিপদ।"

"অসুন, ভেতরে আসুন।"

ভদ্রলোক ভেতরে এলেন। তারপর একটা চেয়ার টেনে বসতে যেতেই আমি তাঁকে সোফাটা দেখিয়ে দিলাম। সোফায় বসেই বললেন, "জানি এইরকম সময় আমার আসাটা ঠিক হয়নি। আমি বালাশোর থেকে আসছি। আমার নাম সোমেশ্বর সামন্ত। ধৌলি এক্সপ্রেসটা রাত সাড়ে ন'টায় হাওড়ায় ঢোকবার কথা। তার জায়গায় রাত বারোটা হয়ে গেল। ভাবলাম হাওড়া স্টেশনে রাত্রিটা কাটিয়ে ভোরে আপনার কাছে আসব। কিন্তু...।"

"কিন্তু কী?"

"কিন্তু এরই মধ্যে এমন একটা ব্যাপার হয়ে গেল যে, এখনই না এসে পারলাম না। এক গেলাস জল খাওয়াবেন?"

রাখহরি জল দিয়ে চা কিংবা কফির জন্য স্টোভ ধরাল।

সোমেশ্বর বললেন, "চাঁদিপুরের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? আমি সেখানকাব ছোটখাটো একটি লজের মালিক। কিছুদিন আগে আমার লজে একটি খুন হয়। ঘটনাটা এইরকম, এক নবদম্পতি কয়েকদিনের জন্য আমার লজের একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন দুটি ছেলে এসে পাশের ঘরটি ভাড়া নিল। প্রথম দিনটা কাটল ভালয়-ভালয়। দ্বিতীয় দিন সন্ধেবেলা দম্পতি এসে অভিযোগ করলেন, ছেলে দুটির আচার-আচরণ নাকি ভাল নয়, এবং ওঁদের খুব উত্ত্যক্ত করছে। এই না শুনেই আমি ছেলে দুটিকে আমার লজ ছেড়ে অন্য লজে চলে যেতে বলব বলে যেই না ওপরে গেলাম, অমনি দেখি ঘরের

দরজায় তালা দেওয়া। আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম ওদের জন্য। কিন্তু না, ওরা আর ফিরল না। সম্ভবত ভয় পেয়েই পালিয়েছে। পরদিন পুলিশ ডেকে দরজা খুলেই অবাক। দেখি সেই ছেলে দুটির একজন মৃত অবস্থায় ঘরের মেঝেয় পড়ে আছে, অপরজন উধাও।"

"সে কী! ওদের নাম ঠিকানা আপনার খাতায় লেখা ছিল না?"

"ছিল। পুলিশকে যখন সেই ঠিকানা দেব বলে নীচে এলাম তখন দেখলাম খাতাটাই নেই। এই ঘটনায় ওখানে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। নবদম্পতিও সেই ফাঁকে কখন যেন সুট করে কেটে পড়লেন।"

"পুলিশ বাধা দিল না?"

"না। আসলে ওঁরা ভয় পেয়েই পালিয়েছেন।"

"এমনও তো হতে পারে, ওঁদেরই যোগসাজসে খুনটা হওয়ার পর ওঁরা আপনার কাছে অভিযোগ করতে গিয়েছিলেন?"

"তা হলে ওর বন্ধুটা পালাবে কেন?"

"সাজানো নাটকও তো হতে পারে? তা যাক, আপনার লজে স্টাফ ক'জন?"

"স্টাফ বলতে কিছু নেই। আমি ছাড়া চরণিয়া নামে আমাব এক বিশ্বাসী কর্মচারি আছে। বহুদিনের পুরনো লোক।"

"আপনার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে?"

"আমি ব্যাচেলার লোক। কেউ নেই আমার।"

"আপনার পা গেছে কতদিন?"

"বেশ কয়েক বছর হল। একটা মোটর দুর্ঘটনায় পা-টাকে খুইয়েছি।"

রাখহরি তখন কফি নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য। বলল, "আগে এটা খেয়ে নিন, তারপর কথা বলবেন।"

আমরা তিনজনেই কফির পেয়ালায় চুমুক দিলাম।

আমি বললাম, "আমার খবর আপনি কার কাছ থেকে পেলেন?"

"মেজর কে. কে. ঘোষকে আপনার মনে আছে?"

"আরে, উনি আমার বিশেষ পরিচিত।"

"ওঁর মুখেই আপনার কথা শুনেছি এবং উনিই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। যদি সম্ভব হয়, তা হলে বন্ধুর মতো আপনি একটু আমার পাশে এসে দাঁড়ান। আমাকে সাহায্য করুন।"

"বলুন তো আপনার প্রবলেমটা কী?"

"আমার এক পুরনো শত্রু এখন আমাকে উৎখাত করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। মোটা টাকা অফার করছে লজটি তাকে বেচে দেওয়ার জন্য। কিন্তু কোনও কিছুর বিনিময়েই ওই কাজ আমি করব না। শুধু তাই নয়, ইদানীং প্রায়ই দেখছি একটা উড়ো চিঠিতে কেউ বা কারা যেন আমার প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। কী জ্বালা বলুন তো? আপনি কি পারবেন ওই শয়তানগুলোকে শায়েস্তা করতে?"

"পারবই এমন কথা বলতে পারি না, তবে চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?"

"শুনে সুখী হলাম। এখন আমার এই অসময়ে আসার কারণটা বলি শুনুন। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, কেউ জানে না। চরণিয়াকে বলে এসেছি ভুবনেশ্বর

যাচ্ছি বলে। আমি ভেবেছিলাম ধৌলিতে রাত সাড়ে ন'টায় নেমে আপনার সঙ্গে দেখা করব, তারপর ভোরের ট্রেনে আবার ফিরে যাব বালাশোরে। তা রাত বারোটা হয়ে গেল বলে স্টেশনে পায়চারি করছি এমন সময় লেট লতিফ ইস্পাত এক্সপ্রেস এসে ঢুকল। তারপরই এক চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। ইস্পাত এক্সপ্রেসেব ভেতর থেকে একটি দাবিদারহীন ট্রাঙ্ক নামাতেই দেখা গেল ভেতরে এক তরুণীর মৃতদেহ। দেখেই শিউরে উঠলাম। পরিচিত মুখ। সেই তরুণী, যিনি আমার লজে খুনের ঘটনার দিন ছিলেন। সঙ্গে সেদিন স্বামী ছিল। আজ উনি একা। সেই দৃশ্য দেখেই আমি একটা ট্যাকসি নিয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।"

সোমেশ্বরের বিবরণ শুনে আমার কপাল ঘেমে উঠল। রীতিমত রহস্যময় ব্যাপার। বললাম, "চলুন, এখুনি যেতে হবে।"

"এখন কোথায় যাবেন? ট্রেন তো সেই ভোরবেলায়।!"

"ভোরের আর দেরি কত? এখনই তো দুটো বাজে। এখনও গেলে হয়তো তরুণীর লাশটাকে দেখতে পাব।"

"চলুন তবে।"

রাখহরির হাতে ঘরের দায়িত্ব দিয়ে সোমেশ্বরকে নিয়ে সোজা চলে এলাম হাওড়া স্টেশনে। ওখানে আমার এক পরিচিত পুলিশ অফিসারের সাহায্য নিয়ে বেশ ভাল করে দেখলাম তরুণীকে। বললাম, "এ তো রীতা পারিয়াল।"

সোমেশ্বর বললেন, "আপনি চেনেন মেয়েটিকে?"

"আলাপ না থাকলেও বিলক্ষণ চিনি। চমৎকার অভিনয় করে মেয়েটি। কখনও শখের থিয়েটারে, কখনও সিনেমায় পার্শ্বচরিত্রে। অনেকেই চেনে।"

আমি তখনই লোক্যাল থানায় আমার বন্ধু অফিসারকে ফোন করে জানালাম ব্যাপারটা। উনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন। তারপর ডেড বডি দেখে বললেন, "হ্যাঁ, এ তো সেই মেয়েটিই। আমাদের পুলিশ ক্লাবেও অভিনয় করেছিল একবার। ওর বাড়িও আমি চিনি। চলুন তো যাই!"

পুলিশের জিপেই আমরা শালকিয়ার একটি বাড়িতে এসে দরজায় ধাক্কা দিলাম। যিনি এসে দরজা খুললেন তাঁকে দেখেই তো আমাদের চক্ষুস্থির। দেখলাম, স্বয়ং রীতা পারিলাল আতঙ্কিত মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন, "ব্যাপার কী ভাই? আপনারা?"

বললাম, "কিছু মনে করবেন না, এমন একজন তরুণীর মৃতদেহ আজ আমরা দেখেছি, যার সঙ্গে আপনার চেহারার হুবহু মিল আছে। তাই ছুটে এলাম খোঁজখবর নেব বলে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি ভাল থাকুন, এই কামনা করি।"

"আপনারা যে আমাকে বোনের মতো স্নেহ করেন সেজন্য ধন্যবাদ।"

আমরা যখন তাঁর ঘুম ভাঙানোর জন্য ক্ষমা চেয়ে লজ্জিত হয়ে ফিরে আসছি তখন হঠাৎ কি মনে হতেই আবার ফিরে গিয়ে বললাম, "আচ্ছা, আপনার কোনও অ্যালবাম আছে? যা থেকে আপনার দু-একটা ছবি আমরা পেতে পারি?"

"নিশ্চয়ই পারেন।" রীতা আমাদের বসিয়ে রেখে তাঁর অ্যালবামটা দিতেই আমরা ছবির জন্য পাতা ওল্টাতে লাগলাম। বেশির ভাগই অভিনয়ের ছবি। হঠাৎ একটি ছবি দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, সোমেশ্বর, "ওই, ওই তো সেই ভদ্রলোক! এর ছবি এখানে কী করে এল?"

রীতা বললেন, "আপনি কার কথা বলছেন?"

"আপনি কি এঁকে চেনেন?"

"কেন চিনব না? উনি অশোক রায়। আমাদের ইউনিটের একজন ছিলেন। বিরাট বিজনেসম্যান! এখন অবশ্য লাইন ছেড়ে দিয়েছেন।"

সোমেশ্বর বললেন, "যিনি খুন হয়েছেন তিনি এঁরই স্ত্রী। আচ্ছা একটু মনে করে দেখুন তো, আপনার মতো দেখতে আপনার আর কোনও আত্মীয়া আছেন কিনা?"

"আমার কেউ নেই। মা ছিলেন, বছর দুই আগে গত হয়েছেন।"

আমার মনে হল উনি কি যেন চেপে যাচ্ছেন। তাই বললাম, "ঠিক আছে। আজ আর আপনাকে বেশি বিরক্ত করব না। আপাতত অ্যালবামটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি। কয়েকদিনের মধ্যেই অবশ্য ফেরত পেয়ে যাবেন। আজ আমরা আসি। সহযোগীতার জন্য ধন্যবাদ।"

আমি বাইরে এসে পুলিশ অফিসার বন্ধুটিকে বললাম রীতার দিকে একটু নজর দিতে, যাতে কোনওরকমেই এখান থেকে ও পালিয়ে না যায়। তারপর আমাকে সাহায্যের জন্য ওঁকে কী কী করতে হবে তা একটু আড়ালে গিয়ে জানিয়ে দিলাম। সোমেশ্বর টিকিট কেটে আনালেন। আমরা দু'জন মুখোমুখি দুটি জানলার ধার দেখে বসলাম ধৌলি এক্সপ্রেসে। পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটে ট্রেন ছাড়ল।

ধৌলি এক্সপ্রেস বালাশোরে পৌঁছল সকাল সাড়ে ন'টায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সোমেশ্বর তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে ফোন নম্বরটা দিতে ভুললেন না অবশ্য। আমিও একটা অটো নিয়ে চলে এলাম চাঁদিপুর। সেখানে সোমেশ্বর সামন্তর লজ খুঁজে বার করতে আমার একটুও অসুবিধে হল না। চরণিয়া লজের দায়িত্বেই ছিল। আমি গিয়ে তাকে বললাম, "তোমাদের এই লজের মালিক আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তাই এখানে এসেছি তার সঙ্গে গল্প করে কয়েকদিনের ছুটি কাটাতে। কোথায় তিনি?"

চরণিয়া বলল, "বাবু তো এখানে নেই। ভুবনেশ্বর গেছেন। একটু বেলায় ফিরবেন। কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না। তাই ডিপোজিটের টাকা আপনাকে অগ্রিম দিতে হবে। এর পর বাবু এসে যা ব্যবস্থা করবার করবেন।"

আমি ওর হাতে একশো টাকার একটা নোট দিলাম। শুধু তাই নয়, সারাদিন ধরে নানাভাবে আলাপ জমাতে লাগলাম ওর সঙ্গে। কিছুদিন আগে যে খুনের ঘটনা ঘটেছিল, সে ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। ওকে আমি এমনভাবে হাত করে নিলাম যে, আমার উদ্দেশ্যটা বুঝতেই পারল না ও। সারাটা দিন গেল। সন্ধের সময় বললাম, "কই হে, তোমার বাবু তো এলেন না?"

চরণিয়ার মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, "কী জানি, এমন তো কখনও হয় না। ওঁর পিছনে কী যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে...।"

এমন সময় হঠাৎ ওকে অবাক করে সোমেশ্বরকে লেখা সেই প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া একটা চিঠি বার করে বললাম, "কী ব্যাপার বলো তো, আমার ঘরের ভেতর থেকে এই চিঠিটা পেলাম। এসব কী?"

চরণিয়া কেমন যেন সন্দেহের চোখে তাকাল আমার দিকে। বলল, "ঘরের ভেতর থেকে পেলেন?"

"হ্যাঁ, এইমাত্র।"

"ওটা আমাকে দিন।"

চিঠিটা আমি দিয়েই দিলাম ওর হাতে। তারপব পঞ্চাশ টাকার একটা নোট ওকে দিয়ে বললাম, "শোনো, আমাদের দু'জনের খাবারের ব্যবস্থা করো। আর একটু চায়ের ব্যবস্থা করো দিকিনি, গল্প করতে করতে খাই দু'জনে।"

চরণিয়া চলে গেল। তারপর যখন রাতের খাবার আর চা নিয়ে ওপরের ঘরে এল আমি তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অ্যালবামটা দেখছি। চরণিযা সেদিকে তাকিয়ে বলল, "এসব ছবি আপনার কাছে কী করে এল বাবু?"

"কেন, তুমি কি চেনো এদের? দ্যাখো তো, এর ভেতরে কাউকে তুমি চিনতে পারো কিনা?"

আমি দেখলাম কেমন যেন ভয়ে ভয়ে একটা নাট্যমঞ্চের স্ক্রিনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছেলের ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ও। সেদিকে তাকিয়ে দু'চোখের পাতা পড়ছে না।

বললম, "চেনো নাকি ওকে?"

চরণিয়ার মুখ সাদা হয়ে গেল। বলল, "চিনি, গোরাবাবু। আপনি যে ঘরে আছেন সেই ঘরেই ও খুন হয়েছিল।"

এবার আমি ওকে রীতার ছবিটা দেখালাম, "এঁকে চিনতে পারো?"

'পারি।"

"এই ভদ্রলোককে?"

"এঁদের দু'জনকেই চিনি। কিন্তু এসব ছবি আপনার কাছে কী করে এল? তাছাড়া ওই ছবিটাও তো এ-ঘরে পড়ে থাকবার নয়। সত্যি করে বলুন তো, আপনি কে?"

"তোমার বাবুর বন্ধু।"

চরণিয়া কোনওরকমে চা খেয়ে ওর খাবার নিয়ে চলে যাওয়ার পর আমি অনেকক্ষণ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখলাম। তারপর এক সময় খেয়ে দেয়ে ডিম লাইটটা জ্বেলে রেখে চুপিসাড়ে বাইরে এসে বাড়িটার দিকে চেয়ে সেই ঝাউবনের ছায়া-অন্ধকারে চুপচাপ বসে রইলাম। মাথার ওপর তারার আকাশ। শুধু সমুদ্রের ভয়ঙ্কর গর্জন ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না এখানে। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক বসে থাকার পর একসময় দেখলাম একজন দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠ চেহারার লোক সেই লজের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আমি বেড়ালের মতো সন্তর্পণে পিছু নিলাম তার। লোকটি কোনও দিকে না তাকিয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে চরণিয়ার দরজায় টোকা দিল। চরণিয়া দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই বলল, "ওই লোকটা কে রে! অনবরত ওকে নিয়ে ঘুরছিস, কী ব্যাপার?"

"উনি তো বলছেন, উনি নাকি বাবুর বন্ধু। তবে খুবই সন্দেহজনক। ওঁর কাছে একটা অ্যালবাম রয়েছে দেখলাম। তাতে খুকুদিদিমণির ছবি। সেই যে ছেলে দুটিকে খুন করা হল, তাদেরও একজনের ছবি। আমার কিন্তু খুব ভয় করছে। আমি আর এসবের ভেতরে নেই। তা ছাড়া সেদিন যে চিঠিটা আপনি বাবুকে দিয়েছিলেন সেই চিঠিটাও দেখছি ওঁর হাতে। উনি বললেন, আজই নাকি ওই ঘর থেকে পেয়েছেন। কিন্তু আজ তো বাবু নেই। আপনিও কোনও চিঠি দেননি। তা হলে?"

লোকটি একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "মনে হচ্ছে এ নিশ্চয়ই পুলিশের লোক। খুব সাবধান। বেফাঁস কথা একদম বলবি না।"

"না। কিন্তু বাবু এখনও ফিরলেন না কেন?"

"কী করে জানব? তবে লোকটার দিকে নজর রাখিস। ভোরবেলা নিশ্চয়ই সি বিচে বেড়াতে যাবে, তুই সঙ্গে থাকবি। পারলে রাত্রি তিনটে নাগাদ ডেকে তুলবি ওকে। তারপর যা করবার আমিই করব।"

"আপনি কি শেষকালে পুলিশ মার্ডার করবেন?"

"প্রয়োজনে করতে হবে বইকী? আমার কথামতো না চললে তোরও পরিণাম ওই হবে।"

লোকটা চলে গেল। আমিও ওকে যেতে দিলাম। তারপর আবার ঝাউবনে এসে একটা দেশলাই জ্বালতেই দু'জন সাদা পোশাকের পুলিশ এগিয়ে এল আমার দিকে। বললাম, "রাত্রিশেষে একটু সজাগ থেকো তোমরা। একটা কিছু ঘটতে পারে। কতজন আছ তোমরা?"

"আপাতত দশজন আছি।"

"এতেই হবে।"

আমি চরণিয়ার ঘরের দিকে এগোলাম। তারপর টক-টক করে দরজায় টোকা দিতেই বেরিয়ে এল চরণিয়া, "আবার কী!" বলে আমাকে দেখেই যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল, "এ কী, আপনি?"

"হ্যাঁ, ঘুম আসছে না। তাই চলে এলাম তোমার কাছে। চলো না একটু সমুদ্রের ধার থেকে ঘুরে আসি?"

"এখন আমি যেতে পারব না বাবু, ঘুম পাচ্ছে।"

"তা হলে আমার ঘরেই এসো, গল্প করি।"

"না, ঘুম পাচ্ছে।"

"আসতে বলছি এসো।"

চরনিয়া ভয় পেয়ে বলল, "আপনি কে বাবু?"

"তোমার বাবুর বন্ধু।"

"আপনি এখানে কেন এসেছেন?"

"এই লজটা কিনতে। কিনতে ঠিক নয়, এখন আমি এটা কিনেই ফেলেছি। তোমার বাবু ভুবনেশ্বরে গেছেন এটি আমাকে বিক্রি করবেন বলে। এতক্ষণে হয়তো রেজেস্ট্রিও হয়ে গেছে।"

"তার মানে আপনি এখন এই লজের মালিক? কত টাকায় কিনলেন?"

"আড়াই লাখে কিনেছি।"

"কিন্তু বাবু তো চার লাখ টাকাতেও এই লজ শ্যাম বিশোয়ালকে দিতে চাননি।"

"সেটা ওঁর ব্যাপার।"

"যদি কিনে থাকেন তা হলে আপনি ভুল করেছেন বাবু। শ্যাম আপনাকে কিছুতেই এখান থাকতে দেবে না। হয়তো আপনিও খুন হবেন।"

"সে কী! আমার অপরাধ?"

"ওর মুখের গ্রাস আপনি কেড়ে নিয়েছেন।"

আমি ভয় পাওয়ার ভান করে বললাম, "দোহাই চরণিয়া, সব কথা তুমি আমাকে খুলে বলো। তোমার বাবু আমাকে কিছুই না জানিয়ে বেচে দিয়েছেন। দরকার নেই আমার লজ কিনে। তোমার শ্যাম বিশোয়াল যদি আমাকে চার লাখ টাকা দেয় তো এই লজ আমি ওকেই দিয়ে দেব। তবুও তো দেড় লাখ টাকা প্রফিট হবে আমার।"

চরণিয়া বলল, "সেটা যদি আপনি করেন তা হলে বুদ্ধিমানের কাজ করবেন।"

"এসো তা হলে আমার ঘরে। তোমার মুখে সব শুনি। একটু আলোচনাও করি। তবে তুমি যখন এতই উপকার করলে আমার, তখন বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা দালালি হিসেবে তোমাকেও দেব আমি। কিন্তু আগাগোড়া কী সব ব্যাপার আমাকে খুলে বলো দিকিনি?"

চরণিয়া টাকার লোভে ভাল-মন্দ বিচার না করেই উঠে এল আমার ঘরে। তারপব বলল, "পঁচিশ হাজার টাকা যদি আপনি আমাকে দেন. তা হলে আমি আর এ-দেশেই থাকব না। সম্বলপুরে আমার পৈতৃক ভিটেয় চলে যাব। তবে একটা কথা, আপনি যেন ভোরবেলা ভুলেও বেরোবেন না ঘর থেকে, শ্যাম বিশোয়াল আপনাকে মারবার জন্য ওত পেতে বসে আছে। ওর ধারণা আপনি পুলিশের লোক। আমিও কিন্তু তাই ভেবেছিলাম।"

"বলো কী! তা বারণ যখন করছ তখন বেরোব না। এখন খুলে বলো তো সব শুনি. কীভাবে কী হল?"

চরণিয়া এলেও আমি বড় আলো জ্বাললাম না। ডিম লাইটই জ্বলতে লাগল। ও বলতে শুরু করলে, আমিও একমনে সব শুনতে লাগলাম। ও বলল, "এই শ্যাম বিশোয়াল হল একজন কুখ্যাত ব্যক্তি। যত রকমের খারাপ কাজ সবই ও করে থাকে। এখন ওর মাথায় চেপেছে সিনেমার প্রোডিউসার হওয়ার। কয়েকটি ওড়িয়া ছবিতে অংশও নিয়েছে। ওর ইচ্ছে সমুদ্রের ধারে বাবুর এই বাড়িটা কেনে এবং এখানে ওর কাজকর্ম করে। আসলে এই বাড়ি এবং এখানকার লোকেশন তো শুটিং স্পট হিসেবে আইডিয়াল। বাবু কিন্তু ওর প্রস্তাবে একদম সায় দেন না। শ্যামও টাকার পর টাকা অফার করতে থাকে। বাবুও তাকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন।"

"কারণটা কী?"

"প্রথমত, জায়গাটা বাবুরও পছন্দসই। দ্বিতীয়ত, শ্যামের সঙ্গে শত্রুতা। বাবুও তো একসময় খুব একটা ভালোমানুষ ছিলেন না। জানি আমি সবই। ওয়াগন ব্রেকারদের লিডার ছিলেন। শেষমেশ একবার পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে মালগাড়ির চাকায় একটা পা-ই খোয়াতে হল।"

"ওঁর পা তা হলে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে বাদ যায়নি?"

"না। সেই দুর্ঘটনার পর বাবু সেই সব পাপের টাকা নিয়ে এখানে লজ করে ভালমানুষটি সেজে বসে আছেন।"

"কিন্তু এর সঙ্গে ওই দুটি ছেলের খুন হওয়ার কারণটা কী? আমি অবশ্য জানতাম একটি ছেলে!"

"সবাই তাই জানে। কিন্তু আমি জানি সে রাতে খুন হয়েছিল দুটো। গোরাবাবু আর কালাবাবু। আসলে ওই যে খুকুদিদিমণির ছবি দেখালেন তখন, ওরা হলেন যমজ বোন। ওঁরা দু'বোনে ছোটবেলায় চমৎকার লব-কুশের অভিনয় করতেন। আমি আগে কটকের

জ্ঞানমঞ্চে দারোয়ানের কাজ করতাম তো, তা সেই জ্ঞানমঞ্চ উঠে গেলে এখানে এই বাবুর কাছে এসেছি।"

"তারপর বলো।"

"এইবার মেয়ে দুটি বড় হলে খুকুদিদিমণির কদর হল এখানে সবচেয়ে বেশি। মেয়ে হিসেবেও খুকুদিদিমণি অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির। তা রীতাদিদির খুব অভিমান হল তাই নিয়ে। উনি কলকাতা চলে গেলেন। এ ছাড়া অন্য কোন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারও ছিল বোধ হয়। তাই দু'বোনের মধ্যে মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে গেল। ওদের বাবা মা দু'মেয়েব কাছে দু'প্রান্তে থাকতেন। তাঁরাও কেউ বেঁচে নেই আব।"

"তোমার বাবু এঁদেব চিনতেন?"

"বোধ হয় চিনতেন না। নাহলে খুকুদিদিমণি যখন বিয়ের পর আমাদের লজে কয়েকদিনের জন্য এলেন তখন কথাবার্তায় বুঝতে পারতাম। কিন্তু আমি চিনেছিলাম। বাবুর সঙ্গে অবশ্য ওঁর বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি আমার। সে যাইহোক, খুকুদিদিমণি ইদানীং বেশ কিছুকাল অভিনয় জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। চাঁদিপুরেব মাটিতে পা দিতেই শ্যামের চোখে পড়ে যান উনি। শ্যাম বার বার ওঁকে অনুরোধ করে তার নতুন ছবিতে কাজ কববাব। খুকুদিদিমণি বা ওঁর স্বামী কেউই রাজি হন না। শ্যাম তখন গোরা ও কালাকে ওঁদের পিছনে লাগিয়ে দেয়। ওবা এসে এই লজেই ওঠে। এবং অনেক করে বোঝাতে থাকে দু'জনকে।"

"গোরা কালা কে?"

"ওরাও ওই জ্ঞানমঞ্চে কাজ করত। স্ক্রিন টানত ওরা। দিদিমণিও ওখানে অভিনয করতেন। রামায়ণে সীতা, কৃষ্ণলীলায় রাধা হতেন। তা ওদের গায়ের বং ফর্সা আর কালো ছিলো বলে ওইরকম নাম। ওরা দু'জনেই অনেক বুঝিয়েও যখন হার মেনে গেল, শ্যাম তখন খুকুদিদিমণিকে খুন করবার মতলব দিল ওদের। এই নিয়েই মতান্তর। ওরা বলল, যাকে আমরা চিরকাল দিদির মতো শ্রদ্ধা কবেছি তার গায়ে হাত দেব? দরকার হলে তোমাকেই খতম করে দেব আমরা। তারই পরিণাম হল এই। গোরাকে মুখে চট চাপা দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মাবল শ্যাম। আর কালাকে ছুরি মারল ওর দলের লোকেরা। কালার লাশ ঝাউবনের বালিতে পোঁতা আছে। শ্যামের নজর এড়িয়ে এই কথাটা খুকুদিদিমণিকে বলেই ওদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলাম আমি।"

"খুব ভাল কাজ করেছ। কিন্তু তোমার শ্যাম বিশোয়াল যেভাবে খুনের পর খুন করে, তাতে তোমার বাবুকে এতদিন বাঁচিয়ে রাখল কী করে?"

"আসলে বাবুকে খুন করলে সবাই তো আগে ওকেই ধরবে। তা ছাড়া সে-কাজ করলে এই বাড়িটা কিনবে কার কাছ থেকে?"

"শ্যামের ব্যাপারে বাবুকে কখনও কিছু বলেছ তুমি?"

"না। বাবু মাথা গরম করে কখনও যদি বলে দেন শ্যামকে, তাহলে আমি খুন হয়ে যেতাম। তবে এটা ঠিক, এ বাড়ি একান্ত না পেলে বাবুকে খুন ও করতই। তাই তো বাবু ফিরছেন না দেখে ভয় হচ্ছিল আমার।"

"এবার তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি কি জানো তোমার ওই খুকুদিদিমণিকেও খুন করা হয়েছে?"

শিউরে উঠল চরণিয়া, "সত্যি বলছেন? এ তাহলে ওই শয়তানেরই কাজ। শ্যাম বিশোয়াল ছাড়া এ-কাজ আর কেউ করেননি।"

আমি এবার একটু কঠিন গলায় বললাম, "এতক্ষণ তুমি আমাকে যা-যা বললে তা আদালতে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে?"

"পারব। কেননা আমি বুঝতে পেরেছি আমি নিজের জালেই নিজে জড়িয়ে গেছি। আপনি নিশ্চয়ই পুলিশের লোক, আর আমাকে ধোঁকা দিতে পারবেন না, তবে জেনে রাখুন, আদালতের চৌকাঠ পর্যন্ত ওরা আমাকে পৌঁছতে দেবে না।" বলে উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গেই একটা গুলি এসে লাগল ওর বুকে।

মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় জানলাটা খুলে রেখে কী ভুলই না করেছিলাম, এর পর সিঁড়িতে দুড়দাড় শব্দ। আমি বড় আলোটা জ্বেলে দরজা খুলে বাইরে এসেই দেখি আততায়ী ধরা পড়েছে সাদা পোশাকের পুলিশের হাতে।

চরণিয়ার মরদেহ পুলিশের লোকেরা সরিয়ে নিয়ে গেল। শুধু শ্যাম নয়, পালাতে গিয়ে ধরা পড়ল ওর দলের আরও দু'জন। সে রাতটা যে কীভাবে কাটল তা বলে বোঝানো যাবে না।

পরদিন সকালে ফোন করলাম সোমেশ্বরকে। উনি এলেন। আমার বক্তব্য লিখে ফেললাম পুলিশকে দেওয়ার জন্য। শ্যাম বিশোয়ালও চাপের মুখে সব কথাই স্বীকার করল। এমন কি প্রতিশোধ নেবার জন্য এই তরুণী-হত্যার কথাও অস্বীকার করল না। খবর পাঠালাম রীতা পারিলালের কাছে। আর তীব্র ভর্ৎসনা করলাম সোমেশ্বরকে। বললাম, "নেহাত মেজর ঘোষের নাম করেছিলেন তাই, নাহলে মিথ্যে পরিচয় দেওয়া বার করে দিতাম আপনার। আপনার মতো একজন ওয়াগন ব্রেকারের খুন হওয়াটাই দরকার ছিল। আপনার সংস্পর্শে না থাকলে চরণিয়াটাও মরত না।"

সোমেশ্বর মাথা হেঁট করলেন। আমি কোনও কথা না বলে নীচে নেমে এলাম। আমার কাজ শেষ। এবার পুলিশের কাজ পুলিশ করুক।

জোড়াখুনের তদন্ত

দ্বিতীয় হুগলি সেতু হওয়ার পরে মৌড়িগ্রামের গুরুত্ব বেড়ে গেলেও আমার চার কাঠার নিরালাবাসের শান্তি কিন্তু বিঘ্নিত হয়নি। ছোট্ট এই দোতলা বাড়িটায় রাখহরিকে নিয়ে আমি বেশ শান্তিতেই আছি। আমার এখানে আশ্রয় পেয়ে অনাথ ছেলেটার যেমন একটা হিল্লে হয়েছে, আমিও তেমনই ওর মতো একজনকে পেয়ে বর্তে গেছি।

সত্যি, কত কাজই না করে ছেলেটা! ভোরে উঠে আমাকে কফি খাওয়ায়। তারপর ঘরদোর পরিষ্কার করে। চা-জলখাবার দেয়। দু'জনের জন্য দুটো ডিমসেদ্ধ আর মাখন-টোস্ট চটপট করে ফেলে ও। বেলা দশটার মধ্যে রান্নাও শেষ। ছুটিরদিন অনেক কিছুই করে। খুব বিশ্বাসী ছেলে। লেখাপড়াতেও অমনোযোগী নয়। গল্পের বই তো পেলে ছাড়ে না। সবচেয়ে বেশি নজর দেয় আমরা শরীরের দিকে। এক-এক সময় মনে হয়, ছেলেটি কি গতজন্মে আমার কেউ ছিল?

রোজকার মতো আজও সকালে উঠে বাগানে পায়চারি করছি। নানারকম ফুলগাছে আমার সাজানো বাগান। বাগানের এককোণে একটা শ্বেতরঙ্গনের গাছ ফুলে ফুলে ভরে আছে। আমি যখন সেই গাছটার কাছাকাছি এসেছি, তেমন সময় পেছন থেকে রাখহরি ডাকল, "দাদাবাবু!"

"কী ব্যাপার রাখহরি?"

"এক দিদিমণি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

"বসতে বলো।"

"একটু তাড়াতাড়ি আসুন। মনে হচ্ছে খুবই জরুরি।"

আমি আর একটুও দেরি না করে ওর সঙ্গে ঘরে এলাম। ঘরে গিয়ে যাকে দেখলাম, তাকে দেখেই চমকে উঠলাম, "এ কী, সুজাতা!"

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা কিশোরী সুজাতা একটা মিনি স্কার্ট পরে সোফায় হেলান দিয়ে বসে ছিল। আমার সাড়া পেয়েই অশ্রুসজল চোখে ধরা-ধরা গলায় বলল, "অম্বরদা!"

"কী হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন তুমি?"

"বাবা—"

"বাবার কী হয়েছে?"

আর থাকতে পারল না সুজাতা। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, "বাবা নেই।"

"সে কী, দয়াময়বাবু নেই!"

"না। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি বাবা আর চোখ মেলে তাকাচ্ছেন না। কত ডাকলাম বাবাকে। বাবুয়া কত কাঁদল 'বাবা বাবা' করে, কিন্তু বাবা সাড়া দিলেন না।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী, পাড়ার লোকেরা গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনলেন। ডাক্তারবাবু এসে বাবাকে দেখেই বললেন, বাবা নেই। ডেথ সার্টিফিকেটও দিলেন না। বললেন, বাবার মৃত্যুটা নাকি স্বাভাবিক নয়। পুলিশ কেসের ব্যাপার এটা।"

"তার মানে?"

আমি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "বাড়িতে কে আছে এখন?"

"বাবুয়া আছে বাবার মরদেহের কাছে। আর আছে পাড়ার লোকজন।"

"চলো, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।"

সুজাতা আবার কান্না শুরু করল। কাঁদুক। কাঁদলে মনটা হাল্কা হয়। আমি পোশাক পরিবর্তন করে থানায় একটা ফোন করলাম। তারপর সদ্য কেনা স্কুটারটা বের করে ওকে বললাম, "বোসো।"

সুজাতা বলল, "আমি হেঁটেই যেতে পারব।"

"পারলেও যেয়ো না। আমাকে শক্ত করে ধরে বোসো। এখনই পৌঁছে যাব, এটা থাকতে হাঁটবে কেন?"

সুজাতা বসলে আমি ওকে নিয়ে ওদের বাড়িতে এলাম।

পুলিশ তখনও আসেনি। বাড়িতে ঢুকেই যে ঘরে দয়াময় থাকতেন, সেই ঘরে আগে গেলাম। দয়াময় একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। অত্যন্ত ভালমানুষ তিনি। কয়েক বছর হল স্ত্রী মারা গেছেন। আমার কাছ আসতেনও মাঝে মাঝে। আমার বাগানের শ্বেতরঙ্গনের

গাছটা ওঁরই দেওয়া। সেই দয়াময় নেই, এ কি ভাবা যায়? আর দু-চার বছর পরে মেয়ে একটু বড় হলে তার বিয়ে দেবেন, ছেলেকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাবেন, কত স্বপ্ন ছিল তাঁর। এখন সংসারটাই ভেসে গেল।

আমি ভালভাবে মৃতদেহ পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ পায়ের বুড়ো আঙুলের মাথায় সূচ অথবা পিন বেঁধার মতো দাগ দেখতে পেলাম। সেখানটায় এমনভাবে রক্ত জমে আছে যে, খুব ভালভাবে লক্ষ্য না করলে বোঝা যাবে না। যে ডাক্তারবাবু এখানে এসেছিলেন, তিনি খুবই অভিজ্ঞ বলতে হবে। নাহলে অন্য কেউ হলে হয়তো হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বলেই ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিতেন।

আমি সুজাতাকে বললাম, "তোমরা কোন ঘরে শোও?"

সুজাতা ওদের ঘর দেখিয়ে দিল। যে ঘরে মা শুতেন সেই ঘরে সুজাতা ও বাবুয়া শোয়। পাশের ঘরে দয়াময়। শোওয়ার সময় দু'ঘরের দরজাই খোলা থাকে। বন্ধ থাকে শুধু বাইরের দরজাটা। আততায়ী তাহলে কোন পথে এসেছিল?

আমি সুজাতাকে বললাম, "দু' ঘরের দরজা খোলা থাকলেও বাইরের দরজা বন্ধ ছিল তো?"

সুজাতা বলল, "হ্যাঁ। আমি নিজে হাতে বন্ধ করেছিলাম।"

"তা হলে?"

আমি এবার ঘরের মেঝেয় আততায়ীর পায়ের ছাপ লক্ষ করতে লাগলাম। কিন্তু না, সেসবের কোনও বালাই নেই। তবে অদ্ভুতরকমের একটা চ্যাপটা দাগ ঘরময় চলে বেড়িয়েছে। সেটা জানলার কাছে, ঘরের মেঝেয়, সর্বত্র বিচরণ করেছে। এমন কী সুজাতার ঘরেও ঢুকেছিল সেটা। সেটা না জুতোর দাগ, না পায়ের।

একটু পরেই নতুন ইনস্পেক্টর পুলিশ নিয়ে ভেতরে ঢুকে সব কিছু লিখে-টিখে মৃতদেহ মর্গে পাঠালেন। আমি পুলিশকে তাদের কাজ করতে দিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম। ডাক্তারবাবুর নাম অনাদি সামন্ত। বয়সে তরুণ। উনি তখন কয়েকজন রোগীকে যত্ন করে দেখছিলেন। আমি গিয়ে পরিচয় দিয়ে দয়াময়ের নাম করতেই উনি বললেন, "ওই ভদ্রলোকের ডেথ সার্টিফিকেট আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ভদ্রলোককে বেশ ঠাণ্ডা মাথায় এবং পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে।"

"আমি আপনার কাছে ডেথ সার্টিফিকেট চাইতে আসিনি। এসেছি অন্য ব্যাপারে। আপনি ওটাকে খুন বলছেন কেন?"

"ওঁর পায়ের কাছটা একটু লক্ষ করবেন, তা হলেই বুঝতে পারবেন আমার অনুমান ঠিক কিনা।"

"তা হলে আপনি বলতে চান...।"

"কোনও সুচ অথবা আলপিনের মুখে মারাত্মক বিষ প্রয়োগ করে মৃত্যু ঘটানো হয়েছে ভদ্রলোকের।"

'স্ট্রেঞ্জ!"

আমি নীরবে সেখান থেকে আবার চলে এলাম সুজাতাদের বাড়িতে। কী চতুর খুনী! আমি এ-ঘর, ও-ঘর, সে-ঘরে ঢুকে সেই দাগগুলো লক্ষ করে ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। মেঝেয় অল্প ধুলো না থাকলে এই দাগ বোঝা যেত না। হঠাৎ দাগ ধরে যেতে যেতে

সুজাতার ঘরে এসে ওর বুক-শেলফের কাছে গিয়ে এমনই একটা জিনিস পেয়ে গেলাম, যা দেখে বিস্ময়ের অন্ত রইল না। জিনিসটা আমি একটা পলিপ্যাকে মুড়ে যত্ন করে পকেটে পুরলাম। তারপর বিদায় নিয়ে সোজা চলে এলাম নিজের বাসায়। কোনও বুদ্ধিতেই এর ব্যাখ্যা পেলাম না। এ জিনিস সুজাতার ঘরে কী করে আসে? চোদ্দ বছরের একটা মেয়ে এত বড় একটা ঝুঁকি কী করে নিতে পারে? তা ছাড়া একাজ সে করবেই বা কেন?

একসময় রাখহরি এসে বলল, "দাদাবাবু, চা!"

বললাম, "না, থাক। একটু পরেই স্নান করে খেতে যাব। তারপর মর্গে যাব একবার।"

নির্বাক রাখহরি নতমস্তকে তার নিজের কাজে চলে গেল। আমি পকেট থেকে সেই ভয়ঙ্কর জিনিসটা বের করে টেবিলের ওপর রেখে বারে-বারে দেখতে লাগলাম।

দয়াময়ের সৎকার্য সেরে যখন ঘরে ফিরলাম তখন রাত একটা। ক্লান্তদেহে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করতে লাগলাম। সুজাতার শুভ্র সুন্দর পবিত্র মুখখানি চোখের সামনে বার-বার ভেসে উঠতে লাগল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যা পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে সুজাতার ঘরে পাওয়া জিনিসটার একটুও পার্থক্য নেই। কিন্তু এ জিনিস সুজাতার ঘরে এল কী করে? আমি অনেকক্ষণ ধরে এই ব্যাপারে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম একসময়।

ঘুম ভাঙল রাখহরির ডাকে, "দাদাবাবু, দাদাবাবু!"

আমি চমকে উঠে বললাম, "কেন রে?"

"বাগানে একটা লাশ!"

লাশ! এক অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। আমার এখানে লাশ কী করে আসবে? কার লাশ? দয়াময়ের খুনের সঙ্গে কি এই হত্যাকাণ্ডের কোনও যোগসূত্র আছে? নাহলে আততায়ী লাশটিকে আমার বাগানেই বা রেখে যাবে কেন? যেহেতু আমি এই হত্যাকাণ্ডের একজন তদন্তকারী গোয়েন্দা, তাই আমাকে ভয় দেখানোর জন্যই এ-কাজ করেছে নিশ্চয়ই।

আমি কোনওরকমে চোখে-মুখে একটু জল দিয়েই ছুটে গেলাম বাগানে। এক জায়গায় একটা রক্তকরবীর গাছ ছিল। সেই গাছের নীচেই পড়ে ছিল লাশ। সকালের সোনা রোদ এসে তার ফ্যাকাসে মুখে লুটিয়ে পড়েছে। এরও কোথাও কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই। শুধু কপালের ওপর পিন-বেঁধা ছোট্ট একটুকরো কাগজে লেখা আছে—"এবার তোমার পালা।"

আমি চিরকুটটা পকেটে রেখে যুবকের মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ঘরে এসে ফোন করলাম, "হ্যালো, পুলিশ স্টেশন? অম্বর চ্যাটার্জি স্পিকিং।"

ওদিক থেকে উত্তর আসতেই বললাম, "এবার আমার পালা!"

"তার মানে?"

"ডাক্তার সামন্ত, মানে যিনি আমাদের দয়াময়ের ডেথ সার্টিফিকেট না দিয়ে মৃতদেহ মর্গে পাঠিয়েছিলেন, তিনি এখন আমার বাগানে প্রাণহীন দেহে ঘুমোচ্ছেন। তাঁকেও একটু কষ্ট করে মর্গে নিয়ে যান।"

"আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি।"

আমি কোনও কথা না বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম।

একটু পরেই পুলিশ এল। তদন্ত হল। বাগানে ঘাসের গালিচায় আততায়ীর চরণচিহ্ন বোঝা গেল না।

নতুন ইন্সপেক্টর বললেন, "গেটে তো তালা দেওয়া! লাশ এখানে বয়ে আনল কী করে?"

আমি বললাম, "কম দামি তালা তো! এমনও হতে পারে, নকল চাবি দিয়ে গেট খুলে যাওয়ার সময় আবার তালার কল টিপে দিয়ে গেছে!"

ইনস্পেক্টর বললেন, "হতে যে পারে না তা নয়। তবে মিঃ চ্যাটার্জি, আপনি যতই বলুন, দয়াময়ের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমরা কিন্তু মেয়েটাকেই সন্দেহ করছি।"

"সেটা আপনাদের ব্যাপার। তবে সন্দেহ করবার আগে একবার অন্তত ভেবে দেখা উচিত ছিল, কোনও মেয়েই তার বাবাকে ওইভাবে হত্যা করতে পারে না। এবং ও জিনিস সংগ্রহ করাও অল্পবয়সী একটি মেয়ের পক্ষে অসম্ভব।"

"মোটেই অসম্ভব নয়। মনে করুন না, এর ভেতরে আমার কি আপনার মাথাই যদি কাজ করে, তা হলে কি সত্যিই অসম্ভব?"

ওঁর কথার কী উত্তর দেব, ভেবে না পেয়ে আমি চুপ করে রইলাম। উনি আবার বললেন, "বদ্ধ ঘরের মধ্যে দয়াময়কে খুন নিশ্চয়ই ভূতে করেনি?"'

"অদ্ভুত কিছুতে করেছে, নাহলে ঘরের ভেতর ওইসব দাগ আসে কোত্থেকে? দয়াময়ের খুনের ব্যাপারে যদি মেয়ে সন্দেহভাজন হয়, তাহলে এইখানকার খুনের ব্যাপারে আমাকেই সন্দেহ করুন!"

ইনস্পেক্টর বললেন, 'চ্যাটার্জিবাবু, এই ব্যাপারে আপনিও কিন্তু সন্দেহমুক্ত নন। আপনার এখানে আসব বলে সবাই যখন তৈরি হয়েছি, ঠিক তখনই এমন একটা ফোন এল, যা শুনলে আপনিও চমকে উঠবেন।"

"কীরকম শুনি?"

"আপনি নাকি সুজাতাকে বাঁচাবার জন্য পুলিশ আসবার আগেই বাড়িতে ঢুকে অনেক প্রমাণ লোপ করেছেন। আর সামন্ত ডাক্তারকে শাসিয়েছিলেন, দয়াময়ের ডেথ সার্টিফিকেট লিখে না দিলে তাঁকে খুন করা হবে বলে। যেহেতু সামন্ত ডাক্তার আপনার প্রস্তাবে রাজি হননি, তাই আপনিই ওঁকে খুন করে আপনার বাগানে ফেলে রেখেছেন। এবং যেহেতু আপনি নিজেই একজন তদন্তকারী গোয়েন্দা, তাই সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য পুলিশকে ফোন করে ডাকিয়ে এনেছেন এখানে।"

রাগে লাল হয়ে উঠল আমার মুখ। ঘটনা যা, তাতে এইরকমই মনে হয়। ইন্সপেক্টরও নতুন, তাই আমাকেই সন্দেহ করছেন, বললাম, "ঠিক আছে। আপনি আপনার ফর্মে কাজ করে যান, আমিও আমার কাজ করে যাব। এখন চলুন, একটু চা-টা খেয়ে ফিল্ডে নামা যাক।"

সবাই ভেতরে এলে রাখহরিকে চা করতে বলে আমার উকিলবন্ধু রণেন্দুকে একটা ফোন করলাম। রণেন্দু ফোন ধরলে বললাম, "ভাই, কোনও দুষ্টচক্র আমাকে ব্ল্যাকমেল কবতে চাইছে। এখানকার নতুন ইনস্পেক্টরও আমার সহযোগী নন। এই ব্যাপারে আমি তোমার একটু সাহায্য চাই। হয়তো ওরা পরিকল্পনা কবে আমাকে অ্যাবেস্ট করিয়ে তদন্তেব

মোড় ঘুরিয়ে দেবে। সাক্ষাতে সব বলব। পারলে তুমি আজই একবার দেখা করো আমার সঙ্গে।''

ইনস্পেক্টর বললেন, ''আরে দূর মশাই, আপনি কি সত্যি ভাবলেন? আমি রসিকতা করছিলাম আপনার সঙ্গে!''

আমি বললাম, ''সত্যি-মিথ্যে জানি না। আমি আমার দিকটা নিরাপদ করে রাখলাম। আপনি এখানে নতুন এসেছেন, আমাকে চেনেন না, তাই উড়ো-ফোনে বিভ্রান্ত হয়েছেন। এতেই আপনার বোঝা উচিত, এর পেছনে একটা চক্র আছে।''

ইনস্পেক্টর বললেন, ''চক্র তো একটা আছেই। তবে কিনা এই প্রাণঘাতী বিষের শিশি আর সূচটা যে আপনার টেবিলে কী করে এল, তা কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না!''

আমি যে কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না।

ইনস্পেক্টর একটু বিদ্রূপ করে বললেন, ''দেখুন, এটাও হয়তো খুনীরা আপনাকে জালে জড়াবার জন্য কোনও ফাঁকে রেখে গেছে!''

আমি বললাম, ''না, ওটা খুনীরা রেখে যায়নি। আমিই ওটাকে গতকাল নিয়ে এসেছি দয়াময়ের বাড়ি থেকে। সুজাতার বুক-শেলফের মধ্যে এটা ছিল। সম্ভবত সুজাতাকে জড়াবার জন্য খুনীর এটা চতুর পরিকল্পনা।''

''সেটা আপনি পুলিশকে জানাননি কেন?''

''আমার কাজের সুবিধের জন্য।''

ইন্সপেক্টর বললেন, ''কাজটা ভাল করেননি চ্যাটার্জিবাবু, এটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি।''

চা-পর্ব শেষ করে ইনস্পেক্টর তাঁর লোকজন নিয়ে চলে গেলেন। আমি রাগে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলাম। একটু পরেই রণেন্দু এলে তাকে সব কথা খুলে বললাম। সব শুনে রণেন্দু বলল, ''মনে রাখিস তুই সরকারি গোয়েন্দা নয়, একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা। তোকে এরা নানাভাবে ফাঁসাতে পারে। যাই হোক, আমি ওপরমহলে যোগাযোগ করছি তোর ব্যাপারে। তুই শুধু জেনে রাখ, ওই ইনস্পেক্টর তোর কিছু করতে পারবে না।''

রণেন্দু চলে গেলে আমি সামান্য একটু জলযোগ সেরে সোজা চলে গেলাম ডাক্তার সামন্তর ওখানে। সেখানে তখন লোকজনের ভিড়, কান্নাকাটি। ওঁর ডিসপেনসারিতে যে লোকটি থাকে, তাকে আড়ালে ডেকে এনে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সে বলল, ''হ্যাঁ, সামন্তদাকে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে না দিলে খুন করা হবে, এমন একটা হুমকি ফোন মারফত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উনি রাজি হননি তাতে। আর তারই পরিণাম এই।''

''কাল কখন থেকে উনি বাড়ি ছিলেন না?''

''রাত ন'টার পর একটি ছেলে এল ওঁকে নিয়ে যাবে বলে। সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না।''

''ছেলেটাকে চেনো?''

''দেখলে চিনতে পারব। বাজারে অনেকবার দেখেছি ওকে। নাম জানি না, তবে এলাকার ছেলে।''

আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমার স্কুটারে চাপিয়ে বড় রাস্তায় নিয়ে এলাম। তারপর বাজারের কাছাকাছি আসতেই সে বলল, ''ওই তো, সেই ছেলেটা!''

ছেলেটি তখন ওকে দেখেই দৌড়।

আমি ছুটে গিয়ে তাকে ধরলাম। ততক্ষণে আরও অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। আমি ইশারায় সকলকে চলে যেতে বলে ছেলেটিকে একান্তে এনে বললাম, "কাল ডাক্তারবাবুকে তুই কোথায় নিয়ে গিয়েছিলি? কার অসুখ করেছিল?"

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বলল, "কারও না।"

"তাহলে কেন ডেকেছিলি?"

"আমাকে ডালিমদা পাঠিয়েছিল। এর বেশি আমি কিছুই জানি না।"

"তুই জানিস, ডাক্তারবাবুর কী হয়েছে?"

"জানি। আমাকে ছেড়ে দিন, আপনার দুটি পায়ে পড়ি।"

"ডালিমদা কোথায় থাকে?"

ছেলেটি চুপ করে রইল।

আমি ধমক দিয়ে বললাম, "বল কোথায় থাকে?"

"চলুন, বাড়িটা আমি দূর থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

আমি বাড়ি দেখে সুজাতাদের ওখানে গেলাম। আমাকে দেখেই সুজাতা বলল, "কাল থেকে পুলিশ আমাকে জ্বালিয়ে মারছে অম্বরদা। মাঝে-মাঝে আসছে আর এমন ধমকাচ্ছে, যেন বাবাকে খুন আমিই করেছি!"

"আমি সব জানি। তবে কয়েকটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব। তুমি ঠিকঠাক উত্তর দিবে কিন্তু।"

"বলুন।"

"তোমাদের আত্মীয়স্বজন সত্যিই কি কেউ কোথাও নেই?"

"না। এক দূর-সম্পর্কের কাকা আছেন। তিনি শিবপুরে থাকেন। যোগাযোগ রাখেন না।"

"ইদানীং কোনও ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে তোমাদের মনোমালিন্য হয়েছিল?"

"যোগাযোগই যেখানে নেই, সেখানে মনোমালিন্যের প্রশ্নই ওঠে না।"

"তুমি ডালিমকে চেনো?"

ডালিমের নাম শোনামাত্রই চমকে উঠল সুজাতা। বলল, "চিনি। এই ব্যাপারে ওর কি কোনও হাত আছে?"

"তোমাকে যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দাও।"

"গত বছর কালীপুজোর সময় ডালিম আমার বাবার কাছে হাজার-এক টাকা চাঁদা চায়। বাবা দিতে রাজি হননি বলে ডালিম বাবাকে শাসিয়েছিল, এরপর এখানে বাজার করতে বা ব্যাঙ্কে এলে মজা দেখাবে বলে। ওখানকার ব্যাঙ্কের লকারে আমাদের অনেক গয়না এবং স্থায়ী আমনতে টাকাও আছে অনেক। ডালিমের এক পরিচিত লোক ওই ব্যাঙ্কে কাজ করে। সম্ভবত তার মারফতই জেনেছে ডালিম।"

"তারপর?"

"তারপর একদিন আমি বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে স্কুল থেকে ফিরছি, ডালিম হঠাৎ খুব জোরে স্কুটার চালিয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। ভাগ্য ভাল যে হাত-পা ভাঙেনি। পড়ে গিয়ে একটু চোট পেয়েছিলাম শুধু। পরদিন বাবা ওদের বাড়ি গিয়ে ওর বাবাকে অভিযোগ করলে আমার বাবাকে উনি দারুণ অপমান করে তাড়িয়ে দেন। বলেন,

জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ না করতে।"

"তোমাব বাবা থানায় গেলেন না কেন?"

"বাবা হয়তো বেশি ঝামেলা চাননি। আর থানার কথা বলছেন তো, ডালিমের বাবা কে জানেন?"

"কে শুনি?'"

সুজাতার মুখে নামটা শুনেই মাথা গরম হয়ে উঠল আমার। বললাম "বুঝেছি। সেইজন্য ইনস্পেক্টরের এত দেমাক। পেছনে তাহলে ঘুঘুর ঘুঘু! ঠিক আছে, ঘুঘুর ফাঁদ আমিও পাতছি।"

এর পর বাড়ি এসে খাওয়াদাওয়া করে সামান্য একটু বিশ্রাম করেই আবার গেলাম গোয়েন্দাগিরি করতে। ডালিমের বাড়ির পাশ দিয়ে দু-একবার যাতায়াত করে একটা দোকানে বসে ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নিলাম। দোকানদার বলল, "অত্যন্ত মন্দ চরিত্রের ছেলে এই ডালিম। বাপ দুষ্টচক্রের লোক, তার ওপর অত্যন্ত ক্ষমতাও রাখেন। কাজেই ছেলের উচ্ছন্নে যাওয়ার পথ একেবারে পরিষ্কার। এখন ওর আর-এক বাজে সঙ্গী নেলোকে নিয়ে একটা গ্রিল তৈরির দোকান করেছে। তাও লোকের কাছ থেকে টাকা অ্যাডভান্স নেয়, জিনিস ডেলিভারি দেয় না ঠিকমতো। এই নিয়ে রোজই ঝামেলা লেগে থাকে। ওই দেখুন, নেলো আসছে। ওর দুটো পায়েরই আঙুল নেই। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। আর..."

আর কিছুই শোনবার দরকার নেই আমাব। গ্রিলের দোকান শুনেই শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ শুরু হয়ে গেছে। দয়াময়ের ঘরগুলোর সব জানলাতেই তো গ্রিল দেওয়া। অথচ একবারও সেগুলো পরীক্ষা করবার কথা মন হয়নি কারও। আমি আর এক মুহূর্তও দেরি না করে সুজাতাদের বাড়িতে এলাম। যা ভেবেছি তাই। শিয়রের জানলার গ্রিলটা নড়বড় করছে। আততায়ী এই পথেই এসেছিল। যাওয়ার সময় চোখে ধোঁয়া দেবে বলে গ্রিল আবার ফিট করে একটা-দুটো স্ক্রু আলগাভাবে এঁটে দিয়ে পালিয়েছে।

সফলতার আনন্দে আমি তখন দারুণ উত্তেজিত হয়েছি। সুজাতাকে একটু সাবধানে থাকতে বলে সোজা চলে এলাম রণেন্দুর বাড়িতে। ওকে সব কথা খুলে বলতেই ও বলল, "এখন ছলে-বলে-কৌশলে নেলোর জবানবন্দি নিয়েই ডালিমকে ফাঁদে ফেলতে হবে। সরাসরি ডালিমকে আক্রমণ করা ঠিক হবে না। হাজার হলেও ওর বাবার নামডাকের ব্যাপার আছে তো, খুঁটির জোরও আছে।"

"এ কাজটা তা হলে তোমাকেই করতে হবে ভাই। আমি আড়ালে থাকব।"

"তাই থেকো।"

"ওদিকের কাজ কিছু কি এগোল?"

"ওপরমহলে কথাবার্তা হয়েছে। সদর দফতরের কিছু সাদা পোশাকের পুলিশ এখন ঘোরাফেরা করছে বাড়িটার আশপাশে।"

"ধন্যবাদ।"

আমি রণেন্দুকে নিয়ে ডালিমের দোকানে এলাম। সুন্দর ছিপছিপে চেহারার ডালিম কিসের যেন হিসেবনিকেশ করছিল দোকানের ভেতর। আর নেলো বাইরের রাস্তায় গ্রিলের পেটি নাড়াচাড়া করছিল।

রণেন্দুর গাড়িটা ছিল বড় রাস্তায়। আমার স্কুটার আমার কাছে। পরিকল্পনামতো আমি

দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। রণেন্দু গিয়ে নেলোকে বলল, "এই যে ভাই, একবার আমার বাড়িতে গিয়ে একটা গেট আর কয়েকটা জানলার মাপ নিয়ে আসতে হবে যে!"

নেলো বলল, "এখন হবে না। কাল সকালে আসবেন।"

"কাল আমি থাকব না রে ভাই। আমি এখনই গাড়ি করে নিয়ে যাব, নিয়ে আসব। অ্যাডভান্স দেব দু'হাজার টাকা।"

"কোথায় আপনার বাড়ি?"

"বেশি দূরে নয়, ওই যে নতুন কোয়ার্টারগুলো হচ্ছে, ওর পাশেই।"

ডালিম ভেতর থেকে বলল, "যা, নিয়ে আয় চট করে।"

রণেন্দু নেলোকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর আমি ইচ্ছে করেই ডালিমকে দেখা দেব বলে ওর দোকানের সামনে স্কুটার থামালাম। তারপর আড়চোখে একবার ওর দিকে তাকিয়ে চলে এলাম আবার। ডালিমের মুখ তখন শুকিয়ে এতটুকু।

রণেন্দুর গাড়িটা একসময় দয়াময়ের বাড়ির সামনে এসে থামল। ওদের অনুসরণ করে আমিও তখন এসে গেছি। গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির দিকে তাকিয়েই আঁতকে উঠল নেলো। তারপর বিকট একটা চিৎকার করে শুরু করল প্রাণপণে ছোটা। কিন্তু যাবে কোথায় বাছাধন? সাদা পোশাকের পুলিশরা ধরে ফেলল তাকে। তারপর দু-চার ঘা দিতেই "বাবা রে, মা রে...।"

আমি ওর কাছে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে বললাম, "কি রে, আমাকে চিনতে পারিস?"

নেলো আমার পাদুটো জড়িয়ে ধরে বলল, "খুব চিনি দাদা। কিন্তু আমার কোনও দোষ নেই। সবের মূলে ডালিম। ও-ই আমাকে দিয়ে এইসব করিয়েছে।"

"আমার বাগানে সামন্তর লাশ ফেলে এসেছিল কে?"

"আমরা দু'জনেই ছিলাম।"

"গ্রিল খুলে ঘরের ভেতর ঢুকেছিল কে?"

"আজ্ঞে, আমি। ডালিম বলেছিল, পায়ে ন্যাকড়া বেঁধে পাতার ওপর দিয়ে ভর করে চলতে—যাতে ছাপ না পড়ে। কাজ হয়ে গেলে মেয়েটার ঘরে বিষের শিশি আর সূচটা রেখে আসত। সেইমতোই কাজ করেছিলাম।"

"দয়াময়কে খুন করা হল কেন?"

'ডালিম প্রতিশোধ নেবে বলেছিল, তাই। তাছাড়া বাবাকে মেরে মেয়েটাকে শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল ওর। কেননা মেয়েটা প্রায়ই ওকে অপমান করত।"

"এবং যেহেতু ডাক্তারবাবু সার্টিফিকেট দেননি, তাই তাঁকেও সরিয়ে দেওয়া হল! তা নেলোবাবু, ডালিমের না হয় শাঁসালো বাবা আছে, কিন্তু তোমার কী হবে?"

নেলো আর কিছু বলার আগেই জোরালো একটা শব্দের সঙ্গে চারদিক ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। কী জোরে একটা বোমা ফাটল! নেলো চিৎকার করেই বসে পড়ল, "বাবা রে!" ওর পায়ে একটা টুকরো এসে লেগেছে। ভাগ্যে দূর থেকে ছুঁড়েছিল, নাহলে আমরা সবাই জখম হতাম। ঘটনাটি এমনই আকস্মিক যে পুলিশরাও হতচকিত।

আমি তারই মধ্যে স্কুটার নিয়ে ধাওয়া করলাম সেই শয়তানকে। আমি ওর অনেকটা কাছাকাছি গিয়ে বললাম, "যতই চেষ্টা করো, তুমি পালিয়ে বাঁচবে না ডালিম। তুমি যে খুনী,

তা প্রমাণ হয়ে গেছে। তাই ভাল চাও তা এখনও ধরা দাও।"

ডালিম অনেক জোরে স্কুটার চালাচ্ছিল। আমার কথা শুনতে পেল কিনা কে জানে, একবার শুধু ঘাড় বেঁকিয়ে আমাকে দেখেই আরও স্পিড নিল। এবার সে নবনির্মিত দ্বিতীয় সেতুর পথ ধরল। আলোকমালায় সজ্জিত সন্ধেরাতের সেতুর পথে এ এক মারণ অভিযান। আমাদের দু'জনের স্কুটারই তখন প্রচণ্ড গতি নিয়েছে। ধরা পড়বার ভয়ে ডালিম এত জোরে স্কুটার চালাচ্ছে যে, ওর সঙ্গে আমি পেরে উঠছি না। আমার কাছে অটোম্যাটিকটাও আছে। কিন্তু এইরকম অবস্থায় সেটাকে ব্যবহার করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। পথের দু'পাশের জনতা তখন আমাদের স্কুটার-দৌড় দেখছে। আতঙ্কিত জনতার চোখের সামনে ডালিমের স্কুটার হঠাৎ রং-সাইডে ঘুরে যেতেই অন্যদিক থেকে একটা ভারী ট্রাক এসে ধাক্কা মারল সেটিকে। স্কুটারকে ছিটকে পড়ল কয়েক হাত দূরে। আর ডালিম? তার প্রাণহীন দেহটা ছিটকে পড়ল শালিমার ইয়ার্ডের একটা ধাবমান মালগাড়ির মাথায়।

হইহই করে অনেকেই ছুটে এসেছে তখন। পলাতক লরিটিও চোখের পলকে বেপাত্তা। আর ডালিমের দেহটা মালগাড়ির মাথায় শুয়ে কোথায় যে চলে গেল, কে জানে?

অপরাধী তার শাস্তি পেয়েছে। শত্রুর শেষ দেখে আমিও ফিরে এলাম। আমি যখন ফিরে এলাম, নেলোর হাতে তখন হাতকড়া। চারদিকে থিকথিক করছে পুলিশ। সেই ইনস্পেক্টরও এসেছেন। আমি ডালিমের ব্যাপারে বিবৃতি লিখে ওঁর হাতে দিতেই তিনি বললেন, "আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম মিঃ চ্যাটার্জি। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

আমি হেসে বললাম, 'আরে কী আশ্চর্য, ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি আপনার কর্তব্য পালন করতে এসে যা করণীয় ঠিকই করেছেন।"

সে-রাতে দয়াময়ের বাড়ি পুলিশ পাহারায় রেখে সুজাতা ও বাবুয়াকে আমার বাসায় নিয়ে এলাম। পরে ওদের ব্যাপারে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে কিছু একটা করা যাবে। এখন তো ওরা আশ্রয় পাক।

জুহু বিচে তদন্ত

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাগানে একটু পায়চারি করে যখন কেয়ারি-করা রঙ্গন গাছগুলোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, ঠিক তখনই রাখহরি এসে খবরের কাগজটা হাতে দিল। কাগজের প্রথম পাতায় চাঞ্চল্যকর একটা সংবাদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে চমকে উঠলাম। এক অদ্ভুত প্রতারণার খবর।

রাখহরি বলল, "আপনার চা কি এখানে নিয়ে আসব?"

আমি রাখহরির মুখের দিকে একটুক্ষণ স্থিরভাবে চেয়ে থেকে বললাম, "নাঃ, থাক! আমিই ভেতরে যাচ্ছি।" বলে ঘরে এসে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলাম। যেখানে ফোন করলাম, সেখানে লাইন ঠিকমতো পাওয়া গেলেও ফোন ধরল না কেউ। অর্থাৎ সোনালি অ্যাপার্টমেন্টের ওই ঘরটিতে এখন কেউ নেই।

ফোন নামিয়ে রেখে আমি যখন ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে খবরের বিষয়বস্তুর ওপর মন রেখেছি, রাখহরি তখন চা নিয়ে এল। সঙ্গে দুটো বিস্কুট।

আমি বিস্কুট খেয়ে চায়ে চুমুক দিলাম। যে খবরটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে তা এইরকম, গতকাল দুপুরে বউবাজার অঞ্চলে একটি গয়নার দোকানে অভিনব কায়দায় প্রতারণা করা হয়েছে। দুপুর একটা নাগাদ এক দম্পতি একটি দোকানে এসে লক্ষাধিক টাকার গয়না কেনেন। তারপর সেল ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য রসিদ না নিয়েই চলে যান। দোকানদারও টাকা গুনে সিন্দুক-ভর্তি করে খদ্দেরকে বিদায় দেন। এইরকম খদ্দের যে এই প্রথম তা নয়, মাঝেমধ্যেই এমন দু-একজন আসেন। সম্পত্তি কেনাবেচার ব্যাপারেও এইরকম ফাঁকিবাজি চলে। তিন লাখ টাকার সম্পত্তিকে দু'লাখ টাকা দেখিয়ে দলিল করা হয়। এতে অনেক টাকার স্ট্যাম্পপেপার বেঁচে যায়। সে যাক, রহস্য ঘনাল এর পরেই। ওই দম্পতি গয়না নিয়ে চলে যাওয়ার পরই আরও দু'জন খদ্দের আসেন। এ-ক্ষেত্রেও একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। তাঁরাও ওই একই দামের গয়না কিনে নিয়ে রসিদ নিয়ে যখন উঠে আসতে যান, নাটক তখনই জমে। দোকানদার বিনীতভাবে বলেন, "আমার টাকাটা?"

দম্পতি বলেন, "টাকা তো আপনাকে দিয়ে দিয়েছি!"

দোকানদারের চোখ কপালে উঠে যায়, "সে কি মশাই, কখন আমাকে টাকা দিলেন?"

দম্পতি শুরু করেন চেঁচামেচি, "ঠগ, জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী!"

সে এক মহা কেলেঙ্কারি। খদ্দের ও দোকানদারের চেঁচামেচিতে লোকজন জড়ো হয়ে যায়। পুলিশ আসে। পুলিশ এসে দম্পতিকে বলে, "আপনারা যে টাকা দিয়েছেন, তার কোনও প্রমাণ আছে?"

দম্পতি বলেন, "আছে বইকি, প্রতিটি নোটের নম্বর আমাদের কাছে নোট করা আছে— এই দেখুন।" পুলিশ তখন দোকানদারের সিন্দুক খুলিয়ে টাকা বের করে নোটের নম্বর মিলিয়ে দেখে। প্রতারকরা সসম্মানে তাঁদের গয়না নিয়ে চলে যান। আর দোকানদার? মাথা হেঁট করে বসে থেকে জনসাধারণের ধিক্কার এবং বিদ্রুপাত্মক বাক্যবাণ হজম করতে থাকেন।

চাঞ্চল্যকর এই সংবাদটা পড়ে দেখলেই বোঝা যায়, প্রতারণার ব্যাপার সুপরিকল্পিত। অর্থাৎ দুই দম্পতি একটি চক্রের হয়ে কাজ করেছেন। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার, যে দোকানদার এই প্রতারণার বলি হয়েছেন তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। নাম গুণধর পাইন। ফরসা রং। মাঝারি চেহারা। সব সময় মুখে পান আর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। এহেন লোক যে খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে কেন এমন ভুল করলেন, তা ভেবে পেলাম না।

কাগজটা নামিয়ে রেখে যখন বিষয়টা নিয়ে গম্ভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছি, সেই সময় রাখহরি এসে বলল, "এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

"উনি কি একাই, না সঙ্গে কেউ আছেন?"

"বারো-চোদ্দ বছরের একটি ছেলেও আছে।"

"ওঁদের ভেতরে আসতে বলো। আর চা করো সকলের জন্য।"

একটু পরেই পায়ের শব্দ শোনা গেল। চেহারা না দেখেই বললাম, "আসুন গুণধরবাবু, আসতে আজ্ঞা হোক।"

গুণধরবাবু বিনয়ের হাসি হেসে বললেন, "কী করে জানলেন আমি এসেছি?"

"আজ সকালে আপনার গুণের খবর কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছে দেখেই অনুমান করেছি, এইবার আমার কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়বে!"

গুণধরবাবু নিজে থেকেই আসন গ্রহণ করলে বললাম, "এই ছেলেটি কে?"

"আমার একজন কর্মচারি।"

রাখহরি চা দিয়ে গেলে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বেশ ভাল করে শুনলাম গুণধরবাবুর মুখ থেকে। শুনে বললাম, "এখন আমাকে আপনি কী করতে বলেন?"

গুণধরবাবু বললেন, "শোনো ভাই, আমার তো যা হওয়ার তা হয়েইছে, এই ব্যাপারে আইন আদালত করতে গেলে কর ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে আমিই ফেঁসে যাব। বহুকষ্টে পুলিশি ঝামেলার হাত থেকেও রেহাই পেয়েছি। এখন আমি চাই, এই প্রতারকদের তুমি খুঁজে বার করো।"

"তাতে লাভ? আপনার গয়না কি আপনি ফেরত পাবেন?"

"না, গয়নাও পাব না—টাকাও না। তবু চাই এই জাল ছিঁড়ে যাক। অপরাধী ধরা পড়ুক।"

আমি বললাম, "এই ধরনের অপরাধীর শাস্তি পাওয়া অবশ্যই দরকার, কিন্তু এই জনবহুল শহরে কোথায় কোনখানে যে রয়েছে তারা, কোন সূত্র ধরে তা আবিষ্কার করব? এই মুহূর্তে তারা যে পুনে কিংবা বাঙ্গালোরের কোনও কফি হাউসে বসে নেই তাই বা কে বলতে পারে?"

"তা হলে?"

"চেষ্টা অবশ্যই করব—করছিও।" বলেই আর একবার উঠে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলাম।

এবারে সাড়া এল, "হ্যালো!"

"ইনস্পেক্টর ভদ্র? আমি অম্বর বলছি—অম্বর চ্যাটার্জি।"

"হ্যাঁ বলুন, কী ব্যাপার?"

"একটু আগে আপনার অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করেছিলাম—"

"আমি মার্কেটিংয়ে গিয়েছিলাম।"

"আপনার ঘরে কেউ নেই? ফোন ধরল না কেন?"

"জানেন তো, আমি ব্যাচিলর মানুষ। আর কাজের লোকটির আন্ত্রিক দেখা দেওয়ায় তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"বেশ করেছেন। একটা ব্যাপারে আমি আপনার একটু হেল্প চাইছি। কাল বড়বাজারে একটা গয়নার দোকানে...।" লাইনটা হঠাৎই কেটে গেল।

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, "আপনার গাড়ি আছে?"

"গাড়ি নিয়েই এসেছি আমি।"

"তাহলে ড্রাইভারকে বলুন, একবার সোনালি অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের নিয়ে যেতে।"

"সেটা কোথায়?"

"কোলার স্বর্ণখনির কাছে নয়, এই কলকাতার মধ্যেই।"

রাখহরিকে আজকের জন্য একটু মাংস-ভাত করে রাখতে বলে গুণধরবাবুকে নিয়ে সোনালি অ্যাপার্টমেন্ট এলাম।

ইনস্পেক্টর ডি.কে. ভদ্র একজন সুদর্শন যুবক। পুলিশের চাকরিতে ওঁর মতো ভদ্র যুবকের সত্যিই প্রয়োজন। খুব শান্ত প্রকৃতির, কিন্তু রাগলে ভীষণ।

আমরা যেতে সাদর অভ্যর্থনা করে বসালেন আমাদের। তারপর ধীরেসুস্থে গুণধরবাবুর মুখ থেকে সবকিছু শুনে বললেন, "দেখুন, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বের হয়! তবে কলকাতা শহরের বুকে দিনদুপুরে এইরকম প্রতারণা সত্যিই নজিরবিহীন। এখন আমাকে কী করতে হবে বলুন?"

গুণধরের হয়ে আমি বললাম "দেখুন, কেসটা যেরকম তাতে দোকানদারকে যে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে এটা কি আপনি বুঝতে পারেননি? ওই দম্পতিকে চলে যাওয়ার সুযোগ না দিয়ে আপনি যদি ওদের জেরা করতেন, এত টাকা কোথা থেকে পেলেন সে-কথা জানতে চাইতেন, বা ওদের পেছনে ধাওয়া করে ডেরাটা দেখে আসতেন, তা হলে কিন্তু হাতেনাতে ধরা পড়ত চক্রটা।"

ভদ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "এই কথাটা যে আমারও মনে হয়নি তা নয়। এবং এই ভুলটা যে মারাত্মক তা আমিও স্বীকার করছি। কিন্তু মুশকিল হল, গুণধরবাবু তখন চোখ-মুখের ভাব এমন করলেন যে, মনে হয়েছিল উনিই আসলে খদ্দেরকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছিলেন। তাই ওঁকেই ভর্ৎসনা করছিলাম, ইতিমধ্যে পাখি ফুড়ুত!"

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, "ওই দম্পতি দু'জনকে এর আগে আপনি আর কখনও দেখেছিলেন?"

হতাশ গুণধরবাবু বললেন, "না ভাই। মনে তো পড়ছে না।"

গুণধরবাবুর সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল তাকে প্রশ্ন করলাম এবার, "তোমার নাম কী ভাই?"

"আমার নাম নন্দ।"

"তোমার বড়ি কোথায়?"

নন্দর হয়ে গুণধরবাবুই বললেন, "ওর বাড়ি হরিপালের কাছে এক গ্রামে। বাপ-মা-মরা ছেলে। আমার কাছেই মানুষ।"

নন্দকে বললাম, "ওই মুখগুলো আর একবার দেখলে তুমি চিনতে পারবে?"

নন্দ বলল, "হ্যাঁ পারব।"

"আচ্ছা, ওঁদের কাউকে আর কখনও এ দোকানে তুমি আসতে দেখেছিলে?"

"মনে হচ্ছে একবার যেন দেখেছিলাম। দু-তিন মাস আগে এক মহিলা দুপুরবেলা এসে আমার কাছ থেকে ডিজাইনের বইটা চেয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কী সব দেখে ব্রজদার সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন।"

"ব্রজদা! ব্রজদা কে?"

"আগে কাজ করত আমাদের দোকানে।"

"এখন করে না?"

"না।"

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, "সেদিন দুপুরে আপনি কোথায় ছিলেন?"

গুণধরবাবু বললেন, "আমি বরাবরই বিকেলের দিকে আসতাম এবং রাত অবধি থেকে ক্যাশ নিয়ে বাড়ি যেতাম। এখন ব্রজ চলে যাওয়ায় সব সময়ই আমাকে দোকানে

থাকতে হয়।"

"আপনার সেই ব্রজ এখন কোথায়?"

"ও পাথর সেটিং-এর কাজ জানত। শুনেছি সেই কাজ নিয়ে ও এখন বম্বের জাভেরি মার্কেটে ভাল রোজগার করছে।"

"ওর বাড়ি কোথায় জানেন?"

"ডোমজুড়ের কাছে নিবড়ে নামে একটা গ্রাম আছে, সেইখানে। তবে ও বউবাজারেই মেসে থাকত। সেই ঠিকানাটা আমি জানি। কিন্তু ব্রজ অত্যন্ত ভাল ছেলে, ওকে সন্দেহ করার কোনও কারণ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"সন্দেহ করছি না তো। তবে একেবারে হাল ছেড়ে না দিয়ে একটু ফুঁ দিয়ে দেখছি ছাইচাপা কিছু যদি থাকে।"

ইনস্পেক্টর ভদ্রর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বউবাজারের মেসে এসে ব্রজর বম্বের ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। ওর দু-একটা চিঠিপত্তর যা বন্ধুদের লিখেছিল তা পড়ে দেখলাম। বম্বে থেকে পাঠানো ওর দু-একটা ফোটো সংগ্রহ করলাম বন্ধুদের কাছ থেকে, যা গুণধরবাবুর কাছে নেহাতই অর্থহীন বলে মনে হল।

সব কাজ সেরে যখন বাড়ি ফিরলাম দুপুর তখন দেড়টা। রাখহরি আমার জন্য হানটান করছিল। বলল, "আপনি এত দেরি করলেন দাদাবাবু! একটু আগে অশোকবাবু এসেছিলেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা করে চলে গেলেন।"

"অশোকবাবু! মানে অশোক পালিত? সেই প্রেস ফোটোগ্রাফার ছেলেটি?"

"হ্যাঁ। বলে গেছেন আবার আসবেন সন্ধের সময়। আপনি যেন কোথাও যাবেন না। বিশেষ দরকার।"

আমি চিন্তিত হয়ে বললাম, "কী এমন দরকার যে এইভাবে থাকতে বলল?"

"তা জানি না। তবে একটা কাগজ রেখে গেছেন। আপনাকে দেখতে বলেছেন।"

আমি ভেতরে ঢুকে পোশাক পরিবর্তন না করেই অশোকের রেখে যাওয়া কাগজের পাতায় চোখ বোলালাম। নতুন বেরিয়েছে কাগজটা। লোকের হাতে-হাতে না ঘুরলেও হকাররা রাখে। বিক্রিও হয়। সেই কাগজের প্রথম পাতায় বউবাজারের প্রতারণা বিবরণটা ফলাও করে ছাপা তো হয়েইছে, সেইসঙ্গে রয়েছে অশোকের তোলা একটি সুন্দর আলোকচিত্র—যাতে দেখা যাচ্ছে গয়নার বাক্স নিয়ে সেই দম্পতি অপেক্ষমান একটি মারুতিতে উঠছেন। এই ছবি একমাত্র এই একটি দৈনিকেই ছাপা হয়েছে।

কাগজটা রেখে মনের আনন্দে স্নান-খাওয়া সেরে বার বার সেই ছবির মুখগুলো দেখতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম এ জগতে কোনও কিছুই তুচ্ছ নয়—অশোক পালিতও নয়, আর এই কাগজটাও নয়। সবারই কিছু-না-কিছু অবদান থাকে।

অশোকের কথামতো আমি সারাটা দিন ঘরে রইলাম। কিন্তু না, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে পার হয়ে গেল, তবুও অশোক এল না। রাত্রিবেলা ওর কাগজের অফিসে ফোন করলাম। সেখান থেকেও ওর কোনও খোঁজখবর দিতে পারল না কেউ।

সেরাত্রে অশোকের জন্য অপেক্ষা করে করে আমি নিজেও কোথাও গেলাম না। পরদিন সকালের কাগজেই খবর পেলাম, অশোকের মৃতদেহ মধ্যরাত্রে কে বা কারা যেন ওদের অফিসের সামনে রাস্তার ওপর শুইয়ে রেখে গেছে।

শিউরে ওঠার মতো খবর। চক্রটি যে শুধু প্রতারণা করে তাই নয়, খুন করতেও পিছপা হয় না। সামান্য একটি আলোকচিত্র প্রকাশ করার অপরাধে যারা একজন নিরীহ ফোটোগ্রাফারকে হত্যা করতে পারে, তারা যে কী সাঙ্ঘাতিক তা যে-কেউ ধারণা করতে পারবে। আমি সেই কাগজের কাটিং সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই গেলাম গুণধর পাইনের ওখানে। নন্দকে ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি এঁদের চিনতে পারো?"

নন্দ বলল, "হ্যাঁ, এরাই তো এসেছিল কাল।"

আমি সেই মহিলার ছবি দেখিয়ে বলেছিলাম, "ইনিই কি তোমার ব্রজদার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?"

"না, সে ছিল প্রথমজন।"

তারপর সোজা চলে এলাম সদর দফতরে। সেখানও পুলিশের সংগ্রহে থাকা অপরাধীদের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে এই ছবির দু'জনের একজনেরও কোনও মিল পেলাম না। অবশেষে হতাশ হয়েই বাড়ি ফিরে এলাম।

কীভাবে যে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাব তা ভেবে পেলাম না। রহস্যের জট খুলতে পারি এমন কোনও সূত্রও খুঁজে পেলাম না কোথাও।

এখন একমাত্র ভরসা ব্রজগোপাল। তবে সেখানেও যে খুব একটা আশার আলো আছে তা নয়, সে বেচারা নির্দোষও হতে পারে। দোকানে কত কাস্টমার আসে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, তবু...

তবু চেষ্টা একটু চালিয়ে যাই। সারাদিন অনেক চিন্তাভাবনা করার পর একটা উপস্থিত বুদ্ধি মাথায় এল। কাগজের কাটিংটা সঙ্গে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন হোটেলে খোঁজখবর শুরু করলাম। বেশি খুঁজতে হল না, শিয়ালদহেই উড়াল পুলের পাশে সাধারণ একটি লজের ম্যানেজার ছবি দেখেই বললেন, "কী আশ্চর্য, এঁরা তো আমাদেরই অতিথি! প্রায়ই আসেন এখানে!"

"আমি একটু দেখা করতে চাই।"

ম্যানেজার ঘাড় নেড়ে বললেন, "সরি। কাল রাতেই এঁরা চলে গেছেন ঘর ছেড়ে দিয়ে।"

"সেই ঘরে নতুন কেউ কি এসেছেন এখনও?"

"না, ঘর খালি আছে।"

"একবার দেখতে পারি ঘরটা?"

"আপনার পরিচয়?"

পরিচয় দিলাম। ম্যানেজার নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ওপরের ঘরে। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছুই যখন পেলাম না, তখন হঠাৎ ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে কিছু বাজে কাগজের সঙ্গে একটা ট্রেনের টিকিট উদ্ধার হল। টিকিটটা বম্বে ভিটি টু হাওড়ার, পাঁচদিন আগেকার। টিকিটও দু'জনের। মিঃ পি.কে. সিনহা ও মিসেস মীরার। ছবির বয়সের সঙ্গে বয়সও মিলে যাচ্ছে। আমি উৎফুল্ল চিত্তে টিকিটটা পকেটে নিয়ে সহযোগিতার জন্য ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম হোটেল থেকে। কী ভাগ্যিস, চাপরাশি কাগজগুলো ঘর ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়নি!

পরদিন দুপুরেই গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে ভি.আই.পি. কোটায় দুটো বার্থ নিয়ে চলে এলাম বম্বেতে। অবশ্য একা আসিনি, ইনস্পেক্টর ভদ্রও সিভিল ড্রেসে সঙ্গে এসেছেন। কলকাতা থেকে একটা হোটেলে জানিয়ে এসেছিলাম, তাই আমাদের থাকার জন্য ঘরও রেডি ছিল।

যথাসময়ে বম্বে পৌঁছে হোটেলে খাওয়াদাওয়া করে রেস্ট নিলাম। প্রথমেই বম্বে পুলিশের সাহায্য নিয়ে আমরা রিজার্ভেশন টিকিট দেখিয়ে রেল দফতর থেকে উদ্ধার করলাম মিঃ সিনহার ঠিকানাটা। তারপর গেলাম ব্রজর খোঁজে।

পায়ধনির একটি তিনতলার ফ্ল্যাটে ব্রজগোপাল এম. কে. নম্বরির দোকানে কাজ করে। আমরা ওপরে উঠে খোঁজ নিতেই ওর শেঠ এসে বললেন, "ওকে তো আজ পাবেন না আপনারা! পেলেও ফিরতে অনেক রাত হবে।"

"কোথায় গেছেন উনি?"

"আন্ধেরিতে ওর দিদির বাড়ি। আপনারা?"

"আমরা ওঁকে দিয়ে কিছু কাজ করাব, তাই..."

"এ কাজের দায়িত্ব আমিও তো নিতে পারি?"

"আমরা কাল ওঁর সঙ্গে দেখা করব।"

আমরা সকালের দিকে অন্য কোথাও না গিয়ে এক ট্যাক্সি নিয়ে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া থেকে নরিম্যান পয়েন্ট হয়ে চৌপট্টি পর্যন্ত ঘুরলাম। তারপর বিকেলবেলা রোদের তেজ একটু কমলে মেরিন লাইন্স থেকে ট্রেন ধরে সোজা চলে এলাম আন্ধেরিতে। ঠিকানা আমাদের কাছেই আছে। রেল দফতর রিজার্ভেশন স্লিপ ঘেঁটে যে ঠিকনা আমাদের দিয়েছে সেটাও আন্ধেরির!

আন্ধেরির জুহুতে এসে সমুদ্রের ধারে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম আমরা। তারপর খুঁজে বের করলাম মিঃ এবং মিসেস সিনহার ফ্ল্যাটটাকে। খুবই উন্নতমানের ফ্ল্যাট। তবে দুঃখের বিষয়, ঘরে তালা দেওয়া। আমরা সমুদ্রতীরে বসেই ফ্ল্যাটের দিকে নজর রাখলাম, আলো জ্বললেই ধরব।

এখানে জুহু বিচে এখন টুরিস্টের মেলা। বোম্বাইয়ের চৌপট্টির থেকেও এখানটা আরও আকর্ষক, লোভনীয়। অনেক রাত পর্যন্ত এখানে মানুষের মেলা বসে থাকে। এই শহর দিনে-রাতেও ঘুমোয় না তাই।

হঠাৎ একসময় একজনের দিকে নজর পড়ল আমার। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির এক যুবক সমুদ্রের দিকে মুখ করে বার বার সিগারেট ধরাতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে। বললাম, "একে কি একটুও চেনা-চেনা লাগছে মিঃ ভদ্র?"

"হ্যাঁ, ফোটো দেখেছি। ইনিই তো সেই ব্রজগোপাল!"

আমি লাইটারটা নিয়ে ব্রজর দিকে এগিয়ে গিয়ে ফট করে ওর মুখের সামনে জ্বেলে ধরলাম সেটা।

ব্রজ প্রথমে একটু চমকে উঠল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বলল, "থ্যাঙ্কস।"

আমিও মিষ্টি হেসে ঘাড় নেড়ে ধন্যবাদ গ্রহণ করলাম।

ব্রজ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে চলে যেতে চাইল।

আমি বললাম, "আপনাকে কলকাতায় কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে!"

"ভুল দেখেছেন। আমি বম্বেতেই থাকি।"

“বউবাজারের কোনও সোনার দোকানে কখনও গেছেন কি?”

“মাঝে মাঝে গেছি হয় তো, সোনাদানা কিনতে।”

“বোম্বাই থেকে কলকাতায় কেউ সোনা কিনতে যায়? আপনি গুণধর পাইনকে চেনেন?”

আর চেনা! ব্রজ অতর্কিতে আমাকে এমনভাবে আক্রমণ করল যে, এক ঝটকাতেই ধরাশায়ী হলাম। তারপর আমি উঠে দাঁড়াবার আগেই দৌড় শুরু করল সে। ততক্ষণে মিঃ ভদ্র এসে চেপে ধরেছেন তাকে।

ব্রজ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, “কে, কে, কে আপনারা? আপনারা কারা? আমি আপনাদের চিনি না।”

আমি তখন ওর পেটের কাছে রিভলবার ধরে বললাম, “আমাদের তুমি নিশ্চয়ই চিনবে ব্রজদুলাল।”

“আমি ব্রজদুলাল নই। আপনারা ভুল করছেন—আমি ব্রজগোপাল।”

“এখানে কোথায় এসেছিলে? দিদির বাড়ি?”

“আমার কোনও দিদি-টিদি নেই।”

আমি খবরের কাগজের কাটিংটা ওর দিকে মেলে ধরে বললাম, “এঁদের তুমি চেনো? এরা কারা? এখানকার সাউথপয়েন্ট ব্লকে ফিফথ ফ্লোরে কারা থাকে?”

ব্রজ তখন দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। বলল, “সব বলব আপনাদের, আমাকে ছেড়ে দিন। আপনারা নিশ্চয়ই পুলিশের লোক?”

“হ্যাঁ। অনেকক্ষণ থেকে আমরা ওত পেতে আছি তোমাদের ধরবার জন্য। ওঁদের ফ্ল্যাটে তালা দেওয়া। কোথায় গেছেন ওঁরা?”

“আমরা সবাই গিয়েছিলাম বজ্রেশ্বরী। একটু আগেই ফিরেছি।”

“তা হলে চলো, ওঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় একটু করিয়ে দাও।”

জুহু বিচ ঘিরে তখন উৎসাহী জনতার কৌতূহলী দৃষ্টি। আমরা হাতের ইঙ্গিতে তাদের সরে যেতে বলে টেলিফোন বুথে গিয়ে লোকাল থানায় একটা ফোন করলাম। বোম্বাই পুলিশকে আগে থেকেই জানানো ছিল ব্যাপারটা, তারাই এখানকার ফোন নম্বর আমাদের দিয়েছিলেন। তাই অসুবিধে হল না।

আমরা ব্রজকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ অ্যান্ড মিসেস সিনহার ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছলাম, তখন আমাদের দেখেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন তাঁরা। আমাদের দু'জনের হাতে রিভলবার আর ব্রজগোপালের অবস্থা দেখেই ব্যাপারটা যে কী হতে চলেছে তা অনুমান করতে পারলেন।

একটু পরেই স্থানীয় পুলিশও এসে গেল।

জেরার মুখের অপরাধ স্বীকার করল অপরাধীরা। উদ্ধার হল লক্ষাধিক টাকার সমস্ত গয়না। ব্রজগোপাল স্বীকার করল, এরাই তার নিজের দিদি-জামাইবাবু। এই জামাইবাবুই তাকে বোম্বাইতে নিয়ে আসেন। এইখানে বসেই এই অভিনব প্রতারণার পরিকল্পনা করে ওরা। উদ্দেশ্য, এইভাবে সোনা সংগ্রহ করে নিজেরা স্বাধীনভাবে এখানে একটা ব্যবসা করবে। তবে পার্ক স্ট্রীটের শম্ভু মালিক এবং তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন আসল নাটের গুরু। প্রতারণা ছাড়াও আরও অনেক বাজে কাজ তাঁরা করে থাকেন। মিঃ সিনহাকে নিয়ে কলকাতার

বিভিন্ন অঞ্চলে এবং অন্যান্য বড় বড় শহরে বেশ কিছুদিন ধরে এইরকম প্রতারণার ফাঁদ পেতে আসছিলেন। শুধু ভাগ্য বিপর্যয়ে এইবার বমাল সমেত ধরা পড়লেন সকলে।

বোম্বাই পুলিশ প্রতারণার দায়ে তিনজনকেই গ্রেফতার করল। ওদিকে টেলিফোনে খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশও অ্যারেস্ট করল শম্ভু মালিক ও তাঁর স্ত্রীকে। তাঁদের বিরুদ্ধে শুধু প্রতারণা নয়, খুনের অভিযোগও আনা হল।

আমরা গুণধরবাবুকেও পরদিন বিমানযোগে বোম্বাই আসতে বলে ভি.টি.-তে ফিরে এলাম। এখন পূর্ণ বিশ্রাম। কাল গুণধরবাবু এলে ওঁর হাতে গয়নার বাক্স তুলে দিয়ে ভাবছি গোয়াটা একবার ঘুরে যাব।

রহস্য রজনীগন্ধার

ভোরে ওঠা আমার বরাবরের অভ্যাস। কিন্তু ইদানীং রাত সাড়ে তিনটে কি চারটে বাজতে-না-বাজতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। সেই যে ঘুম ভাঙে, হাজার এপাশ-ওপাশ করলেও আর ঘুম আসে না। আমি তখন শয্যাত্যাগ করে কখনও ছাদে যাই, কখনও-বা বাগানে পায়চারি করি। এইসময় আমার খুব চা খেতে ইচ্ছে করে। আমার সবরকমের কাজকর্ম করে দেওয়ার জন্য রাখহরি আছে। কিন্তু সে বেচারা তখন এমন অকাতরে ঘুমোয় যে ওকে ডাকতেও আমার মায়া হয়। ছেলেমানুষ তো! আমি তাই নিজেই এক কাপ চা করে খাই।

আজ ঘুম ভাঙল শেষ রাতে। তিনটে। কেন এমন হল? অথচ খুব একটা বেশি রাতেও ঘুমোইনি। যাই হোক, ঘুম থেকে উঠে মুখে-চোখে জল দিয়ে চায়ের একটু ব্যবস্থা করে যখন জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়েছি, তখনই বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই মনে হল, ঘুম যখন ভাঙেই আর উঠতেও যখন হয় তখন এইভাবে বন্ধ ঘরের মধ্যে আটকে না থেকে একটু মর্নিং ওয়াক করে নিলে কেমন হয়? মনে হওয়া মাত্রই আমার শরীরচর্চার সঙ্গে আর একটা নতুন মাত্রা যোগ করে দিলাম।

ডেকে তুললাম রাখহরিকে।

ওকে দরজায় খিল দিতে বলে আমি বাইরে বেরোলাম। এখনও চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। চৈত্রের প্রথম। তবুও মনে হচ্ছে, যেন মধ্যরাত। পাখিরা সবে জাগছে। দু-একজন সাইকেল আরোহী টিং-টিং করে ঘণ্টি বাজিয়ে কোথায় যেন গেল। যে যেখানেই যাক, আমি আমার পথচলা শুরু করলাম।

মৌড়িগ্রাম এখন আর আগের মতো গ্রাম নেই। দ্বিতীয় হুগলি সেতু হয়ে যাওয়ার ফলে নিত্যনতুনভাবে তার চেহারা পালটাচ্ছে। আমি দ্রুত পা চালিয়ে রথতলার দিকে চললাম। হাঁটাটা একটু রপ্ত হয়ে গেলে আরও দূরে খটিরবাজার কিংবা প্রশস্তর দিকে চলে যাব। প্রশস্তর মূর্তি মহল্লা বিখ্যাত।

মৌড়ি রথতলার কাছাকাছি যখন এসেছি তখন হঠাৎই একটা বাড়ির দিকে আমার নজর পড়ল। দেখলাম গেঞ্জি ও শর্টস পরা এক যুবক একজনদের বাড়ির দোতলা থেকে কিছু একটা বেয়ে নীচে লাফিয়েই অন্ধকারে মিশে গেল। যুবকটির গায়ের রং কালো, বেঁটেখাটো চেহারা। ও যে চোর এবং চুরি করতে এসেছিল তা বোঝাই গেল।

আমি ধীরে-ধীরে সেই বাড়িটার দিকে এগোলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম ওপরের ঘরের বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা। বোধ হয় গরমের জন্য। আর বারান্দার সঙ্গে লোহার হুকে আটকানো একটা নাইলনের ফিতে বাইরের দিকে ঝুলছে। চোর পালাবার সময় এটা না নিয়েই চলে গেছে। বাড়ির দরজায় নেমপ্লেট দেখেই চমকে উঠলাম আমি। আরে, এ যে প্রোফেসর এম.এল. বোসের বাড়ি! ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। কিন্তু শুনেছি উনি অত্যন্ত গুণী মানুষ। হাওড়ারই কোনও একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ওঁর কোচিং-এরও নামডাক আছে খুব।

একবার ভাবলাম চোরটার পেছনে একটু তাড়া লাগালে হত। যদিও দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ওর সঙ্গে আমি পেরে উঠতাম না, তবু একটা শোরগোল ওঠানো যেত। কিন্তু ব্যাপারটা এমনই আচমকা ঘটে গেল যে, তখন আর কিছুই করবার ছিল না আমার।

আমি অনেকক্ষণ সেই জায়গাটায় পায়চারি করে আকাশ একটু ফর্সা হলে প্রোফেসরের বাড়ির দরজায় নক করলাম।

ভেতর থেকে সাড়া এল, "কে?"

তারপর সদ্য ঘুমভাঙা এক মহিলা বেরিয়ে এসে বললেন, "কাকে চাই?"

"প্রোফেসর বোস আছেন?"

"উনি এখন ঘুমোচ্ছেন। এখন তো দেখা হবে না। বেলায় আসবেন।"

"ওঁকে একবার ডাকুন, ডেকে বলুন বাড়িতে চোর এসেছিল।"

মহিলা ভয়েই হোক, বা যে-কোনও কারণেই হোক 'ও মাগো' বলে আমার মুখের ওপর সশব্দে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

আমি আর কী করি, বাধ্য হয়েই বাড়ি ফিরে এলাম।

রাখহরি বলল, "আজ এত ভোরে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন দাদাবাবু?"

"মর্নিং ওয়াকে। শুধু আজ নয়, এবার থেকে রোজই আমি বেরোব। মর্নিং ওয়াকটা আমার কাছে এখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।"

'কিন্তু আপনার মতো লোকের পক্ষে অত ভোরে একা ওইভাবে বেরনোটা কি ঠিক? কে কখন সন্ধান নিয়ে পিছু নেয়, তা কে বলতে পারে?"

"ও-ভয় করলে তো ঘর থেকেই বেরনো যাবে না রে! আজ শুধু হাতে গেছি। কাল থেকে তৈরি হয়েই বেরোব। যাক, তুই এখন বেশ জুতসই করে একটু চা কর দিকিনি।"

রাখহরি ওর কাজে গেল।

আমি ইজি চেয়ারটা বাইরের বাগানে এনে আমার প্রিয় রঙ্গন গাছগুলোর কাছে গিয়ে বসলাম।

একটু পরেই কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে গেল। সেইসঙ্গে একটা দুঃসংবাদ।

কাগজওয়ালা বলল, "জানেন তো চ্যাটার্জিদা, একটা খুব খারাপ খবর আছে আজ। কাগজে নেই অবশ্য খবরটা, তবে কালকের কাগজে নিশ্চয়ই বেরোবে।"

"কীরকম?"

"প্রোফেসর এম.এল. বোস খুন হয়েছেন।"

আমার তো আঁতকে ওঠার পালা। বললাম, "সে কী!"

"হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, খুনি খুন করে নীচের দিদিকে জানিয়েও গেছে।"

রাখহরি তখন চা আর টোস্ট নিয়ে এসেছে। আমি কোনওরকমে ওর হাত থেকে সেটা নিয়ে মাটিতে ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখলাম।

কাগজওয়ালা বলল, "এই ধরনের অজাতশত্রু মানুষের যদি এই অবস্থা হয়, তা হলে দেশের পরিস্থিতি কীরকম এবার বুঝতে পারছেন তো?" বলে চলে গেল।

আমি কাঁপা-কাঁপা হাতে টোস্টে কামড় দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। এই মুহূর্তে নিজের ওপর দারুণ রাগ হল আমার। কেন যে ভোরবেলা সেই খুনিটার পেছনে ধাওয়া করলাম না, তা ভেবেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই মুহূর্তে আগাগোড়া ঘটনাটা পুলিশকে জানানো দরকার। তারপর যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতে হবে আততায়ীকে।

থানায় গিয়ে পুলিশকে সব কথা বলতেই ইনসপেক্টর ত্রিবেদী বললেন, "অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন আপনার এবং আততায়ীর মধ্যে দূরত্ব এতটাই ছিল যে, আপনি উদ্যম নিলেও ধরতে পারতেন না।"

"ঠিক তাই।"

"তবু খুনির চেহারার একটু বর্ণনা দিতে পারেন?"

"বেঁটেখাটো চেহারা। শর্টস আর গেঞ্জি পরে ছিল।"

"মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি?"

"দূরত্বের জন্য বোঝা যায়নি।"

মিঃ ত্রিবেদী একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'মনে হয় চোর-গণেশ। ছোটখাটো যত চুরিটুরির প্রধান হচ্ছে ও। তবে কিনা এইরকম খুন-জখমের মতো জঘন্য অপরাধের কোনও রেকর্ড ওর নেই। আচ্ছা, লোকটাকে আর একবার দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?"

"না পারাই স্বাভাবিক। আমি যখন রথতলার বাঁকের মুখে এসেছি, ও তখন দড়ি বেয়ে ঝুপ করে নেমে পালাল।"

ত্রিবেদী একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ঠিক আছে। চলুন একবার ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক।"

আমি বললাম, "যেতে তো হবেই ত্রিবেদীজি। তবে একটা কথা, এই খুনের তদন্তটা কিন্তু আমি করব। আপনারা আমাকে হেল্প করবেন।"

"অন্তত এই একটা ব্যাপারে আপনি আমাদের পরম বন্ধু। আপনার সহযোগীতা আমাদের কাছে অলওয়েজ অ্যাক্‌সেপ্টেব্‌ল।"

আমরা একটুও দেরি না করে ঘটনাস্থলে চলে এলাম।

সেই দিদি তো আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন। বললেন, "এই তো! এই বাবুই আমাকে খবর দিয়েছিলেন। উনি চলে যাওয়ার পর ওপরে গিয়েই দেখি এই কাণ্ড। আমি তো ভয়েই মরি। ভাবলাম উনিই বোধ হয় বাবুকে খুন করে আমাকে জানিয়ে গেলেন। এখন তো দেখছি উনি পুলিশেরই লোক।"

ইনসপেক্টর ত্রিবেদী এবং আমি বাইরের লোকজনের ভিড় ঠেলে ওপরে উঠে গেলাম। নীচের কনস্টেবলরা ভিড় কন্ট্রোল করতে লাগল।

আমরা ঘরে ঢুকেই দেখলাম মিঃ বোস মাথায় আঘাতের চিহ্ন নিয়ে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর মাথা রেখে এমনভাবে পড়ে আছেন, যাতে মনে হচ্ছে অত্যন্ত ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন তিনি। টেবিলের ওপরে একটা ফুলদানি আছে। সম্ভবত এই

ফুলদানিটা দিয়েই ওঁর মাথার ব্রহ্মতালুতে আঘাত করা হয়। ওঁর হাতের মুঠোয় আছে একগোছা রজনীগন্ধা। টেবিলের ওপর একটা বিদেশি গোয়েন্দা গল্পের বই এবং একটি 'সুইসাইড নোট'। একটি ফুলস্ক্যাপ কাগজের ওপর লেখা আছে, "আমিই খুনি", লেখার নীচে ওঁর সই।

রহস্যময় ব্যাপার। রহস্যময় এই কারণে যে, উনি যদি নিজের মাথায় ফুলদানি দিয়ে আঘাত করে থাকেন, তা হলে সেটা ওই ভাবে টেবিলের ওপর থাকতে পারে না। সুইসাইড নোটে কেউ নিজেকে নিজের খুনি বলে লিখে রাখে না। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা, সেটা হল ওই রজনীগন্ধা ফুলগুলো। এই ফুলগুলো ওঁর হাতের মুঠোয় এল কীভাবে?

এইবার ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের দিকে নজর দেওয়া হল। সবই ঠিকঠাক আছে। শুধু স্টিলের আলমারিটাই যা লণ্ডভণ্ড। তার মানে খুনি যার লোভে এই কাজ করেছে তা পেয়ে অথবা না পেয়েই করেছে এই কাজ। ওই আলমারিতেই একটি খাতায় লেখা ছিল ওঁর সঞ্চয়ের হিসেবনিকেশ। প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকার মতো ইন্দিরা বিকাশ কিনেছিলেন উনি, তার একটিও নেই। জাতীয় সঞ্চয়ের কিছু কাগজ ছোঁড়াখোঁড়া অবস্থায় পড়ে আছে। সেও প্রায় দেড় লাখ টাকার মতো। ব্যাঙ্কে এফ.ডি.-র জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দেওয়ার ফর্ম ফিল-আপ করেছিলেন, কিন্তু ফর্ম আছে, অথচ টাকা নেই। অর্থাৎ খুনি এটাকেও হাতিয়েছে। এই টাকাটা সম্ভবত কোনও পলিসি ম্যাচিওর হওয়ার পর জমা পড়তে যাচ্ছিল। খুনি সেটা জানত।

ত্রিবেদী বললেন, "কী বুঝলেন মিঃ চ্যাটার্জি?"

"রীতিমতো সন্ধানী চোর।"

"কিন্তু ওই সুইসাইড নোটের অর্থ কী?"

"বোঝা যাচ্ছে না। তবে লেখাটা ওঁরই। কেননা ওঁর খাতাপত্র বা অন্য লেখাটেখা দেখে এই লেখার কোনও গরমিল পাচ্ছি না।"

এবার আমরা বারান্দার কাছে এসে একজোড়া পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। পরে আরও লক্ষ করে ঘরের ভেতর পর্যন্ত একই পায়ের যাওয়া-আসার ছাপ স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমরা। আততায়ী জুতো পরে আসেনি। সে এসেছিল ধুলোমাখা খালি পায়ে। কিন্তু সেই পায়ের ছাপ বোসবাবুর চেয়ারের কাছ পর্যন্ত আছে, তারপর আর নেই। তা হলে স্টিলের আলমারি ভেঙে জিনিসপত্রগুলো চুরি করল কে?

আমি ওঁর সম্পত্তির হিসেব লেখা খাতা ও ডায়েরিটা আদায় করে পুলিশকে বললাম, "আপনারা এবার আপনাদের কাজ করুন। আমি ততক্ষণ দিদির সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।"

কাজের দিদি নীচের ঘরে বসে নীরবে চোখের জল মুছছিলেন। আমি গিয়ে বললাম, "আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।"

উনি বললেন, "বেশ তো, করুন।"

"আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

"তা ধরুন না কেন, বছর পনেরো।"

"আগে কোথায় ছিলেন? আপনার কে-কে আছে?"

"আগে দেশে ছিলাম। আমার কেউ নেই। গরিব মানুষ, বিধবা। উনি আমাকে ওঁর

চরণে ঠাঁই দেন।"

"বোসবাবুর কে-কে আছেন? এখানে অথবা দেশের বাড়িতে?"

"উনি তো আমারই দেশের লোক। দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বহু বছর। কেননা যা যেখানে ছিল সবই বেচেবুচে দিয়ে এইখানে এসে বাড়ি করেছেন। ওঁরও কেউ কোথাও নেই। বিয়ে করেছিলেন, ছেলেপুলে হয়নি। বউদিমণি মারা গেছেন ক্যান্সারে। তারপর উনি আর বিয়েও করেননি। তবে কিছুদিন ধরে বলছিলেন অবসর নেওয়ার পর তীর্থে-তীর্থে ঘুরবেন। তা কোন তীর্থে যে উনি চলে গেলেন বাবা, তা কে জানে?"

"আচ্ছা, সম্প্রতি ওঁর সঙ্গে কি কারও মনোমালিন্য হয়েছিল?"

"না বাবা। সকলে ওঁকে দেবতার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করত।"

"কাল উনি কখন ফিরেছেন? কতক্ষণ কাজ করেছেন? কে-কে দেখা করতে এসেছিল ওঁর সঙ্গে?"

"উনি তো কাল কলেজে যাননি। কী একটা বই লিখবেন বলে ক'দিনের ছুটি নিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীও আসেনি কেউ। বাইরের কেউও আসেনি দেখা করতে। শুধু ভোরবেলা আপনিই যা এসেছিলেন।"

কাজের দিদির কথায় একটু আলোর ইশারা পেলাম। অর্থাৎ সুইসাইড নোটের রহস্যটা একটু পরিষ্কার হল। উনি তা হলে বই লিখতে যাচ্ছিলেন। আর সেই বইটার, অথবা সেই বইয়ের কোনও গল্পের নাম নিশ্চয় 'আমিই খুনি'। হয়তো বা ওই ইংরেজি বইয়ের কোনও গল্পের অনুবাদ করতে বসেছিলেন। আর ঠিক সেই সময়ে খুনি এসে তার ফায়দাটা লুটেছে। কিন্তু কীভাবে?

আমি আবার ওপরে উঠে এসে বোসবাবুর টেবিলের ওপর রাখা সেই ইংরেজি বইটার পাতা উলটেই এমন একটা গল্প দেখতে পেলাম, যার বাংলা করলে নামটা দাঁড়ায় 'আমিই খুনি'। বইটা ত্রিবেদীকে দেখাতে তিনিও চমকে উঠলেন। বললেন, "আরে, তাই তো! আমরা তো এতক্ষণ ভুল সিদ্ধান্তে যাচ্ছিলাম।"

আমার মনের মধ্যে এখন একটাই দুশ্চিন্তা তোলপাড় করতে লাগল, খুনি কে? তার পায়ের ছাপ মৃতের কাছ পর্যন্ত গেল কিন্তু আলমারির কাছে নেই কেন? আর মৃতের হাতের মুঠোয় ওই রজনীগন্ধার অর্থ কী?

দুপুরবেলা ঘরে বসে নিজের মনে কত কী চিন্তা করতে লাগলাম। কোন সূত্র ধরে এই তদন্তের কাজ কীভাবে এগোব তা কিছুতেই ভেবে পেলাম না। আততায়ী একমাত্র পদচিহ্ন ছাড়া আর কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি। বোসবাবুর সম্পত্তির হিসেব লেখা খাতায় ষাট ভরি সোনার গয়নার উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই গয়নাও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উধাও। অমন একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এমন অমূল্য সম্পদ লকারে না রেখে কেন যে ঘরে রেখেছিলেন, তা ভেবে পেলাম না। হয়তো-বা এইসবের প্রতি কোনও মোহ ছিল না, তাই।

যাই হোক, আমি যখন বসে-বসে এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, ঠিক তখনই টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। ফোন ধরতেই ত্রিবেদীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "মিঃ চ্যাটার্জি, শিগ্‌গির একবার আসুন। বোধ হয় আপনার খুনি ধরা পড়েছে।"

বোধ হয়? তবুও আমি এক মুহূর্ত দেরি না করে থানায় এলাম। দেখলাম বেঁটেখাটো

চেহারার একজন লোককে লকআপে রাখা হয়েছে। এই চোর-গণেশ। লোকটাকে এই এলাকায় বহুবার দেখেছি। তবে নাম জানতাম না। আমাকে দেখেই কেঁদে ফেলল সে। বলল, "আমাকে বাঁচান বাবু। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। সুযোগ পেলেই ছোটখাটো চুরিটুরি একটু-আধটু করে থাকি বটে, তবে এই সমস্ত খুন-খারাপির ব্যাপারে আমি নেই। দরকার হলে আপনারা পুলিশ-কুকুর আনান, দেখবেন সে আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। শুধু আমি কেন, ওঁকে খুন করবে এই অঞ্চলে এমন কেউ নেই।"

আমি চোর-গণেশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বললাম, "এ-লোকটাকে ছেড়ে দিতে পারেন। এর পায়ের সঙ্গে ওই ঘরের ভেতরের পায়ের ছাপ মিলছে না। তার এক পায়ে ছ'টা আঙুল ছিল।"

এই কথা শুনেই লাফিয়ে উঠল চোর-গণেশ, "কী বললেন বাবু, ছ'টা আঙুল ছিল? বাঁ পায়ে কী?"

ত্রিবেদী উৎসাহিত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঁ পায়ে। তুমি চেনো তাকে?"

"চিনি মানে? ওর জামার কলার ধরে এখনই ওকে টেনে আনছি আপনার কাছে। সামান্য ক'টা টাকার লোভে শেষ পর্যন্ত এই কাজ করল ও?"

"ও কে?"

"সুবল বাগ। ঘরামির কাজ করে। আমি এখনই টেনে আনছি ওকে। দু'নম্বর বস্তিতে ঘর ছাইতে গেছে ও।"

চোর-গণেশকে ছেড়ে দেওয়া হল। লোকটা বোধ হয় ম্যাজিক জানে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে মারতে-মারতে যাকে নিয়ে এসে হাজির করল তার নাম সুবল বাগ।

সুবল প্রথমেই এসে ত্রিবেদীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তারপর আমার পায়ে। বলল, "অপরাধ নেবেন না হুজুর। আমি চোর বটে, তবে খুনি নই।"

ত্রিবেদী বললেন, "তা হলে কি সাধু?"

আমি ইশারায় ত্রিবেদীকে চুপ করতে বললাম।

সুবল বলল, "হুজুর, কাল অনেক রাতে বেগড়ি থেকে একজনের ঘর ছেয়ে খটিরবাজারে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখি, সুন্দরপানা এক ভদ্রলোক বাবুর বাড়ির দোতলা থেকে কী একটা বেয়ে নামল। তার কাঁধে ছিল একটা ঝোলা-ব্যাগ। পায়ে মোজা। নীচে নেমেই জুতো পরে একটা ভটভটিতে চেপে কোথায় যেন চলে গেল। বাবুর ওপরের ঘরে তখন আলো জ্বলছে। আমি তখন ব্যাপারটা কী হল তা বোঝবার জন্য কাছে গিয়ে দেখি একটা নাইলনের ফিতে ওপর থেকে ঝুলছে। দেখেই কেমন সন্দেহ হল। আমাদের মতো চোরেরা ফিতে ধরে ওঠে না, আবার ভটভটিও চাপে না। তাই কৌতূহলী হয়ে সেই ফিতে ধরে ওপরে উঠেই দেখি ওই কাণ্ড। বাবু টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। দু'চোখ বোজা। আস্তে করে দু'বার ডেকে সাড়া না পেয়ে বুঝলাম বাবুর দেহে প্রাণ নেই। টেবিলের ওপর ফুলদানিটা কাত হয়ে পড়ে ছিল। ঘরের মেঝেয় ফুলদানির জল। সেটাকে ঠিক করে রেখে গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম শরীরে তখনও উত্তাপ আছে যদিও, তবুও উনি মৃত। আমি তখন আলোটা নিভিয়ে দিলাম। কেননা দারুণ ভয়ে হাত-পা তখন কাঁপছে আমার। যদি কেউ নামবার সময় আমাকে দেখে ফেলে তা হলে আমাকেই খুনি ভাববে। তাই কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচলাম। কিন্তু বেঁচেও কি

রেহাই পেলাম? আমার পায়ের ছাপের জন্য ধরা পড়ে গেলাম। বাবুরা বিশ্বাস করুন, আমি সম্পূর্ণ নির্দোস।''

আমি বললাম, ''তুমি তখন ওই লোকটাকে নামতে দেখে চেঁচালে না কেন?''

''ভয়ে। কেননা ওই জোয়ান লোকটা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আমি ওর সঙ্গে পেরে উঠতাম না। তা ছাড়া ওইসব লোকের কাছে গোলাগুলিও থাকে।''

''তুমি তখন পুলিশে খবর দিতে পারতে!''

ত্রিবেদী বললেন, ''যাক, এসব তো হল। এখন ওই বাবুর ঘর থেকে কী-কী জিনিস চুরি করেছিলে তুমি?''

''হুজুর, মা-বাপ। ওই খুন দেখেই আমার সব কিছু তখন মাথায় উঠে গেছে। তা ছাড়া ওই সমস্ত নামীদামি লোকের ঘরে চুরি করবার মতো দুর্মতি আমার হয় না বাবু। আসলে হয় কী, পেটে টান পড়লে তখনই...।''

যাই হোক, সুবলের অকপট স্বীকারোক্তি বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হল। কেননা ও মৃতের কাছ পর্যন্ত যে গিয়েছিল. সে-প্রমাণ আমরাও পেয়েছি। কিন্তু আলমাবির কাছে ওর কোনও পদচিহ্ন ছিল না। চতুর খুনি মোজা পরে ঘরে ঢোকার ফলে তারও পায়ের ছাপ কিছু পাওয়া যায়নি। তাই সামান্য জিজ্ঞাসাবাদের পর সুবলকেও ছেড়ে দেওয়া হল।

সন্ধেবেলা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এল। বোসবাবুকে প্রথমে শ্বাসরোধ করে, পরে মাথায় ফুলদানির ঘা দিতেই আঘাতজনিত কারণে মারা যান বোসবাবু। পুলিশ কুকুরও এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কোনওরকম আলোকপাত করতে পারেনি আমাদের।

পরদিন সকালে আমি আবার বোসবাবুর বাড়ি গেলাম। কাজের দিদি তখন অত্যন্ত কান্নাকাটি করছিলেন। বললেন, ''বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো। এই অনাথিনীর একটা ব্যবস্থা করে দাও বাবা। আমাকে কোনও একটা আশ্রমে পাঠিয়ে দাও। কেউ কোথাও নেই আমার। এই বাড়িতে একা আমি কী করে থাকব, কী খাব? আর শোনো, বউদিমণির গয়নার বাক্সটা নীচের ঘরে থাকত। তাই ওটা চোরে নিয়ে যেতে পারেনি। ও তুমি থানায় জমা দিয়ে দাও। ও আমি কতদিন আগলে রাখব বাবা? কার জন্য রাখব?

আমি অবাক হয়ে বললাম, ''বউদিমণির গয়নার বাক্স আপনার কাছে থাকত কেন?''

''ওগুলো নীচের ঘরের আলমারিতে থাকত। তার চাবি আমার কাছে। আমি যে বাবুর মায়ের মতো, দিদির মতো ছিলাম বাবা। উনি যে আমাকে খুবই বিশ্বাস করতেন।''

কাজের দিদির এই কথা শুনে শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে এল আমার। আজকের দিনে এমন নির্লোভ মানুষও হয়? এইজন্যই এই মহিলাকে দেবীর আসনে বসিয়েছিলেন বোসবাবু। আমি বললাম, ''আপনার কোনও চিন্তা নেই দিদি। আপনি এই বাড়িতেই থাকবেন। পরে আপনার ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নেব। সেরকম হলে আপনি নীচের তলাটা ভাড়া দিয়ে ওপর তলায় থাকবেন।'' তারপর বললাম, ''আচ্ছা, একটু মনে করে দেখুন তো, ওঁর এই বিষয়সম্পত্তির দাবি করতে পারে এমন কেউ কি কোথাও. নেই?''

''আমার অন্তত জানা নেই বাবা। তবে ওঁর এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠতুতো দাদা কাশীতে ছিলেন। শুনেছি তিনিও মারা গেছেন। তাঁর একমাত্র ছেলে খোকনবাবু একবার এখানে এসে এক রাত ছিলেন।''

"কতদিন আগের কথা?"

"এই তো গতমাসে। তা, বাবু ওঁকে কিছু টাকাও দিয়েছেন। বলেছেন আর কখনও যেন এখানে না আসেন।"

"বাবু ওকে এখানে আসতে বারণ করলেন কেন? সে-ব্যাপারে কিছু জানেন?"

"না। তবে শুনেছি উনি বাবুকে এখানকার বাড়ি বেচে দিয়ে কাশীতে গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি কিনে চলে যাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। সেরকম বাড়িও নাকি ওঁর সন্ধানে আছে। তা বাবু একদমই রাজি হননি।"

"আপনি ওদের কাশীর বাড়ির ঠিকানাটা জানেন?"

"না বাবা, তাও জানি না।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "খোকনবাবু যা লোক দেখছি তাতে মনে হয় ওঁকে একটা খবর দেওয়া একান্তই দরকার। কেননা যদি কখনও এই বাড়ির দাবি করে উনি কোর্টে যান তখন কিন্তু আপনি মুশকিলে পড়ে যাবেন।"

দিদি চোখের জল মুছে বললেন, "আমার আর মুশকিল কী বাবা? যাদের যা পাওনা তারা তাই নেবে। আমাকে দয়া করে থাকতে দেয় দেবে, না দেয় তোমরা কোনও একটা আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ো আমাকে। শেষমেশ ভিক্ষে করব। তাও যদি না জোটে গঙ্গায় জল তো আছেই বাবা!"

আমি তখন দিদিকে বললাম গয়নার বাক্সটা দেখাতে। দিদি আলমারি খুলে বাক্স বের করে দেখালেন। ওই আলমারিতেও অনেক পুরনো কাগজ ও চিঠিপত্র ছিল। হঠাৎ একটি চিঠি দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার। চিঠিটা এসেছিল কাশীর পাঁড়েঘাট থেকে। চিঠিটা লিখেছেন নিশিকান্ত বসু। সম্ভবত ইনিই বোসবাবুর সেই দূর সম্পর্কের জ্যাঠতুতো দাদা। চিঠিটা এই : "বউমার মৃত্যুসংবাদ লোকমুখে শুনে অত্যন্ত দুঃখ পেলাম। আরও দুঃখ পেলাম তুমি দেশের পাট চুকিয়ে হাওড়ায় বাড়ি কিনেছ বলে। তাই আমার অনুরোধ, যদি তুমি কাশীর এই বাড়িটা কিনে রাখো তা হলে এই বৃদ্ধ বয়সে আমি একটু নিশ্চিন্ত হই। তোমার বাড়ি তোমারই থাকবে। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আর আমি বেঁচে যাই ভাড়া গোনার হাত থেকে। মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা হলেই বাড়িটা কিন্তু তোমার হয়ে যায়। ছেলেটাকে মানুষ করতে পারিনি। আমার জীবনের এটাই চরম ব্যর্থতা।"

আমি চিঠিটা পকেটে রেখে গয়নার বাক্সটা দিদিকে ফেরত দিলাম। বললাম, "এখনই এটা থানায় জমা দেওয়ার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। সাবধানে থাকবেন। বাড়ির বাইরে যাবেন না। আর অচেনা কেউ এলে বাড়ির দরজা খুলবেন না।"

দিদি আমার কথায় সায় দিয়ে 'হ্যাঁ" বললেন।

আমি বাড়ি ফিরে এলাম। এসে আবার বোসবাবুর ডায়েরিটা নিয়ে বসলাম। একমাস আগের একদিনের পাতায় লেখা আছে, "পুরনো পরিচয়ের সূত্র ধরে খোকন এসে হাজির। প্রথমে ওকে চিনতেই পারিনি। পরে পরিচয় দিতে চিনলাম। ও কাশীর একটি চার লাখ টাকার বাড়ির দালালি করতে এসেছে। আমাকে ওই বাড়িটা কেনবার জন্য বিশেষভাবে চাপ দিতে লাগল। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। শেষমেশ ও আমাকে ওর নানারকম বিপদের কথা বলে দশ হাজার টাকা চাইল। আমি ওকে তাও দিলাম না। বললাম, আমার সব টাকাই এখন ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিসে ডবল ইনভেস্টমেন্ট-এ আছে। এমনকী, ওর বিশ্বাস

উৎপাদনের জন্য আলমারি থেকে কাগজপত্রগুলোও বের করে দেখালাম। তারপর হাজারখানেক টাকা ওর হাতে দিয়ে বিদায় করলাম ওকে, এবং এও জানালাম, ভবিষ্যতে আর কখনও যেন ও আমাকে এইভাবে বিরক্ত করতে না আসে।''

এই ডায়েরি পড়ে মনে-মনে আমি স্থির করলাম যেভাবেই হোক একবার কাশীতে গিয়ে ওই খোকনবাবুর সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। ঠিকানা না থাকলেও পাঁড়েঘাটের ওদের সেই পুরনো বাড়ি থেকেই শুরু হবে আমার অনুসন্ধান। একান্ত খুঁজে না পাই তদন্তের কাজে গিয়ে বারাণসী ভ্রমণ তো হবে! জয় বাবা বিশ্বনাথ।

কিন্তু ভাগ্য আমার এতই ভাল যে, কাশীযাত্রা আর করতে হল না। হঠাৎই সন্ধেবেলা এক অবাঙালি যুবক দেখা করতে এল আমার সঙ্গে, ''আপনিই মিঃ অম্বর চ্যাটার্জি? মানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ...।''

''হ্যাঁ আমিই। আপনার পরিচয়?''

''আমার নাম শিবকুমার শর্মা। আমার বাড়ি বারাণসীতে। আমি সালকিয়ায় থাকি।''

''কী ব্যাপার বলুন তো?''

''শুনলাম, আপনি নাকি মিঃ বোসের খুনের ব্যাপারে তদন্ত করছেন। তা এই ব্যাপারে আমার বন্ধু খোকনবাবু একটু দেখা করতে চান। কেননা মিঃ বোসের ওই বাড়ি এবং তাঁর অন্যান্য সম্পত্তির ও-ই এখন একমাত্র দাবিদার।''

''আপনার সেই বন্ধুটি কোথায়?''

'বাইরে অপেক্ষা করছে।''

''বাইরে কেন? ভেতরে নিয়ে আসুন।''

''আসলে এই মর্মান্তিক সংবাদে ও খুব ভেঙে পড়েছে। মাসখানেক আগে একবার ও এখানে এসেছিল। সেই শেষ দেখা।''

''ঠিক আছে। ওঁকে আসতে বলুন।''

রহস্যের গন্ধ পেয়ে আমি অস্থির হলাম।

একটু পরেই শিবকুমার যাকে নিয়ে ভেতরে এল সুবল বাগের বর্ণনার সঙ্গে তার হুবহু মিল। ওরা ঘরে এসে আসন গ্রহণ করলে বললাম, ''আপনারই নাম খোকনবাবু?''

''হ্যাঁ, ভাল নাম রজনীকান্ত বোস।''

''কিন্তু আপনি যে সেই লোক তার প্রমাণ কী? আপনাকে চেনে এমন কেউ কি আছে এখানে?''

শিবকুমার বলল, ''কেন, আমি আছি।''

''আমি তো আপনাকে চিনি না।'' তারপর ওদের দু'জনের আপাদমস্তক আর একবার নিরীক্ষণ করে বললাম ''আচ্ছা ওই বাড়িতে যে কাজের দিদি আছেন তিনি কি চিনবেন আপনাকে?''

খোকনবাবু বললেন, ''চিনবেন না মানে? মাত্র একমাস আগে আমি ওই বাড়িতে এসে এক রাত কাটিয়ে গেছি, এত তাড়াতাড়ি ভুল হবে কী করে? আমি এসেছিলাম দাদামণিকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে কাশীতে নিয়ে যাব বলে। তা ওই মহিলার চক্রান্তেই সেটা হল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই মহিলাই সম্পত্তির লোভে খুন করিয়েছেন আমার দাদামণিকে।''

''কী এমন সম্পত্তি ছিল যে, তার লোভে মহিলা ওই কাজ করতে যাবেন?''

"কী ছিল না? সাড়ে তিন লাখ টাকার ইন্দিরা বিকাশ। দু'লাখ টাকার 'কিষাণ বিকাশ', 'জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট'। ব্যাঙ্কে এফ.ডি.-তে লক্ষাধিক টাকা আর ছিল প্রচুর সোনার গয়না। ওই মহিলা সবকিছুরই সন্ধান জানেন। তা ছাড়া দোতলা ওই বাড়িটার দামও নেহাত কম নয়!"

আমি বিস্মিত হওয়ার ভান করে বললাম, "ওরে বাবা, আপনি মাত্র এক রাত ওই বাড়িতে থেকেই সবকিছু জানতে পেরেছেন?"

"আসলে উনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই বিশ্বাস করে এ-কথা আমাকে বলেছিলেন, এবং এও বলেছিলেন শিগ্‌গিরই উনি এইসবই আমার নামে উইল করে দেবেন। এ-কথা জানতে পেরেই ওই মহিলা এই সর্বনাশটি ঘটিয়েছেন।"

"সর্বনাশ যে কে কীভাবে ঘটাল তা ভগবানই জানেন। কিন্তু রজনীবাবু ওরফে খোকনবাবু, ওঁর ডায়েরি যে অন্য কথা বলছে। আপনার কথার সঙ্গে তো তা মিলছে না।"

"কী লিখেছেন উনি ডায়েরিতে?"

"সে-কথা নাই-বা জানলেন!" বলে একটুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললাম, "জাস্ট এ মিনিট। ছেলেটাকে একটু চা করতে বলে আসি।" বলে উঠে গিয়ে রাখহরিকে যা করতে হবে তা বুঝিয়ে দিলাম।

ও ঘাড় নেড়ে ওর কর্তব্যপালনে চলে গেল।

আমি আবার ঘরে এসে ওদের সামনে বসে বললাম, "বোসবাবুর মৃত্যুসংবাদটা আপনারা কীভাবে পেলেন?"

খোকনবাবু বললেন, "কেন, খবরের কাগজ মারফত পেয়েছি।"

"আপনি এখন থাকেন কোথায়?"

"বেনারসেই থাকি।"

"ওরে বাবা, আজকের কাগজে খবর পেয়ে আজই চলে এলেন?"

"না, না, আমি খবরটা পাই শিবকুমারের মারফত। ও-ই আমাকে ভোরবেলা ফোনে জানায়। আমি তখনই পূর্বা এক্সপ্রেস ধরে চলে আসি।"

"আজকের কাগজ তো ছ'টার পরে বেরিয়েছিল। আর বারাণসীতে পূর্বা এক্সপ্রেস ছাড়ে ভোর পাঁচটা দশে। এটা কী করে সম্ভব হল?"

"আসলে ট্রেনটা আজ এক ঘণ্টা লেট ছিল কিনা?"

"বুঝলাম। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার। আজ তো পূর্বা এক্সপ্রেস বারাণসী দিয়ে আসে না।"

"তা হলে কি বলতে চান আমি মিথ্যে কথা বলছি?"

"না, না, তা কেন? আমারও ভুল হতে পারে। কিন্তু আমি যে এই ঘটনার তদন্ত করছি এ-কথা আপনাদের কে বলল?"

খোকনবাবু গদগদ হয়ে বললেন, "বাবা, কাল থেকে সবার মুখেই আপনার নাম। সবাই বলছে অম্বর চ্যাটার্জি যখন তদন্ত করছে খুনি তখন ধরা পড়বেই।"

"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ভাই। আজকের ভোরে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সুদূর বারাণসী থেকে এই সবে এখানে এসে পৌঁছলেন আপনি, অথচ কাল সকাল থেকেই এই খুনের তদন্ত আমি করছি বলে আপনি জেনে গেছেন!"

শিবকুমার বলল, "ও-কথা আমিই বলেছি ওকে।"

"আপনিও তো মশাই আজই কাগজ পড়ে জেনেছেন খবরটা। এখানে 'কাল' আসে কোত্থেকে?"

শিবকুমার চুপ করে গেল।

আমি খোকনবাবুকে প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি ট্রেন থেকে নেমেই সোজা এখানে আসছেন?"

"হ্যাঁ।"

"ওরে বাবা, পূর্বা এক্সপ্রেস দেখছি আজকাল বিমানেরও আগে আসে। যাক, স্টেশন থেকে কিসে এলেন? হেলিকপ্টারে?"

"আপনি কি আমাদের বিদ্রূপ করছেন? আমরা আমাদের স্কুটারে এসেছি।"

"আপনার জিনিসপত্র?'"

"কিছুই আনিনি সঙ্গে।"

"বন্ধু নিশ্চয়ই আপনাকে এখানে নিয়ে আসবার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন?"

"ঠিক তাই।"

এবার একটু যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল শিবকুমার। বলল, "শুনুন মিঃ চ্যাটার্জি, আমার বন্ধুটি সবে ট্রেন থেকে নেমেছেন। এখন ওঁর একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। আপনার সঙ্গে পরিচয়পর্বটা সারা হয়ে গেল। আমরা কাল সকালে দেখা করব আপনার সঙ্গে। আজ তা হলে আসি, কেমন?"

"সে কী! আপনাদের জন্য চা করতে বললাম যে!"

"মাফ করবেন। আমরা কেউই চা খাই না।"

"তা হলে আমি যখন চায়ের কথা বললাম তখন আপনারা না করলেন না কেন?"

ওরা দু'জনেই তখন যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

আমি গলার স্বর কঠিন করে বললাম, "এখন কিন্তু আপনারা যেতে পারবেন না। তার কারণ, যে-রাতে বোসবাবু খুন হন সে-রাতে উনি কিছুমাত্র লিখে যেতে না পারলেও ওঁর হাতের মুঠোয় আমরা একগোছা রজনীগন্ধা পেয়েছি। তাতেই বুঝেছি রজনী নামের কারও কথা উনি মরণকালে বলতে চেয়েছিলেন। আর এখন এই ঘরেও একজন রজনী আছেন। তিনি এমন এক রজনী যিনি এক মাস আগে ওঁর সঙ্গে দেখা করে ওঁর নাড়িনক্ষত্র জেনেছেন এবং যাঁকে উনি পছন্দ করেননি। গত রাতে খুনি যখন খুন করে পালায় তখন আমাদেরই পরিচিত একজন লোক খুব কাছ থেকেই তাকে দেখে ফেলে। তারও দেওয়া বিবৃতির সঙ্গে এই রজনীর চেহারার জুতসই একটা মিল আছে। কাল রাতে খুনি পালাবার সময় একটা ভটভটি অর্থাৎ মোটরবাইক কিংবা স্কুটারে চেপে পালায়। আজ আপনারাও একটি স্কুটারে চেপেই এখানে এসেছেন।"

খোকনবাবু ও শিবকুমারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

খোকনবাবু বললেন, "এর দ্বারা কি প্রমাণ হয় আমিই খুনি?"

"ইয়েস। নাউ ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।" বলতে-বলতেই হাতে হাতকড়া নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিঃ ত্রিবেদী। সঙ্গে আরও পুলিশ। এমনকী সেই সুবল বাগও।

সে রজনীকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "এই, এই তো সেই লোক। একেই আমি দেখেছি

কাল।''

ত্রিবেদী বললেন, ''একজনকে খুনের অপরাধে এবং অন্যজনকে খুনিকে সাহায্য করার অপরাধে গ্রেফতার করা হল।''

রাখহরি তখন দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। আমার নির্দেশে সে-ই গিয়ে পুলিশে খবর দিয়েছিল।

আমি তখন খোকনবাবুকে বললাম, ''কী রজনীবাবু, এই ব্যাপারে আর কিছু আপনার বলবার আছে?''

ক্লান্ত রজনী মাথা নত করে ঘাড় নাড়লেন।

''তা হলে আপনার অপরাধ আপনি স্বীকার করছেন তো?''

রজনীকান্ত অশ্রুসজল চোখে বলল, ''হ্যাঁ। আমিই খুনি।''

শিবকুমারের দু'চোখে তখন আগুন জ্বলছে।

বন্দি কিশোর

ছোটখাটো একটা তদন্তের কাজ সেরে যখন বাড়ি ফিরলাম রাত তখন দশটা। রাখহরি আরাম কেদারায় বসে রঙিন টিভিতে দারুণ একটা হিন্দি ছবি দেখছিল। ওর পাশেই বসেছিলেন অপরিচিতা এক ভদ্রমহিলা। মধ্যবয়সী এবং সুন্দরী।

আমি ভেতরে আসতেই ভদ্রমহিলা সঙ্কুচিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, ''আপনি?''

ভদ্রমহিলার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল।

রাখহরি বলল, ''উনি আজ আমাদের অতিথি। কোনও একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছেন। আগে আপনি জামাকাপড় ছেড়ে একটু বিশ্রাম নিন। পরে সব শুনবেন।''

আমি আর কথা না বাড়িয়ে ভদ্রমহিলার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে আমার ঘরে গেলাম। তারপর পোশাক পরিবর্তন করে বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে টিভির সামনে এসে বসলাম।

ছায়াছবির উত্তেজক দৃশ্য তখন রমরমিয়ে চলছে। সেদিকে তাকিয়ে আমারও দম যেন বন্ধ হয়ে এল। রাখহরি তো চোখ দিয়ে গিলতে লাগল দৃশ্যগুলো। একটু পরে অ্যাড শুরু হতেই তাল কেটে গেল সকলের।

আমার টিভি দেখার নেশা খুব একটা নেই। সময়ও খুব কম। রাখহরির জন্যই বলতে গেলে বাড়িতে টিভি রাখা। বিশেষ করে ওর জেদাজিদিতেই কেব্‌ল লাইন নেওয়া। তারই ফলে হেন কিছু নেই যা ও দেখে না। এরই ফাঁকে মন দিয়ে পড়াশোনাও করে। প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে মাধ্যমিকটাও পাশ তো করল ও। সেইসঙ্গে চলে প্রচুর গল্পের বই পড়া। দূরদর্শন আর যাই করুক রাখহরির বইপড়ার নেশাকে কিন্তু কাটিয়ে দিতে পারেনি। এই নিয়ে একদিন ওকে প্রশ্ন করেছিলাম, ''হ্যাঁরে, সবাই যে বলে দূরদর্শন হয়ে বই বিক্রি কমেছে। পাঠক সরে গেছে বইয়ের জগৎ থেকে কিন্তু তোকে দেখে তো তা হয়েছে বলে

মনে হয় না, ব্যাপারটা কী?" ও তৎক্ষণাৎ হেসে জবাব দিয়েছিল, "ব্যাপার কিছুই না। এই তো সেদিন আপনি আমাকে একটা জেমস হ্যাডলি চেজের বই এনে দিয়েছিলেন। তা বইটা পড়তে পড়তে আমাব মধ্যে আমি আছি বলেই মনে হচ্ছিল না, দূরদর্শন তো দূরের কথা। আসল কথা কী জানেন? নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ হয়। লেখকরা লিখতে পারবেন না দায় চাপাবেন দূরদর্শনের ঘাড়ে। জমিয়ে গল্প লেখার মতো কলম এখন কজনের আছে?"

অ্যাড শেষ হতেই ছবি আবার শুরু হল। এ সময় একটি সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, "আপনার চা।"

আমি বেশি রাতেও চা খেয়ে থাকি। তার ওপর আজ আমি ভয়ানক টায়ার্ড। তাই হাত পেতে প্লেট সমেত চায়ের কাপটা নিলাম।

রাখহরি বলল, "চা-টা দিদিই করেছেন। আজকের রান্নাবান্না সবই করেছেন উনি।"

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, "বাঃ, বেশ ভালই তো করেছেন উনি। তা উনি কী জন্য এসেছেন সেটা তো এবার জানা দরকার।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "ব্যস্ত হচ্ছেন কেন দাদা, আপনি সারাটা দিন বাইরে কাটিয়ে এলেন। একটু সুস্থ হন। পরে সব বলব।"

আমি আর কথা না বাড়িয়ে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ছাদে গেলাম। মাঝে মধ্যে মনে কোনও জটিল চিন্তাভাবনার ছায়া পড়লে আমি ছাদে গিয়ে পায়চারি করি। আর বলতে নেই, তখনই আমার সকল মুশকিলের আসন হয়ে যায়। ছাদে উঠে প্রথমেই আমি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। আমার নিজের হাতে সাজানো বাগান এখন নানান ফুলে ভরে আছে। সারা আকাশ ভরে আছে অসংখ্য নক্ষত্রমালায়। আমি ভদ্রমহিলার কথা চিন্তা করতে লাগলাম। কে উনি? বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। তবু যেন পূর্ণ যুবতী। সুন্দর মুখশ্রী মিষ্টি হাসিতে ভরা। আমার কাছে কী এমন প্রত্যাশা নিয়ে ছুটে এসেছেন উনি? ওই মহিলার ব্যাপারে রাখহরিই বা এতটা দুর্বল কেন? সে তো জানে আমার এখানে দুটিমাত্র ঘর। তার একটিতে আমি থাকি, অপরটিতে রাখহরি। একপাশে রান্নাঘর ও বাথরুম সংলগ্ন প্রশস্ত দালান। এবং সেটাই আমার আড্ডা, আলোচনা, টিভি দেখা ও খাওয়ার জায়গা। এই ব্যবস্থাপনায় একজন অনাত্মীয়া ভদ্রমহিলাকে ও আশ্রয় দেবে কোথায়? তবে কিনা ওটা রাখহরির ব্যাপার। ওর প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। ও আমার মন মেজাজ এবং রুচির সঙ্গে পরিচিত। ও যখন মহিলাকে গ্রহণ করেছে তখন নিশ্চয়ই আগাগোড়া সবকিছু শুনেছে ও। যাই হোক, সময়মতো ধীরে সুস্থে শোনাই যাক না ব্যাপারটা কী।

আমি যখন মনে মনে এইসব ভাবছি ঠিক তখনই সিঁড়ির দরজার কাছে এসে রাখহরি ডাকল, "দাদাবাবু, নীচে আসুন। অনেক রাত হল। খেয়ে নিন এবার।"

আমি ধীর পায়ে নীচে এলাম। এসে দেখলাম ভদ্রমহিলা বেশ পরিপাটি করে খাবার সাজিয়ে খাবারের প্লেটগুলি এক এক করে নামিয়ে রাখছেন টেবিলের ওপর। লুচি, আলুভাজা, আলু-পটলের দম, ছোলার ডাল আর সিমুইয়ের পায়েস।

অনেকদিন এমন সব উপাদেয় ঘরোয়া রান্না খাইনি, তাই খাবার দেখে জিভে জল এসে গেল। আমাদের রোজের মেনু হয় মাংস ভাত, নয় তো ডিমের ঝোল। বর্ষায় ও শীতে খিচুড়িও হয়। লুচি পরোটা হয় কালেভদ্রে।

যাই হোক, রাখহরি আমি দুজনেই খেতে বসলাম। বুঝলাম রান্নার ব্যাপারে রাখহরির আজ একেবারেই ছুটি।

আমরা খেতে বসলে আমিই বললাম ভদ্রমহিলাকে, "মোটে তো আমরা তিনজন। তা আপনি বা বাদ থাকেন কেন? বসে পড়ুন আমাদের সঙ্গে। কথা বলতে বলতেই খাওয়া যাবে।"

ভদ্রমহিলা তাঁর সুন্দর মুখে ম্লান হেসে বললেন, "আজ আমার একাদশী।"

একাদশী! চমকে উঠলাম শুনে। উনি কি বিধবা? ভাল একটি রঙিন তাঁতের শাড়ি পরে থাকার জন্য তা বলে মনে হয় না। অবশ্য এই বয়সের মহিলারা আত্মীয়স্বজনদের আপত্তিতে কেউই বিধবার সাজে সাজেন না আজকাল। আমি বললাম, "একাদশীর দিন আপনি কিছু খান না বুঝি?"

উনি ঘাড় নাড়লেন।

মনে অত্যন্ত ব্যথা পেলাম। বললাম, "সারাটা দিন নিজে উপবাসী থেকে এইভাবে এত রান্নাবান্না কেন করতে গেলেন আমাদের জন্য? তা ছাড়া কেন এইভাবে নিজেকে কষ্ট দেন? এমন কিছু বয়স তো নয় আপনার?"

"এতে আমি কষ্ট পাই না দাদা। এত দুঃখ, এত কষ্ট আমি পেয়েছি যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব কিছুরই ঊর্ধ্বে এখন আমি।"

আমরা ঘাড় হেঁট করে খাওয়া শুরু করলাম। উনি আমাদের দুজনকে বেশ তৃপ্তি করেই খাওয়ালেন।

আমি ওঁর রান্নার প্রশংসা করে বললাম, "আপনি কি এবার একটু সময় করে বলবেন কেন আপনি এখানে এসেছেন?"

"হ্যাঁ, এবার বলব। আগে আপনার খাওয়া শেষ হোক।"

আহারাদির পর্ব একসময় শেষ হল।

আমি মুখ হাত ধুয়ে আরামকেদারায় হেলান দিয়ে ভদ্রমহিলার মুখোমুখি বসে বললাম, "এইবার বলুন, আপনি কে? কেন এবং কী জন্য এখানে এসেছেন? বাড়ি কোথায় আপনার?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "আমি আসছি বর্ধমান থেকে। আমার স্বামী ওখানকার একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন। বীরহাটায় সুন্দর একটি দোতলা বাড়ি আমাকে উপহার দিয়ে ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি। আমাদের বাড়ির নাম স্বপ্ননীড়।" বলে সুদর্শন একটি কিশোরের ছবি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এই আমাদের একমাত্র সন্তান। স্বপ্ননীড়ের স্বপ্ন। ডাক নাম বুবাই। ভাল নাম রাজা। রাজা মুখার্জি। এর ফাঁসির আদেশ হয়েছে। আজ থেকে ঠিক পনেরো দিন পরে...।" বলেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন ভদ্রমহিলা।

আমিও অবাক হয়ে গেলাম শুনে। কতই বা বয়স ছেলেটির, আঠারো কি কুড়ি। এই বয়সের ছেলের গলায় কেন ফাঁসির দড়ি! কী এমন অপরাধ?

ভদ্রমহিলা কান্নায় ভেঙে পড়েই বললেন, "মা হয়ে ছেলের মরণ আমি কী করে দেখব? আপনি কি পারেন না ফাঁসির মঞ্চ থেকে আমার বুবাইকে তুলে এনে আমার বুকে ফিরিয়ে দিতে?"

"ওর অপরাধ?"

"ও নিজে হাতে তিন তিনটে খুন করেছে। ও অবশ্য তিনটে খুনের কথা স্বীকার করে না, তবে একটা খুন যে করেছে তা ও নিজেই স্বীকার করে। তবে আইনের চোখে ও তিনটে খুনের দায়েই অভিযুক্ত এবং অভিযোগ প্রমাণিত।"

আমি বললাম, "তা হলে তো ওকে বাঁচানো অসম্ভব।"

ভদ্রমহিলা আমার দুটি পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বললেন, "আপনি শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর জীবন রক্ষা করুন দাদা। আমি কথা দিলাম, ওকে নিয়ে আমি এই দেশ ছেড়ে দূরে বহুদূরে কোথাও চলে যাব।"

"তা হলে শুনুন, আমার কাজ হল নানা রকমের ফাঁদ পেতে কৌশলে বুদ্ধি খাটিয়ে অপরাধীকে ধরে তাকে আইনের হাতে তুলে দেওয়া। তাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়।"

"বুঝলাম। কিন্তু ওর বয়সটার কথা একবার চিন্তা করুন।"

আমি আর একবার তাকিয়ে দেখলাম ছবির কিশোরকে। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হার মানল। এমন নিষ্পাপ সুন্দর মুখ আমি খুব কমই দেখেছি। এই ছেলে কখনও কোনও অবস্থাতেই খুন করতে পারে না। তবু এর ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত। সে নিজেও স্বীকার করেছে। এমনকী আদালতের রায়ও বেরিয়ে গেছে। ভদ্রমহিলাকে আমি কথা দিলাম, "আই মাস্ট ডু ফর হিম। তবে এর জন্য আপনাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে। এক আদালত থেকে আর এক আদালতে যেতে হবে। তাতে করে মৃত্যুদণ্ড হয়তো রহিত হবে, তবে কিনা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতেই হবে ওকে। অর্থাৎ আপনি যা চাইছেন তা হবে না, একেবারে ছাড়া ও পাবে না কিছুতেই। শুধু ওর প্রাণটুকুই যা রক্ষা করা যাবে।"

ভদ্রমহিলা আঁচলে চোখের জল মুছে বললেন, "বেশ, তবে তাই করুন।"

"বারো বছর পরে অবশ্য আপনি আবার ফিরে পাবেন আপনার ছেলেকে। তার আগে কিন্তু নয়।"

ভদ্রমহিলা আশার আলো দেখে বললেন, "তবে তাই করুন দাদা। বারোটা বছর দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। এই ক'বছর যেখানে যেভাবেই থাকি না কেন আমি ওরই পথ চেয়ে দিন গুনব।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "সে কী! ছেলের শোকে যেখানে সেখানেই বা থাকবেন কেন আপনি? আপনার স্বপ্ননীড়ে ফিরে যাবেন না?"

ভদ্রমহিলা ডুকরে কেঁদে বললেন, "না। ওখানে ফিরে যাবার মুখ আমার নেই। এখন আমি কসবায় আমার বোনের বাড়িতে আছি। সেখানেও বেশিদিন থাকতে পারব না। তার কারণ সব জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর ওদের বাড়ির লোকরাও আমাকে পছন্দ করছেন না। ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করে আমি কনখলে আমার গুরুদেবের আশ্রমে চলে যাব।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম,"অমন সুন্দর এক কিশোরের বুকে খুনের অভিপ্রায় কী করে চাপল? হঠাৎ কোনও উত্তেজনার বশেই কী?"

ভদ্রমহিলা দীপ্তকণ্ঠে বললেন, "না। ছেলেটা আমার বিপথগামী হয়েছিল। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবেই এই কাজ করেছে ও। ও তো একা নয়, ওর বন্ধুরাও ছিল। তাদের কেউ পলাতক। কেউ মৃত।"

"বলেন কী?"

"হ্যাঁ। আমরা স্বামী যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন সেই ব্যাঙ্কেই ডাকাতি করেছে ওরা। ম্যানেজারকে গুলি করে সাত লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। পরে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে...। বাকিটা আর না-ই বা শুনলেন। এরপর ওই স্বপ্ননীড় আমার কাছে দুঃস্বপ্নের নীড় হয়ে উঠল। লজ্জায় লোকের কাছে মুখ দেখাতে না পেরে পালিয়ে এলাম বোনের বাড়ি। কিন্তু এখানেই বা আমার শান্তি কোথায়? সবার চোখেই তো ঘৃণা আর ঘৃণা।"

"আপনার স্বামী কতদিন আগে মারা গেছেন?"

"ঠিক দশ বছর আগে। এই দশটা বছর ধরে বুকে করে ওকে মানুষ করলাম। লেখাপড়া শেখালাম। এইচ.এস. পাশ করল। কিন্তু কীভাবে যে রসাতলে গেল ছেলেটা তা ভেবেও পেলাম না। অনেক চেষ্টা করেছিলাম বদসঙ্গ থেকে ওকে সরিয়ে আনবার, পারিনি। শেষ পর্যন্ত এমন একটা কাণ্ড যে ও করে বসবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। ওই ব্যাঙ্কেই আমাদের সঞ্চিত সব টাকা। অথচ লজ্জায় সেই টাকা আমি তুলতে পর্যন্ত যেতে পারছি না। তা ছাড়া গেলেই বা আমার টাকা ওরা আমাকে দেবে কেন বলুন?"

"ওই ব্যাঙ্কে আপনার কত টাকা আছে?"

"আমার স্বামীর উপার্জনের সব টাকাই। প্রায় পাঁচ লাখ।"

"ও টাকার আশা আপনি ছেড়েই দিন।"

"লকারে আছে পঁচিশ ভরি সোনা।"

"সেও মনে করুন খরচের খাতায়।"

"এখন আমি নিঃস্ব। পথের ভিখারি। ওই দুঃস্বপ্নের নীড়কে আমি বিক্রি করেই কোনওরকমে জীবন ধারণ করব এবার। কাজেই ওই বাড়ির ওপর আমার আর অধিকার কিসের বলুন?"

কথায় কথায় রাত বারোটা।

শুতে যাবার আগে ভদ্রমহিলাকে বললাম, "আমার খবর আপনি পেলেন কার কাছ থেকে?"

"আমার বোন সুজাতা আমাকে আপনার খবর দিল। ও কোনও একটা বই পড়ে আপনার ব্যাপারে জেনেছিল। যেভাবে আপনি রাখহরিকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে টেনে এনেছিলেন...।"

"সেটা সম্ভব হয়েছিল ও সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলে। কিন্তু আপনার ছেলের ব্যাপারটা তো তা নয়। একে রক্ষা করাও একটা সামাজিক অপরাধ। যাই হোক, আপনি ওর মা। আপনাকে এসব কথা বলে অযথা আপনার দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবু টিনএজারদের ব্যাপার তো। দেখা যাক, কিছু যদি করতে পারি।"

রাখহরি ভদ্রমহিলাকে ওর ঘরটি ছেড়ে দিল। সে ঘরও ঘরের মতো ঘর নয়। তবু মহিলাকে ওর ঘরে ঢুকিয়ে নিজে শুয়ে পড়ল দালানে। আমি আমার ঘরে গিয়ে শয্যাগ্রহণ করলাম।

পরদিন খুব ভোরে উঠে বাগানে পায়চারি করতে করতে ভদ্রমহিলার ছেলের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম।

এমন সময় রাখহরি এসে চা দিয়ে গেল। মর্নিং টি। আমি চা খেতে খেতে আরও দু'একবার পায়চারি করে ঘরে এসে রণেন্দুর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলাম। আমার পরামর্শদাতা এবং উকিল বন্ধু রণেন্দু সততার প্রতীক। সে কারণে ক্ষমতাও ওর অনেক। আমার মুখের সব কথা শোনার পর ও বলল, "আইনের লড়াই আমি লড়ব। ছেলেটির মাকে একটি কথাই শুধু বলে দাও, আমাদের কাছে ভদ্রমহিলা যখন এসে পড়েছেন তখন ফাঁসির দড়ি ওর ছেলের গলায় কিছুতেই পড়বে না।"

"ব্যস। এই কথাটাই আমি শুনতে চাইছিলাম তোমার মুখ থেকে।"

রণেন্দুর সঙ্গে কথা বলার পর আমি বাইরে দালানে আসতেই ভদ্রমহিলা করুণ মুখ নিয়ে এগিয়ে এলেন আমার দিকে।

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কিছু কি বলবেন?"

ভদ্রমহিলা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "আমি তা হলে...।'

"আসুন। ইতিমধ্যে আমি আপনার ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার মুখ থেকেও কিছু শুনি। আপনি আরও কয়েকটা দিন একটু কষ্ট করে অপমান সহ্য করেও আপনার বোনের বাড়িতেই থাকুন। পরে যা হয় একটা সিদ্ধান্ত নেবেন।"

'ইতিমধ্যে কাল রাত্রে নিজের মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে আমি আর একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি দাদা।"

"কীরকম তবু শুনি।"

"ওই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার খুন হওয়াটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমার ছেলে দলে ছিল। কিন্তু ম্যানেজারকে খুন ও করেনি। এটা ওখানকার সবাই জানে। যেহেতু দলের অন্যান্যরা কেউ মৃত কেউ পলাতক, ফলে ধৃত আমার ছেলের ওপরই ওই অপহৃত সাত লক্ষ টাকার দায়ভারটা চেপে যায়। তাই আমি ঠিক করেছি ওই ব্যাঙ্কে আমার যা টাকা আছে তা লিখিতভাবেই ব্যাঙ্ককে অধিগ্রহণ করার অনুমতি দেব। আর বাকি টাকা শোধ করব স্বপ্ননীড় বিক্রি করে। তারপর লকারের গয়নাগুলো বেচে আর বাড়ি বিক্রির অবশিষ্ট টাকায় দূরে কোথাও গিয়ে আমার দিন গুজরান করব আমি।"

সব শুনে আমি বললাম, "এর চেয়ে চমৎকার সিদ্ধান্ত আর হয় না। তবে কিনা এসবই আপনি করবেন আমার উকিল বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে। এখনই হুট করে আপনি কোনও কিছু করতে যাবেন না। আর সর্বশেষ কথা, আপনার ছেলে অপরাধী। আপনি তো নন? তাহলে অযথা এত বেশি ভেঙে পড়ছেন কেন? ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে মাথা উঁচু করে চলাফেরা করুন। শুধু মনে করবেন অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট।"

ভদ্রমহিলা বিদায় নিলেন।

একটু বেলায় স্নান খাওয়া সেরে আমিও গেলাম ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে।

জেলারের অনুমতি নিয়ে কয়েদির সঙ্গে দেখা করতে গোয়েন্দা পুলিশের খুব একটা অসুবিধে হয় না। আমারও তাই হল না।

খুনি কিশোর আমাকে দেখেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। ওর কান্না দেখে আমার চোখেই জল এসে গেল হঠাৎ। আমি ছেলেটির চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তোমাকে এমন সুন্দর দেখতে, কত ভাল ঘরের ছেলে তুমি, তা তোমার হঠাৎ এমন দুর্মতি হল কেন?"

"আপনি কি গোয়েন্দা অম্বর চ্যাটার্জি?"

"কী করে জানলে?"

"আমার মাসিমণি কসবায় থাকেন। কাল উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। উনিই বললেন, আমার ব্যাপারে একমাত্র আপনি নাকি কিছু করতে পারেন। মাসিমণির মুখে শুনে মা নিশ্চয়ই যোগাযোগ করেছেন আপনার সঙ্গে?"

"তোমার ধারণাই ঠিক। কিন্তু বুবাই...।"

'রাজা মুখার্জী।"

"একই ব্যাপার। তোমার হয়ে কিছু করা যে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।"

বুবাই আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, "প্লিজ, একটা কিছু করুন আপনি আমার জন্য। আমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হওয়ার পর আমি বুঝতে পারছি জীবন কত মহান। জীবন কত সুন্দর। তাই আমি নতুন করে বাঁচতে চাই। আমি কথা দিচ্ছি, একবার আমি মুক্তি পেলে এমন কাজ আর কখনও করব না।"

"সবই তো বুঝলাম। কিন্তু তিন-তিনটে খুনের আসামীকে আমি মুক্তি পাওয়াব কী করে? তুমি মুক্তি পেলে হয়তো জীবনে তুমি সত্যিকারের একজন ভালমানুষ হবে। কিন্তু আইন তো তা মানবে না। শুনতেও চাইবে না সে কথা। তবে আমি চেষ্টা করব তোমার ফাঁসির আদেশ যাতে রোধ করা যায়। এখন বল, কীসের মোহে তুমি এ-কাজ করলে?"

বুবাই বলল, "তা হলে শুনুন। তিনটে খুন আমি করিনি। আমি খুন করেছিলাম আমাদের পালের গোদাটাকে। ওর নাম জটাশঙ্কর সাহানি। ছোটবেলা থেকেই বদসঙ্গে মিশে আমি খারাপ হই। আমার সঙ্গে মিশেও অনেকে খারাপ হয়। আসলে বাবা না থাকায় মায়ের আদরে আমি বাঁদর হয়েছিলাম। ওই জটাশঙ্করের হয়ে আমরা অনেক অসামাজিক কাজকর্ম করতাম। হিস্যাও পেতাম ভাল। একবার আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম, এইসব ধান্দাবাজি ছেড়ে আমরা ফিল্মস্টার হব। কিন্তু কে আমাদের সুযোগ দেবে সিনেমায় নামার? কথাটা ওস্তাদের কানে গেল। পীর বাহারামের কাছে ওর ডেরা। ছেলেমেয়ে চুরির ব্যাপারে একজন পেশাদার বদমাশ ও। বলল, "নিজেদের টাকায় ছবি করতে না পারলে তোদের যা উদ্দেশ্য তা কখনও সফল হবে না। আমায় যদি হাফ হাফ বখরা দিতে পারিস তা হলে আমিই তোদের পথ বাৎলে দিতে পারি।" আমরা তো 'গুরু গুরু' করে উঠলাম। আমরা মানে নেলো, কেলো, ফটিক, রতন, রঘু আর কানাই। আমরা সবাই মিলে জটাশঙ্করকে চাপ দিতেই ব্যাঙ্ক ডাকাতির পরিকল্পনা ও মাথায় ঢোকাল। এইরকম একটা দুর্বুদ্ধি ওর মাথায় চেপেছিল অনেকদিন আগেই কিন্তু আমাদের সহযোগীতা পাচ্ছিল না বলে করছিল না। এখন আমি বেঁকে দাঁড়ালেও দলের আর সবাই একমত হল। আমার ভূমিকা ছিল ব্যাঙ্কের পেছনদিকের একটি মাঠে স্কুটার নিয়ে অপেক্ষা করার। ডাকাতির টাকাটা ওরা পলিব্যাগে মুড়ে ওপর থেকে ফেলে দিলেই আমার সেটা নিয়ে পালাবার কথা। ওই টাকাটা লুকিয়ে রাখার নির্দেশ ছিল শের আফগানের সমাধির পেছনে একটা ভাঙা মসজিদের সংলগ্ন শেয়ালের গর্তে। ধূর্ত জটাশঙ্করকে আমি চিনতাম। তাই স্থিরই করেছিলাম টাকাটা আমি আমার জিম্মাতেই অন্যত্র সরিয়ে রাখব। তবে এই ডাকাতি করার আগে আমরা সবাই বার বার বলে দিয়েছিলাম খুনখারাপির রাস্তায় আমরা কেউ যাব না। সেই অনুযায়ী ব্লু-প্রিন্টও আমরা তৈরি করেছিলাম। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তা হল না। আমার বন্ধুরা যখন অপারেশন শুরু

করতে খেলনা পিস্তল নিয়ে হইহই করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জটাশঙ্কর তখন ছদ্মবেশে হাজির ছিল আমানতকারীদের দলে। ওরা যখন লুটের মাল জটাশঙ্করের হাতে তুলে দেয় ও তখন সব টাকা আত্মসাৎ করে পালাবার ধান্দা করে। আর তখনই নিজেকে আরও বেশি নিরাপদ করার জন্য গুলি করে ম্যানেজারকে। বেগতিক দেখে আমি তখন একটু দূরে গিয়ে ওৎ পেতে থাকি। ওপর থেকে টাকা তো পড়লই না, উপরন্তু জটাশঙ্করকে দেখি ব্যাগ কাঁধে দৌড়তে। আমার বন্ধুরাও তখন ধাওয়া করে ওকে। আমিও দূর থেকে ওদের অনুসরণ করি। রাস্তার লোকও তখন মারমুখী হয়ে ছুটে যায়। কিন্তু ক্ষিপ্ত জটাশঙ্কর সেদিকে তাগ করে গুলি চালাতেই কুত্তার মতো ভেগে পালায় সব। ধরা পডার ভয়ে আমার অন্যান্য বন্ধুরাও গা ঢাকা দেয়। শুধু নেলো আর কেলো জটাশঙ্করের পিছু ছাড়ে না। পরিণামে ওরই বুলেটে ঝাঁঝরা হতে হল ওদের। বাকি রইলাম আমি। স্কুটারকে এক জায়গায় রেখে জটাশঙ্করের পিছু নিয়ে একটি নির্জন জায়গায় ওর হাত থেকে ওরই রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে তাগ করলাম ওর দিকে। বললাম, "শয়তানের বাচ্চা। এই ছিল তোর মনে? নে এবার বিশ্বাসঘাতকতার পরিণামটা কী দেখ। বলেই ট্রিগারে চাপ দিয়ে খতম করে দিলাম ওর খেল। বান্ডিলে টাকা যে কত ছিল তা আর গুনে দেখার সময় ছিল না। ওই টাকা নিয়েই আমি ছুটলাম। একটি ছেলে সাইকেলে চেপে কোথায় কেন যাচ্ছিল, তাকে সাইকেল থেকে জোর করে নামিয়ে তাতে চেপেই সদরঘাটের দিকে চললাম। আমার স্কুটার যেখানে রেখে আমি জটাশঙ্করকে ধাওয়া করেছিলাম সেখানে আর যাবার উপায় ছিল না। তাই এই কাজ করলাম। আমি ধরা পড়বই বা পড়ে গেছি এটা বুঝে নিয়েই মরিয়া হয়ে উঠলাম। পরিকল্পনামতো আমার নিজস্ব স্থানেই টাকাগুলোকে লুকিয়ে ফেললাম। তারপর পালাতে গিয়েই পুলিশের তাড়া। ওরা যে কীভাবে টের পেল তা ভগবান জানে। আমি প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছুটে গিয়ে দামোদরে ঝাপ দিলাম। ওই দিন নদীতে জল ছাড়া হয়েছিল, তাই ভালই জল ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাকে রক্ষা করতে পারল না। মাঝিরাই আমাকে জল থেকে তুলে ধরিয়ে দিল পুলিশের হাতে। আমি আমার অপরাধ কবুল করলাম। পুলিশ তিনটে খুনের দায়ই আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল বলে আমি টাকার কথা কবুল করলাম না। বললাম, জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার সময় নদীর স্রোতে সে টাকা কোথায় যেন ভেসে গেছে।"

বুবাই-এর অকপট স্বীকৃতি বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হল। ব্যাপারটাকে এবার আমি একটু হালকা করে বোঝবার চেষ্টা করলাম। প্রথমত টিনএজারদের ব্যাপার। দ্বিতীয়ত ব্যাঙ্ক ডাকাতির পরিকল্পনা এক ধূর্ত ধুরন্ধরের। তৃতীয়ত খুনের মোটিভ ওদের ছিলই না। অতএব এ অপরাধ আর যেমনই হোক, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার নয়। কিন্তু এসব কথা এখন আমি বোঝাব কাকে? তবুও রণেন্দুর সাহায্য নিয়ে নতুন করে আপিল করা ছাড়া আর কোনও পথ নেই।

যাই হোক, ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন সবে কয়েক পা এসেছি ঠিক তখনই জেলখানার এক পুরনো কর্মচারী দুলিয়াজানের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। বললাম. "কেমন আছো দুলিয়া?"

মাছের আঁশের মতো ঘোলাটে চোখ তুলে দুলিয়াজান বলল, "আমার আর থাকা। বড় কষ্টে আছি বাবু। আপনি কেমন আছেন?"

"আমি তো ভালই। তোমার চাকরি আর কতদিন?"

"এখনও দু'বছর। বয়স কমিয়ে চাকরিতে ঢুকেছিলাম তাই। না হলে কবে রিটায়ার হয়ে যেতাম।"

"তোমার ছেলে এখন কী করছে?"

ছেলের কথায় ডুকরে কেঁদে উঠল দুলিয়াজান। বলল, "তার কথা আর বলবেন না বাবু। ওর সব আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। শক্ত সমর্থ জোয়ান ছেলে। কী যে হল, দিনে দিনে ফুলে ঢোল হয়ে গেল ছেলেটা। কত ডাক্তার দেখালাম। কিছুতেই কিছু হল না। এখন কলকাতায় নিয়ে এসেছি। বহুকষ্টে ভর্তি করেছি বড় একটি হাসপাতালে। রোগও ধরা পড়েছে। আসলে কিডনি থেকেই ওর এই উপসর্গ। দুটো কিডনিই নাকি নষ্ট হতে বসেছে। ডাক্তারবাবুদের হিসাব মতো চার-পাঁচ লাখ টাকা খরচা করতে পারলে তবেই ওকে সারানো সম্ভব। কিন্তু অত টাকা আমি কোথায় পাব বাবু? তাই ভাবছি ছেলে চোখ বুজলে আমিও আত্মঘাতী হব।"

আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "অমন ভুল কখনও কোরো না। একান্তই যদি মরতে চাও তো দধিচীর মতো তনুত্যাগ করো। দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষের সেবার কাজে লাগাও। তোমার ছেলের মতো অসহায় কেউ যদি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে তবে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াও।"

দুলিয়াজান চোখের জল মুছে বলল, "হ্যাঁ, সেটা করলেও মন্দ হয় না। দেখি শেষ পর্যন্ত কী হয় ছেলেটার।"

আমি জেলখানা থেকে ফিরে এসে সারাটা দিন ধরে ওদের কথা ভাবতে লাগলাম। একজন মানুষ অর্থের অভাবে রোগের যন্ত্রণা ভোগ করে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, আর একজন সুস্থ সুন্দর দেহ নিয়ে জীবনের সামান্য একটা ভুলের কারণে বরণ করতে চলেছে মরণকে। ওদের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই একটু আশার আলো দেখতে পেলাম। কেন জানি না মন হল সেই আলোর পথ ধরে একটু চেষ্টা করলে হয়তো একসঙ্গে দুটি জীবনই রক্ষা পেতে পারে।

পরদিন সকালে বুবাই-এর মা অর্থাৎ সেই ভদ্রমহিলা আবার এলেন। বললেন, "আমার ছেলের ব্যাপারে কোনও কিছুর ব্যবস্থা কি করতে পারলেন দাদা?"

আমি একটু স্বাভাবিকভাবে বললাম, ""ওর ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওর অপরাধ সামান্যই। ওর সব কথাই ও আমাকে বলেছে। ওকে বাঁচানোর জন্য অন্য পথে একটা চেষ্টা আমি করছি। অতএব যে পর্যন্ত সেটা সম্ভব না হয় সে পর্যন্ত আপনি আমার এখানেই থাকুন।"

ভদ্রমহিলা রয়ে গেলেন।

বেলা দশটার পর আমি আবার গেলাম জেলখানায় বুবাই-এর সঙ্গে দেখা করতে।

আমাকে দেখেই আশার আলোয় চকচকিয়ে উঠল বুবাই-এর চোখ দুটো। বলল, "আমার কি কোনও গতি হবে?"

বললাম, "হবে। তার আগে বল ওই যে ডাকাতির টাকাগুলো তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে সেগুলো কি তুমি চেষ্টা করলে উদ্ধার করতে পারবে?"

"পারব। তার কারণ একমাত্র আমি ছাড়া ওই টাকার হদিশ আর কারও জানা নেই।"

"টাকার অঙ্ক মনে আছে তোমার?"

"আমি তো টাকা গুনে দেখার সময় পাইনি। তবে শুনেছি সাত লাখ।"

"সাত লাখই। ওই টাকার ওপর তোমার কোনও মোহ আছে?"

"বিন্দুমাত্র নেই। এখন আমি আমার মায়ের কোলে মাথা রাখতে চাই। নতুন জীবন চাই। নতুন করে বাঁচতে চাই। আপনি যদি একবার আমাকে এখান থেকে বাইরের জগতে নিয়ে যেতে পারেন তা হলে সবার চোখের আড়াল থেকে দূরে বহুদূরে চলে যাব আমি। আর আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে মানুষের সেবা করব। আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি।"

আমি ওর কাঁধ চাপড়ে বললাম, "ধৈর্য ধরো। হয়তো আমি কৌশলে তোমাকে মুক্তি দিতে পারব। কিন্তু যে লোককে আমি তোমার সঙ্গে দেব সেই লোকের হাতে তোমার ওই লুকিয়ে রাখা সব টাকাটাই তুলে দিতে হবে। কেননা ওই টাকার জোরেই এক মৃত্যুপথযাত্রী তার রোগের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেয়ে আরোগ্য লাভ করবে।"

বুবাই-এর সঙ্গে কথা বলার পর দেখা করলাম দুলিয়াজানের সঙ্গে। ওকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম, "তোমার ছেলেকে সারিয়ে তুলতে কত টাকা লাগবে দুলিয়াজান?"

দুলিয়াজানের চোখেও তখন আশার আলো ফুটে উঠল। বলল, "চার থেকে পাঁচ লাখ।" তারপরই বলল, "এ-কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন বাবু? আপনি কি কোনও ব্যবস্থা করতে পেরেছেন?"

"পেরেছি। তবে এর জন্য তোমাকে দারুণ একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে।"

দুলিয়াজান বলল, "কী যে বলেন বাবু, আমার ছেলের জীবন রক্ষার জন্যে আমি যে-কোনওরকম বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজি আছি। বলুন কী করতে হবে?"

"মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক কিশোরকে তোমায় মুক্তি দিতে হবে।"

"বুঝেছি। আপনি নিশ্চয়ই ওই রাজা মুখার্জী ওরফে বুবাই-এর কথা বলছেন?"

"ঠিক তাই।"

"ওর জন্য আমার বড় দুঃখ হয় বাবু। ছেলেটা কিন্তু খুব একটা খারাপ নয়। কিন্তু টাকাটা...?"

"বর্ধমানের একটি ব্যাঙ্ক ডাকাতির সাত লাখ টাকা ওর হেফাজতেই আছে। তাই থেকে পাঁচ লাখ টাকা তুমি পাবে। বাকি টাকা ফেরত যাবে ওই ব্যাঙ্কেই।"

দুলিয়াজান বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, আজই রাত দশটায়...।"

"আমি কিন্তু একটা গাড়ি নিয়ে জেলখানার বাইরে পুরনো গীর্জার কাছে অপেক্ষা করব।"

"ওকে নিয়ে আমি ঠিক সময়েই সেখানে হাজির হব।"

আমি বুবাইয়ের সঙ্গে আবার দেখা করে ওকে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত থাকতে বললাম। তারপর বাড়ি ফিরে ভদ্রমহিলাকে বললাম, "আপনার ছেলেকে আজ রাতের মধ্যেই জেলের বাইরে নিয়ে আসছি। আপনি এখনই আপনার স্বপ্ননীড়ে ফিরে যান। আজ রাতে আপনি দু'লাখ টাকা পেলে কালই আপনি আপনার সঞ্চিত অর্থ ও এই টাকা দিয়ে ব্যাঙ্কের পাওনা মিটিয়ে দিন। পরে সময় সুযোগ মতো ছেলেকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে

যাবেন। আপাতত কয়েকটি দিন ও কাছাকাছি কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকবে।''

ভদ্রমহিলা আমার কথামতো আনন্দে গদ্গদ হয়ে তাই করলেন। অর্থাৎ তখনই রওনা হলেন বর্ধমানের দিকে।

সে রাতে নির্বিঘ্নে কাজটি সম্পন্ন হল। দুলিয়াজান বুবাইকে আমার হাতে সমর্পণ করলে আমি নিজেই ওকে নিয়ে চলে এলাম বর্ধমানে। সদরঘাটে দামোদরের তীরে এক গভীর নির্জনে বিশাল একটি বটবৃক্ষের উচ্চকোটরের মধ্যে টাকাটা এমনভাবে কালো কাঠ দিয়ে পেরেক সেঁটে রেখেছিল ও যা কারও নজরে পড়বার কথা নয়। বুবাই আমাব হাতে নির্দ্বিধায় টাকাগুলো তুলে দিয়ে আমাকে প্রণাম করে বিদায় নিল। বাড়ি তো গেল না, গেল ওরই মনোমতো কোনও নিরাপদ স্থানে। আমিও সেই টাকা থেকে দু'লাখ টাকা সে রাতেই ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে বাকি টাকা ছেলের চিকিৎসার জন্য তুলে দিয়েছিলাম দুলিয়াজানের হাতে।

এর পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। দুলিয়াজানের ছেলে রোগমুক্ত হয়ে তার জীবন ফিরে পেয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষও কর্তব্যের অবহেলার কারণে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেছিলেন দুলিয়াজানকে। বুবাই এর মা ব্যাঙ্কের টাকা পরিশোধ করায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। বুবাই এখন বারাণসী শহরে ছোটখাটো একটা ব্যবসা করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার বন্ধু রণেন্দুর সহযোগিতায় স্বপ্ননীড় কিনেছেন বর্ধমানের ওই ব্যাঙ্কেরই এক কর্মচারি। ব্যাপারটার ওখানেই নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

একজন পেশাদার গোয়েন্দা হিসেবে আমার এবারের ভূমিকা হয়তো খুবই নিন্দনীয়। আইনের কাছে, প্রশাসনের কাছে গুরুতর একটা অপরাধ আমি সত্যিই করেছি। তবে কিনা আইনও তো সব সময় সঠিক পথে চলে না। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এবং সুকৌশলে সাজানো মিথ্যা মামলায় অনেক নিরাপরাধও কঠিন শাস্তি পায়। মৃত্যুদণ্ডও পেয়ে থাকে কেউ কেউ। অতএব আমার একটু ছলনার ফলে আইনের মর্যাদা যেমন হানি করা হয়েছে তেমনই সুস্থ সুন্দর জীবন ফিরে পেয়েছে দুটি কিশোর। তাই সংবিধান যাই বলুক না কেন আমার মনের মধ্যে কিন্তু এখনও কোনও বিবেকের দংশন নেই।

কালপ্যাঁচার ডাক

যে রাতে আমার বাগানে চাঁপাগাছের ডাল থেকে শ্যাঁস শ্যাঁস করে কালপ্যাঁচাটা ডেকে ওঠে সে রাতে কেন জানি না একটু অমঙ্গলের আশঙ্কা করি। প্যাঁচাটা যতবারই ডাকে ততবারই কোনও না কোনও একটা ঝুট-ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি আমি। অর্থাৎ কিনা এমন একটা বিরক্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাই যে তা বলবার নয়।

আজ ভর সন্ধেবেলাতেই প্যাঁচাটা ডাকল।

রাখহরি ঘরের কাজ করছিল, কাজ ফেলে ছুটে গেল ছাদে। তারপর হুট-হ্যাট করে একটা ঢিল ছুঁড়তেই উড়ে গেল প্যাঁচাটা।

ও নেমে এলে আমি বললাম, ''হঠাৎ কী হল? ওটাকে তাড়িয়ে দিলি কেন?''

"ওই অলুক্ষুণে প্যাঁচাটা যখনই ডাকে তখনই একটা না একটা ঝামেলা এসে জুটে যায়।"

"তাই বলে ওকে তাড়িয়ে দিবি?"

"নিশ্চয়ই দেব। ধরতে পারলে গলা টিপে মেরে ফেলতাম ওকে!"

"ওর অপরাধ?"

"ও ডাকে কেন?"

"সে কীরে! ভগবান ওকে ডাক দিতে পাঠিয়েছেন তাই ও ডাকে। নিশাচর প্রাণী ওরা। গাছের ডালে বসে ডাক দিয়ে ওর অবস্থিতির কথা জানায়। তাছাড়া বলতে পারিস ও আমাদের পরম বন্ধু।"

রাখহরি চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "বন্ধু! কী যে বলেন আপনি তার ঠিক নেই। অমন বন্ধুর দরকার নেই আমাদের।"

"তুই ভেবে দ্যাখ, ওর ডাকা মানেই অশুভ কিছু একটা ব্যাপার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটতে চলেছে।"

"অবশ্যই ঘটবে।"

"তা হলে? ওর ডাকেই তো আমরা সেই সংবাদটা আগেভাগেই জেনে যাই। আজকের এই রাত আমাদের দুজনের কারও পক্ষেই শুভ নয়। তাই খারাপ কিছু একটা ঘটবার আগে যে আমাদের সতর্ক করে দেয় সে-ই তো আমাদের পরম বন্ধু।"

রাখহরি আর কোনও উত্তর না দিয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগল।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

রাখহরির মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে।

আমি টেলিফোন ধরে হ্যালো করতেই একটি কোমল কণ্ঠস্বর আমার কানে এল, "আমি অম্বর চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"আপনি?"

মনে হল যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল বেচারি। অতিকষ্টে বলল, "আমি তনুশ্রী, ডাক নাম তনু। ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে ফোন করছি আপনাকে। আমার জ্যেঠুমণি—।"

"কী হয়েছে তোমার জ্যেঠুমণির?"

"সাক্ষাতে সব বলব। আপনি বাড়ি আছেন তো?"

"আছি। কিন্তু আমাকে আপনি চিনলেন কী করে? আমার ফোন নম্বর কার কাছ থেকে পেলেন?"

আর কোনও উত্তর নেই। ফোন রেখে দেওয়ার শব্দ শোনা গেল এবার।

গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়ে গেলাম আমি।

রাখহরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কোনও খারাপ খবর কিছু?"

"খারাপ তো নিশ্চয়ই। কিন্তু রহস্যময়।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সন্ধে সাতটা। ব্যান্ডেল থেকে হাওড়া লাইন ক্লিয়ার থাকলে এক ঘণ্টায় আসা যায়। তারপর হাওড়া থেকে মৌড়িগ্রাম আরও এক ঘণ্টা। যদিও সময়টা আরও কম লাগা উচিত। তবুও অনুমান করা যায় রাত দশটার মধ্যেই এসে পড়বে মেয়েটি। এখন ওর এসে পৌঁছনোর সময়টুকু পর্যন্ত অধীর আগ্রহে বসে থাকা ছাড়া কিছুই

আর করবার নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল মেয়েটি কে? কেনইবা সে অমন করে ফোন করল আমাকে? ওই অচেনার কোনও বিপদ ঘটে থাকলে সে তো থানাতেই যেতে পারত। তাছাড়া আমার প্রশ্নের উত্তরে ফোনটাই বা সে রেখে দিল কেন? এইসব ভাবতে ভাবতেই মেয়েটির আগমনের জন্য হানটান করতে লাগলাম।

আটটা-ন'টা-দশটা-এগারোটা। ধৈর্যের বাঁধভাঙা প্রতীক্ষা। কিন্তু না, তনুশ্রী নামের সেই অপরিচিতা এলই না।

তবে কি কেউ রসিকতা করল আমার সঙ্গে?

রাখহরি বলল, "আর রাত করবেন না দাদাবাবু, খেয়ে নিন। মনে হয় ও আর আসবে না।"

আমি বললাম, "সেই ভাল। খেয়েদেয়ে শুয়েই পড়া যাক। দরকারটা ওর, না এলে আমার কী? তবে—।"

"কী তবে?"

"ভাবছি আমাকে ফোন করার পর মেয়েটির কোনও বিপদ হল না তো?"

রাখহরি বলল, "তা যা বলেছেন, অসম্ভব কিছু নয়। যা দিনকাল পড়েছে।"

এমন সময় ডোরবেলটা বেজে উঠল।

রাখহরি নিঃশব্দে ছাদে উঠে ওপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে আগন্তুকদের দেখেই দরজা খুলল।

ভেতরে ঢুকলেন দুজন গোয়েন্দা অফিসার। মিঃ কালাচাঁদ রায় ও এস.কে.চন্দ। দুজনেই আমাদের পরিচিত।

আমি খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়িযে তাঁদের অভ্যর্থনা করতেই মিঃ চন্দ বললেন, "কী ব্যাপার চ্যাটার্জি? এত রাতে খাচ্ছেন কেন?"

"আর বলবেন না। রাখহরির সঙ্গে পুরনো দিনের নানারকম গল্প করতে করতেই এত দেরি হয়ে গেল। তা হঠাৎ কী ব্যাপার? আপনাদের পায়ের ধুলো তো এই সময়ে পড়বার কথা নয়।"

কালাচাঁদবাবু বললেন, "একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব নিয়ে আপনার কাছে এসেছি আমরা। আপনাকে এখনই একবার আমাদের সঙ্গে অনেকদূরের একটি গ্রামে যেতে হবে।"

"না মিঃ রায়, আজ আর তা সম্ভব নয়।"

"হোয়াই নট? আমরা শুধুমাত্র আপনার ওপরে ভরসা করেই সেই হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট থেকে এই মৌড়িগ্রামে ছুটে এসেছি। খুবই গুরুতর ব্যাপার। এ কাজের দায়িত্বটা আপনাকে নিতেই হবে ভাই।"

আমি হেসে বললাম, "কেন রসিকতা করছেন? আপনাদের মতো দু'দুজন ঝানু গোয়েন্দা থাকতে শেষকালে আমি?"

"হ্যাঁ আপনি। তার কারণ এই ঘটনার তদন্ত কোনও সরকারি গোয়েন্দাকে দিয়ে হোক এটা কেউ চাইছেন না।"

"কেউ চাইছেন না মানে?"

"ওঃ চ্যাটার্জি প্লিজ। কোনও প্রশ্ন করবেন না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। এখনই বেরোতে হবে।"

যাঃ। এখনই বেরোতে হবে মানেই তো আজ রাতে ঘুমের বারোটা বেজে গেল। অথচ ব্যাপারটা এমনই যে এড়িয়ে যাবারও নয়। একদিকে তনুশ্রী নামের অচেনা এক মেয়ের জন্য টান টান উত্তেজনা, অপরদিকে শহর থেকে দূরে যাবার ডাক। তাই চটপট খাওয়া শেষ করলাম।

এমন সময় আবার বেজে উঠল টেলিফোনটা।

রিসিভার উঠিয়ে হ্যালো করতেই রণেন্দুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আমার উকিল বন্ধু রণেন্দুশেখর শেঠ। যার কাছে আমি একসময় নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। রণেন্দু বলল, "এত রাতে তোকে ফোন করলাম বলে তুই নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাচ্ছিস? কিন্তু কোনও উপায় নেই। আমার এক ক্লায়েন্ট জগদানন্দ রায় আজ দুপুরে এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। যে ভাবেই হোক, ওই খুনিকে খুঁজে বার করতেই হবে। কেননা এ কাজের জন্য তুই-ই একমাত্র যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোক। আর কিছুক্ষণের মধ্যে মিঃ কালাচাঁদ রায় ও এস. কে. চন্দ তোর কাছে যাবেন। তুই যেন না করিস না ভাই। আমি খুব জোর দিয়ে তোর কথা বলেছি।"

"ওঁরা একটু আগেই আমার এখানে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু তুই যে সাংঘাতিক কথা শোনালি আমাকে। জগদানন্দ রায় মানে সেই প্রাক্তন—।"

"হ্যাঁ তিনিই। ওই অঞ্চলের উন্নতির জন্য যাঁর অনেক অবদান ছিল। অথচ সেই মানুষের এমন মর্মান্তিক পরিণতি হবে কেউ তা ভাবতেও পারিনি।"

"একে জগদানন্দ রায়, তার ওপরে তোর ক্লায়েন্ট। এই কেস আমি কী করে না নিই বল? কিন্তু এদিকে যে আর এক কাণ্ড হয়েছে।"

"কী হয়েছে?"

"তনুশ্রী নামে একটি মেয়ে আজ সন্ধে সাতটা নাগাদ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে বলে ব্যান্ডেল থেকে ফোন করেছিল, কিন্তু কোনও এক রহস্যময় কারণে এখনও পর্যন্ত সে এসে পৌঁছুল না?"

"কী বললি? তনুশ্রী! ঠিক শুনেছিস তো?"

"হ্যাঁ। ডাক নাম তনু।"

"স্ট্রেঞ্জ!"

"তুই কি চিনিস মেয়েটিকে?"

"চিনি মানে? তনুশ্রীই জগদানন্দর ভাইঝি। ওর জ্যেঠুমণির খুনের কথা ও-ই আমাকে জানায়। কিন্তু ব্যান্ডেল স্টেশনে সে আসবে কী করে?"

"সে না হয় যেভাবেই হোক এল, আমার সঙ্গেও ফোনে যোগাযোগ করল কিন্তু তারপর মেয়েটি গেল কোথায়?"

"বড়ই রহস্যময়।"

"অথচ এই টেনশনের মধ্যে কালাচাঁদ এবং মিঃ চন্দ দুজনেই বসে আছেন আমাকে নিয়ে যাবেন বলে।"

"তুই চলে যা। তনুশ্রীর ব্যাপারে আমি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে খোঁজখবর নিচ্ছি। তুই গিয়ে ডেড বডি পরীক্ষা না করা পর্যন্ত ওটা দাহ করা যাবে না।"

আমি রিসিভার নামিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়ে রাখহরিকে সাবধানে থাকতে বলে

ওঁদের বললাম, "চলুন।"

পুলিশের গাড়ি বাইরেই অপেক্ষা করছিল।

রাইফেলধারী দুজন কনস্টেবলও অপেক্ষা করছিল সেখানে।

আমরা গিয়ে গাড়িতে চেপে বসতেই কালপ্যাঁচাটা আবার ভয়াবহ স্বরে ডেকে উঠল. 'শ্যাঁস-শ্যাঁস-শ্যাঁস—!"

ভয়ে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল।

এই রাতে চারদিক এখন সুনশান। পুলিশের জিপ ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে। জিপের আরোহী মাত্র তিনজন। ড্রাইভার, মিঃ চন্দ এবং আমি। কালাচাঁদবাবু এবং কনস্টেবল দুজন দ্বিতীয় হুগলি সেতু পার হবার পরই নেমে গেছেন।

একসময় আমিই নীরবতা ভঙ্গ করলাম, "আমাদের যেতে হবে কতদূর?"

"অনেকদূর। নদীয়া মুর্শিদাবাদ বর্ডারের কাছে। রঘুনাথপুর।"

"তার মানেই তো রাত কাবার।"

"তা হবে। ভোরের আগে পৌঁছনো সম্ভব নয়। অবশ্য গাড়ি যদি একটানা চলতে থাকে। মাঝে অবশ্য একবার রানাঘাটে থেমে একটু চা-মিষ্টি খেয়ে নেব। রানাঘাটের পানতুয়ার নাম শুনেছেন তো!"

"শুনেছি কেন খেয়েওছি। ছানার কোনও বালাই নেই, সুজিতে ভর্তি।"

"দূর মশাই, কী খেয়েছেন তা হলে?"

"বললাম তো খেয়েছি।"

দমদম বিমানবন্দর পেরিয়ে কলকাতা ছেড়ে রাতের অন্ধকারে আমাদের গাড়ি ছুটেছে।

রাত প্রায় তিনটে নাগাদ রানাঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা। এত রাতেও এখানে বেশ কয়েকটা চায়ের দোকান খাবারের দোকান খোলা রয়েছে দেখলাম। আমরা এক জায়গায় বসে চা-বিস্কুট খেয়ে এখানকার মাখা সন্দেশ আর বিখ্যাত পানতুয়া খেলাম। মন্দ লাগল না। এর আগে যেরকম খেয়েছি সেরকম মনে হল না। ভালই লাগল খেতে।

চন্দ বললেন, "কী! কেমন লাগল?"

বললাম, "সত্যিই ভাল। অত্যন্ত সুস্বাদু।"

"দোকান চিনে খেতে হয় মশাই, বুঝলেন?"

"ফেরবার পথে ভাবছি হাঁড়ি ভর্তি করে নিয়ে যাব। তারপর ফ্রিজে রেখে রোজ একটা দুটো করে...।'

চন্দ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন।

জলযোগ পর্ব শেষ হতেই আমরা ওখানকার থানায় গেলাম যোগাযোগ করতে। এইরকমই নির্দেশ ছিল আমাদের ওপর। আমরা যোগাযোগ করলে ওই থানার একজন ইনসপেক্টর আমাদের গাড়িতে উঠে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন অকুস্থলে।

আকাশ ভালভাবে পরিষ্কার হবার আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম যথাস্থানে।

ওখানকার ওসি আমাদের অভ্যর্থনা করে স্মিত হেসে বললেন, "আসুন চ্যাটার্জিবাবু, আপনার নাম শুনেছি কিন্তু সামনাসামনি দেখলাম এই প্রথম। ভাবতে পারেন, আমরা কোন রাজত্বে বাস করছি?"

"কেন, স্বাধীন ভারতেই বাস করছি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এরকম কিছু না কিছু হবেই।"

"তাই বলে এমন ঋষিতুল্য মানুষকে কেউ খুন করে?"

"খুনিদের কাছে মুনি ঋষি সাধারণ মানুষ সব এক।"

মিঃ চন্দ বললেন, "কই চলুন, কোথায় আপনাদের ডেডবডি আগে দেখান।"

ওসি আমাদের নিয়ে গেলেন যেখানে ডেডবডি রাখা ছিল সেইখানে। দেখেই শিউরে উঠলাম। উঃ! কী নৃশংসভাবেই না স্ট্যাবিং করা হয়েছে মানুষটিকে।

চন্দ বললেন, "একেবারে পাকাপোক্ত পেশাদার খুনিকে দিয়েই করানো হয়েছে কাজটা।"

ওসি বললেন, "এবং প্রকাশ্য দিবালোকে।"

মিঃ চন্দ বললেন, "আপনার কী মনে হয় স্যার? এটা কোনও পলিটিক্যাল মার্ডার?"

ওসি বললেন, "তা ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে? একসময় তো উনি ভোটে দাঁড়াতেন। রাজনীতি করতেন।"

আমি ততক্ষণে যা দেখবার তা দেখে নিয়েছি। নিয়ে বললাম, "না এটা পলিটিক্যাল মার্ডার নয়।"

চন্দ বললেন, "সে কী মশাই! রাজনীতির লোক প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হল অথচ আপনি বলছেন এটা পলিটিক্যাল মার্ডার নয়।"

"শুধু তাই নয়, কোনও পেশাদার খুনিকে দিয়েও করানো হয়নি খুনটা। এবং এই খুনের জন্য কোনও তীক্ষ্ণ ছোরাও ব্যবহার করা হয়নি।"

ওসি এবং চন্দ দুজনেই বললেন, "আমরা কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।"

"সেটা আপনাদের ব্যাপার।"

"কিন্তু কেন আপনি এত জোর দিয়ে বলছেন যে এটা পলিটিক্যাল মার্ডার নয়, তা জানতে পারি কী?"

অবশ্যই পারেন। প্রথমত ওই ধরনের হত্যাকারীরা প্রকাশ্য দিবালোকে এমন একজন মানুষকে খুন করার জন্য কখনও ওইরকম অস্ত্র ব্যবহার করবে না। খুব ঠাণ্ডা মাথায় পিস্তল অথবা রিভলবারের সাহায্যই নেবে এরা। আর পেশাদার কোনও ভাড়াটে খুনিকে দিয়ে ছুরিকাঘাতে খুন করালেও সেইসব খুনিদের ধরন-ধারণ আলাদা। তারা গলা বুক এবং পেট তীক্ষ্ণ ছোরাকে বিদ্ধ করে যেভাবে টেনে নামায় এক্ষেত্রে তা-ও হয়নি। এমনকী ক্ষতস্থান লক্ষ্য করলে বোঝাই যায় চপার বা ছোরা কোনওটিই প্রয়োগ করা হয়নি এক্ষেত্রে। কিন্তু তবুও যে ধরনের ধারালো অস্ত্র এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে সেটা যে কী তাও তদন্তের বিষয়।"

ওসি এবং মিঃ চন্দ দুজনেই এবার একমত হলেন আমার কথায়।

আমি বললাম, "এই ব্যাপারে সন্দেহজনক সেরকম কাউকে কি গ্রেফতার করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ। ভোচন নামে স্থানীয় এক সমাজবিরোধীকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। সিনেমা হলে টিকিট ব্ল্যাক, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা তোলা, অবাধে গুণ্ডামি এমনকী

খুনের অভিযোগও আছে তার বিরুদ্ধে।''

''খুনের অভিযোগ!''

''হ্যাঁ। লালগোলা প্যাসেঞ্জারের একজন আর.পি.এফ.-কে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেয় ও।''

''সে কী! তারপরও সে লোকের মধ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়ায় কী করে?''

''প্রমাণের অভাব! ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে কে?''

''সেই লোকটার কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারেন?''

''চলুন।''

লক-আপে রাখা সেই ভোচন নামের লোকটির কাছে গিয়ে দেখি যেন একটা বুনো চিতাকে কেউ জোর করে আটকে রেখেছে সেখানে।

আমি গিয়ে সরাসরি লোকটির দিকে তাকিয়ে বললাম, ''জগদানন্দবাবুর খুনের ব্যাপারে সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসেবে তোমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ব্যাপারে কি তোমার কিছু বক্তব্য আছে?''

''আছে। অন্যায় আমি দেখতে পারি না। সহ্যও করি না। কাউকে অন্যায় করতে দেখলেই আমি পেটাই, তাতে আমার জেল হোক, ফাঁসি হোক, যা হয় হোক।''

''এ তো খুব ভাল কথা। কিন্তু অন্যায় তুমি নিজেও তো করো। টিকিট ব্ল্যাক করো, তোলা আদায় করো, আরও অনেক কিছুই তো করো।''

''সেটা করি পেটের দায়ে।'' বলে ও.সি.-কে দেখিয়ে বলল, ''এই সম্বন্ধীকে তো আমি অনেক করে বলেছিলাম আমাকে একটা কনস্টেবলের চাকরি অথবা নিদেনপক্ষে একটা পিওনের চাকরিও করে দিতে। খারাপ রাস্তা আমি একেবারেই ছেড়ে দেব। এমন কি এই অঞ্চলে আমি যতদিন থাকব কাউকে মাথা তুলতেও দেব না। উনি কি শুনেছিলেন আমার কথা? যেমন শুনলেন না, এখন তার ফল ভোগ করুন।''

আমি বললাম, ''শোনো ভাই, আজকের দিনে কাউকে একটা চাকরি করে দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তা ছাড়া তুমি দাগি আসামী। পুলিশ ভেরিফিকেশনেও তোমার রেকর্ড অত্যন্ত খারাপ। অতএব সরকারি চাকরি তোমার কী করে হবে? তা ছাড়া বয়সের সীমাও পার হয়ে গেছে তোমার।''

ভোচন বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, ''বাঃ দাদা, বাঃ! বেশ কথাটি বললেন তা হলে। আপনারা আমাকে সৎ উপায়ে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন না অথচ আমি জীবনে বাঁচার জন্য কোনও ধান্ধাবাজি করলে আমাকে বলবেন সমাজবিরোধী, এই জিনিসটা কিন্তু ঠিক হল না।''

ওসি বললেন, ''ঠিক আছে। তোর জন্য আমি চেষ্টা করব। এখন বল জগদানন্দবাবুর খুনের ব্যাপারে তুই কিছু জানিস কি না?''

''সেটা যদি জানতাম তাহলে এতক্ষণে আমি সে খুনির মাথাটাকে বল্লমে গেঁথে শহরময় নেচে বেড়াতাম। কিন্তু আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না এই খুনের ব্যাপারে এত লোক থাকতে আমাকেই বা কেন সন্দেহ করা হল আর কেনই বা আমাকে আটকে রাখা হয়েছে বিনা কারণে?''

আমি বললাম, ''আসলে তুমি খুব শান্তশিষ্ট মানুষ তো, সমস্ত রকমের গণ্ডগোলের

মধ্যমণি। তাই তোমাকেই প্রথম সন্দেহ করা হয়েছে। তবে এখন মনে হচ্ছে তুমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। অতএব তুমি যেতে পারো।''

ভোচন মুক্তি পেয়ে প্রথমেই প্রণাম করল আমাকে। তারপর আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, ''আপনাকে এখানে প্রথম দেখছি। আপনি কি আমাদের এখানে পোস্টিং নিচ্ছেন স্যার?''

আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, ''তুমি এখন যেতে পারো।''

ভোচন চলে যাচ্ছিল।

আমি ডাকলাম, ''শোনো।''

ও ঘুরে তাকাল।

''তুমি তো অন্ধকার জগতের মানুষ। যদি এই ব্যাপারে সন্দেহজনক কোনও কিছুর গন্ধ পাও তাহলে আমাকে জানিও। আমি জগদানন্দবাবুর বাড়িতেই কয়েকটা দিন আছি।''

''নিশ্চয়ই জানাবো। ওঁর মতো মানুষকে যারা খুন করে তাদের একজনকেও যদি খুঁজে বের করতে পারি তাহলে সেটাই হবে আমার অনেক খারাপ কাজের মধ্যে একটা ভাল কাজ।''

ভোচন চলে গেলে আমি ওসি-র সঙ্গে জগদানন্দবাবুর বাড়িতে এলাম। মিঃ চন্দ থানা থেকেই বিদায় নিলেন।

জগদানন্দবাবুর বাড়িটি পৈত্রিক। সেকেলে জমিদার বাড়ি। এতবড় বাড়িতে কিন্তু লোকজন খুবই কম। জগদানন্দবাবু বিয়ে করেননি। তবে তাঁর ভাই, ভাই-বউ আর একমাত্র ভাইঝি তনু অর্থাৎ তনুশ্রীকে নিয়ে সুখের সংসার তাঁর। চিরটাকাল মানুষের উপকার করে এসেছেন। বিপদে আপদে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। অথচ সেই মানুষেরই কী পরিণতি আজ।

তনুশ্রীর বাবা-মা দুজনেই ভেঙে পড়েছেন খুব। এক তো জগদানন্দবাবুর ওই মৃত্যু, তার ওপরে তনুশ্রীর নিখোঁজ হওয়া। একমাত্র মেয়ের শোকে তাই পাগলের মতো অবস্থা ওঁদের।

যাই হোক, জিজ্ঞাসাবাদের পর জানলাম জগদানন্দবাবুর খুন হওয়ার সংবাদ রণেন্দুকে জানানোর পর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় মেয়েটি। ওদের পারিবারিক অ্যালবামে তনুশ্রীর যে সব ছবি দেখলাম তাতে বুঝেই নিলাম তনুশ্রী এক অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে। বছর পঁচিশের এক যুবতী। তবে কি এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই জগদানন্দবাবুর খুন হওয়া? কিন্তু মুশকিল এই যে হাজার জিজ্ঞাসাবাদেও এই ব্যাপারে আমার কাজে লাগে এমন কোনও সূত্রই পেলাম না ওঁদের কাছ থেকে। তনুশ্রীর বাবা-মা বললেন, ''ওর নিখোঁজ হওয়াটা আমাদের কাছে সত্যই রহস্যময়।''

অবশেষে আমি খোঁজখবর নিতে নিতে একসময় সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম যেখানে গতকাল দুপুরবেলা জগদানন্দবাবু খুন হয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে আশপাশের দোকানদারদের মুখে শুনলাম জগদানন্দবাবু একটা সাইকেল রিকশায় করে দুপুরবেলা ফিরছিলেন। হঠাৎ একজন ষণ্ডামার্কা লোক কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ওপর। রিকশাওয়ালাকে এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে উপর্যুপরি আক্রমণ চালায় তাঁর ওপর। অনেক দোকানেরই তখন ঝাঁপ বন্ধ। যে দু'একটা দোকান খোলা ছিল, তাদের

লোকজনরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আততায়ী চোখের পলকে উধাও হয়ে যায়।

একজন পানওয়ালা আগাগোড়া ঘটনাটি দূর থেকে লক্ষ করেছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি তো এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, এখন বলো তো হত্যাকারীরা ক'জন ছিল?"

পানওয়ালা বলল, "একজনই।"

"লোকটাকে তোমরা বাধা দিলে না কেন?"

"তাকে বাধা দেওয়া আমার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাকি যারা ছিল তারাও এমন অভাবনীয় নৃশংস দৃশ্য দেখে হতচকিত হয়ে পড়েছিল। খুন করে হত্যাকারী চলে যাবার পর আমরা যখন এগিয়ে যাই তখন আর কোনও আশা ছিল না। সব শেষ। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ওঁর বাড়ির লোকরা আসেন। থানা পুলিশ হয়। তারই মধ্যে ফোন করতে গিয়ে তনুদিদি উধাও হয়ে যান। কেন যে এমন হল তা আমরা কেউই বুঝে উঠতে পারছি না। তার কারণ, এই অঞ্চলে এই পরিবারের কোনও শত্রু নেই।"

সব শোনার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আততায়ী কি হেঁটেই চলে গেল, না সঙ্গে কোনও গাড়ি ছিল?"

"আজ্ঞে একটা সাইকেল ছিল। সাইকেলটা গঙ্গার ধারে ফেলে রেখে সাঁতার কেটে সে ওপারে চলে যায়।"

আমি আর কোনও জিজ্ঞাসাবাদ না করে ঘরে ফিরে এলাম। তারপর বাড়িতে স্নান শেষ করে বাইরের হোটেলে খেয়ে এলাম। জগদানন্দর ভাই, ভাই-বউ আমাকে ওঁদের ওখানেই খেতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি ওঁদের মানসিক অবস্থা দেখে রাজি হইনি।

দুপুরে বিশ্রামের পর যখন বেরোতে যাচ্ছি তেমন সময় ভোচন এল। বললাম, "কী ব্যাপার?"

"এমনিই এলাম দেখা করতে। যদি কোনও কাজে লাগি।"

"এসে ভালই করেছ। তোমাকে নিয়েই চারদিক তোলপাড় করব আমি। এখন কলকাতায় একটা ফোন করা যায় কীভাবে?"

"কেন, জগদানন্দবাবুর বাড়িতেই তো ফোন আছে।"

আমি বললাম, "তাই তো! এই কথাটা তো আমার মনে হয়নি। এমন বড়মাপের একজন মানুষ তাঁর বাড়িতে টেলিফোন তো থাকবেই। তবে এস.টি.ডি. ফেসিলিটি আছে কিনা সেটা অবশ্য দেখতে হবে।"

কিন্তু ফোন করতে গিয়েই হতাশ হলাম। শুনলাম ওঁদের ফোন গত তিন-চারদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে আছে। এখন প্রশ্ন হল তনুশ্রী তাহলে কলকাতায় রণেন্দুকে ফোন করেছিল কোথা থেকে? সেই জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারলে ওর অন্তর্ধান রহস্যের সূত্র একটা পাওয়া যাবেই।

এই ব্যাপারে ভোচন আমাকে খুবই সাহায্য করল। ও বলল, "একমাত্র ডাঃ সরকারের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও থেকেই কলকাতায় ফোন করা সম্ভব নয়।"

অতএব আমরা ডাঃ সরকারের বাড়ি গেলাম।

ডাঃ সরকার বললেন, "হ্যাঁ, তনুশ্রী এসেছিল, ফোনও করেছিল, কিন্তু তার পরের খবর তো বলতে পারব না।"

আবার শুরু হল তদন্তের কাজ। জিজ্ঞাসাবাদের পালা। খোঁজ নিতে নিতে জানা গেল

ডাঃ সরকারের বাড়ি থেকে বেরনোর পরই ওর পরিচিত এক যুবককে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে তনুশ্রী। তারপর তারই গাড়িতে চেপে উধাও হয়ে যায়।

রহস্যের পর রহস্য।

পরিচিত যুবক যদি হবে তবে তার সঙ্গে এমন রহস্যময়ভাবে উধাও হবে কেন তনুশ্রী? তাছাড়া জরুরি কোনও কাজে গেলে এই দুঃসময়ে বাড়িতে অন্তত একটা খবর দিয়ে তো যাবে?

আততায়ী গঙ্গা পার হয়ে চলে গেল।

তনুশ্রী হঠাৎ করে হারিয়ে গেল ফোন করে ফেরার পথে। কেসটাও কিডন্যাপের নয়। কেননা তনুশ্রী স্বেচ্ছাতেই গেছে।

ব্যাপারটা কিরকম যেন জট পাকিয়ে গেল।

তবুও আর একবার বাড়ি ফিরে ওর বাবা-মা'র কাছে জানতে চাইলাম ওই যুবকের ব্যাপারে।

তনুশ্রীর বাবা ছিলেন না। কাজ মিটে যাওয়ায় মর্গ থেকে ডেডবডি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলেন। ওর মা বললেন, "আমাদের পরিচিত একজনই আছে। সে হল শুভেন্দু। ওদের নিজেদের একটা গাড়ি আছে, মারুতি। কিন্তু সেই মারুতি চেপে ওরা গেলই বা কোথায়?"

আমি বললাম, "কিছু যেন মনে করবেন না, শুভেন্দুর সঙ্গে তনুশ্রীর সম্পর্কটা কীরকম?"

"শুভেন্দু বড়লোকের ছেলে। আমাদের পাশের গ্রামেই ওর বাড়ি। এখন অবশ্য ভাল চাকরি পেয়ে কলকাতায় আছে। শুভেন্দুর সঙ্গে তনুর বিয়ে হোক এটা আমরা মনেপ্রাণে চাই। কিন্তু আমার ভাসুর অর্থাৎ তনুর জ্যেঠুমণির ঘোর আপত্তি থাকায় সেটা আজও সম্ভব হয়ে ওঠেনি।"

"ওঁর আপত্তির কারণটা কী ছিল? শুভেন্দু ভাল ছেলে নয়?"

"অত্যন্ত ভাল ছেলে। তবে কিনা আমার তনু হচ্ছে ওর জ্যেঠুমণির প্রাণ। তাই উনি চেয়েছিলেন তনুর বিয়ে এমন একজনের সঙ্গে হোক যে কিনা শিক্ষিত কিন্তু গরিবের ছেলে। আমাদের পরিবারে ছেলের মতোই থাকবে এবং বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করবে। শুভেন্দুর পক্ষে যেটা করা একেবারেই অসম্ভব।"

সন্দেহের কাঁটা মনের মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে বিঁধে গেল এবার। তবে কি জগদানন্দবাবুর খুন হওয়ার পেছনে শুভেন্দুর কোনও পরিকল্পনা আছে? কিন্তু তনুশ্রী পালিয়ে গেল কেন? তবে কি ফোনটা শুভেন্দুর কলকাতার ফ্ল্যাটে বসেই যুক্তি করে করেছে ওরা?

এই ব্যাপারে আমি আর কোনও জিজ্ঞাসাবাদ না করে চুপ হয়ে গেলাম।

সন্ধেবেলা গঙ্গার ঘাটে গেলাম জগদানন্দবাবুর অন্ত্যেষ্টি দেখতে। বহু গণ্যমান্য লোক এসে জড়ো হয়েছিলেন সেখানে। আমি এখানেও অনুসন্ধান করতে লাগলাম। আততায়ী যে ঘাটে গঙ্গা পার হয়েছিল সেই ঘাটে এলাম। যে সাইকেল ব্যবহার করা হয়েছিল সেই সাইকেলের মালিকের খোঁজ নিলাম। মালিক হচ্ছে এখানকারই এক শ্মশানকর্মী রামহরি ডোম। তিন চারদিন হল জমিজমা সংক্রান্ত কী একটা মামলার কাজে সে কলকাতায় গেছে।

তবে ওর এই সাইকেলে চাবি দেওয়া থাকে না, তাই ইচ্ছেমতো যে কেউ সেটাকে ব্যবহার করে। রামহরির দুটো বিয়ে। এক বউ থাকে এই শ্মশানেই একটি ঝুপড়িতে, অপরজন ত্রিবেণীতে। তবে ও নিজে এই শ্মশান জাগিয়েই বসে থাকে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শব দাহ করে, চোলাই মদের ব্যবসা করে, অত্যাধিক নেশা করে আর এইখানকার ঘাট জমা নিয়ে প্রচুর আয় করে সারা বছরে। তবে বর্তমানে এই ঘাট ওর হাতছাড়া হয়ে বীরপুরের মানিক মণ্ডলের হাতে চলে যায়। সেই সংক্রান্ত মামলাতেই কলকাতায় গেছে ও।

যাই হোক, শ্মশানে আমি শেষপর্যন্ত থেকে সবার সঙ্গেই বাড়ি ফিরে এলাম।

সে-রাতে অনেক চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারলাম না আমি। সারারাত তনুশ্রীর কথা ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম শুভেন্দুর কথা। কাল সকালের মধ্যে শুভেন্দুর কলকাতার ঠিকানা সংগ্রহ করে রণেন্দুকে জানাতে হবে। জানাতে হবে কলকাতার পুলিশকে। হয়তো ওরা ওখানেও থাকবে না। কিন্তু যেখানেই থাকুক না কেন ধরা ওরা পড়বেই।

পরদিন ভোরে যখন সামান্য একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি ঠিক তখনই রণেন্দুর গলা শুনতে পেলাম। ধড়মড়িয়ে শয্যা ত্যাগ করে উঠেই দেখি সত্যসত্যই রণেন্দু। কিন্তু তার সঙ্গে যাদের দেখলাম তাদের দেখব বলে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমার পরিকল্পনার সমস্ত ছকটাই যেন পাল্টে গেল। দেখলাম রণেন্দুর পাশে সুন্দরী তনুশ্রী ও এক সুদর্শন যুবক। এই যুবকই যে শুভেন্দু তা সহজেই অনুমান করা যায়। এ কী করে সম্ভব? তবে কি আমার ধারণাটাই ভুল?

আমি রণেন্দুকে নিভৃতে বসিয়ে সব কথা খুলে বললাম।

রণেন্দু বলল, "তাহলে শোন ব্যাপারটা কী হয়েছিল। তনুশ্রী ডাঃ সরকারের বাড়ি থেকে ফোন করে রাস্তায় নামতেই হঠাৎ করে ওর দেখা হয়ে যায় শুভেন্দুর সঙ্গে। শুভেন্দু ওর জ্যেঠুমণির ওই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা শুনেই শিউরে উঠল। ও কলকাতা ফিরছিল। বলল, "তোমার জ্যেঠুমণি খুন হওয়া মানে তো বিরাট এক ষড়যন্ত্রের ব্যাপার, তুমি মনে করো না যে এইখানেই এর শেষ, এই ঘটনার পর তোমার দিকেও নজর দেবে ওরা। ওদের টার্গেট ছিল হয়তো তুমি। এখন পথের কাঁটা সরিয়ে তোমাকে ওরা কিডন্যাপ করবে। তাই আমার মনে হয় এইভাবে ফোনে যোগাযোগ না করে এখনই তোমার কলকাতায় গিয়ে তোমাদের উকিলবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে কলকাতা থেকে ভাল গোয়েন্দা আনিয়ে তদন্ত করানো উচিত।" শুভেন্দুর কথা শুনে তনুশ্রী বলে তোমার কথা। ওর নোটবুকে আমার কাছ থেকে পাওয়া তোমার ফোন নাম্বারও ছিল। ও তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শুভেন্দুর গাড়িতে উঠে বসে। উত্তেজনার মাথায় পরিচিত একজনকে দিয়ে বাড়িতে খবর পাঠিয়েই চলে যায় ওরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যাকে দিয়ে খবর পাঠানো হয় সে খবর দেওয়া তো দূরের কথা, খুনের কথা শুনে ভয়ে আর ওদের বাড়ির দিকেই যায়নি।"

আমি বললাম, "গল্পটা ওরা ভালই বানিয়েছে। তারপর?"

রণেন্দু বলল, "না না গল্প নয়। কিছু বদ প্রকৃতির ছেলে ইদানীং খুব বিরক্ত করছিল তনুকে, তাই ওরা এইরকম আশঙ্কা করেছিল। তা যাক, আসলে ওরা কলকাতা থেকে পুলিশ কুকুর বা ঝানু গোয়েন্দাকে আনাবার ব্যবস্থাই করতে চেয়েছিল। সেই কারণে বাড়ি গিয়ে সব কথা বলে আসবার সময় পায়নি। আর শুভেন্দুও এতই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে দারুণ

একটা অমঙ্গলেব আশঙ্কা করে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল তনুশ্রীকে। ইতিমধ্যে ওরা গাড়ি নিয়ে আসবার সময় নৈহাটির কাছে ওদের গাড়িটা যায় খারাপ হয়ে। ঠিক সেইসময়ে ব্যান্ডেলগামী একটা লোকাল দেখতে পেয়ে তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়ে ওরা।''

''গাড়িটা রাস্তায় ফেলে রেখেই?''

''না। দুজনে মিলে গাড়িটাকে ঠেলতে ঠেলতে কোনওরকমে একজায়গায় সারাতে দিয়েই চলে আসে।''

''তারপর?''

''ব্যান্ডেলে এসে তোকে ফোন করতে গিয়েই হঠাৎ গা মাথা ঘুরে পড়ে যায় তনু। শুভেন্দু তখন উপায়ান্তর না দেখে ওকে নিয়ে চলে যায় চুঁচুড়া হাসপাতালে। পরে খবর পেয়ে আমি যখন দেখতে আসি তুই তখন তদন্তের কাজে চলে এসেছিস এখানে।''

সব শুনে আমি বললাম, ''আমার সমস্ত অঙ্কটাই তাহলে ভুল হয়ে গেল। আমি কিন্তু ঘটনার গতি-প্রকৃতি দেখে এদের দুজনকেই সন্দেহ করেছিলাম।''

''স্বাভাবিক। তবে এখন তুই অন্য কোনওভাবে চিন্তাভাবনা কর।''

আমি বললাম, ''তাই করতে হবে দেখছি।'' বলে মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে রণেন্দুকে সঙ্গে নিয়েই গঙ্গার ঘাটে এলাম।

রণেন্দু বলল, ''তুই কি এ ব্যাপারে পুলিশ কুকুরের সাহায্য নিতে চাস?''

''লাভ কী? খুনি তো গঙ্গা পার হয়ে পলাতক। তার নাগাল এখন পাবে কে? তনুশ্রী যদি হঠাৎ করে উধাও হয়ে না যেত তাহলে কিন্তু এতক্ষণে অন্য কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারতাম আমি।''

''এই খুনের ব্যাপারে এখন তোর সন্দেহের তীর কার দিকে?''

''কারও দিকেই নয়, কারণ এটা রহস্যময় খুন। তবে একজন ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাকে আরও কয়েকটা দিন এখানে অপেক্ষা করতে হবে।''

''কে সে?''

''এখানকার শ্মশানকর্মী রামহরি ডোম। সেই বলতে পারবে তার ওই সাইকেল কারা কারা ব্যবহার করত। কেননা ওর ওই সাইকেল যে ব্যবহার করেছে সে ওর বিশেষ পরিচিত। যদিও ঘটনার দিন সে এখানে ছিল না তবুও কয়েকজনের নাম অন্তত সে বলতে পারবে।''

এমন সময় হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেল ভোচনের সঙ্গে। ভোচনকে আমার খুবই ভাল লেগে গেছে। অমন একজন দুর্ধর্ষ গুণ্ডা, অথচ কত নম্র ও বিনয়ী।

আমি ভোচনকে বললাম, ''আচ্ছা ভোচন, রামহরির বউ কি বলতে পারে না সেদিন ওই সাইকেলটা দুপুরবেলা কে নিয়েছিল?''

''পারা তো উচিত। আবার নাও পারে। কেননা এটা তো বারোয়ারির সাইকেল হয়ে গেছে। যে কেউ যখন তখন নেয়। চলুন তো দেখি।''

আমরা শ্মশানের প্রান্তে রামহরির ঘরের দিকে চললাম। রণেন্দু আমি আর ভোচন।

রামহরির বউটা অত্যন্ত মুখরা। আমরা গিয়ে রামহরির কথা জিজ্ঞেস করতেই অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করল। তবে বেশিক্ষণ নয়, ভোচনেব চোখের দিকে তাকিয়েই একসময় চুপ হয়ে গেল সে।

আমরা স্থান ত্যাগ করে শ্মশানের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম।

ভোচন বলল, "এই রামহরিকে কিন্তু যা তা লোক ভাববেন না। কী হারে যে পয়সা রোজগার করছে ও তা ভাবলে অবাক হয়ে যাবেন। ওই যে সাইকেল, বারোয়ারির। ও তো ওর কেনা নয়, কার জিনিস কোথা থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছে তা কে জানে? তারপরে ওই দেখুন, ও-ধারে ওর চোলাই মদের ঠেক। তা ছাড়া সাইকেল চুরির চক্র একটা আছে। সুদে টাকা খাটায়। আর তার চেয়েও বড় কাজ যেটা করে সেটার ব্যাপারে অনেকেই জানে না। যত বেওয়ারিশ মড়াকে ও পোড়াতে নিয়ে এসে বস্তাবন্দী করে এই গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রেখে পচতে দেয়। তারপর সেগুলো পরিষ্কার করে আস্ত কঙ্কালগুলো বিক্রি করে চড়া দামে।"

রণেন্দু আমি দুজনেই অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, "সে কী! কই চলো তো দেখি!"

ভোচনের সঙ্গে ছোট একটা জঙ্গল পার হয়ে এক জায়গায় গিয়ে দেখি দুর্গন্ধে আর টেকা যাচ্ছে না। কতকগুলো দড়ি বাঁধা বস্তা গঙ্গার জলে ডোবানো আছে। তাকে ঘিরে কাক-শকুন উড়ছে। আর দড়ির প্রান্তগুলো বাঁধা আছে গঙ্গার দিকে ঝুঁকে পড়া কিছু গাছের ডালে। সেইখানই আশপাশে মরচে ধরা লোহার এমন কতকগুলো ছুরির মতো ধারালো জিনিস পড়ে আছে যা দেখেই শিউরে উঠলাম আমি। ওই দুর্গন্ধিযুক্ত জায়গায় আর কিছুক্ষণ থাকলেই বমি উঠে আসত, তাই পালিয়ে এলাম। আসবার সময় মবচে ধরা একটা ছুরিও নিয়ে এলাম সঙ্গে।

ওই জিনিসটা হাতে নিতেই ভোচন হাঁ-হাঁ করে উঠল। বলল, "ফেলে দিন স্যার, বাজে জিনিস। চালের বস্তার ভেতর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা বোমাযন্ত্রর মতোই এই ধারালো অস্ত্রগুলো। গায়ে করাতের মতো খাঁজ কাটা। এই অস্ত্র দিয়েই রামহরি পচা শবদেহ পরিষ্কার করে। ও নিয়ে আপনি কি করবেন?"

আমি হাসলাম। বললাম, "এই মুহূর্তে এটাকেই আমার বিশেষ প্রয়োজন। জগদানন্দ রায়ের হত্যারহস্যের জট খুলতে এটারও প্রয়োজন আছে।"

ভোচন চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "সেকি!"

"এখন তোমার প্রথম এবং প্রধান কাজ হল এইদিকে লক্ষ্য রাখা। আর রামহরি এলেই আমাকে খবর দেওয়া।"

আমি রণেন্দুকে নিয়ে ফিরে এলাম।

সে রাতেই রামহরির ফিরে আসার খবর পেয়ে থানা থেকে পুলিশ নিয়ে হাজির হলাম শ্মশানে।

পুলিশ দেখেই তো রামহরির চক্ষুস্থির।

আমরা তাকে কোনও কথা না বলে হাতকড়াটা দেখিয়ে একভাবে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

অমন ভয়ঙ্করদর্শন রামহরির মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। অতিকষ্টে ভয়ে ভয়ে সে বলল, "আপনারা?"

"হ্যাঁ, আমরা। তুমি কি সব দোষ স্বীকার করে নিজের থেকেই ধরা দেবে? না আমরা মারতে মারতে নিয়ে যাব তোমাকে?"

"আ-আ-আমার অপরাধ?"

"জগদানন্দ রায়কে প্রকাশ্য দিবালোকে তুমি এইরকমই একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে গঙ্গা পার হয়ে পালিয়েছিলে।"

"মিথ্যে কথা। খুনের দিন আমি এখানে ছিলাম না। হাইকোর্টে কেস লড়তে গিয়েছিলাম।"

"সেরকম কোনও প্রমাণ মানে কাগজপত্তর তোমার আছে? তোমাকে যদি হাইকোর্টে নিয়ে যাওয়া হয় তুমি প্রমাণ করতে পারবে ওইদিন কোর্টে তোমার হাজিরা ছিল? আসলে তুমি মনে মনে খুনের ছক এঁকে কোর্টে তোমার হাজিরা দেওয়ার ধাপ্পা দিয়ে এখান থেকে উধাও হয়ে যাও। পরে কাজ হাসিল করে দু'দিন গা ঢাকা দিয়ে ফিরে এসেছ আজই। ঠিক কিনা বল?"

রামহরি আর উত্তর দিতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ইনসপেক্টর বললেন, "আর তুমি নিজেকে লুকোতে পারবে না রামহরি। ওইরকম একজন লোককে কেন তুমি এইভাবে খুন করলে সেটা আমরা জানতে পারি কি?"

রামহরি বলল, "হঠাৎ মাথা গরম করে উত্তেজনার মাথায় করে ফেলেছি কাজটা। উনি আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে বীরপুরের মানিক মণ্ডলকে সাহায্য করেছিলেন। শুধুমাত্র ওনার জন্যই রঘুনাথপুরের এই ঘাট আমার হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই...।"

ইনসপেক্টরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "স্কাউন্ড্রেল।" বলেই হাতকড়া লাগালেন ওর হাতে।

হত্যাকারী ধরা পড়ল।

পরদিন সকালে রণেন্দুকে নিয়ে আমিও ফিরে এলাম কলকাতায়।

এর কিছুদিন পরেই শুভেন্দুর সঙ্গে তনুশ্রীর বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র পেলাম। তবে অত্যধিক কাজের চাপে সেই বিয়েতে আমি উপস্থিত হতে পারিনি।

যুগলময়ূরী

কী ভয়ঙ্কর দুর্যোগ। আজ ক'দিন ধরেই চলেছে একটানা ধারাবর্ষণ। থামবার নামটি নেই। ঘরে বসে হাঁফিয়ে উঠছি তাই। টিভি দেখতে ভাল লাগছে না। গল্পের বই পড়তে ভাল লাগছে না। কেমন যেন একঘেয়ে লাগছে। অথচ রাখহরির মধ্যে বিরক্তির কোনও বালাই নেই। সে দিব্যি জলে ভিজছে, ঘরের কাজ করছে, নিজের মনে গান গাইছে। বেশ আছে।

সকাল এখন সাড়ে ছ'টা। এই বৃষ্টিতেও কাগজওয়ালা ঠিক এসে কাগজ দিয়ে গেল। চারদিক জলময়। এই জল ভেঙে কী করে যে কাগজ নিয়ে এল বেচারি তা ভেবে পেলাম না।

সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে খবরের কাগজের পাতায় যখন চোখ রেখেছি তখনই রাখহরি কতকগুলো নোনতা বিস্কুট আর কাপ ভর্তি ধূমায়িত গরম কফি এনে সামনে রাখল। আমি দারুণ খুশি হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুই কি জাদু জানিস?"

রাখহরি বলল, "এ তো রোজের ব্যাপার। এর মধ্যে জাদুর কিছু নেই। এখন বলুন, আজকের মেনুটা কী হবে? মাছ না মাংস?"

"যা তুই খাওয়াবি। তবে আজকের এই দুর্যোগে কিছুই পাবি না তুই। বাজারই বসবে না ভাল করে।"

"ও ব্যাপারটা আমারই ওপর ছেড়ে দিন। কী খাবেন তাই বলুন?"

আমি কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললাম, "মাছ পেলে মাছ, মাংস পেলে মাংস। তবে কিনা মুরগির মাংস নয়। আজ বরং খাসির মাংস নিয়ে আসিস।"

রাখহরি বর্ষাতিতে গা ঢেকে ওই বৃষ্টিতেই চলে গেল বাজারে।

আমি খবরের কাগজের প্রতিটি পাতায় সবরকম খবরই খুঁটিয়ে পড়তে লাগলাম। তবে সেরকম কোনও বিশেষ খবর আজকের কাগজে দেখলাম না। এর মধ্যে দুবার দুটি ফোন এল। একটি রণেন্দুর, অপরটি আমার এক সহকর্মী বন্ধুর। আমি চাকরি ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও ওরা প্রায়ই আমার খোঁজখবর নেয়। সবারই অভিযোগ, চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে আমার কোন চতুর্বর্গ ফললাভটা হল? উত্তরে আমিও বলি, 'পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হলাম এটাই আমার সবচেয়ে বড় লাভ।'এমনকী আমি এও বলি, 'এখন আমার কোনও বাঁধন নেই। আপন মনেই ঘুরি-ফিরি, তদন্তের কাজ করি। আগের চেয়েও এখন আমি অনেক-অনেক ভাল আছি।'

বৃষ্টিটা আরও জোরে নামল।

এমন সময় বাড়ির সামনে গাড়ির আওয়াজ। হর্নের শব্দ শুনে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললাম। দরজাটা এমনই বন্ধ ছিল। রাখহরি যাওয়ার পরে আর ছিটকিনি লাগানো হয়নি।

দরজা খুলতেই দেখলাম বর্ষাতি মোড়া এক স্যুটেড-বুটেড যুবক গাড়ি থেকে নেমে হন হন করে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। চেনা কেউ বলে মনে হচ্ছে না। অথচ হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন কত পরিচিত। মাথায় টুপি ও বর্ষাতির কারণে মুখও দেখা যাচ্ছে না ভালভাবে।

আগন্তুক আমার সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, "ভেতরে ঢুকতে বলবি, না এখান থেকেই বিদায় নেব?"

খুব পরিচিত না হলে কেউ এভাবে কথা বলবে না। তাই সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললাম, "সেইজন্যই তো দুয়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি বন্ধু।"

অতিথি এবার ঘরে ঢুকে বর্ষাতিটা এক কোণে রেখে জুতো খুলে বলল, "তোর বাথরুমটা কোথায় বল দেখি?"

আমাকে বলে দিতে হল না। ও নিজেই বাথরুম চিনে ঢুকে পড়ল। তারপর মুখ-হাত-পা ধুয়ে এসে আমি কিছু বলার আগেই সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বলল, "দশ বছর আগে রণেন্দুর সঙ্গে একবার তোর এখানে এসেছিলাম। তারপর এই। চিনতে পারছিস?"

এতক্ষণে চিনতে পারলাম। বললাম, "দিবাকর না?"

দিবাকর বলল, "চিনতে পেরেছিস তা হলে?"

"তোর যে ভোল পাল্টে গেছে। আগের চেয়ে একটু মোটাও হয়েছিস। গলার স্বর ভারি হয়েছে। চাপদাড়িতে মুখ ঢাকা পড়েছে অনেকটা। তার ওপর অনেকদিনের ব্যবধান, তাই চিনতে একটু অসুবিধে হল। তা হঠাৎ এতদিন বাদে আমাকে মনে পড়বার কারণ?"

দিবাকর বলল, "কারণ আছে। না হলে শুধু শুধু সময় নষ্ট করে কে আসে বল? বিশেষ করে আমি ব্যস্ত মানুষ।"

"তুই এখন আছিস কোথায়?"

"চন্দ্রপুরায়। কাল রাতে সদর স্ট্রিটে একটা হোটেলে ছিলাম। কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে আজ সকাল হতেই ছুটে এসেছি তোর কাছে। তোর ফোন নম্বরটা হারিয়ে ফেলেছি। তাই না জানিয়েই চলে এলাম।"

"বেশ করেছিস। ছোটবেলায় একসঙ্গে এক স্কুলে পড়তাম আমরা। বিকেলে অনুশীলন সমিতির মাঠে খেলা দেখতে যেতাম। কী সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো।"

"এখনকার দিনগুলো তেমনই বিরক্তিকর। তাব ওপর ক'দিন ধরে যা লাগিয়েছে আকাশটা, থামবার আর নামটি নেই। এখন একটু চা খেয়ে দুপুরে খাওয়ার পাটটাও তোর এখানে সেরে তারপর বিদায় নেব। তা তোর সেই ছেলেটা কোথায় গেল? রাখহরি না কী যেন নাম?"

বলতে বলতেই রাখহরি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। ওর ব্যাগ ভর্তি বাজার। হাতে খাবারের প্যাকেট। এই বর্ষায় বুদ্ধি করে মুখরোচক কী এনেছে তা কে জানে?

আমি রাখহরিকে বললাম, "অনেকদিন বাঁচবি রে তুই। এইমাত্র তোর নামই হচ্ছিল।"

রাখহরি ওর স্বভাবসুলভ হাসি হেসে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের জন্য গরম সিঙাড়া আর চা নিয়ে এল।

দিবাকর একটি প্লেট হাতের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "ভাগে কম পড়ল তো?"

রাখহরি বলল, "উঁহু। আমি কোনওকিছুই গোনাগুনতি আনি না। তা ছাড়া বাড়ির কাছেই দোকান। প্রয়োজন হলে...।"

যাই হোক, আমরা দু'বন্ধুতে চা-সিঙাড়া খেতে খেতেই নানারকম গল্পে মেতে উঠলাম।

রাখহরিও ওর কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর দিবাকর বলল, "শোন, যে জন্য এই দুর্যোগ মাথায় নিয়েও তোর এখানে আসা সে কথাই বলি এবার। কিছুদিন আগে প্রায় সব কাগজেই যুগলময়ূরীর একটা চাঞ্চল্যকর কাহিনী ছাপা হয়েছিল, তোর মনে আছে?"

ওর কথায় রহস্যের গন্ধ পেয়ে আমি নড়েচড়ে বসলাম। বললাম, 'মনে আছে। ব্যাপারটা সত্যই রহস্যময়। ও নিয়ে আমিও অনেক ভাবনাচিন্তা করেছি। কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। তাই প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিলাম ব্যাপারটা।"

"ভুলে গেলে চলবে না। ওই যুগলময়ূরীর অন্তর্ধান রহস্য তোকেই উন্মোচন করতে হবে। পারলে উদ্ধার করবি ওই দুর্লভ সম্পদ। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশনে তোর এখন নামডাক খুব। তাই এ কাজের উপযুক্ত তুই ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। এই কাজের জন্য অবশ্য মোটা টাকা পারিশ্রমিকও পাবি।"

"পারিশ্রমিক পাওয়াটা আমার কাছে বড় কথা নয়। কাজে সাফল্য লাভ করাটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। যুগলময়ূরীর বৃত্তান্ত আকর্ষণীয়। তবে কিনা অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রায় একমাস আগে ঘটনাটা পড়েছি কাগজে। তার ওপর এখন এই ঘনঘোর বর্ষায়...।"

"আমি কিন্তু রম্যাণীকে কথা দিয়েছি। ও তোরই আশায় পথ চেয়ে বসে আছে।"

"রম্যাণী কে?"

"সুন্দরগড়ের রাজপরিবারের একমাত্র মেয়ে।"

আমাদের আলোচনাটা বোধ হয় কানে গিয়েছিল রাখহরির। তাই আরও এক কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে এসে আমাদের সামনে রেখে আগের কাপ-ডিশ ও প্লেটগুলো নিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, "এই কেসটা আপনি কিন্তু নিতে পারেন। ওইখানকার ঘটনার কথা সেদিন খবরের কাগজে যা বেরিয়েছিল তা আমিও পড়েছি।"

দিবাকর বলল, "তা হলেই বুঝে দ্যাখ। কাগজে তো পড়েইছিস, তবু আমার মুখে শোন। আধকেজি ওজনের সোনার ওই যুগলময়ূরীর সর্বাঙ্গে ছোট বড় মিলিয়ে মোট একশ আটটি মূল্যবান হিরে বসানো ছিল। আর ময়ূরীদুটির মাথায় ছিল দুটি দুষ্প্রাপ্য বৈদুর্যমণি। ক্যাটস্ আই-এর মতো সেই মণি দুটি ছিল বিশ্বের সমাদরের এবং অত্যন্ত মূল্যবান। এই যুগলময়ূরী সুন্দরগড়ের ঐতিহ্য। এটি যে কত প্রাচীন তা ওই পরিবারেরও কেউ জানেন না। সুন্দরগড় রাজপরবারের শেষ বংশধর বিষ্ণুকান্ত আচার্য। তিনি এখন বয়সের ভারে নত। তাঁব এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেটি নাগপুরে এক রিসার্চ সেন্টারে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করত। ওর নাম চন্দ্রকান্ত। মেয়ে রম্যাণী অনার্স গ্র্যাজুয়েট। গতবছর ছেলেটি নাগপুরে এক দুর্ঘটনায় মারা যায়। তার ঠিক একবছর পরেই এই যুগলময়ূরীর অন্তর্ধান। একদিন ভোরে বিষ্ণুকান্ত স্বপ্ন দেখলেন তাঁর বংশের ঐতিহ্য যুগলময়ূরী নীল আকাশে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। স্বপ্ন দেখেই তিনি উঠে এসে সিন্দুক খুলে দেখেন যুগলময়ূরী উধাও। একে তো পুত্রশোক, তার ওপর এই মূল্যবান সম্পদের অন্তর্ধান। ফলে মানসিকভাবে দারুণ বিপর্যস্ত হয়ে তিনি এখন শয্যাশায়ী।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ওঁর স্ত্রী বেঁচে নেই?"

"না। কয়েক বছর আগেই উনি মারা গেছেন।"

"ওই বাড়িতে এখন তা হলে...।"

"বিষ্ণুকান্তবাবু, রম্যাণী ও একজন কাজের লোক ছাড়া আর কেউ নেই।"

সব শুনে আমি বললাম, "আছে। চতুর্থ কোনও ব্যক্তি নিশ্চয়ই আছে এর ভেতরে। না হলে যুগলময়ূরী চুরি যায় কী করে? কোনও যুক্তিতেই কোনও জড় পদার্থর আকাশে উড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া...।"

"তা ছাড়া কী?"

"চন্দ্রকান্তর ওই দুর্ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা না হয়ে খুনও তো হতে পারে!"

দিবাকর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ওদের তো কোনও শত্রু নেই।"

"গুপ্ত শত্রু থাকতে পারে।"

"সেজন্যই আমি চাই এর রহস্য তুই-ই গিয়ে উন্মোচন কর। পারলে উদ্ধার কর যুগলময়ূরীকে।"

আমি ওর কথা শুনে নানারকম চিন্তা করতে করতে অকারণেই একবার ঘরময় পায়চারি করে বললাম, "যুগলময়ুরী উদ্ধার হবে কিনা জানি না। তবে চোরকে আমি ধরব। তার আগে বল, ওই পরিবারের সঙ্গে তোর পরিচয়টা কীভাবে গড়ে উঠল?"

দিবাকর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "রাজনন্দগাঁওয়ে আমার এক রিলেটিভ আছেন। ওঁদেরও এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেটির নাম বিজয়, মেয়েটির নাম জয়। এদের সঙ্গে রম্যাণী ও তার দাদা চন্দ্রকান্তর খুব মেলামেশা ছিল। সেই সূত্র ধরেই আমি ওদের

পরিচিত হই। রাজনন্দগাঁও থেকে জায়গাটার দূরত্ব কুড়ি কিলোমিটার। দারুণ সুন্দর জায়গা। লালমাটির প্রান্তরে শাল-পিয়ালের জঙ্গলে ভরা জায়গাটার সর্বত্র ছোট ছোট টিলা। যেমন নির্জন, তেমনই মনোরম।"

আমি বললাম, "তবে তো যেতেই হবে আমাকে। সুন্দর প্রকৃতি যেখানে হাতছানি দিচ্ছে সেখানে কি আমি না গিয়ে পারি? তবে এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আমার কাজের সুবিধার জন্য জিজ্ঞেস করি, রাজনন্দগাঁও-এর তোর ওই আত্মীয়দের সঙ্গে রম্যাণী ও তার দাদার খুব মেলামেশা ছিল, এখন কি তা নেই?"

দিবাকর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "না নেই। তার কারণ বিজয়ের খুব ইচ্ছে ছিল এই দুই পরিবারের মধ্যে একটা মধুর এবং স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার কিন্তু সুন্দরগড়ের রাজপরিবারের ঐতিহ্য এবং বংশমর্যাদা ওর সেই আশা এবং আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ওদের ওই দুই পরিবারের মধ্যে কোনওরকম বন্ধুত্বের সম্পর্ক এখন আর নেই।"

আমি হেসে বললাম, "অথচ তোর সঙ্গে সম্পর্কটা অটুট রইল, ব্যাপারটা কী রে?"

দিবাকর বলল, "ব্যাপারটা কিছুই নয়, রম্যাণী।"

"রম্যাণী!"

"হ্যাঁ। ওর সঙ্গে আমারও একটা চিরস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার স্বপ্ন আমিও দেখেছিলাম। কিন্তু ওদের গোঁড়ামো দেখে আর এগোতে সাহস করিনি। তাই ওদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কটাই শুধু বজায় রেখেছি। এরই কারণে রাজনন্দগাঁও-এর সঙ্গেও আমার সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। জয়ার বিয়েতেও আমাকে নেমন্তন্ন করেনি। ও এখন নাগপুরে আছে। বিজয়ও ডোঙ্গরগড়ের এক প্রভাবশালী ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী।"

আমি বললাম, "তার মানে এই তদন্তের ব্যাপারে ওদের কোনও সাহায্যই আমি পাব না। তা যে ক'দিন সুন্দরগড়ে আমি থাকব সেই ক'দিন তোর সাহায্য কি আমি পেতে পারি?"

"না রে! আমাকে আজ এবং এখনই ফিরে যেতে হবে চন্দ্রপুরায়। আমি চাই ওদের পরিবারের জন্য কিছু অন্তত তুই কর।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে। কাল-পরশুর মধ্যেই রওনা হব আমি। শুধু ওদের ওখানে যাবার পথ-নির্দেশিকা একটা তৈরি করে দে।"

"তা তো দেবই। এমনকী তোর যাওয়ার টিকিটের ব্যবস্থাও করে দেব। আজই সন্ধের মধ্যে তুই তোর টিকিট পেয়ে যাবি।"

"কীভাবে?"

"অত জানার তোর কোনও প্রয়োজনই নেই।" বলেই ও কাকে যেন আমার নাম বয়স ইত্যাদি জানিয়ে ফোন করল। তারপর ফোন রেখে বলল, "বম্বে মেল বা আমেদাবাদ এক্সপ্রেসে হচ্ছে না, কুরলা এক্সপ্রেসে হয়ে যাবে।"

আমি বললাম, "আমার যাওয়া নিয়ে কথা।"

এরপর দিবাকর চলে যেতে চাইলেও আমি ওকে ছাড়লাম না। দুপুরে মাংস-ভাত খাইয়ে তবেই ওকে যেতে দিলাম। আর ঠিক সন্ধের মুখেই ঘরে বসে টিকিট পেয়ে গেলাম

দিবাকরের এক বন্ধুর মারফত। এ.সি. স্লিপারের একটা টিকিট। আগামীকাল কুরলা এক্সপ্রেসের।

বেলা এগারোটা তিরিশ মিনিটে হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু করে পরদিন সকাল ছটা সাঁইত্রিশে যখন রাজনন্দগাঁওয়ে ট্রেন থেকে নামলাম তখন একবারের জন্যও মনে হল না এটা বর্ষাকাল বলে। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। সকালের সোনার আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। পরিবেশ দেখে মন আমার আনন্দে ভরে গেল।

আমি স্টেশনের বাইরে এসে সুন্দরগড়ে যাবার জন্য একটা টাঙ্গা ভাড়া করলাম। অনবদ্য প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্যের দেশে ছোট ছোট টিলা পাহাড় পেরিয়ে একসময় সুন্দরগড়ে রাজপ্রাসাদের সামনে এসে নামলাম। রাজপ্রাসাদ বলতে চোখের সামনে যে ছবি ভেসে ওঠে তা কিন্তু নয়। মধুপুর-শিমূলতলায় বাঙালিদের বসবাসের যেরকম বাড়ি আছে অনেকটা সেইরকম। তা হোক, তবু তো রাজবাড়ি।

আমি টাঙ্গা থেকে নামতেই হাসিমুখে যে এসে আমাকে অভ্যর্থনা করল তাকে দেখেই আমি মোহিত হয়ে গেলাম। মনে হল হিন্দি ছায়াছবির কোনও রঙিন পর্দা থেকে কোনও নায়িকা যেন আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে একজন পরিচারিকা। সে-ও সুন্দরী কম নয়।

বললাম, "আপনিই কি রম্যাণী?"

মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে সে বলল, "হ্যাঁ, আমিই। পথে আপনার কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

"একেবারেই না। বরং এই দীর্ঘ পথ টাঙ্গায় আসতে আসতে মনে হচ্ছিল এই পথ যেন কখনও শেষ না হয়। তা যাক, আমি যে আসব আপনি জানতেন?"

"জানতাম। তবে এত তাড়াতাড়ি আসবেন তা অবশ্য ভাবতে পারিনি। আসুন, ভেতরে আসুন।"

আমি ওর সঙ্গে ভেতরে গেলাম। আমার থাকার জন্য ঘরের ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল। ঘরটি বেশ সাজানো গোছানো। বাইরের লোকজন কেউ এলে এই ঘরটিই মনে হয় অতিথির জন্য বন্দোবস্ত করা হয়। আমার খুব পছন্দ হল ঘরটি।

রম্যাণী ওর পরিচারিকাকে বলল, "মালা, তুই কিন্তু সবসময় কাছে কাছে থাকবি। কখন কি দরকার হয় ওঁর তার তো ঠিক নেই। দেখিস যেন কোনও অসুবিধে না হয়। আমি তো আছিই, তবু সব সময়ের জন্য কিন্তু তুই।"

মালা 'আচ্ছা' বলে চলে গেল।

দুপুরে জোর খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিলাম। বিকেল হতেই একমুখ হাসি নিয়ে রম্যাণী এল অপূর্ব সাজে। বলল, "চলুন, আপনাকে ছোট কাশ্মীর থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।"

"ছোট কাশ্মীর?"

"আমার দেওয়া নাম।"

"কিন্তু যে কাজের জন্য এলাম সে ব্যাপারে তো একটু আলোচনা হওয়া দরকার।

আপনার বাবার সঙ্গেও পরিচয় হল না।''

''হবে হবে। সব হবে। এই তো এলেন। এখানে সন্ধে হলেই রাত। রাত মানেই অন্ধকার। তখনই চিন্তাভাবনা যা করবার করবেন।''

আমি রম্যাণীর আহ্বানে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে নিলাম। এমন সুন্দর পরিবেশে এসে চমৎকার প্রকৃতি দেখতে পাবার এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে কখনও। তা ছাড়া অচেনা কোনও জায়গায় তদন্তের কাজে গেলে সেখানকার পথঘাটের একটা মানচিত্রজ্ঞান অবশ্যই থাকা দরকার। তদন্তের কাজ কতটা এগোবে না-এগোবে, সেটা পরের কথা। যুগলময়ূরী উদ্ধার যে আমার পক্ষে সম্ভব নয় তা আমিও জানি। তবে চোরকে ধরতে পারব এমন আশা আমি এখনও রাখি। এ-কাজটা অবশ্য আমি অন্তরের তাগিদেই করব। কোনও পারিশ্রমিকের আশায় নয়।

রম্যাণীর সঙ্গে পথে বেরিয়ে যেন এক অন্য জগতে পৌঁছে গেলাম। মালভূমির মতো এই প্রান্তরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কত যে ছোট-বড় টিলা তার যেন আর শেষ নেই। চারদিকের ভূমি প্রকৃতি লাল। টিলাগুলি রঙিন পাথরের। একদিকে একটু নিম্নভূমিতে রূপোলী ফিতের মতো ছোট্ট একটি নদী বয়ে যাচ্ছে। নাম রুপসা।

এখানে এসে এমনই মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি যে বলতে বাধ্য হলাম, ''আপনার দেওয়া নাম দেখছি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। পাহাড়ের ঢালে ঘন বনানী, এই নদীর স্বচ্ছ ধারা, এখানকার প্রকৃতি, এতই সুন্দর যে সত্যই ভূস্বর্গ। এখানকার এই উপত্যকাকে ছত্তিশগড়ের কাশ্মীর ছাড়া আর কী-ই বলা যেতে পরে?''

আমার কথায় খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল রম্যাণী। তারপর বড় একটি পাথরের চটানে আমাকে বসতে বলে নিজে বসে বলল, ''আমি রোজ বিকেলে এখানে আসি। অন্যদিন মালা সঙ্গে থাকে। আজ আপনি আছেন বলে ওকে নিয়ে এলাম না।''

আমি একটু হেসে বললাম, ''জায়গাটা আমারও খুব ভাল লেগেছে। যদি আপত্তি থাকে তা হলে সময় পেলেই আমি কিন্তু এখানে চলে আসব।''

''নিশ্চয়ই আসবেন। এলে খুব খুশি হব। এই নির্জনে আপনার মতো সুন্দর এক বন্ধু পেলে ধন্য হব আমি।''

আমরা যেখানে বসেছি সেখান থেকে অনেকগুলো টিলার ফাঁক দিয়ে সুন্দরগড়ের রাজবাড়িটা ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো দেখা যাচ্ছে। আমি কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, ''দিবাকরের মুখে আপনাদের যুগলময়ূরীর বৃত্তান্ত আমি শুনেছি।''

রম্যাণী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ''এমন যে হবে কখনও ভাবতেও পারিনি।''

''ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে হল আমাকে একটু বলুন তো। জিনিসটা কোথায় কার কাছে থাকত?''

''আমার বাবার কাছে, সিন্দুকে।''

''চাবি থাকত কার কাছে?''

''বাবার মাথার বালিশের নীচেই থাকত চাবিটা। মূর্তিটা চুরি যাওয়ার পরও চাবি বাবার কাছেই ছিল।''

''আশ্চর্য!''

''বাবার ওই স্বপ্নের কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন?''

"শুনেছি। স্বপ্নে এমন অবাস্তব অনেক কিছুই দেখা যায়। কিন্তু চুরিটা চুরিই। দুটো ব্যাপার একই সঙ্গে হওয়ার ফলে মনে হয়েছে স্বপ্নই সত্য। মানুষের মনের ব্যাপারটা এমনই যে ভাল-মন্দ কিছু হওয়ার আগে মনের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সব সময় না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই হয়। এখানেও তাই হয়েছে। অর্থাৎ মূর্তি চুরির পরই ওই স্বপ্ন।"

"কিন্তু...!"

"কোনও কিন্তু নেই এর মধ্যে। ওটা চুরিই।"

"এই সুন্দরগড়ে চোর-ডাকাতের উপদ্রব তো কখনও ছিল না। থাকলে কবেই চুরি হয়ে যেত। আমাদের প্রজারা এত ভাল যে আমরা তাদের নয়নের মণি। কাজেই এ কাজ তারা করবে না। ও জিনিস বংশ পরম্পরায় আমাদের কাছে রয়েছে। সবাই জানে। তবু ওটি যে এমন রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা আমাদের কখনও হয়নি।"

আমি বললাম, "দেখুন, এই চুরির ব্যাপারে সুন্দরগড়ের মানুষজন দায়ী নন। কিন্তু বহিরাগত কারও দ্বারাও তো এ কাজ সম্ভব হতে পারে।"

"বহিরাগত কেউ এই দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে যাতায়াত করলে কারও না কারও নজরে পড়ে যেতই।"

"সেজন্য সে রাতের অন্ধকারকে বেছে নিয়েছে। রাতেই এসেছে, রাতেই কাজ হাসিল করেছে, রাতেই উধাও হয়েছে। যাক সে কথা, এখন দেখতে হবে বাইরের লোক কারা এখানে আসা-যাওয়া করত?"

"একসময় এখানে ঘন ঘন যাতায়াত করত আমার দাদার বন্ধু রাজনন্দগাঁওয়ের বিজয়দা ও তার বোন জয়া। আর মাঝে-মাঝে আসতেন দিবাকরদা। বিজয়দার খুব ইচ্ছে ছিল...।"

"আমি জানি।"

"তা সম্ভব হয়নি দুটি কারণে। এক, আমাদের বংশ মর্যাদার উপযুক্ত ওরা নয়। দুই, আমি পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে নাচ ও অভিনয় শিখছিলাম ভবিষ্যতে একজন চিত্রাভিনেত্রী হব বলে। ইচ্ছে ছিল নিজেই সেই চলচ্চিত্রের প্রযোজনা ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকব। ঠিক সেই একই কারণে আমার দাদার সঙ্গে জয়ারও কোনও স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ফলে ওদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছিল। দিবাকরদা অবশ্য ওদের লুকিয়ে সময় পেলেই এখানে চলে আসেন। উনি আমাদের পরিবারের বন্ধুর মতো।"

"আচ্ছা রম্যাণী দেবী...।"

"আমি দেবী নই, মানবী।"

"আপনার কি একবারও মনে হয়নি, এই বংশমর্যাদার ব্যাপারটা ইস্যু করলে সারা জীবন আপনাকে অবিবাহিতই থাকতে হতে পারে?"

"না না। ঠিক তা নয়। আসলে বাবা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন ধারাটাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখবই। তারপর তো আমি একা। তখন কী করব না করব সে তখনকার ব্যাপার। শুধু দাদার মৃত্যুটাই যা আমাদের সংসারে বিরাট একটা অভিশাপ হয়ে গেছে।"

"আপনার দাদা চন্দ্রকান্তবাবু মারা যান কীভাবে?"

"শুনেছি নাগপুর শহরে জনবহুল ওয়ার্ধা রোডে বেপরোয়া একটি লরির চাকায় পিষ্ট

হযে মাবা যান। ঘটনাব প্রায সাতদিন পবে আমি যখন পুনে থেকে এলাম তখন সব শেষ।"

"তাব মানে আপনাব দাদাব ডেডবডি দেখাব সুযোগটুকুও আপনি পাননি। আপনাব বাবাও নিশ্চযই ।"

"ওঁব পক্ষে কি দেখা সম্ভব? যা কববাব ওব বন্ধুবাই কবেছে।"

আমি সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে বললাম, "ওই বিজযবাবু এখন ডোঙ্গব গডেব এক প্রভাবশালী ব্যক্তিব মেযেকে বিযে কবেছেন, তাই না?"

বম্যাণী বলল, "হ্যাঁ।"

"আব জযাব বিযে হযেছে কোথায যেন?"

"নাগপুবে মাউন্ট বোড এক্সটেনশনে।"

"তা হলে এমন কিছু কি ধাবণা কবা যায না যে আপনাব দাদাব মৃত্যুটা ঠিক দুর্ঘটনা নয, ওটা হত্যাকাণ্ড। আপনাদেব আভিজাত্যেব কাছে মাথা নত কবে প্রতিশোধ নেবাব জন্য ওবা দু'ভাইবোনই যুক্তি কবে ওই কাণ্ড ঘটিয়েছে। আপনাদেব সম্পত্তি এবং যুগলমযূবী দুটোই হাতছাডা হওযায এই আক্রোশ ওদেব।"

আমাব কথা শুনে শিউবে উঠল বম্যাণী। বলল, "কী বলছেন আপনি?"

"মনে হয ঠিকই বলছি। আপনি নিজেই আমাব সন্দেহেব দিকগুলো একটু বিবেচনা কবে দেখুন না?"

দেখতে দেখতে সন্ধে হযে গেল। আমবা আব নদীব ধাবে বইলাম না। প্রাসাদে ফিবে এলাম।

মালা আমাদেব চা কবে খাওযাল। কী মিষ্টি মেযে মালা। ওকে দেখে ওব কথাবার্তা শুনে খুব ভাল লাগল আমাব।

চা পর্ব শেষ হলে বম্যাণী আমাকে নিযে গেল ওব বাবাব কাছে। অশীতিপব বৃদ্ধ বিষ্ণুকান্ত আচার্য বযসেব ভাবে এবং পুত্রশোকে নুযে পডেছিলেন। আমি গিযে প্রণাম কবে আসন গ্রহণ কবতেই উনি বললেন, "তুমিই সেই? মানে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটব?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দিবাকব তোমাব কথা বলেছিল আমাকে। তা কী নাম যেন তোমাব?"

নাম বললাম।

"চ্যাটার্জি। অর্থাৎ ব্রামিন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমাদেব বংশে কেউ কখনও বাজা ছিল?"

"না। তবে ভিখাবিও ছিলেন না কেউ।"

"বিযে কবেছ?"

"উঁহু।"

"কেন কবোনি?"

"আসলে মনেব দিক থেকে সেবকম কোনও সাডা পাইনি তাই।"

"বেস্ট অব লাক। তোমাব দ্বাবাই কোনও বড কাজ সম্ভব। পাববে তুমি আমাব যুগলমযূবীকে উদ্ধাব কবতে?"

"না।"

"তা হলে কেন এসেছ এখানে?"

"আপনার মতো একজন মানুষের পায়ের ধুলো নিতে। আপনার সুন্দরগড়কে ভালবাসতে। এত ঐশ্বর্যের মানুষ হয়েও আপনার এই নিরালাবাস আমাকে বিস্মিত করেছে।"

"এখানকার প্রকৃতি আমাকে প্রেরণা দেয়। এখানকার মাটি আমার মা। আর ওই যুগলময়ূরীকে নিরাপদে রাখার এর চেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর হতে পারে না।"

"তবু তো ধরে রাখতে পারলেন না যুগলময়ূরীকে।"

"যে নিজের থেকে চলে যায় তাকে কি কেউ ধরে রাখতে পারে বাবা? ছেলে গেল, ময়ূরী গেল। শেষ সময়ে ছেলের মরা মুখটাও একবার দেখতে পেলাম না। শুনলাম ওর মুখটা নাকি এমনভাবে থেঁৎলে গিয়েছিল যে একদম চেনাই যাচ্ছিল না। এখন শুধু রম্যাণীকে নিয়েই আমার চিন্তা। বেঁচে থাকতে ওর একটা কোনও ব্যবস্থা আমি করে যেতে পারলাম না, এও আমার আর এক দুঃখ।"

বিষ্ণুকান্তবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার ঘরে এলাম। রম্যাণীও এল।

মালা জলখাবার নিয়ে এল আমাদের জন্য। রম্যাণী আমি দুজনেই খেতে বসলাম। নানাবিধ মিষ্টান্ন। অন্যান্য খাবার।

অবাক হয়ে বললাম, "এই গাঁয়ে এতসব পেলেন কী করে?"

রম্যাণী হেসে বলল, "কেন? গ্রাম বলে কি মানুষের বাস নেই? পাশের গ্রাম থেকে আনিয়েছি।"

আমি মালাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এবার তোমাকে কতকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, উত্তর দাও তো?"

মালা ভয়ে ভয়ে তাকাল আমার দিকে।

আমি হেসে বললাম, "ভয় পাচ্ছো কেন? তুমি এ বাড়িতে কতদিন আছো?"

"খুব ছোটবেলা থেকেই। বাবা-মা'র কথা মনে পড়ে না। এখানেই মানুষ আমি।"

"সে রাতের কথা তোমার কিছু মনে আছে?"

"উল্লেখযোগ্য কিছুই তো ঘটেনি সে রাতে। তেমন কিছু মনেও করতে পারছি না।"

"এ বাড়ির দরজা কখন বন্ধ হয়?"

"বাইরের দরজা সবসময়ই বন্ধ থাকে। অন্যগুলো রাত দশটার পর।"

"আচ্ছা, বিষ্ণুকান্তবাবু যে ঘরে থাকেন সে ঘরের দরজা বন্ধ করে কে?"

"'ওই ঘরটা খোলাই থাকে। বাবু ওঁর ঘরে কারও শোওয়া পছন্দ করেন না বলে সবাই আমরা আলাদা ঘরেই থাকি। দিদি তো আগে পুনেতে থাকতেন। দাদা মারা যাওয়ার পর থেকে এখানেই আছেন। তবে উনি মাঝেমাঝে রাতে উঠে বাবার ঘরে একবার করে উঁকি দিয়ে দেখেন। আমিও দেখি। তবে ওঁর খুব শরীর খারাপ করলে আমরা কেউ না কেউ থেকে যাই ওঁর ঘরে।"

আমি এবার রম্যাণীকে প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, আপনার বাবা কি একেবারেই হাঁটাচলা করতে পারেন না?"

"তা কেন? উনি তো নিজেই উঠে বাথরুমে যান। মাঝে মধ্যে সকাল অথবা

বিকেলের দিকে বাইরে বেরিয়ে ঘরের কাছেই পায়চারি করেন।''

'এবং সে সময় ঘর একেবারেই ফাঁকা থাকে। যেদিনের ঘটনা সেদিনও কি বাইরে বেরিয়েছিলেন?''

''ঠিক বলতে পারব না। রোজের মতো বিকেলের দিকে মালাকে নিয়ে আমি রূপসার ধারে বসেছিলাম, তবে হ্যাঁ, ওইদিন ফিরতে আমাদের একটু দেরি হয়েছিল। কেননা নদীর ওপারে দেবনগরীতে একটা গ্রামীণ মেলা দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। তিন দিনের মেলা। ওইদিনই ছিল শেষ দিন। ওটা অবশ্য সুন্দরগড়ের এলাকার মধ্যে পড়ে না।''

''তা হলে মনে হচ্ছে রাতে নয়, ওই সময়টুকু মধ্যেই যা হবার তা হয়েছে। আপনারা বাড়িতে নেই। বাবা হয় বাথরুমে অথবা বাইরে পায়চারি করছেন। ঘুঘু চোর এসে তার কাজটি হাসিল করে চলে গেছে। সেই চোর জানত চাবি এবং যুগলময়ূরী কোথায় আছে।''

রম্যাণীর মুখে কথা নেই। মালাও হাঁ করে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

সে রাতটা সুন্দরগড়ে বেশ ভালভাবে কাটিয়ে পরদিন সকাল হতেই রওনা হলাম নাগপুরের দিকে। রহমতের টাঙ্গাতেই স্টেশন পর্যন্ত এসে বেলা একটায় নাগপুর প্যাসেঞ্জারে চেপে রাত এগারোটা নাগাদ নাগপুরে এসে নামলাম। রাতটা বাধ্য হয়েই স্টেশন সংলগ্ন হোটেলে কাটাতে হল। পরদিন সকাল থেকে শুরু হল তদন্তের কাজ।

মৌচাকে ঢিল ছোড়ার জন্য প্রথমই গেলাম থানায়। কেননা এই দুর্ঘটনা হত্যাকাণ্ড হলে যারা একাজ করেছে থানা থেকেই তাদের কাছে খবর পৌঁছে যাবে। তারপব যা হবে বা হতে পারে সেজন্য আমি পুরোপুরি তৈরি।

এরপর সেই রিসার্চ সেন্টারে এলাম, যেখানে চন্দ্রকান্ত বিজ্ঞান গবেষণার কাজ করত। ওয়ার্ধা রোডের দুর্ঘটনাস্থল থেকে গবেষণাগারটা খুব একটা বেশি দূরে নয়। সেখানে গিয়ে ওর বন্ধু স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও সদুত্তর কিছু পেলাম না। সবাই বলল, ''এসব ব্যাপারে আমাদের জড়াবেন না। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি বন্ধুর শেষকৃত্য করবার। আপনার কিছু জানবার থাকলে আপনি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।''

ওদের সাফ কথা জানার পর চন্দ্রকান্ত যে কোয়ার্টারে থাকত সেখানে গিয়ে খোঁজখবর শুরু করলাম। এখানকারই কেয়ারটেক' দুবেজির মুখে এক চাঞ্চল্যকর খবর শুনে রীতিমতো চমকে উঠলাম। দুবেজি বললেন, ''বাবুজি, সাচ বাত বোলনে সে মেরি জিন্দগী খতরেমে পড় যায়েঙ্গে। যো লাশ উনহোনে জ্বালায়া থা উয়ো চন্দ্রকান্ত বাবুকা নেহি থে। দুসরা কিসিকা। চন্দরকান্ত জিন্দা হ্যায়।''

''জিন্দা হ্যায়!''

''হাঁ বাবু। শেঠ ধরমচান্দ উনকো কয়েদ করকে রাখ্খা হ্যায়।''

''কিঁউ?''

''ও তো মুঝে মালুম নেহি।''

পরে ও যা বলল তাতে বোঝা গেল সেদিন ও দূর থেকে লক্ষ করেছে ধরমচাঁদের লোকেরা ওকে একটা গাড়িতে করে উঠিয়ে নিয়ে গেছে।

আমি বললাম, ''ওরা ওকে কোথায় রেখেছে বলতে পারো?''

দুবেজি বললেন, "বাবুজি, আমি গরিব আদমি আছে। আমার এক লেড়কির সাদী ভি দিতে বাকি আছে। ওই শেঠজি জানতে পারলে বরাবরের জন্য আমার দুশমন হয়ে যাবে। আমরা জিন্দগী বরবাদ করে দেবে।"

"জানি। কিন্তু দুবেজি, চন্দ্রকান্তর বদলে আপনার লেড়কিকে যদি ওই শেঠ ধরমচাঁদ তুলে নিয়ে যেত তখন আপনি কী করতেন?"

"বাবুজি!"

"আপনার ভয় নেই দুবেজি। চন্দ্রকান্তবাবু কোটি টাকার মালিক। ওকে উদ্ধার করতে পারলে আপনাব মেয়ের বিয়ে কিন্তু আটকাবে না। মেয়েব বিয়ের সব খরচা উনিই দেবেন।"

এবার দারুণ উৎসাহিত হয়ে দুবেজি বললেন, "কথা দিচ্ছেন তো বাবুজি। আমি কিন্তু আশা করে রইলাম। তা ছাড়া আমার মেয়ে তো মেয়ে নয়, লছমি আছে, লছমি। আসুন, দেখে যান।"

আমি দুবেজির সঙ্গে ওর ঘরে গেলাম। গিয়েই অবাক হলাম। মনে হল কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে কোনও লক্ষ্মী প্রতিমারই জীবন্ত রূপ যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমি।

দুবেজি বললেন, "বাবুজি, রামটেকে পাহাড়ের কোলে ধরমচান্দের একটা বাগানবাড়ি আছে। আমার ধাবণা চন্দ্রকান্তবাবু ওখানেই আছেন। সন্ধের পর আপনি আসুন, আমি দূর থেকে আপনাকে বাড়ি চিনিয়ে দেব।"

দুবেজির সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে আমি আবার হোটেলে ফিরে এলাম।

দুপুরে স্নান খাওয়ার পর বিশ্রাম করছি, দরজায় টক টক শব্দ। জানি এমনটা হবে। তাই সতর্ক হয়ে দরজা খুললাম।

দুজন মাঝারি চেহারার গুণ্ডাকৃতি লোক প্রায় জোর করেই ঘরে ঢুকে বলল, "আপনি এখানে কোন কাজকাম নিয়ে এসেছেন দাদাজি?"

আমি ওদের বসতে বলে বললাম, "সব তো জেনেই এসেছেন দেখছি। তাই নতুন করে কী আর বলার আছে?"

"আছে বৈকি। আপনি চন্দ্রকান্তবাবুর ব্যাপারে মাথা ঘামাতে এসেছেন বলেই আমাদের আসতে হল।"

"কোনও মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে আমি মাথা ঘামালে আপনাদের ঘুম ছুটে যাবে কেন? ওদের সুন্দরগড়ের প্রপার্টি আমি কিনে নিচ্ছি। তাই চন্দ্রকান্তবাবুর ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। ওর কোনও ডেথ সার্টিফিকেট ওর বাড়ির লোকরা দেখাতে পারছেন না। ওর ডেড বডি জ্বালানোর সময় বাড়ির লোকজনও কেউ উপস্থিত ছিলেন না। তাই খোঁজখবর একটু নিতেই হচ্ছে।"

গুণ্ডারা পরস্পরের মুখের দিকে একবার তাকাল। তারপর ওদেরই একজন বলল, "কাল সকালের মধ্যেই ডেথ সার্টিফিকেট আপনি পেয়ে যাবেন। কিন্তু বিকেলের পর আপনি আর এখানে থাকবেন না।" বলেই একটা রিভলভার বের করে আমার কপালের মাঝখানে ঠেকিয়ে ধরে বলল, "আমাদের কথা না শুনলে পরিণামটা কী হবে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?"

আমি তৈরিই ছিলাম। তাই ওরা কথা বলে চলে যাবার জন্য উদ্যত হতেই আমার রিভলভারের বাঁট দিয়ে লোকটার মাথায় সজোরে একটা আঘাত করে আর একজনের কান ও চোয়ালের মাঝখানে একটা ঘুষি মারতেই বসে পড়ল সে। মানুষের শরীরের এমন কতকগুলো অংশ আছে যেখানে মোক্ষম ঘা দিতে পারলে তার আর প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে না। উপর্যুপরি ওদের সেইসব জায়গায় ঘা দিতেই ওরা অক্ষম হয়ে পড়ল।

আমি ওদের দিকে রিভলভার তাগ করে বললাম, "এবার বলো, শেঠ ধরমচাঁদ চন্দ্রকান্তবাবুকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? আমি কিন্তু পুলিশের লোক। একটুও লুকোবার চেষ্টা কোরো না।"

ওদের চোখ এবার কপালে উঠে গেল। বলল, "আপকো ক্যায়সে মালুম? আপনি সব কুছু জানেন?"

"আমি পুলিশের লোক। আমি জানব না তো কে জানবে? ধরমচাঁদ ওকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে?"

"রামটেক। তালাওপর যো পিলেবালা মকান হ্যায়, ওঁহি মে।"

বুঝলাম দুবেজির অনুমান সত্য। বললাম, "ঘরের চাবি কার কাছে?"

"কেয়ারটেকার শিউপূজন কি পাস।"

আমি রিভলভার রেখে নাইলনের ফিতে দিয়ে ওদের দুজনেরই হাত-পা চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে ক্লোরোফর্ম ইউজ করলাম। তারপর দরজায় তালা দিয়ে সোজা দুবেজির ওখানে।

যুগলময়ূরী উদ্ধারের চেয়ে চন্দ্রকান্তকে উদ্ধার করতে পারলে সত্যিই একটা কাজের কাজ করা হবে। দেখি কী হয়!

দুবেজির ওখানে গিয়ে হোটেলের ঘটনার কথা বলতেই চোখ কপালে উঠল দুবেজির। বলল, "ওরে বাবা। আপনি তো কাল্লা আর ভাল্লাকে ঘায়েল করেছেন। এ কী করে সম্ভব হল?"

"প্রথমত আমি এইরকম আক্রমণের জন্য তৈরি ছিলাম। আর ওইসব গুণ্ডারা এতদিন শুধু মেরেই এসেছে, মার খায়নি। তা ছাড়া আমি জানি মানুষের শরীরের ঠিক কোন কোন জায়গায় আঘাত হানলে সে প্রাণে মরবে না কিন্তু অবশ হবে। তাই সহজেই কাবু করতে পেরেছি ওদের। ওদের মুখে যা শুনলাম তাতে আপনার অনুমানই ঠিক। আপনি শুধু রামটেকে নিয়ে গিয়ে দূর থেকে বাড়িটা আমাকে চিনিয়ে দেবেন।"

সন্ধে হওয়া পর্যন্ত দুবেজি আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন। তারপর আমাকে নিয়ে চললেন রামটেকে। ঘন ঘন বাস যায় এ পথে। তারই একটিতে সামনে পেছনে করে দূরত্ব বজায় রেখে বসলাম দুজনে। শেঠ ধরমচাঁদ অবশ্য রামটেকে থাকেন না। নাগপুর শহরে অগ্রসেন চকে তাঁর বিরাট মকান।

সন্ধের পর পাহাড়ি রামটেক সুনসান হয়ে যায়। তাই এখানে অন্ধকারে গা আড়াল দিয়ে পথ চলতে কোনও অসুবিধে হল না। দুবেজি আমাকে বাড়ি চিনিয়ে দিতেই আমি বললাম, "আপনার কাজ শেষ। আপনি সোজা স্টেশন চলে যান। আজ রাতেই যাতে নাগপুর ছেড়ে যেতে পারি এমন কোনও গাড়ির খোঁজখবর নিন।"

দুবেজি বিদায় নিলে আমি বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। রোগাটে চেহারার এক যুবক এগিয়ে এল আমার দিকে।

আমি বললাম, "কাল্লা ভাল্লা নে ভেজা। শিউপূজন কৌন?"

"ম্যায় হুঁ।"

"দরোয়াজা খোলিয়ে। চন্দ্রকান্তবাবুকো সুই দেনা হ্যায়।"

"নেহি বাবুসাব। শেঠজি কা হুকুম নেহি। কাল্লা ভাল্লাকো সাথ লেকে আইয়ে আপ।"

আর কোনও কথা নয়, আমি সরাসরি ওর দিকে রিভলভার তাগ করে বললাম, "দরোয়াজা খোলিয়ে।"

শিউপূজন ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিল।

ঘরের ভেতর দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে ভরা শীর্ণকায় এক রাজপুত্র ম্লান মুখে বসেছিল। আমি ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলাম তাকে, "আপনিই কি চন্দ্রকান্ত আচার্য!"

"হ্যাঁ। আপনি?"

"আপনাদের পরিবারের এক বন্ধু। যদি বাঁচতে চান এখনই চলে আসুন আমার সঙ্গে। একদম দেরি করবেন না।"

এই সুযোগে শিউপূজন পালাতে যাচ্ছিল। আমি ওকে ধরে মোক্ষম একটা ঘা দিতেই জ্ঞান হারাল সে।

চন্দ্রকান্ত এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "আমি তো পালাতেই চাই। কিন্তু কিছুতেই এদের সঙ্গে পেরে উঠছিলাম না। সুযোগও পাচ্ছিলাম না।"

"আপনার কথা পরে শুনব। এখন চলুন।"

আমরা জঙ্গলের পথ ধরে বাইরে এসেই একটা অটো পেয়ে গেলাম। সেই অটোতেই একেবারে রেলওয়ে স্টেশনে।

দুবেজি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। চন্দ্রকান্ত তো আবেগে জড়িয়ে ধরল

আমি চন্দ্রকান্তকে বললাম, "আপনার আসল উদ্ধারকর্তা কিন্তু দুবেজিই। উনি না বললে আমি জানতেও পারতাম না আপনি বেঁচে আছেন বলে। আমরা সবাই জানি আপনি মৃত।"

চন্দ্রকান্ত বলল, "উঃ! সেদিনের কথা মনে পড়লে গা যেন শিউরে ওঠে আমার।"

আমি দুবেজিকে বললাম, "গাড়ির খবর কিছু জানেন?"

"ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই গীতাঞ্জলি আসছে।"

আমি হাজার খানেক টাকা দুবেজিকে দিয়ে বললাম, "চট্ করে দুটো টিকিট কেটে আনুন। বাকি টাকা রেখে দিন আপনার কাছে। আমি ততক্ষণে চন্দ্রকান্তবাবুকে একটা সেলুনে নিয়ে গিয়ে একটু ভারমুক্ত করিয়ে আনি।"

দুবেজি চলে গেলেন। আমিও স্টেশন সংলগ্ন একটি সেলুনে নিয়ে গেলাম চন্দ্রকান্তকে। তারপর দুবেজি এলে রেলের ক্যান্টিনে ভরপেট খাওয়া-দাওয়ার পর সময়মতো ট্রেনে উঠলাম। একটি সংরক্ষিত বগিতে বাড়তি কিছু দিয়ে ব্যবস্থা করে নিলাম দুজনের। দুবেজি বিদায় নিলেন। ওঁর উপকারের কথা জীবনেও ভুলব না।

পথে যেতে যেতে চন্দ্রকান্ত ওর কাহিনী যা শোনাল তা এইরকম—রাজনন্দগাঁওয়ের বিজয় ও জয়ার সঙ্গে ওদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক শেষ হলেও হঠাৎ একদিন নাগপুরের ব্যাক সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যুতে দেখা হয়ে গেল জয়ার সঙ্গে। আগের কথা সব ভুলে সে ওকে সাদর আমন্ত্রণ জানাল ওর শ্বশুরবাড়িতে। চন্দ্রকান্তও ভাল মন নিয়েই গেল ওদের বাড়ি। মস্ত বড় লোকের বউ হয়েছে জয়া। অবাঙালি পরিবার। ওর স্বামী রতনলাল শাহ একটি পেট্রল পাম্পের মালিক। ওই পরিবারের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় শেঠ ধরমচাঁদেব সঙ্গেও পরিচয় হল ওর। জয়াই পরিচয় করিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, ওদের অগাধ সম্পত্তি এমনকী যুগলময়ূরীর বৃত্তান্তও জানিয়ে দিল উচ্ছ্বাস বশে।

এরই পরিণামে রতনলাল ও ধরমচাঁদ বার বার উত্যক্ত করতে লাগলেন ওকে। এবং ওই দুর্লভ সম্পদটাকে একবার চোখের দেখা দেখতে চাইলেন। কিন্তু চন্দ্রকান্তও বার বার জানিয়ে দিল, পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ ছাড়া ও জিনিস বাইরের কাউকে দেখাবার নয়।

এরপর থেকেই চলতে লাগল নানাভাবে ওর প্রতি ভীতিপ্রদর্শন। তারপর হঠাৎ একদিন সন্ধের মুখে একটি বেপরোয়া ট্রাক ওকে চাপা দিতে এলে ও কোনওরকমে নিজেকে বাঁচাতে পারলেও পথচারি অন্য এক যুবক লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে গেল। সেই দৃশ্য দেখেই জ্ঞান হারাল ও। পরে যখন জ্ঞান ফিরল তখন ও রামটেকে বন্দি। রতনলাল এবং ধরমচাঁদ দুজনেই এবার দেখা করল ওর সঙ্গে। বলল, "আমাদের কথা শুনলে এমনটি হত না। পুলিশের খাতায় তুমি এখন মৃত। এখন আর ওই যুগলময়ূরী আমরা দেখতে চাই না। বরাবরের জন্য পেতে চাই। তুমিই বল কীভাবে ওটা পাওয়া যেতে পারে।"

চন্দ্রকান্ত বলল, "সুন্দরগড়ের প্রাকৃতিক অবস্থান এমনই এক জায়গায় যেখানে দিনে রাতে যে কোনও সময়ই অচেনা কোনও লোক গেলে তাকে গ্রামবাসীদের মুখোমখি হতে হবে। অতএব ও জিনিস নিতে গেলে বা নিয়ে ফিরে আসবার সময় বিপদের শেষ থাকবে না।"

রতনলাল বলল, "তবুও আমরা হাল ছাড়ছি না। শুধু আমার স্ত্রীর অনুরোধে তোমাকে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি। যতদিন না ওটা আমাদের হাতে আসে ততদিন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব। তারপর ভেবে দেখব কী করা যাবে তোমাকে নিয়ে।"

এরপর একদিন রতনলাল এসে বলল, "আমরা খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি সুন্দরগড় স্টেটের বাইরে দেবনগরীতে একটা গ্রামীণ মেলা বসে। ওইদিন নিশ্চয়ই ওই এলাকায় গেলে কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না। যুগলময়ূরী হরণের ওই হল উপযুক্ত দিন। সম্ভব হলে তোমার বোন রম্যাণীকেও নিয়ে আসব আমরা।"

শুনেই বুক কেঁপে উঠল চন্দ্রকান্তর। বলল, "আমার জীবন তো শেষ করে দিয়েছেন। বোনটাকে অন্তত বেঁচে থাকতে দিন। তা ছাড়া রম্যাণীহরণ করতে গেলে এ কূল ও কূল দুকূলই যাবে আপনাদের। ওই যুগলময়ূরী থাকে আমার বাবার ঘরের সিন্দুকে। চাবি থাকে...।"

"ওঁরই বালিশের নীচে। সে খবরও জানি। তাই আর দেরি করতে চাইছি না আমরা।"

চন্দ্রকান্ত বলল, "বেশ, যুগলময়ূরী হাতে পেলেই যদি আপনারা ক্ষান্ত হন তো হোন। তবে একটা কথা, ওই দুর্লভ সম্পদটি নিয়ে আসবার সময়ও কিন্তু বিপদ হতে পারে। যদি

আমার পরিবারের নিরাপত্তার আশ্বাস দেন তো একটা গোপন পথের সন্ধান আমি বলে দিতে পারি।"

"কথা দিলাম।"

"যুগলময়ূরী হাতে পাওয়ার পর আপনাদের লোককে বলবেন আমাদের বাড়ির উঠোনের পেছনদিকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে। সেখানে বহুদিনের পুরনো একটি সুড়ঙ্গ পথের ছোট্ট দরজা আছে। ওই সুড়ঙ্গপথ এসে মিলেছে রূপসা নদীর ধারে। বাইরের দিক থেকে কেউ সে পথের সন্ধান পাবে না। কিন্তু বাড়িব ভেতর দিয়ে এলে সহজেই বিনা বাধায় সে চলে আসতে পারবে। বহুদিনের পরিত্যক্ত পথ। হয়তো আগাছায় ভরে আছে। কিন্তু নিবাপদ।"

চন্দ্রকান্তর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, "আপনি ওদের কথায় বিশ্বাস করে ওই গোপন পথের সন্ধান দিতে গেলেন কেন? নিয়ে চলে আসবার সময় ওরা কারও না কারও হাতে ধরা পড়লে আপনাদের সম্পদ আপনাদেরই থেকে যেত।"

চন্দ্রকান্ত বলল, "এখানেই আমি একটু চালাকি করেছি। তার কারণ, আমাকে আজ না হয় কাল মরতেই হবে। ওরা আমাকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখবে না। বাবারও তো এখন শেষ সময়। রম্যাণীব দিকে ওদের নজর পড়লে রম্যাণীও বাঁচবে না। অতএব কোনওদিক থেকেই বাঁচার কোনও সম্ভাবনা নেই আমাদের। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে ওরাও যাতে ধ্বংস হয় এবং যুগলময়ূরীও যাতে বেহাত না হয় সেজন্যই ওই গোপন পথের সন্ধান দিলাম ওদের। ওই সুড়ঙ্গের বেরনোর পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। বর্তমানে ওটি একটি মরণকূপ ছাড়া কিছুই নয়। বিষাক্ত সাপেদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে এখন ওর ভেতরটায়। তা সে যাই হোক, যুগলময়ূরী চুরি হয়েছে এখবর আমি পেয়েছি। কিন্তু চোরদের একজনও ফিরে আসেনি। এদের ধারণা চোরেরা ওদের ওপর বাটপাড়ি করেছে। তবে আমি জানি শেষপর্যন্ত কোন পরিণতি হয়েছে তাদের। তাই দারুণ আনন্দে আছি আমি। ধরমচাঁদ আর রতনলালরা এখন চোরেদের খুঁজে বের করার জন্য চারদিক তোলপাড় করছে।"

কাহিনী রোমাঞ্চকর তাতে সন্দেহ নেই। শেষ রাতে যখন আমরা রাজনন্দগাঁওয়ে নামলাম তখন সুনসান চারদিক। এই অসময়ে সুন্দরগড়ে যাওয়া যাবে না। প্রায় কুড়ি কিমি পথ। হেঁটে যাওয়াও অসম্ভব। তাই বাধ্য হয়েই সকালের জন্য অপেক্ষা করতে হল। এইসময়টুকু চন্দ্রকান্তকে আমার একটা রুমাল দিয়ে ওর মুখ সবসময় ঢেকে রাখতে বললাম।

বার কয়েক চা খেয়ে এবং স্টেশনের অন্ধকার অংশে অকারণ পায়চারি করে সময় কাটালাম। একটু বেলায় একটা টাঙ্গা নিয়ে রওনা হলাম সুন্দরগড়ের দিকে। রহমতের টাঙ্গা পাওয়া গেল না। অন্য একজনের টাঙ্গায় উঠে রাজবাড়ি যাব বলতেই টাঙ্গাওয়ালা আমাদের নিয়ে ঘোড়া ছোটাল।

বাড়ির কাছে গিয়ে টাঙ্গা থামলে সর্বাগ্রে বেরিয়ে এল মালা। সঙ্গে রম্যাণীও।

আমরা টাঙ্গা থেকে নামতেই রম্যাণী বলল, "ইনি?"

"ভেতরে চলুন, বলছি।"

টাঙ্গা ভাড়া আগে থেকেই দিয়ে রেখেছিলাম। তাই ঘরে গিয়ে চন্দ্রকান্তকে আমার বিছানায় বসিয়ে রম্যাণীকে বললাম, "ভাল করে আমার এই বন্ধুটির মুখের দিকে একবার

তাকিয়ে দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা?''

চন্দ্রকান্ত এবার রুমাল সরাতেই চমকে উঠল রম্যাণী, ''দাদা!''

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল চন্দ্রকান্ত। বলল, ''হ্যাঁ, আমি রে। মরিনি। বেঁচে আছি। ইনি না থাকলে...।''

রম্যাণীও কাঁদতে লাগল দাদাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ''তোমাকে যে এইভাবে ফিরে পাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি দাদা। তোমাকে হারিয়ে আমরা জীবন্মৃত হয়েছিলাম।''

মালাও হতচকিত হয়ে বলল, ''এমন অসম্ভব কী করে সম্ভব হল?'' বলেই ছুটল পাশের ঘরে বিষ্ণুকান্তবাবুকে খবর দিতে।

রম্যাণী ও চন্দ্রকান্তও গিয়ে হাজির হল।

বিষ্ণুকান্তবাবু নিজের কানকে, চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন, ''না না। মিথ্যে— সব মিথ্যে। তোমরা আমার সঙ্গে রসিকতা করছ। নয়তো আবারও একটা স্বপ্ন দেখছি আমি। স্বপ্ন মিলিয়ে গেলেই দেখব স-অ-অ-ব মিথ্যে।''

চন্দ্রকান্ত বাবাকে প্রণাম করে বাবার বুকে মাথা রেখে বলল, ''না বাবা, মিথ্যে নয়। আমি সত্যিই ফিরে এসেছি।''

রম্যাণী এবার আমার হাতদুটি ধরে কান্না-ধরা গলায় বলল, ''সত্যি করে বলুন তো আপনি কে? আপনি গোয়েন্দা না কোনও জাদুকর?''

''আমি অম্বর চ্যাটার্জি। আপনাদের পরিবারকে ঘিরে যে দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল তা ঈশ্বরের ইচ্ছায়। এখন যা হল তার মূলেও তিনিই। তবে একটা কথা, আপনার দাদার ব্যাপারে আমরা রাজনন্দগাঁওয়ের বিজয়বাবু ও জয়াকে যে সন্দেহ করেছিলাম তা নেহাতই অমূলক। ওঁরা দুজনেই সন্দেহের ঊর্ধ্বে। যদিও জয়ার একটু ভুলের জন্য এতবড় বিপর্যয়টা ঘটে গেল তবুও সে বেচারা নিরপরাধ। আপনার দাদার কাহিনী শুনে আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে। এই অপহরণ ও চুরির জন্য দায়ি জয়ার স্বামী রতনলাল শাহ্ ও শেঠ ধরমচাঁদ। শুধু তাই নয়, পথে আসতে আসতে আপনার দাদার মুখে যা শুনলাম তাতে মনে হয়েছে ওই যুগলময়ূরীও আপনাদের হাতছাড়া হয়নি। ওটি এ বাড়ির গোপন সুড়ঙ্গের মধ্যেই বহাল তবিয়তে আছে।''

চমকের পর চমকের পালা।

ততক্ষণে সুন্দরগড়ের প্রজারা খবর পেয়ে দলে দলে ছুটে এসেছে চারদিক থেকে। আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠেছে সবাই। তারাই মশাল জ্বেলে পেশাদার সাপুড়েদের সাহায্যে সেই সুড়ঙ্গপথের ভেতরে ঢুকে তিনটি গলিত শবের পাশ থেকে উদ্ধার করে আনল যুগলময়ূরীকে।

বিষ্ণুকান্তবাবু বললেন, ''দেখলে তো, আমার যুগলময়ূরী কত জাগ্রত। সে স্বপ্ন দিয়ে নিজে উধাও হয়ে আমার চন্দ্রকান্তর ফিরে আসার পথ পরিষ্কার করে দিল।''

সুন্দরগড়ে সেদিন উৎসব রজনী। কত নাচগান হল। কত বাতি জ্বলল। আনন্দে আত্মহারা হল সকলে।

আমি বেশ কয়েকটা দিন ওদের ওখানে কাটিয়ে সুন্দরগড় থেকে বিদায় নিলাম। আসবার সময়ে বার বার বলে এলাম, এই চরম আনন্দের মধ্যে দুবেজির স্মৃতি যেন মন থেকে মুছে না যায়। বেচারা গরিব মানুষ। ওর মেয়েটিও লক্ষ্মীস্বরূপা। সে যাতে সুপাত্রে

পড়ে তেমন ব্যবস্থা যেন ওরা অবশ্যই নেয়। ওর বিয়ের যাবতীয় দায়িত্ব বহন করুক ওরাই।

রম্যাণী ও চন্দ্রকান্ত দুজনেই আমাকে কথা দিল।

নিঠুর দরদী

আজকাল ছুটির দিনে আমি একটু এদিক-সেদিকে চলে যাই। আজ গিয়েছিলাম বেড়াচাঁপার দিকে। রাতে যখন বাড়ি ফিরলাম চারদিক তখন নিস্তব্ধ নিঝুম। রাখহরি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। তবে ঘুমিয়ে পড়লেও বেশি ডাকাডাকি করতে হয় না ওকে। ওর ঘুম খুব সজাগ। তাই ডোর বেলে চাপ দিতেই ও দরজা খুলে আমার দিকে কেমন যেন চোখে তাকিয়ে বলল, "কাকে চাই?"

সাধারণত দরজা খোলার আগে ও বাইরের আলো জ্বালে। আজ তা করল না। উপরন্তু এমন এক প্রশ্ন। নিশ্চয়ই কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে। তাই ওর চোখে চোখ রেখেই বললাম, "অম্বর চ্যাটার্জি আছেন?"

"না। ওঁর ফিরতে রাত হবে।" বলেই দড়াম করে মুখের ওপর সশব্দে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

আমার অভিজ্ঞতায় বুঝে নিলাম অঘটন কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে। এবং সেটা আমাকে কেন্দ্র করে। তাই খুব আলতোভাবে হ্যাজবোল্টটা টেনে দিয়েই বাইরে এসে একটি টেলিফোন বুথ থেকে থানায় একটা ফোন করলাম।

আমাব পরিচিত একজন ইনসপেক্টর তখন কর্মরত অবস্থায় ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলেন কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশকে নিয়ে। তারপর বাইরে থেকেই বাড়ির চারদিক ঘিরে ফেললেন তাঁরা।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। হ্যাজবোল্ট সরিয়ে আবার ডোর বেলে পুশ করতেই আলো না জ্বেলে দরজা খুলল রাখহরি।

আমি বললাম, "মিঃ চ্যাটার্জি ফিরেছেন?"

"না। বললাম তো রাত হবে।"

"আর কত রাত হবে? এখনই তো বারোটা।"

"তাতে কী? একটা দুটোও হতে পারে।"

আমি এবার গলার স্বর অসম্ভব রকমের গম্ভীর করে বললাম, "উনি ভেতরেই আছেন। হয় আসতে বলো, না হলে আমরা কিন্তু জোর করে ভেতরে ঢুকব।" বলেই রাখহরির হাত ধরে একটা হেঁচকা টান দিয়ে বাইরে আনলাম ওকে। তারপর বাইরে থেকে দরজাটা আবার এঁটে দিতেই ভেতরে দুড়দাড় শব্দ।

বুঝলাম কেউ বা কারা যেন ভেতরে ছিল। যারা অনেক আগে থেকেই ভেতরে ঢুকে ব্ল্যাকমেল করছিল রাখহরিকে। এবং ওদেরই জন্য আমার নিরাপত্তার খাতিরে রাখহরি উল্টোপাল্টা বকছিল এতক্ষণ। ওরা এখন বিপদ বুঝে ছাদে উঠেছে।

আমি পুলিশকে নির্দেশ দিতেই পুলিশের লোক ভেতরে ঢুকে সিঁড়ির দিকে ছুটল। কিন্তু আগন্তুকরাও চতুর কম নয়। ওরা ছাদে উঠেই বন্ধ করে দিয়েছিল ওপরের দরজা।

সেই দরজার কাছে একজনকে পাহারায় রেখে ইনসপেক্টর বাড়ির বাইরে এসে ছাদের দিকে রিভলভার তাগ করে বললেন, "যদি ভাল চাও তো ধরা দাও বাছাধনরা। না হলে দরজা ভেঙে তোমাদের ডেডবডি নামিয়ে আনব ছাদ থেকে।"

প্রত্যুত্তরে একটি বোমা ফাটার শব্দ শোনা গেল। ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। আর তারই মধ্য দিয়ে দুষ্কৃতীরা ছাদ থেকে লাফিয়ে চোখের পলকে উধাও।

মুহূর্তের মধ্যে যা কিছু ঘটে গেল তার সবই অবাস্তব মনে হল।

রাখহরির মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে।

আমি বললাম, 'কী ব্যাপার বল তো?"

ও বলল, "আপনি আসবার বেশ কিছুক্ষণ আগে দুজন বিশ্রি চেহারার লোক এসে দরজায় বেল টিপল। আমি ভাবলাম আপনিই এসেছেন। তাই আলো জ্বেলে দরজা খুলেই দেখি মূর্তিমান ওরা। ওদের একজন জিজ্ঞেস করল, আপনি বাড়িতে আছেন কিনা। আমি 'না' বললে ওরা জানতে চাইল, কখন আসবেন? আপনার আসতে রাত্রি হবে বলায় ওরা আমার বুকে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে জোর করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল, 'তোর বাবুর সঙ্গে আমাদের একটা বোঝাপড়া আছে। যতক্ষণ না আসে আমরা কিন্তু ততক্ষণ এখানেই থাকব।' বলে ঘরে ঢুকে দারুণ অসভ্যতা শুরু করে দিল। গোটা ঘর তছনছ করে চারদিক নাড়াঘাঁটা করে একশা করল। অশ্রাব্য মুখের ভাষা ওদের। একটু আধটু নেশাও করেছিল বোধ হয়। ঘরে কেক, বিস্কুট যা ছিল সব সাবাড় করে মিনিটে মিনিটে চায়ের অর্ডার দিতে লাগল। ওদের মতলব ভাল নয় বুঝে আমি ওদের নির্দেশ মতোই সবকিছু করে যেতে লাগলাম। একবার ভেবেছিলাম ছাদে উঠে দরজা বন্ধ করে ছাদ দিয়ে পালাব। কিন্তু সিঁড়ির কাছে যেতেই একজন সজোরে একটা লাথি মারল আমাকে। এরপর আমি আর এগোতে সাহস করিনি। ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হল ওদের হাতে আপনার জীবন বিপন্ন। তাই আপনি আসার পর আমি আপনার সঙ্গে ওইরকম ব্যবহার করলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আপনি আমার কথাবার্তা শুনে এবং চোখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নেবেন।"

আমি বললাম, "বুঝে তো নিয়েইছি। কিন্তু ব্যাপারটা খুব রহস্যময় মনে হচ্ছে। এরা কারা? কেন এল এখানে? আমাকে মারবার উদ্দেশ্য থাকলে তো অন্ধকারে লুকিয়েই মারতে পারত। অযথা এমন সিন ক্রিয়েট করার তো কোনও দরকার ছিল না।"

রাখহরি বলল, "উঃ! কী ভয়ঙ্কর ওরা।"

পুলিশ আবার ভেতরে এসে ঘরের অবস্থা দেখে যা যা নোট নেবার নিয়ে বিদায় নিল। যাবার সময় ইনসপেক্টর বললেন, "খুবই গোলমেলে ব্যাপার। এরা যে কারা কিছু অনুমান করতে পারলেন?"

বললাম, "না।"

"তা হলে একটু সাবধানে থাকবেন মিঃ চ্যাটার্জি। কেননা গুপ্ত ঘাতকদের বিশ্বাস নেই। আমরাও অবশ্য নজর রাখব আপনার বাড়ির দিকে।"

"কোনও দরকার নেই। আপাতত ওরা আর এদিকে আসবে না। তা ছাড়া আমি কখন কোথায় থাকি না থাকি তারও ঠিক নেই, তাই অযথা একজন স্টাফকে রিজার্ভ না করাই ভাল। বিশেষ করে এই ঘটনার পর আমি আরও বেশি সতর্ক থাকব।"

পুলিশ বিদায় নিলে আমি মুখ-হাত ধুয়ে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিলাম।

রাখহরির ভয় তখনও কাটেনি। তবুও ও ওই সময়টুকুর মধ্যেই একটু আলুভাজা ও পরোটা করে আমাকে খাইয়ে দিল। শয়তানরা শুধু চা-বিস্কুট নয়, ফ্রিজের ভেতর থেকে বের করে সন্দেশ-রসগোল্লাগুলো পর্যন্ত খেয়ে গেছে।

ওরা যে কেন কী জন্য এসেছিল তা বুঝতে না পারায় ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটল সারারাত। কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। সারাটা রাত বিছানায় শুয়ে জেগেই কাটিয়ে দিলাম।

ভোরের দিকে একটা ফোন এল।

রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতেই শুনতে পেলাম, ''আমি ডেঞ্জার সিগন্যাল বলছি।''

''বলুন, শুনছি।''

''আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমাকে অমান্য করে লেভেলক্রসিং যারা ক্রস করতে যায় তারা সবাই কাটা পড়ে।''

''জানি।''

'তা হলে আপনি কেন আগুন নিয়ে খেলছেন মিঃ চ্যাটার্জি?''

''এটাই তো আমার কাজ।''

''আপনি কি জানেন না আগুন নিয়ে খেলতে গেলে অনেক সময়ই হাত পোড়ে?''

''সেটা অসতর্ক এবং আনাড়ি খেলোয়াড়দের। পাকা খেলোয়াড়ের নয়।''

''তবুও আমি বলছি, আপনি আগুন নিয়ে খেলা বন্ধ করুন।''

''তার আগে বলুন আপনি কে?''

''ড্যাম ফুল।''

''সেতো বুঝতেই পারছি।''

''এটা আপনাব উদ্দেশ্যে বললাম। আপনি গোয়েন্দাগিরি করেন অথচ আমার পরিচয় জানেন না?''

''কী করে জানব? মেঘের আড়ালে মেঘনাদ হয়ে লুকিয়ে থাকলে কি তার পবিচয জানা যায়? ডেঞ্জার সিগন্যাল ধাতব। তার ভাষা নেই। অথচ আপনি ..।''

''আমি সরব। ডেঞ্জার সিগন্যাল হয়ে আমার লেভেলক্রসিং-এ আসার আগেই আমি বিপদ সংকেত দিই।''

''এবার বুঝতে পেরেছি। বার্নপুরে পাঁচজন ব্যবসায়ীকে রেলের চাকায় কাটিয়ে মারার নায়ক আপনি। সারা পুলিশ দপ্তর যাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে আপনি সেই...।''

'ইউ আর রাইট। বুঝতে পেরেছেন তা হলে?''

''পেরেছি। কিন্তু হঠাৎ আমাকে এমন হুঁশিয়ারি দেওয়ার কারণ?''

''আছে বৈকি। আমার দুজন লোক আজ আপনার কাছে গিয়েছিল সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু আপনি তাদের চালাকি করে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। ওরা নেহাত অসুরের শক্তি ধরে তাই কোনওরকমে পালিয়ে আসতে পেরেছে। কাজটা কি আপনি ভাল করলেন?''

আমি এবার কঠিন গলায় বললাম, ''নিশ্চয়ই ভাল করেছি। আমার কোনও লোক যদি আপনার অবর্তমানে আপনার বাড়িতে ঢুকে আপনার কোনও লোককে ভয় দেখিয়ে ঘরের মধ্যে বাঁদর নাচ নাচত তখন আপনি কী করতেন?''

"আমার কথা ছাড়ুন। জেনে রাখুন, ওরা দুজনে অতি ভয়ঙ্কর। ওদের ঘাঁটিয়ে ঠিক করলেন না। এখন থেকে ওরাই আপনার নিয়তি।"

"তেমনই আমিও ওদের নিয়তি। সেইসঙ্গে আপনারও।"

ওদিক থেকে বিদ্রুপের একটা হাসি শোনা গেল।

আমি বললাম, "এতক্ষণ ধরে আজেবাজে কথা তো অনেক হল। এখন কী বলতে চান তা স্পষ্ট করে বলুন?"

"রূপরাজ সাহানি আমারই শিকার। ওর কেসটা আপনি না নিলেই ভাল করতেন।"

"রূপরাজ সাহানি কে তাই তো জানি না। অতএব তার কোনও কেস নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না আমার।"

"আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। রূপরাজ সাহানির কেস আপনি হাতে নিয়েছেন।"

"ওই নামের কোনও লোককেই আমি চিনি না।"

"না চিনতে পারেন। কিন্তু ওর কেস আপনি নিয়েছেন।"

"আমি আপনার মতো কাপুরুষ নই। তবে হ্যাঁ, এবার দারুণ আগ্রহী হয়ে খোঁজখবর নেবো, মাথা ঘামাবো। কেননা বিষয়টা আমার খুব রহস্যময় মনে হচ্ছে।"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর শোনা গেল, "রূপরাজ সাহানির খুনের ব্যাপারে তার স্ত্রী অনুরাধা সাহানি আপনাকে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হিসেবে নিয়োগ করেননি?"

"এখনও পর্যন্ত না।"

"আমার কাছে কিন্তু পাক্কা খবর আছে।"

"খবরটা নেহাতই কাঁচা। তাই আমাকে ঘাঁটিয়ে আপনি আপনার নিজের বিপদই ডেকে আনলেন। যাইহোক, টেলিফোনের তার যেমন আপনার কণ্ঠস্বরকে আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে তেমনই আমার তদন্তের সূত্র আপনার শরীরটাকেও একদিন টেনে আনবে আমার কাছে। তখন আইন-আদালতের তোয়াক্কা না করে..।"

"আমার মাথাটাকেই আপনি গুঁড়িয়ে দেবেন। এই তো? যাক, আপনি তা হলে আমার সঙ্গে দুশমনি চাইছেন? ঠিক আছে। আমার পথের কাঁটা কীভাবে উপড়ে নিতে হয় আমি তা জানি।"

আর কোনও কথা নয়। এরপর রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শোনা গেল। লাইন কাট।

ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই এমন একটা ফোন পেয়ে মাথার মধ্যে যেন ঝিম ধরে গেল। রূপরাজ সাহানি কে আমি সত্যিই চিনি না। তবে কয়েকদিন আগে তাঁর খুন হওয়ার বৃত্তান্ত কাগজে পড়েছি। অত্যন্ত সভ্রান্ত ঘরের বনেদী এবং বিত্তবান ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। সৎ ও সজ্জন হিসেবেও সুনাম ছিল। ব্যবসার সূত্রে বিহারের নওয়াদায় থাকতেন। সেখানেই তিনি রেলে কাটা পড়ে মারা যান। পুলিশের অনুমান, ডেঞ্জার সিগন্যালের ডেঞ্জার গ্যাঙ-এর লোকরাই খুন করে তাঁকে। অথচ এই ছদ্মনামের আড়ালে লুকিয়ে আছেন যিনি তাঁর নাগাল অনেক তদন্তের পরও পাওয়া যায় না। একাধিক খুনের ঘটনায় ও সন্ত্রাস সৃষ্টিতে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে। কিন্তু পুলিশের গন্ধ শুঁকেই সে বিপদ টের পেয়ে উধাও হয়ে যায়। তা সে যাই হোক, ওঁর খুনের ব্যাপারে আমার সাহায্য

নেবার জন্য এখনও পর্যন্ত কেউই এগিয়ে আসেননি। অথচ উনি কীভাবে টের পেলেন যে ওই কেসটা আমিই হাতে নিয়েছি? তা ছাড়া বিহারের কোনও ব্যবসায়ী পরিবার সেখানকার কোনও তদন্তকারী অফিসারের সাহায্য না নিয়ে আমার কাছে আসবেনই বা কেন? আমি তো তেমন কোনও নামজাদা গোয়েন্দা বা কেউকেটা নই, তা হলে? ব্যাপারটা তাই রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল আমাকে। এখন আমাকে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে এ ঘটনায় আমি জড়িয়ে পড়লাম কীভাবে?

ফোন রেখে অকারণে ঘরময় একটু পায়চারি করে বাথরুমের কাজ সেরে আয়েস করে বসতেই রাখহরি চা আর বিস্কুট দিয়ে গেল।

বিস্কুটে কামড় দিয়ে আমি অবাক চোখে তাকালাম ওর দিকে। বললাম, "কী ব্যাপার! এগুলো কি তোর গোপন স্টক? ওই রাক্ষসদের নজর পড়েনি বুঝি ওগুলোর দিকে?"

রাখহরি বলল, "এইমাত্র মোড়ের মাথা থেকে নিয়ে এলাম।"

বিস্কুট খেয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম আমি।

একটু পরেই খবরের কাগজ এলে চোখ রাখলাম কাগজের পাতায়। প্রথম পাতায় উল্লেখযোগ্য কোনও খবরই নেই। আর ভেতরের পাতাগুলো বিজ্ঞাপনে ভর্তি। তাই কাগজ রেখে বাগানে এসে গাছপালাগুলোর পরিচর্যা করতে লাগলাম।

সকালের সোনা রোদে চারদিক যখন ঝলমিলিয়ে উঠল ঠিক তখনই একটা টাটা সুমো এসে থামল বাগানের গেটের কাছে।

গাড়ির শব্দ শুনে রাখহরি এগিয়ে গেল।

আমি দূর থেকেই দেখলাম অত্যন্ত দামি শাড়ি পরা ও নানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিতা এক তরুণী গাড়ি থেকে নেমেই আমার খোঁজ করলেন।

আমিও এবার এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে। বললাম, "আপনি নিশ্চয়ই অনুরাধা সাহানি?"

তরুণী অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী করে জানলেন?"

"আগেভাগেই আমি অনেক কিছু জানতে পারি।"

"আশ্চর্য!"

"আসুন, ভেতরে আসুন।"

তরুণী ভেতরে এলে আমার সোফায় আমি তাঁকে বসতে বললাম। তারপর রাখহরির দিকে তাকাতেই রাখহরি বলল, "ব্যবস্থা করছি।"

রাখহরি সঙ্গে সঙ্গে দোকানে গিয়ে আমাদের জন্য বেশ ভালরকম জলখাবারের ব্যবস্থা করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসল।

আমি বললাম, "এবার বলুন অনুরাধা দেবী, আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?"

"তার আগে বলুন, আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?"

"শুধু নাম নয়, আপনি যে আসবেন তাও জানতাম। তবে আজই আসবেন তা জানতাম না।"

"আমার মনে হয় আমি তা হলে ঠিক লোকের কাছেই এসেছি।"

আমি হেসে বললাম, "আপনি যদি অম্বর চ্যাটার্জি নামে কারও কাছে এসে থাকেন তা হলে ঠিক লোকের কাছেই এসেছেন।"

"হ্যাঁ, অম্বর চ্যাটার্জির কাছেই এসেছি আমি।"

"আপনার স্বামীব ওই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডর একটা কিনারা করবার জন্য, এই তো?"

"না। এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক কে বা কারা তাদের প্রত্যেককে আমি চিনি। পুলিশও চেনে। কিন্তু ওই ধূর্ত বেড়ালদের ধরবার মতো ফাঁদ এখনও পর্যন্ত কেউ পাততে পারেনি। সেই কাজটা আপনাকে ধরতে হবে। এমনভাবে ধরতে হবে ওদের যাতে এক জালে সবাই ওরা ধরা পড়ে। ওবা ধরা না পড়লে আরও কতলোক যে ওদের শিকার হয়ে অকালে জীবন বিসর্জন দেবে তা কে জানে?"

রাখহরি প্লেট ভর্তি সিঙাড়া কেক ও কফির পেয়ালা এনে নামিয়ে রাখল আমাদেব সামনে।

খেতে খেতেই কথাবার্তা চলতে লাগল আমাদের।

আমি বললাম, "এত সকালে আপনি কোথা থেকে এলেন?"

"আমি কলকাতা থেকেই আসছি। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে একটা ফ্ল্যাট নেওয়া আছে আমাদেব। কলকাতায় এলে আমরা ওখানেই উঠি।"

"তা না হয় হল। আপনি তো থাকেন বিহারে। সেখান থেকে আমাব খোঁজ আপনি কীভাবে পেলেন?"

"জয়ন্ত বিশ্বাস নামে কাউকে আপনি চেনেন?"

"চিনি বৈকি। ল্যান্সডাউনে বাড়ি। একসঙ্গে একই কলেজে পড়েছিলাম আমরা। দেখাসাক্ষাত অবশ্য অনেকদিন নেই।"

"উনি আমাদেব পবিবারের বিশেষ বন্ধু। ওঁর মুখে শুনেই আপনার কাছে এসেছি আমি। আপনি নিশ্চয়ই জয়ন্তর মুখে শুনেছেন আমার কথা। নামও জেনেছেন?"

"মোটেই তা নয়। অন্য একটা সূত্র থেকেই আপনার খবর পেয়েছি। আগে আপনাব কথা শুনি। পরে সব বলব আপনাকে।"

চা-পর্ব শেষ করে অনুরাধা বললেন, "আমার নাম অনুরাধা মুখার্জী। পরে সাহানি হই। বুঝতেই পারছেন বাঙালি। আপনাদেরই এই লাইনে বাগনানে বাড়ি। আমার বাবা-মা দুজনেই বেঁচে আছেন। খুবই অভাবের সংসার ছিল আমাদের। শ্যামপুর কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে পড়তেই আমি সংসার চালানোর তাগিদে কলকাতায় একটি হোটেলে নর্তকীর চাকরি নিয়ে পড়াশুনা ছাড়ি। তখনই রূপলাল সাহানির সঙ্গে আমার পরিচয়। জয়ন্ত বিশ্বাস ও আমার স্বামী একই ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন। সেইসূত্রেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। যাই হোক, বিয়ের পর আমি রূপলালের নওয়াদার বাড়িতে চলে আসি। ওঁর দয়ায় আমাদের পরিবারে আর কোনও দুঃখ-কষ্ট রইল না। বাগনানে এখন আমাদের পাকা বাড়ি। জমিজমাও হয়েছে অনেক। আমার স্বামী অত্যন্ত সৎভাবে ব্যবসা করতেন। গরিব দুঃখীদের সাহায্য করতেন। সেই মানুষের যে অমন মর্মান্তিক মৃত্যু হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। বাড়ি গাড়ি শাড়ি গয়না কোনও কিছুরই অভাব নেই আমার। অল্পদিন হল বিধবা হয়েছি। এখন বলুন তো যাঁর দয়ায় আমার এত কিছু সেই তিনিই যদি আমার জীবনে না থাকেন তো আমার বেঁচে থেকে লাভ কী?"

"ওঁর মৃত্যুটা ঠিক কীভাবে হল একটু যদি বলেন...।"

"একদিন উনি কী একটা কাজে বিহারশরীফে গেলেন কিন্তু বাড়ি ফিরলেন না। তিন

দিন পরে বাড়ির কাছেই লেভেল ক্রসিং-এ রেলের চাকায় ছিন্নভিন্ন তাঁর দেহটার সন্ধান পাওয়া গেল। এটি যে দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা নয় তার প্রমাণ ওঁর হাত-পা দুটোই লাইনের সঙ্গে বাঁধা ছিল। ওঁর মারুতিটা ছিল হসুয়ার মোড়ে। তবে রহস্যময়ভাবে উধাও গাড়ির ড্রাইভার রতনলাল।"

"রতনলালের বাড়ি কোথায়?"

"হসুয়াতেই। কিন্তু না সে বাড়ি ফিরেছে না পাওয়া গেছে তার ডেডবডি।"

"অর্থাৎ পলাতক। তার মানে খুনিদের দলে হয়তো সেও ছিল। তাই গা ঢাকা দিয়েছে।"

"না। রতনলাল সে প্রকৃতির মানুষ নয়। তা ছাড়া কোথায় হসুয়া, কোথায় নওয়াদা। হসুয়া তিলাইয়ার মোড়ে। রেল স্টেশনের কাছে। আর নওয়াদা সেখান থেকে বেশ কয়েকটি স্টেশন দূরে। ওরা রতনলালকেও হয় খুন, নয় তো গুম করেছে।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "একটু আগে আপনি বললেন এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক কে বা কারা তাদের আপনি চেনেন। পুলিশও চেনে। তাই, যদি আপনি ওদের সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করেন তা হলে কিন্তু আমার তদন্তের খুব সুবিধে হয়।"

"সব বলব বলেই তো আপনার কাছে এসেছি আমি।"

রাখহরি এতক্ষণ মন দিয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। কিন্তু তারই মধ্যে আবার দু'কাপ চা তৈরি করে দিয়ে গেল আমাদের। অমনিই জিজ্ঞেস করল, "দিদি, আজ আপনি আমাদের এখানে ডাল-ভাত যা হোক দুটো খেয়ে যাবেন তো?"

অনুরাধা বললেন, "না ভাই। আজ নয়, অন্য একদিন। তোমাদের এখান থেকে বেরিয়ে আমি একবার বাগনানে যাব আমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে। তারপর আবার ফিরে যাব নওয়াদায়।"

আমি বললাম "এবার বলুন, ওদের ব্যাপারে কী বলবেন? লেভেলক্রসিং, ডেঞ্জার গ্যাঙ সব যেন কেমন ওলোট-পালট হয়ে যাচ্ছে আমার।"

"যাবারই কথা। লক্ষ্মীসরাই, বেগুসরাই, কিউল, মোকামা, আকবরপুর সর্বত্র সন্ত্রাস ওদের। দশ পনেরোজনের একটি অশুভ চক্র। প্রতীক হল ডেঞ্জার সিগন্যাল। এই মাফিয়া দলটি রেলের স্ক্র্যাপ বিক্রির সঙ্গে যুক্ত। ওয়াগন ভাঙা থেকে শুরু করে ভারতীয় রেলের যাবতীয় সর্বনাশের মূল এরাই। এরা এমনই বেপরোয়া যে খুন করে নিজেদের পরিচয় দিয়ে টেলিফোনে পুলিশকে খুনের কথা জানায়। যাদের বাড়ির লোক খুন হয় জানিয়ে দেয় তাদেরকেও। ওদের টার্গেট হল বড় ব্যবসায়ীরা। খুনের জন্য ওরা ছোরা-ছুরি, বোমা-গুলি কিছুই ব্যবহার করে না। শুধু একই দলের কাজ এটা জানাবার জন্য রেলের লেভেল-ক্রসিংকেই ব্যবহার করে। জীবন্ত মানুষকে হাত-পা বেঁধে ট্রেন আসার আগের মুহূর্তে লাইনে ফেলে দেয়। শুধু ফেলে দেওয়া নয়, এমনভাবে বেঁধে রাখে যে সেখান থেকে সরে যাওয়ারও কোনও উপায় থাকে না। ওদের কালো হাত বহুদূর বিস্তৃত। যে কোনও ব্যবসায়ী একটি বিশেষ সীমাবদ্ধতার ওপরে উঠে গেলে অর্থাৎ এই রাজ্যের মধ্যে অধিক বিত্তবান ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে ডেঞ্জার গ্যাঙ বিপদ সিগন্যাল দেখায়। বলে, লেভেল ক্রস করে ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছতে গেলে ডেঞ্জার সিগন্যালকে লাভের অর্ধাংশ দিতে হবে। না হলেই বরণ করে নিতে হবে চরম পরিণতিকে। শুধু তাই নয়, ওরা খুন করে। করে পুলিশকে জানায়,

'আজ একটা খুন হয়েছে। খুনটা আমরাই করেছি। তাই অযথা সময় নষ্ট করে দৌড়-ঝাঁপ করবেন না। অযথা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কাউকে বিরক্ত করবেন না। কোনও নিরীহ মানুষকে গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করবেন না। মনে রাখবেন, আমাদের কাজের জন্য অন্যের শাস্তি হলে পুলিশকে কিন্তু আমরা ছাড়ব না। আমরা যত না খুন করি, পুলিশ ও নেতারা তার চেয়েও অনেক বেশি খুন করে। আমরা অত্যন্ত ভদ্রলোক। মশা যেমন নির্বিচারে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর রক্তপান করে ব্যবসায়ীরাও তেমনই নানাকায়দায় শোষণ করে মানুষকে। তাই ব্যবসায়ীরা আমাদের কাছে রক্তশোষক মশক-এর মতো। সেজন্যই ব্যবসায়ী খুন আমাদের কাছে মশা মারার মতোই সামান্য ব্যাপার'।"

এই পর্যন্ত বলে অনুরাধা থামলেন।

আমিও একাগ্রচিত্তে ওঁর বক্তব্য শু'নে স্থির হয়ে বসে রইলাম। গ্যাঙটি যে সত্যই ডেঞ্জারাস তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ওদের যুক্তির সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। ব্যবসায়ীরা যদি ওই দলের কাছে রক্তশোষক মশক হন তা হলে একমাত্র চাকুরিজীবী ছাড়া সবাই তো ব্যবসায়ী। যে লোকটা বাদাম বেচছে সেও যা, আর যিনি জুয়েলারির দোকানে বসে লাখ লাখ টাকা আয় করছেন তিনিও তা। আসলে ওই দুষ্কৃতীর দল চুনোপুঁটি নয়, রাঘব বোয়ালদেরই মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চায়। আর সেজন্যই এই অজুহাত।

আমি অনুরাধাকে বললাম, "আপনার স্বামীর ব্যবসাটা ঠিক কী ধরনের ছিল বলুন তো?"

"ওঁর ব্যবসা এক ধরনের ছিল না। প্রথমে বাড়ি কেনাবেচা, পরে প্রমোটারি। তারও পরে ফিল্ম ইন্ডাসট্রিতে টাকা খাটাতেন। রেল ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ তৈরি করতেন। রাঁচি, হাজারিবাগ ও পটনাতে ওঁর স্টিল ফার্নিচারের দোকান ছিল। সম্প্রতি নওয়াদাতে জমি কিনে একটি সিনেমা হল তৈরি করেছিলেন।"

"তার মানে অনেক টাকারই মালিক হয়েছিলেন তিনি।"

"হ্যাঁ। কিছুদিন আগে পটনার একটি হোটেলে একজন ব্যবসায়ীর পার্টিতে যখন আমরা যোগ দিয়েছিলাম তখন ওরা আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করে। ওরা ওঁর কাছে দু'কোটি টাকা অথবা ওঁর ব্যবসার লভ্যাংশের অর্ধেক নিয়মিতভাবে যাতে বিনা ঝামেলায় ওদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এমন দাবি করে। কিন্তু উনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, ওদের কোনওভাবেই কোনও সাহায্য করবেন না বলে। ওরা অবশ্য ওদের প্রস্তাবটা আর একবার ভেবে দেখবার কথা বলে বিদায় নেয়। তারপরই এই। জয়ন্তবাবু আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। উনি অনেক করে ওঁকে বললেন, ওদের সঙ্গে সংঘর্ষে না যেতে। এমনকী এও বললেন জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বাদ না করার জন্য। আমার উনি হেসে বললেন, "ব্যবসায় ফুলে-ফেঁপে ওঠাটা আমার একটা নেশা। তেমন হলে ব্যবসা আমি গুটিয়ে নেব। মুম্বই অথবা পুনেতে গিয়ে হোটেল ব্যবসা করব। তবু এক পয়সাও দেব না ওদের।" জয়ন্তবাবু আর কোনও কথা না বলে শুধু একটি কথাই বললেন, "তোমার নিয়তি এবার ঘনিয়েছে দেখছি।"

আমি একটু চুপ থেকে বললাম, "জয়ন্তর সঙ্গে আপনাদের বন্ধুত্ব কতদিনের?"

"অনেকদিনের। আমি তো বিয়ের পর থেকেই ওকে দেখছি ওঁর সঙ্গে।"

"জয়ন্তর কীসের ব্যবসা?"

"শুনছি উনিও প্রথমে বাড়ি কেনাবেচার লাইনে ছিলেন। পরে এই লাইনে মাফিয়াচক্র সক্রিয় হয়ে ওঠায় উনি প্রমোটারির পথ ধরেন। পটনায়, ভাগলপুরে, রাঁচিতে ওঁর এখন রমরমা কারবার। রাজগীর থানার কাছে একটি জমি পছন্দ করে উনি হোটেল তৈরি করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। আমার উনি অবশ্য ওঁকে রাজগীরের বদলে পটনায় জমি কিনতে বলেন। আর রাজগীরের জমিটি উনি রতনলালের নামে কিনে ওকে গিফট দেন। তবে ওইখানে হোটেল তৈরি করার দায়িত্বটা দেন জয়ন্তবাবুকেই। পরিকল্পনামতো কাজও এগোচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ...।"

"জয়ন্ত কি পটনার জমিটা কিনেছিল?"

"হ্যাঁ। এমনকী ওখানে একটা ফাইভ স্টার হোটেল নির্মাণের আয়োজনও করছিলেন।"

"কাজ কতটা এগিয়েছিল বলতে পারেন?"

"না। তবে এই ব্যাপারে উনি আর্থিক সাহায্যের জন্য আমার স্বামীর কাছে ঘনঘন আসা-যাওয়া করছিলেন।"

"তা হলে ধরা যেতে পারে জয়ন্ত এতদিনেও আপনার স্বামী রূপলাল সাহানির ধারেকাছে পৌঁছতে পারেননি।"

"না।"

আমি বললাম, "আপনার কথা মোটামুটি শুনলাম। ব্যাপারটা যে দারুণ গোলমেলে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নায়ক যে কারা তাও অজানা নয়। শুধু ওই লোকগুলোকে হাতে নাতে ধরতে পারলেই যাবতীয় রহস্যের যবনিকা পতন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই, জয়ন্ত বিশ্বাস আমার অতীতের বন্ধু। তবে কিনা বহুদিন ওর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। তাই আমার খবর ও কী করে পেল এটা আমার খুবই জানতে ইচ্ছে করছে। ও কী নিজেই আপনাকে আমার কাছে পাঠাল?"

অনুরাধা বললেন, "না। অনেকদিন আগে কাগজের রিপোর্ট পড়ে আপনার প্রসঙ্গে উনি বলেছিলেন আপনি নাকি ওঁর বন্ধু হন। তা ছাড়া আমার বাড়ি বাগনানে। তাই বলেছিলেন মৌড়িগ্রামে আপনার বাড়ির কথা। ওই বিপজ্জনক গ্যাঙটিকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য আপনার শরণ নেওয়ার কথা আমিই ওঁকে বলেছিলাম। কিন্তু উনি 'হুঁ-হাঁ' করে আর এগোননি। আমার এই চরম বিপদের মুহূর্তে যখন আমি ওঁর দ্বারস্থ হলাম তখন উনি বললেন, "এই ব্যাপারে অম্বরকে কাজে লাগালে ও হয়তো একটা কিনারা করতে পারে। আমার নাম করে ওর কাছে গিয়ে বলে দেখো, ও রাজি হয় কি না। মনে হয় 'না' করবে না। তাই অনেক আশা নিয়েই আপনার কাছে আমি এসেছি আজ।"

আমি বললাম, "এই ধরনের কোনও গ্যাঙকে ধরিয়ে দিতে পারলে সত্যিই একটি ভাল কাজ হবে আমার দ্বারা। সবচেয়ে বড় কথা, রতনলালকে জীবিত অথবা মৃত সে অবস্থাতেই হোক খুঁজে বের করতে হবে। তা হলেই রহস্যের জট খুলে যাবে। রতনলালকে কিডন্যাপ করেই খুনিরা মস্ত একটি ভুল করে গেছে। এখন আপনার কথা [illegible], স্বামীর অবর্তমানে ওঁর বিজনেস...।"

"ব্যবসার কিছুই আমি বুঝি না। শেষ পর্যন্ত সব দায়িত্ব জয়ন্তবাবুর হাতেই তুলে দিতে হবে হয়তো। তবে যা উনি সঞ্চয় রেখে গেছেন তা সারা জীবনেও দু'হাতে খরচা করে

শেষ করতে পারব না। এখন বলুন আপনাকে কি দিতে হবে?''

''আপাতত কিছু না। তার কারণ, এটা ঠিক আপনার কেস নয়। দেশের এক শ্রেণীর নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপার। আসামীদের ধরিয়ে দিতে পারলে সরকারিভাবে আমি কিছু পুরস্কার পাবার আশা করব। যেহেতু আপনার মৃত স্বামীর জীবন আমি ফিরিয়ে দিতে পারব না তাই আপনার কাছ থেকে কোনও কিছুই প্রত্যাশা করি না। ধরুন, যদি আমি সফল না হতে পারি, তা হলে?''

''সফল আপনি হবেনই। আমার মন কিন্তু তাই বলছে। আপাতত আমি আপনার জন্য এক লাখ টাকার একটা চেক এনেছি। যদি ওই গ্যাঙটাকে আপনি ধরিয়ে দিতে পারেন তা হলে আরও চার লাখ টাকা আপনাকে আমি দেব। না হলে এই শেষ।''

আমি চেকটি হস্তগত করলাম। তারপর বললাম, ''আপনাব সব কথাই তো শুনলাম। কিন্তু আপনার কোনও সন্তানাদি...।''

অনুরাধা ম্লান হেসে বললেন, ''বিয়ের পর একটি হয়েছিল। কিন্তু সে বেঁচে নেই। মাত্র চারদিনের মাথাতেই...।''

''স্যরি। না জেনে আপনার ব্যথার জায়গায় আমি ঘা দিয়ে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না।''

অনুরাধা বললেন, ''না না। তাতে কী? আচ্ছা, আজ তা হলে আসি?'' বলে উঠে দাঁড়িয়েই বললেন, ''ওঃ হো, আপনার ফোন নম্বরটা আমাকে দিন তো?''

আমি আমার নাম-ঠিকানা লেখা একটি কার্ড অনুরাধাকে দিলাম। তারপর বললাম, ''যাবেন কিন্তু খুব সাবধানে। আমার এখানে দেখা করতে আসার অপরাধে আপনার জীবনও কিন্তু বিপন্ন হতে পারে।''

অনুরাধা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিদায় নিলেন।

উনি চলে যাবার পর আমি চেকটা হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম কিছুক্ষণ। জয়ন্তর সঙ্গে আজ প্রায় দশ বছর আমার যোগাযোগ নেই। আমার গোয়েন্দাগিরির কথা হয়তো আমার কোনও বন্ধুবান্ধবের মুখ থেকে ও শুনে থাকতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য! এই ব্যাপারে অনুরাধাকে পাঠানোর আগে আমার সঙ্গে ও নিজে কোনও যোগাযোগ করল না কেন? তার চেয়েও আশ্চর্যের, ডেঞ্জার গ্যাঙের ওরা আমার ব্যাপারে কীভাবে জানল আর আমার টেলিফোন নম্বরই বা পেল কী করে? অনুরাধা যে আমার সাহায্য নেবে এমন ধারণাই বা ওদের হল কেন? অনেক ভেবেও আমি কোনও কূল পেলাম না।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর যখন চিন্তা করছি এই ব্যাপারে কীভাবে এগোব সেই নিয়ে, এমন সময় আবার টেলিফোন, ''কেসটা তা হলে আপনি নিয়েই নিলেন মিঃ চ্যাটার্জি? ভালই করেছেন। ডেঞ্জার গ্যাঙ বড়ই বিপজ্জনক। তাদের ধরিয়ে দেওয়া একান্তই দরকার। তা কবে আসছেন আমাদের নওয়াদায়?''

''ভাবছি আজকালের মধ্যেই যাব।''

''আপনি নিশ্চয়ই অনুরাধা সাহানির বাড়িতে উঠবেন?''

''অবশ্যই।''

''ভদ্রমহিলা কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরী।''

আমি ইংরেজিতে একটি গালাগালি দিয়ে ফোন নামিয়ে রাখলাম।

ফোনের কথাগুলো টেপ হয়ে গেছে।

অনুরাধা চলে যাবার পরই তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এসে এই ব্যবস্থা করে গেছে।

রাখহরিও সময়মতো ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা দিয়ে এসেছে চেকটা। এ পর্যন্ত কোনও কাজের জন্য এক লাখ টাকা পাওয়া দূরের কথা, এর অর্ধেকও পাইনি আমি। গ্যাঙটাকে যদি ধরতে পারি তা হলে পাব আরও চার লাখ টাকা। ভাবা যায়?

এখন আমার নিজের কাছেই নিজের প্রশ্ন, এগোব আমি কোন পথ দিয়ে?

আমি যখন আকাশ-পাতাল ভাবছি রাখহরি তখন কী যেন ভেবে বলল, "আপনার কাছে আমি অনেকদিন আছি। কিন্তু কোনও জটিল কেসের ব্যাপারেও আপনাকে এতটা ভাবতে দেখিনি। এই ব্যাপারে আমার কিছু বলা উচিত নয় যদিও তবুও বলি, খুনিদের পেছনে ধাওয়া না করে আপনি বরং চেষ্টা করুন ওই রতনলালকে খুঁজে বের করার। অবশ্য ইতিমধ্যে যদি সে খুন না হয়ে থাকে।"

রাখহরির কথাটা মনে ধরল আমার। বললাম, "আমিও ঠিক এইরকমই চিন্তাভাবনা করছিলাম। তাই ভাবছিলাম, নওয়াদায় না গিয়ে হসুয়ার মোড় থেকেই শুরু করি তদন্তটা।"

"হসুয়াটা কোথায় বলুন তো? এমন নাম কখনও শুনিনি।"

"রাজগীরের কাছাকাছি। ওটাকে তিলাইয়ার মোড়ও বলা হয়। তিলাইয়া রেলস্টেশন থেকে মাত্র এক কিমি।"

"কবে যাবেন তা হলে?"

"আজই যেতে পারলে ভাল হত কিন্তু আজ যাচ্ছি না। ওদের আরও দু-একটা ফোনের হুমকির আশা করছি। তাই কালকের যাওয়াটা ফাইনাল।"

"কোন গাড়িতে যাবেন?"

"সম্প্রতি হাওড়া থেকে কিউল হয়ে গয়া যাবার একটি এক্সপ্রেস ট্রেন চালু হয়েছে। ওই গাড়িতেই যাব। ওই ট্রেনটা নওয়াদা তিলাইয়া হয়ে গয়ায় যায়। তুই একবার হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখ, ওই গাড়িতে একটা রিজার্ভেশন পাস কিনা। না পেলে কাল পূর্বা এক্সপ্রেসের সাধারণ বগিতে চেপেই যাব। ওই গাড়িতে গেলে অবশ্য গয়ায় নামতে হবে। সেখান থেকে নওয়াদা কিম্বা বিহারশরীফের বাসে হসুয়ায়।"

রাখহরি বলল, "খুব সাবধানে যাবেন কিন্তু। ট্রেনেও সাবধান থাকবেন। ঘুমিয়ে পড়লেই বিপদ।"

আমি বললাম, "ভয় নেই। তুই গিয়ে একবার টিকিটের চেষ্টা করে দেখ।"

আমি টাইমটেবল দেখে ফর্ম ফিলাপ করে কিছু টাকা দিয়ে রাখহরিকে স্টেশনে পাঠালাম।

ও চলে যাবার একটু পরেই জয়ন্তর ফোন এল, "হ্যালো এ.সি. কেমন আছিস?"

এ.সি. মানে অম্বর চ্যাটার্জি। ও বরাবর আমাকে এই নামেই ডাকত। আজও তাই ওই নামেই সম্বোধন করল।

বললাম, "তুই কোথা থেকে ফোন করছিস?"

"তার আগে বল, আছিস কেমন?"

"আমি সবসময় যেমন থাকি অর্থাৎ ভালই। তা এতদিন বাদে কী মনে করে?"

"একটু আগে অনুরাধা সাহানি কি তোর কাছে গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"ওকে আমিই পাঠিয়েছিলাম তোর কাছে। ওর মুখে সব শুনেছিস নিশ্চয়ই?"

"শুনেছি। টেলিফোন হুমকিও পেয়েছি।"

"তা ডিসিশনটা কি নিলি?"

"ডেঞ্জার গ্যাঙকে এবার থেকে রেড সিগনালটা আমিই দেখাব।"

"খুব সাবধানে ভেবেচিন্তে এগোবি কিন্তু। ওরা দারুণ খতরনক। তোর ব্যাপারে অনেকদিন আগে একবার অনুরাধার কাছে গল্প করেছিলাম। তারপর তোর কয়েকটা ঘটনা বিশেষ করে গোয়েন্দা অম্বর বইটা পড়ে ও তোর ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী হয়। আমার বন্ধু রূপলাল সাহানির হত্যাকাণ্ডের পর ও যখন তোর সাহায্য নেবার জন্য আগ্রহী হয় আমি তখন ওকে এড়িয়েই যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও শুনল না তাই তোর ঠিকানাটা ওকে দিলাম। পুরো ঠিকানা তো আমি জানি না। তাই মৌড়িগ্রামে পাঠিয়ে খুঁজে নিতে বললাম। ওদের জালে আমিও জড়িয়েছি রে ভাই, যে কোনও মুহূর্তে আমার জীবনও বিপন্ন হতে পারে।"

আমি বললাম, "সাবধানে থাক। চেষ্টা করে দেখি কতটা কি করতে পারি। কিন্তু তুই এখন ফোন করছিস কোথা থেকে?"

"বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে। তুই কবে নওয়াদায় যাচ্ছিস বল? তা হলে একসঙ্গেই যাব আমরা।"

আমি বললাম, "ঠিক নেই। সম্ভবত এই সপ্তাহের শেষের দিকেই যাব।"

"আজ-কালের ভেতর হয় না?"

"আমার কতকগুলো আইনি জটিলতার কাজ আছে, সেগুলোকে শেষ না করে যেতে পারছি না।"

"বেস্ট অব লাক। তুই নওয়াদায় এলেই তোর সঙ্গে দেখা করব।"

আমি ফোন নামিয়ে রাখলাম। ফোনে ওর সঙ্গে কথা বলার পর দুশ্চিন্তা আমার আরও বেড়ে গেল।

দুশ্চিন্তা বেড়ে যাওয়ার কারণ একটাই। কারণটা হল ফোনের হুমকি এবং জয়ন্তর কণ্ঠস্বর হুবহু এক। তবে কি ডেঞ্জার গ্যাঙের আড়ালে জয়ন্তরই কোনও কূটবুদ্ধি খেলা করছে? না হলে এই সমস্ত ঝুট-ঝামেলার মাঝখানে আমি জড়িয়ে পড়ব কেন? মিঃ সাহানিকে খুন করে অথবা খুন করিয়ে ব্যবসায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা অনুরাধাকে ব্ল্যাকমেল করে সে হয়তো ওকে সর্বস্বান্ত করবার চেষ্টা করছে। অনুরাধা সুন্দরী রমণী, সেদিক থেকেও ওর মনে কোনও বদ মতলব থাকতে পারে। তবুও আমি আরও নিশ্চিন্ত হবার জন্য থানায় একবার ফোন করলাম। ফোনের কথোপকথন টেপ করবার ব্যবস্থা ওরাই করে রেখেছিল। এই ফোনের মধ্যে দিয়েই ঘুঘুর ফাঁদে ঘুঘু ঠিকই ধরা পড়বে।

একটু পরেই ইনসপেক্টর এলেন।

তাঁকে সব কথা খুলে বলতেই তিনি টেপের কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করে বললেন, "স্ট্রেঞ্জ। আপনার বন্ধুর কণ্ঠস্বর আর হুমকির স্বর তো দেখছি হুবহু এক।" বলে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আপনার বন্ধু জয়ন্তবাবুর ঠিকানাটা জানেন?"

"না। ল্যান্সডাউনের দিকে থাকে এইটুকুই শুধু জানি। তাও সুদীর্ঘকাল ওর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই।"

"কিন্তু এতদিন বাদে উনি হঠাৎ আপনাকে টার্গেট করতে গেলেন কেন?"

"হয়তো বা পাপের ভারা পূর্ণ হয়েছে বলে। আসলে ব্যাপারটা একটু হালকাভাবেই নেওয়া যাক। সাহানি পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাসটা দৃঢ় করার জন্যই হয়তো কোনও সময় মুখ ফসকে আমার প্রসঙ্গ চলে আসে। তারপর অনুরাধার জেদকে আর এড়িয়ে যেতে পারে না। এখন যখন ও বুঝতে পেরেছে আমাকে এড়ানো আর সম্ভব নয় তখন সাধু সাজা এবং পুরনো বন্ধুত্বকে ঝালিয়ে নেওয়ার জন্যই এই ফোন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ডেঞ্জার গ্যাং-এর গডফাদার জয়ন্ত ছাড়া আর কেউ নয়।"

ইন্‌সপেক্টর বললেন, "আমারও তাই ধারণা।" বলে একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আচ্ছা মিঃ চ্যাটার্জি, আপনি অনুরাধা সাহানির গাড়ির নম্বরটা কি নোট করে রেখেছেন?"

আমি বললাম, "না। ঘটনার আকস্মিকতায় সে কথা একবারের জনও মনে হয়নি। এমনকী বাগনানে কোন জায়গায় ওঁর বাপের বাড়ি সে কথাও জানা হয়নি।"

"ঠিক আছে। ও ব্যাপারটা আপনি আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। আর হ্যাঁ, আপনি কি এই গ্যাঙটাকে ধরার ব্যাপারে কোনও পরিকল্পনা বা চিন্তাভাবনা করছেন?"

"অবশ্যই। আমি হয়তো আজ-কালের মধ্যেই রওনা হব নওয়াদার দিকে।"

"বেস্ট অব লাক। যান আপনি। ওখানকার পুলিশও যাতে আপনাকে সাহায্য করে সে ব্যবস্থাও আমরা করে দেব।"

আমি বললাম, "খবরদার নয়। এখান থেকে কোনও কিছুই জানাবেন না ওখানকার পুলিশকে।"

"জানালে দোষ কি?"

"এমনও তো হতে পারে ওখানকার পুলিশের একাংশের সাহায্য নিয়েই ডেঞ্জার গ্যাঙ এমন ভয়ানক সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে?"

"পারে। কিন্তু আপনি যে এই ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন এই তথ্য তো ডেঞ্জার গ্যাং-এর অজানা নয়।"

"তবুও যতটা গোপনে কাজ করা যায় ততটাই ভাল।"

ইন্‌সপেক্টর হেসে করমর্দন করে বিদায় নিলেন।

পরদিন গয়া এক্সপ্রেসেই আমি রওনা হলাম তিলাইয়ার দিকে। এর মধ্যে কোনও হুমকি বা জয়ন্তর কোনও ফোন আসেনি। এমনকী অনুরাধা সাহানিও ফোন করেননি আমাকে।

রাত দশটা কুড়িতে ট্রেন ছাড়ল। নতুন চালু হয়েছে গাড়িটা। তাই ভিড় একদমই নেই। রাখহরি যাওয়া মাত্রই টিকিট পেয়েছে এই গাড়ির।

আমি একটি আপার বার্থে শুয়ে তদন্তের কাজ কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম। দ্রুতগামী ট্রেনের গতি এবং দুলুনিতে মাঝে মাঝেই ঘুমে জড়িয়ে আসছিল চোখ দুটো। কিন্তু এখন ঘুমিয়ে পড়া মানেই নিজের হাতে মৃত্যুর যবনিকাকে টেনে আনা। ডেঞ্জার গ্যাঙের লোকেরা যদি আমার পিছু নিয়ে থাকে তো হলে

এই ঘুমই হবে আমার কালঘুম। কাল সকালের সূর্যোদয় আমাকে আর দেখতে হবে না।

রাত্রি প্রায় দুটো নাগাদ ট্রেন আসানসোলে আসতেই আমার কম্পার্টমেন্টের কোচ অ্যাটেনড্যান্ট এসে টিকিট দেখতে চাইলেন আমার। বললেন, "আপনিই কি মিঃ এ. চ্যাটার্জি?"

বললাম, "হ্যাঁ, আমিই।"

"আসুন আপনি আমার সঙ্গে। ফার্স্ট ক্লাস এ.সি.-তে মিসেস অনুরাধা সাহানি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

আমি বললাম, "ওঁকে গিয়ে বলুন, আমি এখানে বেশ আছি।"

"উনি শুনছেন না। আপনি আসুন।"

অগত্যা যেতেই হল।

প্ল্যাটফর্মে নেমে দু'চারটে বগির পরই ফার্স্ট ক্লাস এ.সি-তে উঠলাম। ছোট্ট একটি কূপের মধ্যে অনুরাধা একাই ছিলেন। দুজনের থাকার মতো কূপ।

অ্যাটেনড্যান্ট আমাকে ওঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "ইনিই তো?"

অনুরাধা একমুখ হেসে বললেন, "হ্যাঁ, ইনিই।"

একটু নিশ্চিন্ত হলাম। এতক্ষণ একা একা মুখ বুজে আসছিলাম এবার কথা বলার মতো একজনকে পেলাম। এমনই একজন, যাঁর কাজের জন্যই এখানে আসা। শুধু তাই নয়, এই কূপের মধ্যে লক করে নিশ্চিন্তে একটু ঘুমনোও যাবে।

অনুরাধা বললেন, "রাতদুপুরে আপনাকে ডিসটার্ব করলাম।"

আমি বললাম, "এতে আমার উপকারই হল। কিন্তু আমি যে এই গাড়িতে আছি এ-খবরটা আপনি পেলেন কী করে?"

"আমি স্টেশনে এসে আপনার বাড়িতে ফোন করেছিলাম। আপনার ওই ছেলেটিই আমাকে বললে, এস টু বগিতে বাইশ নম্বর বার্থে আপনি আছেন। স্টেশনে আপনাকে খুঁজে বের করবার সময় পাইনি। পরে আমার অনুরোধে রেলের লোকরাই আপনাকে ডেকে আনল আমার কাছে।"

"ধরুন যদি আমি অন্য গাড়িতে যেতাম?"

"তা হলে আর কী? বাড়ি পৌঁছে দর্শন পেতাম আপনার। আপনি যে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবেন এ আমি ভাবতেও পারিনি।"

কথালাপের মধ্যেই ঘুমের ঘোরটা কেটে গেল কখন যেন। অনুরাধা ওঁর ফ্লাস্ক থেকে গরম কফি একটু খেতে দিলেন আমাকে। আমি কফিতে চুমুক দিয়ে বললাম, "জয়ন্তর ব্যাপারে আপনাকে দু'একটা কথা আমি জিজ্ঞেস করব এবার।"

"বেশ তো, কী জানতে চান বলুন?"

"জয়ন্ত বিশ্বাস মানুষটাকে দেখে আপনার কী মনে হয়?"

"হঠাৎ এরকম প্রশ্ন করছেন কেন?"

"তার কতকগুলো কারণ আছে। প্রথমত, জয়ন্তর সম্পর্কে আমার ধারণা খুব একটা স্পষ্ট নয়। বহুদিন ওর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। আপনার স্বামী খুন হলেন অথচ উনি বহাল তবিয়তে আছেন। মিঃ সাহানির মতো অতটা বিত্তবান না হলেও উনিও নেহাত হেঁজিপেঁজি বিজনেসম্যান নন। আপনার স্বামীর মৃত্যুর পরে বর্তমানে আপনার যা

অবস্থা তাতে আপনি বলছেন আপনাকে ওর ওপরই নির্ভর করতে হবে। তখন আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা উনি তো নাও রাখতে পারেন।''

''অসম্ভব কিছুই নয়! আমি শুধুমাত্র হাউস ওয়াইফ। আমার এই দুঃসময়ে ওঁকে বিশ্বাস করা বা ওঁর ওপরে নির্ভর করা ছাড়া আর কোনও উপায়ও নেই।''

''এ ব্যাপারে ওর আগ্রহ কতটা?''

''ষোলো আনা।''

''এ কাজে ওর নিজের জীবনের ঝুঁকিও তো আছে।''

''আছে। তবে কিনা উনি কিন্তু ওদের কথামতোই চলেন।''

''তা যদি হয়, তা হলে এমন কি আপনার কখনও মনে হয়নি যে এই ডেঞ্জার গ্যাঙ-এর দলের সদস্যদের মধ্যে উনিও একজন?''

অনুরাধা এবার নতবদন হলেন। তাঁর পদ্মের মতো মুখখানি গ্রহণলাগা চাঁদের মতো ম্লান হয়ে গেল। বললেন, ''এরকম কিন্তু আমার কখনও মনে হয়নি। আর বিশ্বাসঘাতকতা করলেই বা আমার কী যায় আসে? ওঁর ব্যবসা তো আমি সামলাতে পারব না। আর উনি এ পর্যন্ত যা রেখে গেছেন তাতে আরও অধিক অর্থের প্রয়োজনে আমাকেও কোনও কিছু করতে হবে না।''

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, ''এইবার আপনাকে আমি একটি অনধিকার প্রশ্ন করব। যদি কিছু মনে না করেন।''

অনুরাধা মিষ্টি হেসে বললেন, ''না না। কিচ্ছু মনে করব না। এখন আপনি আমার বন্ধুর মতো। আপনার যা মনে আসে তাই বলুন। শুধু জয়ন্তবাবু নয়, আপনাকেও তো আমি বিশ্বাস করছি। না হলে এই রাতে একদিনের অল্প কিছুক্ষণের পরিচয়ে আমি আপনাকে আমার কূপের মধ্যে ডাকিয়ে আনলাম কোন সাহসে?''

''সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি যা বলছিলাম তা হল, আপনি তো রীতিমতো একজন সুন্দরী মহিলা, এত ঐশ্বর্যের মালিক। কাঁচা বয়স আপনার, যদি কেউ হঠাৎ করে আপনার জীবনে আসে, তাকে কী আপনি মেনে নেবেন না? সারাটা জীবন একা একা নিশ্চয়ই থাকবেন না আপনি। ওই ব্যাপারে কোনও চিন্তাভাবনা আপনি করেছেন কী?''

''নিশ্চয়ই করেছি। আপনার অবগতির জন্য জানাই, রূপরাজ সাহানির সঙ্গে আমার রেজিস্ট্রি বিবাহ হলেও বিয়ের আগে আর একজনের সঙ্গে আমার মালাচন্দনে বিবাহ হয়েছিল। তাঁর নাম বিহারীলাল। তিনি উত্তরপ্রদেশে থাকেন। সাহানির চেয়েও অনেক বেশি ঐশ্বর্যবান তিনি। এই হত্যাকারীরা সমুচিত শাস্তি পেয়েছে জানার পরই আমি তাঁর কাছে চলে যাব। আমি তাঁকে যতটা আপন করে নিতে পেরেছি ততটা আপন কিন্তু আর কাউকেই করে নিতে পারিনি। আমার মন প্রাণ আমার সমস্ত সত্তাটা পড়ে আছে তাঁর দিকে।''

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর বললাম, ''কিন্তু তিনি কি আপনাকে গ্রহণ করবেন?''

''না করলে তাঁর দরজার সামনে পড়ে থেকে মাথা খুঁড়ে মরব। আমি এত বোকা নই যে তাঁকে না বুঝে তাঁর গলায় মালা দিয়েছি। তিনিই আমার আসল পতি এবং গুরু।''

''আপনি সুখী হন।''

''আপনার আর কোনও বক্তব্য?''

"আপাতত নেই।"

"তাহলে এবার আপনি একটু বিশ্রাম করুন।"

ট্রেন এসে মধুপুরে থামল

আমি বার্থে উঠে দেহটা টান করে শুয়ে পড়লাম। ঘুমের একটু সত্যই প্রয়োজন। দু'চোখের পাতায় ঘুমও আছে আমার। কিন্তু ঘুমবো কী করে? অনুরাধা সাহানির এই অকপট স্বীকৃতি আমাকে যেন চমকে দিল। আমার মতো একজনকে এই রাতদুপুরে তার কূপে নিয়ে আসা, বন্ধুর মতো ব্যবহার করা, নিজের গোপন ইচ্ছার কথা অকপটে স্বীকার করা সবই কেমন যেন রহস্যময় মনে হল আমার কাছে। সদ্য স্বামীহারা এক বিধবা কী করে বলেন তিনি উত্তরপ্রদেশে চলে যাবেন বিহারীলাল নামে একজনের কাছে। এমন তো চিন্তাও করা যায় না। যাই হোক, যার যেমন ভবিতব্য, যার যেমন রুচি তিনি তো তাই করবেন। আমি আমার কাজ করতে এসেছি, করে চলে যাব।

বাকি রাতটা দারুণ ঘুমিয়েছিলাম। ভোরবেলা কপালে নরম হাতের স্পর্শ পেয়ে ঘুম ভাঙল।

অনুরাধা বললেন, "কী! আর কত ঘুমোবেন? নামতে হবে না এবার?"

"তিলাইয়া এসে গেল?"

"তিলাইয়ায় নামবেন কোন দুঃখে? আগে নওয়াদায় চলুন। ওখান থেকেই যা করবার তা করবেন।"

"আপনি সারারাত জেগে ছিলেন বুঝি?"

"দুজনেই ঘুমোলে একেবারেই গয়ায় পৌঁছে যেতাম।"

ট্রেন থামল নওয়াদায়। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা রিকশায় পৌঁছে গেলাম সাহানিদের স্বপ্নপুরীতে।

অনুরাধা বললেন, "আমার ড্রাইভার এত তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে এসে পৌঁছতে পারেনি। তাই আপনাকে রিকশায় নিয়ে এলাম। কিছু মনে করবেন না যেন।"

"কিছুই মনে করব না। আমি তো আপনাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করব বলে আসিনি। এসেছি তদন্তের কাজে। তাই কোনওরকম সুখসুবিধা গ্রহণ করবার মতো মানসিকতা আমার নেই।"

"ধন্যবাদ।"

অনুরাধা আমার থাকবার জন্য একটি ঘর দেখিয়ে দিয়ে নিজে অন্য ঘরে চলে গেলেন। এ বাড়ির কাজের লোকজনরাও বেশ ভদ্র। আমার যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য পালা করে সেদিকে নজর রাখতে লাগল। আমি শুধু ভাবতে লাগলাম, বিচিত্র রমণীর মন। এত সুখ, এত ঐশ্বর্য, এমন স্বপ্নের মতো স্বপনপুরী ছেড়ে উনি কিনা চলে যাবেন উত্তরপ্রদেশে কে এক বিহারীলাল, তার কাছে। আশ্চর্য!

আমি যখন মুখ-হাত ধুয়ে পোশাক পরিবর্তন করে ফ্রেশ হয়ে বসেছি অনুরাধা তখনই প্লেট ভর্তি খাবার নিয়ে আমার ঘরে এলেন। বললেন, "যা যা এনেছি সবই খাবেন কিন্তু। কোনও অজুহাতেই কোনও কিছু ফেলে রাখবেন না।"

আমি হেসে বললাম, "সুখাদ্য যদি হয় তা হলে তা ফেলে রাখার মতো বোকা আমি

নই। তা ছাড়া যথেষ্ট খিদেও পেয়েছে আমার।"

"খুব ভাল ছেলে আপনি। কিন্তু এমন রাঙা মুলোটি হয়ে আছেন অথচ বিয়ে করেননি কেন?"

"এবার কিন্তু আপনি একটা অনধিকার প্রশ্ন করলেন।"

"এই রকম অনধিকার প্রশ্ন আপনিও আমাকে করেছিলেন। আমি কিন্তু তাতে রাগ করিনি। বরং বন্ধু ভেবে যা কাউকে বলা উচিত নয় তা বলেছি।"

"আয়্যাম স্যরি। আসলে আমার বিয়ে না করার পেছনে অন্য একটা কারণ আছে। আমি যে কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি তাতে যে কোনও মুহূর্তে আমার নামের ওপর একটা চন্দ্রবিন্দু বসে যেতে পারে। তাই—।"

"জীবন-মৃত্যুর দোলায় দুলে সীমানা পার হতে চান, তাই না?"

"ঠিক তাই।"

"আপনার মতো মানুষ সত্যিই দেখিনি আমি।"

কথা বলতে বলতেই খাওয়া শেষ করলাম। তারপর বললাম, "আর একটুও ব্যক্তিগত আলোচনা নয়। এবার যা হবে তা শুধুই কাজের কথা। কেননা নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে এতটুকুও নেই।"

"এ কাজে এতটুকু দেরি হোক, আমিও তা চাই না। তবে একটা কথা, আপনি কিন্তু এখন বাঘের গুহায়। এই বাড়িতে পদার্পণ মাত্রই আপনি কিন্তু ওদের নজরে পড়ে গেছেন।"

"এতে আমার কাজের সুবিধে হবে খুব। তবুও আমি খুব সতর্ক হয়েই কাজ করব। আপনি নিজেও সাবধানে থাকবেন। কেননা ওরা কিন্তু এবার আপনাকেও টার্গেট করতে পারে।"

"পারে। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত যে এখনও পর্যন্ত ওরা কোনও ব্যবসায়ীর মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর তার স্ত্রী বা বাড়িঘর মেয়েদের ওপর আক্রমণ চালায়নি।"

"না হলেই ভাল। আপাতত আমি এই তদন্তের কাজ শুরু করব আপনাদের গাড়ির ড্রাইভার সেই রতনলালকে উদ্ধার করার প্রস্তুত নিয়ে।"

"কিন্তু সে কী আর বেঁচে আছে?"

"তার ডেডবডি যখন পাওয়া যায়নি তখন আশা তো একটু করা যায়। ওর বাড়ি কি হসুয়াতেই?"

"হ্যাঁ। বাজারের কাছেই বাড়ি।"

"বাড়িতে কে কে আছে ওর?"

"বছর দশেকের একটি ছেলে ও ছিপলি। মানে ওর বউ। একটি আদিবাসী মেয়েকে বিয়ে করে বেশ সুখেই দিন কাটছিল ওর। মাঝখান থেকে কী যে হয়ে গেল! কী ভাল মেয়ে ছিপলি। যেমনই সহজ সরল, তেমনই কর্মঠ। আমার তো যা হবার তা হয়ে গেল। দেখুন একটু চেষ্টা করে যদি কোনওরকমে উদ্ধার করতে পারেন রতনলালকে।"

আমি বললাম, "করতেই হবে। না হলে এই রহস্যের জট খুলবে না।" বলে হসুয়ায় যাবার জন্য তৈরি হলাম।

নওয়াদা থেকে রাজগীর অথবা গয়াগামী যে কোনও বাসে চাপলেই হসুয়ার মোড়। আমি সেইরকমই একটি বাসে সাধারণ যাত্রীদের ভিড়ে মিশে প্রায় ঘণ্টা খানেকের জার্নিতে

হসুয়ায় এলাম। আরও আগে আসা যেত কিন্তু এখানে পথ বলে তো কিছু নেই, যা আছে তা পথের কঙ্কাল। বড় বড় খানাখন্দয় ভরা। অত্যন্ত বিপজ্জনক।

যাই হোক, হসুয়ায় নেমে রতনলালের বাড়ি খুঁজে বের করতে খুব একটা দেরি হল না। মাটির পাঁচিলে ঘেরা ঝকঝকে তকতকে উঠানের প্রান্তে আদিবাসী প্রথায় তৈরি মাটির ঘর। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

আমি যাওয়ামাত্রই একটা দেশি কুকুর অচেনা অতিথি দেখে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিল।

অবশেষে ছিপলি উঠে এসে শান্ত করল তাকে। তারপর আমাকে দেখে বলল, ''কাকে চাই?''

আমি স্মিত হেসে বললাম, ''তোমার নাম যদি ছিপলি হয় তা হলে আমি তোমাকেই চাই। তুমি তো রতনলালের বউ।''

''হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে?''

''আমি হলাম আমি। তোমার বাড়িতে এলাম, তুমি আমায় বসতে বলবে না? চা-জল দেবে না?''

ছিপলি একটু লজ্জা পেয়ে বলল, ''খুব ভুল হয়ে গেছে। কখনও দেখিনি তো আপনাকে।''

ও আমাকে অত্যন্ত সমাদরে ওর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। মাটির ঘর হোক কিন্তু আলো-পাখা এমনকি রঙিন টিভিরও ব্যবস্থা সেখানে।

আমি ঘরে গিয়ে বিছানায় না বসে একটি চেয়ারে বসলাম। তারপর বললাম, ''আমি রতনলালের ব্যাপারে খোঁজখবর নেব বলেই এসেছি।''

এবার আর থাকতে পারল না ছিপলি। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল।

আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম ছিপলিকে। বন্য আদিবাসী মেয়ে। অথচ কী চমৎকার মুখশ্রী তার। গায়ের রঙ ঘন কালো। এত কালো যে তা সচরাচর চোখে পড়ে না। সেই কালো মেয়ের হরিণের মতো চোখ দুটি যে কোনও মানুষকেই বুঝি আকর্ষণ করে।

কিছু সময় পরে ছিপলি ওর চোখের জল মুছে বলল, ''একটু বসুন আপনি। আপনার জন্য চা করে আনছি।''

আমি বললাম, ''শুধু চা কিন্তু। অন্য কিছু নয়। কেননা তোমাদের মনিবের বাড়ি থেকে আমি অনেক কিছু খেয়ে এসেছি। তবে তার আগে এক গেলাস জল আমাকে দাও।''

ছিপলি ঘর থেকে বেরিয়েই রান্নাঘরে ঢুকে দুটো ক্ষীরের মিষ্টি ও এক গেলাস জল নিয়ে ঘরে ঢুকল।

বললাম, ''এসব কী?''

''ঘরে ছিল। শুধু জল কি মানুষকে দেওয়া যায়? তা ছাড়া আমি যে আপনার জন্য দোকানে যাইনি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।''

ওর কথায় কোনও টান নেই। জড়তা নেই। কে বলবে ও আদিবাসী মেয়ে!

মিষ্টি জল খেয়ে আমি বললাম, ''তোমার ছেলেটাকে তো দেখছি না ছিপলি? সে কোথায়?''

"ইস্কুলে গেছে।"

একটু পরেই ও চা করে নিয়ে এলে আমি চা খেতে খেতে বললাম, "আমি যে কেন এসেছি তা তোমাকে আগেই বলেছি। এখন তুমিই বলো, রূপরাজ সাহানি বড় ব্যবসায়ী। তিনি ডেঞ্জার গ্যাঙের চাহিদামতো টাকাপয়সা দিতে চাননি বলেই খুন হলেন। কিন্তু রনতলালের কী হল? তার অপরাধটা কোথায়?"

"হিংসা। বাবুদের বন্ধু হলেন জয়ন্ত বিশ্বাস। উনি রাজগীরে হোটেল ব্যবসা করতে চেয়েছিলেন। এমনকী জমিও দেখে ছিলেন একটা। তা রাধা দিদিমণি—।"

"রাধা দিদিমণি!"

"সে কী! রাধা দিদিমণিকে চেনেন না? যাঁর ওখান থেকে আপনি আসছেন।"

"ও তুমি মিসেস সাহানির কথা বলছ? অর্থাৎ অনুরাধা।"

"হ্যাঁ। আমি ওঁকে রাধা দিদিমণি বলি। দয়ার অবতার। আমার স্বামীকে ওরা উঠিয়ে নিয়ে যাবার পর দুদিন ছাড়াই দু'পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তা বলুন তো, এত টাকা আমি কখনও খরচা করতে পারি? যাই হোক, ওই রাধা দিদিমণির ইচ্ছাতেই বাবু জমিটা আমার স্বামীর নামে কিনে গিফট দেন। সেখানে একটা হোটেলও তৈরি হচ্ছিল। সব খরচ বাবুই দিচ্ছিলেন। বলেছিলেন, 'এই হোটেল ঠিকভাবে চালাতে পারলে আমাদের একমাত্র সন্তান বাবুয়ার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল'। তা সেই হিংসাতেই এখানকার একজন ব্যবসায়ী গোপীচাঁদ গুপ্তার বিষনজরে পড়েছিলাম আমরা।"

ছিপলির কথায় এই অন্ধকারে একটু যেন আশার আলো দেখতে পেলাম আমি। তাই দারুণ উৎসাহিত হয়ে বললাম, "তারপর?"

"ওই গোপীচাঁদ একদিন আমার খোকার বাবাকে বললেন, রাজগীরের ওই জমিটা কেনবার ইচ্ছে তাঁর অনেকদিনের। কিন্তু নানান জটিল সমস্যার কারণে তিনি ওটি কিনে উঠতে পারছিলেন না। তা ছাড়া জমির মালিক এমন একটা অসম্ভব রকমের দাম চাইছিল যাতে তিনি দর কষাকষি করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন শুনলেন বাবুর বন্ধু জয়ন্ত বিশ্বাস জমিটা ওই দামেই কেনবার জন্য রাজি হয়ে কিছু টাকা দিয়ে নাকি বায়নানামাও করিয়েছেন। তারপর জানতে পারলেন রূপরাজ সাহানি নিজে ওই জমি কিনে রতনলালকে গিফট দিয়েছেন অথবা ওর নামেই কিনেছেন। এইবার শুরু হল আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার। তারপর একদিন লোক মারফত খোকার বাবাকে ডাকিয়ে ওঁর মহলে নিয়ে গিয়ে অনেক বোঝালেন। বললেন, 'রূপরাজ সাহানির দিন আসন্ন।' খতমের তালিকায় সর্বপ্রথম নামটিই ওর। আজ বাদে কাল ডেঞ্জার গ্যাঙ-এর লেভেল ক্রসিং-এ ওর লাশটা যদি পড়ে থাকে তখন তোর ওই হোটেল ব্যবসা চালাবে কে? তার চেয়ে তোর নামে জমি যখন, তুই তখন ন্যায্য দামে জমিটা আমাকেই লিখে দে। কাজ হবে ভেতরে ভেতরে। কেউ জানতেও পারবে না। তা ছাড়া এমনও তো হতে পারে, রূপরাজ সাহানির ডেড বডি জ্বলে ওঠার পর তোকেও একটা বেওয়ারিশ লাশ হয়ে চিতায় উঠতে হবে। অতএব ভেবে দেখ, আমার শর্তে রাজি, নাকি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনবি?' খোকার বাবা বলেছিলেন, 'জমি যেখানে আমি কিনিনি সেখানে জমি বিক্রি করার অধিকারও নেই আমার। তাই এ ব্যাপারে কিছুই আমার করার নেই।"

আমি বললাম, "তারপরই এই বিপর্যয়?"

"হ্যাঁ। ঠিক তিনদিনের মাথায়।"

ছিপলির সঙ্গে কথা বলে ওর মুখে সব শুনে আমার কপালেও তখন ঘাম দিয়েছে। ওদিকে জয়ন্তর কণ্ঠস্বর, টেলিফোনের হুমকিতেও জয়ন্তর কণ্ঠ, এদিকে গোপীচাঁদ গুপ্তা। সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। এখন মনে হচ্ছে, এই গোপীচাঁদই ডেঞ্জার গ্যাঙ-এর গডফাদার নয়তো? আর জয়ন্ত? ও নিশ্চয়ই ওদেরই দুষ্কৃতী দলের একজন সক্রিয় সদস্য। এখন এই গোপীচাঁদকে কোনওরকমে ফাঁদে ফেলতে পারলেই পুরো গ্যাঙটা এসে যাবে হাতের মুঠোয়।

আমি বললাম, "রতনলাল নিখোঁজ হবার পর গোপীচাঁদের লোকেরা তোমাদের ভয়টয় দেখায়নি?"

"না। তবে বিহারশরীফ-এর এক কুখ্যাত গুণ্ডা কুশাই যাদব একদিন এসে আমার কাছে রাজগীরের জমির দলিলটা চেয়েছিল। কিন্তু আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি, দলিল হয় বাবুর বাড়িতে নয় তো সরকারি সাবরেজিস্টারের অফিসেই পড়ে আছে, আমাদের কাছে নেই।"

আমি বললাম, "তা হলে হয়তো রতনলালের বেঁচে থাকার একটা ক্ষীণ আশা এখনও আছে। ওরা ওকে মারবে। তবে এখনই নয়। ওই দলিল হাতে পাওয়ার পর বিক্রয় কোবালায় ওদের দলিলে সই করিয়ে তবেই ওকে মারবে ওরা। তাই ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যাওয়ার আগেই উদ্ধার করতে হবে ওকে।"

"কিন্তু কীভাবে? ও যে কোথায় আছে তাইতো জানি না। তা ছাড়া গোপীচাঁদের সঙ্গে লড়তে যাওয়া আর বুনোবাঘের সঙ্গে শুধু হাতে লড়তে যাওয়া একই ব্যাপার।"

"কিছুই কঠিন ব্যাপার নয়। এখন বলো তোমার বাপের বাড়ি কোথায়?"

"রাঁচির কাছে রামগড়ে।"

"ছেলেটা স্কুল থেকে এলে আজই তাকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর। যতদিন না এই শয়তানদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া না যায় ততদিন ও ওখানেই থাকবে। তোমার বিশ্বাসী কেউ এখানে আছে যে ওকে নিয়ে যাবে ওখানে?"

"হ্যাঁ আছে। বুধিরাম মাহাতো।"

"বিশ্বাসী?"

"শুধু বিশ্বাসী নয়, ওর সঙ্গে ছেলেকে পাঠালে যমেরও সাধ্য নেই ওর কাছ থেকে ছেলেকে কেড়ে নেয়।"

"খুব ভাল কথা। এই মুহূর্তে এমনই একজন লোকের দরকার আমাদের।"

"খোকার বাবাকে ওরা গুম করার পর বুধিরাম আমাকে বারবার বলেছিল, ছেলেকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু আমিই রাজি হইনি। এখন আপনিও যখন বলছেন...।"

"বলছি এই কারণে যে এখানকার মানুষজন পথঘাট সবই আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এসব চিনিয়ে দেওয়ার জন্য একজনের সাহচর্য একান্ত প্রয়োজন। আর এই কাজের ভারটা তোমাকেই নিতে হবে।"

সাপিনী যেভাবে ফণা তুলে ফোঁসফোঁসিয়ে ওঠে ছিপলিও ঠেক সেইভাবেই ফুঁসে উঠল। বলল, "আপনি আমার পাশে থাকলে এ কাজ আমার দ্বারাই সম্ভব। শুধু একবার যদি জানতে পারি সে কোথায় আছে...।"

"এর জন্যে আমি আছি। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেওয়ার পরই তুমি শুধু আমাকে চিনিয়ে দেবে ওই কুশাই গুণ্ডার ঠেক্‌টাকে। তারপর ওকে মোচড় দিয়েই জেনে নেব ওদের গোপন ঘাঁটিটা কাথায়। গোপীচাঁদ ডেঞ্জার গ্যাঙের গডফাদার হলেও এরাই হচ্ছে কাজের লোক।"

আমরা কথা বলতে বলতেই ছেলেটা এসে গেল স্কুল থেকে। ছিপলি ওকে স্নান করিয়ে খাইয়েদাইয়ে ডাকিয়ে আনল বুধিরামকে।

আমি বুধিরামকে যা করতে হবে তা বললাম।

বুধিরাম বলল, "আমি অনেক আগেই বলেছিলাম ছিপলিকে। কিন্তু ও শুনল না আমার কথা। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবুও আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। একটু গজ তুলো দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধিয়ে ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার অছিলায় নিয়ে যেতে হবে ওকে। কেননা শত্রুরা বোধ হয় আপনার উপস্থিতি টের পেয়েছে। একটু আগেই দেখলাম কুশাইটা ঘোরাফেরা করছে হসুয়ার মোড়ে। আর ধীরা ও বীরা নামের দুটো শয়তান তীক্ষ্ণ নজর রাখছে এদিকে।"

ধীরা আর ভীরা নাম দুটো শুনেই চমকে উঠলাম। এই দুষ্কৃতীরাই তো আমার ওখানে গিয়ে ভয় দেখিয়েছিল রাখহরিকে।

আমি বললাম, "তা যদি হয়, তা হলে একটা কাজ করো। ছেলেটাকে আহত বা রোগী সাজানোর কোনও দরকার নেই। এর পেছনদিক দিয়ে কোনও রাস্তা নেই?"

ছিপলি বলল, "হ্যাঁ আছে। আমি সেদিক দিয়েই পাচার করে দিচ্ছি ওকে।"

বুধিরাম ছেলেটাকে নিয়ে পেছনদিক দিয়েই উধাও হয়ে গেল।

ছিপলি এবার ঘরের ভেতর ঠাকুরের জায়গা থেকে একটা শাঁখ এনে তাতে ফুঁ দিল। পরপর তিনবার। তারপর বলল, "এই শঙ্খধ্বনিতে একদিকে যেমন ছেলের মঙ্গল কামনা করলাম অন্যদিকে তেমনই ওদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণাও করলাম।"

আমি বললাম, "ধীরা আর ভীরাকে আমি দেখিনি। কুশাইকে আমি চিনি না। ওদের কীভাবে চেনা যায়?"

"বুধিরামের মুখে তো শুনলেন ওরা আশপাশেই আছে। কুশাইও নিশ্চয়ই আপনাকে আক্রমণের জন্য তৈরি। তাই বাইরে বেরোলেই চিনে যাবেন ওদের। আর গোপীচাঁদের মহলটা আপনাকে আমি চিনিয়ে দেব সন্ধের পর।"

"এমনও হতে পারে রতনলালকে ওরা ওই মহলেই বন্দি করে রেখেছে।"

"না। ওদের বাড়িতে চুন্নি নামে একজন কাজ করে, তার মুখে শুনেছি ওখানে ও নেই।"

"তা হলে ওদের আর কোনও ঠেক?"

"একটা আছে। সেটা হল কাকোলাতের পেছনে চৌমুখ পাহাড়ে। কিন্তু জায়গাটা আমি ঠিক চিনি না। ওর মুখে শুনেছি, ওই পাহাড়ে জঙ্গলে নাকি গোপীচাঁদের গোপনঘাঁটি।"

"বুঝেছি। ডেঞ্জার গ্যাঙের আসল দপ্তর তাহলে ওখানেই। ঠিক আছে। এখন আমি নওয়াদায় ফিরে যাই। সন্ধের পর আবার আমি আসব। তারপরই শুরু হবে অভিযান ও তদন্তের কাজ।"

"কিন্তু এখন আপনি যাবেন কী করে? যদি ওরা. .।"

"আক্রমণ ওরা করবেই আর সেজন্য আমি তৈরি।"

"আপনি স্কুটার চালাতে পারেন?"

"পারি।"

"আপনি তা হলে একটু বসুন। বুধিরামের ছেলের স্কুটারটাই আপনাকে আমি এনে দিচ্ছি।"

"খুব ভাল হয় তা হলে। তুমি ওকে বোলো, দু'চারদিনের জন্য এটা সবসময় আমার কাছেই থাকবে।"

ছিপলি চলে গেল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেই স্কুটার চালিয়ে এসে বলল, "দেখলেন তো আমিও পারি। যদিও আমার লাইসেন্স নেই, তবুও খোকার বাবার কাছে গাড়ি চালানোও শিখেছি ভালভাবে।"

আমি হেসে বললাম, "তোমাকে দিয়েই কাজ হবে।"

এমন সময় মোটরের হর্ন। চেয়ে দেখি গাড়ি এসে যাওয়ায় অনুরাধা সাহানি নিজেই এসে হাজির।

বললাম, "এ কি? আপনি আবার এলেন কেন?"

উনি মিষ্টি হেসে বললেন, "না এসে কি পারি! তখন আপনি বাসে করে এলেন দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তাই গাড়ি আসতেই ড্রাইভারকে বিশ্রাম করতে বলে নিজেই চালিয়ে এলাম এটাকে। ছিপলির মতো ভাল না হলেও আমিও চালাতে পারি। চলুন, অনেক বেলা হয়ে গেছে। আজ আর বেশি দৌড়ঝাঁপ করবেন না। কাল যা করবার করবেন।"

ছিপলি বলল, "ভালই হয়েছে। আপনারা যান, একটু পরে আমিও যাচ্ছি।"

অনুরাধা আমাকে ওর টাটা সুমোয় হসুয়ার মোড়ে নিয়ে এসে সেই অপহরণের জায়গাটা দেখালেন। বললেন, "এখানেই ছিল আমাদের মারুতিটা।"

"সেটা এখন কোথায়?"

"সারাতে দিয়েছি। গাড়ির অনেক যন্ত্রাংশও চুরি গেছে। এ চুরি অবশ্য ছিঁচকে চোরেদের কাজ। অপহরণকারীদের সঙ্গে এই চুরির কোনও সম্পর্ক নেই।"

আমি যখন গাড়ি থেকে নেমে জায়গাটার অবস্থান দেখছি ঠিক তখনই হিরো হোন্ডায় চেপে এক দুর্ধর্ষ বিহারী আমার চারপাশে এক নাগাড়ে চক্কর দিতে লাগল। তারপর ওই অবস্থাতেই একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার মুখে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "রূপ কি রানি বঙ্গাল কি বাদশা। দেখো ভাইসাব কায়সা তামাশা।" বলে আরও একবার আমার মুখে ধোঁয়া ছাড়তেই আমি সজোরে ওর নাকে একটা ঘুষি মারলাম। হিরোহোন্ডা সমেত বীরপুঙ্গব ছিটকে পড়ল রাস্তার ধারে।

পড়বি তো পড় লাট খেয়ে ঘুরে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। নাকে আঘাত লেগে গলগল করে ঝরে পড়তে লাগল রক্তের ধারা। আশপাশের দোকানপত্তর থেকে যে সব লোকজন ও পথচারিরা মজা দেখছিল এতক্ষণ, তাদের চোখ এবার কপালে উঠে গেছে।

অনুমানে বুঝলাম এই সেই কুখ্যাত কুশাই গুণ্ডা। তাই ওর কাছে গিয়ে জামার কলার ধরে ওকে টেনে তোলার চেষ্টা করে বললাম, "বাবা কুশাই, চিরকাল তুমি অন্যের রক্ত

ঝরিয়ে এসেছ। এখন থেকে মা বসুমতি তোমার রক্তই পান করবেন। আর সেইজন্যই আমার মতো কসাইকে পাঠিয়েছেন এখানে তোমাদের মোকাবিলা করতে। এবার থেকে একটু সাবধানে থেকো বাবা। এই প্রকাশ্য রাজপথে এত লোকের সামনে তোমার প্রেস্টিজ কিন্তু পাংচার।''

ভয়ঙ্কর মূর্তিতে রুদ্ররোষে উঠে দাঁড়াল কুশাই। তারপর আড়চোখে আশপাশের লোকজনের মুখের ভাব লক্ষ করে পকেটে হাত ঢোকাতেই আমার পিস্তল আমার হাতে চলে এল। বললাম, ''কোনও রকম চালাকি নয়। বাড়াবাড়ি করলেই শেষ করে দেবো।''

ক্রুদ্ধ কুশাই আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে পড়ে থাকা হিরো-হোন্ডাটা তুলে উধাও হয়ে গেল নিমেষে। চলে গেল, তবে ওর চোখেব চাহনি বলে গেল অন্য কথা।

তারপরই মূর্তিমান যমের মতো ধেয়ে এল ধীরা এবং ভীরা। কিন্তু এলে কী হবে? আমার হাতে পিস্তল দেখেই থমকে দাঁড়াল ওরা। মনে হয় ওদের হাতে সেরকম মারাত্মক কোনও অস্ত্র ছিল না। তাই রাগে ফুঁসতে লাগল।

অনুবাধা বললেন, ''চলুন, আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সিন ক্রিয়েট করে লাভ নেই।''

''হ্যাঁ, চলুন। মনে হচ্ছে এখন থেকে আমাকে আর ওদের পেছনে ছুটতে হবে না, ওরাই আমার পেছনে ছুটবে।''

রাস্তা খারাপ হলেও অনুরাধার টাটা সুমোয় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম নওয়াদায়। আমরা যাওয়ার পর মুহূর্তে ছিপলিও এসে হাজির হল। ওর চোখে-মুখে দারুণ উত্তেজনা। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, ''সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবুদাদা।''

''কী হয়েছে? তুমি এত হাঁফাচ্ছ কেন?''

''ওই কুশাই গুণ্ডা, আপনার কাছে মার খেয়েই বোধ হয় ভাগছিল। যাবার সময় বলে গেল, আজ রাতের মধ্যেই দড়িবাঁশ খাটিয়ার ব্যবস্থা করে রাখিস। খোকার বাবাকে আজই আমরা ফিরিয়ে দেব। আর তোদের ওই বাঙালিবাবুরও আজই শেষ রাত। তাই বলি, আপনি কিন্তু আর এখানে একদণ্ডও থাকবেন না। আপনি একা। ওরা অনেকজন। আপনি কিছুতেই পেরে উঠবেন না ওদের সঙ্গে।''

অনুরাধা বললেন, ''আমিও তাই বলি। এদের সঙ্গে লেগে সত্যিই পারা যাবে না। থানা-পুলিশ করেও লাভ হবে না কিছু। প্রকাশ্য রাজপথে এরা দাপিয়ে গুণ্ডামি করে বেড়াচ্ছে অথচ পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার। তাই কারও সাহায্য পাবেন না এখানে।''

''সেটা সর্বত্রই। এইসব ক্রিমিনালদের পুলিশও ভয় করে। কেননা এরা এমনই মারাত্মক যে পুলিশকেও খুন করতে এদের বাধে না। অতএব দোষ দেওয়া যায় না কাউকেই।''

''তা হলে বুঝে দেখুন।''

''বোঝাবুঝির কিচ্ছু নেই। এদের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে বলে এরা নিজেরাই নিজেদের চিনিয়ে দিচ্ছে। তাই ভয় করলে চলবে না। আঘাতের পাল্টা আঘাত করলে এরাই বরং ভয় পাবে। তার প্রমাণ তো হাতে নাতে পেলেন। একটা মোক্ষম ঝাড় খাওয়ার পর কুশাইয়ের অবস্থাটা দেখলেন তো।''

"তা তো দেখলাম। কিন্তু যদি ও সত্যসত্যই গুলি করত?"

"করবার সময় পেত না। তার আগেই ওকে আমি জখম করে দিতাম। তবে আজই সন্ধে অথবা রাতের অন্ধকারে ও আসবে। আসবে ওর দলের লোকেরা। আমি এবং এই বাড়িটাই হবে ওদের টার্গেট। এখানে একটা ছোটখাটো যুদ্ধ হবে। তারপরই ঘনিয়ে আসবে ওদের কাল।"

এমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

অনুরাধা ফোন ধরলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললনে, "আপনার ফোন।"

আমি ফোন ধরতেই উত্তর এল, "হ্যালো, এ.সি. আমি জয়ন্ত বলছি। তুই তা হলে এসে গেছিস। মিসেস সাহানি তোকে খুবই যত্ন করছেন নিশ্চয়ই। তবে এখানে এসে পরিস্থিতি যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে তোকে বোধ হয় আর বাঁচানো যাবে না।"

আমি কঠিন গলায় বললাম, "আমি বাঁচবার জন্য জন্মাইনি। মরবার জন্যই জন্মেছি। আমার কাজও অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। তাই আমাকে আর ফোনে বিরক্ত না করলেই বাধিত হব।" বলে ফোনটা নামিয়ে রেখে নিজের মনেই বললাম, 'তোমার মুখোশ আমি খুলছি শয়তান।'

অনুরাধা বললেন, "জয়ন্তবাবুর ফোন। আপনি এত রেগে গেলেন কেন মিঃ চ্যাটার্জি?"

আমি একটু হেসে ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্য বললাম, "ও কিছু নয়। আসলে আমি একটা অন্য মুডে ছিলাম।" তারপর ছিপলির দিকে তাকিয়ে বললাম, "বিপদে কোনও ভয় নয়। বুকের পাটা ফুলিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। তবে রতনলালের ব্যাপারে কুশাই যা বলে গেছে তা যদি সত্য হয় সেটা হবে নেহাতই দুর্ভাগ্যজনক। তবে এটা তো ঠিক, সে এখনও বেঁচে আছে। সময়মতো গিয়ে পড়লে এখনও হয়তো উপায় আছে তাকে উদ্ধার করবার। তাই ওর খোঁজে যাওয়ার জন্য আরও একটা স্কুটারের প্রয়োজন।"

অনুরাধা এবার ছিপলির মুখ থেকে আমাদের পরিকল্পনার কথা সব শুনে বললেন, "আপনি কি তাহলে সত্যসত্যই ওদের সঙ্গে সংঘর্ষে যাবেন?"

"এতদূর এগিয়ে এসে এখন আর পিছিয়ে পড়ার কোনও পথই খোলা নেই। তাছাড়া রণে ভঙ্গ দেওয়ার চেয়ে আসন্ন মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়াই অম্বর চ্যাটার্জির পক্ষে অনেক বেশি গৌরবের।"

"তা হলে আর একটুও দেরি না করে স্নান-খাওয়ার পাটটা এখনই চুকিয়ে নিন।"

আমি স্নানের জন্য তৈরি হবার আগে বাড়ির লোকেদের প্রত্যেককে বললাম, "এই বাড়ি আজ যে কোনও সময় যে কোনও মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে। অতএব তোমরা সবাই কিন্তু খুব সতর্ক থাকবে। একটু কিছু বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই জানাবে আমাকে।"

ভীত-সন্ত্রস্ত সকলে ঘাড় নেড়ে যে যার কাজে গেল।

স্নানান্তে খেতে বসতেই তেমন সময় আবার টেলিফোন। এবারের ফোনটা এল পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে। ফোন ধরেই শিউরে উঠলেন অনুরাধা, "সে কী! কখন?"

"এই একটু আগে।'

ছিপলি আমার জন্য কী একটা তরকারি আনছিল, হাত থেকে খসে পড়ল সেটা। বলল, "খোকার বাবার কিছু...?"

অনুরাধা বললেন "না।"

আমি বললাম, "তা হলে?"

"জয়ন্তবাবু।"

"কী হয়েছে জয়ন্তর?"

"লেভেলক্রশিং।"

"অসম্ভব। এই একটু আগেই তো সে আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলল। এরই মধ্যে সে লেভেলক্রশিং-এ বলি হল! এরই মধ্যে পুলিশে খবর গেল! ব্যাপারটা কিন্তু খুবই রহস্যময়। পুলিশের এখন বক্তব্য কী?"

"আমাকে একবার স্পটে যেতে হবে। গিয়ে শনাক্ত করতে হবে জয়ন্তবাবুকে।"

"কেন, ওঁর বাড়ির কেউ নেই?"

"উনি তো বিয়েই করেননি। আছে এক অপদার্থ ভাগ্না। নাম কুণাল চৌধুরী। সে যে কখন কোথায় থাকে কেউ জানে না।"

আমি বললাম, "একেই বলে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। ঘর নেই, সংসার নেই অথচ ব্যবসাবাণিজ্য করে কোটি কোটি টাকার মালিক হতে চান। এখন পরিণামে কী হল?"

অনুরাধা বললেন, "উনি ঘর-সংসার করেননি ঠিক কথা। কিন্তু জীবনটা ছিল ব্যাভিচারের। কাজেই টাকার প্রয়োজন ছিল। যাক, আপনি খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করুন। আমি একবার থানা থেকে ঘুরে আসছি।"

আমি বললাম, "আপনি একা নন, আমিও যাব আপনার সঙ্গে। ফোনটা আদৌ পুলিশের নাও হতে পারে।"

অনুরাধার মুখ ঘেমে উঠল।

একটু পরেই এসে হাজির হল পুলিশের গাড়ি। পরিচিত একজন ইনসপেক্টর এসে বললেন, "আপনি রেডি আছেন ম্যাডাম?"

আমিও তখন যাবার জন্য তৈরি।

ইনসপেক্টর বললেন, "আপনি?"

আমি আমার পরিচয়পত্রটা দেখিয়ে দিলাম।

ইনসপেক্টরের নাম এ.পি. শর্মা। একটু ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। বললেন, "তা আপনি এখানে কী ব্যাপারে এসেছেন।"

আমি বললাম, "আমি ওদের এই পরিবারের একজন বন্ধু লোক। মিসেস সাহানি এবং জয়ন্ত বিশ্বাস দুজনের আমন্ত্রণেই আমি এখানে এসেছি। একটু চেষ্টা করে দেখি না যদি এদের কারও কোনও হদিশ পাই। এ ব্যাপারে আমি আপনাদের কাছ থেকে কী কোনও সাহায্য পেতে পারি।?"

"পুলিশের সাহায্যের কোনও প্রয়োজনই আপনার হবে না মিঃ চ্যাটার্জি। হলে আপনি আসামাত্রই রিপোর্ট করতেন। আপনি এসেছেন সেই কোন ভোরে। হসুয়ার মোড়ে একটা প্যানিকও সৃষ্টি করে এসেছেন। এখন আর আপনার পুলিশের প্রয়োজন কী? তাছাড়া আপনার ডেথ ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়ে গেছে। এইমাত্র ডেঞ্জার গ্যাঙের লোকেরা ফোনে সে কথা আমাদের জানিয়ে দিল।"

"বাঃ! আমার ব্যাপারে এত নাড়িনক্ষত্র আপনারা জেনে ফেললেন অথচ একটি

কুখ্যাত দল দিনের পর দিন এমন সব কাণ্ড করে যাচ্ছে, তাদের চাঁইগুলোকে আপনারা আজও ধরতে পারলেন না?"

"ধরতে পারলে তো ল্যাঠা চুকেই যেত। আমাদের আর চাকরি করার প্রয়োজন হত না।"

যাই হোক, পুলিশের সঙ্গে স্পটে গিয়ে দেখে এলাম জয়ন্তকে। আমি তো চিনতেই পারলাম না। না পারার কারণ আছে। এতদিনে ওর চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবে অনুরাধা চিনতে পারল। লাশ শনাক্ত করার পর ফিরে এলাম দুজনে। গিয়েছিলাম পুলিশের গাড়িতে, আসতে হল রিকশায়।

দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন। বাড়ির কাছাকাছি এসেছি হঠাৎই এক বিপর্যয়। পেছন থেকে কে যেন একটা মোটরবাইক নিয়ে সজোরে ধাক্কা দিতেই রিকশা থেকে ছিটকে পড়লাম আমি। সামনের একটি লাইটপোস্টে মাথাটা এমনভাবে ঠুকে গেল যে মুহূর্তের মধ্যে চোখে অন্ধকার দেখলাম। চারদিক থেকে অনেক লোকজন ছুটে এল বুঝতে পারলাম। কিন্তু...। কিছুক্ষণ বাদে আবার যখন ধাতস্থ হলাম তখন বুঝলাম আমার চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে ছিপলি।

আমি আস্তে করে বললাম, "মিসেস সাহানি...?"

"ওঁর কথা বলতে পারব না। বাড়ির সামনে আপনাকেই পেয়েছি আমরা।"

আমি একটু উঠে বসার চেষ্টা করতেই ছিপলি বলল, "এখনই নয়। ডাক্তার তেওয়ারি এসে আপনাকে দেখে গেলে তারপর।"

আমি উঠতে গেলাম বটে তবে মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। একটু পরেই ডাঃ তেওয়ারি এলেন। এসে ভালভাবে পরীক্ষা করে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই। মাথাটা যে ফেটে যায়নি এই যথেষ্ট। কপালেব কালসিটে পড়া ফোলা জায়গাটায় একটু বরফ ঘষে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। ব্যথা মরার ওষুধও লিখে দিচ্ছি কয়েকটা।"

ডাক্তারবাবু বিদায় নিলে উঠে বসলাম আমি। বললাম, 'আঘাতের আকস্মিক ঘোরটা এখন কাটিয়ে উঠছি। একবার বলো, মিসেস সাহানি কোথায়?"

ড্রাইভার জগদীশদা বললেন, "মনে হয় ওঁকে ওরা অপহরণ করেছে।"

আমি উঠে বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে বললাম, "মিসেস সাহানির মুখে শুনেছিলাম ওরা মেয়েদের গায়ে হাত দেয় না। তাদের বিরক্ত করা পছন্দ করে না। এ তো দেখছি উল্টো ব্যাপার।"

ছিপলি বলল, "ওসব বাজে কথা। শয়তানের বাছবিচার আছে নাকি? তা ছাড়া এই প্রথম ওরা ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেয়েছে। তাই এখন ওদের হিতাহিত জ্ঞান নেই।"

আমি জগদীশদাকে বললাম, "আমাকে দু'একদিনের জন্য একটা মোটরবাইকের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?"

ছিপলি বলল, "কোনও দরকার নেই। আমার কাছে যেটা আছে এতেই কাজ হয়ে যাবে। আপনি একটু সুস্থ হোন।"

"আমি ঠিক আছি। আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না। ব্যথা মরার ওষুধ একটু

আনিয়ে দাও দোকান থেকে। তারপর দেখছি।"

ততক্ষণে কে একজন ছিপলির নির্দেশে এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে এল।

দুধ আমি খাই না। কিন্তু আজ যেন মনে হল খাওয়ার একটু প্রয়োজন আছে। তাই এক নিঃশ্বাসে শেষ করে দিলাম দুধটুকু। তারপর বললাম, "এবার তা হলে যাওয়ার জন্য তৈরি হও।"

ছিপলি বলল, "আমি তৈরিই আছি।"

ব্যথা মরার ওষুধ এলে আমি সেই ওষুধ খেয়ে যেখানে রিকশা থেকে পড়ে গিয়েছিলাম সর্বাগ্রে সেখানে এসে দাঁড়ালাম। জগদীশদাও এলেন আমার পিছু পিছু। আমি স্থানীয় দোকানদারদের জিজ্ঞেস করলাম অনুরাধা সাহানির ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে পারে কিনা। আশ্চর্যের ব্যাপার। ওরা সবাই একজোটে বলল, কেউ নাকি কিছুই দেখেনি।

বাধ্য হয়েই এবার থানায় গেলাম। জগদীশদাই আমাকে গাড়ি করে থানায় নিয়ে গেল।

ইনসপেক্টর শর্মা আমাকে দেখেই বললেন, "এই খবরও পেয়েছি। আপনার রিকশায় মোটরবাইক নিয়ে ধাক্কা দিয়েছিল মহম্মদ নাসিম নামের দুষ্কৃতী। একটু আগে লোকটাকে দেখা গেছে বিহারশরীফের দিকে যেতে। তবে কোনওভাবেই পালাতে পারবে না ও। ধরা পড়বেই। এখন সমস্যা হচ্ছে অনুরাধা সাহানিকে নিয়ে। ওঁকে কিডন্যাপ করেছে কুণাল চৌধুরী। জয়ন্ত বিশ্বাসের ভাগনে।"

শুনেই উত্তেজিত হলাম। বললাম, "মাই গড। সর্বনাশ হয়ে যাবে তা হলে।" তারপর বললাম, "দেখুন, সাধারণ পুলিশ ইনসপেক্টর বলতে সকলের যা ধারণা আপনি কিন্তু তার ব্যতিক্রম। আপনার কাজের যা নমুনা তাতে মনে হচ্ছে আপনি এখানকার সফল অফিসার। আপনি একটু চেষ্টা করলে কিন্তু এদের চক্রকে ভেঙে দিতে পারেন।"

"সেজন্যই তো পটনার আই.জি. আমাকে পাঠিয়েছেন এখানে। বুড়ো ঘুঘুদেব দিয়ে কাজ হবে না। এখানে দরকার ইয়ং জেনারেশনের লোক। আমি নিজের জীবন বাঁচিয়ে একটু একটু করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে কিনা এই এলাকায় গুণ্ডাবাজিটা বেশি হলেও খুনখারাপি খুব কম। শুধু কয়েকটি পাকা মাথার চালে বড় বড় ব্যবসায়ীগুলো মরছে এক এক করে।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে। আপনি সচেষ্ট হন। আমিও চেষ্টা করে দেখি কতদূর কী করতে পারি। এখন যেভাবেই হোক, মিসেস সাহানি এবং রতনলালকে উদ্ধার করতেই হবে।"

আমি উঠে দাঁড়াতেই মিঃ শর্মা বললেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। জেনে রাখুন, এ ব্যাপারে পুলিশ কিন্তু নিষ্ক্রিয় নেই। যার জন্য হাই কমান্ডের নির্দেশে আমার এখানে আসা। তাছাড়া সত্যি বলতে কি, মিসেস সাহানিকে দেখার পর থেকে ওঁর প্রতি আমার এমন একটা সফ্‌ট কর্নার এসে গেছে যে তা কি বলব। ওরকম সুন্দরী মহিলা আমি দেখিনিই বলতে পারেন। তাই ওঁকে কেউ নির্যাতন করবে এ আমি সহ্য করব না। তবু কী জানেন, কতকগুলো ক্ষেত্রে পুলিশের এমন একটা সীমাবদ্ধতা থাকে যাকে লঙ্ঘন করা যায় না। তাই আপনি আপনার কাজ করুন। আমি আমার কাজ করি। আর হ্যাঁ, আপনাকে একটা মোবাইল ফোন দিয়ে রাখছি। প্রয়োজনে এর মাধ্যমে আপনি আমার সঙ্গে

যোগাযোগ করবেন। থানার এবং আমার কোয়ার্টারের দুটো ফোন নম্বরই আপনার কাছে থাক।"

পুলিশের এই সহযোগিতায় আমার মনোবল দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমি ইনসপেক্টরের সঙ্গে করমর্দন করে জগদীশদার সঙ্গে ফিরে এলাম।

আমাদের আসার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ছিল ছিপলি। বলল, "থানায় গিয়ে কোনও কাজ হল বাবুদাদা?"

বললাম, "একটা কাজ হয়েছে। মিসেস সাহানির অপহরণকারীর নামটা জানতে পেরেছি।"

আবার ফণা তুলল ছিপলি, "কে সে?"

"কুণাল চৌধুরী।"

ছিপলির দু'চোখেই এবার আগুন। বলল, "এই শয়তানই তা হলে খুন করেছে জয়ন্তবাবুকে।"

"আর আমার রিকশায় মোটরবাইকে করে যে ধাক্কা মেরেছিল তার নাম মহম্মদ নাসিম।"

"নাসিম! ওটা মানুষ নয়, একটা পিশাচ। ওই কুণালবাবু শয়তানের সঙ্গে ওর এখন দোস্তি খুব। খোকার বাবার মুখে শুনেছি আকবরপুরে পাহাড়ের কোলে একটা পুরনো বাড়িতে এখন ওরা থাকে। এবার বুঝেছি এই চক্রটাই তা হলে করে বেড়াচ্ছে এইসব কাজ। এখন থেকে ওদের মরণ ঘণ্টা আমিই বাজাব।"

"তুমি চেনো আকবরপুরের ঠিকানাটা?"

"ওখানে গিয়ে পৌঁছলেই আমি সব চিনে নেব। আপনি শুধু আমাকে ঘণ্টাখানেক সময় দিন। একবার আমি বাড়ি থেকে তৈরি হয়ে আসি। আমার কালুয়াই ওদের সবাইকে খুঁজে বের করবে।"

ছিপলি আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে ও যে স্কুটারে চেপে এসেছিল সেই স্কুটারেই দ্রুত চলে গেল হসুয়ার দিকে।

আমি জগদীশদাকে বললাম, "ছিপলিকে বোধ হয় একা যেতে দেওয়া ঠিক হল না। আপনি যেভাবেই হোক আমাকে একটা স্কুটার অথবা মোটরবাইকের ব্যবস্থা করে দিন।"

"আমার আছে। আমারটাই নিয়ে যান আপনি। তা আমি বলছিলাম কি গাড়ি যখন আছে তখন...।"

"গাড়িটা রিজার্ভে থাক। এখানকার ফোন নম্বর আমি টুকে নিয়েছি। প্রয়োজনে জানাব। মিসেস সাহানিকে উদ্ধারের জন্য হয়তো এমন সব জায়গায় আমাদের যেতে হবে যেখানে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা।"

জগদীশদা একটা হিরোহোন্ডাই নিয়ে এলেন। আমি তাতে চেপে ভয়ঙ্কর কুৎসিত রাজপথ ধরে এগিয়ে চললাম হসুয়ার দিকে। একসময় পৌঁছেও গেলাম। কিন্তু কোথায় ছিপলি? ছিপলি তো নেই।

ছিপলির বদলে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কুশাই শয়তানটা। বলল, "কী বাবুজি! এ বাড়ির মায়া যে ছাড়তে পারছেন না দেখছি।"

আমি কঠিন বলায় বললাম, "ছিপলি কোথায়?"

"আরে বাবু! ছয়লা বাবু। ছিপলি কি আমার কেউ যে বলে দেব সে কোথায়?"

"এই রাতদুপুরে তুমি এখানে কী করতে এসেছিলে?"

"আমি তো আপনারই মতো ছিপলির খোঁজে এসেছিলাম। রতনলাল ওকে একবার শেষবারের মতো দেখতে চাইছে। তা এসে দেখছি ঘরে তালা। ভেবেছিলাম ওর বাচ্চাটাকেও নিয়ে যাব। বাচ্চাটাকে কোথায় সরালেন চালাকি করে?"

"ওসব বাজে কথা রেখে বলো ছিপলি কোথায়?"

"ধীরা আর ভীরা হয়তো ওকে নিয়ে গেছে রতনলালের কাছে। না হলে আর কেউ নিয়ে গেছে।"

এমন সময় হঠাৎই কুকুরের ডাক চরমে উঠল। সেই কালো দেশি কুকুরটা। সকালে যেটা উঠোনে শুয়েছিল। এই তা হলে ছিপলির কালুয়া।

কুকুরটা এসে আগে আমার গা-পা শুঁকতে লাগল। তারপর কুশাই-এর দিকে তাকিয়ে শুরু করল ভীষণ চেঁচামেচি।

কুশাই-এর হাতে দেশি রিভলবার। ও সেটা আমার দিকে তাগ করে বলল, "বাঙালিবাবু, আজ আর আপনার নিস্তার নেই। আগে এই কুকুরটাকে মারব। তারপর আপনাকে।"

ওর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী যন্ত্র আমার কাছে আছে। আমি সেটা বের করার মুহূর্তেই ও বলল, "না না। একদম নয়। দিন আর রাত্রি কখনও এক হয় না বাবুজি। আজ সকালের কথাটা চিন্তা করুন। আপনি কি আমাকে পকেটে হাত ঢোকাতে দিয়েছিলেন?" বলেই রিভলভারটা তাগ করল আমার দিকে। বলল, "না। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। শুরুটা আপনাকে দিয়েই করা যাক।"

আমি হেসে বললাম, "তবে তাই হোক বিহারীদাদা।" বলে এমন একটা লাথি ঝাড়লাম অতর্কিতে যে ট্রিগারে চাপ দেওয়ার আগেই পা মচকে পড়ে গেল সে। আর সেই সুযোগে ওর রিভলভার ধরা হাতটিকে পা দিয়ে চেপে ধরলাম আমি।

খসে পড়ল রিভলভার।

এবার ও-ও প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে নিজেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়াতেই ওরই রিভলবারের নল দিয়ে আঘাত করলাম ওর মাথায়। চাপ পেয়ে গুলিটা ছিটকে দেওয়ালের গায়ে গিয়ে লাগল।

রক্তাক্ত কুশাই ছটফট করতে লাগল মাটিতে পড়ে।

আর এমনই এক নাটকীয় মুহূর্তে ঝড়ের বেগে যে এসে হাজির হল তাকে দেখেই কালুয়া ছুটে এসে তার পায়ে লুটোপুটি খেতে লাগল।

কুশাইও আঁতকে উঠল তাকে দেখে। চোখ দুটো কপালে উঠিয়ে বলল, "রতনলাল! তু আভিতক জিন্দা হ্যায়?"

রতনলাল সজোরে ওর মুখে একটা পদাঘাত করে বলল, "হ্যায়।"

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবুজি, আপনি কে আছেন?"

আমি ওকে সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, "আমি তোমারই সন্ধানে এসেছিলাম। এখন তুমি ফিরে আসায় আমার দুশ্চিন্তা দূর হল। তবে এইমুহূর্তে ছিপলির খুব

বিপদ। ধীরা আর ভীরা ওকে কিডন্যাপ করেছে। তাছাড়া কুণাল চৌধুরী নামে এক শয়তান কিডন্যাপ করেছে মিসেস সান্যালকে।"

উত্তেজিত রতনলাল বলল, "আমার বাবুয়া। বাবুয়া কোথায়?"

"বাবুয়ার জন্য চিন্তা কোরো না। ও নিরাপদ জায়গাতেই আছে।"

"কিন্তু বাবুজি, ধীরা আর ভীরা ছিপলিকে কিডন্যাপ করবে কী করে? আমি যে নিজে হাতে ওদের দুজনকে রেল লাইনে শুইয়ে দিয়ে এসেছি। ওরা জোর করে আমাকে দিয়ে কোর্টের কাগজে সই করিয়ে নিয়েছে। তারপর যখন নওয়াদা আর তিলাইয়ার মাঝের স্টেশন ছাতারে আমাকে লেভেলক্রসিং-এ বাঁধতে এসেছিল আমি তখন ওদের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম একবাব আমার বউ বাচ্চাকে দ্যাখবার জন্য। তা ওরা ছিপলিকে আনবার জন্য কাকে যেন পাঠায়। আর সেই সুযোগে আমি ওদের দুজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার দুটো হাতই দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। তবুও ওদের অন্যমনস্ককতায় আমি এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ি ওদের ওপর যে দুজনেই মুখ থুবড়ে পড়ে যায় লাইনের ওপর। সেই সুযোগে আমি লাইনে ঘষে আমার দড়ি আলগা কবে দুদিকের লাইনে ওদের দুজনকে গলার সঙ্গে ফাঁস লাগিয়ে বেঁধে দিই। তারপর হাত দুটোকে এমনভাবে জখম করে দিই যাতে ওই দড়ি খুলে ওরা পালাতে না পারে। এমন সময় একটা মালগাড়ি এসে...। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের মৃত্যু দেখে এসেছি বাবু। এই কদিনে চিনে নিয়েছি এদের সবাইকে। মাত্র জনা কয়েক লোকে এতদিন ধরে এই সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। আর এদের হয়ে কাজ করছে এই কুশাই শয়তান, মহম্মদ নাসিম, ধীরা আর ভীরা। এদের চালনা করে গোপীচাঁদ গুপ্তা, জয়ন্ত বিশ্বাসের মতো লোকেরা। আরও যে দু'একজন নেই তা নয়। হাজিপুরের ওঙ্কারমল জেঠিয়ার নামও শোনা গেছে। সেদিন বিহারশরীফে আমার বাবুকে ওরা যখন মুখে কাপড় বাঁধা অবস্থায় আক্রমণ করল আমি তখনই কয়েকজনকে চিনে ফেলেছি। তাই থানায় খবর দেব বলে গাড়ি নিয়ে যখন পালিয়ে আসছি তখনই ধীরা ভীরা আর এই কুশাই শয়তানটা আমার পিছু নেয়। ধীরা আর ভীরাকে আমি মেরেছি। এখন এই কুশাই শয়তানটাকেও শেষ করব। বলেই ওর বজ্রবাহু দিয়ে কুশাই-এর গলাটাকে এমনভাবে চেপে ধরল যে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এল ওর। কুশাই-এর আর্তনাদ করারও আর শক্তি রইল না।

এরই মধ্যে রতনলাল কয়েকগাছা মোটা দড়ি এনে বাড়ির উঠোনে একটি গাছের সঙ্গে ওকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ওর দুটো পায়ের হাড়ে মোটা একটা কাঠ দিয়ে এমনভাবে জখম করল যে ওই অবস্থায় কারও সাহায্য ছাড়া কোনওমতেই সে পালাতে পারবে না।

কাজ শেষ হলে রতনলাল বলল, "আমি ছিপলির খোঁজে যাই। ওরা নিশ্চয়ই ওকে গোপীচাঁদের মহলে নিয়ে যাবে।"

"কারা নিয়ে যাবে? ধীরা আর ভীরাকে তো তুমি নিজে হাতে শেষ করে দিয়েছ।"

"জানি না। আর কাউকে তো চিনি না আমি।"

"এই কদিন তুমি কোথায় ছিলে?"

"গোপীচাঁদের গুদাম ঘরে। আমি আবার ওখানেই ফিরে যাচ্ছি বাবু। আপনি একটু এদিকে নজর রাখুন।" বলেই কুশাই-এর সেই দেশি রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে ওর পকেট হাতড়ে কতকগুলো গুলি বের করে ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল রতনলাল।

এই মুহূর্তে আমি যে কী করব কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না। মোবাইল ফোনে থানার

সঙ্গে একবার যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলাম কিন্তু লাইন পেলাম না। অথচ মন পড়ে আছে আমার কুণাল চৌধুরীর দিকে। শয়তানটা মিসেস সাহানিকে যে কোথায় নিয়ে গেল তা কে জানে? আকবরপুরই বা এখান থেকে কতদূর? রাত বেশি নয়। তবু পাহাড় জঙ্গলের দেশ বলে চারদিক নিঝুম হয়ে আসছে। এমন সময় বাড়ির সামনে স্কুটারেব শব্দ শুনে উঠোন পেরিয়ে বাইরের দরজার কাছে এলাম।

কালুয়াটাও ঘৌ ঘৌ করে ছুটে গেল।

একেবারে সম্পূর্ণ আদিবাসী সাজে সজ্জিতা হয়ে তীর কাঁড় নিয়ে রণং দেহি মূর্তিতে স্কুটার থেকে নামল ছিপলি। তারপর দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, "একি! আপনি এখানে এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"

"আমি যে তোমারই প্রতীক্ষা করছি। কিন্তু তোমার এত দেরি কেন?"

"দেরি হল আপনারই জন্য। আমিও নওয়াদা থেকে রওনা হয়েই নিমপুরায় এক আদিবাসী পল্লীতে গিয়ে ওদের সাহায্য চাই। ওরা এতক্ষণে দলবল নিয়ে আকবরপুর ঘিরে ফেলেছে। ওদেরই কাছ থেকে তীর কাঁড় জোগাড় করে নওয়াদায় ফিরে গিয়ে শুনি আপনি আমার নিরাপত্তার কারণে এখানে এসেছেন।"

"ভাগ্যে এসেছিলাম। না এলে যে কী হত তা কে জানে? তুমিও যদি পথে দেরি না করতে তা হলে তোমারও বিপদ হত। ওইরকম একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই তোমাকে অনুসরণ করেছিলাম আমি। দেখবে তার নমুনা? ভেতরে এসো।"

ছিপলি আমার সঙ্গে উঠোনে পা দিয়েই আধো অন্ধকারে গাছে বাঁধা কুশাইকে দেখে চমকে উঠল। বলল, "এ কী কাণ্ড!"

"তোমার জন্যে আরও ভাল খবর আছে।"

ছিপলি উল্লসিত হয়ে বলল, "কীরকম!"

"রতনলাল ফিরে এসেছে।"

"সত্যি বলছেন বাবুদাদা! কই! কোথায় সে?"

'ধীরা আর ভীরাকে বধ করে সে গেছে গোপীচাঁদের বদলা নিতে। এই কদিন গোপীচাঁদের গুদামঘরেই সে ছিল। তুমি না আসায় এই কুশাই শয়তানটার মুখে তোমার ব্যাপারে শুনে ও তার মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি।"

"কেন ওকে যেতে দিলেন বাবুদাদা। ও একা। ওরা অনেকজন।"

"ওকে ধরে রাখার সাধ্য আমার ছিল না। তবে জেনে রেখো ও কিন্তু তৈরি হয়েই গেছে। ওদেরই অস্ত্রে ওদের সবাইকে বধ করবে ও।"

শুধু তীর কাঁড় নয়, ধারালো একটা ছোরাও ছিল ছিপলির কাছে। ও সেটা কুশাই-এর পেটে ঠেকিয়ে বলল, "তোদের খেলা তো এবার শেষ। এখন বল আমার রাধা দিদিমণিকে নাসিম কোথায় নিয়ে গেছে?"

কুশাই-এর এখন কথা বলারও শক্তি নেই। তবু বলল, "ওই ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনা।"

"আকবরপুরের বাড়িতে এখন কারা থাকে?"

"ওখানে ওঁকে নিয়ে যাবে না।"

"তাহলে কোথায় নিয়ে যেতে পারে?"

"কাকোলাতের জঙ্গলে চৌমুখ পাহাড়ের গুহায় খোঁজ নিয়ে দেখতে পারিস। ওখানে না পেলে ওর আশা ছেড়ে দে।"

ছিপলি এবার খুবই ব্যস্ততার সঙ্গে আমাকে বলল, "আর তা হলে দেরি নয়। চলুন যাওয়া যাক।"

ছিপলি ওর কালুয়াকে স্কুটারে বসিয়ে নিল।

আমি চেপে বসলাম হিরোহোন্ডায়।

হসুয়া থেকে রাজপথ বিভক্ত হয়ে নানাদিকে চলে গেছে। তবুও পাহাড়ি এলাকা বলে জনবসতি কম। একটি পথ চলে গেছে রাজগীর হয়ে বিহারশরীফ। একটি গয়া এবং আর একটি পথ হাজারিবাগ ও রাঁচির দিকে। আমরা যাচ্ছি আকবরপুর হয়ে কাকোলাতের জঙ্গলে। নওয়াদার আগেই আমরা ডানদিকে বাঁক নেব। ভয়াবহ জঙ্গল ও জলপ্রপাতের জন্য বিখ্যাত কাকোলাত। আর চৌমুখ পর্বত হল জঙ্গীদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আকবরপুরে পৌঁছ গেলাম। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদিবাসী এবং পুলিশে গোটা জায়গাটা ঘিরে ফেলেছে। পুলিশ বাড়ি বাড়ি ঢুকে তল্লাসী করছে। কিন্তু কুণাল চৌধুরী বা নাসিমের কোনও পাত্তা নেই। তবে যে গাড়িতে করে মিসেস সাহানিকে অপহরণ করা হয়েছিল সেই গাড়িটির সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। শীর্ণ একটি নদীর ধারে পড়ে আছে গাড়িটা। সেখান থেকে মিসেস সাহানির একটি ব্যাগ ও একপাটি জুতোও পাওয়া গেছে।

ছিপলি ওর দলের কয়েকজনকে ডেকে চৌমুখ পাহাড়ের ব্যাপারটা জানিয়ে বলল, "তোমরা এদিক দ্যাখো। আমরা জঙ্গলে যাচ্ছি। কাল সকালের মধ্যে আমরা ফিরে না এলে দিনের আলোয় তোমরা ঘিরে ফেলবে কাকোলাতের জঙ্গল।"

ওরা ওকে এগিয়ে যেতে বলে তোলপাড় করতে লাগল এখানকার পরিত্যক্ত জায়গাগুলো।

আমরা কাকোলাতের কাছাকাছি এসে এক জায়গায় একটি ঝোপের মধ্যে স্কুটার ও হিরোহোন্ডাকে লুকিয়ে রেখে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। উঃ কী ভীষণ জঙ্গল। এই জঙ্গলে মোটর কেন, স্কুটার নিয়েও ঢোকা যেত না।

ছিপলি বলল, "আপনি কিন্তু খুব সাবধানে আসবেন বাবুদাদা। এই জঙ্গল হিংস্র জঙ্গি ও জানোয়ারে ভর্তি। কাঠুরিয়ারাও দিনমানে এখানে আসতে ভয় পায়।"

আমি বললাম, "আমরা সতর্ক। তার ওপর তোমার হাতে আছে তীর কাঁড়, আমার হাতে পিস্তল। অতএব—"

হঠাৎই এক হাতে আমার মুখ চেপে ধরল ছিপলি।

দেখলাম বিপদের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই কিছু আছে এখানে। কালুয়াটাও আগে আগে চলছিল। দারুণ ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াল সেও।

ছিপলি আমাকে ইঙ্গিতে দূরের দিকে তাকাতে বলল। দেখলাম দুতিনটি বড় ভালুক কতকগুলো ছোট ছোট বাচ্চাকে নিয়ে কোথায় যেন চলেছে। ঠিক মনে হল যেন কালো কম্বলে মোড়া কতকগুলো বল গড়িয়ে চলেছে চোখের সামনে দিয়ে।

সেগুলো বিদায় নেওয়ারও অনেক পরে আবার রওনা হলাম আমরা। খানিক যাওয়ার পরই ভীষণদর্শন এক পর্বতের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম।

ছিপলি বলল, "এই চৌমুখ পর্বত। এর চারটি মাথা। কাকোলাতের ঝরনা পাহাড়টা আমরা বাঁদিকে ফেলে এসেছি। এখন আমরা লক্ষ্যস্থলে। সমতলের মানুষদের পক্ষ এই পাহাড়ে ওঠা খুব কষ্টকর। কেননা অসম্ভব খাড়াই।"

ছিপলির কথাই ঠিক। খানিক ওঠার পরই দম বন্ধ হয়ে এল।

হঠাৎই কী দেখে যেন প্রাণান্ত একটা চিৎকার করে উঠল কালুয়া। আমরা দেখলাম ছোট সাইজের একটা চিতাবাঘ পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে। কথায় বলে সাপের লেখা আর বাঘের দ্যাখা। বাঘটা কালুয়াকে লক্ষ্য করে একটা ঝাঁপ দিতেই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করল ছিপলি। বাঘের চোয়াল ভেদ করে মাথা ফুঁড়ে বিদ্ধ হল ওর নিক্ষিপ্ত তীরটা।

এই বিপর্যয়ে পাহাড়ও জেগে উঠেছে। আমরা দূর থেকেই দেখলাম অন্ধকার একটা গুহার মুখে জ্বলে উঠল চারপাঁচটা মশালের আলো।

ছিপলি আমাকে হাতের ইশারায় এগোতে বলে কালুয়াকে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল গুহার দিকে।

হঠাৎই পর পর কয়েকটি গুলির শব্দে চমকে উঠল জায়গাটা।

ছিপলি আমাকে ভয় পেতে বারণ করল। বলল, "একদম ভয় পাবেন না। ওরা ফাঁকা আওয়াজ করে ভয় দ্যাখাচ্ছে আমাদের।" তারপর বলল, "আমাদের উপস্থিতি ওরা টের পেয়েছে, তাই এ পথে নয়। যেদিকে পথ নেই সেদিক দিয়েই যেতে হবে এবার।" বলে পায়ে চলা পথ ছেড়ে শাখামৃগর মতো জঙ্গলের গাছপালা ধরে যেতে লাগল।

প্রচণ্ড অসুবিধা সত্ত্বেও আমিও ওই পথই অবলম্বন করলাম।

হঠাৎই কী যে হল! একটি গাছের ডাল ভেঙে হড় হড় করে ক্রমশ খাদের দিকে গড়িয়ে চলল ছিপলি। ওর কণ্ঠস্বর থেকে একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল, "বা-বু-দা-দা-আ।"

সেই মহান্ধকারে কোথায় খুঁজে পাব ওকে? কীভাবে উদ্ধার করব? তবে কালুয়া ঘৌ ঘৌ ডাক ছেড়ে ওর খোঁজে নেমে চলল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।

আমার গোয়েন্দাগিরির জীবনে এমন বিপজ্জনক অভিজ্ঞতা এই প্রথম। এখান আমার কোনও বুদ্ধিই কাজ করছে না। ঘটনার গতিই হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে।

শত্রুপক্ষের ওরা এবার আর্তনাদ শুনে এদিকে নজর দিল। দেখলাম প্রায় চার পাঁচজন বন্দুকধারী নিমেষে এগিয়ে এল এদিকে। টর্চের আলো ফেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল আমাদের। আমি কোনওরকমে বড়সড় একটি পাথরের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বাঁচলাম।

একসময় ওরা নেমে এল। তারপর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামার চেষ্টা করতেই পড়ে গেল কালুয়ার পাল্লায়। বুঝলাম কুকুরে মানুষে দারুণ ঝটাপটি শুরু হয়েছে সেখানে। এই সুযোগে আমি আর আক্রমণের পথে না গিয়ে যেমন এগোচ্ছিলাম তেমনভাবে এগিয়ে পাহাড়ের একটি উঁচু জায়গায় পৌঁছলাম। সেখান থেকে দেখলাম বড় একটি গুহামুখের সামনে একজন বেঁটেখাটো লোক একটি বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। একপাশে একটি মশাল জ্বলতে থাকায় জায়গাটা বেশ আলোকিত।

আমি সন্তর্পণে সেখানে নেমে এসে পেছনদিক থেকে লোকটাকে আক্রমণ করতে

যেতেই ঘুরে দাঁড়াল সে। বলল, "হ্যান্ডস আপ।"

তত্ক্ষণে আমার পিস্তলের গুলি ওর বুকে লেগেছে।

হাত থেকে বন্দুক ছিটকে পড়ল লোকটির। আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম, "মিসেস সাহানিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?" ও প্রথমটায় খুব হকচকিয়ে গেল। তারপর যন্ত্রকাতর গলায় ভয়ে ভয়ে বলল, "গুহার ভেতর।"

আমি মশালটা হাতে নিয়ে অন্ধকার গুহার ভেতর ঢুকে দেখলাম কোথায় কে? তাই দ্রুত বেরিয়ে এসে লোকটাকে বললাম, "উনি তো নেই।"

"হ্যাঁ আছেন। ভাল করে দেখুন। আমার নজর এড়িয়ে উনি যেতেই পারেন না।"

আমি আবার ঢুকে দেখলাম কোথায় কে?

রাগে তখন আমি অন্ধ হয়ে গেছি। মশালের আগুনে ওর মুখে একটু ছ্যাঁকা দিয়ে বললাম, "এবারে বল।"

"কী করে বলব? তা হলে সুযোগ বুঝে নিশ্চয়ই পালিয়েছেন। গুহার পেছনদিকে একটু...।"

আমি আবার গুহায় ঢুকে দেখি এক জায়গায় সত্যিই একটি আলগা পাথরের গায়ে অল্প একটু ফাঁক আছে। একজন মানুষ কোনওরকমে গলে পালাতে পারে। মিসেস সাহানি নিশ্চয়ই এই পথেই পালিয়েছেন। আমি আরও একটা পাথর সরিয়ে সেই পথেই এগিয়ে চললাম। এইভাবে আমি চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে একটা চাপা আর্তনাদ শুনে থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম খাদের মতো একটা গর্তের ভেতর থেকে ভেসে আসছে শব্দটা। বুঝলাম অন্ধকারে পথ চলতে গিয়ে এখানেই বিপদটা ঘটিয়ে বসেছেন মিসেস সাহানি।

আমি একটি লতা ধরে কোনওরকমে মশাল হাতে লাফিয়ে নামলাম সেই গর্তের ভেতর। দেখলাম যা ভেবেছি তাই। মিসেস সাহানিই বেটপকে পড়ে আছেন সেখানে।

আমি যেতেই কেমন যেন ভয়ে আতঙ্কে জড়সড় হয়ে উঠলেন তিনি।

বললাম, "মিসেস সাহানি! আমাকে দেখে ভয় পাবেন না। আমি অম্বর চ্যাটার্জি। আপনার বিপদ কেটে গেছে।"

মশালের আলোয় দেখলাম দ্রুত পতনের ফলে ওঁর গা হাত পা ছড়ে গেছে। কপালের একটা পাশও কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে চুঁয়ে চুঁয়ে। বললাম, "উঠে দাঁড়ানোর যদি শক্তি থাকে তা হলে আমাকে ধরে উঠুন। চলুন ওই লতাটা ধরে গর্তের বাইরে যাই।"

অনুরাধা আমাকে ধরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "না থাক। এই রাতে আজ আর কোথাও যাওয়া নয়। কাল সকালে আলোয় ভুবন ভরে উঠলে তখনই বরং পথ চিনে যাওয়া যাবে। হিংস্র মানুষ এবং হিংস্র জন্তুরা তখন পথের বাধা হবে না। আমরা সহজেই চলে যেতে পারব।"

মশালের আলোয় অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমিও। ওঁকে দেখে আমার দু চোখে যেন পাতা পড়ল না। সত্যি! উনি কত সুন্দর।

আমরা গর্তের মধ্যে দুজনে মুখোমুখি বসে গল্প করেই কাটালাম। ছিপলির সাহচর্য, রতনলালের ফিরে আসা সব বললাম অনুরাধাকে। উনিও মন দিয়ে সব শুনলেন।

অনেক— অনেক পরে কালুয়ার ডাক শুনতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সেইসঙ্গে

ছিপলির কণ্ঠস্বর, "বাবুদাদা তুমি কোথায়?"

আমি সাড়া দিলাম, "আমরা এখানে।"

আমার মশালের আলো তখন নিভে গেছে।

ছিপলিই এবার মশাল নিয়ে এগিয়ে এল। গর্তের ওপর ঝুঁকে পড়তেই বললাম, "তোমার রাধা দিদিমণিও এখানেই আছেন।"

"আর ওখানে থাকবার দরকার নেই। উঠে আসুন।"

আমরা কোনওরকমে গর্ত থেকে উঠে আবার সেই গুহার কাছে এলাম। গুলিবিদ্ধ সেই লোকটাকে সেখানে দেখলাম না।

ছিপলি বলল, "যাকে খুঁজছেন সে নেই। লোকটা মরেছে। ওকে টেনে হিঁচড়ে ফেলে দিয়েছি খাদের ভেতর। এখন ও বাঘের খাদ্য হোক।"

দুষ্কৃতীদের গুহায় কতকগুলো সজারু রাখা ছিল। ছিপলি সেগুলোকেই আগুনে ঝলসে খাওয়ার উপযোগী করে ফেলল। তেল নুন মশলা চাল আটারও ব্যবস্থা ছিল অন্য একটি গুহাব স্টোর রুমে। কাছেই কাঠের জ্বালে গবম রুটি আব মাংস জমে উঠল ভালভাবেই।

আমি অনেক চেষ্টার পর থানার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে পারলাম। ইতিমধ্যে রতনলালের বক্তব্য অনুযায়ী সবাইকেই প্রায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আমি অনুবাধাকে বললাম, "আমার একার গোয়েন্দাগিরিতে নয়, সকলের প্রচেষ্টাতেই ধরা পড়ল গ্যাঙটা। তাই আমার কাজ কিন্তু শেষ।"

অনুবাধা বললেন, "এবার আপনার পরিশ্রমের টাকাটা দিয়ে দিতে পারলেই আমারও ছুটি।"

"মিসেস সাহানি, ওই টাকা নেওয়ার কোনও নৈতিক অধিকারই আমার নেই। কারণ এখানে যা কিছু হয়েছে তা সকলের সমবেত প্রচেষ্টায়। আমার একার চেষ্টায় নয়। আপনাব যা দেবার তা বরং আপনি উজাড় করে এই ছিপলিকেই দিয়ে যান।"

ছিপলি বলল, "যে জিনিস উনি হেলায় ফেলে যাচ্ছেন সে জিনিস কখনও আমি নিতে পারি? আমার জীবনের নৌকাটা ছোট! জাহাজেব মাল এতে ধরবে কেন?"

অনুরাধা ম্লান হেসে বললেন, "সবার সবকিছুই তো পড়ে থাকবে একদিন। সাজাহানও পারেননি তাঁর স্বপ্নের শতদল তাজমহলকে স্বর্গে নিয়ে যেতে। তাই যার যতটুকু ক্ষমতা ততটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।"

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, "আপনি তা হলে কবে যাচ্ছেন উত্তরপ্রদেশে?"

অনুরাধা মুখে প্রশান্তি এনে বললেন, "দেখি কবে যাই।"

"আপনার বিহারীলাল দেখছি সত্যই ভাগ্যবান। এতদিনে তিনি আপনার মতো সুন্দরীর কৃপা পেতে চলেছেন।"

ছিপলি সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বলল, "ছিঃ ছিঃ। ও কথা বলবেন না বাবুদাদাভাই। ওঁর বিহারীলালের কাছে সুন্দর অসুন্দর নেই।"

"তার মানে?"

"আপনি কী বুঝেছেন জানি না। ওর বিহারীলাল হলেন উত্তরপ্রদেশের বুকের ওপর যমুনা যেখানে বয়ে চলে সেই মধু বৃন্দাবনের বিহারীলাল। সবাই যাকে বাঁকেবিহারী বলে

ডাকে। তাঁর শ্রীমন্দিরে ঝাঁকিদর্শনে যায়। খুব ছোটবেলায় একজন জ্যোতিষের মুখে ওঁর বৈধব্যযোগের কথা শুনে ঠাকুরমা বাঁকেবিহারীর ছবির সঙ্গে রাধাদিদিমণির বিয়ে দেন। ঠাকুমা বলেছিলেন, জীবনে কখনও চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে এলে অন্য কারও কাছে নয়, ওই বিহারীলালের চরণেই নিজেকে নিবেদন করিস। আহা! কী অপূর্ব মূর্তি তাঁর। দিদিমণির দয়ায় আমিও বৃন্দাবনে গিয়ে দর্শন করে এসেছি তাঁকে। ওখানে দিদিমণির স্বামী দিদিমণির জন্যে সুন্দর একটি বাড়িও তৈরি করে দিয়েছেন।''

এই কথা শোনার পর আমার মুখ দিয়ে আর কথা বেরলো না। বুঝলাম মেয়েরা শুধুই মেয়ে নন। তারা মাতৃপ্রতিমা। তাদের মহামায়ার কতটুকুই বা আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

পরদিন সকালে পুলিশের সাহায্য নিয়েই আমরা ফিরে এলাম নওয়াদায়। রতনলালও এসেছিল ছিপলিকে নিতে। সেই ঝোপে রাখা স্কুটার ও হিরোহোন্ডাটা নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব রতনলালই নিল। রতনলালকে দেখে যে কী খুশি হল ছিপলি তা বলবার নয়।

নওয়াদায় ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরেই এমন একটা ফোন এল যাতে আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। রিসিভার তুলতেই শুনতে পেলাম, ''হ্যালো এ.সি। কেমন আছিস? আমি জয়ন্ত বলছি।''

আমার মুখ দিয়ে প্রথমে কথা সরল না। পরে বললাম, ''তুই তো মৃত।''

''ডেঞ্জার গ্যাঙ ভেঙে গেলেও আমি যে গডফাদার। আমি কি মরতে পারি? আমার অপদার্থ ভাগ্না কুণালটাকেই মরতে দেখেছিস তোরা। ওকে অনেকটা আমারই মতো দেখতে তো, তাই চিনতে ভুল করেছে সবই। ওটা ইদানিং আমাকেই ব্ল্যাকমেল করছিল। তাই আমিই ওকে সরিয়ে দিলাম। ভেবেছিলাম সাহানির মৃত্যুর পর মিসেস সাহানির সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলব কিন্তু সেখানেও আমি হেরে গেলাম। ওর দর্পচূর্ণ করবার জন্য ওকে কুণাল সেজে কিডন্যাপও করলাম। কিন্তু তোদের চক্রজাল আমাদের পুরো দলটাকে এমনভাবে ঘিরে ফেলবে তা ভাবতেও পারিনি। এইমাত্র ওঙ্কারমল জেঠিয়াকে খুন করে আমি তোকে ফোন করছি। যাই হোক, একটা কথা জেনে রাখ, ওই যে কথায় আছে না পাপ বাপকেও ছাড়ে না। আমিও তাই পার পেলাম না। কদিন আগে ডাক্তাররা জনিয়েছে আমার ব্রেন ক্যানসার। আপাতত আমি এ রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যের দিকে চলে যাচ্ছি। বিদায় বন্ধু বিদায়—।''

আমি আস্তে করে ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

অনুরাধা বললেন, ''গলাটা খুব চেনা মনে হল। কে ফোন করেছিল আপনাকে?''

আমি হেসে বললাম, ''এক নিঠুর দরদী।''

অনুরাধা আমার কথার অর্থ না বুঝে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। ওঁর চোখের কোল দুটি ভেজা ভেজা।

আজই রাতের গাড়িতে আমারও প্রত্যাবর্তন।

নিশান্তে রাত

শীতের মরশুমে এত শীত বিগত কয়েক বছরের মধ্যে পড়েনি বললেই হয়। শাল-সোয়েটার-মাংকি ক্যাপ চাপিয়েও শীতকে কিছুতেই কনট্রোল করা যাচ্ছে না। অথচ রাখহরি যেন শীতকেও জয় করে প্রকৃতিকে জানিয়ে দিচ্ছে আমার নাম রাখহরি। সামান্য একটি শার্ট-প্যান্ট ও উলিকটের গেঞ্জিতেই শীতের মোকাবিলা করছে ও।

ইদানীং শীতের দাপটে মর্নিংওয়াক বন্ধ হয়ে গেছে আমার। তার আর এক কারণ ঘন কুয়াশা। এক হাত দূরের মানুষকেও চোখে দেখা যাচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়েই লেপেব্ তলাটাকে নিরাপদ আশ্রয় মনে করেছি। সকাল ছটাতেও ভোর হচ্ছে না আজকাল। রাখহরি কিন্তু ঘুম থেকে উঠছে তিনটেতেই।

আজ পৌনে তিনটের সময় উঠেছে রাখহরি। উঠেই চা তৈরি করে ডাক দিয়েছে, আপনার গরমজল বেডি দাদাবাবু।

আমি বললাম, এক নম্বর না দু নম্বর?

এক নম্বর গরম জল মানে মুখ-হাত ধোওয়ার। দু নম্বর হল চা।

রাখহরি বলল, দুটোই।

আমি শয্যাত্যাগ করে কোনওরকমে উঠে চোখে-মুখে জল দিয়ে সোফায় এসে বসলাম। বললাম, এবার একটা গিজারের ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি। না হলে আর চলছে না।

রাখহরি বলল, করতে তো অনেক কিছুই হবে। কিন্তু করছেন না কেন? এত পয়সা খাবে কে আপনার?

আমি বললাম, কেন, তুই তো আছিস।

সেটা কী একটা কথার কথা হল?

রাখহরি এবার আমার প্রিয় ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট ও গরম চা এগিয়ে দিল। আমি বিস্কুট খেয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, তুই আমার জন্য এত করিস অথচ আমি তোর জন্য কিছুই করতে পারি না রে। তোর কাছ থেকে আমি শুধু সেবার পর সেবা নিয়েই যাই।

রাখহরি বলল, ও কথা বলছেন কেন দাদাবাবু। আপনি আমার জন্য যা করেন নিজের ভাইয়ের জন্যও কেউ তা করে না। আজ আপনি না থাকলে আমি কোথায় তলিয়ে যেতাম বলুন তো? আপনি তো আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। লেখাপড়া শিখিয়েছেন।

কিন্তু তোর একটা চাকরির ব্যবস্থা তো করে দিতে পারিনি।

দোহাই আপনার। ওই নামটি মুখে আনবেন না। এই বেশ আছি। সুখে আছি। স্বাধীনভাবে আছি। ওসব চাকরি-বাকরি করা আমার পোষাবে না।

আমি হেসে বললাম, সে কীরে পাগল! এইভাবে কেউ নিজের জীবনকে নষ্ট করে নাকি?

নষ্ট! এই জীবনই তো আমি চেয়েছিলাম। এতেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

আমরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব কথাবার্তা বলছি, সেইসময় হঠাৎই বাইরের রাস্তার দিক থেকে একটি গুলির শব্দ ভেসে এল। সেইসঙ্গে করুণ এক আর্তনাদ।

রাখহরি, আমি দুজনেই সচকিত হয়ে উঠলাম।

রাখহরি বাইরের আলো জ্বাললেও আমি টর্চটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। নিজের নিরাপত্তার জন্য পিস্তলটাও সঙ্গে নিতে ভুললাম না। রাখহরিও সঙ্গে এল।

বাইরে তখন যেমনই শীত, চারদিক তেমনই ঘন কুয়াশায় ঢাকা। পথেও কোনও লোকজনের আনাগোনা নেই। অথচ নিশুতি রাতে কে যে কোথায় খুন হল তা কে জানে?

রাখহরি, আমি দুজনেই তন্নতন্ন করে খুঁজলাম সর্বত্র। কিন্তু কোথাও কারও কোনও অস্তিত্ব টের পেলাম না। না পেলাম হত-আহত কাউকে, না কোনও আততায়ীর সন্ধান। পাবই বা কী করে? ঘন কুয়াশার জন্য কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না।

যাই হোক, সকাল না হওয়া পর্যন্ত এবং কুয়াশা না কাটলে কিছুই করা সম্ভব নয় বুঝে দুজনেই ঘরে ফিরলাম।

দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম দুজনেই।

রাখহরি যাওয়ার আগে দরজায় ডোর বোল্ট এঁটে দিয়েছিল। এখন দেখা গেল দরজাটা দু-হাট করে খোলা।

বাইরের আলোটা জ্বলছিল, তাতেই দেখলাম দরজার কাছে চাপ-চাপ রক্ত। আমরা ঘর থেকে বেরোনোর সময় কিন্তু ওই রক্ত দেখিনি। অর্থাৎ রক্তপাতটা হয়েছে আমরা চলে যাওয়ার পরে। আগে হলে ঘর থেকে বেরোনোর সময় আমাদের যে কেউ ওই রক্তের প্রবাহে পা পিছলে পড়তাম।

রক্তের দাগ শুধু বাইরে নয়, ঘরের ভেতরেও রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে আহত কেউ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এসেছে এখানে। হয়তো ভেতরেই আছে সে।

আমরা সেই রক্তের ধারা দেখে বাথরুমের কাছ পর্যন্ত এলাম। যা ভেবেছি তাই। বাথরুমের বেসিনের ওপর মুখ থুবড়ে বেসিন আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে এক অল্পবয়সি যুবক। তার জামা-প্যান্ট ইত্যাদিতেও রক্ত মাখামাখি। সে আদৌ জীবিত কী মৃত তা বোঝা যাচ্ছে না।

আমি একটুও বিলম্ব না করে থানায় ফোন করলাম।

একজন এস.আই. ফোনটা ধরেছিলেন। আমার মুখে সব শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, এ তো দেখছি রীতিমতো রোমাঞ্চকর ব্যাপার। এমন ঘটনার কথা গল্পের বইতেও পড়া যায় না। যাই হোক, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমরা এখনই যাচ্ছি।

আমি রিসিভার নামিয়ে রেখে সোফায় এসে বসলাম। শেষরাতে কী ভয়ানক কাণ্ড!

রাখহরিও নির্বিকার। কিছুক্ষণ চুপ থেকে একসময় বলল সে, আমাদের নজর এড়িয়ে কখন কীভাবে ঢুকল বলুন তো?

আমিও তাই ভাবছি। তবে কি রাস্তায় নয়, আমাদের বাগানেই গুলিবিদ্ধ হয়েছে বেচারি?

না। গুলির শব্দটা রাস্তার দিক থেকেই ভেসে এসেছে। গুলি খেয়েই মনে হয় বাগানে ঢুকে লুকিয়েছিল কোথাও। তারপর আমাদের চলে যেতে দেখে খুব সম্ভবত জলের প্রয়োজনে ঘরে ঢুকেছে।

কিন্তু ও আমাদের কাছে সাহায্য তো চাইতে পারত।

চায়নি এই কারণে যে মৃত্যু যখন আসন্ন তখন কারও কোনও সাহায্যেই ওর কিছু হত না। ওর যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, সেটা হল জলের। তাই পাছে আমরা ওকে বিমুখ করি, সেই ভয়ে ও চুপিচুপি ভেতরে ঢুকে জলের সন্ধানে গেছে। তৃষ্ণা মিটিয়েই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে বেচারি।

রাখহরির যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম। বললাম, তুই তো দেখছি ভেতরে-ভেতরে অনেকটা তৈরি হয়ে গেছিস। তোর যা বুদ্ধি তাতে তুই এবার গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে আমাকেও সাহায্য করতে পারবি।

রাখহরি হেসে বলল, কী যে বলেন।

ঠিকই বলছি। তুই যা-যা বলেছিস তা যথার্থই। তোর প্রতিটি কথাই যুক্তিপূর্ণ।

একটু পরেই পুলিশের গাড়ি এসে থামল বাড়ির কাছে।

এস.আই. অমল দত্ত কয়েকজন কনস্টেবল, একজন ডাক্তার ও অ্যাম্বুলেন্স সঙ্গে নিয়েই এসেছেন।

আমি প্রথমেই ওঁদের দরজার কাছে চাপ রক্তের জায়গাটা দেখিয়ে দিলাম। নাহলে অসতর্কভাবে পা পড়লে যে কেউ পিছলে যেতে পারে।

পুলিশের লোকেরা এসে রক্তাক্ত যুবককে ধরাধরি করে স্ট্রেচারে শোয়াল।

ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করতে শুরু করলে আমি বললাম, আশা নেই যদিও, তবুও আমার মনে হয় এখনও মরেনি বেচারি।

ডাক্তার নাড়ি টিপে বললেন, স্পন্দন নেই। চোখের পাতা স্থির। তবে দেহে এখনও উষ্ণতা আছে।

বডি কিন্তু শক্ত হয়নি।

ওইটাই রহস্য। যাই হোক, হসপিটালে তো পাঠাই। তারপর ওঁরা কী বলেন দেখা যাক।

অ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা বডি নিয়ে চলে গেল।

পুলিশও আমার মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে যা-যা লেখবার লিখে যুবকের পায়ের ছাপ, রক্তের নমুনা ইত্যাদি নিয়ে বিদায় নিল।

সবাই চলে গেলে কাজ বাড়ল রাখহরির। ওই কনকনে ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করেও ফিনাইল ঢেলে সব কিছু ধুয়েমুছে সাফ করে আগের মতোই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করল জায়গাগুলো।

অনেক বেলায় রোদ উঠলে আর একবার চা-পর্ব সেরে আমি বাইরের রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। দেখিই না কোথাও থেকে কোনওরকম সূত্রও যদি একটু খুঁজে পাই। কিন্তু না। আমার তদন্তের সুবিধে হয় এমন কোনও সূত্রই আততায়ীরা রেখে যায়নি কোথাও। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার দরজার কাছটুকু ছাড়া কোথাও কোনও রক্তের ছাপও চোখে পড়ল না। বাইরে থেকে এসে আমি এবার বাগানময় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু না। সেখানেও কোনও চিহ্ন নেই।

আমার মাথার ভেতরটা কেমন যেন ঝিমঝিম করতে লাগল। সেইসঙ্গে মনের মধ্যে

অসংখ্য প্রশ্নও তোলপাড় করতে লাগল আমার। যুবকের পরিচয় কী? কোথা থেকে এসেছে ও? কেনই বা খুন হল? খুনের নেপথ্যে কারা? এত জায়গা থাকতে আততায়ীরা এই হত্যাকাণ্ড বাধানোর জন্য আমার বাড়ির কাছটাই বা বেছে নিল কেন? এইসব প্রশ্নই তোলপাড় করতে লাগল মনের ভেতর।

একটু পরে কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে গেলে রাখহরি স্টিলের ইজিচেয়ারটা বাগানে নিয়ে এসে আমার বসবার ব্যবস্থা করল। হাওয়াটা আজ নেই। তাই ঠাণ্ডাটা কম লাগছে। আমি মিঠে রোদ্দুরে শালমুড়ি দিয়ে বসে কাগজের প্রথম পাতায় চোখ রাখলাম।

রাখহরি বলল, আপনি ওই নিহতকে কোনওরকম সার্চ না করেই পুলিশের হাতে তুলে দিলেন কেন?

কারণ আছে। কতকগুলো ব্যাপারে পুলিশের ক্ষমতা অসীম। যেহেতু কেসটা আমার বাড়ির মধ্যে তাই আমি এখানকার সব দায়িত্বই পুলিশের ওপর তুলে দিলাম। তবে খুনের তদন্ত আমিই করব। যদি ওর বডি সার্চ করে পুলিশ কোনও কিছুর সূত্রসন্ধান পায় তা হলে সেই সূত্র ধরেই আমি এগোতে থাকব। অবশ্য গুলিবিদ্ধ যুবকের মধ্যে যদি কোনও প্রাণের স্পন্দন আমি টের পেতাম তাহলে কিন্তু আমিই হাত লাগাতাম সব কিছুতে। যেহেতু ও জীবিত কী মৃত ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না তাই আমি ইনঅ্যাকটিভ ছিলাম।

রাখহরি আর কিছু না বলে থলি হাতে বাজারের দিকে গেল। আমিও সংবাদপত্রের বিশেষ-বিশেষ সংবাদগুলো খুঁটিয়ে পড়তে লাগলাম।

এমন সময় ফোনটা বেজে উঠতেই ঘরে এসে ফোন ধরলাম।

এস.আই. অমল দত্ত ফোন করেছেন। বললেন যে, যুবকের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়েছে। তবে এখনও সে অজ্ঞান অবস্থাতেই আছে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে বেচারি। ইচ্ছে করলে আমি গিয়ে তাকে একবার দেখে আসতে পারি।

আমি একটুও দেরি না করে তৈরি হয়ে নিলাম।

রাখহরি ফিরে এলে ওকে সব কথা বলে সামান্য জলযোগের পর রওনা হলাম থানার দিকে।

চার্চের ঘড়িতে তখন ন'টা পাঁচ। আমার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেটাও ঠিক একই সময় দিচ্ছে।

হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম পেশেন্টের অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। ডাক্তারবাবুরা অনেক চেষ্টা করে গুলি বার করেছেন। আর বহুকষ্টে জেনেছেন দুটি নাম। জয়দীপ ব্যানার্জি ও পূজা। জয়দীপ সম্ভবত যুবকেরই নাম। কিন্তু পূজা? ওই নাম রহস্যেই ঢাকা রইল। সঙ্গে কোনও কাগজপত্তর বা ঠিকানা না থাকায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপরিচয়, জ্ঞানহীন এই যুবকের কাছ থেকে ওর খুনিদের ব্যাপারেও কোনও কিছু জানা গেল না।

যুবকের জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় সারাটা দিন অধীর আগ্রহে বসে রইলাম। কিন্তু কোনও লাভ হল না। সন্ধের আগেই মারা গেল যুবকটি।

বিষন্ন মন নিয়ে যখন ঘরে ফিরলাম, তখন দেখলাম আলো জ্বেলে বাইরের দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রাখহরি। আমি যেতেই আমার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার চেষ্টা করল। আমিও চোখের ভাষায় বুঝিয়ে দিলাম ওকে খবর ভাল নয়।

পরে আস্তে করে বললাম, মারা গেল বেচারি।

রাখহরি বলল, ওর নামধাম কোনও কিছু?

শুধু নামটাই যা জানতে পেরেছি। ওর নাম জয়দীপ। আর পূজা নামের একটি মেয়ের নামও পেয়েছি। এর বেশি কিছু নয়।

আমি কিন্তু দারুণ একটা জিনিস পেয়েছি। মনে হয় তার মধ্যে থেকেই এই রহস্যের জট খুলে যেতে পারে।

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, কী পেয়েছিস?

ভেতরে আসুন।

আমি ভেতরে ঢুকেই দেখলাম আমার সোফার সামনে টি-টেবিলের ওপর একটি ব্রিফকেস বসানো আছে। সেটার দিকে তাকিয়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল। বললাম, কোথায় পেলি এটা?

বাগানে।

বাগানে!

হ্যাঁ। বিকেলে বাগানের গাছগুলোয় জল দেওয়াব সময় দেখি মাধবীলতার ঝোপেব আড়ালে লুকনো আছে ওটা।

স্ট্রেঞ্জ। বলে রাখহরির কাঁধে হাত রেখে বললাম, মনে হয় এই ব্রিফকেসটাই রহস্যের উৎস। তবে মেটাল ডিটেক্টরে পরীক্ষা করার আগেই এতে তুই হাত দিতে গেলি কেন? দেখছিস এখন দিনকাল খারাপ। যদি বিস্ফোরক কিছু থাকে ওর ভেতর?

রাখহরি বলল, অন্যসময় হলে দিতাম না। তবে সকালের ওই ঘটনার পর মনে হল এই খুনের ব্যাপারটা ওই ব্রিফকেসকে নিয়েই।

আমি মুখ-হাত ধুয়ে পোশাক পরিবর্তন করে মেটাল ডিটেক্টরের সাহায্যে পরীক্ষা করলাম সেটাকে। কিন্তু না। ওর ভেতরে কোনও বিস্ফোরক থাকার সঙ্কেত পেলাম না। এখন এটাকে হয় থানায় গিয়ে জমা দিয়ে আসতে হয়, নয়তো নিজেদেরই খুলে দেখতে হয় এর ভেতরে কী আছে।

রাখহরি, আমি প্রাণান্ত চেষ্টার পর সেটাকে না ভেঙে খুলে ফেললাম। তার ভেতরে পাঁচশো ও হাজার টাকার নোটের বান্ডিল মিলিয়ে রয়েছে মোট দশ লাখ। দেখেই চোখ কপালে উঠে গেল!

আমি বললাম, বুঝেছি। এর জন্যেই এত কাণ্ড।

রাখহরি বলল, কেমন যেন সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। প্রথমত এত টাকা চুরি যাওয়া মানে রীতিমতো একটা হইচই পড়ে যাওয়া। ব্যাঙ্কডাকাতি ছাড়া এতগুলো টাকা হাতে আসা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত এই টাকার জন্য যুবক খুন হলে খুনিরা টাকা না নিয়েই পালাল কেন? তৃতীয়ত এই টাকা আমাদের এই বাগানের মধ্যেই বা এল কী করে?

আমি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো ভাবনাচিন্তা শুরু করলাম। তারপর অনেক ভেবে একসময় বললাম, দ্যাখ, আমার মনে হয় এই টাকাগুলো ব্যাঙ্কডাকাতির টাকা নয়। নিশ্চয়ই কারও কোনও কালো টাকার হদিশ পেয়ে চোরেরা চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছে। ব্যাঙ্কডাকাতি হলে রীতিমতো হইচই পড়ে যেত। যেহেতু কালো টাকা, তাই টাকার মালিকও ব্যাপারটা জানাজানি করতে সাহস করছে না। তবে,

একটু আশার আলো আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে—।

কীরকম?

অতগুলো টাকার মায়া ওর দলের ওরা কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। ওগুলোব লোভে ওরা নিশ্চয়ই আশপাশে ঘোরাঘুরি করবে! এমনকী এই বাগানেও আসবে ওরা। কাল ওরা খুঁজে দেখার সময় পায়নি। কিন্তু আজ আসবেই।

নাও তো আসতে পারে।

আসবেই। দশ লাখ টাকা। মুখের কথা! কাল শেষরাতের ঘটনা। গুলির আওয়াজ শুনেই আমরা আলো জ্বেলে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলাম বলে ওরা ধরা পড়বার ভয়ে বাধ্য হয়েই পালিয়ে যায়। আহত জয়দীপ সেই সুযোগে আমাদের নজর এড়িয়ে ব্রিফকেসটাকে লুকিয়ে রাখে বাগানে। উদ্দেশ্য একটাই, যদি ও বেঁচে যায় তা হলে পরে সময়মতো এসে টাকাটা নিয়ে যাবে। যদি না বাঁচে তা হলে আর যাই হোক ওর সঙ্গীরা কেউ ও টাকায় হাতও দিতে পারবে না। এখন প্রশ্ন হল, এই জয়দীপ ব্যানার্জি কে? স্থানীয় কেউ যে নয় তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে। ওর খুনিরাই বা থাকে কোথায়? তার চেয়েও বড় কথা এই এলাকায় ওরা এল কীভাবে?

যাই হোক, সে রাতে আমরা দুজনে ঘরে-বাইরে সব জায়গায় আলো নিভিয়ে পালা করে রাত জেগে বাগানের দিকে নজর রাখলাম। কনকনে ঠাণ্ডায় কী কষ্ট যে ভোগ করলাম তা আমরাই.জানি। কিন্তু না, রাত্রি শেষ হলেও কারও পায়ের ধুলো পড়ল না আমাদের বাগানে।

অবশেষে হাল ছেড়ে দিলাম। দুই আর দুইয়ের মতো সহজ অঙ্কে এর সমাধান হল না। টাকাগুলো নিরাপদ জায়গায় রেখে ব্যাপারটা নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামাতে লাগলাম যে আমার আহার-নিদ্রা প্রায় ঘুচেই গেল বলতে গেলে।

এই ঘটনার দিন দুই পরে এস.আই. অমল দত্ত এমন একটা খবর দিলেন যে তা শুনে চমকে উঠলাম। অমল দত্ত বললেন, কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন মিঃ চ্যাটার্জি। যে রাতে জয়দীপ ব্যানার্জি নামে ওই যুবক খুন হয় ঠিক সেই রাতেই জয়দীপ ব্যানার্জি নামে একজন প্রোমোটার ডাউন আমেদাবাদ এক্সপ্রেস থেকে রূপনারায়ণে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।

এতক্ষণে যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলাম। পুলিশ সূত্রের খবর মানে দারুণ নির্ভরযোগ্য খবর। বললাম, খবরটা কীভাবে পেলেন?

জয়দীপের ব্যাপারে তো আমরা সব থানাকেই জানিয়েছিলাম। আজ এইমাত্র উলুবেড়িয়া থানা থেকে খবরটা পেয়েই আপনাকে জানাতে এসেছি।

আমি বললাম, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। মনে হচ্ছে এই খুন এবং আত্মহত্যার মধ্যে একটু যোগসূত্র আছেই। ঘটনাটা যখন একই দিনের তখন...। শুধু নামের ব্যাপারেই একটু যা বিভ্রান্তি রয়ে গেল।

একই দিনে একই নামের দুজনের এই পরিণতি রহস্যময় নয় কি?

আমি বললাম, অন্ধকারের পথ ধরেই যেমন অন্ধকার জগতে পৌঁছনো যায়, তেমনই রহস্যের হাত ধরেই রহস্যের উন্মোচন করতে হবে। কথায় আছে যেখানে দেখিবে ছাই

উড়াইয়া দেখো তাই। দেখিই না একবার চেষ্টা করে কোনও কিনারায় পৌঁছতে পারি কি না।

অমল দত্ত বিদায় নিলে আমি চটপট তৈরি হয়ে নিলাম। রাখহরিকে বললাম, আমি যে কখন ফিরব তার ঠিক নেই। তবে এতগুলো টাকা ঘরে আছে। তুই কিন্তু একদম ঘর থেকে বেরোবি না; কেউ এলেও দরজা খুলবি না।

রাখহরি বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

আমি মৌড়িগ্রাম স্টেশনে আসতেই সঙ্গে-সঙ্গে একটি মেচেদা লোকাল পেয়ে গেলাম। সেই ট্রেনে কিছুক্ষণের মধ্যেই উলুবেড়িয়ায়। ওখানকার থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমার বিশেষ পরিচিত। তাঁর কাছে গিয়ে ওই যাত্রীর খোঁজখবর নিতেই তিনি বললেন, আমরা এটিকে আত্মহত্যার ঘটনা বললেও মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়।

তা হলে কী?

মনে হচ্ছে খুন। ভদ্রলোককে ফেলে দেওয়া হয়েছে ট্রেন থেকে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গেছে এক ধরনের ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল মৃত্যুর আগে।

ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ সহজ বলে মনে হল এবার। একজন প্রোমোটারের কাছে দশ লাখ টাকা থাকা চমকে ওঠার মতো কোনও ব্যাপার নয়। দুষ্কৃতীরা টাকা নিয়ে ভদ্রলোককে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেয়। তারপর মৌড়িগ্রামের কাছে সিগন্যাল না পেয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লে নেমে পালায়। অথবা চেন পুলিং করে পালায়। বললাম, ভদ্রলোকের ঠিকানাপত্তর পাওয়া গেছে কিছু?

না। তবে লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত পূজা ব্যানার্জি নামে একটি মেয়ের প্রেসক্রিপশন পাওয়া গেছে। প্রেসক্রিপশনটি ডাঃ রমেশ যোশী নামে টাটানগরের একজন নামকরা চিকিৎসকেব।

ওতেই হবে। মনে হচ্ছে রহস্যের জট এবার খুলতে পারব। কিন্তু উনিই যে জয়দীপ ব্যানার্জি এবং একজন প্রোমোটার এটা আপনারা জানলেন কী করে?

ওঁর ডেডবডি যখন আমরা রূপনারায়ণের চরা থেকে উদ্ধার করি তখনই ওঁর নামাঙ্কিত একটি কার্ড পাই। তাতে শুধুমাত্র নামটুকু ছাড়া আর কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। তবে প্রেসক্রিপশনটি একটি পলিপ্যাকে মোড়া ছিল বলে বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

অন্য কোনও মালপত্তর পাওয়া যায়নি ওঁর কোচ থেকে?

সে ব্যাপারে অনুসন্ধান তো এখনও হয়নি। প্যান্টের পকেটে প্রথম শ্রেণীর একটি টিকিট ছিল। মালপত্তর কিছু থাকলেও তা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। হাওড়া স্টেশনে ট্রেন গিয়ে পৌঁছলে বেওয়ারিশ মাল ভ্যাগাবন্ডসদের হাতেই চলে যায়। জমা পড়ে না।

এ ব্যাপারে ডাক্তার যোশীর সঙ্গে আপনারা কোনও যোগাযোগ করেছিলেন?

করেছিলাম। কিন্তু উনি এখন আউট অফ স্টেশন। একটি চিকিৎসক-কনফারেন্সে যোগ দিতে পুনেয় গেছেন।

আমি আর দেরি না করে বাড়ি ফিরে এলাম। একটাই প্রশ্ন এখন আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল, যে ছেলেটি খুন হল, সে তাহলে কে? জয়দীপ ব্যানার্জি ও পূজা এই দুটি নাম ও বললই বা কেন?

আমি বাড়ি ফিরে এলেও দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সন্ধ্যায় স্টিল এক্সপ্রেসে রওনা হলাম টাটানগরের দিকে।

টাটানগরে পৌঁছলাম রাত প্রায় নটা নাগাদ। স্টেশন এলাকাতেই একটি লজে উঠলাম। সে-রাতটা সেখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে গেলাম যোশীর চেম্বারে।

যোশী তো আউট অফ স্টেশন। কিন্তু ওঁর একজন লোককে জিগ্যেস করতেই পরিচয় পাওয়া গেল জয়দীপ ব্যানার্জির। বললেন, 'উনি একজন প্রোমোটার। কোটি টাকার মালিক। এখনও বিয়ে করেননি। সাকচিতে একটি ফ্ল্যাটে একা থাকেন। ওঁর ছোট বোন পূজার ব্লাড টেস্টে সম্প্রতি লিউকোমিয়া ধরা পড়েছে। তাতেই পাগলের মতো হয়ে উঠেছেন উনি। বেহালায় ম্যানটনে ওঁর পরিবারের আঁর সবাই থাকেন। রাজা বসন্ত রায় রোডে একটি ফ্ল্যাট কেনবারও তোড়জোড় চলছে। মানুষটি খুবই ভাল। এ হেন মানুষের যে এইরকম পরিণতি হবে তা কে জানত? তবে চান্ডিলে রূপা মাহেশ্বরীর কাছে গেলে ওঁর ব্যাপারে আপনি অনেক কিছুই জানতে পারবেন।

রূপা মাহেশ্বরী ওঁর কে হন?

অত্যন্ত আপনজন। বোনের লিউকোমিয়া ধরা না পড়লে হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই ওঁদের একটা স্থায়ী সম্পর্ক হয়ে যেত।

উনি কি এখনও পর্যন্ত কোনও খবর পেয়েছেন ওঁর ব্যাপারে?

কী করে পাবেন? খবরটা দেবে কে?

দুঃসংবাদটা তাহলে আমাকেই বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কী আর করবেন? একজন না একজনকে তো নিয়ে যেতেই হবে। তা আপনিই যান। চান্ডিলের স্টেশনমাস্টারের কাছে গেলেই ওর খোঁজ পেয়ে যাবেন।

এখন টাটানগর থেকে চান্ডিলে যাওয়ার কোনও ট্রেন নেই। তাই বাধ্য হয়েই একটা মারুতি ভাড়া করে এগিয়ে চললাম চান্ডিলের দিকে। এ পথে বহুদিন আগে একবার এসেছিলাম বাঘমুণ্ডি থেকে বরাহভূম হয়ে। তারপরে এই।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম চান্ডিলে। এখানকার স্টেশন-মাস্টারের কাছে ওঁর ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়েই দেখা হয়ে গেল আমার এক পুরোনো বন্ধু বিরাজের সঙ্গে। ও এখানে ওর শ্বশুরবাড়িতে এসেছিল। আমার মুখে রূপার নাম শুনেই চমকে উঠল ও। বলল, তুই আবার ওর ফাঁদে পড়লি কবে থেকে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, ফাঁদ মানে?

ওরেব্বাবা। সাংঘাতিক মেয়ে ও। যেমনই তেজি, তেমনই জেদি, তেমনই—।

তেমনই কী?

নাঃ থাক। তোর তো আবার মেয়েদের ব্যাপারে অ্যালার্জি। তবে খুব সাবধান' ওর সঙ্গে মেলামেশা করার আগে জেনে রাখিস ও একটা সাক্ষাৎ বাঘিনী।

এই ধরনের কথাবার্তা আমি একদম পছন্দ করি না। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলার সময় এমন সব সহ্য করতেই হয়। তাই ওকে এড়িয়ে স্টেশনমাস্টারের ঘরেই গেলাম।

স্টেশনমাস্টার বাঙালি। অত্যন্ত অমায়িক এবং ভালমানুষ। আমি যেতে প্রথমেই আমাকে বসতে বললেন। নিজে হাতে এক গেলাস জল খাইয়ে চা আনতে পাঠালেন

একজনকে। তারপর বললেন, এবাব বলুন কে আপনি? কোথা থেকে আসছেন?

আমি বললাম, আমার নাম অম্বর চ্যাটার্জি। আমি এসেছি রূপা মাহেশ্বরীর কাছে একটি বিশেষ বার্তা নিয়ে। যদি আপনি ওঁর সঙ্গে আমার একটু পরিচয় করিয়ে দেন তা হলে খুবই উপকৃত হই।

সে আর এমন কী কথা। এই কাছেই তো ওর বাড়ি। বড় ভাল মেয়ে। নন বেঙ্গলি। কিন্তু বাংলাতেই পড়াশোনা, বাংলাতেই সবকিছু। ভাল ঘরে বিয়েও হয়েছিল। তবে সুখ সইল না ওর কপালে। ডিভোর্সের পর এক নতুন জীবন বেছে নিয়েছে ও। নিজের বাড়িতেই একটা ফ্রি-কোচিং সেন্টার খুলেছে। তাছাড়া গানের স্কুলে গানও শেখায়।

কে-কে আছেন ওঁর বাড়িতে?

কেউ না। বাবা রেলে চাকরি করতেন। ছোটবেলায় মা মারা যান। এখন ও একা। বয়সও বেশি নয়। খুব জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর।

আমি বললাম, আচ্ছা, জয়দীপ ব্যানার্জি নামে কারও সঙ্গে ওঁর কোনও সম্পর্কের কথা আপনার জানা আছে?

হ্যাঁ। ছেলেটি বড় ভাল। টাটানগরের সাকচিতে একটি ফ্ল্যাটে থাকে। প্রোমোটারি করে প্রচুর টাকার মালিক হয়েছে। খুব শিগগির রূপার সঙ্গে ওর একটা স্থায়ী সম্পর্কও গড়ে উঠতে চলেছে। শুনেছি কলকাতায় একটা ফ্ল্যাটও কিনবে ও। তারপরই রূপাকে নিয়ে এখানকার পাট চুকিয়ে ওখানে চলে যাবে।

তাহলে ওঁর ব্যবসা?

আপাতত বন্ধ। হয়তো নতুন করে শুরু করবে কলকাতাতেই। কেননা এখানে রামু যাদব নামে এক সমাজবিরোধী যেভাবে ওর পিছনে লেগেছে তাতে যে কোনও মুহূর্তে জীবন বিপন্ন হতে পারে ওর। তাছাড়া রূপাকেও ইদানীং খুব বিরক্ত করছে লোকটা।

শুনেই বললাম, কী নাম বললেন? রামু যাদব?

হ্যাঁ। চেনেন নাকি লোকটাকে?

না। লোকটা কোথায় থাকে বলতে পারেন?

ওর কোনও নির্দিষ্ট ঠেক নেই। শুনেছি ডিমনার কাছে ও একটা আস্তানা করেছে। বর্ন ক্রিমিন্যাল একটা।

আমি বললাম, নামটা বলে যে কী উপকার করলেন আপনি। কোনও একটি হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ওই রকমেরই একজনকে হন্যে হয়ে খুঁজছি আমি।

মাস্টারমশাই অবাক হয়ে বললেন, আপনি তাহলে কে? হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে যখন খুঁজছেন তখন নিশ্চয়ই আপনি পুলিশের লোক।

আমি আমার আসল পরিচয় দিয়ে সব কথা খুলে বললাম মাস্টারমশাইকে।

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন উনি। কপাল চাপড়ে বললেন, কী বলছেন আপনি? জয়দীপ নেই! আবার নতুন করে কপাল পুড়ল মেয়েটার? এই দুঃসংবাদ ওকে কী করে দেব?

আমি বললাম, এখনই কিছু বলবার দরকার কী? ওই ব্যাপারে কোনও কথা না বলে আমার তদন্তের কাজে লাগে এমন দু-একটা কথা ওঁকে আমি জিগ্যেস করতে চাই।

আসুন তাহলে আমার সঙ্গে। এই দুঃসংবাদটা একটু দেরিতে খবরের কাগজের মাধ্যমেই জানুক ও।

স্টেশন এলাকা থেকে একটু দূরে নির্জন পরিবেশে বাংলো প্যাটার্নের একটি বাড়ির সামনে এসে মাস্টারমশাই বললেন, এই বাড়ি।

মাস্টারমশাই দরজায় নক করতেই এক আদিবাসি কিশোরী দরজা খুলে বাইরে এসে বলল, দিদি তো নেই।

কোথায় গেছে?

সাকচিতে।

সাকচিতে? কখন গেছে?

কাল সন্ধেবেলা। কিশোরীলাল এসে বলল জয়দার খুব অসুখ, তাই শুনেই দিদি গেছে। জয়দার বোনের অসুখের খবর পেয়ে জয়দার কলকাতায় যাওয়ার কথা ছিল। দিদি ফোনে জেনেছে জয়দা বাড়ি যায়নি। তাই—।

সর্বনাশ। যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে পারল না?

আপনি তো কাল নিমডিহিতে গিয়েছিলেন।

মাস্টারমশাই আমার হাত ধরে খানিকটা তফাতে নিয়ে এসে বললেন, যা ভয় করেছিলাম তাই হল। মেয়েটা শেষপর্যন্ত রামু যাদবের খপ্পরেই পড়ে গেল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই হত্যাকাণ্ডের নায়ক রামু ছাড়া আর কেউ নয়।

আচ্ছা, ওই কিশোরীলাল কে?

চ্যাংড়া ছেলে একটা। লাইনের ওপারে বস্তিতে থাকে। কিশোরীলাল, মদনলাল ও সোনামানিক। তিন সঙ্গী ওরা। এমনিতে বাইরে থেকে দেখে ওদের স্বরূপ বোঝা যাবে না। তবে ভেতরে-ভেতরে মোস্ট ডেঞ্জারাস। আমার মনে হয় রামুর সঙ্গে ওদের নিশ্চয়ই যোগাযোগ আছে। ওরই নির্দেশে ওরা মিথ্যে সংবাদ দিয়ে সর্বনাশটি করিয়েছে রূপার।

আমি বললাম, গুলিবিদ্ধ যে ছেলেটি আমার বাড়িতে গিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে সে এদের তিনজনের একজন নয়তো?

মাস্টারমশাই বললেন, হতে পারে। এতক্ষণ এই সম্ভাবনার কথাটা আমার মাথায় আসেনি। কীরকম দেখতে বলুন তো ছেলেটিকে?

আমি চেহারার বর্ণনা দিতেই মাস্টারমশাই বললেন, বুঝেছি। এ সোনামানিক ছাড়া আর কেউ নয়।

আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারেন ওর বাড়িতে?

বেশ তো চলুন।

আমরা একটা রিকশায় চেপে লাইন পার হয়ে ওদিকের বস্তিতে গেলাম। সোনামানিকের বাড়িতে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম সে আজ দু-তিনদিন বাড়িতে নেই।

ওর বাবা একটু ভারিক্কি মেজাজের লোক। তাই গম্ভীর স্বরে বললেন, কেন আমার ছেলের খোঁজ নিচ্ছেন বলুন তো আপনারা? আমার ছেলে কি অন্যায় কিছু করেছে?

আমি বললাম, সত্যিই অন্যায় কিছু করেছে কি'না তা প্রমাণসাপেক্ষ। তবে বাড়িতে ওর কোনও ছবি থাকলে যদি দেখাতে পারেন তা হলে খুব ভাল হয়!

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই ওর মা একটা অ্যালবাম নিয়ে এসে বললেন, এই তো আমার ছেলের ছবি। বলুন না কী হয়েছে ওর? ও আজ কদিন ধরে বাড়ি ফিরছে না কেন?

ছবির দিকে তাকিয়ে আমি নির্মম হয়েই বললাম, ও আর কখনও বাড়ি ফিরবে না।

আপনারা হাওড়ায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

হাজার হলেও মা তো। আমার কথা শোনামাত্রই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

আমি ওর বাবাকে বললাম, কিশোরীলাল ও মদনলাল নিশ্চয়ই বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

ওর বাবা বললেন, ওরাই তো ডেকে নিয়ে গিয়েছিল আমার ছেলেকে। তারপর ওরা ফিরল। আমার ছেলে ফিরল না। কাল সকালে একবার দেখেছিলাম কিশোরীলালকে। ছেলের কথা জিগ্যেস করতে বলল, ওর ব্যাপারে ওরা নাকি কিছুই জানে না।

আমি বললাম, ওদের যে-কোনও একজনকে আপনি ডাকিয়ে আনতে পারেন?

না। ওরা ফাঁকা মাঠের বেড়াল। কোথায় ঘুরছে এখন তা কে জানে?

আমি মাস্টারমশাইকে ইশারায় স্থানত্যাগ করতে বলে চলে এলাম সেখান থেকে।

তারপর এখানকার লোকাল থানাকে সব কথা জানিয়ে যখন টাটানগরে যাব বলে স্টেশনে আসছি, তখনই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছিপছিপে চেহারার একটি ছেলে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, স্যার আপনি পুলিশের লোক?

কেন বলো তো?

এদের ব্যাপারে অনেক কিছু আমি জানি। তাই দু চার কথা আপনাকে বলতে চাই।

আমি বললাম, এতে তোমার বিপদও হতে পারে তো?

সোনামানিক আমার বন্ধু। ছেলেটা কিন্তু সত্যিই খুব ভাল। শুধু এই দুটি বাজে ছেলের পাল্লায় পড়ে ইদানীং বারোটা বেজে গেছে ওর। ওর মর্মান্তিক পরিণতির কথাটা আমি কাল রাতেই জেনেছি। সেইসঙ্গে জেনেছি জয়দীপ ব্যানার্জির খুন হওয়ার ব্যাপারটা। কিন্তু সব জেনেও না জানার ভান করে আছি। রুপাদিকে ওরা যেভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিল, তাতে আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি না।

তাই যদি হয়, তাহলে রূপাদিকে তুমি সাবধান করে দিলে না কেন?

বললাম তো সবকিছু হয়ে যাওয়ার পর কাল রাতেই যা জানবার জেনেছি।

আমি বললাম, তোমার নাম?

আমার নাম রোহন। আমার বোন রূপাদির ছাত্রী। তা কাল রাতে আমি যখন নর্থ কেবিনের পাশ দিয়ে আসছি, তখনই মদনলাল ও কিশোরীলালকে এক জায়গায় বসে শলা-পরামর্শ করতে দেখি। দেখেই আমার সন্দেহ হয়। কেননা ওরা প্রায়ই খারাপ কাজ করে থাকে। তাই আমি লুকিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনি ওরা এবার কার কী সর্বনাশ করতে চলেছে তা আগাম জানব বলে।

এমনসময় ট্রেন আসার শব্দ শোনা গেল।

ও বলল, ওই আপনার ট্রেন আসছে।

আমি বললাম, তোমার কথা না জেনে এক পা-ও নড়ছি না এখান থেকে। ওদের কথা কী শুনলে বলো?

ট্রেন এল। ছেড়ে চলেও গেল। আমি ওকে নিয়ে স্টেশনেরই একটু নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বসলাম।

ও বলল, কিশোরীলাল বলছিল, বেশি সততা দেখাতে গিয়েই মরল ছেলেটা। ও যে ফিল্ডে নেমে ওইভাবে পাল্টি খেয়ে যাবে তা কে জানত? মদনলাল বলল, তাই বলে তুই

হট করে গুলি চালাতে গেলি কেন? কিশোরীলাল বলল, সাক্ষ্য-প্রমাণ লোপ করার জন্য। জয়দীপ ব্যানার্জির খুনের ব্যাপারে ও যেরকম বাধা দিয়েছিল তাতে আমার মনে হয় ও নিজেই গিয়ে পুলিশকে জানিয়ে দিত সব কথা। মাঝখান থেকে টাকাগুলো হাতছাড়া হয়ে গেল। শয়তান ছেলেটা কোথায় যে লুকলো ব্রিফকেসটা তা কে জানে? অজানা-অচেনা জায়গা, তাই ঝুঁকি না নিয়েই পালিয়ে এলাম। জয়দীপ ব্যানার্জির ওই পরিণতির কথা শুনেই তো রামুদা বলল, এত বড় দাঁওটা যখন মারতে পারলি না তখন তোদের তো হাত খালি। এখন ওই রূপা মেয়েটাকে যদি আমার ফাঁদে ফেলতে পারিস তাহলে কথা দিলাম তোদের পকেট আমি ভর্তি করে দেব। মেয়েটা একদিন সবার সামনে আমার গালে চড় মেরেছিল। তা লাইনে যখন নেমেইছি তখন আর প্রাণে মায়া-মমতা রাখলে চলবে কেন? এক ধাক্কায় কাজ হাসিল করে এলাম। মদনলাল বলল, শুধু সোনামানিকটার জন্যই সব চাল ভেস্তে গেল আমাদের। ওটাকে কেন জড়ালি? কিশোরীলাল বলল, কী করব? কদিন ধরেই 'কাজ দে, কাজ দে' করছিল। তারপর ট্রেনে উঠে জয়দীপ ব্যানার্জিকে দেখেই যে অমন হয়ে যাবে তা কে জানত?

আমি রোহনকে বললাম, কিশোরীলাল ও মদনলালকে এখন কোথায় পাওয়া যেতে পারে?

আমি ওদের ন'টা পঞ্চান্নর ট্রেনে টাটানগরের দিকে যেতে দেখেছি।

তার মানে ওরা টাটানগরেই গেছে। রামু যাদব তো ডিমনায় থাকে, তাই না?

জায়গাটা চিনি আমি। আপনি যদি বলেন তো আমিও যেতে পারি আপনার সঙ্গে।

আমি দারুণ উল্লসিত হয়ে বললাম, একেই বলে মেঘ না চাইতেই জল। তুমি সঙ্গে থাকলে কাজের অনেক সুবিধে হয় আমার। রামু যাদব. কিশোরীলাল, মদনলালকে তুমিই চিনিয়ে দিতে পারবে।

আপনি তা হলে একটু অপেক্ষা করুন। আমি চট করে বাড়িতে একটা খবর দিয়ে আসি।

কোনও প্রয়োজন নেই। তোমার বাড়িতে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা আমিই করছি।— বলে স্টেশনমাস্টারের ঘরে ঢুকে যা-যা বলবার সব বলে ওঁকেই বললাম রোহনদের বাড়িতে আমার সঙ্গে ওর যাওয়ার খবরটা গোপনে পৌঁছে দিতে।

একটা ট্রেন তো বেরিয়ে গেল। পাঠানকোট-টাটানগর এক্সপ্রেস। এখন আর কোনও ট্রেন নেই। তাই আবার একটা মারুতি নিয়েই এগিয়ে চললাম টাটানগরের দিকে।

টাটানগরে পৌঁছে নিজের পরিচয় দিয়ে ওখানকার পুলিশকেও জানালাম সব কথা। তারপর থানার মারফতই জানালাম আমার এলাকার পি.এস.-এ। অমল দত্ত বললেন, আপনি নির্ভয়ে কাজ করুন। ওখানকার পুলিশের সাহায্যও যাতে আপনি পান সেই ব্যবস্থা এখনই করছি।

এরপর টাটানগরে যে লজে উঠেছিলাম আমি সেই লজেই আবার উঠলাম রোহনকে নিয়ে। বেলা অনেক হয়েছে। স্নান-খাওয়ার পর্বটা তো মিটিয়ে নিতে হবে এবার। তারপর মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীরেসুস্থে এগোতে হবে আসল কাজে।

বিকেলের দিকে রোহনকে নিয়ে কিছুক্ষণ এখানকার জুবিলি পার্কে কাটিয়ে ঠিক

সন্ধের মুখেই চলে এলাম ডিমনাতে।

রোহন বলল, পাহাড়ের কোলে ওই যে দেখছেন বাড়িটা, ওখানেই রামু যাদবের আস্তানা। যদিও ও বাড়িতে ঢুকিনি কখনও, তবুও বাড়িটা চিনি। ডিমনা লেকে একবার পিকনিক করতে এসে দেখেছিলাম বাড়িটা। রুপাদি ওখানেই আছে। কিশোরীলাল ও মদনলালও ওই জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও থাকবে না।

আমি বললাম, রামু যাদবের বাড়িটা চিনে রাখা আমার দরকার ছিল খুবই। কিন্তু রূপা কি সত্যি ওখানে আছে?

রামু যাদবের এই একটাই ঘাঁটি।

বুঝলাম। রূপা মাহেশ্বরীর ব্যাপারে যা শুনেছি তাতে ওর মতো মেয়ে ওই কিশোরীলালের কথা শুনে ওই ধূর্তর ফাঁদে পা দেবে বলে আমার তো মনে হয় না।

অসম্ভবও নয়। কেননা কিশোরীলাল ও মদনলাল প্রকৃতিগতভাবে খল হলেও ওদের কথাবার্তা শুনলে বুঝতেই পারবেন না ওরা খুব একটা বাজে ছেলে বলে। কাজেই ওদের কথায় বিশ্বাস করতেও পারেন রূপাদি।

এখন তাহলে কাজ শুরু করা যাক।

কীভাবে করবেন?

তুমি বরং একটু উদ্যোগী হয়ে দেখো বদ ছেলেদুটো এখানেই আছে কি না।

রোহন কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে।

আমি বেশ কিছুটা দূরে অন্ধকারে লুকিয়ে রইলাম।

ও দরজায় নক করতেই দারোয়ানগোছের একজন প্রবীণ বিহারী লোক দরজা খুলে বেরিয়ে এল। রোহন তাকে কী যেন বলতেই লোকটি অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দিল দূরের দিকে।

ও আবার আমার কাছে এসে আমাকে ইশারায় ডেকে নিয়ে চলল লেকের একটু নির্জনতার দিকে। সেখানে যেতেই দুই মূর্তিমানের সাক্ষাৎ পেলাম।

আমি লুকিয়ে রইলাম একটি গাছের আড়ালে।

রোহন এগিয়ে গেল ওদের কাছে।

রোহনকে দেখেই ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল ওরা। বলল. তুই এখানে?

হ্যাঁ আমি। তোরা কি জানিস, তোদের খোঁজে আজ পুলিশ এসেছিল?

ওরা দারুণ ভয় পেয়ে বলল, সত্যি! কিন্তু কেন?

সেটা তো তোরাই ভাল করে জানবি। রূপাদির মতো মেয়েকে তোরা ওই রামু যাদবের খপ্পরে তুলে দিলি কী বলে?

সত্যি, খুব ভুল হয়ে গেছে রে। না-না ভুল নয়। অমার্জনীয় একটা অপরাধ করে ফেলেছি আমরা।

রূপাদি এখন কোথায়?

জানি না। কাল রাতে রামু যাদবের লোকেরা আচমকা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে কিডন্যাপ করলে একটুও বাধা দিতে পারেনি রুপাদি। কিন্তু পরে এখানে গাড়ি থেকে নামবার সময় হঠাৎই ভয়ঙ্করী মূর্তিতে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন আক্রমণ চালায় যে ওরা এখন মৃত্যু-পথযাত্রী। রুপাদি যে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় সঙ্গে ছুরিও নিয়ে

এসেছিল তা জানত না কেউ। ওর ছুরির ঘায়েই...।

তারপর কী হল?

দলমার ওই ভয়ঙ্কর জঙ্গলের দিকে ছুটে যেতে দেখা গেছে রুপাদিকে।

তোরা কি তখন ধারেকাছে ছিলি?

না। আজ সকালে আমরা এখানে এসে সব শুনলাম। রামু যাদবের কাছে এসেছিলাম আমাদের প্রাপ্য টাকার জন্য। রামু যাদব আমাদের টাকা তো দিলই না উপরন্তু বলল, রূপা মাহেশ্বরীকে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা যেন তাকে বিরক্ত না করি।

রোহন বলল, রুপাদি যে রামু যাদবের খপ্পরে পড়েনি এটা অত্যন্ত ভাল খবর। কিন্তু জয়দীপদাকে খুন করলি কার নির্দেশে?

কিশোরীলাল বলল, মিথ্যে কথা। কে বলল আমরা খুন করেছি?

সোনামানিককেও খুন করেছিস তোরা।

মদনলাল এবার কঠিন গলায় বলল, এত সব তুই কী করে জানলি বল?

কাল রাতেই তোদের দুজনের কথা আমি শুনেছি।

তাহলে তো সোনামানিকের মতো অবস্থা তোরও হওয়া উচিত। না হলে তুই আমাদের ধরিয়ে দিবি। কিন্তু তুই এখানে এলি কী জন্য?

আমি যে সব জেনেছি সেই কথাটা তোদের বলবার জন্যই এসেছি।

তবে তো আর এক মুহূর্ত তোকে বাঁচিয়ে রাখা নয়। বলেই একটা রিভলবার বা পিস্তল জাতীয় কিছু বার করল মদনলাল।

আমিও অঘটন একটা কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই আমার রিভলবার উদ্যত করে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

আমাকে দেখেই চমকে উঠল ওরা, কে!

রোহন বলল, উনি পুলিশের লোক।

কিশোরীলাল ও মদনলাল দুজনেই তখন লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ে। উঠতি মস্তান হলে যা হয়, তাই।

রোহন আমার নির্দেশে মদনলালের হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিল।

কিশোরীলাল বলল, এইরকম খুনখারাপির রাস্তায় যাওয়ার কোনও ইচ্ছেই আমাদের ছিল না স্যার। কিন্তু কী থেকে যে কী হয়ে গেল তা এখনও আমরা ভেবে পাচ্ছি না।

আমি বললাম, কী থেকে যে কী হয়ে গেল সেটাই তো আমি তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চাই।

কিশোরীলাল বলল, সেদিন বিকেলে আমি যখন চায়ের দোকানের আড্ডা থেকে স্টেশনের দিকে আসছি, তখনই রূপাদির গানের স্কুলের দুটি মেয়ের কথোপকথন শুনতে পাই। ওদের একজন বলছিল, 'জয়দা আজই রাতের গাড়িতে কলকাতা যাচ্ছে অনেক টাকা নিয়ে। ওর বোনের অসুখ। তাছাড়া সেখানে নাকি একটা ফ্ল্যাটও কিনবে। বেশ কয়েকলাখ টাকা নিয়ে যাচ্ছে। রূপাদি কত করে বারণ করল, কিন্তু জয়দা শুনল না। সত্যি, দিনকাল যা খারাপ তাতে জয়দা কিন্তু কাজটা ঠিক করল না, কী বল? এখন ভগবান করুন কোনও বিপদ না হলেই হয়।' এই পর্যন্ত শুনেই আমার মাথায় একটা বদমতলব খেলে গেল। আমি সঙ্গে-সঙ্গে মদনলালকে এসে বললাম কথাটা। মদনলাল বলল, এই সুযোগ কোনওমতেই

হাতছাড়া করা নয়। আমি এখনই টাটানগরে চলে যাচ্ছি। স্টেশনে প্রতিটি ট্রেনের দিকেই নজর রাখছি আমি। তুই সোনামানিককে নিয়ে একটুও দেরি না করে চলে আয়। তবে খুব সাবধান। কেউ যেন টের না পায়।

সোনামানিকটা অনেকদিন ধরেই কাজ-কাজ করছিল। তাই এক কথায় রাজি হয়ে গেল। তবে কাজটা যে কী তা অবশ্য সে জানত না। শুধু এটুকু জেনেছিল, এই কাজটা করতে পারলে আমাদের আর কোনও অভাব থাকবে না।

আমরা যখন স্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম তখন দেখলাম মদনলালের মুখ খুশিতে ভরপুর। বলল, কেল্লা ফতে। জয়দীপ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা হয়েছে। উনি ডাউন আমেদাবাদ-হাওড়া এক্সপ্রেসের একটি কুপে ম্যানেজ করেছেন। আমিও যে ওই গাড়িতে যাচ্ছি তা ওঁকে বলেছি। আমি ওঁকে সময়মতো ট্রেনে বসিয়ে যা করবার করব। ট্রেন ছাড়লেই তোরা দুজনে উঠে পড়বি। তারপর লুকিয়ে থাকবি বাথরুমে। আমি ওঁকে ট্রেনে উঠিয়ে আর ট্রেন থেকে নামব না। সময়মতো ডেকে নেব তোদেব।

কিন্তু ধর, চেকার বা পুলিশ যদি ধরে?

তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। তবে এই প্রচণ্ড শীতে ঘুমের ধান্দায় থাকে সবাই। কারও পাত্তা পাওয়া যাবে না।

সেইমতোই কাজ হল। ট্রেন ছাড়তেই আমরা নজর এড়িয়ে ঠিক ঢুকে পড়লাম ট্রেনের বাথরুমে।

খানিকবাদেই মদনলাল এসে ডেকে নিয়ে গেল আমাদের।

গোলমালটা বাধল তখনই। জয়দীপকে দেখেই বেঁকে দাঁড়াল সোনামানিক, এ কী! এ কী করতে যাচ্ছিস তোরা?

আমি বললাম, এখন কোনও ভাবনাচিন্তার সময় নেই। ব্রিফকেসটা তুই নে। নিয়ে বাথরুমে চলে যা। মদনলাল ওঁর জলের সঙ্গে এমন ওষুধ দিয়ে দিয়েছে যে সহজে ঘুম ভাঙবে না ওঁর। ঘুম ভাঙলেও অসুস্থ থাকবেন। আমরা সময়মতো চেন পুলিং করব।

সোনামানিক বলল, তোরা যা করবি কর। আমি এর মধ্যে নেই।

মদনলাল বলল, বেশি সেন্টিমেন্টাল হোস না। বলেই আস্তে করে দরজার লকটা খুলে ফেলল।

আমি বললাম, এখনই চেন পুলিং করবি?

মদনলাল বলল, জয়দীপদা আমাকে দেখেছে। অনেকক্ষণ কথা বলেছি ওঁর সঙ্গে। ওঁর ওয়াটারবটলে জল ভরে দিয়েছি। ওঁকে ট্রেনে উঠিয়ে ওঁর কুপে বসে গল্প করেছি। পরে জ্ঞান ফিরলে এসব কথা যদি উনি পুলিশকে বলেন তখন আমার অবস্থাটা কী হবে একবার ভেবে দেখেছিস? অতএব—।

অতএব কী করতে চাস তুই?

কী যে করতে চায় ও তা আমাদের বলতেই সোনামানিক রুখে দাঁড়াল। আমারও ভয় করছিল না যে তা নয়। তবু ওর কথার একটা যুক্তি আছে ভেবেই আমরা অচৈতন্য জয়দীপদাকে কুপের ভেতর থেকে বার করে আনলাম। ট্রেন তখন কোলাঘাটে রূপনারায়ণের ব্রিজে উঠেছে।

সোনামানিক বলল, তোদের পায়ে ধরছি, তোরা এ কাজ করিস না।

কিন্তু আমরা কোনও কথাই শুনলাম না ওর। জয়দীপদাকে চলন্ত ট্রেন থেকেই ফেলে দিলাম।

এরপর কেমন যেন হয়ে গেল সোনামানিক। ওর দু-চোখে আগুন দেখে প্রমাদ গুনলাম।

আমাদের অবশ্য ট্রেন থেকে নামার জন্য চেন পুলিং করতে হয়নি। মৌড়িগ্রামে ঢোকবার মুখে সিগন্যাল না পেয়ে ট্রেন থামতেই নেমে গেলাম আমরা। সোনামানিক উলটোদিকের দরজা দিয়ে নেমে পালাতে গেল। কিন্তু ভারী ব্রিফকেস নিয়ে ছুটে বেশিদূর পালাতে পারল না। আমাদের নজরে এসে গেল। আমরা ওকে থামতে বললেও ও থামল না। বলল, কাছেপিঠে যদি কোনও থানা থাকে তবে সেখানে গিয়েই থামব।

আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের কার্যকলাপ ওর পছন্দ হয়নি। এবং ধরিয়ে আমাদের দেবেই। তাই নিজেদের বাঁচানোর জন্যই গুলি করলাম ওকে।

আমি, আমিই গুলি করেছি। ঠিক সেই সময় একটি বাড়ির আলো জ্বলে উঠতেই গা-ঢাকা দিলাম আমরা। বুঝলাম আর এখানে থাকলে বিপদের শেষ থাকবে না। কেননা এবার হইচই হবে।

কিশোরীলালের সব কথা জেনে আমি বললাম, ওই আলো আমিই জ্বেলেছিলাম। কিন্তু তোমাদের ওই বন্ধু আর তোমাদের কাউকেই না দেখে আবার ঘরে ফিরে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি তোমাদের বন্ধু আমারই বাড়ির বাথরুমে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে। পরে অবশ্য মরবার আগে জয়দীপ ব্যানার্জি ও পূজা এই দুটো নাম বলতে পেরেছিল।

ওই টাকাগুলোর কথা?

কিছু বলেনি। ওগুলো পরে পেয়েছি।

এখন কি আপনি আমাদের অ্যারেস্ট করবেন?

তোমরাই বলো এই অবস্থায় আমার কী করা উচিত?

মদনলাল বলল, আমাদের দুজনকেই আপনি গুলি করে মারুন। এ জীবন আমরা আর রাখতে চাই না। আমরা যখন দুজনকে হত্যা করেছি তখন দুজনেই আমরা গুলিতে মরি।

আমি বললাম, না। আমার ইচ্ছা তোমরা স্বেচ্ছায় ধরা দাও। তার আগে বলো রামু যাদবকে আমি ধরব কীভাবে?

সে এখন বাড়িতেই আছে। ওর সঙ্গী দুজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। রূপাদি ছুরি দিয়ে এমনভাবে ফাঁসিয়েছে ওদের যে ওরা একজনও বাঁচবে কি না সন্দেহ। সঙ্গীরাও ওখানেই আছে। বড় ডাক্তার এসে সেলাই-টেলাই করেছে। অক্সিজেন চলছে। এই কেস নিয়ে হাসপাতালে গেলে ওরা তো থানার নির্দেশ ছাড়া নেবে না। তাই বাড়িতে চিকিৎসা হচ্ছে।

রূপাদি তাহলে পিকচার থেকে একেবারেই মুছে গেলেন?

মনে হয় তাই। দলমার ওই জঙ্গলে হিংস্র জন্তু-জানোয়াবের বাস। রাতের অন্ধকারে ওখানে যখন ঢুকেছেন তখন ওঁর আর ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আজ সারাদিনে আমরাও জঙ্গল তোলপাড় করেছি। রামু যাদবও হন্যে হয়ে খুঁজেছে কিন্তু কোনও সন্ধানই পায়নি ওর।

এমনসময় অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন বলল, সন্ধান আমি দিতে পারি তোমাদের।

চেয়ে দেখলাম রামু যাদবের বাড়ির সেই দারোয়ান গোছের প্রবীণ লোকটি।

কিশোরীলাল বলল, এ কী মিশিরজি! আপনি?

মিশিরজি বলল, হ্যাঁ আমি। এই সমস্ত কাজ-কাম আমি আর চোখে দেখতে পারি না। মেয়েটিকে কাল রাতে আমিই সরিয়ে দিয়েছি। ওকে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে আমি বিটিয়ার কাছে রেখে এসেছি। বলেছি আমি না বলা পর্যন্ত ও যেন ঘর থেকে না বেরোয়। ও আমার ঘরেই আছে। এখন আপনাদের কথা সব শুনে বুঝলাম ওকে আপনাদের হাতেই তুলে দেওয়া উচিত।

আমি বললাম, আপনি সত্যিকারের একটি ভাল কাজ করলেন মিশিরজি। এখন বলুন এখান থেকে থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কীভাবে?

মিশিরজি বলল, ওই দেখুন।

চেয়ে দেখি অদূরেই একটি পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে।

আমি সকলকে নিয়ে সেখানে যেতেই একজন ইন্সপেক্টর বললেন, আপনিই মিঃ অম্বর চ্যাটার্জি?

হ্যাঁ।

আপনার রিপোর্টের ভিত্তিতেই আমরা এসেছি। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশও আপনার নাম করে আমাদের সাহায্য চেয়েছে। তাই আমরা এদিকে এসেছিলাম। এখন বলুন আমরা কী করতে পারি আপনার জন্য?

আমি কিশোরীলাল ও মদনলালকে দেখিয়ে বললাম, এরাই আসামী। এরা অপরাধ স্বীকার করে স্বেচ্ছায় ধরা দিচ্ছে। এদের অ্যারেস্ট করুন। সেই সঙ্গে নারীহরণের দায়ে অভিযুক্ত রামু যাদব ও তার সঙ্গীদের। আমার এখানে অন্য কাজও আছে। সেটা শেষ করে কিছু সময়ের মধ্যেই আমি থানায় যাচ্ছি।

পুলিশ ওদের দুজনকে সঙ্গে নিয়েই রামু যাদবের বাড়িতে ঢুকল। সেখানে তখন অন্য চিত্র। গুরুতর আহতদের একজন ততক্ষণে একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। আর একজনের দেহে প্রাণটুকুই অবশিষ্ট আছে মাত্র। আর রামু যাদব? পুলিশের আগমনবার্তা টের পেয়েছে। কখন কোন ফাঁকে যে কেটে পড়েছে সে, তা কে জানে?

আমি রোহনকে নিয়ে মিশিরজির সঙ্গে জঙ্গলের কাছাকাছি একটি বস্তিতে গেলাম। রূপা মাহেশ্বরী সেখানেই ছিল।

মিশিরজি রূপার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে যেন বুকে বল পেল ও। নির্ভয়ে চলে এল সে আমাদের সঙ্গে।

ডিমনার চৌরাস্তায় আসতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম আমরা। তাতে করেই থানায় এসে ওর জবানবন্দি লিখিয়ে চলে এলাম স্টেশন এলাকায় আমাদের হোটেলে।

রাতেই সব কথা খুলে বললাম রূপাকে। টাকাগুলো যে আমার হেফাজতে আছে তাও বললাম। সব শুনে ও শুধু একটা কথাই আমাকে বলল, ওর ওই টাকার প্রতি আমার কোনও মোহ নেই। কাল সকালে চলুন আপনার বাড়ি থেকে টাকাগুলো নিয়ে ওর বাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে আসি। ওর বোন পূজার চিকিৎসার জন্য তো অনেক টাকার দরকার।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম রূপার মুখের দিকে। আমার মনে হল রূপা তো শুধুই রূপা নয়, রূপে-অরূপে সে যেন অপরূপা।

পূর্ণগ্রাসের চাঁদ

বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি একজন বয়স্ক ভদ্রলোক সবসময় আমার বাড়ির দিকে নজর রাখছেন। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। এই বয়সের কোনও লোকের মনে বিশেষ কোনও দুরভিসন্ধি থাকা সম্ভব নয়। চোখে চোখ পড়লেই চোখ নামিয়ে অন্যদিকে চলে যান তিনি।

ব্যাপারটা রাখহরিরও নজর এড়ায়নি।

একদিন আমি ধুলাগড় থেকে ফিরছি, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। সন্ধে হতেও খুব বেশি দেরি নেই। দেখি না ভদ্রলোক সেই একইভাবে আমার বাড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন অন্যদিকে।

আমি ঘরে এসে মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিতেই রাখহরি আমাকে কফি আর টোস্ট দিয়ে বলল, 'সেই ভদ্রলোক আবার এসেছেন।'

'কতক্ষণ?'

'অনেকক্ষণ। আমি ছাদ থেকে লক্ষ রাখছি। দেখি না উনি একবার করে আসছেন, বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছেন, আবার চলেও যাচ্ছেন।'

'ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। মনে হচ্ছে উনি বোধহয় কিছু বলতে চান আমাকে।'

'তা হলে সরাসরি বাড়িতে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করেই তো বলতে পারেন।'

'বিষয়টা নিশ্চয় এমনই যে উনি সাহস করে এগিয়ে এসে বলতে পারছেন না।'

'কিন্তু এইভাবে কেউ যখন তখন এসে বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকলে কি ভাল লাগে?'

আমি টোস্টে কামড় দিয়ে দু'এক চুমুক চা খেয়ে বললাম, 'বাইরে বেরিয়ে দ্যাখতো, যদি এখনও থাকেন ভদ্রলোক তা হলে ওঁকে ডেকে নিয়ে আয়।'

রাখহরি বলল, 'কী দরকার? ওঁর প্রয়োজন হলে উনি নিজেই আসবেন।'

'আসছেন না তো। সেইজন্যই তো কৌতূহল হচ্ছে। তাই বলছি তুই একবার যা, গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় ভদ্রলোককে। কিছু না হোক, আলাপ পরিচয় তো হবে। একটু না হয় গল্পই করা যাবে দুজনে।'

আমার আদেশ পেয়ে রাখহরি ডেকে আনল ভদ্রলোককে। ভদ্রলোকের চেহারায় বনেদীয়ানার ছাপ আছে। মাথার সবকটি চুলই পাকা। সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী ও ধুতি পরে আছেন। চোখে রিমলেস চশমা। ভদ্রলোক ঘরে এসে আসনগ্রহণ করে বললেন, 'আপনিই মিঃ অম্বর চ্যাটার্জি?'

'হ্যাঁ আমিই। আপনাকে এই এলাকায় আমি আগে কখনও দেখিনি। তবে বেশ কিছুদিন ধবে লক্ষ করছি আপনি আমার বাড়ির দিকে খুব বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন। তাই

আমার ইচ্ছে হল আপনার সঙ্গে আলাপ করবার। আপনার পরিচয় জানতে পারলে অত্যন্ত খুশি হবো। আরও খুশি হবো আপনি যদি মাঝে মধ্যেই আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়ে চায়ের আসরে যোগ দেন।'

ভদ্রলোক অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, 'আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রিয় সরকারি কর্মচারী। এই এলাকায় যে নতুন ওনারশিপ ফ্ল্যাটগুলো তৈরি হয়েছে তারই একটিতে আমি কিছুদিন হল এসেছি। আমার নাম সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। আপনি এখানকার একজন সৎ সজ্জন নাগরিক। গোয়েন্দাগিরিতেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তাই আপনার সঙ্গে আলাপ করবার খুব ইচ্ছে ছিল। বিশেষ করে আপনাব বাড়িটি নিরালায় এবং বাগানখানিও চমৎকার। শুনেছি আপনি বিয়ে-থা'ও করেননি। বাগানসমেত আপনার এই ছোট্ট বাড়িটি নজর কেড়ে নেয় বলে আমি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকি।'

রাখহরি ততক্ষণে চা নিয়ে এসেছে। ভদ্রলোকের জন্য, আমার জন্যও।

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, 'এবার থেকে আপনি আর বাইরে থাকবেন না। সরাসরি ভেতরেই চলে আসবেন।'

'সে কী! আপনি ব্যস্ত মানুষ। অসুবিধে হবে না আপনার?'

'অন্য কেউ এলে হবে। আপনি এলে হবে না। আমি না থাকি আমাব এই ভাই রাখহরি আছে। ও সবসময় বাড়িতে থাকে। আপনি আসবেন, চা খাবেন, খবরের কাগজ পড়বেন।'

সুধাকান্তবাবু স্মিত হেসে বললেন, 'আপনার সম্বন্ধে লোকমুখে যা যা শুনেছি এখন দেখছি তার এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়।'

আমি বললাম, 'আমার সম্বন্ধে কে কী বলে তা জানি না। যদি কেউ ভাল বলে তবে সেটা আমার গৌরবের। যদি মন্দ বলে সেটা দুর্ভাগ্যের। আপনি এবার কোনওরকম দ্বিধা না করে অকপটে বলুন তো, আপনি কি সত্যই শুধুমাত্র ভাল লাগার কারণেই আমার বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকেন? নাকি আপনার কোনও কিছু বলার আছে আমাকে? যা হয়তো বলব মনে করেও বলতে পারছেন না?'

সুধাকান্তবাবু এবার একটু যেন লজ্জিত হয়ে আমতা আমতা করে বললেন, 'না না। আমার আর কী বক্তব্য থাকতে পারে? ভাল লাগে তাই এদিকে আসি। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকি।'

'আমার কিন্তু তা বলে মনে হচ্ছে না। আপনার চোখমুখ দেখে বুঝতে পারছি একটা চাপা কান্না যেন আপনার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে অথচ আপনি তা প্রকাশ করতে পারছেন না। যদি আপনার সেরকম কোনও বক্তব্য থাকে তা হলে স্পষ্ট করে খুলে বলুন। একটুও দ্বিধা করবেন না। আমি আপনার ছেলের বয়সী।'

সুধাকান্তবাবু মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে স্থির হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

আমি বললাম, 'বুঝেছি। যা অনুমান করেছি তাই। এখন আর চোখের জল নয়। আপনার যা বলবার তা বলে মনের চাপ কমান।'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'আমার মনের চাপ এত প্রবল যে এ আর কমবার নয়। তবু আপনাকে বলে একটু হয়তো হাল্কা হতে পারব, তাই বলি। আমার একমাত্র সন্তান

শুভ্রকান্তি...।'

'কী হয়েছে তার?'

'আজ থেকে বছর দশেক আগে ওর বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েছিল ইলোরার গুহামন্দির দেখতে। প্রথমে ওরা মানমাদে নেমে ঔরঙ্গাবাদে যায়। সেখান দুদিন থেকে ইলোরা দর্শন করে চলে আসে অজন্তায়। সাধারণত বেশিরভাগ যাত্রীই ক্লোকরুমে মাল রেখে অজন্তার গুহাচিত্র দেখে জলগাঁওতে এসে হোটেল অথবা লজে থাকে। ওরা কিন্তু অজন্তাতেই ছিল। অজন্তায় ঠিক নয়, সেখান থেকে দু'কিমি দূরে ফর্দাপুরে। ওদের ব্যাক রিজার্ভেশন ছিল ভূসাওয়াল জংশন থেকে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে। বেলা একটায় ট্রেন। কথা ছিল সকালের দিকে প্রথমেই যে বাস পাবে সেই বাসেই ওরা চলে আসবে জলগাঁওতে। তারপর সেখান থেকে ভূসাওয়াল। কিন্তু ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই ওরা দেখে ঘরের দরজা বাইরে থেকে ক করা। শুভ্র নেই। ওরা অনেক ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি করে যেখানে উঠেছিল সেখানকার লোকজনকে ডেকে তুলে শুভ্রর খোঁজ করে। কিন্তু ওর কোনও সন্ধানই দিতে পারে না কেউ। এদিকে ওইদিনই ওদের ফেরার টিকিট। ছেলেদের হাতে টাকাপয়সাও খুব কম। নেই বললেই চলে। তাই ওরা বাধ্য হয়ে শুভ্রকে না নিয়েই ফিরে আসে। ওর মালপত্তর সবই রেখে আসে ওখানে। কেননা যদি ও বেলায় ফিরে আসে তা হলে যাতে ওর অসুবিধা না হয় তাই।'

আমি বললাম, 'ব্যাপারটা খুব রহস্যজনক। ওরা ওখানকার থানায় কোনও মিসিং ডায়রি লেখায়নি?'

'ওখানে থানা কোথায়? একেবারেই বুনোপাহাড়ি জায়গা। আমি অবশ্য পরে খবর পেয়ে জলগাঁওতে গিয়ে ডায়রি লিখিয়েছি।'

'বন্ধুদের উচিত ছিল ওর ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নেওয়া। এমনও তো হতে পারে একা কোথাও যেতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। অথবা কোনও বন্য জন্তুর শিকার হয়েছে। তা ছাড়া ফোনেও জানাতে পারত আপনাকে।'

'আমার বাড়িতে ফোন নেই, তখনও ছিল না। এখনও নেই। আর ছেলেগুলোকেও খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সকলেই খুব কম টাকাপয়সা নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল। কদিনে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়িয়ে খরচও করেছে যা ছিল তার সবই প্রায়। একমাত্র ফেরার টিকিট এবং দু'একশর বেশি টাকা ছিলও না কারোও কাছে। শুভ্র যদি ঘরের দরজায় ডোরবোল্ট এঁটে না যেত তা হলে ওখানকার লোকজনরা ছাড়ত না ওদের। যেহেতু ওরা গৃহবন্দি, তাই ওরা ছিল সন্দেহমুক্ত। ওরা যে আমার শুভ্রর কোনও ক্ষতি করেনি এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ওরা এসে কান্নাকাটি করে আমার পায়ে ধরে বলে, 'কাকাবাবু, আপনি যেন আমাদের অবিশ্বাস করবেন না। আমরা সত্যি বলছি কেউই জানি না ও কোথায় গেছে। আমাদের কাছে টাকা পয়সা একদম ছিল না তাই, না হলে আমরা ওকে রেখে কখনওই চলে আসতাম না। এখন আপনি যদি ওর খোঁজে যান তাহলে আমরা সবাই আপনার সঙ্গে যেতে রাজি আছি। আমার স্ত্রীর তখন মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা। পুত্রশোকে এমনই কাতর যে তা বলবার নয়। তবুও ছেলের খোঁজে যেতে আমাকে হলই। স্ত্রীও চললেন সঙ্গে। ছেলের বন্ধুদের মধ্যে ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দেবুকে সঙ্গে নিলাম এবং বিনা রিজার্ভেশনে গীতাঞ্জলিতে চেপেই চলে এলাম ভূসাওয়ালে। ওখান থেকে জলগাঁও এসে

বাসস্ট্যান্ডের পেছনে একটা হোটেলে উঠলাম আমরা। তারপর মিসিং ডায়রি লিখিয়ে ফর্দাপুরে গিয়ে ওদের সেই থাকার জায়গার খোঁজখবর নিলাম। গিয়ে শুনলাম নিখোঁজ শুভ্র ওর মালপত্তর নিতেও ফিরে আসেনি। এমনকি স্থানীয় লোকজনরাও ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও হদিশ পায়নি ওর।'

'তার মানে একেবারেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল ছেলেটা।'

'ঠিক তাই। ছেলেটার একটা দোষ ছিল ও বড় বশি ভাবুক প্রকৃতির। আর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের হাতছানি যেখানে, সেখানে ও অন্ধ। ওর মনে কখন যে কী ভাব জাগে তা কেউ জানে না। ভোরে উঠে হয়তো মনে হয়েছে এখানকার পাহাড় পর্বতের রূপ একটু দেখে আসি। তাই কাউকে কিছু না জানিয়েই বেরিয়ে পড়ে এবং তারপরই চরম বিপদটি ঘনিয়ে আসে ওর জীবনে। হয়তো বা বাঘেরই পেটে যায়। কেননা অন্য কোনও দুর্ঘটনা হলে ডেডবডিটা পাওয়া যেত। স্থানীয়রা অবশ্য বন্য জন্তুর আক্রমণের আশঙ্কা করছে না। তাদের বক্তব্য যেকোনও কারণেই হোক ও স্বেচ্ছায় অন্য কোথাও চলে গেছে। নয়তো কোনও দুষ্টচক্র কিডন্যাপ করেছে ওকে। বন্য জন্তুর কবলে পড়লে তার ভুক্ত দেহাবশেষ বা রক্তমাখা জামাকাপড় কোথাও না কোথাও পড়ে থাকত।'

আমি বললাম, 'আমারও ধারণা তাই। তবে স্বেচ্ছায় ও কিন্তু যায়নি। গেলে নিঃসম্বলে যেত না। ওকে অপহরণই করেছে কেউ।'

'দেখতে দেখতে দশ দশটা বছর কেটে গেল। ছেলেটা ফিরে এল না। আদৌ সে বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে? পুত্রশোকে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর জীবন এখন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তবুও বেঁচে আছি যদি কখনও সে ফিরে আসে এই আশায়। যদিও জানি সে সম্ভাবনা খুব কম।' বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'আপনি গোয়েন্দাগিরি করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন, তাই মাঝে মাঝে ভাবতাম একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করে ছেলেটার ব্যাপারে একটু আলোচনা করি আপনার সঙ্গে। আবার ভাবতাম তাতেই বা লাভ কি হবে? ঘটনা এতই পুরনো যে কোনও সূত্রই তো খুঁজে পাবেন না আপনি। সেই যেখানে ওরা রাত্রিবাস করেছিল সে জায়গাও এখন সেরকমই আছে না সেখানে কোনও বড় হোটেল লজ গজিয়ে উঠেছে তাই বা কে জানে? সেইসব লোকজনও হয়তো নেই। দশ বছরে কত পরিবর্তন হয়েছে সেখানকার।'

আমি বললাম, 'দেখুন, তদন্ত ঠিক মতো হলে অনেক জটিল রহস্যেরও উন্মোচন হয়। আপনার ছেলের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আশার আলোও আমি দেখাতে পারছি না। তবে কিনা অজন্তা ইলোরায় আমি বেশ কয়েকবার গেছি। আমার খুবই পরিচিত জায়গা। সর্বশেষ গেছি আমি বছর তিনেক আগে। তাই আরও একবার গেলে আমার মন্দ লাগবে না। আপনি আমাকে আপনার ছেলের নিখোঁজ হওয়ার তারিখ, মিসিং ডায়রির ডেট, যেখানে ওরা রাত্রিবাস করেছিল তার বিবরণ, নাম ইত্যাদি যত শীঘ্র পারেন দিয়ে যান। আর ওর সেই বন্ধুদের প্রত্যেককে নিয়ে আসুন আমার কাছে। ওরা কজন ছিল?'

'আমার ছেলেকে নিয়ে চারজন।'

'তিনজনকেই নিয়ে আসুন তা হলে। অবশ্য যদি সম্ভব হয়। না হলে যাকে পাবেন তাকেই নিয়ে আসুন।'

'দেবুকে পাওয়া যাবে। ও রাজবল্লভ সাহা লেনে থাকে। বাকি দুজনকে পাওয়াই

মুশকিল। ওদের বাড়ি চিনি না। একজনের নাম শঙ্কর। অপরজন বিশু। তবু আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব ওদের নিয়ে আসার।'

সুধাকান্তবাবু আমার কথায় আশার আলো দেখতে পেলেন বোধহয়, তাই প্রফুল্লচিত্তে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন।

রাখহরি বলল, 'এতবড় একটা ঝুঁকি কেন নিতে গেলেন আপনি?'

'ভদ্রলোককে দেখে বড় মায়া হল। যদিও সাকসেসফুল হবো না জানি তবুও একবার একটু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? তাছাড়া জলগাঁও বা অজন্তা আমার খুব প্রিয় জায়গা। ছেলেটার ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে আর একবার না হয় ঘুরেই আসা যাবে জায়গাটা। অজন্তার গুহা, বাঘেরা জলপ্রপাত এখনও আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।'

সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি হয়েছে। আমি আরও একবার চা খেয়ে দূরদর্শনের চ্যানেলে নজর রাখলাম।

পরদিন দুপুরে 'রাজস্থান ভ্রমণ' নামে একটি বইয়ের পাতায় চোখ রেখে মানস ভ্রমণ করছি এমন সময় রাখহরি এসে বলল, 'সেই ভদ্রলোক আবার আসছেন। সঙ্গে কারা যেন।'

আমি বই যথাস্থানে রেখে উঠে গেলাম দরজার কাছে। সুধাকান্তবাবু সস্ত্রীক এসেছেন। সঙ্গে তিন যুবক।

আমি হেসে আমন্ত্রণ জানালাম, 'আসুন সুধাকান্তবাবু। আজ সারাদিন শুধু আপনার কথাই ভাবছিলাম।'

সুধাকান্তবাবু সবাইকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে সোফায়, চেয়ারে যে যার সুবিধামতো বসে বললেন, 'আমার মিসেসকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আপনি একটু আশার আলো দিয়েছেন শুনেই ও ছুটে এসেছে আপনার কাছে। তার চেয়েও বড় কথা আমার ছেলের তিন বন্ধুকে যে এত সহজে পেয়ে যাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। দেবুই অবশ্য নিয়ে এসেছে ওদের। না হলে আমি তো কারও ঠিকানাই জানতাম না।'

আমি বললাম, 'ভালই করেছেন। এতে আমার কাজের অনেক সুবিধে হবে। দশ বছর আগের ঘটনা। কতটা সফল হব তা জানি না, তবু চেষ্টা করব।'

সুধাকান্তবাবুর স্ত্রী আমার হাত দুটি ধরে বললেন, 'এই অভাগিনী মায়ের জন্য একটু কিছু অন্তত করুন। ছেলেটা বেঁচে আছে কি নেই এই খবরটুকু সঠিকভাবে পেলেই মনকে যা হোক কিছু বোঝাতে পারব।'

'আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝি। কিন্তু ব্যাপারটা এতদিনের পুরনো যে এক্ষেত্রে একমাত্র চেষ্টা করা ছাড়া কিছুমাত্র করার নেই। তাই বিন্দুমাত্র আশার আলো আমি দেখাতে পারছি না। যদি সফল হই জানব এক পুত্রহারা পিতামাতার আশীর্বাদ আমি অবশ্যই পাবো।'

সুধাকান্তবাবু এবার তাঁর ছেলের বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। দেবু, শঙ্কর ও বিশু। বেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরের যুবক। তিনটি ছেলেই অনার্স গ্র্যাজুয়েট। দেবু এখন ব্যাঙ্কে চাকরি করছে। শঙ্কর ব্যান্ডেল থার্মালে। আর বিশুর চৌরঙ্গীতে ফোটোর দোকান। শঙ্কর ও বিশু বাজে শিবপুরের দিকে থাকে।

বন্ধুদের হয়ে দেবু বলল, 'দাদা, আপনি তো সবই শুনেছেন। একটা সময় ছিল যখন আমরা চার বন্ধুতে সময় পেলেই কখনও পুরী, কখনও রাজগীর, কখনও বেনারসের দিকে

বেড়াতে যেতাম। কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকে আমরা আর কোথাও যাইনি। আমরা চারবন্ধুতে গেলাম, ফিরে এলাম তিনজন। কাকাবাবু অত্যন্ত ভালমানুষ, তাই আমাদের ছেড়ে দিলেন। অন্য কোনও গার্জেন হলে জীবন বিষিয়ে দিতেন আমাদের। ছেলের অপহরণকারী, হত্যাকারী ইত্যাদি বদনাম দিতেন। আর শুভ্রর কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ। সে যদি নিজের খেয়ালে দরজায় ডোরবোল্ট না এঁটে যেত তা হলে যেখানে আমরা রাত্রিবাস করেছিলাম সেই সাথী লজের লোকেরাই আমাদের সন্দেহ করে পুলিশে দিত। সে সময় আমরা তো কেউ চাকরি করতাম না। প্রত্যেকেই বাবা মায়ের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে হাজার দুই করে টাকা নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সকলেরই পকেট তখন খালি। ট্রেনেও রিজার্ভেশন করা ছিল। তাই বাধ্য হয়েই ওর জন্যে অপেক্ষা করে করে চলে এসেছিলাম। ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম ওর জন্য কিন্তু ও এল না। আমরা চলে আসার কয়েকদিন পরও লজে ফেরেনি ও। কাকাবাবু কাকিমার সঙ্গে গিয়েই মালপত্তর নিয়ে আসি ওর। কাজেই বুঝে দেখুন ওর আশায় টিকিট ক্যানসেল করে আমরা যদি ওখানে থেকে যেতাম তা হলে কী অবস্থা হত আমাদের। লজের ভাড়া দিতে পারতাম না। পেটে খেতে পেতাম না। বাড়িও আসতে পারতাম না। বিপদের শেষ থাকত না আমাদের।'

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। তাই বললাম, 'এক্ষেত্রে তোমাদের উচিত ছিল যার যার বাড়িতে টেলিগ্রাম করা। কিংবা যে কোনও এক জনের ফিরে এসে খবর দিয়ে নতুন করে বেশি টাকা পয়সা নিয়ে আবার যাওয়া। এই ব্যয়ভার অবশ্য ছেলের জন্য সুধাকান্তবাবুকেই বহন করতে হত। না হলে তোমাদের বাড়ির লোক অত টাকা দিতেনই বা কেন? আসলে তোমাদেরও তখন বয়স কম। সিদ্ধান্ত নিতে পারোনি। ভয়ও পেয়েছিলে। তবে চলে এসে ভালই করেছিলে, কেননা থেকে কোনও লাভ হত না।

শঙ্কর বলল, 'তবু সেদিন আমরা কম খোঁজাখুঁজি করিনি। বেলা একটায় ট্রেন। বেলা এগারোটা পর্যন্ত আমরা ওর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেরিয়েছি। তারপর ওর আশা ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।'

বিশু বলল, 'এখন আপনি যদি ওর ব্যাপারে কোনও তদন্ত করেন তা হলে আমরা আপনাকে সবরকমের সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে এখন ফোন এসে গেছে। প্রয়োজনে ডাক দিলেই চলে আসব আমরা। যদিও কাকাবাবু কাকিমা আমাদের নামে কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি তবুও কেমন যেন একটা অপরাধবোধে ভুগছি আমরা।'

সুধাকান্তবাবু ছেলের নিখোঁজ হওয়ার তারিখ, মিসিং ডায়েরির ডেট আমাকে দিলেন। সেইসঙ্গে দিলেন ওর দু'একটি ফোটো। যা আমার খুবই কাজে লাগবে।

দেবু, শঙ্কর ও বিশু ওদের প্রত্যেকের বাড়ির ঠিকানা ও ফোন নম্বর একটা কাগজে লিখে আমাকে দিল।

আমি সেগুলো সযত্নে রেখে সুধাকান্তবাবুকে বললাম, 'এখন আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যেতে পারেন। এই তদন্তের মূল সাহায্যকারী হল এইসব ছেলেরা। এখন আমি ওদের সঙ্গে বন্ধুর তো কতকগুলো বিষয়ে আলোচনা করব। তাতে সময় লাগবে অনেক। অতএব—।'

সুধাকান্তবাবু উঠতে যাচ্ছিলেন। রাখহরি বলল, 'এখনই নয়। আপনাদের জন্য চা বসিয়েছি। চা খেয়ে তারপর যাবেন।'

অগত্যা বসতেই হল।

একটু পরেই চা বিস্কুট নিয়ে এল রাখহরি।

চা পর্ব শেষ হলে সুধাকান্তবাবু সস্ত্রীক বিদায় নিলেন।

ওঁরা চলে গেলে আমি শুভ্রর তিন বন্ধুকে মুখোমুখি বসিয়ে বললাম, 'আচ্ছা, শুভ্রর এই রহস্যময় অন্তর্ধানের ব্যাপারে তোমাদের কী মনে হয়? কেননা বাবা মায়ের চেয়েও কতকগুলো ব্যাপারে বন্ধুরা কিন্তু অনেক বেশি জানে।'

দেবু বলল, 'সে কারণেই বলি ওর ওই ব্যাপারটায় আমাদের স্পষ্ট অস্পষ্ট কোনও ধারণাই নেই। আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত আমরা গল্পগুজব করেছি। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ও নেই। বাইরে বেরোতে গিয়ে দেখি দরজা বাইরের দিক থেকে বন্ধ। আমরা—।'

'বাকিটা একাধিকবার শুনেছি। কাজেই আর না বললেও চলবে। এখন একটাই প্রশ্ন, তোমরা চারজনে বেড়াতে গিয়ে বাইরে কারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় করোনি? কোনও ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে বা সহৃদয় কোনও বাঙালি অবাঙালি পরিবারের সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব হয়নি?'

বিশু বলল, 'হয়েছিল। ইলোরাতেই এক নেপালি পরিবারের সঙ্গে দারুণ বন্ধুত্ব হয়েছিল আমাদের। ওরা কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা। পরিষ্কার বাংলা বলে। স্বামী-স্ত্রী, এক মেয়ে, এক ছেলে। মেয়েটি বড়। আমাদেরই বয়সী। নাম মনীষা। কী দারুণ মিষ্টি মেয়ে। আমরা একসঙ্গে ঘুরেছি। ছবি তুলেছি। ওরা অজন্তাতেও এসেছিল। দেখা হয়েছিল আমাদের সঙ্গে। অজন্তা গুহার কাছে একটি সরকারি রেস্টহাউসে ছিল ওরা।'

আমি বললাম, 'মেয়েটির সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব কি খুব বেশি রকমের হয়ে গিয়েছিল?'

দেবু বলল, 'দারুণ। সত্যি বলতে কি আমাদের বন্ধুদের সকলেরই খুব ভাল লেগেছিল মেয়েটিকে। তবে মেয়েটির সঙ্গে শুভ্রর বন্ধুত্ব হয় সবচেয়ে বেশি। তার কারণ শুভ্র অতি সুন্দর। মেয়েটিও দারুণ। ওদের দুজনের কত ভঙ্গিমায় কত ছবি যে আমরা ধরে রেখেছি তার ঠিক নেই। যেদিন শুভ্র চলে যায় তার আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত আমরা শুভ্রকে মেয়েটির ব্যাপারে রাগিয়েছি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এরসঙ্গে ওর উধাও হয়ে যাওয়ার কোনও সম্পর্ক আছে বলে আমাদের মনে হয়নি।'

'না হওয়াই স্বাভাবিক। সেরকম কিছু ব্যাপার হলে ও ওর জিনিসপত্তর না হোক টাকাপয়সা সামান্য যা কিছু ছিল তা না নিয়ে কখনও যেত না। তবুও আমার কেন জানিনা মনে হচ্ছে ওর অন্তর্ধানের নেপথ্যে ওই নেপালি মেয়েটিই হয়তো একটু ক্ষীণ সূত্র। একটা বয়স আসে যখন অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মনে রাগ-অনুরাগ একটু প্রবলভাবেই দেখা দেয়। ওদের মধ্যে হয়তো এমন কোনও কথাবার্তা হয়েছে যা তোমরা জান না। যদি তোমরা ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হও তাই তোমাদের কাছেও চেপে গেছে সে সব কথা। আসলে টিন-এজটা বড় সাংঘাতিক কিনা।'

শঙ্কর বলল, 'আপনার এই আশঙ্কাটা অমূলক নয়। কিন্তু দাদা, আমি যতদূর জানি ওরা একদিন আগেই বিদায় নিয়েছিল অজন্তা থেকে।'

দেবু বলল, 'এবং সেজন্য শুভ্র খুব মনমরাও হয়েছিল।'

'মেয়েটি কোনও ঠিকানাপত্তর দেয়নি তোমাদের?'

'দিয়েছিল, কিন্তু এতদিনে তা আর মনে নেই।'

বিশু বলল, 'ঠিকানাটা মনে হয় আমার খাতায় নোট করা আছে। কেননা এই ঘটনার মাস ছয়েক পরে মেয়েটির কতকগুলো ছবি আমি ওই ঠিকানায় ডাকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেগুলো ফেরত এসেছিল। শুভ্রর বাবা মাকে অবশ্য আমরা শুভ্রর সঙ্গে ওই মেয়েটির বন্ধুত্বের কথা কখনও বলিনি।'

'সেইসব ছবির কোনও কপি তোমাদের কাছে আছে?'

বিশু বলল, 'আমার কাছেই আছে। অ্যালবাম ভর্তি। শুধু তাই নয়। আমাদের তো ফোটোর দোকান, বাঘেরা জলপ্রপাতের কাছে মেয়েটির অনবদ্য ভঙ্গিমার একটি ছবি বড় করে আমাদের দোকানে সাজিয়েও রেখেছি।'

'ওর কয়েকটা ছবি আমার চাই। আর সেই ঠিকানাটা। এই সূত্র ধরে তদন্ত করে যদি ওর কোনও সন্ধান পাই তো ভাল, না হলে আশা ছেড়েই দিতে হবে।'

দেবু বলল, 'দাদা, একটা কথা তা হলে বলি। যদি ওইরকমই কিছু হয়ে থাকে তা হলে এতদিনেও ও ওর মা বাবাকে একটা চিঠি লিখবে না কেন?'

'দশ বছর আগের সেই রহস্যের জট এত সহজে খুলবে না ভাই। শুভ্র পালিয়েই যাক বা অপহৃতই হোক, সে জীবিত কি মৃত সব কিছুর মূলে আমার কেন জানিনা মনে হচ্ছে ওই মনীষাই। তদন্ত না করে এ ব্যাপারে কোনও কিছুই বলা যাবে না।'

বিশু বলল, 'মনে হচ্ছে এদ্দিনে এই রহস্যের সত্যিই একটা কিনারা হবে। সম্ভব হলে আজ রাতে না হলে কাল সকালেই আমি অ্যালবামের ছবি ও ঠিকানা নিয়ে আসছি।'

আরও একপ্রস্থ চা-পর্বের পর ওরা বিদায় নিল। আমিও বিষয়টি নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলাম।

পরদিন সকালে যখন বাগানে ফুলগাছগুলোর যত্ন নিচ্ছি ঠিক তখনই ওরা তিন বন্ধুতে হাজির হল।

আমি ওদের সমাদরে ঘরে নিয়ে এসে বসালাম। রাখহরিকে বললাম প্রত্যেকের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে। তারপর ওদের নিয়ে আসা সেই অ্যালবামের ছবিগুলো দেখতে লাগলাম এক এক করে।

সুধাকান্তবাবুর দেওয়া শুভ্রকান্তির ছবি কালই দেখেছি। অমন রূপবান ছেলে খুব কমই দেখা যায়। আজ মনীষার ছবি দেখে চোখে আমার পাতা পড়ল না। ইলোরার গুহামন্দিরে, অজন্তায় কোথায় নেই ওরা দুজনে। ছবি দেখে মনে হল কোনও চলচ্চিত্রের শুটিং-এর দৃশ্যে রোম্যান্টিক জুটির ছবি দেখছি। শুভ্রর অন্তর্ধান রহস্যের মূলে যে এই মনীষাই তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

ছবি দেখে বললাম, 'এরপরেও তোমরা বলবে শুভ্রর অন্তর্ধানের সঙ্গে মনীষার কোনও সম্পর্ক নেই?'

দেবু বলল, 'আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে না-ই বলব। তবে কিনা গোয়েন্দার চোখ তো আমাদের নেই। তাই অঙ্কে ভুল হয়ে যাচ্ছে।'

'মনীষার ঠিকানাটা এনেছ?'

শুভ্র একটি ঠিকানা লেখা কাগজ আমাকে দিল। ভবানীপুরে হরিশ পার্কের কাছে একটি বাড়ির ঠিকানা। বললাম, 'কলকাতার মেয়ে!'

'হ্যাঁ। ওইজন্য চমৎকার বাংলা বলে। কিন্তু ওই ঠিকানায় ফোটো পাঠিয়েও তো একদিন দেখলাম, সেগুলো ঠিকানায় লোক না থাকার কারণে ফেরত এল।'

রাখহরি ততক্ষণে প্রত্যেকের জন্য দুটো করে সিঙাড়া ও চা নিয়ে এল। তাই খেতে খেতেই বললাম, 'আপাতত তোমাদেরকে আর কিছু আমার জিজ্ঞাস্য নেই। পরে যদি প্রয়োজন হয় তো ফোনে জানাব।'

ওরা চা খেয়ে বিদায় নিল।

আমি আব সময় নষ্ট না করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতু পার হয়ে চলে এলাম হরিশ পার্কে। বাড়ির নম্বর খুঁজে ঠিক ঠিকানায় গিয়ে দরজায় নক করতেই মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বললেন, 'কাকে চাই?'

'এখানে নরবাহাদুর নামে কেউ থাকেন?'

'না তো।'

'অথচ ঠিকানা দেখছি এই বাড়িরই।'

'আমি এখানে বছর দুই হল ভাড়া এসেছি। আমার আগে ওই নামে যদি কেউ এখানে থেকে থাকেন তা অবশ্য আমার জানা নেই।'

আমি বললাম, 'বাড়ির মালিক কে?'

'উনি দিল্লিতে থাকেন। ওঁর ছেলে বছরে দু'বার এসে বাড়ি ভাড়ার টাকাটা নিয়ে যান।'

আমি একেবারেই হাল না ছেড়ে সামনেব একটি স্টেশনারি দোকানে খোঁজ নিলাম। দোকানের মালিক যিনি তিনিই সেলসম্যান। বললেন, 'এখানে নরবাহাদুব নামে এক নেপালি ভদ্রলোক পরিবার নিয়ে থাকতেন বটে তবে কিনা সে প্রায় বছর দশেক আগে।'

'আমি ওদেরই ব্যাপারে জানতে চাই।'

'কী জানতে চান বলুন?'

'এই যেমন, ওরা কতদিন এখানে ছিল? হঠাৎ করে চলে গেল কেন? এই আর কি।' বলে সংক্ষেপে আমার এত সব জানতে চাওয়ার কারণটাও বললাম ওঁকে।

শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'বুঝেছি।' তারপর বললেন, 'ওঁদের ব্যাপারটাও ঠিক এইরকমই রহস্যময়। নরবাহাদুর অত্যন্ত ভালমানুষ। যদিও নেপালিরা সাধারণত ভালমানুষই হয়। ভদ্রলোক স্ত্রী এবং এক ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে থাকতেন। মেয়েটি ছিল অসাধারণ সুন্দরী। নাম মনীষা। ছেলের নাম উদয়। একবার ওঁরা সপরিবারে অজন্তা ইলোরা বেড়াতে যান। তারপরই এখানকার পাট চুকিয়ে চলে যান নেপালে। এর বেশি অবশ্য আর কিছু আমি জানি না।'

আমারও এর চেয়ে বেশি কিছু জানবার নেই। তাই ঘরে ফিরে এসে কোন সূত্র ধরে যে কীভাবে এগোব সেই নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম। এই চিন্তাভাবনার মধ্যে রহস্যও উঁকি দিতে লাগল মাঝে মাঝে। শুভ্রকান্তি নিরুদ্দেশ হওয়ার পর ওর বাবা মা বন্ধুরা জলগাঁওতে গিয়ে মিসিং ডায়রি লিখিয়ে চারদিক যেমন তোলপাড় করে এসেছেন নরবাহাদুর সেরকম কিছু করেছেন বলে মনে হচ্ছে না। তা যদি হত তা হলে ওখানকার

লোকজনরাই সেকথা বলত সুধাকান্তবাবুকে। কাজেই শুভ্রর সঙ্গে মনীষাও উধাও হয়ে থাকলে ওর বাবা মা কোনও কিছু না করেই ফিরে এলেন কেন? কেনই বা ওঁরা এখানকার পাট চুকিয়ে চলে গেলেন নেপালে? তাই এ ব্যাপারে কোনওদিক থেকে কোনওরকম আশার আলো দেখতে না পেলেও শুভ্রকান্তি অন্তর্ধান রহস্য যে মনীষাকে ঘিরেই তাতে কোনও সন্দেহই রইল না আমার।

আমাকে গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখে রাখহরি আমার সামনে এক কাপ চা রেখে বলল, 'ওদের ব্যাপারে কোনও খোঁজখবর পেলেন না বুঝি?'

'পেয়েছি। কিন্তু তাতেও দেখছি রহস্যের গন্ধ।'

'কীরকম!'

আমি তখন সব কথা খুলে বললাম ওকে।

সব শুনে রাখহরি বলল, 'এই ব্যাপারে আমি এমন একজনকে আপনার কাছে নিয়ে আসছি যে হয়তো আপনাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কে সে?'

'রাজু লামা। এখানকারই একটি কারখানার দারোয়ান। আমারই বয়সী। সম্প্রতি ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। ও খুব গুণী ছেলে। নেপালি জনকল্যাণ সমিতির একজন সদস্য। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে হাওড়া কলকাতায় বসবাসকারী প্রায় সব নেপালিরই নাড়িনক্ষত্র ও জানে। একমাত্র ও-ই পারে ওদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে সবকিছু জানাতে।'

এতক্ষণে একটু যেন আশার আলো দেখতে পেয়ে আমি বললাম, 'তুই শিগগির ওকে ডেকে নিয়ে আয়। কেননা মনের উত্তেজনাকে আমি আর চেপে রাখতে পারছি না।'

রাখহরি কোনও কথা না বলে চলে গেল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বেঁটেখাটো চেহারার এক নেপালি যুবককে নিয়ে এল।

রাখহরি বলল, 'এই হচ্ছে সে। এর নাম রাজু লামা। একে আপনি সব কথা বলতে পারেন।'

রাজু লামা অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও লাজুক প্রকৃতির যুবক। আমি ওকে আগাগোড়া সব কথা বলে ওই মনীষাদের ব্যাপারে বিশদ জানতে চাইলাম। এমনকি এও বললাম, সম্ভব হলে ও যেন ওদের নেপালের ঠিকানাটাও জোগাড় করে দেয়।

রাজু একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, 'আজ সন্ধের মধ্যেই খবরটা পেয়ে যাবেন আপনি। কেননা-এই নামের একজন লোক আমাদের নেপালি ভাষার পত্রিকা বিহানীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আর ওই মনীষা নামের একটি মেয়েও আমাদের বার্ষিক উৎসবে নাচগান করত। তবে কিনা দীর্ঘদিন তাদের কোনও খোঁজখবর নেই।'

আমি বললাম, 'তোমার আশায় আমি পথ চেয়ে রইলাম তা হলে!'

রাজু চলে গেলে আমি স্নানাহার সেরে আমার তদন্তের কাজ কীভাবে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে যাব সেই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল এবং বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এল। আমি অধীর আগ্রহে রাজুর প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

রাজু এল ঠিক সন্ধের পরই। এসে বলল, 'আমার আসতে দেরি হল বলে কিছু যেন

মনে করবেন না। আপনার ও ব্যাপারে খোঁজ নিতে আমাকে একবার একবালপুর যেতে হয়েছিল।'

আমি আশান্বিত হয়ে বললাম, 'কাজের কাজ হল কিছু?'

'না। আপনি যার খোঁজ করছেন সেই নরবাহাদুর বছর দুই আগে নেপালেই মারা গেছেন। ওঁর স্ত্রী গত হয়েছেন আরও আগে। ছেলেটা বেপাত্তা। মনীষারও কোনও সংবাদ নেই।'

আমি বললাম, 'তা হলে শেষ চেষ্টা হিসেবে আমাকেই একবার জলগাঁও যেতে হচ্ছে।'

রাখহরি বলল, 'যাবেন। তবে কিনা অজন্তার গুহামন্দির দেখা ছাড়া বিশেষ কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না।'

আমি বললাম, 'অজন্তায় যেতে পারাটাই তো মস্ত একটা লাভ।'

'যাচ্ছেন কবে?'

'কালই।'

রাজু বিদায় নিলে রাখহরি আমার স্যুটকেস গুছিয়ে রাখল।

আমিও বেশি রাত না করে খাওয়া দাওয়া সেরে দশটার মধ্যেই শুয়ে পড়লাম।

পরদিন তৎকালে টিকিট কেটে চেপে বসলাম গীতাঞ্জলিতে। আমি জলগাঁও গেলে গীতাঞ্জলিতেই যাই। জলগাঁওতে গীতাঞ্জলির স্টপেজ নেই। তাই ভূসাওয়ালে নেমে বাসেই চলে যাই জলগাঁও। সেখানে বাসস্ট্যান্ডের গায়ে যে লজটা আছে সেখানেই উঠি।

যেদিন গিয়ে পৌঁছলাম সেদিন ঘুরে বেড়ানোর কোনও অবকাশ রইল না। তাই পরদিন সকালে চা-পর্ব শেষ করে সরকারি বাস যোগে প্রথমেই চলে গেলাম অজন্তায়। প্রিয় স্থান আমাব। যতবার আসি ততবারই নতুন বলে মনে হয়। ততবারই বিস্ময়ের চোখে দেখি এখানকার প্রকৃতিকে। এবারও তাই দেখছি আর ভাবছি আজ থেকে বছর দশেক আগে এখানে যে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছিল আজ এতদিন বাদে সেই রহস্যকে ধোঁয়াশামুক্ত করা কি আমার পক্ষে সম্ভব? কোথাও কোনও সূত্র নেই। এতটুকু আশার আলোও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। অথচ সুধাকান্তবাবু ও তাঁর স্ত্রী অনেক আশায় বুক বেঁধে একমাত্র সন্তানের একটু খোজখবর পাবার জন্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। যদিও আমি কোনও প্রতিশ্রুতি দিইনি তবুও আমি বেশ বুঝতে পারছি এবারেই হবে আমার প্রথম পরাজয়। কেননা এই রহস্যের যবনিকা উন্মোচন করা আমার পক্ষে কখনওই সম্ভব হবে না।

অজন্তা দেখে জলগাঁও-এর পথে পাঁচ কিমি দূরে চলে এলাম ফর্দাপুরে। ওরা যেখানে উঠেছিল ঠিকানা খোঁজ করে সেখানেই এলাম। সেইসব পুরনো দিনের কর্মচারীরা সেখানে তেমনই বহাল আছে। আমি তাদের সঙ্গে আলাপ করে সেদিনের সেই রহস্যময় অন্তর্ধানের ব্যাপারে শুরু করলাম অনুসন্ধান। কিন্তু কোনও লাভই হল না। সবাই দেখলাম সেই আগের মতোই রহস্যের অন্ধকারে।

পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে শেষ চেষ্টাতেও বিফল হয়ে আবার অজন্তাতেই ফিরে এলাম আমি। জলগাঁও গিয়ে লজের শয্যায় আরাম করার চেয়ে এখানকার গুহামন্দিরে পড়ে থাকা অনেক ভাল। তাই গুহায় ফিরে বাঘেরা জলপ্রপাতের কাছে নির্জনে বসে যখন

মনীষার ফোটোগুলো স্পটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি তখনই এক সুরেলা কণ্ঠস্বর আমার কানে এল, 'শুনিয়ে।'

আমি তন্ময়তার ঘোর কাটিয়ে ফিরে তাকিয়েই দেখি বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশের এক তরুণী বাঘেরার জলপ্রপাতকে ক্যামেরাবন্দি করতে এসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই বলল, 'আপনি বাঙালি?'

'হ্যাঁ। আপনার পরিচয়?'

'আমার নাম সুজাতা শর্মা। জার্নালিস্ট। বাঙালি নই কিন্তু বাংলা জানি। উজ্জয়িনীর বাসিন্দা। আমাদের ওখানকার একটি ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকার সঙ্গে আমি যুক্ত। এই নির্জনে আপনাকে এইভাবে বসে থাকতে দেখে বিশেষ করে আপনার হাতে আপনার নায়িকার ওই ছবিগুলো দেখে আমি কিন্তু লোভ সামলাতে পারলাম না। তাই যেচেই আলাপ করলাম।'

আমি হেসে বললাম, 'অজন্তার নির্জনে এমন রমণীয় পরিবেশে আপনার মতো একজন সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার লোভ কি আমিই সামলাতে পারি? তাই সাদর আমন্ত্রণ জানাই আপনাকে। বসুন না এখানে। এই বাঘেরা জলপ্রপাতের সামনে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলি।'

জার্নালিস্ট তরুণী সুজাতা শর্মা স্মিত হেসে আমার পাশেই বসল। জিনসের প্যান্ট ও গোলাপী টাওয়েল গেঞ্জি পরা অত্যন্ত স্মার্ট মেয়ে। বলল, 'আপনি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছেন, না? কেনই বা আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই, কেনই বা সম্পূর্ণ অজানা অচেনা একজনের পাশে এত সহজ হয়ে বসে পড়লাম এই ভেবে?'

'মোটেই না। এটাই তো স্বাভাবিক। বন্ধুত্বের কোনও বয়স নেই, স্থানকাল নেই।'

'থ্যাঙ্কস। এখন আপনার নায়িকার এই ছবিগুলো আমি কি একবার হাতে নিয়ে দেখতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন। তবে কিনা আপনার অবগতির জন্য জানাই যার ছবি আমি দেখছিলাম বা এখন আপনি দেখছেন সে আমার নায়িকা নয়। বোনের মতো। বয়সের ফারাক দেখে বুঝতে পারছেন না?'

'তাতে কি বোঝা যায়? আজ আপনি একজন হ্যান্ডসাম ইয়ংম্যান। আপনারও তো কৈশোর ছিল। অতীত ছিল। যার ছবি এমন করে আপনি দেখছেন সে আপনার প্রথম দেখার স্মৃতিও হতে পারে। এখানে বেড়াতে এসেই হয়তো তার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল। তাকে ক্যামেরাবন্দিও করেছিলেন আপনি। পরে যা হয়, ফেলে আসা দিনগুলো বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায় মানুষের মন থেকে। এতদিন পরে আবার সেই পুরনো জায়গায় ফিরে এসে হয়তো তাকেই স্মরণ করে আজ আপনি তার স্মৃতিমন্থন করছেন এখানে এই নির্জনে বসে।'

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'অপূর্ব।'

'কে?'

'আপনি। আপনার মানসিকতা। সুন্দরভাবে গুছিয়ে যুক্তিপূর্ণ কথা বলার ক্ষমতা।'

সুজাতা বলল, 'আপনার হাতে এই ছবিগুলো দেখে আমি কিন্তু আর নিজেকে স্থির রাখতে পারছি না। কী দারুণ শিল্পদৃষ্টি নিয়ে এই ছবিগুলো তুলেছিলেন আপনি। নেপালি

এই মেয়েটির মতো রূপ আমার নেই। তবুও আমার ইচ্ছে করছে ওই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওর মতো করে আমার কতকগুলো ছবি তুলতে। আশা করি আপনি আমার সেই আশা পূর্ণ করবেন।'

'নিশ্চয়ই করব। তবু বলি এইসব ছবির একটিও আমার তোলা নয়। তবে আমি চেষ্টা করব মনের মতো করে আপনার কয়েকটা ছবি তুলে দিতে। এমনও হতে পারে প্রকৃতির এই দৃশ্যপটে আপনি হয়তো আরও বেশি মানানসই।'

'কী বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি। আপনি নেপালসুন্দরী না হলেও অবন্তীসুন্দরী তো বটেই।'

সুজাতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

এরপর ওর আমার দুজনেরই মনোমতো স্থানে ওর অনেকগুলো ছবি তুললাম। বিশেষ করে মনীষার স্পটে মনীষার ভঙ্গিমায় চার পাঁচটা ছবি তুলে রাখলাম ওর। সবই অবশ্য ওর ক্যামেরায়। কেননা আমার সঙ্গে তো ক্যামেরা ছিল না।

ছবি তোলা শেষ হলে আমরা আবার এসে যথাস্থানেই বসলাম। সুজাতাকে বললাম, 'জানি না আপনার ছবি কেমন হল। আপনার মনোমতো হবে কিনা তাও জানি না। তবু অনুরোধ, যদি আমাকে একেবারেই ভুলে না যান তা হলে প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ আমার তোলা প্রত্যেকটি ছবির একটা করে কপি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।' বলে নেম কার্ড একটা এগিয়ে দিলাম ওঁর দিকে।

কার্ডের ওপর চোখ বুলিয়েই সবিস্ময়ে সুজাতা তাকাল আমার দিকে, 'অম্বর চ্যাটার্জি! প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর!'

'হ্যাঁ। এটাই আমার পরিচয়।'

'বুঝেছি। আপনি নিশ্চয়ই কোনও তদন্তের ব্যাপারে এখানে এসেছেন? এবং যা কিছু রহস্য তা নিশ্চয়ই ওই মেয়েটিকে নিয়ে?'

'ঠিক তাই। শুধু মেয়েটি নয়, সেই সঙ্গে ছেলেও আছে একটি।' বলে শুভ্রর ছবিও দেখালাম ওকে। ওদের দুজনের একসঙ্গে তোলা ছবিও দেখালাম।

সুজাতা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'যদি বলতে আপত্তি না থাকে তা হলে জানতে পারি, ব্যাপারটা কী?'

'আপনি একজন জার্নালিস্ট। কাগজের সঙ্গে যুক্ত। এসব কথা আপনাকে ছাড়া কাকেই বা বলা যায়?'

'তা হলে এক কাজ করুন, এই নির্জনে এভাবে বসে না থেকে চলুন ওধারে কোথাও গিয়ে একটু চায়ের ব্যবস্থা করা যাক।'

বললাম, 'তাই চলুন। এসময় একটু চায়ের সত্যই প্রয়োজন ছিল। চা খেতে খেতেই বরং মেজাজ নিয়ে আলোচনাটা করা যাবে।'

আমরা আর বসে না থেকে গুহামন্দিরের এলাকা ছেড়ে বাইরে এলাম। তারপর একটি দোকানে বসে কিছু স্ন্যাক্‌স্‌সহ চা খেয়ে যখন দাম দিতে যাচ্ছি তখন সুজাতাই বাধা দিল। বলল, 'এটা আমাকেই দিতে দিন। কেননা চায়ের অফারটা আমিই দিয়েছিলাম আপনাকে।'

সুজাতার ব্যবহারে, কথাবার্তায় এমন এক আন্তরিকতা ও সাবলীলতা ছিল যা

আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করল। আমি পকেটে হাত দেবার আগেই একটা একশ টাকার নোট বার করে বলল, 'একটু পরে আরও দু'কাপ চা আর দুপুরের জন্য দুটো মিল বলাইদাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো কেমন?'

'কখন্ পাঠাবো বলুন, বারোটা-একটা?'

'একটা দেড়টা নাগাদ দিলেই হবে।' বলে আমাকে বলল, 'আসুন, আমার ঘরে আসুন। ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। মন খুলে কথাবার্তা বলা যাবে।'

'তাহলে দুটো মিলের অর্ডার দিলেন যে!'

'বাঃ রে। আমার ঘরে অতিথি হয়ে আপনি কি সারাটা দিন না খেয়ে থাকবেন?'

এই মুহূর্তে সুজাতাকেও আমার দারুণ রহস্যময়ী বলে মনে হল। ওর সঙ্গে নদী ও পাহাড়ের গা বেয়ে এক দারুণ মনোরম পরিবেশে ছোট্ট একটি দোতলা বাড়ির কাছে এসে থামলাম।

'এই আপনার বাড়ি?'

'না না। আমার বাড়ি কেন হবে? এই বাড়িটা ছিল প্রভাকর জৈনের। পরে মানমাদেব এস.কে. পাতিল বাড়িটা কেনেন। তিনি আমার বাবার এক বিশেষ বন্ধু। মাঝে মাঝে নির্জনে ছুটি কাটাতে এখানে আসেন। বাড়ি দেখাশোনার জন্য রকেট নামে একজন কর্মচারী আছে। আমি যখন তখনই এখানে এসে হাজির হই। থাকি বড়জোর দু'চারটে দিন। ঘন ঘন এখানে এসে এমনই হয়েছে যে এই বাড়ি আমাব নিজেরই বাড়ি হয়ে গেছে। ভগবান যদি দিন দেন আর ওরাও যদি রাজি থাকেন তা হলে আমাব খুব ইচ্ছে বাড়িটা কিনে নেবার। তবে নিজে রান্না করে খাওয়া আমার পোষায় না, তাই দোকান থেকেই খাবার আনিয়ে নিই। যে দোকানে খাবারের অর্ডার দিলাম ওরা দুজনেই বাঙালি। তবে মালিক নয়, কর্মচারী। প্রায় কুড়ি বছব একভাবে এখানে আছে।'

আমি মন্ত্রমুগ্ধর মতো সব শুনে যেতে লাগলাম। একসময় দোতলায় উঠে ওর ঘর দেখে বারান্দায় এলাম। সুজাতাও এল। বলল, 'জানেন নিশ্চয়ই, ওই যে দেখছেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়টা, ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ওই পাহাড়ের ওপর শিবির স্থাপন করে থাকা একদল ইংরেজ সৈন্যই বাইনোকুলার দিয়ে দেখতে দেখতে আবিষ্কার করে বাঘেরার তীরে অশ্বক্ষুরাকৃতি অজন্তার গুহামন্দিরগুলোকে।'

'জানি। তারপর ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ জেমস ফার্গুসন নামে এক সাহেব পথঘাট জেনে অজন্তা দর্শন করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তখনই টনক নড়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের। তারপর থেকেই মানুষের পদচিহ্ন পড়তে থাকে এখানে। সত্যি, কী উপকার যে করে গেছেন ওঁরা।'

'আসুন, ঘরে এসে বসুন।'

ছোট্ট ঘর। কিন্তু কী সুন্দর সাজানো গোছানো। এমন পরিবেশে এমন ঘরে দিনের পর দিন থাকলেও মনের তৃষ্ণা বোধ হয় মিটবে না।

একটু পরেই সুজাতার নির্দেশে বলাইদা চা নিয়ে এলেন। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। বেশ শান্ত সৌম্য মূর্তি। বলাইদা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলে আমিই বললাম, 'আমাকে খুব চেনা চেনা লাগছে তাই না বলাইদা?'

'হ্যাঁ, সেরকমই মনে হচ্ছে।'

'আসলে আমি এখানে বেশ কয়েকবার এসেছি। আপনাদের দোকানে বসে চা-টাও খেয়েছি। আপনার চেহারা দেখে বা হিন্দি শুনে কখনও আপনাকে বাঙালি বলে মনে হয়নি। আজই এখানে এসে আপনার পরিচয় পেলাম।'

'আসবেন মাঝে মাঝে।' বলে চলে গেলেন।

এরপর চা খেতে খেতে আমি শুভ্র ও মনীষাকে কেন্দ্র করে আমার সন্দেহের কথা ও সেই অন্তর্ধান রহস্যের কাহিনী সবই সবিস্তারে গুছিয়ে বললাম সুজাতাকে।

সুজাতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সব শুনে বলল, 'এ ব্যাপারে আমি কি আপনাকে কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন। কারণ আমি বেশ বুঝতে পারছি এই রহস্যকাহিনীর জট আমার একার পক্ষে খোলা অসম্ভব।'

'তা হলে প্রাথমিকভাবে একটা কাজ এখনই সেরে নেওয়া যাক, কী বলুন?'

'কীরকম?'

'মনীষারা তো এখানকারই রেস্টহাউসে উঠেছিল। শুভ্রর বন্ধুরা বলছে ওরা নাকি আগের দিনই রেস্টহাউস ছেড়ে চলে যায়, তাতেই শুভ্র খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। এখন ওদের বক্তব্য কতটা সঠিক তা একবার মিলিয়ে দেখা যাক। প্রথমেই আমরা রেস্টহাউসে গিয়ে তারিখটা একবার মিলিয়ে দেখি। এখানকার সবাই আমাকে চেনে। তাই খাতাপত্তর দেখতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

'দারুণ হয় তাহলে। চলুন তো দেখি।'

আমরা সেই মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে নেমে এলাম নীচে। তারপর পাহাড় ও নদীর খাত ধরে চলে এলাম গুহামন্দিরের কাছে সরকারি রেস্টহাউসে। এখানকার কেয়ারটেকার ওমপ্রকাশ সাহু কয়েক বছর হল এখানে এসেছেন। তবে সুজাতাকে বেশ ভালই চেনেন। তাই প্রশান্তবদনে অভ্যর্থনা করলেন আমাদের।

সুজাতা আসল প্রসঙ্গ না তুলে পুরাতন সালের সেই খাতা দেখতে চাওয়ামাত্রই একটি জাবদা রেজিস্টার বার করে দেখিয়ে দিলেন। সাল তারিখ সবই তো আমাদের জানা। তাই খাতার পাতা ওলটাতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। যে তারিখে শুভ্রর অন্তর্ধান হয়, ঠিক তার আগের দিনই সকাল আটটার সময় মনীষারা রেস্টহাউস ছেড়ে চলে যায়।

সুজাতা রেজিস্টার রেখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা হলে?'

'তা হলে বোঝাই যাচ্ছে ওদের দুজনকে ঘিরে আমি যে সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেছিলাম তা ভুল। অর্থাৎ শুভ্রর অন্তর্ধানের নেপথ্যে কোনও দুষ্টচক্রের হাত আছে। অথবা কোনও হিংস্র জন্তুর কবলেই পড়েছে সে। আর মনীষার অন্তর্ধানটা স্রেফ অপহরণ ছাড়া কিছু নয়। এবং সেটা হয়েছে ওরা চলে যাবার পর অন্য কোথাও অন্য কোনওখানে। তাই এখানকার পুলিশের খাতায় ওর নামে কোনও মিসিং রিপোর্টও লেখা নেই।'

সুজাতা বলল, 'ব্যাপারটা হয়তো এইরকম। তবে এত সহজে এই অঙ্ক মিলবে না মিঃ চ্যাটার্জি। মেয়েদের আপনি কতটুকু চেনেন? বিশেষ করে টিন-এজের মেয়েদের অসাধ্য কিছুই নেই। এমনও তো হতে পারে শুভ্রকে তার খুবই ভাল লেগেছে বলে ওর সঙ্গে দেখা করতে সে পালিয়ে এসেছিল এখানে। তারপর ভোরের আলোয় দুজনের দেখাসাক্ষাতের পর কোনও একটা সিদ্ধান্তে এসে দুজনেই উধাও হয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'এইরকমই হওয়া সম্ভব। তবুও মনে প্রশ্ন জাগে সে রাতে সে ছিল কোথায়? ওইদিন ভোরে শুভ্র যদি বাইরে না বেরত তা হলে ওরা উধাও হত কীভাবে? ধরা যাক, ওদের মধ্যে একটা গোপন বোঝাপড়া ছিল। তা যদি হয় তা হলে শুভ্র কোনও কিছু না নিয়ে একবস্ত্রে চলে যাবে কেন? আর কেনই বা এতদিনে সে বাড়িতে একটা চিঠিও লিখল না?'

সুজাতা বলল, 'গোয়েন্দার চোখে এই যে খুঁটিনাটি দিকগুলোর প্রতি আপনি আলোকপাত করেছেন তা খুবই যুক্তিপূর্ণ। তবুও আমি কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়ছি না। এই রহস্যের কিনারা একটা করতেই হবে। এখন চলুন ঘরে গিয়ে স্নানাহারের পর্বটা চুকিয়ে নিয়ে দুপুরবেলা এই ব্যাপারে একটু মাথা ঘামানো যাক। আমি অনেক গোয়েন্দা গল্পের বই পড়েছি কিন্তু এমন রহস্যের কাহিনী কখনও পড়িনি, শুনিওনি।'

আমরা আবার ফিরে এলাম ঘরে। অপরিচিতা ও অনাত্মীয়া কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক এই প্রথম। শুধু ওর মধুর ব্যবহারের জন্য ওকে খুব সহজভাবে মেনে নিতে পারলাম। বাড়তি জামা কাপড় না থাকার কারণে স্নানের সময় একটু অসুবিধে হলেও সেটা ম্যানেজ করে নিলাম।

ঠিক একটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বলাইদা খাবার নিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'রাতের মিলটা কখন পাঠাবো?'

সুজাতা বলল 'আটটা নাগাদ পাঠিও।'

আমি বললাম, 'একটা মিল কিন্তু। আমাকে সন্ধের আগেই ফিরে যেতে হবে। জলগাঁওয়ে বাসস্ট্যান্ডের গায়ে লজে আছি তো।'

সুজাতা বলল, 'আপনি যে কাজের জন্য এখানে এসেছেন তাতে জলগাঁওয়ে থাকলে কোনওকিছুই করে উঠতে পারবেন না। খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আপনি চলে যান। সন্ধের আগেই আবার ফিরে আসুন। বাসের আশায় থাকবেন না। একটা হিরো-হোন্ডার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, নিয়ে যান। এখানে আরও ঘর আছে। রাজুকে বললেই খুলে দেবে।'

'রাজু কে?'

'ওঃ হো। রাজুর সঙ্গে তো আপনার পরিচয়ই হয়নি। ও এ বাড়ির দেখাশোনা করে। আজ সকালে বিশেষ কাজে ও গেছে ঔরঙ্গাবাদে। বিকেলেই ফিরে আসবে।'

বলাইদা আমার দিকে তাকিয়ে সুজাতাকে বললেন, 'উনি কী কাজে এসেছেন এখানে?'

'পরে তোমাকে সব বলব। উনি জলগাঁও থেকে ফিরে আসুন। সন্ধের পর তো তোমার কোনও কাজ থাকে না। ট্যুরিস্টের সংখ্যাও এখন খুবই কম।'

বলাইদা চলে গেলেন। খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আমিও চলে গেলাম জলগাঁওতে। বলাইদা প্রেমজি নামে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে একটা হিরোহোন্ডা ম্যানেজ করে আমাকে দিলেন। আমিও সন্ধের আগেই ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ ফিরে এলাম।

সন্ধের পর ঘন অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে গেলে এই জায়গাটা কী ভয়াবহ হয়ে ওঠে তা একরাত এখানে যে না থেকেছে সে কল্পনাও করতে পারবে না।

সুজাতার ঘরের পাশেই আমার থাকার জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছে রাজু। বছর পঁচিশের এক নম্র ভদ্র যুবক। প্রথম পরিচয়েই ও জানাল এরপর কখনও এখানে এলে এই বাড়ি ছাড়া যেন অন্য কোথাও না উঠি। মালিকরা এখানে আসেন না। এলেও ওর পরিচিত কারও ঘরের অভাব হবে না। নীচে ওপরে করে মোট চারখানি ঘর।

আমরা অন্ধকারে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলাম। রাজু আমাদের চা তৈরি করে খাওয়াল। ও তো বারোমাস থাকে, তাই রেঁধেই খায়। সব সরঞ্জামই ছিল ওর। তাই অসুবিধে হল না।

চা খেতে খেতে সুজাতা বলল, 'জলগাঁওতে থাকলে রাতের অজন্তার এমন রূপ দেখতে পেতেন? চাই কি একটু পরে বাঘের দেখাও মিলতে পারে। বনশূয়োর, ভালুকও অনেক আছে এখানে। ওই পাহাড় থেকে নেমে আসে।'

রাত আটটা নাগাদ বলাইদা একটি ছেলেকে সঙ্গে করে খাবার নিয়ে এলেন। রুটি আর ভেড়ার মাংস।

আমাদের খাওয়া শেষ হলে ছেলেটি প্লেট নিয়ে চলে গেল।

আমরা গুছিয়ে বসে আলোচনা করতে লাগলাম আমাদের সমস্যা নিয়ে। রাজুও এসে বসল আমাদের পাশে।

আমি আগাগোড়া সব কথা খুলে বললাম।

বলাইদা সব শুনে কেমন যেন অনমনস্ক হয়ে শূন্যদৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন।

সুজাতা বলল, 'তুমি তো এখানে কুড়ি পঁচিশ বছর আছ বলাইদা, কিছু কি মনে করতে পারছ?'

বলাইদা কিছু বলার আগে রাজুই বলল, 'ও দোনো জিন্দা হ্যায়।'

বলাইদা ধমকে উঠলেন, 'জিন্দা হ্যায় বললেই হল? তুই জানিস কাদের কথা হচ্ছে না হচ্ছে?'

'লালজি নে হমকো সব কুছ বতায়া।'

বলাইদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ভেবেছিলাম আসল সত্য কারও কাছে প্রকাশ করব না। এখন দেখছি না বললেই নয়।'

সুজাতা আমি দুজনেই উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'কোনওরকম দ্বিধা না করে বলেই ফেলুন ব্যাপারটা কী।'

বলাইদা বললেন, 'মেয়েটির বাবা মা দুজনেই তা হলে মারা গেছেন? ভাইটা বেপাত্তা?'

'এরকমই শুনেছি।'

'ছেলেটির মা বাবা তা হলে এখনও বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ। ওঁরা আমার প্রতিবেশী।'

বলাইদা বললেন, 'শুনুন তা হলে সেদিনের ঘটনা। আমরা অনেকেই জানি কিন্তু কাউকে বলি না। তা ছাড়া আজ এতদিন বাদে ও নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। ওই নেপালি মেয়েটি, মনীষা। ওরা তো এখানকার রেস্টহাউসে ছিল, চলেও গেল। হঠাৎ দেখি মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে রাত্রিবেলা এখানে এসে হাজির। এসে আমাদের সকলের হাতে-পায়ে

ধরতে লাগল এক রাত এখানে থাকতে দেবার জন্য। রেস্টহাউসে তো জায়গা মিলল না। তাই বাধ্য হয়ে আমাদের দোকানে ওর থাকার মতো একটু ব্যবস্থা করে দিলাম। ওকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম ও স্বেচ্ছায় ওর বাবা মা'র কাছ থেকে চলে এসেছে। তার কারণ কোনও একটি ব্যাপারে ওর ইচ্ছাপূরণে ওর বাবা মা বাধা দেন। এমনকি মারধোরও করেন ওকে। তাই ও আত্মঘাতী না হয়ে এখানে চলে এসেছে। কাল সকালে ও কোনও একজনের সঙ্গে দেখা করে যা হোক একটা সিদ্ধান্ত নেবে। এই কোনও একজনটি যে কে তা ও ম বুঝতে পেরেছিলাম। তার কারণ অনবরত ওই ছেলেদের দলে বিশেষ একজনের সঙ্গে ওকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলাম। যাই হোক, মেয়েটিকে আশ্রয় তো দিলাম। তবে কিনা নজরেও রাখলাম। পরদিন ভোরেই দেখি মেয়েটি ফর্দাপুরের দিকে হাঁটা শুরু করেছে। আমি ভিকিপ্রসাদ নামে একজনকে সঙ্গে নিয়ে অনুসরণ করলাম মেয়েটিকে। ভিকিপ্রসাদের হাতে একটা ধারালো কুঠার ছিল। কেননা এত ভোরে পথঘাটও তো নিরাপদ নয়। চারদিকে জঙ্গল। হিংস্র জন্তুরা এসময় ধারেকাছেও থাকতে পারে। বিপদ হতে পারে মেয়েটির। যাই হোক, মেয়েটি যেন কেমন এক উন্মাদনায় এগিয়ে চলল রাজপথ ধরে। আমরা যে ওকে দূর থেকে অনুসরণ করছি তা ও টেরও পেল না। হঠাৎই একসময় দেখি সেই রাজপুত্তুরের মতো ছেলেটি আসছে। ছেলেটির মেয়েটিকে দেখে দু'চোখে বিস্ময়। বলল, 'একী! মনীষা তুমি!'

সুজাতা আমি দুজনেই মন্ত্রমুগ্ধর মতো শুনছিলাম এই মনোহর কহানিয়া। বললাম, 'তা হলে বোঝাই যাচ্ছে মনীষার ফিরে আসার ব্যাপারটা পরিকল্পিত ছিল না।'

'না।'

'তারপর?'

আমরা আড়ালে থেকে শুনতে লাগলাম ওদের কথাবার্তা।

মনীষা বলল, 'শোনো, আমি লুকিয়ে আমার বাবা মা'র কথাবার্তা শুনেছি। ওঁরা কলকাতায় ফিরেই আমাদেরই স্বজাতি একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন আমার। এই ব্যাপারে আমার কোনও আপত্তিই ওঁরা মানলেন না। তাই আমি পালিয়ে এসেছি। এখন আমি চাই তুমি আমাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে।'

ছেলেটি বলল, 'এই মুহূর্তে তা কী করে সম্ভব? আমার মা বাবা কীভাবে মেনে নেবেন ব্যাপারটা? তা ছাড়া আমি এখনও পর্যন্ত কোনও চাকরির চেষ্টাও করিনি।'

মনীষা বলল, 'এটা অবশ্য আমি ভেবে দেখিনি। ঠিক আছে, তুমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। আমি আমার পথ দেখি।' বলেই জঙ্গলের পথ ধরে নদীর দিকে ছুটল মনীষা।

বলাইদা বললেন, 'আমরা দুজনেই তখন আত্মপ্রকাশ করেছি। ছেলেটিকে বললাম, তুমি এভাবে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও, ফিরিয়ে আনো ওকে। ও তো সুইসাইড করতে চলেছে।'

হতভম্ব ছেলেটিও তখন ছুটল মনীষার দিকে, 'মনীষা! ফিরে এসো, মনীষা!'

মনীষা ওর কথার কোনও উত্তর না দিয়েই যেমন উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলছিল তেমনই চলতে লাগল।

ছেলেটিও মরিয়া হয়ে ছুটল ওকে ফিরিয়ে আনতে।

ভিকি আর আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম ওদের দিকে। মনে হল আমরা যেন

চলচ্চিত্রের কোনও সুন্দর একটা দৃশ্য দেখছি।

হঠাৎই ঘটে গেল বিপর্যয়। এই এলাকার সন্ত্রাস এক উচ্ছৃঙ্খল যুবক দুর্জন সিং পাহাড়িয়া কোনও বস্তিতে রাত কাটিয়ে ঘরে ফিরছিল। মনীষা গিয়ে পড়ল তারই মুখের গ্রাসে।

বাঘ যেভাবে হরিণশিশুকে মুখে তুলে নেয় দুর্জনও ঠিক সেইভাবে তুলে নিল মনীষাকে। তবে পরক্ষণেই মনীষার আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে ছিটকে পড়ল পথের ধারে। মনীষা আরও জোরে ছুটল। কিন্তু এইসব পাহাড়ের পথে ছোটা খুবই কষ্টকর। কেননা পথ তো সমতলের মতো নয়। ততক্ষণে ছেলেটিও গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুর্জনের ওপর। দুর্জন ওকে এক ঝটকায় কাত করে আবার ছুটল মনীষার দিকে। ছেলেটিও কম যায় না। দুর্জনের একটা পায়ে এমন আঘাত করল যে পাথরের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে রইল দুর্জন। ছেলেটি তখন মনীষার কাছে পৌঁছেছে। কিন্তু দুর্জনও দমবার পাত্র নয়। সেও আবার উঠে গিয়ে একসঙ্গে দুজনকেই আক্রমণ করল প্রবলভাবে।

আমরা যে কী করব কিছু ঠিক করতে পারলাম না। দুর্জনকে বাধা দিতে যাওয়া মানে নিজেদের মরণকে স্বেচ্ছায় ডেকে নিয়ে আসা। কেননা আঘাত পেলে দুর্জন কাউকে ছাড়ে না। ওদের দুজনেরই নিয়তি যে আজ ঘনিয়ে এসেছে তা আমরা ভালই বুঝতে পারলাম। তবুও অনেক পরে সাহসে ভর করে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাওয়ার অছিলায় এগিয়ে চললাম আমরা। এখান থেকে ওদের কাউকেই আর দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ওরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বাঘেরার দিকে নেমে গেছে।

অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর পাহাড়ের একটু উচ্চস্থান থেকে যে দৃশ্য দেখলাম তা দেখে শিউরে উঠলাম। দেখলাম ছেলেটি বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে পাথরের একটি খাঁজে। ওর সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন। নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। আর মনীষা রক্তাক্ত কলেবরে একটা বড় পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে থরথর করে কাঁপছে। সেখানেই এক জায়গায় গলার নলিকাটা অবস্থায় পড়ে আছে দুর্জন সিং-এর প্রাণহীন দেহটা।

আমরা যেতে মনীষা একটা কথাই বলল, 'ও শুভ্রকে মেরেছে। আমার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করেছিল, তাই ওকে খুন করেছি।'

আমরা যে কী বলব কিছু ভেবে পেলাম না। শুধু বললাম, 'কাজটা তুমি ভাল করোনি মনীষা।' তারপর বললাম, 'যা হবার হয়ে গেছে। ভাগ্যিস আর কেউ দেখেনি। আমরা দেখছি কীভাবে কী করা যায়। তবে এই শয়তানটাকে মেরে তোমরা যে কী উপকার করেছ আমাদের তা বলে বোঝাতে পারব না। এলাকার মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে এবার।'

ভিকি ততক্ষণে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছে ছেলেটির। একটু পরে ওর সম্বিৎ ফিরলে মনীষাকে বললাম, 'শোনো, তোমাদের এখন উভয় শত্রু। প্রথমত আইনের চোখে তোমরা খুনি। দ্বিতীয়ত দুর্জন সিং-এর লোকেরা টের পেলে তোমাদের জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। তাই এই মুহূর্তে কোনও একটি গোপন ডেরা খুঁজে নিতে হবে তোমাদের। আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। এখন এইরকম রক্তমাখা জামাকাপড়ে লোকালয়ে গেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। তাই একটুও দেরি না করে নদী পার হয়ে তোমরা ওই উঁচু পাহাড়ের মাথায় ওঠবার চেষ্টা করো। ওদিকে লোকজন বিশেষ কেউ যায় না। পরে আমরা খুঁজে নেবো তোমাদের। আমরা ততক্ষণে লাশটাকে গায়েব করবার চেষ্টা করি।'

ইতিমধ্যে ভিকি একটা সুড়ঙ্গর মতো গহ্বর দেখতে পেয়েছে। ভিকি আর আমি ধরাধরি করে ডেডবডিটাকে সেই গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে কয়েকটা পাথর এনে গর্তের মুখ ঢেকে দিলাম। এমনভাবে হয়ে গেল কাজটা যে টেরও পেল না কেউ।

ভিকিই তখন মনীষা ও ছেলেটিকে নিয়ে নদী পার হয়ে একটি নিরাপদ জায়গা দেখে রাখতে গেল। ওদের বলে দেওয়া হল সময়মতো সবকিছুই ওদের কাছে পৌঁছে যাবে। শুধু ওরা যেন আমাদের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত স্থানত্যাগ না করে।

এই বলে আমি হোটেলে ফিরে এলাম। ভিকি জঙ্গলের কাঠ কাটতে যাবার ভূমিকা নিয়ে ওদের লুকিয়ে রাখতে গেল।

ছেলেটির ব্যাপার এখানকার কেউ জানে না। মনীষাকে অনেকে দেখে থাকলেও ওর ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামাল না। সবাই জানল রাত্রি শেষ হতেই বিদায় নিয়েছে ও।

একটু বেলায় ভিকি ফিরে এলে আমি ইশারায় ওর সঙ্গে কথা বলে লালজির ওখানে গেলাম। তার আগে ছেলেটির বন্ধুরা একবার এসেছিল ওর খবর জানতে। আমরা সবাই বললাম 'না, আজ এখনও পর্যন্ত কোনও ট্যুরিস্ট এখানে আসেনি।'

যাই হোক, লালজিকে গিয়ে সবকথা বলতেই সে কী আনন্দ লালজির। তার কারণও আছে। লালজির একমাত্র সন্তান রবিকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল ওই দুর্জন সিং। তাই ছেলের হত্যাকারীর নিধনের খবর পেলে কার না আনন্দ হয়?'

লালজি বললেন, 'যেভাবেই হোক রক্ষা করতে হবে এই ছেলে মেয়ে দুটিকে।' বললেন, 'রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে নিয়ে এসো ওদের। আপাতত ওরা আমার এখানেই থাকবে। পরে ওদের সরিয়ে দেবো আমার দেশের বাড়ি ইন্দোরে। তবে ভুলেও যেন ওরা ওদের আসল পরিচয় কারও কাছে না দেয়। বাড়ির কথাও কেউ যেন আর মনে না রাখে। কেননা আইন এবং দুষ্কৃতী উভয়েরই বিষনজরে ওরা।'

যাই হোক, এরপর অনেক বেলায় টিফিন ক্যারিয়ারে অনেক খাবার দাবার নিয়ে পৌঁছে দিতে গেলাম ওদের। কিছু পোশাক-আশাকেরও ব্যবস্থা করলাম। তারপর ভিকি যে গুহায় ওদের রেখেছিল সেখানে গিয়ে সবকিছু দিয়ে বললাম, ওদের কীভাবে থাকতে হবে।

ছেলেটি বলল, 'মনীষা যখন আমার জন্য সবকিছু ছাড়তে পেড়েছে তখন ওর জন্য আমিই বা পারব না কেন সবকিছু ভুলে যেতে?'

আমি বললাম, 'এই হল বুদ্ধিমানের মতো কথা। কেননা সাবধানের মার নেই। লাশ না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা অপরাধী নও। ওই খুনের কথা কোনওদিনই টের পাবে না কেউ। কিন্তু মনীষা যে পালিয়ে এসেছে এ তো অজানা নয়। ওর বাবা কি ওর জন্য থানাপুলিশ না করবেন ভেবেছ? সেক্ষত্রেও ধরা পড়লে দুজনের বিচ্ছেদ কিন্তু অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। অতএব অতীত ভুলে বর্তমানের পথ ধরে এগিয়ে চলো। দুজনেই সুখী হবে।'

এরপর লালজির ইচ্ছেমতো রাতের অন্ধকারে অনেক ঝুঁকি নিয়ে ওদের পাহাড় থেকে নামিয়ে লালজির বাড়িতে রাখলাম। খুব গোপনে হয়ে গেল সবকিছু। লালজির স্ত্রী ওদের নিজের ছেলেমেয়ের মতোই যত্ন করতে লাগলেন। কয়েকদিন থাকার পর একদিন রাতের অন্ধকারে স্পেশাল একটা গাড়িতে করে ইন্দোরে সরিয়ে দেওয়া হল ওদের। শুভ্রর নাম এখন সঞ্জয়। মনীষার পার্বতী। ওখানকার একটা মন্দিরে লালজির সুপারিশে কাজ করে

সঞ্জয়। আর পার্বতী চুটিয়ে সংসার করে। চাঁদের মতো ফুটফুটে একটি ছেলেও হয়েছে ওদের। নাম তাতাই। ওরা এখন দারুণ সুখী।'

আমি বললাম, 'আমরা কি একবার ওদের সঙ্গে দেখা করতে পারি না?'

'নিশ্চয়ই পারেন। তবে কিনা খুঁচিয়ে ঘা না করাই ভাল।'

আমি বললাম, 'ঠিক। কিন্তু ছেলেটির বাবা মায়ের অবস্থাটা একবার ভাবুন তো। তাছাড়া ওরা এখন সম্পূর্ণরূপে বিপন্মুক্ত। মেয়েটির খোঁজখবর নেবার কেউ নেই। দুর্জন সিং-এর ব্যাপারটা নিখোঁজের তালিকায়। দলও তার অস্তিত্বহীন। পুলিশের পুরনো ডায়রিতে নিখোঁজের তালিকায় শুভ্রর নাম থাকলেও অপরাধীর তালিকায় তার নাম নেই। অতএব এই অবস্থায় আত্মপ্রকাশেই বা ওদের বাধা কোথায়?'

বলাইদা বললেন, 'ঠিক আছে, এ ব্যাপারে লালজির সঙ্গে একটু কথা বলে কালই আপনাকে ইন্দোরে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।'

সুজাতা বলল, 'আমি যাব না বুঝি? দুজনেই যাব আমরা। ওদের দুজনকেই আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।'

বলাইদা চলে গেলেন। আমরা সে রাতে তন্দুরি রুটি, কষা মাংস আর মিষ্টি খেয়ে শুয়ে পড়লাম যে যার ঘরে।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল অজস্র পাখির ডাকে। ভোরের চা-টা রাজুই খাওয়াল আমাদের।

একটু বেলায় রোদ উঠলে লালজি এবং তাঁর স্ত্রী দেখা করতে এলেন আমাদের সঙ্গে। বলাইদা এবং ভিকিও এল। ওদের মুখে সব কথাই তো শুনেছেন লালজি। তাই বললেন, ছেলেমেয়েদুটো বড় ভাল। তা বাবুজি, পুত্র হারানোর কী যে জ্বালা আমরা বুঝি। কাজেই ওদের বাবা মা যদি ওদের হারানিধি খুঁজে পান তো খুবই আনন্দের কথা। মেয়েটির মা বাবা যখন নেই তখন ছেলেটির বাবা মা-ই ফিরে পান তাঁদের ছেলে বউ নাতিকে। কিন্তু বাবুজি, ওরা আর কলকাতায় ফিরে না গিয়ে এখানেই থাকুক এটাই আমি চাই। আমার তো কেউ নেই। আমার ইন্দোরের ঘর আলো করে ওরা যেমন আছে তেমনই থাকুক। মন্দির, ধর্মশালার দেখভাল করে ভাল টাকা মাইনে পাচ্ছে ও। এটাই তো চাকরি। এখানকার ব্যবসা আমি দেখভাল করি, ও ওদিকটা সামলাক।'

আমি বললাম, 'এর চেয়ে উত্তম প্রস্তাব আর হয় না। ছেলেটির বাবা মা-ও ছেলের আশা আর করেন না। ওঁদের যেটা জানবার ছিল তা হল ছেলেটা আদৌ বেঁচে আছে কিনা। এখন খবর পেলে তাঁরা আকাশের চাঁদ হাতে পাবেন।'

লালজির সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে তাঁর অনুমতি নিয়ে আমরা ভূসাওয়াল থেকে ট্রেনে খাণ্ডোয়ায় এসে সেখান থেকে একটা গাড়ি নিয়ে সন্ধে নাগাদ পৌঁছে গেলাম ইন্দোরে। ঠিকানা খুঁজে গণপতি মন্দিরের পাশে সেই ধর্মশালায় এসে হাজির হলাম। শুভ্র ও মনীষা এখন সঞ্জয় ও পার্বতী।

শুভ্র আমাদের দেখে এগিয়ে এসে বলল, 'ক্যা সেবা চাহিয়ে আপ দোনোকো?'

'আমরা ঘর চাই। কামরা মিলে গা?'

'আপনারা বাঙালি! আপনাদের পরিচয়?'

'আমরা অতিথি। প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি আমার সঙ্গে যিনি তিনি কিন্তু আমার বান্ধবী।'

'আপনারা কি একই ঘরে থাকবেন, না আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে দেবো?'

'সেটা হলেই ভাল হয়।'

শুভ্র আমাদের বসতে বলে একজনকে ডেকে বলল, 'সাত আর আট নম্বর কামরা খালি করে বাবুদের গদী বিছানা পেতে দাও।' বলে বলল, 'আজকাল পুলিশের উপদ্রব খুব এখানে। রাত্রিবেলা এসে যাত্রীদের বিরক্ত করে। পরিচয় জানতে চায়। যদি জানতে পারে আপনাদের সম্পর্কটা নিকট নয় তাহলে এমন হয়রান করবে যে ভাবতেও পারবেন না।'

'সে কী! এখানে বুঝি কাকের মাংস কাকে খায়?'

'তার মানে?'

'আমিও তো পুলিশের লোক। দশ বছর আগে হাওড়া শহরের একটি ছেলে অজন্তার গুহা দেখতে এসে উধাও হয়ে যায়। সেই সঙ্গে উধাও হয় এক পরমাসুন্দরী নেপালি কিশোরী। পুলিশ আজ দশ বছর ধরে হন্যে হয়ে খুঁজছে তাদের। আমরা তাদেরই অনুসন্ধানে এসেছি।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে শুভ্রর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

আমি বললাম, 'কী হল! ভয় পেয়ে গেলে মনে হচ্ছে! তুমি তাদেরই একজন নও তো?' তারপর খুব চাপা গলায় বললাম, 'শুধু তাই নয়, দুর্জন সিং নামে এক দুষ্কৃতীকে খুনের অভিযোগও আছে তাদের বিরুদ্ধে।'

শুভ্রর তখনকার অবস্থা যে কী তা বলে বোঝানো যাবে না। বলল, 'আপনারা একটু বসুন। আমি এখনই আসছি।'

আমি বললাম, 'কোথায় যাবে তুমি? ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।'

শুভ্র ডেকে উঠল, 'পার্বতী!'

'এখানে পার্বতী নামে কেউ থাকে না। যাকে ডাকছ তার নাম মনীষা। আর তুমি? তুমি হলে শুভ্রকান্তি রায়চৌধুরী।'

মনীষা এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। এবার ছুটে এসে আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলল, 'আমাদের বাঁচতে দিন। এমন সুখের ঘরে আগুন দেবেন না দয়া করে।'

সুজাতা আর থাকতে পারল না। আমাকে তেড়ে একটা ধমক দিয়ে বলল, 'কী আরম্ভ করেছেন আপনি। অযথা বেচারিদের ভয় পাইয়ে দিলেন।' বলে মনীষাকে বুকে নিয়ে সে কী আদর।

আমিও শুভ্রকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'পাগল ছেলে, আমি গোয়েন্দা হলেও তোর দাদা। কোনও ভয় নেই তোর।'

হতভম্ব শুভ্র কিছুই বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

এবার আমি ওকে আমার ও সুজাতার পরিচয় দিয়ে সব কথা খুলে বললাম। তারপর বললাম, 'বোকা ছেলে, তোরা তো জানিস তোদের বিরুদ্ধে কারও কোনও অভিযোগই নেই। তবুও মা বাবাকে এতদিনে একটা চিঠিও লিখলি না কেন?'

শুভ্র আমাদের দুজনকেই প্রণাম করে বলল, 'মনীষার জন্য। আমি আমার মা বাবার সান্নিধ্য পেলেও ও তো ওর মা বাবাকে পাবে না, তাই ওর মনে যাতে অন্য প্রতিক্রিয়া না হয় তাই ওর মতো আমিও আমার মা বাবাকে ভুলে গেলাম। এখন আমরা দুজনেই এক মন, এক প্রাণ, এক আত্মা।'

বললাম, 'চমৎকার। সুখী হ তোরা।'

সুজাতা বলল, 'ছেলেটা? ছেলেটা কই? তাকে দেখছি না কেন?'

মনীষা সঙ্গে সঙ্গে পাশের একজনদের বাড়ি থেকে বছর দুয়েকের একটি ফুটফুটে শিশুকে নিয়ে এসে প্রণাম করল আমাদের।

সুজাতা মনীষার কোল থেকে শিশুটিকে বুকে নিয়ে আদরে আদরে ভরিয়ে তুলল।

শুভ্র ও মনীষা আমাদের দুজনকে যে কীভাবে আপ্যায়ন করবে তা ভেবে পেল না। লালজির কৃপায় ওদের তো কোনও অভাব নেই। তাই মিনিটে মিনিটে চা জলখাবার কত কী। আতিথেয়তার চরম যা, তাই করল।

দু'একটা দিন ওখানে কাটিয়ে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওদের নিয়ে এলাম আমার মৌড়িগ্রামের বাড়িতে। আসবার আগে লালজির নির্বাচিত একজনকে ঘর, মন্দির ও ধর্মশালা কয়েকদিনের জন্য দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে আসা হল। শুভ্রকে বোঝালাম, 'ইন্দোরের মাটিই তোমাদের মাটি। এখানেই তোমাদের অন্নজল। মা বাবার আশীর্বাদ নিয়ে আবার তোমরা ফিরে আসবে। আমি নিজে টিকিট কেটে তোমাদের গাড়িতে উঠিয়ে দেবো।'

মনীষা বলল, 'দাদাভাই, বিশ্বাস করুন আমি ওকে বহুবার বলেছি আমার সবকিছু আমি তো স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছি। তুমি ঘর ছেড়েছ আমার জন্য। বিপদ একসময় এসেছিল। বিপদের মেঘ যখন কেটে গেছে তখন একটা অন্তত চিঠি দাও বাড়িতে। ও কিন্তু আমার কথা একবারও শুনল না। আমি তো ওর বা ওর বন্ধুদের ঠিকানা জানি না, তা হলে আমিই চিঠি দিতাম। আমার কি ইচ্ছে যায় না শ্বশুর শাশুড়িকে দেখি, আমার তাতাইকে তাদের চরণে অঞ্জলি দিই?'

আমি বললাম, 'তুমি খুব ভাল মেয়ে।'

যাই হোক, আমরা ইন্দোর শিপ্রা এক্সপ্রেসেই হাওড়ায় এলাম। সুজাতাও কয়েকদিনের জন্য আমাদের সঙ্গে এসে কলকাতা ঘুরে যাওয়ার লোভ সামলাতে পারল না। আমি নিঃসঙ্গ মানুষ। সুজাতার মতো মমতাময়ী বান্ধবী, শুভ্র ও মনীষার মতো ভাই বোন, ওদের প্রাণবন্ত ফুটফুটে শিশুটি আমার অন্তরকে যেন আনন্দে ভরিয়ে তুলল। বুঝলাম সাংসারিক জীবনে অভাব অনটন শোক দুঃখ যা কিছুই থাকুক না কেন তার মাধুর্যই আলাদা।

হাওড়া স্টেশনে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলাম আমার মৌড়িগ্রামের বাড়িতে। আমি যে ফিরছি সে কথা রাখহরিকে আগেই জানিয়েছি ফোনে। তবে অন্তর্ধান রহস্যের যবনিকা যে একেবারেই টেনে দিয়েছি তা অবশ্য জানাইনি ওকে। কেননা আমার উদ্দেশ্যই ছিল সুধাকান্তবাবুকে চমক দেওয়া।

রাখহরি আমার সঙ্গে এতজনকে দেখেই অবাক। তবে কিনা মনীষা ও শুভ্রকে দেখামাত্রই অনুমান করে নিল এরা তারাই। যাদের খোঁজে আমি গিয়েছিলাম। রাখহরি আমার চোখের দিকে তাকাতেই আমি ঘাড় নাড়লাম।

রাখহরিকে বললাম, 'আমরা মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে বসলে তুই আমাদের চা-টা খাইয়ে সুধাকান্তবাবু ও তাঁর স্ত্রী দুজনকেই ডেকে নিয়ে আয়। তবে ভুলেও কিন্তু ফাঁস করে দিবি না। ওঁরা এলে দারুণ একটা চমক দেবো ওঁদের।'

রাখহরি তাই করল।

আমাদের চা-পর্ব শেষ হলে ডাকতে গেল সুধাকান্তবাবুকে। আমি শুভ্র ও মনীষাকে আমার ঘরে রেখে বাইরের সোফায় বসে কাগজ দেখতে লাগলাম। আর সুজাতা করল কি তাতাইকে নিয়ে বাগানময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

একটু পরে রাখহরির সঙ্গে সস্ত্রীক সুধাকান্তবাবু এলে সুজাতাকে হাঁক দিয়ে ডাকলাম।

ডাক শুনে সুজাতা এল তাতাইকে নিয়ে।

সুধাকান্তবাবুর স্ত্রী বললেন, 'ওমা! কী সুন্দর দেখো বাচ্চাটা।' বলেই সুজাতার কোল থেকে তাতাইকে নিয়ে আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটি কে?'

'আমার বড়ই আদরের।'

সুধাকান্তবাবু সুজাতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'উনি?'

'অত্যন্ত প্রিয়জন।'

সুধাকান্তবাবুর স্ত্রী বললেন, 'কী আশ্চর্য মুখের মিল। আমার ওকেও ছোটবেলায় ঠিক এইরকমই দেখতে ছিল।'

সুধাকান্তবাবুর চোখ দুটো হঠাৎই অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। তাতাইকে বুকে নিয়ে করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যে জন্য গেলেন সে ব্যাপারে কিছু হল? আমার শুভ্রর কোনও সন্ধান পেলেন?'

'তার সন্ধান না পেলে আপনার নাতিকে আপনাদের বুকে তুলে দিলাম কী করে?'

সুধাকান্তবাবু ও তাঁর স্ত্রী প্রথমে যেন বিশ্বাসই করতে পারলেন না আমার কথাটা। তারপরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাতাইকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে লাগলেন। সে যেন এক স্বর্গীয় দৃশ্য।

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'ওরা, ওরা কোথায়?'

নির্দেশ পেয়ে শুভ্র ও মনীষা এসে প্রণাম করল বাবা মাকে।

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'এ কী করে সম্ভব হল মিঃ চ্যাটার্জি! আপনার হাতে কি আলাদীনের আশ্চর্যপ্রদীপ আছে?'

বললাম, 'না। গুরুজনদের আশীর্বাদ আছে। তবে আমার এই জার্নালিস্ট বান্ধবী মিস সুজাতা শর্মার সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হত না। যান, এখন আপনার ছেলে বউ নাতি নিয়ে ঘরে যান।'

সুধাকান্তবাবু ও তাঁর স্ত্রী আমাদের দুজনের হাত দুটি ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে বললেন, 'আপনাদের ঋণ আমরা কখনও শোধ করতে পারব না। তবে একটা কথা, আজ রাতে কিন্তু আমার ওখানে আপনাদের তিনজনেরই নিমন্ত্রণ।'

আমরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

ওরা বিদায় নিলে রাখহরি আমাদের আর এক প্রস্ত চা খাইয়ে রান্নার কাজে মেতে উঠল। সুজাতাও বসে থাকার মেয়ে নয়। কোমর বেঁধে এমনভাবে লেগে পড়ল ওর সঙ্গে

যে এই ক'দিনে ওর অমন রূপ আমি একবারও দেখিনি। ওকে দেখেই আমি যেন নতুন করে অনুভব করলাম আকাশের চাঁদ আকাশে সুন্দর, মেয়েরা গৃহকোণে।

রহস্যের সাতবাহিনী

শীতের এক সন্ধ্যায় যখন বেশ কয়েকটা গরম ফুলকপির শিঙাড়া খেয়ে এক কাপ চা কিংবা কফির প্রত্যাশা করছি, ঠিক তখনই কোথা থেকে যেন ধূমকেতুর মতো আমার কলেজ-জীবনের বন্ধু কুনাল রায় এসে হাজির হল। বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। তাই হঠাৎ দর্শনে চিনতে একটু দেরি হল। সেই পাতলা ছিপছিপে চেহারার কুনাল এখন সুন্দর স্বাস্থ্যবান এক যুবক।

ওর কিন্তু আমাকে চিনতে অসুবিধে হয়নি। আগের মতোই হাসি-হাসি মুখ করে বলল, "ব্যাপার কী বলতো? তুই কি মহাকালকে জয় করেছিস? তোর চেহারাটা তো দেখছি একটুও বদলায়নি।"

আমি বললাম, "কিন্তু তুই তো ভোল একেবারেই পালটে ফেলেছিস। তা এতদিন পরে হঠাৎ কী মনে করে?"

"হ্যাঁ, কিছু একটা মনে করেই এসেছি ভাই। আসতে খুব লজ্জা করছিল। কোনওদিন কোনও যোগাযোগ রাখিনি অথচ আজ একেবারে সশরীরে বর্তমান। এটা রীতিমতো স্বার্থপরের ব্যাপার।"

"তা হোক, প্রয়োজনে যে আমার কথা মনে পড়েছে, মনে করে যে এসেছিস এতেই আমার আনন্দ। বিপদের দিনে যে বন্ধু বন্ধুর কাছে সাহায্য চাইতে আসে বা যে বন্ধু বন্ধুর পাশে দাঁড়ায় সেই হল প্রকৃত বন্ধু। এতদিন আমিও তো তোর কোনও খোঁজ খবর রাখিনি। তা প্রবলেমটা কী তোর?"

কুনাল কিছু বলার আগেই রাখহরি প্লেট ভর্তি চিঁড়েভাজা আর গোটা দুই শিঙাড়া কুণালের সামনে রেখে বলল, "আগে মুখ-হাত ধুয়ে আসুন। তারপর খেতে খেতে দু'বন্ধুতে যত খুশি গল্প বা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন। আমি ততক্ষণে কফি নিয়ে আসছি।"

রাখহরির এইসব আতিথেয়তা মনে রাখার মতো।

কুনাল মুখ হাত ধুয়ে এসে বলল, "বেশ ছেলেটি তো। কোনও রিলেটিভ বুঝি?"

"আমার ভাইয়ের মতো।"

এর পর খেতে খেতেই বলল, "সত্যি, কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা। কী আনন্দ যে হচ্ছে। অনেকটা ভয়ে ভয়েই কিন্তু এসেছি তোর কাছে।"

"ভয়ে ভয়ে কেন?"

"এমনও তো হতে পারে অতদূর থেকে এখানে এসে দেখলাম তুই-ই নেই। তদন্তের স্বার্থে হয়তো দূরে কোথাও চলে গেছিস।"

"ফোন করে আসতে পারতিস?"

"ফোন নম্বর পাব কার কাছে? তাই ঝুঁকি নিয়ে সরাসরি চলেই এলাম।"

"বেশ করেছিস। এখন সমস্যাটা কী বল? আছিস কোথায় এখন?"

"ডেহরি অন শোনে। সাতবাহিনীর নাম শুনেছিস?"

"এই প্রথম শুনলাম।"

"ডেহরি অন শোন ও গারোয়া রোডের মাঝে ছোট্ট একটি অরণ্যময় প্রান্তর। ওই সাতবাহিনীতে...।"

রাখহরি কফি নিয়ে এল।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, "ভারী সুন্দর নামটি তো, সাতবাহিনী।"

"জায়গাটিও তেমনই সুন্দর। কিছুদিন আগে আমাদের বনদপ্তরের কয়েকজন কর্মী ওই অঞ্চলে জমি জরিপের কাজে গিয়েছিল। সেখানে বসন্তকুমার ঠাকুর নামে আমাদের একজন পদস্থ কর্মী ছোটো একটি পাহাড়ের গুহায় অষ্টধাতুর একটি বুদ্ধ মূর্তি আবিষ্কার করে। সেই মূর্তিকে নিয়েই বিপর্যয়। মূর্তিটি তাঁবুতে নিয়ে এসে রাখার পর মধ্যরাতেই মূর্তিটি উধাও এবং বসন্ত ঠাকুরকেও পাওয়া যায় মৃত অবস্থায়।"

"সে কী! তা হলে নিশ্চয়ই তাকে খুন করেই মূর্তিটা নিয়ে গেছে কেউ। এর মধ্যে কর্মীদেরও কারও যোগসাজশ থাকতে পারে।"

"না। কর্মীরা সবাই প্রায় দেহাতি। তাও ওই অঞ্চলের কেউ নয়। কেউ গয়া কেউ পাটনার লোক। সবচেয়ে আশ্চর্য মৃতদেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে হৃদরোগই মৃত্যুর কারণ।"

"অস্বাভাবিক কিছু নয়, এরকম হতেই পারে।"

"কিন্তু প্রশ্ন এই, মূর্তিটা তা হলে গেল কোথায়?"

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, "কেসটা অত্যন্ত জটিল। তবে এমন হতে পারে আততায়ী যখন মূর্তি অপহরণ করতে আসে তখন হয়তো আচমকা ঘুম ভেঙে তার ভয়াবহ আকৃতি দেখেই বসন্ত ঠাকুর হৃদরোগে আক্রান্ত হন।"

কুনাল বলল, "এই সন্দেহটা কিন্তু আমাদের কারও মাথায় আসেনি। মনে হয় এমনই হয়েছে।"

"এ অবশ্য আমার অনুমান মাত্র।"

"তবে এর পরে যা ঘটল তো কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম।"

"কীরকম?"

"সুরেশ শর্মা নামে দ্বারভাঙার এক যুবককে পাঠানো হল ওই কাজে! কাজও বেশ পুরোদমেই চলছিল। হঠাৎই একদিন মধ্যরাতে ঘুমন্ত অবস্থায় কে যেন তাকে গলা টিপে মারল।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী? কয়েকদিন কাজ বন্ধ থাকার পর আবার নতুন করে কাজ শুরু করার নির্দেশ এসেছে। তার চেয়েও বড়ো কথা, এবার দায়িত্ব আমার ওপর। আর সত্যি বলতে কী, আমার কিন্তু ভয় করছে খুব।"

আমি ওর ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "স্বাভাবিক।"

"অথচ চাকরিও ছেড়ে দেবার নয়।"

"না, না। এর জন্য চাকরি ছাড়ার কোনও প্রয়োজন নেই। এ কাজের দায়িত্ব তোকে

নিতেই হবে। কাজও করতে হবে খুব সাবধানে।''

'''যদি আমারও ওই একই পরিণতি হয়?''

''যে-কোনো মুহূর্তে হতে পারে। তবে তা যাতে না হয় সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। এখন কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আমাকে দে। যেমন প্রথমজনের মৃত্যুর পর ফের যখন কাজ শুরু হল তখন তাঁবুতে রাত জাগার কোনও ব্যবস্থা হয়েছিল কি?''

''না। তার কারণ বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে ঘুরে সারাদিন কাজ করার পর লেবাররা খুব ক্লান্ত থাকে। এর পর সন্ধেবেলা ফিরে এসে ভরপেট খেয়ে যখন তারা শয্যা নেয় তখন আর জ্ঞান থাকে না কারও।''

''জরিপের কাজে এমন কী পরিশ্রম?''

''পরিশ্রম আছে। শুধু তো মাপজোক নয়, খুঁটি পোঁতা, কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া ইত্যাদি আনুসঙ্গিক কাজও করতে হয়।''

''নেশা ভাঙ?''

''সে সব তো আছেই।''

''এখন প্রশ্ন একটাই, অষ্টধাতুর সেই মূর্তি নিয়ে আসার জন্য বা তারই কারণে বসন্ত ঠাকুরের মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু সুরেশ শর্মাকে ওইভাবে মেরে ফেলার পেছনে ওইরকম কোনও কারণ আছে কি?''

''না। সবে কিছুদিন হল বিয়ে করেছিল বেচারি। বউটার কান্না দেখলে চোখে জল আসে। সাতবাহিনীরই মেয়ে।''

''সে কী! দ্বারভাঙার ছেলে অথচ সাতবাহিনীর মেয়ে! যোগাযোগ হল কী করে?''

''ডেহরি অন শোন থেকে প্রায়ই ওকে আসতে হত এদিকে। সেই সূত্রেই পরিচয়। তার থেকেই সুন্দর পরিণতি। যেহেতু সাতবাহিনীতে তার আত্মীয় থাকে সে কারণেই সুরেশকে ওই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়।''

''মানলাম। তাই যদি হয়, তা হলে সুরেশ তার নবপরিণীতা স্ত্রীকে ছেড়ে তাঁবুতে শুতে এল কেন?''

''এটা আমাদের চাকরির শর্ত। তা ছাড়া বিয়ের পরে সতীয়া সুরেশের কাছে ডেহরিতেই থাকত।''

সব শুনে আমি কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা পালন করে বললাম, ''এইখান থেকেই মনে হচ্ছে রহস্যের কোনও একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে আর এই সূত্র সন্ধানের সহায়িকা হবে সতীয়াই।''

কুনাল বলল, ''আমার তো মাথায় কিছু আসছে না ভাই। আমার শুধু ভয় ওই গুপ্ত ঘাতকের হাতে খুন হওয়ায়।''

আমি ওকে অভয় দিয়ে বললাম, ''ভয় হবারই কথা, তবু পিছিয়ে পড়লেও চলবে না। এই ব্যাপারে আমার কাছ থেকে কীরকম সাহায্য তুই চাস?''

''সেটা তুই-ই ঠিক করবি। ওই গুপ্ত ঘাতককে যেভাবেই হোক ধরতে হবে তোকে।''

''এটা তো ওখানকার পুলিশের কাজ।''

''কিন্তু তারা তো নিষ্ক্রিয়। পুলিশ গেল, ডেডবডি নিল, পোস্ট মর্টেম করাল, একবার জঙ্গলে টহল দিল, তারপর সব চুপচাপ।''

''তা হলে আমাকেই এবার তোর জীবনরক্ষার স্বার্থে স্পটে গিয়ে তদন্তের কাজ শুরু

করতে হয়।'''

"তুই এ কাজের দায়িত্ব নিলে আমি নির্ভয়ে কাজে যোগ দিতে পাবি।"

"বেশ। তা হলে যাওয়ার ব্যবস্থা কর।"

ততক্ষণে আমাদের চা-পর্ব শেষ হয়েছে।

কুনাল বলল, "আজই রাতের গাড়িতে দেখি একটু চেষ্টা করে যদি দুটো বার্থ ম্যানেজ করতে পারি।"

কুনাল আমাব টেলিফোন নম্বর নিয়ে চলে গেল।

আমি রাখহরিকে বললাম, "আমার ব্যাগটা তা হলে একটু গুছিয়ে রাখ। ওর যা উৎসাহ তাতে দালাল ধরেও টিকিট ও করবেই।"

রাখহরি বলল, "এইসব উটকো ঝামেলাগুলো কেন আপনি ঘাড়ে নেন?"

আমি হেসে বললাম, "আরে এটাই যে আমার কাজ। কোনও মরণাপন্ন রোগী ডাক্তারের কাছে এলে ডাক্তার তাকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না। যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তেমনি আমাদের কাছেও কেউ এভাবে সাহায্য চাইতে এলে আমরাও তাকে ফিরিয়ে দিতে পারি না।"

"কিন্তু কেসটা কত জটিল বলুন তো?"

"জটিল বলেই তো আমার কাছে আসে। তা ছাড়া ও আমার পুরোনো বন্ধু, ওকে সাহায্য করা তো আমার নৈতিক কর্তব্য। তার চেয়েও বড়ো কথা হাতে এখন তেমন কোনও কাজের দায়িত্বও নেই। শীতের শুরু সবে। এইসময় কারও আহ্বানে পাহাড় জঙ্গলের দেশে বেড়াতে যাওয়ার মজাই আলাদা।"

"এর নাম আপনার বেড়াতে যাওয়া?"

"তা নয় তো কী? একসঙ্গে রথ দেখা কলা বেচা দুইই হবে।"

রাখহরি আর কথা না বাড়িয়ে বাজারে চলে গেল।

আমিও খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে বাগানে গেলাম পায়চারি করতে। রাখহরির পরিচর্যায় কত গাঁদাফুলই না ফুটেছে চারদিকে। খুব যত্ন করে গাছগুলো লাগিয়েছে ও।

খানিকবাদে কুনালের ফোন এল, আজই রাতের দুন এক্সপ্রেসে দুটো বার্থ পাওয়া গেছে। ওর ফোন পেয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম। ইতিমধ্যে মনে মনে একটা ছক আমি কষে রেখেছি। এখন দেখা যাক কর্মক্ষেত্রে কতটা কী করতে পারি।

কুনাল এল অনেক দেরি করে। বোধ হয় ট্রেনের গোলমাল ছিল।

ইতিমধ্যে রাখহরির তৎপরতায় মাংস ভাত রেডি।

আমরা স্নানের পর্ব শেষ করে দু'বন্ধুতে আহার পর্ব সমাধা করলাম। কুনাল কতকগুলো রাজভোগ এনেছিল স্টেশন থেকে ফেরার পথে। আমরা তার দু'একটা খেয়ে বাকি রেখে দিলাম রাখহরির জন্য। ফ্রিজে রেখে ও দু'দিন ধরে খেতে পারবে।

দুপুরে দু'বন্ধুতে চুটিয়ে গল্প করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই চলে এলাম হাওড়া স্টেশনে। রাত আটটা পঁয়ত্রিশে ট্রেন। ট্রেন ছাড়ার অনেক আগেই পৌঁছলাম আমরা প্লাটফরমে। যথাসময়ে ট্রেন এল। ছাড়লও যথাসময়ে। মাত্র এক রাতের ব্যাপার। পরদিন সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ শোন নদীর পুল পার হয়ে ট্রেন এসে থামল ডেহরি অন শোনে।

এ-পথে কতবার যে গেছি এসেছি তার ঠিক নেই। কিন্তু নামা হয়নি কখনও। আজ তাই দারুণ আনন্দ হল এখানে এসে।

স্টেশনের বাঁদিকের পথ ধরে খানিক যাওয়ার পর ওর বাসা বাড়িতে এলাম। একতলায় ছোট্ট একখানি ঘর, বেশ উন্নত মানের। থাকার পক্ষে অতি উত্তম। কিন্তু থাকব তো এখানে একটি দিন। অথচ পরিবেশটি এমনই রমণীয় যে বেশ কয়েকটা দিন থেকে গেলেও মন যেন ভরে না।

আশপাশের বাসিন্দারাও দেখলাম কুনালের খুবই অনুগত। ও সবার সঙ্গেই আমার পরিচয় করিয়ে দিল। ওই দিনটা আমরা আর ঘরে খাওয়ার ব্যবস্থা না করে কাছাকাছি একটি হোটেলে ব্যবস্থা করে নিলাম।

গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত সুরেশ শর্মা যে বাড়িতে ভাড়া ছিল সেটিও দেখাল কুনাল। ওর স্ত্রীকে তার বাবা এসে নিয়ে গেছে সাতবাহিনীতে। ঘরে জিনিসপত্তর কিছু আছে হয়তো, তাই তালা দেওয়া।

যাই হোক, সে রাতটা ডেহরি অন শোনে কাটিয়ে পরদিন ভোরে রওনা হলাম আমরা সাতবাহিনীর উদ্দেশে। ভোর পাঁচটা কুড়িতে ট্রেন। বারওয়াডিহ প্যাসেঞ্জার, দূরত্ব মাত্র আটাত্তর কিলোমিটার।

কী প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এখানে। শাল সোয়েটারেও যেন বাধা মানছে না। আকাশ এখনও অন্ধকার। নামে ভোর হলেও ভোরের কোনও আভাস নেই। দু'একটা পাখিই যা কল কল করে ডাকছে মাঝে-মাঝে।

এই শীত ভোরে ট্রেনে বসে এক কাপ করে গরম চা খেলাম। তারপর ট্রেন ছাড়লে একটির পর একটি স্টেশন পার হয়ে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ এসে পৌঁছলাম সাতবাহিনীতে।

স্টেশনে নেমে আর এক পর্ব চায়ের পাট সেরে ও প্রথমেই গেল ওদের টেন্টে। তারপর ঘটনাস্থলটি আমাকে একবার ঘুরিয়ে দেখাল। তাঁবুর ভেতরটা দেখাল। অষ্টধাতুর মূর্তি কীভাবে চুরি গেল তা বলল।

আমি সবই শুনে গেলাম। দেখলামও ঘটনাস্থল এবং তাঁবুর ভেতরের অবস্থা। বেশ বড়োসড়ো তাঁবু। তারই মধ্যে একটি ঘেরা জায়গায় ছিলেন বসন্ত ঠাকুর এবং পরবর্তী সময়ে সুরেশ শর্মা। এখন এটাই হবে কুনালের রাত্রিবাসের জায়গা।

আমি বললাম, "আমার ব্যবস্থাটা কি এই তাঁবুর মধ্যেই হবে?"

কুনাল বলল, "না, না। তা কেন? এখানে কুলিদের গায়ের গন্ধে টিকতেই পারবি না তুই। আমার অভ্যেস হয়ে গেছে, তাই অসুবিধে হবে না।"

"তা যদি হয় তা হলে রাত দুপুরে সেই গুপ্তঘাতক আবার এলে তোকে আমি বাঁচাবো কী করে?"

"বুঝলাম। কিন্তু এখানে তুই থাকতে পারবি না তো।"

"তা হলে আমি থাকব কোথায়?"

"তোর থাকার ব্যবস্থা আগে থেকে আমি করেই গেছি। আমি জানতাম তুই না এসে পারবি না। চল, তোকে সেখানেই নিয়ে যাই।'"

কুনাল আমার ব্যাগটা একজন কুলির হাতে দিয়ে তাঁবু থেকে সামান্য দূরত্বে একটি বহুদিনের পুরনো বাড়িতে নিয়ে এসে রাখল। বলল, "একটু কষ্ট করে এখানেই কয়েকটা দিন থেকে যা তুই। কোঠা বাড়ি এদিকে এখনও তেমন গড়ে ওঠেনি। বেশির ভাগই মাটির বাড়ি, পাকা বাড়ি বলতে এটাই।"

আমি বললাম, "তাতে কী? আমি তো এখানে আরামে সুখ ভোগ করতে আসিনি। তা ছাড়া ঘরে আমি থাকবই বা কতক্ষণ? সারাটা দিন তো বনে পাহাড়ে টো টো করে ঘুরব আর রাত্রিবেলা কড়া নজরদারি করব তাঁবুর দিকে। অতএব...।"

কুনাল সেই ঘরের মধ্যে তক্তাপোশের ওপর কতকগুলো পুরু চট বিছিয়ে তার ওপর ভুটের কম্বল পেতে দিব্যি শোবার ব্যবস্থা করে দিল। গায়ে চাপা দেওয়ার জন্য দুটো কম্বল ও একটা বালাপোশ রাখল। এখানে লাইটের ব্যাপার নেই। তাই কেরোসিন লণ্ঠন একটা নিয়ে এসে রাখল। তা ছাড়া মোমবাতি, দেশলাই সব কিছুই এমনকি একটি কলসিতে করে জল ও একটি গেলাসও রেখে বলল, "তোর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আমি এখনই করছি। আজকের দুপুরটা আমি তোর সঙ্গেই খাব। রাত্রি থেকে তাঁবুতে। কাল সকাল থেকে লেগে পড়ব কাজে। এখান থেকে এক দেড় কিমি দূর থেকে শুরু হবে কাজ। আপাতত একটু বোস তুই। আমি আসছি।"

কুনাল চলে গেল।

অগত্যা বসেই রইলাম আমি। কম্বলশয্যায় ওপর ঘর থেকে নিয়ে আসা বেডশিট পিছিয়ে একটু ভব্যিযুক্ত করে নিলাম। ঘরটি নিম্নমানের হলেও থাকা যায়।

খানিকবাদেই কুনাল এল একটা জায়গায় করে আলুর চপ মুড়ি ও কতকগুলো ডিমের ওমলেট নিয়ে। ওর সঙ্গে এল আদিবাসীদের মতো দেখতে একটি মেয়ে। বলল, "এই হল সতীয়া। সুরেশের বউ।"

বন্য স্বাস্থে ভরা কুড়ি-বাইশ বছরের এক তরুণী। একটু বেঁটে খাটো গড়ন। টানা টানা চোখ, গোলগাল মুখ। চালচলন স্বাভাবিক। কে বলবে মাত্র কিছুদিন আগে মেয়েটি স্বামীহারা হয়েছে।

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ওকে একটু বোঝবার চেষ্টা করলাম। তারপর বললাম, "তুমিই সতীয়া?"

ও ঘাড় নেড়ে জানাল, "হ্যাঁ।"

"তোমার বাড়ি কোথায়?"

সতীয়া আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

চেয়ে দেখলাম এক জায়গায় একটু জঙ্গলে ভরা স্থানে একটি টিলা পাহাড়ের কোলে কতকগুলো ঝুপড়ি ঘর আছে। ওর মধ্যে যে-কোনো একটিতে ওদের ঘর।

আমি বললাম, "ঘরে কে কে আছে তোমার?"

"বাবা আছে। মা আছে। ছোটো একটা বোন আছে। আর আছি আমি।"

কুনাল বলল, "এই সতীয়াই তোকে দু'বেলার রান্না করে খাওয়াবে। ওর বাবার হাতে আমি টাকা-পয়সা দিয়ে এসেছি। সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে তোর। এখানে তো রান্না করতে কয়লা লাগে না। কাঠের জ্বালেই সব। আর হাঁস মুরগি এখানে অপর্যাপ্ত। যত পারিস খা। ডিম সেদ্ধ, ডিমের ওমলেট যত পারবি খাবি।"

আমি হেসে বললাম, "একদিনেই এত কিছু খেলে সহ্য করতে পারব কেন?""

"একদিনেই বা খাবি কেন? রয়ে সয়ে খাবি। এখানকার জল এমনই হজমি যে লোহাও হজম হয়ে যাবে।" এরপর সতীয়াকে বলল, "একটু ভাল করে এই বাবুজির দেখভাল করবি। তোর সুরেশকে যে গলা টিপে মেরেছে এই বাবুজি তার দুটো হাতে হাতকড়া পরাবে।"

এতক্ষণে সতীয়ার মধ্যে একটু যেন ভাবান্তর দেখা দিল। ওর চোখ দুটো ধারালো ছুরির মতো চকচকিয়ে উঠল। তবে কিনা সেই চোখে এক ফোঁটা জলবিন্দুও দেখা গেল না। কী কঠিন মেয়ে এই সতীয়া।

কুনাল ওকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে ওর কাজের জায়গায় চলল। তারপর কুলিদের নির্দেশ দিয়ে আবার ঘরে এসে বসল। সতীয়াকে বলল, "যা। আমাদের জন্যে চা নিয়ে আয়।"

সতীয়া চলে গেলে আমরা সেই তেলেভাজা মুড়ি, পেঁয়াজ ও ডিমের ওমলেট খেতে লাগলাম।

হাড়-কাঁপানো শীত যাকে বলে এখানে ঠিক তাই। তবে কিনা চনচনে রোদ্দুরে সবই যেন আনন্দময়।

একটু পরেই সতীয়ার বাবা চাল, আটা, তেল, নুন মশলা ও বিরাট একটা কাঠের বোঝা মাথায় করে নিয়ে এসে রাখল। তারপর আমাদের দু'জনকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিল।

সতীয়া এল অনেক পরে। একটা কেটলিতে করে চা এনে সেই চা আর একবার কাঠের জ্বালে গরম করে খেতে দিল আমাদের।

আমি কুনালকে জিজ্ঞেস কবলাম, "মেয়েটা কথা খুব কম বলে, তাই না?"

"মোটেই না। আসলে সুরেশের অপঘাত মৃত্যুর পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেছে ও। হবে নাই বা কেন? বন প্রদেশের গরিব ঘরের মেয়ে। সুরেশ ওকে বিয়ে করে সুখের মুখ দেখাল। তারপরই এই আঘাত। না হলে বিয়ের পর ও যখন ডেহরিতে গেল তখন কী দারুণ প্রাণচঞ্চল ছিল ও তা ভাবতেও পারবি না।"

যাই হোক, সতীয়া চা গরম করে দিলে তাই খেলাম তৃপ্তি করে। এরা চা করে একসঙ্গে জল দুধ চা চিনি সব মিশিয়ে ফুটিয়ে। দুধের গুণেই বোধ হয় তার স্বাদও হয় অন্যরকম।

চা-পর্ব শেষ হলে আমি কুনালের সঙ্গে এলাকাটা একবার ভালভাবে ঘুরে দেখতে চললাম। কেননা পথ ঘাট ঠিক মতো জানা না থাকলে নিজেই বিভ্রান্তিতে পড়ব।

ওদের তাঁবু যেখানে হয়েছে সে জায়গাটা একটু উঁচু জায়গায়। পিছনেই এক জায়গায় একটি টিলাকৃতি স্থান থেকে পাথরের গা বেয়ে অতি ক্ষীণ একটু জলধারা ঝরনার আকারে নালার মতো নেমে আসছে। সেই জায়গা থেকে জঙ্গলের দূরত্ব খুব বেশি দূরে নয়। তবে পাহাড় একটু দূরে। অনেক-অনেক দূরে বড়ো বড়ো পাহাড়ের ধোঁয়াটে আভাস। জঙ্গলও, এখানে অত্যন্ত ঘন। এক-একটি প্রাচীন মহীরুহ যেন আকাশকে ছুঁতে চাইছে এমনই অবস্থা। এখানে সার্ভে করা, কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া রীতিমতো পরিশ্রমের কাজ। এরপর আছে বড়ো মাঝারি গাছগুলোর সংখ্যা গণনা। যদিও চোরা কাঠরাদের উপদ্রব এখানে নেই, তবুও হিসাব তো রাখতেই হয়।

কুনালের সঙ্গে চারদিক ঘুরে এখানকার প্রকৃতিকে এমনই ভালবাসে ফেললাম যে মনে মনে ভাবলাম আর কেন ঘরে ফিরব? এই তো জীবন! বাকি দিনগুলো এখানকার অরণ্যমায়াতেই কাটিয়ে দিই। তবে একটা ব্যাপারে আমি কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারলাম না। এই বনপ্রদেশে এখানকার মানুষজনদের দেখে একবারের জন্যও মনে হল না যে এখানে কোনও হিংসা থাকতে পারে বা কোনও দুষ্টচক্র এখানে বাসা বেঁধে থাকতে পারে। অথচ

কুনালের কথামতো ওর লেবারদেরও দেখলাম অতি শান্ত নিরীহ ভাব। এদের দ্বারা খুনখারাপি করা অসম্ভব। তা হলে কে সেই গুপ্তঘাতক? মূর্তি হরণকারীই বা কে? ঘটনার গতি দেখে মনে হয় একই লোকের কাজ এটা। তা যদি হয় তা হলে মূর্তি পাওয়ার পর বসন্ত ঠাকুরের মৃত্যুর পরও সুরেশ শর্মাকে সে গলা টিপে মারল কেন?

কুনালের সঙ্গে এলাকা পরিদর্শন করে প্রায় বারোটা নাগাদ ফিরে এলাম আমি। কুনালও এল।

সতীয়া ওদের কুয়ো থেকে দু'বালতি জল এনে দিল স্নানের জন্য। কনকনে ঠাণ্ডা জল। সেই জলেই একটু গরম জল মিশিয়ে স্নান করে নিলাম আমরা। এখানে বাথরুমের কোনও বালাই নেই। তাই খোলা জায়গাতেই রোদ্দুরে স্নান করতে হয়।

যাই হোক, আমরা স্নান করে খেতে বসলাম। ডাল, ভাত, পালং শাক ভাজা, ফুলকপির তরকারি, চুনো মাছের ঝাল, ডিমের ওমলেট আর টমেটোর চাটনি। মন্দ রাঁধেনি মেয়েটা। বেশ তৃপ্তি করেই খেলাম তাই।

খাওয়া শেষ হলে কুনাল বলল, "তুই তা হলে বিশ্রাম নে। আমি ওদিকে গিয়ে কাগজপত্তর সব ঠিক করি। আজ রাতে আমি কিন্তু তাঁবুতেই থাকব। কী জানি আজই আমার শেষ রাত কিনা।"

কুনাল চলে গেলে আমি সতীয়াকে ডেকে বললাম, "ওই যে দূরের পাহাড় জঙ্গলগুলো দেখা যাচ্ছে ওদিককার পথঘাট তুমি চেনো?"

সতীয়া বলল, "না। কুসমা চেনে। ও জঙ্গলে যায় কাঠ আনতে, শিকারে যায়। কত পাখি মেরে আনে।"

"আমি কাল সকালে ওই জঙ্গলে যাব। ও কি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে?"

সতীয়া ঘাড় নাড়ল। তার মানে নিয়ে যাবে।

"তা হলে একবার ডেকে নিয়ে এসো ওকে।"

সতীয়া চলে গেলে আমি আমার পিস্তলটি একবার বেশ ভালভাবে দেখে আবার নিরাপদ স্থানে রেখে দিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই পাহাড় জঙ্গলের গভীরেই গুপ্তঘাতক ওত পেতে বসে আছে কোথাও। বসন্ত ঠাকুর মূর্তি পেয়েছিল ওখানেই। গ্রামের লোক মূর্তি পেলে তাকে প্রতিষ্ঠা করা এবং পূজাপাঠের আয়োজন একটা করতই। তা ছাড়া একটি মূর্তি যখন ওখানে পাওয়া গেছে তখন মনে হয় আরও অনেক মূর্তি বা লুপ্ত সম্পদ লুকোনো আছে ওখানেই কোথাও। বসন্ত ঠাকুরের মৃত্যু হৃদরোগে হলেও সুরেশ শর্মাকে মারা হয়েছে শুধুই আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য। কেননা জরিপের কাজ শুরু হওয়ায় বহিরাগত দুষ্কৃতীদের গোপন ঘাঁটি আর গোপন থাকবে না। তাই মরার আগে বেশ ভাল করেই মরণ কামড় দিতে চায় ওরা। অতএব আমার কাজ হল ওদের ঘাঁটিটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বার করা।

অনেক পরে সতীয়া এল কুসমাকে নিয়ে। মাঝারি গড়নের ওরই বয়সী মেয়ে। গায়ের রং ঈষৎ তামাটে। সতীয়ার মতো অতটা চাপা বা নম্র নয়। বেশ চালাক চতুর ছটফটে মেয়ে। এরা না পুরোপুরি বন্য না সাধারণ গ্রাম্য। পরনে হাঁটুর ওপরে তোলা আঁটোসাঁটো করে পরা একটি ময়লা রঙিন শাড়ি। হাতে পালক বাঁধা তির ধনুক। মনে হয় শিকারে গিয়েছিল।

ও এসে দাঁড়াতেই বললাম, "তুমিই কুসমা?"

কুসমা একগাল হেসে বলল, "হ্যাঁ আমিই।"

আমি বললাম, "দ্যাখো, আমি এখানে এসেছি বিশেষ একটি কাজে। তোমার এই সাথীয়া সর্তীয়ার বরকে যে লোকটা খুন করেছে আমি তাকে খুঁজে বার করতে চাই। আর ফিরে পেতে চাই সেই বুদ্ধ মূর্তিটা। কেননা ওটা চোরেদের হাতে না থেকে গভর্নমেন্টের হাতে থাকাই উচিত।"

কুসমা বলল, "গরমেন্ট ওই মূর্তি নিয়ে কী করবে?"

"মিউজিয়ামে রেখে দেবে। দেশের সম্পদ দেশেই থাকবে। চোরেরা তা করবে না। টাকা পেয়ে বিদেশিদের হাতে তুলে দেবে।"

"দেশের ওপর যদি এত দরদ তো গরমেন্টই খুঁজে বার করুক না ওগুলো। আমরা মেহনত করব আর গরমেন্ট নাম কিনবে?"

"এটাই তো নিয়ম।"

"এই নিয়ম আমি মানি না।"

"বেশ তো, একজন খুনি ধরা পড়ুক এটা কি তুমি চাও না? বসন্ত ঠাকুরকে ভয় দেখিয়ে মারা হল। সুরেশকে গলা টিপে মারা হল। হয়তো আরও অনেককে এইভাবে মারবে ওরা। তা এসো না আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করে দেখি এই হত্যাকারীকে ধরতে পারি কিনা?"

"আপনি কি মনে করেন ওই খুনি-কাতিল ধরা দেবে বলে জঙ্গলে ঢুকে বসে থাকবে?"

"না। যাতে তাকে কেউ ধরতে না পারে সেইজন্যে সে কোনও গুহার ভেতরে লুকিয়ে থাকবে। এখানকার জঙ্গলের রাস্তা আমি চিনি না। কোথায় কোনদিকে ক'টা গুহা আছে তাও আমার জানা নেই। এখন তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো তবেই একটা উপায় হতে পারে।"

কুসমা একবার কী যেন ভাবল। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "এখান থেকে ওই যে দূরের পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে ওখানে গান্ধারগিরিতে অনেক গুহা আছে। ওই গুহার ভেতরে খোঁজ করলে কিছু মূরতের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।"

"বেশ, তুমি তা হলে ওই গুহাতেই আমাকে নিয়ে চলো।"

"ওই গান্ধারগিরি কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। দিনমানেও ওখানে লোক যায় খুব কম। রাতে তো কথাই নেই। যেমনই ভালুকের উপদ্রব, তেমনই বাঘের। কে যে কোনদিক থেকে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তা কে বলতে পারে?"

"সেইজন্যেই তোমার সাহায্য নেওয়া।"

"তা হলে আপনি তৈরি হোন।"

আমি বললাম, "এখনই যাওয়ার কথা বলছি না। কাল সকালে যাব। দিনমানে না গেলে কাজের অসুবিধে হবে খুব। তা ছাড়া রাতে আমায় থাকতে হবে এখানে। দূর থেকে লক্ষ রাখতে হবে খুনি আবার কাউকে খুন করতে আসে কিনা।"

কুসমা হাসল। বলল, "ঠিক আছে। কাল সকালেই যাব তা হলে। কিন্তু এই কাজের জন্যে আমি কী পাব?"

"কী তুমি চাও বলো?"

"আমি একদিনের জন্যে দশ টাকা নেব।"

মনে মনে হাসলাম আমি। একদিনের জন্যে মাত্র দশ টাকা? দশটা টাকাকেই এরা বোধহয় অনেক টাকা বলে মনে করে। তাই ভাবে দশ টাকা পেলে তার খুব বেশি পাওয়া হয়ে গেল।

আমি বললাম, "প্রতিদিনের জন্য তুমি দশ টাকা নয়, পঞ্চাশ টাকা করে পাবে।"

কুসমা যেন বিশ্বাসই করতে পারল না আমার কথাটা। অবাক হয়ে বলল, "প-ঞ্চা-শ টাকা! আপনি ঝুট বলছেন না তো বাবুজি? এ আমি ভাবতেও পারি না।"

"আমায় দেখে কি তোমার মনে হয় আমি ঝুটা কথা বলার লোক?"

"না না বাবুজি। তা নয়, তবে এটুকু জেনে রাখবেন এখন থেকে আমি আপনার কেনা হয়ে রইলাম। আপনার জন্যে আমি আমার জান দিয়ে দেব। এখন আমি আসি। আপনার কোনও দরকার থাকলে ওই বস্তিতে গিয়ে আপনি কুসমা বলে একটা ডাক দেবেন। নয়তো সতীয়াকে বলবেন। ও ঠিক ডেকে দেবে আমাকে।"

সতীয়াকে সঙ্গে নিয়েই চলে গেল কুসমা।

আমি শয্যাগ্রহণ করে ওই কথাই ভাবতে লাগলাম। দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি এই মেয়েটিই হবে আমার নির্ভরযোগ্য অরণ্য সঙ্গিনী। ওকে বিশ্বাস করে পথ চলে ঠিক জায়গায় গিয়ে যদি পৌঁছতে পারি তা হলে খুনির নাগাল পেতে আমার একটুও দেরি হবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস খুনি আশপাশেই আছে। কিন্তু কী তার মোটিভ সেটাই শুধু বুঝতে পারছি না। বসন্ত ঠাকুরের কাছ থেকে মূর্তিটা হাতিয়ে নেওয়ার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কিন্তু সুরেশ খুনের কারণ? শুধুই কি ভীতি প্রদর্শন? পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে গোলমেলে লাগছে।

এই সমস্ত চিন্তাভাবনা করতে করতে এক সময় একটু তন্দ্রা মতো এসে গিয়েছিল। সতীয়ার ডাকে সেটা কাটল, "বাবুজি চা।"

আমি চোখে-মুখে জল ঝাপটা দিয়ে চা খেয়ে কুনালের তাঁবুতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম ও কীসব কাগজপত্তর নিয়ে একমনে পরীক্ষা করছে। লেবাররা রান্নার কাজে ব্যস্ত।

কুনাল বলল, "কাল ভোরে আমরা নর্থ হিলের দিকে যাব। ওখানকার জঙ্গলে খুঁটি পোঁতার কাজ শুরু হবে কাল থেকে। আজ কয়েকটা গোরুর গাড়িতে করে কিছু মাল পাঠানো হয়েছে ওদিকে। লেবাররা কেউ কেউ আছেও ওখানে।"

আমি বললাম, "তার মানে? ওখানে ওরা থাকবে কোথায়?"

'জঙ্গলের কাছাকাছিই থাকবে।"

"কী নাম তাদের?"

"বাসদেও, শ্যামচাঁদ আর রামধনি।"

"ওরা যে ওখানে থাকবে ওদের মৃত্যুভয় নেই? ওদের মধ্যে থেকেও কেউ তো খুন হতে পারে? তা ছাড়া হিংস্র জন্তুর ভয় আছে।"

"পালা করে রাত জেগে পাহারা দেবে ওরা। আগুন জ্বলবে। না হলে মরবে।"

"এ কাজটা তো এখানেও করতে পারত। তা হলে দু'দুজনের জীবনান্ত হত না।"

"আসলে এখন তো ওরা রেস্টে আছে। কাল থেকে কাজ শুরু হলে ওরা আর ওদের মধ্যে থাকবে না।"

আমি আর কথা বাড়ালাম না। এদের ব্যবস্থাপনা কেমন যেন অগোছালো মনে হল আমার। যাই হোক, তদন্তের কাজে যতই জটিলতা থাকুক এখানকার রহস্যভেদ আমি

করবই।

অনেকক্ষণ ওদের তাঁবুতে বসে গল্প করে ফিরে এসে দেখি সতীয়া আর কুসমা খোশ গল্পে মেতে উঠোনের একপাশে কাঠের জ্বালে মোটা মোটা রুটি সেঁকছে। আর এক পাশে একটি হাঁড়িতে জ্বাল দিয়ে মাংস রান্না করছে।

আমি যেতেই কুসমা বলল, "এত দেরি করলেন কেন বাবুজি, পাহাড় জঙ্গলের দেশ। রাতে একটু ভয়ডর বেশি হয়। জঙ্গল থেকে এক-আধটা জানোয়ারও বেরিয়ে আসতে পারে।"

আমি বললাম, "তা তো আসতেই পারে। বন জঙ্গলের দেশ এটা। ওদেরই তো রাজত্ব। আমরা শহর ছেড়ে ওদের কাছে এলেও ওরা তো শহরে যাবে না। অতএব ও চিন্তা না করাই ভাল।"

সতীয়া বলল, "এখানকার ঠাণ্ডায় আপনার খুব কষ্ট হবে বাবুজি। আপনি ঘরে বসুন। রান্না শেষ হলেই আপনি খেয়ে নেবেন। রাতে ভাল করে ঘুমিয়ে নিন। কাল সকালে কুসমা আপনাকে নিয়ে যাবে পাহাড়ে।"

সত্যিই ঠাণ্ডাটা জাঁকিয়ে পড়েছে। আমি তাই ঘরে গিয়ে বসলাম। শীত এমনই তীব্র যে জানলাটাও খোলা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় কী করে যে সারারাত ধরে ওদের তাঁবুর দিকে নজর দেব তা ভেবে পেলাম না।

একটু পরেই খাবার ডাক এল। গরম রুটি আর পাখির মাংস। কুসমা তখন শিকারে গিয়ে অনেক পাখি মেরে এনেছিল। তারই সুস্বাদু মাংস। বেশ তৃপ্তি করে খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

ওরা দু'জনেও এখানেই খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরে চলে গেল।

আমি শুয়ে রইলাম বটে তবে ঘুম আসতে দিলাম না চোখে। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পর উঠে বসলাম। তারপর কালো ওভারকোটে শরীর ঢেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলাম তাঁবুর কাছে। তাঁবুর মুখ বেশ কায়দা করেই আটকানো। চট করে কোনও জন্তু জানোয়ার ঠেলে ঢুকতে পারবে না ভেতরে। ভেতর থেকে নাক ডাকার শব্দও শোনা যাচ্ছে দু'একজনের। এমনই যেখানে অবস্থা ভেতরের লোক সহায় না থাকলে একজন বহিরাগত ভেতরে ঢুকে মানুষ খুন করে কী করে? কুনাল যতই বলুক, সরষের ভেতরে ভূত এখানে আছেই।

যাই হোক, আমি অনেকক্ষণ এদিক-সেদিক করে শীতের দাপট সহ্য করতে না পেরে ঘরের দিকে এলাম। আর তখনই কে যেন পিছনদিক থেকে কোনও কিছু দিয়ে আমার মাথায় একটা ঘা দিল। সেই প্রচণ্ড আঘাতে আমি দু'চোখে অন্ধকার দেখলাম। তবুও ঘুরে দাঁড়িয়ে জোরে একটা ঝটকা দিতেই মুখ থুবড়ে পড়ল সে। তারপর আবার আমাকে আক্রমণে উদ্যত হতেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর। ওর হাতে তখন চক্‌চক করছে ধারালো একটা ছোরা। অমানুষিক শক্তির ধারক সেই আততায়ীর হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিতেই ছুটে পালাতে গেল সে। মাথায় আঘাত পেয়ে ওর পিছু নিয়ে ওকে ধাওয়া করার মতো শরীরের শক্তি তখন আমার ছিল না। তাই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে ছোরাটা ওর দিকে নিক্ষেপ করতেই একটা আর্তনাদ করে বসে পড়ল ও। তারপর আবার ছোটা শুরু করল। আমরা সর্বাঙ্গ তখন ঝিমঝিম করছে। গা-মাথা ঘুরছে। কেমন যেন করছে শরীরটা। এই

সময় একটু জল পেলে হত। কিন্তু কে দেবে জল? আমি ঘরের দরজার কাছ পর্যন্ত অতিকষ্টে গেলাম। তারপর লুটিয়ে পড়লাম সেখানেই।

চেতনা ফিরল অনেক পরে। তখন আকাশ ফরসা হচ্ছে একটু একটু করে। ধীরে ধীরে উঠে বসলাম আমি। দেখলাম ঘরের দরজাটা দু' হাট করে খোলা। বুঝলাম আততায়ীর প্রধান টার্গেট ছিলাম আমিই। ভাগ্যক্রমে ঘরের বাইরে থাকায় ওকে বিফল হয়েই ফিরে যেতে হচ্ছিল। এমন সময় আমি এসে পড়াতেই ওর এই আক্রমণ। যাক, খুব বেঁচে গেছি এ যাত্রা।

আমি ঘরে ঢুকে দরজায় খিল না দিয়ে আলতো করে ভেজিয়ে শুয়ে পড়লাম। এরপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা জানি না। সতীয়া ও কুসমার ডাকে ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে ওদের দিকে তাকাতেই কুসমা বলল, "শরীর খারাপ নাকি বাবুজি?"

আমি অতিকষ্টে উঠে বসে বললাম কাল রাতের ঘটনার কথা। শুনেই চমকে উঠল ওরা।

সতীয়া কাঁদতে লাগল ঝরঝর করে। বলল, "আপনি চলে যান বাবুজি। এখানে থাকলে আপনি শেষ হয়ে যাবেন। আরও কত খুন যে করবে ওরা তা কে জানে?"

আমি সবিস্ময়ে বললাম, "ওরা কারা?"

"তা কি আমি জানি?"

কুসমা আমাকে ধবে ধরে বাইরে নিয়ে এল। মুখ ধোয়ার জন্য গরম জল করে দিল। বলল, "আমরা চা করছি। আপনি চা খান। খেয়ে বিশ্রাম নিন। আজ আর কোথাও যাবেন না।"

আমি বললাম, "মাথাটা ফাটেনি এই ঢের। তবে কিনা আঘাতের বেগটা সামলে গেছি। সঙ্গে কড়া ডোজের ওষুধ আছে আমার। খেলেই সামলে যাব। আততায়ীকে হাতেনাতে ধরতে না পারলেও মোক্ষম ঘা তো একটা দিয়েছি। কাজেই দেখা পেলে চিনতে ভুল হবে না।"

সতীয়া বলল, "ওর মুখ কি দেখেছেন আপনি?"

"না। মুখ দেখার সুযোগই পাইনি। তবে ছোরাটা বিঁধেছে ওর পিঠের দিকে। সেটাই ওকে চিনে নিতে সাহায্য করবে। তাই ধরা ও পড়বেই।"

যাই হোক, আমি দু'একটা বিস্কুট খেয়ে ব্যথা মরার ক্যাপসুল খেলাম একটা। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দেহের ক্লান্তি দূর করলাম। এই কনকনে শীতে গাঢ় দুধের চা এত ভাল লাগল আমার যে তা বলবার নয়।

আমি চা খেয়ে একটু তরতাজা হলে কুসমা বলল, "কী করবেন বাবুজি, অনেক দূরের পথ। যেতে পারবেন?"

আমি বললাম, "যেতে হবেই। আততায়ীকে ধরার এই তো সময়।"

"এমনও তো হতে পারে সে জঙ্গলের দিকে যায়নি।"

"এছাড়া ওর যাবারও তো জায়গা নেই। ওই অবস্থায় শহরের দিকে গেলেই তো ধরা পড়বে ও।"

"তা হলে তৈরি হয়ে নিন। আমি এখনই আসছি।"

কুসমা চলে গেলে সতীয়া বলল, "আমি এখনও বলছি বাবুজি আপনি যাবেন না

ওদিকে। আমি বাঘনাকে দেখেছি। সে অতি ভয়ংকর। আমি জানি আমার স্বামী সুরেশকে সেই খুন করেছে।''

ওর কথা শুনে চমকে উঠলাম আমি। বললাম, ''বাঘনা কে?'

''আমার স্বামী।''

এবার আর বিস্ময়ের অন্ত রইল না আমার। বললাম, ''সুরেশ তা হলে কে?''

''সে-ও আমার স্বামী।''

''তোমার কথার মানে আমি বুঝতে পারছি না সতীয়া। ঠিক করে বলো ব্যাপারটা কী?''

''বাঘনা আমাদের এই সাতবাহিনীরই ছেলে। খুব ছোটো বেলায় ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। আমি যখন বড়ো হলাম তখন ওর বাবার চাহিদামতো পণ দিতে না পারায় ওরা আমাকে নিল না। এর মধ্যে বাঘনাটা শহরে ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। পরে অবশ্য জেল ভেঙে পালিয়েও গেল।

''মানুষ খুন করার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল ওর। ইতিমধ্যে সুরেশের সঙ্গে পরিচয় হল আমার। কাজের জন্য ডেহরি থেকে এদিকে প্রায়ই আসত ও। আমাকে ও পছন্দ করল। আমার বাবা ওর সঙ্গেই বিয়ে দিল আমার। আমি ভাবলাম জীবনে বোধ হয় সত্যিকারের সুখী হলাম আমি। কিন্তু হঠাৎই একদিন আমার স্বামী খুন হলে সমস্ত স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে গেল আমার। তখনও আমি জানি না বাঘনাই এ কাজ করেছে বলে। কয়েকদিন আগে হঠাৎই ওকে আমি দেখতে পাই। আসলে ইচ্ছে করেই দেখা দিয়েছিল ও। আমাকে শুধু বলল, ''এমন ভুল আর করিস না। আমি কিন্তু মরিনি। বেঁচে আছি। আমিই সরিয়ে দিয়েছি তোর সুরেশকে। এবার তোকেও আমি সরিয়ে দেব। তোর বাপকেও।''

আমি বললাম, ''ওর এখানে আছে কে কে?''

''কেউ নেই। মা মরেছিল অনেক আগেই। বাবা মরেছে কিছুদিন হল, একটা ভাই ছিল। সেও এখন বেপাত্তা। ওর বাবার চাহিদা মেটাতে না পারার ফলেই ওর ঘর করা আমার হয়নি না বাবুজি। ভাবলাম ভালই হল। একটা চোর খুনে গুণ্ডার ঘর না করে একজন ভালমানুষের বউ হওয়া কত ভাগ্যের। কিন্তু সে সুখও আমার সইল না ওর জন্য।''

''তা হলে বসন্ত ঠাকুরের মৃত্যুর কারণও কি ও?''

''সে কথা আমি বলতে পারব না।''

''তোমার এ ব্যাপারটা কুসমা জানে?''

''না। কাউকে বলিনি আমি। কুসমা রাগী মেয়ে। ও শুনলে রাগ সামলাতে পারবে না। হয়তো জেদ করে একাই ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনবে।''

''বাঘনার দলে কজন আছে জানো?''

''কিছুই জানি না। তবে মনে হয় ও একা নেই। একা কেউ ওই ভীষণ জঙ্গলে থাকতে পারে না। তা ছাড়া ওই জঙ্গলে এক ভয়ানক চেহারার লোককেও মাঝে-মাঝে দেখা যায়। তবে সে ক্ষণেকের তরে। তারপর কোথায় যে সে হারিয়ে যায় তা টের পায় না কেউ।''

''তা হলে কুসমা যে একা একা জঙ্গলে যায়, পাখি শিকার করতে, কাঠ আনতে, ওর চোখে কখনও পড়েনি এমন কেউ? ও নিজে কি কখনও কোনও বিপদে পড়েছিল?''

''না। তবে একা ও গভীর জঙ্গলে যায় না। শুধু ও কেন, কেউই যায় না। তাছাড়া

মেয়েরা গভীর জঙ্গলে ঢোকে না বড়ো একটা। তবে বছরে একবার কি দু'বার পরবের সময় সবাই যায় শিকার করতে। তখনই পথঘাট চেনা হয়ে যায়।''

''কুসমা যে বলল ওখানে কোথায় গান্ধারগিরির গুহায় নাকি অনেক মূর্তি লুকনো আছে।''

''লুকনো ঠিক নেই, কোন আমলের মূর্তি ওগুলো কেউ জানে না। বহুদিন ধরে রয়েছে। বসন্ত ঠাকুরের দল হয়তো বা ওইখান থেকে মূর্তি একটা নিয়ে এসেছিল। বাঘনার দলের চোখে পড়ায় উদ্ধার করেছে সেটিকে।''

আমি বললাম, ''খুনি যে বাঘনাই এ ব্যাপারে তা হলে কোনও সন্দেহই নেই আর। বিশেষ করে সে যখন নিজেমুখে স্বীকার করেছে।''

সতীয়া বলল, ''আমার ভয় এখন আপনাকে নিয়ে। কাল রাতে ও বা ওর কোনও লোক যখন চড়াও হয়েছে আপনার ওপর বা আপনার দিক থেকে পালটা আঘাত পেয়েছে তখন যেভাবেই হোক আপনাকে ও মারবেই। এমন কি আপনার বন্ধু কুনালবাবুও পার পাবেন না।''

''কুনাল তো ওর টার্গেট। জঙ্গলের কাজে বাধা সৃষ্টির জন্যই এই হত্যালীলায় মেতেছে ও। যেহেতু তদন্তের কাজে আমি এসেছি তাই আমাকে দিয়েই শুরু করতে চেয়েছিল ওর আতঙ্কবাদ। যাক, এখন আমি সতর্ক। তবে একটা কথা, আমাদের এই অভিযানে যদি বাঘনার কোনও ক্ষতি হয় তুমি তা হলে দুঃখ পাবে না তো?''

''কী যে বলেন! ও আমার সুখের ঘর ভেঙেছে। সুরেশের মতো ছেলে হয় না। আমার অন্তরে সুরেশ ছাড়া আর কারও এতটুকু স্থানও নেই। ও মরলে আমি যে কতটা আনন্দ পাব তা আপনি ধারণাও করতে পারবেন না।''

কথা বলতে-বলতেই কুসমা এল। সেই কালকের মতো পেঁচিয়ে কাপড় পরে তির-ধনুক হাতে অনেকটা শবরীর বেশে এসে দাঁড়াল। বলল, ''কী ব্যাপার! আপনি এখনও গুছিয়ে নেননি? চটপট করুন। না হলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।''

আমি বললাম, ''হোক না রাত। তোমার হাতে তির-কাঁড় থাকলে আর আমার হাতে এটা থাকলে কাউকেই পরোয়া করি না আমি।''

আমার হাতে পিস্তল দেখে শিউরে উঠল কুসমা। বলল, ''এই জিনিস আপনার সঙ্গে রয়েছে, তবুও কাল আপনি জব্দ করতে পারলেন না খুনিটাকে।''

''কী করব বলো। ওই আক্রমণের জন্য যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তাছাড়া মাথায় আঘাতটা এত জোরে পেয়েছিলাম যে কোনও কিছু করার মতো শক্তিও ছিল না আমার। তবুও ওই অবস্থায় কীভাবে যে লড়েছিলাম আততায়ীর সঙ্গে তা শুধু আমিই জানি।''

কুসমা বলল, ''এই অভিযানে সতীয়াও আমাদের সঙ্গে থাকলে ভাল হত। কিন্তু এখানকার মেয়ে হলেও বনে-জঙ্গলে ও ঘোরেনি কখনও। তা ছাড়া ওর বাবা ওকে ছাড়বে না। তবু আমি 'জং'কে সঙ্গে নিয়েছি।''

আমি বললাম, ''জং কে?''

''জং বাহাদুর। একটি নেপালি ছেলে। অমন দুর্ধর্ষ প্রাণী বোধ হয় জীবজগতে নেই। ও আমার একান্ত অনুগত। ওর একটা কুকুর আছে সেটাও খতরনাক্।''

কুসমার কথা শুনে উত্তেজনায় আনন্দে আমার বুক ভরে উঠল। সতীয়াকে বললাম, ''আমার ঘরে টুকিটাকি জিনিস যা আছে ওগুলো তুমি দেখো। আমি শুধু ওষুধগুলো আমার

সঙ্গে রাখছি। বাদবাকি সব এখানেই থাক।”

সতীয়া বলল, “আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আপনার জিনিসপত্তরগুলো আমার ঘরেই রেখে আসি। আমি ফিরে এলে আপনারা যাবেন।”

আমি সঙ্গে যা যা নেওয়ার তা নিয়ে আমরা স্যুটকেসটা সতীয়াকে দিলাম। ও সেটা নিয়ে চলে যাওয়ার পর এমনই এক দুঃসংবাদ পেলাম যা শুনব বলে ভাবতেও পারিনি।

কুনালের একজন লেবার এসে খবর দিল কাল শেষরাতে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে কুনাল একবার তাঁবুর বাইরে গেলে হয় তাকে বাঘে ধরেছে, নয় তো হাপিস করেছে কেউ। কেন না আর সে তাঁবুতে ফেরেনি।

চাঞ্চল্যকর সংবাদ। এমন যে হবে বা হ'তে পারে তা অপ্রত্যাশিত নয়। বাঘে ধরলে সেটা নিছকই দুর্ঘটনা। কিন্তু কেউ যদি তুলে নিয়ে যায় তা হলে সেটার জন্য পূর্ণ তদন্ত চাই।

আমি সেই লেবারকে নিয়ে তখনই গেলাম এখানকার থানায়। থানাকে এরা কোতোয়ালি বলে। নামেই থানা। ছোট্ট একটা ফাঁড়ি ছাড়া কিছুই নয়। ওখানে গিয়ে অভিযোগ জানাতে বা ডায়রি নিতে বললে প্রথমে আমলই দিলেন না ওঁরা। পরে আমার নাম লেখা কার্ড দেখে একবার তাকালেন আমার দিকে। বললেন, “প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর! মিঃ অম্বর চ্যাটার্জি!”

বললাম, “হ্যাঁ। আমি নিজের ইন্টারেস্টে এখানে তদন্ত কবছি। প্রয়োজনে আইনি সাহায্য নিতে চাই।”

ওখানকার যিনি ভারপ্রাপ্ত হাবিলদার তিনি বললেন, “এনি প্রবলেম আপনি আমার কাছে চলে আসবেন। আমি আপনাকে হেল্প করব। আমার এখানে তো লোক কম। বেশি করে লোক আনিয়ে রাখব আমি।”

আমার আর কোনও বক্তব্য নেই। ভিনরাজ্যে কিছু করার আগে প্রশাসনকে জানানো দরকার। সে কাজটা করে রাখলাম।

থানা থেকে বেরিয়ে একবার গেলাম কুনালের তাঁবুতে। সেখানে গিয়ে শুনলাম আর এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ। গত সন্ধ্যায় জঙ্গলের কাছে যে তাঁবু পাতা হয়েছিল এবং যে তিনজন সেখানে কাঁটাতারের প্রহরায় ছিল তাদের মধ্যে বাসদেও নামের একজন লেবারও হঠাৎই নিখোঁজ। লেবারদের মধ্যে সেই সবচেয়ে পুরনো। জঙ্গলের পথঘাটও সে ভাল চেনে। ডেহরি অন শোনের কাছে বড়কি সালাইয়াতে সে থাকে। তার অন্তর্ধান আরও রহস্যময়। সে মানুষ গুম হবে তা ভাবা যায় না। শুধু তাই নয়, যার অপঘাতে মরবার বাসনা হবে সেই তাকে খুন করতে আসবে।

তাঁবু থেকে ফিরে যখন বাসায় এলাম তখন দেখি সবাই হানটান করছে আমার জন্য। কুসমা, সতীয়া এবং জং। বেঁটেখাটো চেহারার এই নেপালি কিশোর দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত। ওর সমস্ত অবয়বে চোখের চাহনিতে তারই সুস্পষ্ট ছাপ। কুনালের অন্তর্ধানের কথা সবাই জেনেছে ওরা।

কুসমা বলল, “আমরা সবাই যাচ্ছি। সতীয়াও সঙ্গে যাবে বলছে। ওর বাবা না করেনি। অনেক দূরের পথ। তাই বলি কী, দেরি যখন হলই তখন এখনই না গিয়ে স্নান খাওয়া সেরে দুপুরে যাওয়াই ভাল। হয়তো আজকের রাতটা জঙ্গলেই কাটাতে হবে আমাদের।”

আমি বললাম, “সেই ভাল। এখন গন্ধর্বগিরিতে গিয়ে প্রাচীন মূর্তি উদ্ধারের চেয়ে

আমার বন্ধুকে কীভাবে উদ্ধার করা যায় সেই চেষ্টাই করব। সেইসঙ্গে খোঁজ নেব বাসদেও-এর। ওর সম্বন্ধে যা শুনেছি তা যদি সত্য হয় তাহলে অমন একজন শক্তিমান উধাও হয় কীভাবে?"

কুসমা বলল, "আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে। কেউ ওদের কিছুই করেনি। বরং ওরাই খুনির উপস্থিতি টের পেয়ে খুনিকে অনুসরণ করেছে।"

কুসমার কথার উত্তরে বললাম, "এরকম হলে তো ভালই হয়। তবে কিনা আমার বন্ধু কুনাল অত্যন্ত নার্ভাস ও ভীরু প্রকৃতির। এত সাহস ওর হবে না। তা ছাড়া বাসদেও নিখোঁজ হয়েছে সন্ধের সময়, কুনালের অন্তর্ধান শেষরাতে।"

আর কোনও কথা নয়। আমরা স্নানাহারের ব্যবস্থা করতে লাগলাম। জং বাহাদুর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তরগুলো গুছিয়ে বাঁধতে লাগল একটা গাঁটরিতে। এগুলো ওকেই বইতে হবে। এই অভিযানে ওর সহযোগিতা ভগবানের দান ছাড়া কিছু নয়।

দুপুর গড়াতেই আমরা অভিযান শুরু করলাম। কুসমা, সতীয়া, জং বাহাদুর ও আমি। সঙ্গে পাহাড়ি অঞ্চলের একটি লেজকাটা দেশি কুকুর টেগো। কুকুরটি জং-এর একান্ত অনুগত। এখন পরিচয় সূত্রে আমারও।

আমার মনে অফুরন্ত আনন্দ। তার কারণ এই অভিযানে সাফল্য যে অনিবার্য তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কেননা আমাদের চেয়েও অনেক বেশি বেপরোয়া এই টেগো। এবং মানুষের চেয়েও সেরা গোয়েন্দা এরাই। ঘ্রাণের সাহায্যেই এরা ধরে নিতে পারে আততায়ী কোথায় লুকিয়ে আছে। মানুষের অগম্য স্থানেও এরা সহজেই চলে যেতে পারে।

যাই হোক, রওনা হওয়ার পর মুহূর্তেই টেগোর বাহাদুরি টের পেলাম আমরা। কাল রাতে আমার নিক্ষিপ্ত ছোরার আঘাতে মাটিতে যে রক্ত ঝরেছিল আততায়ীর তাই শুঁকে শুঁকে ও আমাদের জঙ্গলের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল।

আমাদের কারও মুখে কোনও কথা নেই।

সবাই চলেছি আমরা টেগোকে সঙ্গে নিয়ে।

সাতবাহিনীর প্রান্তে এসে একটা শীর্ণা নদী পার হলাম আমরা। এইবার শুরু হল অরণ্যের বিস্তার। টেগো সমানে গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎই এক জায়গায় এসে চাপ চাপ রক্তের দাগ দেখে থামল টেগো। তারপর ছোট্ট একটি গুহার দিকে ছুটল। গুহার মুখে দাঁড়িয়ে ভয়ংকর রাগে ঘেউ ঘেউ করতেই আমরা গিয়ে হাজির হলাম সেখানে।

মনে হল গুহার মধ্যে কেউ যেন আশ্রয় নিয়েছে। সামনেই পড়ে আছে একটি রক্তমাখা ছোরা। দেখেই অনুমান করলাম আততায়ী এটা দিয়েই আমাকে আক্রমণ করেছিল এবং পরে আমিই এটি অব্যর্থ লক্ষ্যে আততায়ীর দিকে ছুঁড়ে দিই। মোক্ষম লাগা লেগেছিল নিশ্চয়ই। না হলে এটা দিয়েই সে আমাকে পালটা আঘাত করত।

গুহাটি এতই ছোটো যে এক দুজনের বেশি এখানে কেউ থাকতে পারে না। থাকা সম্ভব নয়।

আমি বললাম, "ভেতরে যে আছো বাইরে এসো।"

কুসমা জোর গলায় বলল, "অন্দরমে কোঈ হ্যায় তো বাহার নিকাল।"

ভেতরে একজন কেউ যে আছে তা দেখাই যাচ্ছে। তাই জং বাহাদুর ভেতরে ঢুকে তার হাত ধরে টেনে আনল হিড়হিড় করে। যে এল তাকে দেখেই ভূত দেখার মতো চমকে

উঠলাম আমরা।

সতীয়া সবিস্ময়ে বলল, "বাসদেও তুম!"

বাসদেও সাড়া দেবে কী, তার অবস্থা তখন সত্যিই কাহিল। আমার নিক্ষিপ্ত ছোরাটা তার পিঠে না লেগে ঘাড়ে লেগেছে। পিঠে লাগলে মোটা জামা সোয়েটারে হয়তো গাঁথতই না। কিন্তু ঘাড়ে লাগার ফলে তার অবস্থা সঙ্গিন। ভাল করে কথাই বলতে পারছে না সে।

তবু আমি বললাম, "কাল তুমি আমার ওপরে চড়াও হলে কেন বাসদেও?"

বাসদেও অতিকষ্টে বলল, "পিটারের নির্দেশ।"

শুনেই চমকে উঠলাম, "পিটার! পিটার কে?"'

"মালগাড়ির ড্রাইভার ছিল আগে। রেলের কয়লা চুরি করে বেচে দিত। একবার হাতে-নাতে ধরা পড়ে চাকরিটা খোয়ায়। আমার এই চাকরিটা ও-ই করে দিয়েছিল। ও এখন স্মাগলিং করে খুন, চুরি, ডাকাতি করে আর লুকিয়ে থাকে এই জঙ্গলে।

"কিন্তু আমি ওর টার্গেট হলাম কেন?"

"আপনি নতুন হুজুরের দোস্ত, তাই।"

"এবার বলো সুরেশ শর্মার খুনি কে?" যদিও জানি, তবুও এই প্রশ্ন করলাম।

বাসদেও বলল, "সুরেশকে মেরেছে বাঘনা। প্রতিশোধ নেবে বলে।"

"বসন্ত ঠাকুরের মৃত্যুটা তা হলে কীভাবে হল?"

"ওকে মেরেছে পিটার। ভয়ের মুখোশ পরে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে ওকে ভয় দেখাতেই হার্টফেল করে ও।"

"পিটার এ কাজ করল কেন?"

"ওই মূর্তিটার লোভে।"

বাসদেও-এর আঘাত এমনই গুরুতর যে ভাল করে কথাও বলতে পারছে না। তবু সে করুণভাবে বলল, "থোড়া পানি মিলে গা?"

জং সঙ্গে সঙ্গে জেলের পাত্র থেকে একটু জল নিয়ে ওর মুখে দিল। সেই জল খেয়ে ও যা বলল তা হল এই—গত সন্ধ্যায় পিটারের নির্দেশে আমাকে খুন করতে এসে ও যে অমন পালটা আঘাতের মুখোমুখি হবে তা ভাবতেও পারেনি। বুধিরাম, শ্যামচাঁদ আর ও যখন জঙ্গলের ধারে তার পাহারা দেওয়ার সময় একটু নেশা করছিল তখনই বাঘনা এসে বলে পিটারের নির্দেশ ওই বাইরের আদমিকে খতম করতে হবে। সেই নির্দেশ পেয়েই ও চলে আসে। পরে ঘাড়ের কাছে ছোরাটা বেশিরকম গিঁথে যাওয়ায় সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে যায়। ছোরাটা অস্থানে গিঁথে যাওয়ায় এবং প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে চলবার শক্তি হারিয়েই আশ্রয় নেয় এখানে। পিটারের দল জানেও না ও কোথায় এবং কী অবস্থায় আছে।

আমরা চাপ দিয়ে ওর কাছ থেকে জেনে নিলাম আরও অনেক কথা। এই পাহাড় জঙ্গলে তিনজন আছে ওরা। পিটার, বাঘনা আর জোজো। জোজোও বেশ কয়েকটা খুনের আসামী। পিটারই ওদের জেল ভেঙে পালিয়ে আসতে সাহায্য করে। ওরা এই জঙ্গলে পাহাড়ের গুহায় রাত কাটায়, বনের পশুপক্ষী মেরে খায় আর এখানে চারদিকে যেসব মূর্তি বা অন্য কিছু পায় তা রাতের অন্ধকারে পাচার করে। ওদের অসাধ্য কিছু নেই। কিন্তু বাধ্য হলে ওরা কিছু বলে না। কাজের বিনিময়ে সামান্য টাকা-পয়সাও দেয়। অবাধ্য হলে পরিণাম হয় ভয়ংকর। বাসদেও এও স্বীকার করল বাঘনার দেওয়া গাছের পাতা শুঁকিয়ে

সবাইকে ও ঘুম পাড়িয়ে রাখত আর পিটার ও বাঘনাকে তাঁবুতে ঢোকার সুযোগ করে দিত। তবে এ-কাজ ও দু'বারই করেছিল। কেননা এতদিন তো এখানে জোরদার কাজকর্ম হয়নি। কাজ শুরু হয়েছে কয়েক মাস।

বাসদেওয়ের বক্তব্য শুনে ওকে বললাম, "শোনো, ছোরাটা যেখানে বিঁধেছে সে জায়গাটা খুবই খারাপ জায়গা। মনে হয় ঘাড়ের হাড় ফুটো হয়ে গেছে। কাল সন্ধে থেকে এখন পর্যন্ত কোনও ওষুধ পড়েনি, ব্যান্ডেজ হয়নি। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে তোমার। ফলে সহজে সেরে ওঠা কঠিন। জীবন-সংশয় হতে পারে। এখন তোমার একটাই রাস্তা হয় মৃত্যুকে মেনে নেওয়া, নয়তো শহরে গিয়ে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে পুলিশে আত্মসমর্পণ করা। যদি মৃত্যু চাও তা হলে যা খুশি তাই করো। যদি বাঁচতে চাও, ধরা দাও।"

আমাদের কথাবার্তার ফাঁকেই বনভূমি কাঁপিয়ে একটি গুলির শব্দ আমাদের কানে এল। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাসদেও লুটিয়ে পড়ল সেখানে।

কে কোথা থেকে গুলি করল কিছুই টের পেলাম না আমরা। ততক্ষণে ভয়ংকর গর্জনে টেগো ছুটে গেল শব্দের উৎসস্থল লক্ষ্য করে। কাঁধের বোঝাটা নামিয়ে রেখে জং-ও ছুটল সেইদিকে। কুসমাও তির ধনুক হাতে নিয়ে দ্রুত অনুসরণ করল ওদের।

সতীয়া স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমিও নির্বাক।

দেখতে দেখতে অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। তবুও ওরা কেউ ফিরল না। অনেক পরে আহত রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরে এল জং। বহুকষ্টে বলল, "কুসমাকে বাঁচাতে পারলাম না।"

"কেন? কী হল কুসমার?"

"শয়তান পিটার ওকে নিয়ে গেছে। আমি বাধা দিতে গেলে জোজো আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারে।"

"তোমার টেগো কোথায়?"

"ও জোজোকে কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে। ওর অবস্থা এমনই করেছে যে সামান্যতম বাঁচার আশাটুকুও আর নেই ওর। আমি বহুকষ্টে নিজেকে সামলে এখানে এসেছি।"

আমি বললাম, "শোনো, তুমি এখনই সতীয়াকে নিয়ে নীচে চলে যাও। আমার কাছে টর্চ পিস্তল সবই আছে। আমি যেভাবেই হোক উদ্ধার করব কুসমাকে। তুমি বরং চেষ্টা করো গ্রাম থেকে কিছু লোকজনকে ডেকে নিয়ে আসার।"

জং বলল, "বৃথা চেষ্টা বাবুজি। গ্রামের লোক কেউ আসবে না। বরং আমাকেই বকাবকি করবে আপনাদের এখানে নিয়ে এসেছি বলে।"

সতীয়া বলল, "কুসমাকে না নিয়ে আমিও গ্রামে ফিরব না। চলুন, এইভাবে এখানে না থেকে আমরা ওর সন্ধানে যাই।"

আমরা আর দেরি না করে জং-এর সঙ্গে এগিয়ে চললাম ধীরে ধীরে। ঘন অন্ধকারে চারদিক তখন ঢেকে গেছে। নিশাচর পশু পাখিদের ডাকে বনভূমি আতঙ্কিত। একটি পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে জঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে চলেছি আমরা। পথ বলে কোনকিছুই নেই এখানে। শুধু টর্চের আলোয় জং-এর সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া।

সতীয়া পাহাড়ে ওঠায় অভ্যস্ত না হলেও বেশ উঠছে। কখনও আমি কখনও জং হাত ধরে টেনে তুলেছি ওকে। এইভাবে যেতে যেতে একসময় আমরা এসে পৌঁছলাম সেই অর্ধমৃত জোজোর কাছে। অমন বিশাল শরীর নিয়ে যে অবস্থায় পড়ে আছে সে তা দেখলে

সত্যিই মায়া হয়। টেগো ওর গলার টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে। তাই কথা বলার শক্তিও হারিয়েছে ও।

আমি ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললাম, "আজই তোমার শেষ রাত বন্ধু। কেননা তোমার যা অবস্থা তাতে সকাল পর্যন্ত তুমি বাঁচবে না। এখন বল কুসমা কোথায়? পিটার ওকে কোথায় নিয়ে গেছে?"

জোজো কথা বলতে পারল না। ওর চোখের কোল বেয়ে দু'-এক ফোঁটা জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। শুধু অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দিল পাহাড়ের আরও একটু উচ্চস্থানের দিকে।

জং বলল, "বাবুজি, এইভাবে পথ চলা কিন্তু আমাদের ঠিক হচ্ছে না।" বলতে-বলতেই থেমে দাঁড়িয়ে হাত ধরে টান দিল আমার। সতীয়াও সরে এল খুব কাছে।

জং বলল, "ওই দেখুন।"

আমরা তাকিয়ে দেখলাম প্রায় কুড়ি-পঁচিশটা কালো রোমশ ভালুক পাহাড় থেকে নীচে নামছে হয়তো জল বা আহারের সন্ধানে। আমরা পাহাড়ের বড় একটি পাথরের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে বসে রইলাম চুপ করে। একটু পরে পথ ফাঁকা হলে আমরা আবার পর্বতারোহণ শুরু করলাম। এক জায়গায় একটু সমতল মতো অংশে অপরিসর একটি গুহার সামনে এসে জং বলল, "আপাতত এই গুহাটাই আমাদের নিরাপদ স্থান।"

আমি বললাম, "এর ভেতরে আশ্রয় নেওয়া কি সম্ভব?"

জং বলল, "সম্ভব এবং দারুণ নিরাপদ। এর বাইরেটা এমন হলেও ভেতরে জায়গা অনেকখানি। শিকারে এসে এর আগে বেশ কয়েকবার এই গুহায় রাত কাটিয়েছি আমি।"

আমি দেখলাম রাত্রিবাসের পক্ষে এই গুহার বিকল্প নেই। বাইরে থেকে দেখলে গুহা বলে মনেই হবে না একে। মনে হবে পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটল ছাড়া কিছুই নয়। একজন লোক কোনও মতে আড়ভাবে ঢুকতে পারে ভেতরে। তাও খুব মোটা লোকের ঢোকা অসম্ভব। এমন গুহা দেখেছিলাম পাঁচমারির গুপ্তেশ্বরে। তারপরে এই।

যাই হোক, আমরা বহুকষ্টে পাথরের গায়ে গা ঘষে ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরটা আবিল অন্ধকারে ঢাকা। টর্চের আলোতেও অন্ধকার দূর হল না। জং একটা বাতি ধরাতে অনেকটা পরিষ্কার হল।

ভেতরটা সত্যিই প্রশস্ত। দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে বসে থাকা যায়। দেখে মনে হল পাহাড়িরা মাঝে-মধ্যেই এসে থাকে এখানে।

জং বলল, "বাবুজি, আপনি আর সতীয়া এখানে থাকুন। আমি একটু খোঁজ নিয়ে দেখি কুসমাকে কোথায় নিয়ে গেল পিটার। সেইসঙ্গে খোঁজ নিই টেগোর। ও তো এইভাবে হারিয়ে যাবার কুকুর নয়। বাঘেও ধরতে পারে। সেরকম হলে অবশ্য ওর আর্তনাদ শোনা যেত।"

আমি বললাম, "টেগোর সন্ধান পেতে হলে তোমাকে আবার ফিরে যেতে হবে সেই ছোট্ট গুহাটার কাছে। বাসদেও যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে।"

জং বলল, "সেখানে তো যাবই। তবুও জেনে রাখবেন সে আশেপাশেই কোথাও আছে। দূরে থাকলেও গন্ধ শুঁকে ঠিক এসে খুঁজে নেবে আমাদের।"

জং যাবার উপক্রম করতেই বললাম, "তুমি যে এভাবে যাচ্ছ, তুমি তো নিরস্ত্র, ভয় করছে না?"

"উপায় নেই বাবুজি, একটা রাতের ভেতরে কী না কী হয়ে যেতে পারে। কুসমাকে

উদ্ধার করতেই হবে পিটারের হাত থেকে। তবে একেবারেই নিরস্ত্র নই আমি। বিপদে জান বাঁচানোর মতো কিছু একটা আছেই আমার কাছে। বাসদেওয়ের ওখানে পাওয়া সেই ছোরাটাও আমি সঙ্গে রেখেছি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি ততক্ষণে চারদিকে একবার টহল দিয়ে আসি।" তারপর বলল, "আপনি কিন্তু আমি না আসা পর্যন্ত ভুলেও কোথাও যাবেন না। সতীয়াকে আপনার ভরসাতেই রেখে গেলাম।"

জং চলে গেল। যাওয়ার সময় আমার টর্চটা পর্যন্ত সঙ্গে নিল না সে। কী দুঃসাহস। ওর সাহস দেখে মনে হল এই কুটিল অরণ্যে পাহাড় জঙ্গলের দেশে ও যেন এক নেপালি শার্দুল।

ও চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে সতীয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলাম একবার। দু' হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে কেমন বসে আছে চুপচাপ। ওর চোখে কোনও উদ্বেগ বা উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। অদ্ভুত এক প্রকৃতি এবং এই অভিযানে বোঝা স্বরূপ। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ভয় করছে না তো?"

ও বলল, "না।" বলে টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

এইভাবে কতক্ষণ বসেছিলাম তার ঠিক নেই। হঠাৎই টেগোর চিৎকারে সচকিত হয়ে কোনরকমে বাইরে এলাম। এসেই টর্চের আলো ফেলে দেখি এক জায়গায় বড়ো একটি পাথরের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জং। ওর নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছে। আর ওকে ঘিরে কুঁই কুঁই করছে টেগো। আমি যেতেই ছুটে এসে আমার পায়ে গড়াগড়ি খেল একবার, তারপর আবার ছুটে গেল জং-এর কাছে।

আমি জং-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখলাম ও তখন সংজ্ঞাহীন। তবে মনে হল কারও আক্রমণে নয়, অন্ধকারে দ্রুত চলতে গিয়ে কোনও কিছুতে হোঁচট খেয়েই পড়েছে ও। এখন ওকে গুহায় নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আমি গুহামুখের কাছে এসে সতীয়া-সতীয়া বলে হাঁক দিতেই সতীয়া বেরিয়ে এল। তারপর আমরা ওকে ধরাধরি করে বহুকষ্টে গুহার ভেতরে নিয়ে গেলাম।

সতীয়া ওর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। আমাদের সেই গাঁটরিটা ছিল গুহার বাইরে। সেখান থেকেই পাওয়া গেল জলের বোতলটা। খুব বেশি জল অবশ্য ছিল না। যতটুকু ছিল তাতেই কাজ চলে গেল।

জংকে গুহায় নিয়ে এলেও টেগোর ছটফটানি কিন্তু কমল না। সে সমানে কুঁই কুঁই করে আমার প্যান্ট কামড়ে টানাটানি করতে লাগল। বারবার ছুটে গেল গুহার বাইরে। ওর ভাব দেখে বুঝলাম নিশ্চয়ই ও কিছু বলতে চায়। অর্থাৎ কোনও কিছুর সন্ধান ও পেয়েছে। হয়তো কুসমার কাছেই আমাকে নিয়ে যেতে চায় ও।

আমি সতীয়াকে বললাম "তুমি জংকে দেখো। আমি টেগোর সঙ্গে যাই। মনে হচ্ছে ও কুসমার সন্ধান জানে।"

"কিন্তু বাবুজি, আপনার যদি কোনও বিপদ হয়?"

"হতেই পারে। বিপদ হবে জেনেই তো অভিযানে এসেছি। এসেছিলাম বলেই সন্ধান পেলাম চক্রটার। কুসমাকে ফিরে পেলেও খুঁজে বের করতে হবে আমার বন্ধুকে। কেননা তার অন্তর্ধানও রহস্যময়।"

নিরীহ গোবেচারা সতীয়া আমার মুখের দিকে অবাক চোখে চেয়ে রইল। আমি বললাম, "বাতিটা নিভে আসছে। ওটা নিভে গেলে অন্ধকারেই থেকো। আর বাতি জ্বেলো

না। কেননা আলোর প্রভা দেখে শত্রুরা হয়তো এখানে এসে উপদ্রব করতে পারে।"

আমি আর দেরি না করে টেগোর পিছু-পিছু এগিয়ে চললাম ওকে অনুসরণ করে। অনেকটা উচ্চস্থানে ওঠার পর হঠাৎই একটি আর্তনাদ শুনে থমকে দাঁড়ালাম।

টেগোও কান খাড়া করে শুনল সেই আর্তনাদ। তারপর আবার ওপরে ওঠা শুরু করল।

আর্তনাদটা আরও স্পষ্ট হল এবার। নিদারুণ যন্ত্রণায় কেউ যেন ছটফট করছে। আর্তনাদ শুনেই টেগো বীরবিক্রমে ছুটে গেল সেখানে। আমি কোনরকমে স্পটে গিয়ে দেখি এক ভয়ানক কাণ্ড। কে যেন একজন দু'হাতে চোখ ঢেকে ছটফট করছে সেখানে। তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ ডাক ছেড়ে চিৎকারে মাত করল টেগো। চেহারা দেখেই মনে হল এই সেই নাটের গুরু পিটার। পাহাড়ি মেয়ে কুসমার অপহরণকারী। এতদিনে উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে সে। কুসমা নিশ্চয়ই ওর কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এই কাজে করেছে। একেবারে প্রাণে না মেরে ওর তীরের ফলায় শয়তানের দুটো চোখই অন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু কুসমা? তাকে কোথায় পাব? এই রাতের অন্ধকারে বনে পর্বতে কোথায় আছে সে?

পিটারের দিক থেকে আর কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই দেখে ওর দিকে আর নজর দিলাম না। এদিকে রাত যত বেশি হচ্ছে বন্য জন্তুদের ডাকও তত বাড়ছে। এই অবস্থায় এভাবে বাইরে থাকা খুবই বিপজ্জনক। জং-দের গুহা থেকে অনেক ওপরে উঠে এসেছি এখন। ফিরে যেতেও সময় লাগবে। অথচ কুসমারও কোনও অস্তিত্ব নেই। যার খোঁজে তাকেই যদি না পেলাম তো এত কষ্ট করে এখানে এসে লাভ কী হল? আর এই পরিস্থিতিতে সন্ধান না জেনে খুঁজে ফেরাও অসম্ভব। তবে মন বলছে ধারে কাছেই আছে ও। আমি মুখের পাশে দুটো হাত রেখে হাঁক দিলাম, "কুসমা। কু-স-মা!"

কোনো প্রত্যুত্তরই এল না।

বার দুই হাঁক দিতেই টেগোও ঘেউ ঘেউ করে ডাক ছাড়তে লাগল। হঠাৎই টেগো দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার। একটু উচ্চস্থানে বাঁকের কাছে গিয়ে ক্রমাগত চিৎকার করতে লাগল। আমি দ্রুত ওর কাছে গিয়ে দেখি পাহাড়ের গায়ে একটি ফাটলের ভেতর থেকে ক্ষীণ একটু আলোর দিশা পাওয়া যাচ্ছে। এটাও যে ওইরকমই একটি গুহা তা বুঝতে দেরি হল না। তবে ব্যতিক্রম একটাই, হামাগুড়ি দিয়ে না ঢুকলে এর ভেতরে ঢোকা অসম্ভব।

আলোর দিশা যখন পাওয়া গেছে তখন বন্যজন্তু নয়, মানুষের অস্তিত্বই যে রয়েছে এখানে তা বেশ বোঝাই যায়। আমার নির্দেশ পেয়েই টেগো দ্রুত সেই গুহার মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর বেরিয়ে এসে আবার ঘেউ ঘেউ ডাক ছাড়তেই আমিও ঢুকে গেলাম ভেতরে। গিয়েই দেখি গুহার দেওয়ালে পিঠ রেখে কেমন যেন চোখে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে কুসমা। আমি ওর খুব কাছে গিয়ে বললাম, "এ কী! তুমি এভাবে বসে আছ কেন? আমরা কত খুঁজছি তোমায়।"

কুসমা বলল, "কীভাবে যে ওই শয়তানের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছি তা আমিই জানি। আমার ঘাড়ের কাছে এমন দু'জায়গায় রদ্দা মেরেছে যে এখনও আমার মাথা ঘুরছে। আমি উঠে দাঁড়াতে পারছি না। তবু তারই মধ্যে ওর যা করেছি তাতে আর কখনও কোনও অন্যায় কাজ করতে সাহস করবে না ও।"

"পিটারের কথা বলছ তো? ও এখন অন্ধ চোখ নিয়ে ছটফট করছে।" বলে ওর ঘাড়ের পাশে আলতো করে একটু হাত বুলিয়ে দিলাম। তারপর আমার সঙ্গে রাখা ব্যথা

কমার ওষুধ একটু খাইয়ে দিলাম। গুহাটি নীচের সেই গুহার থেকেও অনেক প্রশস্ত। দেখে মনে হল এটাই পিটারের আসল ঘাঁটি। কেননা এখানে খাওয়ার শোওয়ার সব রকমেরই ব্যবস্থা আছে।

অনেক পরে একটু সুস্থ হয়ে কুসমা বলল, "ওদের দেখছি না কেন? ওরা কোথায়?"

আমি সমস্ত ঘটনার কথা বললাম ওকে। তারপর টেগোর সাহায্য নিয়ে কীভাবে এখান এসেছি তা ও বললাম।

কুসমা বলল, "আপনার সাহস তো কম নয় বাবুজি। খুব ভাগ্য ভাল যে এতক্ষণে আপনি বাঘের পেটে যাননি। ঈশ্বরের কত দয়া আপনার ওপর।"

আমি বললাম, "না হবেই বা কেন? কোনও অন্যায় অভিসন্ধি নিয়ে তো আমি আসিনি। তবে এই অভিযানে এসে একটাই লাভ, অপরাধী চিহ্নিত হল। মূল অপরাধী এখন হাতের মুঠোয়। আজ রাতে যদি বাঘের পেটে না যায় তা হলে কাল সকালেই ওকে হাতকড়া পরতে হবে। চারজন অপরাধীর মধ্যে দু'জন মৃত। একজন প্রায় ধৃত আর একজন বেপাত্তা। সে হল বাঘনা।" তারপর আবার বললাম, "তুমি জানো কি না জানি না বাঘনাই খুন করেছিল সুরেশকে। একথা সতীয়াই আমাকে বলেছে একটু গোপনে।"

কুসমা বলল, "ওমা! সে কী! জানতাম না তো?"

আমাদের কথাবার্তার ফাঁকেই কখন যে হঠাৎ টেগোটা উধাও হয়েছে তার হদিশই পেলাম না আর। কোথায় গেল টেগো?

আমি গুহামুখে এসে দু'একবার হাঁক দিলাম 'টেগো-টেগো' করে কিন্তু কোনও সাড়াশব্দই পেলাম না ওর।

কুসমা বলল, "ও নিশ্চয়ই আপনাকে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে অসুস্থ জং-এর কাছে ফিরে গেছে। যাক, আজ রাতে এই গুহা থেকে বেরোনো নয়। জীবনের ঝুঁকি খুব বেশি নিতে নেই। ওরা ওখানে থাকুক নিরাপদে আমরা এখানে। এখন দেখি রাতের খাওয়ার কোনও ব্যবস্থা করা যায় কিনা।"

বললাম, "সেই ভাল। কিন্তু জল?"

"জলের অভাব হবে না। গুহার শেষ প্রান্তে এক জায়গায় চুঁয়ে চুঁয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। মনে হয় কোনও ঝরনা আছে ওপরে। ওখানে যে-কোনো একটা পাত্র বসিয়ে জল ভরে নেওয়া যাক।"

আমি টর্চের আলোয় সেদিকে এগিয়েই দেখলাম ওর অনুমানই ঠিক। তবে আমাকে আর মেহনত করতে হল না। নির্দিষ্ট জায়গার একটি তামার হাঁড়ি-বসানো আছে। পাশেই একটি কাচের গেলাস। এখানে বেশ কয়েক জায়গার জল পড়ছে টপটপ করে। এবং নীচের ফাটল দিয়ে বেরিয়েও যাচ্ছে। জল বরফের মতো ঠাণ্ডা। তবে সুখের বিষয় একটাই, গুহার ভেতরটা গরম। শীতের তীব্রতা একদমই নেই।

কুসমা বলল, "জলের অভাব যখন নেই তখন রান্নার কাজেও অসুবিধে হবে না। একগাদা ডিম ও আস্ত দুটো মুরগি ছাড়ানো আছে এখানে। চাল, আটা, তেল, নুন, মশলা সবই আছে দেখছি। একটু কষ্ট করে শুধু ফুটিয়ে নেওয়া। আপনি আমাকে সাহায্য করুন আমি দু'মিনিটে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

এই গভীর নির্জনে অরণ্যদুহিতা কুসুমার উৎসাহ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কিছু কাঠকুটো ভেতরে রাখাই ছিল। তাই নিয়ে চলে এলাম গুহার বাইরে। রান্নার ব্যবস্থাটা

এখানেই হোক। ভেতরে আগুন জ্বাললে ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে যাবে।

এই বনপ্রদেশে পার্বত্য গুহায় মুরগির মাংস আর গরম ভাত যেন কল্পনার অতীত। আমাদের রান্না যখন প্রায় শেষ তখনই টেগোর হাঁকডাকে সচকিত হলাম আমরা। চেয়ে দেখি জং বাহাদুর ও সতীয়া তাকে অনুকরণ করেই আসছে।

জং এসে একটা কথাই বলল, "বাঘনাটা বাঘের পেটে গেছে।"

আমরা সবিস্ময়ে বললাম, "সে কী!"

"হ্যাঁ বাবুজি, পাপের মাশুল ওকে ঠিকভাবেই দিতে হয়েছে। তখন আমি গুহা থেকে বেরোতেই ও আমার পায়ের খাঁজে এমন একটা লাথি মারল যে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। ও তখন আমার মাথাটা ধরে ঠুকতে লাগল পাথরের ওপরে। তবে বেশিক্ষণ নয়, দু'-একবার মাত্র। পরক্ষণেই দেখলাম একটা শের এসে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। ওই দৃশ্য দেখে আমি জ্ঞান হারালাম। তারপর তো আপনি আমাকে দয়া করলেন। সতীয়া বহিন আমার সেবা করল। তা বাবুজি, আপনি এখানে কী করে এলেন?"

"কেন? তোমার টেগোই তো পথ চিনিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে।"

আর কোনও কথা নয়। আমরা সবাই গুহার জঠরে ঢুকে তৃপ্তির সঙ্গে রাতের আহার শেষ করলাম।

শান্ত নিরীহ সতীয়ার এখন দেখলাম অন্যরূপ। কী দারুণ প্রাণবন্ত ও। আসলে বাঘনার শোচনীয় পরিণতিই ওকে এমন করেছে। ওর জীবনের দুষ্টগ্রহ এবং আতঙ্কের চির অবসান হয়েছে আজ।

সে রাতে আমাদের ঘুম হল না কারও। সারাটা রাত সবাই গল্প করে কাটালাম।

কুসমা বলল, "এই রাতের স্মৃতি যেন কখনও মন থেকে মুছে ফেলবেন না বাবুজি। পাহাড়ি এই মানুষগুলোকে একটু মনে রাখবেন।"

আমি হেসে বললাম, "জীবনের সব স্মৃতি কি মোছা যায় না সুখের দিনের কথা ভোলা যায়? এখন তো মনে হচ্ছে এমন রজনী যেন বারেবারেই আসে।"

দীর্ঘ রাত্রির অবসানে একসময় ভোরের আলো ফুটে উঠল। আমরা গুহা ত্যাগ করে প্রত্যাবর্তন করলাম।

জং বলল, "সেই মূর্তিগুহায় একবার যাবেন না বাবু?"

বললাম, "না থাক। ওতে আমার কোনও আগ্রহ নেই। মন পড়ে আছে বন্ধুর দিকে। সে যে কোথায় গেল, কে যে কোথায় আটকে রাখল তাকে তা কে জানে?"

জং বলল, "খুন হলেও হতে পারেন।"

"কিছুই অসম্ভব নয়।"

খানিক আসার পর দেখলাম পিটার সেই একইভাবে কাতরাচ্ছে সেখানে। আমি চেয়েছিলাম ধরাধরি করে ওকে নীচে নামিয়ে আনতে।

কুসমাই বাধা দিল। বলল, "না বাবুজি, ওকে ওর ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিন। কর্মফল ভোগ করুক ও। আমরা কেন ওর জন্য অযথা পুলিশের ঝামেলায় জড়াতে যাব?"

কথাটা যুক্তিপূর্ণ। তাই কিছু বললাম না।

দেখতে দেখতে রোদ উঠল।

আমরাও ফিরে এলাম সাতবাহিনীতে। এসে শুনলাম পরশু রাতে বাইরে বেরোলে ভালুকের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে বড়ো একটি পাথরের খাঁজে গর্তের মধ্যে পড়ে যায়

কুনাল। কাল সারাদিনের পর সন্ধ্যায় ও নিজেই উঠে এসেছে। তারপর ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধপত্তর খেয়ে অনেকটা সুস্থ এখন। আমরা যেতে আমাদের দেখে আনন্দের অবধি রইল না ওর।

আমরা ওকে তাঁবু থেকে ধরাধরি করে আমার জন্য নির্দিষ্ট বাসায় নিয়ে এলাম।

কুসমা ও সতীয়া চা করে খাওয়াল আমাদের।

চা খেতে খেতেই গতকালের অভিযানের কথা সবিস্তারে বললাম ওকে। এবং এও বললাম এই বনপ্রদেশে নির্ভয়ে চাকরি করতে ওর আর কোনও আতঙ্কই নেই। বরং কুসমা ও সতীয়ার সাহচর্য ওর মনে অনেক সাহস জোগাবে।

আমি সে দিনটা সাতবাহিনীতে থেকে পরদিনই বিদায় নিলাম। বিদায়কালে কুসমা ও সতীয়ার চোখের জল আমার চোখেও জল এনে দিল।

জং বাহাদুর এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল আমায়।

বিদায় সাতবাহিনী।

কন্যাসুন্দরী রহস্য

আজ একটু বেশি বেলা অবধি ঘুমিয়ে পড়েছি। কারণও আছে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত একটি বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে থাকতে হয়েছিল। ফিরেছি রাত দেড়টায়। শুয়েছি দুটোয়। সাধারণত এত বেশি সময় রাত্রি জাগরণের পর সহজে ঘুম আসতে চায় না। তাই এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা আমিই জানি না। রাখহরি না ডাকলে এ ঘুমত ভাঙত না বুঝি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সকাল এখন আটটা।

একেবারে কাকভোরে অথবা আরও আগে প্রতিদিন যার শয্যাত্যাগ করা অভ্যাস তার কাছে সকাল আটটা অনেক বেলা বইকি। যাই হোক, ঘুম থেকে উঠে চোখেমুখে জল দিয়ে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিতেই রাখহরি চা নিয়ে এল। সেইসঙ্গে সেদিনের খবরের কাগজটা। কাগজের পাতায় চোখ রেখে সবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছি এমন সময় জয়ন্ত এসে হাজির।

জয়ন্তর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বন্ধুত্বের হলেও খুব একটা বেশি দিনের নয়। বর্ধমান থেকে হাওড়া আসার পথে ট্রেনের কামরায় একবার সহযাত্রী হিসেবে পেয়েছিলাম ওকে। সেই থেকেই পরিচয়। আন্দুল বাজারের কাছে একজনদের বাড়িতে ভাড়া থাকে। স্বামী স্ত্রী একটি বাচ্চা। সুখী পরিবার। সাঁকরাইলে জমি কিনেছে। বাড়ির কাজও শুরু হয়েছে বোধ হয়। আমাকে দু'একবার ওদের বাসা বাড়িতে নিয়ে গেছে। ওর স্ত্রী মণিকা খুব ভাল মেয়ে। আমার প্রতি সে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

আমি জয়ন্তকে বসতে বলে কাগজটা মুড়ে রেখে ওর দিকে তাকালাম। জয়ন্তর সারা মুখে উত্তেজনার একটা কালো মেঘ যেন থমথম করছে।

আমি সন্দিগ্ধচিত্তে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কী হয়েছে তোমার জয়ন্ত? তোমাকে এমন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে কেন?"

জয়ন্ত না পারছে কাঁদতে না পারছে কথা বলতে। তবুও অতিকষ্টে বলল, "একবার

তুমি আমাদের বাড়িতে এসো, মণিকা তোমাকে...।"

"যেতে বলেছে। এই তো? এ আর এমন কী? এখনই যাচ্ছি আমি। তার আগে বলো, তোমাদের কি কোনও বিপদ? বা ওই জাতীয় কিছু?"

জয়ন্ত বলল, "ওখানে গেলেই সব জানতে পারবে।"

কিছু যে একটা হয়েছে বা সেটা যে দারুণ অপ্রীতিকর তা ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। যাই হোক, আমি আর কথা না বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে ওর সঙ্গেই চললাম। আমার বাড়ি থেকে ওর ওখানের দূরত্ব যদিও বেশি, তবু পদব্রজেই ওর সঙ্গে নীরবে চলে এলাম ওর বাড়িতে।"

গিয়ে দেখলাম মণিকাও কেমন উদ্‌ভ্রান্ত। আমি যেতেই কান্নাধরা গলায় বলল, "দাদা এসেছেন? আসুন।" তারপর একটা চেয়ার টেনে আমাকে বসতে বলে বলল, "ওর মুখে শুনেছেন তো সব? কী সর্বনাশ হয়ে গেল আমাদের।"

আমি বললাম, "ও আমাকে কিছুই বলেনি। শুধু বলেছে তুমি ডেকেছ। তবে অনুমান করেছি ভয়ানক কিছু একটা ব্যাপার হয়ে গেছে এখানে। তা কী ব্যাপার বলো তো?"

মণিকা আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে বলল, "বলতে গেলে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি।" এর পর মণিকা যা বলল তা হল এই—

"গতকাল রবিবার গেছে। আমরা দু'জনে খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে টিভিতে একটা সিরিয়াল দেখছি, এমন সময় দরজায় টকটক শব্দ। উঠে গিয়ে দরজা খুলেই দেখি বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের এক মহিলা। মনে হয় সদ্য বিবাহিতা। কী দারুণ দেখতে। অমন অঙ্গভরা রূপ সহসা চোখে পড়ে না। আমি দরজা খুলতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে। বলল, "আমি কি ভেতরে যাব। দয়া করে আমাকে এক গেলাস জল দিন। অনেকদূর থেকে আসছি, বড়ো তৃষ্ণার্ত আমি।"

এই অবস্থায় কাউকে কি "না" করা যায়? গায়ে গয়না। দামি শাড়ি পরনে। ভাল ঘরের বউ। তাই সমাদরে ওকে ভেতরে এনে আমাদের শোবার ঘরেই বসালাম। তারপর ফ্রিজ থেকে দুটো সন্দেশ বার করে খেতে দিলাম ওকে। জল দিলাম।

আপনার বন্ধু জিজ্ঞেস করল, "কে আপনি? কোথা থেকে আসছেন? আপনার পরিচয়?"

মহিলা বলল, "আমার নাম কৃষ্ণা। মাস-দুই আগে আমার বিয়ে হয়েছে। আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই আমার ওপর এত নির্যাতন করে যে তা বলবার নয়। স্বামীও ওদেরই মতো। ওরা দুবার আমার শাড়িতে আগুন ধরিয়ে আমাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল। আবার ওরা ওইরকম ষড়যন্ত্র করছে বুঝতে পেরেই আমি এক বস্ত্রে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। যদি আপনারা দয়া করে আমাকে আজ আর কাল এই দুটো দিন আপনাদের এখানে থাকতে দেন তা হলে খুব ভাল হয়। যেখানে সেখানে তো যেতে পারি না। দেখছেন তো আমাকে, আমার এই রূপই যে আমার সবচেয়ে বড়ো শত্রু। তার ওপর এই গা-ভর্তি গয়না। এর কোনটাই মেকি নয়। এই অবস্থায় কোনও বদ লোকের পাল্লায় যদি পড়ি তো আমিও যাব আমার গয়নাও যাবে। আমার বাপের বাড়ি কাঁথির কাছে রামনগরে। পরশু সকালে দাদা বরং আমাকে আমার বাড়িতে আমার বাবা মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

ওর এই অসহায় অবস্থা দেখে আমরা দু'জনেই দয়াপরবশ হয়ে এবং কিছুটা কর্তব্যের

খাতিরে ওকে থাকতে দিতে রাজি হলাম।

আমার উনি বললেন, "সবচেয়ে ভাল হয় আমি যদি কাল সকালেই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি অথবা আপনার বাড়িতে কাউকে দিয়ে খবর পাঠাই?"

"কোনো লাভ হবে না তাতে। বাড়িতে কেউ নেই। ওঁরা থাকলে তো আমি আজই চলে যেতাম আমার মা বাবার কাছে। আপনাদের এখানে আশ্রয় ভিক্ষা করতাম না। আমার মা বাবা দুজনেই গেছেন পুরীতে জগন্নাথ দর্শনে। কাল রাতের পুরী এক্সপ্রেসে ওঁদের রিজার্ভেশন করা আছে। পরশু সকালে বাড়ি আসবেন ওঁরা।"

এই পর্যন্ত বলে মণিকা থামল। তারপর আবার বলল, "আমরা ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?" ও বলল, "দুর্গাপুরে।" তারপর আমাদের খোকাকে নিয়ে কত আদর করল সে। তখনও আমরা বুঝতে পারিনি ওর ছলনা। যাই হোক, আমরা ওকে ঘরে স্থান দিলাম। একটুপরে চা করে খাওয়ালাম। আমার পরনের শাড়ি ওকে পরতে দিলাম। ও ওর গায়ের সমস্ত গয়না খুলে একটা রুমালে বেঁধে আমাকে বলল, "এটা আপনার গয়নার বাক্সে রেখে দিন দিদি। সবসময় তো এগুলো পরে থাকা যায় না। পরশু যাবার সময় নিয়ে যাব।"

"আমি ওর সমস্ত গয়না সযত্নে আলমারি খুলে আমার গয়নার বাক্সে রেখে দিলাম। এরপর দুজনে সুখ-দুঃখের কত না গল্প করলাম। জোর খাওয়া-দাওয়া করলাম রাত্রে। কালকের দিনটা গেল। আজ একটু আগে ঘুম থেকে উঠে দেখি কৃষ্ণাও নেই, গয়নার বাক্সও নেই। সেই সঙ্গে নেই আলমারিতে রাখা হাজার তিরিশেক টাকা। যেটা আমরা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করব বলে কদিন আগে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছি। আমাদের তো লকার নেই। গয়নাগাটিগুলো তাই বাড়িতেই রেখেছিলাম। সাবেকি নতুন মিলিয়ে প্রায় বিশ ভরির মতো সোনা ছিল।" বলেই আবার দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল মণিকা।

আর জয়ন্ত? ওর মুখের দিকে তাকিয়েই মনে হল এক গভীর শোকে আচ্ছন্ন ও। এতবড়ো একটা বিপর্যয়ে একেবারেই ভেঙে পড়েছে বেচারি। স্বাভাবিক। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষজনের কাছে বিশ ভরি সোনা আর ত্রিশ হাজার টাকার মূল্য তো নেহাত কম নয়।"

আমি অনেকক্ষণ চুপ থেকে বিষয়টি ভালভাবে উপলব্ধি করে বললাম, "বড়ো জটিল রহস্য। মেয়েটিকে এর আগে নিশ্চয়ই কখনও দেখনি তোমরা?"

জয়ন্ত বলল, "না। দেখলে মনে পড়ত। কেননা ওকে একবার যে দেখবে সে কখনও ভুলবে না।"

"তা হলে ওকে ধরা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। এখন কতকগুলো প্রশ্নের তোমরা উত্তর দাও। যেমন, রোজ তোমরা ঘুম থেকে কখন ওঠ?"

"ভোর চারটে নাগাদ। চা খাই। খেয়ে আমি একটু মর্নিংওয়াকে যাই। মণিকা ঘর গেরস্থালির কাজগুলো করে। রান্না চাপায়। কেননা আমি তো সাড়ে আটটায় বেরোই।"

"আজ কখন ঘুম থেকে উঠেছ?"

"ঘড়ি দেখিনি। তবে মনে হয় সকাল সাতটা নাগাদ। তাও দুধওয়ালা এসে ডাকাডাকি না করলে তখনও ঘুম ভাঙত না। ঘুম থেকে উঠেই দেখি দু'হাট করে দরজা খোলা। আলমারি খোলা।"

"এবং সেই কৃষ্ণাসুন্দরীও উধাও।"

"ঠিক তাই।"

"তোমরা ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করো?"

"আর করি না।"

"করবে। তোমাদের ভাগ্য ভাল যে শুধু টাকা আর গয়নার ওপর দিয়ে গেছে। যাবার সময় ও যে তোমাদের খোকনকেও নিয়ে পালায়নি এই ঢের।"

মণিকা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল! করেই বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে বলল, "উঃ ভগবান। আমি আজই নিয়ে ঠাকুরের থানে পুজো দিয়ে আসব। আমাদের যা গেছে যাক। আমার খোকনকে যে ও নিয়ে যায়নি এই রক্ষে। এমন সম্ভাবনার কথা ভাবিওনি কখনও।"

এরপর খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললাম, "আজকের দিনে এমন ভুল কেউ করে? বাড়িতে কাজের লোক রাখলেও তার ছবি তুলে থানায় জানিয়ে আসতে হয়। দেশঘরের খোঁজখবর নিতে হয়। তোমরা কোনদিক না ভেবেই হুট করে একজন অজ্ঞাতকুলশীলাকে ঘরে স্থান দিলে কী বলে?"

জয়ন্ত বলল, "দিতাম না। কিন্তু ও যখন রামনগরে ওর বাপের বাড়ির কথা বলল, আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসার কথা বলল তখনই বিশ্বাস করলাম ওকে। মনের কোণে এতটুকু সন্দেহও উঁকি দিল না আমাদের।"

"স্বাভাবিক। কিন্তু যে মেয়ে দুর্গাপুরের শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসে তোমাদের কাছে আশ্রয় চাইল সে মৌড়িগ্রামে কেন? সে তো কাঁথি অথবা রামনগরেই চলে যেতে পারত। নাই বা থাকলেন বাবা মা। প্রতিবেশী কারও বাড়িতে উঠতে পারত।"

এবার মণিকা বলল, "আপনাকে বলা হয়নি দাদা। ও কিন্তু বলেছিল মৌড়ি স্টেশনের কাছে ওদের নাকি কে এক আত্মীয় থাকে। ও প্রথমে সেখানেই গিয়েছিল। গিয়ে দেখে বাড়ি তালাবন্ধ। তাই আমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে।"

"অর্থাৎ রূপের ছলাকলায় ভুলিয়ে তোমাদের একেবারেই বোকা বানিয়ে গেছে।"

জয়ন্ত বলল, "এখন তুমিই বলো ভাই, আমার কী করা উচিত।"

"প্রথমেই থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি লেখাও।"

"তাতে লাভ?"

"কোনও লাভ হবে না। কৃষ্ণাসুন্দরীও ধরা পড়বে না। তবু প্রশাসনকে জানানো নাগরিক কর্তব্য। পুলিশ গুরুত্ব দিলে ওই ধরনের চিটারদের ধরে ফেলা অসম্ভব কিছুও নয়।" বলে আমি চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলাম মেয়েটি অসতর্কভাবে ওর কোন-কিছু ফেলে রেখে গেছে কিনা। কিন্তু না। মণিকার দেওয়া শাড়িটি পর্যন্ত ছেড়ে রেখে নিজেরটি পরে গেছে। অর্থাৎ চতুর নায়িকা। রীতিমতো পেশাদার। তাই হিসেবের ঘরে কোথাও কোনও ভুল নেই।

মণিকা এবার আমার হাতদুটি ধরে বলল, "দাদা, আপনি তো গোয়েন্দাগিরি করে অনেক বাস্তুঘুঘুকেও ইঁদুরের গর্ত থেকে টেনে বার করেছেন। তা পারবেন না একটু চেষ্টা করে ওই শয়তান মেয়েকে ধরে জেলে পুরতে? না হলে ও কিন্তু আরও অনেক গেরস্তের সর্বনাশ করবে।"

আমি বললাম, "চক্রজাল যতদূর পর্যন্তই স্থির থাকুক না কেন, গোয়েন্দা ভুলেও কখনও বলেন না এ-কাজ তিনি পারবেন না। তাই আমিও বলব, চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

জয়ন্ত বলল, "কথায় কথায় অনেকটা সময় পার হল। এখন একটু চায়ের ব্যবস্থা হলে ভাল হয়। চা খেয়ে একবার থানায় যাই।"

"বাজারে যাবে না?"

"সকালের দিকে তো বাজারে যাওয়া আমার হয়ে ওঠে না। সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফেরার পথেই বাজার করে নিয়ে আসি। ডিম কেনা আছে। তবে আজ একটু মাছ নিয়ে আসব ভাবছি।"

মণিকা চা করলে চা খেতে খেতে বললাম, "কৃষ্ণা সুন্দরীর ব্যাপারে তদন্তটা ঠিক কীভাবে করব তাই ভাবছি। প্রথমত ওকে কখনও দেখিনি। ওর কোনও ফোটো বা অন্য কোনও ডকুমেন্টস নেই। এল, কাজ হাসিল করল, চলে গেল। তোমাদের সঙ্গে আমার যখন বন্ধুত্বের সম্পর্ক একটা রয়েইছে তখন বুদ্ধি করে কাল রাতে যদি একবার কোথাও থেকে ফোন করে আমাকে জানাতে তা হলে কাল রাতেই আমার ফাঁদে পড়ে ওই মোহিনী দিশা হারাত। ওর বক্তব্য সত্য হলেও ওকে নজরে রাখতাম আমি।"

জয়ন্ত বলল, "সত্যি কথা বলতে কি ওর মুখের দিকে তাকিয়েই যেন সব ভুল হয়ে গেল আমাদের।"

"এখন বলো তো, যে কাগজওয়ালা তোমাদের কাগজ দিয়ে যায় তাকে এখন কোথাও পাওয়া যায় কিনা?"

জয়ন্ত বলল, "হ্যাঁ। এই বাজারেই রাস্তার ধারে তার একটা গুমটির স্টল। এইসময় ও সেখানেই থাকে।"

"তাহলে এখনই চলো, তার সঙ্গে একটু কথা বলে দেখা যাক।"

আমরা একটুও দেরি না করে বাজারে এলাম। হকার ছেলেটি তখন বাড়ি বাড়ি কাগজ পৌঁছে দিয়ে সবে এসে চা খাচ্ছে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি। আমি তো তার হাতেই কাগজ দিয়ে এলাম। কাগজ রেখে একটু পরেই উনি হন হন করে কোথায় যেন চলে গেলেন।"

আমি বললাম, "ওই মহিলাকে তুমি এর আগে আর কখনও কোনওখানে দেখেছ?"

"না। এই প্রথম।"

"তোমার কোনও কৌতূহল হয়নি ওঁকে দেখে?"

"না। আসলে ওই তাড়াহুড়োর সময় কারও মুখের দিকে ভাল করে তাকাবারও সময় হয় না আমাদের। তবু দেখেছি। ভারি সুন্দরপানা চেহারা। ভেবেছিলাম বউদিরই কোনও বোনটোন হবে হয়তো।"

আমরা যখন এইসব কথাবার্তা বলছি, ঠিক তখনই মধ্যবয়সী একজন রিকশাওয়ালা আমাদের কথা শুনে এগিয়ে এসে বলল, "ব্যাপারটা কী? কার কথা হচ্ছে শুনি?"

আমরা ঘটনার কথা বলতেই রিকশাওয়ালা বলল, "আজ সকালে ওইরকম এক সুন্দরী মহিলাকে আমিই স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।"

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "কোন স্টেশনে, আন্দুল না মৌড়িতে?"

"মৌড়িগ্রামে।"

আমি রিকশাওয়ালাকে বললাম, "তুমি এখনই আমাদের স্টেশনে নিয়ে চলো।"

জয়ন্ত চট করে একটু মাছ কিনে সেই হকারের হাত দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে আমার সঙ্গে রিকশায় বসল। দারুণ উত্তেজনা নিয়ে আমরা স্টেশনে এসে রিকশাওয়ালাকে বিদায়

দিলাম।

স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে যে ছেলেটি বসেছিল সে আমার অত্যন্ত পরিচিত। তাকে বললাম, "তুমি কতক্ষণ এখানে ডিউটি করছ?"

"সকাল ছ'টা থেকেই। কেন, কী হয়েছে দাদা?"

"কাউকে একটু দায়িত্ব দিয়ে একবার বাইরে আসতে পারবে?"

"জাস্ট এ মিনিট।"

একটু পরেই কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে এল ছেলেটি। বলল, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

ঘটনার কথা সংক্ষেপে বলে বললাম, "এইরকম কোনও মহিলাকে আজ তুমি এখানে টিকিট কাটতে দেখেছ? যদিও এত যাত্রীর মধ্যে বিশেষ কাউকে মনে রাখা সম্ভব নয়, তবুও একটু কি মনে করতে পারো সে কোথাকার টিকিট কেটেছিল?"

ছেলেটি বলল, "মেয়েটিকে আমি দেখেছি। অসাধারণ সুন্দরী। বিবাহিতা। তবে সে কিন্তু একা ছিল না। তার সঙ্গে আরও দু'জন মেয়েকে আমি দেখেছি। তবে তারা ওর মতো অতটা আকর্ষণীয় নয়? দু'জন যুবকও ছিল সঙ্গে। মেয়েটি আসতেই যুবকদের একজন খুব ধমকধামক দিল ওকে। মেয়েটি ওদের হাতে কী যেন দিল। ওরা সেটা হাত পেতে নিল বটে তবে কঠিন গলায় কী যেন বলতেই মেয়েটি কেমন আতঙ্কিত হয়ে উঠল। বলল, "না না। তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি। ওখানে আমি যাব না। ওখানে গেলে আমাকে মেরে ফেলবে। শেষ করে দেবে আমাকে, তোমাদের কথামতো আমি তো কাজ করছিই। যখন যা বলছ তাই তো করছি আমি।" ওরা বলল, "ওইখানেই তোকে যেতে হবে। জিনা মরনা নসীব কি বাত। লেকিন যানা হি পড়েগি।" যুবকদের একজন বলল, "অত ভয় পাচ্ছিস কেন? চলে যা। পালাবার চেষ্টা করলেই মরবি। তবে তোর ভাইটাকে এবার মুক্তি দেব আমরা।" মেয়েটি চিৎকার করে উঠল, "না। ওর কোনও ক্ষতি তোমরা করবে না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর?"

"কাউন্টারে বসে বসে আমি ওদের কাণ্ড দেখছি আর মাঝে মাঝে কেউ এলে তাকে একটা করে টিকিট দিচ্ছি। একটু পরে ওদের দলে আরও একজন যুবক এসে যোগ দিতেই ওরা ডানকুনির সাতটা টিকিট কাটল। যেহেতু আমি ওদের দিকে নজর দিয়েছিলাম তাই ওরা কোথাকার টিকিট কাটল তা মনেও আছে। তা ছাড়া ডানকুনির ওই কটা টিকিটই ইস্যু হয়েছে আজ।" বলে বলল, "মনে হয় দারুণ একটা দুষ্টচক্রের ফাঁদে পড়েছে মেয়েটা। শুধু ওই মেয়েটা নয় আর যে কজন ছিল যুবকদের কথাবার্তা শুনে ওরাও ভয়ে কাঁপছে দেখলাম। কারও মুখে কোনও প্রতিবাদের ভাষা নেই।"

আমরাও বুঝলাম একটি দুষ্টচক্র মেয়েগুলোকে দিয়ে এইসব অপরাধমূলক কাজ করাচ্ছে। এর পর আমরা স্টেশনের দু'-একটি স্টলেও ওদের ব্যাপারে খোঁজ নিতেই একজন চা-ওয়ালা বলল, "ওদের কথাবার্তা আমার কানেও গেছে। মেয়েটি কেবলই কাঁদছিল আর বলছিল, জামালপুরে আমি যাব না। মীর সাহেব ভাল লোক নয়। আমি ওখানে গেলে আমার ওপর অকথ্য অত্যাচার করবে। আমরা গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলবে নয় তো শাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারবে। তোমরা যাকেই ওর কাছে পাঠিয়েছ তারই ওই দশা হয়েছে।" ওরা মেয়েটির কান্নায় আমলই দিল না। বলল, "তোকে যে অত করে বলে দেওয়া হল ছেলেটাকে নিয়ে আসতে তা তুই করলি না কেন?" মেয়েটি বলল, "পারলাম না। বড্ড মায়া লাগল। তবে টাকা গয়না সবই তো এনেছি।" ওরা বলল, "ওই

টাকায় আমাদের পথ খরচাও হবে না। তোর এখানকার কাজ শেষ। আজই রাতের গাড়িতে তোকে যেতে হবে।''

জয়ন্ত বলল, ''এত কাণ্ডর পরও তোমরা সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলে? স্টেশনে আর কোনও যাত্রী ছিল না?''

''ছিল। কিন্তু কথাবার্তা যে ওদের নিজেদের মধ্যেই হচ্ছিল। মেয়েটিও কারও দিকে তাকায়নি বা কারও সাহায্য চায়নি। সে যদি একবার চেঁচাত...।''

আমি বললাম, ''ফল তা হলে আরও খারাপ হত। মেয়েটিকে ওরা ওখানেই গুলি করে মারত। যারা বাধা দিতে আসত তারাও গুলি খেত বেশ কয়েকজন। তবে সংঘবদ্ধ হয়ে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লে অবশ্য অন্যরকম হত। সেটা অফিস টাইমেই সম্ভব।''

জয়ন্ত বলল, ''এরপর ওদের আর কোনও কথাবার্তা...?''

''না। একটু পরেই ট্রেন এলে ওরা চলে গেল।''

আমি জয়ন্তকে নিয়ে স্টেশনের বাইরে একটা রেস্টোর্যান্টে এসে বসলাম। দুজনের জন্য দুটো ওমলেট ও দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে পুরো ঘটনাটার পর্যালোচনা করতে লাগলাম।

আমি কিছুতেই ভেবে পেলাম না কোথায় জামালপুর কোথায় মৌড়িগ্রাম। ওরা সেই অতদূর থেকে এখানে এসে এমন নাটকীয়ভাবে অপারেশনটা করে গেল কেন? আমার সন্দেহ ঠিকই হয়েছিল। ভাগ্যজোরে বেঁচে গেছে ছেলেটা। না হলে ওকে নেবার জন্যই তো এসেছিল কৃষ্ণাসুন্দরী। শুধু মায়াবশে মায়ের কোল থেকে শিশুটিকে নিয়ে যেতে বিবেকে বেধেছিল তার। কিন্তু বিবেক যদি এখানে পঙ্গু হয়ে থাকত তা হলে সর্বনাশ একটা হয়েই যেত। ওরা নিশ্চয়ই শিশুটির জন্য বেশ বড়ো অঙ্কের একটা মুক্তিপণ দাবি করত। তাতে লাভ কী হত? ওরা কি জানে না এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষটির সামর্থ্য কতটুকু? সাধারণত কোনও বড়ো ব্যবসায়ী বা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোকের ছেলেমেয়েকেই হরণ করে ওরা। কিন্তু এখানে যা হল তা তো রঙ টার্গেট। তবে কি কোনও ব্যক্তিশত্রুতা? এ ছাড়া আর কোনও সিদ্ধান্তেই বা আসা যায়?

আমি জয়ন্তকে প্রশ্ন করলাম, ''তোমার স্ত্রী মণিকার বাপের বাড়ি কোথায়?''

''সোনারপুরে।''

''আচ্ছা, ভাগলপুর সুলতানগঞ্জ মুঙ্গের জামালপুরের দিকে যাতায়াত করে এমন কারও সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব আছে?''

''না। তবে মৌড়ি রথতলার কাছে হরিদেও গোয়ালা নামে একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার সাঁকরাইলের জমি কেনার ব্যাপারে একটু মনোমালিন্য হয়। তিনি ভাগলপুরের লোক। আমি সাউথ ফেসিং ওই চার কাঠা জমির প্লটটা বায়না করার পর উনি আবদার করেন ওটা ওঁকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু আমি তাতে রাজি না হওয়ায় উনি অসন্তুষ্ট হন। কেননা ওঁর জামাই-এর জন্য জমিটা ওঁর প্রয়োজন ছিল।''

''জামাই থাকে কোথায়?''

''তা তো জানি না।''

''ওঁর ছেলে মেয়ে?''

''দুই ছেলে এক মেয়ে। তবে এক ছেলেকে আমি জানি। খুবই রাফ টাইপের।''

''ব্যস। আর বলতে হবে না। ওদের কলকাঠিতেই যা হবার তা হয়েছে। এখন তদন্ত

করে দেখতে হবে এই কৃষ্ণাসুন্দরী তো বাঙালি মেয়ে। কীসের ভয়ে এবং কী কারণে সে এদের হয়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে? মীরকে তার এত ভয় কেন? জামালপুরের ওই মীর সাহেবই কি এদের গডফাদার? মীরের কাছে যাওয়া মানেই জীবনান্ত। শাস্তি। কিন্তু কোন অপরাধে এই শাস্তি তাকে পেতে হবে? মীর মানেই যদি মৃত্যু তো কৃষ্ণা তা হলে আত্মহত্যাই বা করছে না কেন?"

আমরা চা খেয়ে প্রথমেই থানায় এলাম। তারপর ঘটনার সবকিছু জানিয়ে একটা ডায়রি লেখালাম। থানায় ও.সি. থেকে সবাই তো আমার বন্ধুর মতো। তাই বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম হরিদেও গোয়ালার ছেলেদের দিকে যেন একটু নজর রাখেন ওঁরা। আব ডানকুনির পি.এস. কেও জানানো হোক এই দলটির ব্যাপারে। আজ রাতের গাড়িতে কৃষ্ণাসুন্দরী জামালপুর এক্সপ্রেসে চাপলে তার গতিবিধির ওপরও যেন নজরদারি করা হয়।

এরপর বাসায় ফিরে স্নানাহারের পাট চুকিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে গিয়েই হঠাৎ একটা প্রশ্ন আমার মাথায় এল। আমি তখনই ছুটলাম জয়ন্তদের ওখানে। ওরাও সবে খাওয়াদাওয়া সেরে উঠেছে। এমন অসময়ে আমাকে দেখেই মণিকা বলল, "কী ব্যাপার! আবার এলেন যে?"

বললাম, "তোমার গয়নাগুলো কি সবই পুরোনো? নাকি নতুন কিছু ছিল?"

"বেশির ভাগই নতুন।"

"ওগুলো কি এখানকার কোনও স্যাকরার কাছে গড়ানো না কলকাতার কোনও বড়ো দোকান থেকে কেনা?"

"আমার কেনা গয়না যা তা কলকাতার এক বিখ্যাত জুয়েলারির দোকান থেকেই কেনা। প্রতিটি গয়নার ক্যাশমেমো আছে।"

"সেগুলো কোথায়?"

"সব ওই গয়নার বাক্সেই ছিল।"

আমি আনন্দে উল্লসিত হয়ে বললাম, "ভালই হয়েছে।" তারপর জয়ন্তকে বললাম, "সেই দোকানের ফোন নম্বর নিশ্চয়ই তোমার জানা নেই? অবশ্য জানার প্রয়োজনও করে না কেউ। তা এক কাজ করো, তুমি আমাকে এখুনি ওই দোকানে একবার নিয়ে চলো। আমার মনে হচ্ছে ওরা ক্যাশমেমোসহ গয়নাগুলো আজই ওই দোকানে বিক্রি করতে আসবে। আমরা দোকানদারকে জানিয়ে একটু ওত পেতে থাকি। আজ যদি না আসে কাল আসবে। এলেই ওদের আটকে রেখে এখানকার থানায় ফোন করতে বলব। চলো, যাওয়া যাক।"

মণিকা বলল, "ওদের দোকানের দুটো ক্যালেন্ডার কিন্তু আছে আমার কাছে। তাতেই পেয়ে যাবেন ফোন নম্বর।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে নম্বরটা নিয়ে জয়ন্তর সঙ্গে বাজারে এসে একটি পাবলিক কল অফিস থেকে ফোন করে সেই জুয়েলারির দোকানে জানিয়ে রাখলাম ব্যাপারটা। এবং বললাম ওই ক্যাশমেমো ও গয়না নিয়ে কেউ গেলেই যেন পুলিশে খবর দেওয়া হয়। এবং আটকে রাখা হয় বিক্রেতাকে।

জুয়েলারির দোকানে ফোন করার পর থানাতেও জানিয়ে রাখলাম ব্যাপারটা। এখানকার থানা বহুবাজার থানাকে জানাল। ফাঁদটা ভালই পাতা হল। এখন দেখা যাক পাখি এসে সেই ফাঁদে পা দেয় কিনা।

সকাল থেকেই টেনশন আর দৌড় ঝাঁপ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দুপুরে তাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। রাখহরি কিছু জামাকাপড় কাচাকাচি করে শুকোতে দিতে গেছে ছাদের ওপরে। এমন সময় থানা থেকে ফোন এল, "পাখি ধরা পড়েছে। তবে আমাদের ফাঁদে নয়, ডানকুনির পুলিশই বামালসমেত ধরেছে ওদের। টাকা গয়না সবই উদ্ধার হয়েছে। শুধু ধরা যায়নি কৃষ্ণাসুন্দরীকে। চোখের পলকে মেয়েটাকে নিয়ে ওদেরই একজন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে উধাও হয়ে গেছে।"

আমি বললাম, "এটা কী করে হল?"

ও.সি. জানালেন, "আসলে আমাদের ফোন পেয়েই ওখানকার পুলিশ নজর রাখে ডানকুনি স্টেশনের দিকে। ওদের গ্যাঙটাকে ধরার সহজ উপায় হল চেহারার বর্ণনামতো কৃষ্ণাসুন্দরী। পুলিশ দেখেই ওরা পালাবার চেষ্টা করে। ওদের দু-একজনকে ধরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণাকে নিয়ে লাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একজন। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ডাউন মালগাড়ি এসে পড়ায় ওরা নাগালের বাইরে চলে যায়। পুলিশেরও আর কিছু করার থাকে না।"

আমি ও.সি কে জানালাম, "আমি তা হলে জয়ন্তবাবুকে নিয়ে চলে যাই?"

"ওনার মিসেসকেও নিয়ে যেতে পারেন। আপনারা এখানেই বরং চলে আসুন। আমিও যাচ্ছি। আমার গাড়িতেই যাবেন আপনারা।"

আমি ফোন রেখে একটুও দেরি না করে যাবার জন্য তৈরি হলাম। একটা রিকশা নিয়ে জয়ন্তর ওখানে যেতেই জয়ন্ত বলল, "সবে আমি তোমার ওখানে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম।"

"আমার ওখানে কেন?"

"ভেবেছিলাম ঘরে শুয়ে বসে না থেকে দুজনে একবার ওই জুয়েলারির দোকানেই যাই।"

"তার আর প্রয়োজন হবে না। ইতিমধ্যে ওদের কয়েকজন ধরা পড়েছে। তোমাদের টাকা গয়নাও উদ্ধার হয়েছে।"

জয়ন্ত মণিকা যেন বিশ্বাসই করতে পারল না আমার কথা। বলল, "সত্যি?"

"এইসব ব্যাপার নিয়ে কি রসিকতা করা যায়? এখন তোমাদের দু'জনকেই আমার সঙ্গে ডানকুনি যেতে হবে। তোমাদের টাকা গয়না সব আনতে।"

ওদের বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে সংক্ষেপে যা বলবার বললাম। মণিকা ওর শিশুটিকে পাশের বাড়ির একজনদের জিম্মায় রেখে যাবার জন্য তৈরি হল। এত সহজে এবং এত তাড়াতাড়ি যে ওদের সকল মুশকিলের আসন হয়ে যাবে তা ওরা ভাবতেও পারেনি। আমিও না।

যাই হোক, আমরা পুলিশের গাড়িতেই ডানকুনি এলাম। ওরা ওদের টাকা গয়না ফেরত পেয়ে খুব খুশি। মণিকার গয়নার বাক্সে রুমালে বাঁধা কৃষ্ণার গয়নাগুলোও ছিল। ওগুলো যে চোরাই মাল তা বোঝাই যায়। মণিকা সেগুলো ওর নয় বলেই পুলিশের হাতে তুলে দিল। কিন্তু এখানে এসে ধৃতদের মধ্যে এমন একজনকে দেখল যাকে দেখামাত্রই চমকে উঠল ওরা। এত বাড়ি থাকতে ওদের বাড়িতেই যে কেন টার্গেট করা হয়েছে তাও এবার পরিষ্কার হয়ে গেল।

ওখানকার যিনি পুলিশ অফিসার তিনি মণিকার মুখের ভাব দেখে বললেন, "ধৃতদের কাউকে কি আপনার চেনা চেনা লাগছে?"

জয়ন্ত বলল, "হ্যাঁ, একজনকে চিনি। সে হল রাকেশ শর্মা। ওই যে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদেরই এলাকায় ওর একটা স্টেশনারি দোকান আছে। এমনি বেশ হাসিখুশি যুবক। বেশ কয়েকবার আমাদের বাড়িতেও এসেছে। তবে আমার স্ত্রী মণিকা ওকে একদম পছন্দ করে না। আমি না থাকলে অকারণে যখন তখন বাড়িতে আসার চেষ্টা করে। কিছুদিন আগে ও আমার কাছে দশ হাজার টাকা ধার চায়। আমি ওকে টাকা ধার তো দিই-ই না উপরন্তু আমি না থাকলে আমার বাড়িতে ওর আসার ব্যাপারেও আপত্তি জানাই। এরপর থেকে ও আমার সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে দেয় ...আমিও আর ওর দোকান থেকে মালপত্তর কিনি না। সম্ভবত সেই রাগেই ও এই কাজটা করিয়েছে। শুধু তাই নয়, এখন বোঝাই যাচ্ছে এই দলের সঙ্গে ও সক্রিয়ভাবে জড়িত। হরিদেও গোয়ালার সঙ্গে জমি কেনা সংক্রান্ত বাপারে গোলমালের বিষয়টা ও জানত। তাই প্রতিশোধ নেবে বলেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। কৃষ্ণাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের খোকনকে অপহরণের ছক কষেছিল। মেয়েটির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে সে এই কাজে বিরত থেকেছে।"

আমি ও. সিকে বললাম, "এই রাকেশ শর্মাকে মোচড় দিলেই ওদের দলের সব খবর পাওয়া যাবে। আর কৃষ্ণাসুন্দরীর বৃত্তান্তও পেয়ে যাব এরই মুখে। জামালপুরের মীর সাহেবও এই সূত্রে আইনের আওতায় আসবেন। ওঁরও খেলা শেষ হবে এবার।"

ধৃত দুষ্কৃতীরা যেহেতু আমাদের এলাকার তাই এদিকেই হস্তান্তর করা হল ওদের।

জয়ন্ত ও মণিকাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে পুলিশ হেফাজতে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। আমিও আর বাসায় না ফিরে ও. সির সঙ্গেই সোজা চলে এলাম থানায়।

রাকেশ শর্মার মুখ আমারও পরিচিত। ওকে থানায় নিয়ে এলে আমিই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম। বললাম, "তা রাকেশ ভাই, আমার মুখটা কি তোমার চেনা চেনা লাগছে?"

রাকেশ বলল, "না। আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।"

"সত্যি কথা বলার জন্য ধন্যবাদ। আশা করি আমি তোমাকে যা যা প্রশ্ন করব তার সঠিক উত্তর দেবে তুমি।"

রাকেশ বলল, "চেষ্টা করব।"

কথাটা কানে যেতেই ও. সি ধমক দিলেন, "চেষ্টা করব নয়, সঠিক উত্তর দিবি। কোনও কিছু গোপন করবার চেষ্টা করলে পিটিয়ে লাশ করে দেব।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার দেশ কোথায়?"

"বিহারে।"

"বিহার তো অনেকখানি জায়গা। বিহারের কোনখানে?"

"কিউলে।"

"তার মানে জামালপুরের কাছাকাছি।"

"আগে আমি ওখানেই থাকতাম।"

"তখনই মীর সাহেবের একজন শাগরেদ হয়ে যাও, তাই না?"

রাকেশের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

রাকেশের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছিল আরও দুই যুবক ও যুবতী। ও. সি তাদের আলাদাভাবে জেরা শুরু করলেন।

আমি রাকেশকে বললাম, "মৌড়ি রথতলায় যে হরিদেও গোয়ালা নামে ব্যবসায়ী আছেন তাঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কীরকম? উনি তো শুনেছি ভাগলপুরের লোক।"

"আমাদের একই লাইনের লোক উনি।"

"ব্যবসার দিক থেকেও, আবার ধান্ধাবাজির দিক থেকেও। কী বলো?"

রাকেশ বলল, "না। আমি ওর ছোটো ছেলে যুগলকিশোরের হয়ে কাজ করি। সব কিছুর মূলে সে-ই। এতে হরিদেওজি বা তাঁর বড়ো ছেলে শ্যামলকিশোরের কোনও ভূমিকা নেই।"

"সেই যুগলকিশোর এখন কোথায়?"

"বলতে পারব না। কৃষ্ণাকে নিয়ে সেই তো পুলিশের খপ্পর থেকে পালিয়ে বেঁচেছে।"

"এখন বলো এদের দলে তোমার ভূমিকা কতটুকু?"

রাকেশ মাথা হেঁট করে বলল, "আমি ইনফরমার। কেউ ব্যাঙ্ক থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তুললে তাকে চিনিয়ে দিতাম। ক্লোরোফরম জাতীয় ঘুমের ওষুধ সাপ্লাই দিতাম। যুগলকিশোরের কাছ থেকে বখরা হিসেবেও পেতাম কিছু কিছু।"

"তা এই জয়ন্তবাবুর বাড়ির দিকে হঠাৎ তোমার নজর পড়ল কেন?"

"প্রথমত সাঁকরাইলের ওই জমিটা জয়ন্তবাবু হরিদেওকে না দেওয়ায় উনি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন ওঁর ওপর। যুগলকিশোরও ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করে জয়ন্তবাবুকে বিপাকে ফেলার। কারণ হরিদেওজির জামাই সবুজলাল বিহারে নানা কুকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকায় সেখানকার পুলিশের বিষনজরে আছে। শুধু মীর সাহেবের নজরে থাকায় পুলিশ তাকে ছুঁতে পারছে না। তাই ওরা চাইছিলেন সবুজলালকে এখানে নিয়ে আসতে। তবে বর্তমানে খটির বাজারের কাছে প্রশস্ততে চার কাঠা জমি কেনা হয়েছে ওদের।"

"কিন্তু তোমার সঙ্গে জয়ন্তবাবুদের বিবোধটা কী নিয়ে?"

"ওনার স্ত্রী একবার আমার গালে একটা চড় মেরেছিলেন।"

"কেন মেরেছিলেন?"

"দোষটা অবশ্য আমারই ছিল। সেই রাগেই আমি যুগলকিশোরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বদলা নিতে চেয়েছিলাম। জয়ন্তবাবুও আমাকে অপমান করেছেন। তাই ভাবলাম, ওদের দুজনের ওপর প্রতিশোধ নিতে গেলে ওদের ছেলেটাকেই সরিয়ে নেওয়া দরকার। যেহেতু যুগলকিশোরেরও রাগ ছিল ওদের ওপর তাই কাজটা খুব সহজ হল।"

রাকেশ শর্মা অকপটে সবই গড়গড় করে বলে যেতে লাগল। ওর কথাবার্তা শুনে মনে হল দলে থাকলেও ও অতটা পোক্ত নয়। তাছাড়া ওর মুখ দেখে মনে হল পুলিশের চক্রজালে ফেঁসে ও বুঝেই গেছে ওর আর বাঁচার কোনও পথ নেই।

আমি বললাম, "মনে হচ্ছে তুমি যা বলছ তা ঠিকই বলছ।"

রাকেশ বলল, "হ্যাঁ। তাছাড়া এও বলছি এরপর থেকে আমি আর এদের সংস্পর্শে থাকব না। আমার জেল জরিমানা যা হবার হোক, সব মিটে গেলে আমার দোকান বিক্রি করে আমি আমার মুলুকে চলে যাব।"

"সে পরের কথা পরে! এখন যা করেছ তার শাস্তি তো ভোগ কর। এবার বলো, এদের দলে কতজন আছে? যে মেয়ে দুটি ধরা পড়েছে এদের পরিচয় কী? মীরকে সকলের এত ভয় কেন?"

"মীর সাহেব হলেন মুঙ্গের জামালপুর অঞ্চলের মাফিয়াদের গড ফাদার। যুগলকিশোরদের মতো অনেকেই ওঁর নির্দেশে কাজ করছে। যুগলের ভগ্নিপতি সবুজলালও মীরের খুব কাছের লোক। মীরের জন্যই তার এত রমরমা। মীরের কথামতো কাজ যারা না করে বা ফাঁকি দেয় তাদের পরিণাম হয় ভয়ংকর।" এই পর্যন্ত বলে রাকেশ বলল, "আমি কি এক গেলাস জল পেতে পারি?"

"অবশ্যই পারো।"

একজন কনস্টেবল ওকে এক গেলাস জল দিতে সেই জলটা এক নিঃশ্বাসে পান করেই রাকেশ বলল, "এদের দলে অনেক লোক। তবে আমাদের এখানকার গড ফাদার হল যুগলকিশোর। সবুজলালও জড়িত দলের সঙ্গে। আর আছে কুশারী পাণ্ডে।"

"সে কে?"

"অতি নৃশংস একজন। ওর হাতের গুলির নিশানা অব্যর্থ। কতজনের মুখে যে অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়েছে তার হিসেব নেই। মানুষ খুনটা ওর কাছে মশা মারার মতো। মীর ওকে খুব বেশি পছন্দ করেন তাই। সেও তো আজ আমাদের সঙ্গেই ধরা পড়েছে। আসলে আমরা যখন ডানকুনি স্টেশনে এলাম তখন ভাবতেও পারিনি এইভাবে পুলিশের জালে ধরা পড়ব বলে। তাই সবাই আমরা অসতর্ক ছিলাম। ওই সময় কুশারীর হাতে পিস্তল বা রিভলভার থাকলে পুলিশের সাধ্য ছিল না ওকে ধরে। আর ধরলেও সেই ধরাটা হত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে কয়েকজন পুলিশের জীবনের বিনিময়ে।"

আমি লকাপে বন্দি সেই কুশারী পাণ্ডেকে একবার ভাল করে দেখে এলাম। ছিপছিপে পাতলা চেহারার যুবক। চোখ দুটো সাপের চোখের মতো। শজারুর কাঁটার মতো মাথার চুলগুলো।

আমি বললাম, "ওই মেয়ে দুটি?"

"ওরা হল কাবেরী ও সুজাতা। ওদের মতো আরও পাঁচ-ছ'জন আছে। বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্তা। কোনরকম খুনখারাপির মধ্যে না গিয়ে ভাল মেয়ের ভূমিকায় লোককে ব্ল্যাকমেল করাই ওদের কাজ। গিরিডির অভ্রখনি অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ওদের। এ কাজে ভাল টাকাও পায় ওরা।"

"মীরের সঙ্গে ওদের কীরকম সম্পর্ক?"

"কোনো সম্পর্ক নেই। মীরকে চোখেও দেখেনি ওরা। তবে এটুকু জানে যুগলকিশোরের অবাধ্য হলে মীরের কাছে যেতেই হবে ওদের। মীর এই সমস্ত অবাধ্যদের কঠিন শাস্তি দেন। কাউকে বা মোটা টাকায় বিদেশিদের কাছে বিক্রি করে দেন। যেমন কৃষ্ণার দাম উঠেছে এখন অনেক—অনেক টাকা।"

আমি বললাম, "কৃষ্ণা কে? কোথাকার মেয়ে ও? ওইরকম একজন ডাকসাইটে সুন্দরী মেয়ে তোমাদের দলে ভিড়ল কী করে? কতদিন কাজ করছে সে এই দলে?"

"বেশিদিন নয়। মাত্র দু'মাস। ওকে সাংঘাতিক রকমের ব্ল্যাকমেল করেছে ওরা। কৃষ্ণারা আসলে ভাগলপুরের কাছে নাথনগরের বাসিন্দা। ওর বাবা ছিলেন ওখানকার একজন নামকরা ডাক্তার। ওরা দু'ভাই এক বোন। কৃষ্ণাই বড়ো। ভাইদের মধ্যে বড়োটি ভাগলপুর হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে। আর ছোটো ভাইটি কাছাকাছি স্কুলে। এই ছোটো ভাইটি হল কৃষ্ণার প্রাণ। তা যুগলকিশোরের ভগিনীপতি সবুজলালের কতকগুলো খুনকে দাহ কার্যের জন্য নর্ম্যাল ডেথ সার্টিফিকেট দেবার অনুরোধ ওর বাবা প্রত্যাখ্যান করায় ওরা

একদিন ওর ছোটো ভাইটিকে কিডন্যাপ করে। সেই শোকে ওর বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মা-ও শয্যাশায়ী। ওরা ওখানে থানা পুলিশ করে কোনও কূল পায় না। ইতিমধ্যে কুশারী পাণ্ডের ফাঁদে পড়ে ও। কুশারী ওকে বলে তিন লাখ টাকার বিনিময়ে ওর ছোটো ভাইকে উদ্ধার করে দিতে পারে সে। কেননা সে জানে ওর ভাইকে কোথায় রাখা হয়েছে। কিন্তু তিন লাখ টাকা কৃষ্ণার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি। কোনও রকমে হাজার পঞ্চাশেক টাকা দেওয়ার পর কুশারী বলে আরও আড়াই লাখ টাকা না পেলে সে কিছুতেই ভাইয়ের সন্ধান দেবে না। তখন কৃষ্ণার অনেক কান্নাকাটিতে সে বলে যে ওদের কথামতো কাজ করে সে যদি ওই টাকাটা তুলে দিতে পারে তা হলেও হবে। মোট কথা টাকা পেলে ওরা বেইমানি করে না। এই ব্যাপারে কৃষ্ণার ভাই বারবার ওকে সাবধান করে দেয় ওদের ফাঁদে পা না দিতে। তার ফলে ভাইটাকে মেরে প্রায় আধমরা করে দেয় ওরা। এরপর কৃষ্ণাকে বলে হয় ওকে ওদের দলের মর্জি অনুয়ায়ী কাজ করতে হবে নয়তো দু'ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু স্বচক্ষে দেখতে হবে ওকে। কৃষ্ণা তাই বাধ্য হয়েই ওদের সঙ্গে হাত মেলায়।''

''যে ভাইকে ওরা অপহরণ করেছে সে কি আদৌ বেঁচে আছে?''

''হ্যাঁ আছে। কুশারীর সঙ্গে ওর ভাইয়ের একটি ফোটো দেখানো হলে তবেই ও বিশ্বাস করে ওদের দলে যোগ দেয়। এখনও পর্যন্ত ভাইয়ের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের ভয় দেখিয়েই ওকে দিয়ে কাজ করায় ওরা।''

''সব মেয়েদেরই কী এইভাবে ব্ল্যাকমেল করে ওরা?''

''বেশিরভাগকেই করে। কোনও কোনও মেয়েকে দিয়ে খুনও করায়।''

আমি ওর প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনে বললাম, ''কৃষ্ণার ভাইকে কুশারীর দল কোথায় রেখেছ জান?''

''মেটিয়াবুরুজে ওদের একটা ঘাঁটি আছে সেইখানে। কৃষ্ণা এবং অন্যান্য মেয়েদের ঠিকানাও ওই বাড়িটা।''

''বাড়িটা কার?''

''জামালপুরের ওই মীর সাহেবের। খিদিরপুরেও ওর ঠেক আছে।''

''তুমি চেনো সেই বাড়িটা?''

''চিনি। বেশ কয়েকবার গেছি আমি ওই বাড়িতে।''

''আর একটাই প্রশ্ন তোমাকে আমি করতে চাই। কৃষ্ণাকে মীরের ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে কেন ওরা?''

''তার কারণ সবুজলাল মীরকে কৃষ্ণার কথা বলে। ওর ছবি দেখায়। তাতেই মীর আদেশ দেন ওকে দিয়ে ওইসব কাজ আর না করাতে। কেননা কৃষ্ণাকে বাইরের দেশে পাচার করলে চক্রের ক্রেতাদের কাছ থেকে ভাল টাকা পাওয়া যাবে। শুনেছি ওর দাম উঠেছে অনেক। তাই কৃষ্ণায় কাজ শেষ। আজই ওর জামালপুর এক্সপ্রেসে যাবার কথা। শুধু আমার আবদারে যুগলকিশোর ওকে দিয়ে শেষ কাজটা করাতে রাজি হয়। কেননা ওরও ব্যক্তিগত রাগ ছিল জয়ন্তবাবুদের ওপর।''

''ওর ভাইটাকে কি তা হলে সত্যিই ওরা মুক্তি দেবে?''

''হ্যাঁ চিরমুক্তি। ওদের মুক্তির নামই মৃত্যু। ভাইটার ওপর নির্যাতনের ভয় দেখিয়েই ওকে দিয়ে খারাপ কাজগুলো করাত ওরা। এখন ও চলে গেলে আর ওকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী?''

আমি বললাম, "রাকেশভাই, মানুষ জীবনে অসৎপথে যেতেই পারে। কিন্তু কোনও কারণে সে তার ভুল বুঝতে পারলে আবার সৎপথে ফিরেও আসে। তুমি যে কাজের পরিকল্পনা করেছিলে তার ক্ষমা নেই। তবুও আমাদের তদন্তের কাজে তুমি সাহায্য করলে তোমার বিষয়টা একটু হালকা করে দেখা হবে। হয়তো এখনও গেলে কৃষ্ণার ভাইটাকে উদ্ধার করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই।"

রাকেশ বলল, "চলুন তা হলে। আমি কিন্তু বাড়িটা দূর থেকে দেখিয়ে দেব। কেননা আমাকে দেখলেই ওরা সতর্ক হয়ে যাবে।"

কথাটা ঠিকই বলেছে রাকেশ। আমরা সাদা পোশাকের কয়েকজন পুলিশকে নিয়ে ওর সঙ্গে দ্বিতীয় হুগলি সেতু পার হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই মেটিয়াবুরুজে পৌঁছলাম।

রাকেশ দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে একজন পুলিশের পাহারায় লুকিয়ে রইল। এমনিতেই ওকে টুপি চশমা পরিয়ে যেভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাতে ওকে আর রাকেশ শর্মা বলে চেনাই যাচ্ছিল না। তবু সাবধানের মার নেই।

আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে ঠিকানা মিলিয়ে মীর সাহেবের বাড়িতে গিয়েই দেখি পাখি ফুড়ুত। গোটা ঘর খাঁ খাঁ করছে। কিছুক্ষণ আগেও যে এখানে লোকজন ছিল তা বোঝাই যাচ্ছে। হঠাৎই একজায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম আমরা। দেখলাম পিছনদিক থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কে যেন একজন। সঙ্গে সঙ্গে ডাকিয়ে আনা হল রাকেশকে। ডেডবডি দেখেই চমকে উঠল রাকেশ। বলল, "এ তো যুগলকিশোর! ও এখানে কী করে এল?"

আমি বললাম, "কৃষ্ণাকে নিয়ে ডানকুনি স্টেশন থেকে পালিয়ে হয়তো এখানেই এসেছিল।"

"তা হলে কৃষ্ণা কই? ওর ভাইকে দেখছি না কেন? সেলিম আর জাভেদ নামে দুজন রক্ষী সব সময় এ বাড়ি পাহারা দেয়, তারা কোথায়?"

"এমন হতে পারে ওরাই যুগলকে হত্যা করে কৃষ্ণাকে আর তার ভাইকে নিয়ে পালিয়েছে।"

"না। এ কাজ তারা করবে না। কেননা মীরসাহেবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে যে কী কঠিন মূল্য দিতে হবে তা ওরা জানে। তবু যদি আপনার অনুমানই সত্য হয় তা হলে ওরা শুধু কৃষ্ণাকেই নিয়ে যাবে। ওর ভাইকে সঙ্গে নেবে কেন?"

আমি বললাম, "আচ্ছা এমন কী হয় না যে কৃষ্ণাই ওকে গুলি করে ভাইকে নিয়ে পালিয়েছে?"

"এত সহজ? সেলিম আর জাভেদের নজর এড়িয়ে ওরা পালিয়েই বা যাবে কী করে? তা ছাড়া কৃষ্ণা পিস্তল রিভলভার কোথায় পাবে? পেলেও ও কাজ কৃষ্ণা পারে না। এ কাজ একমাত্র করা সম্ভব কুশারী পাণ্ডের। কিন্তু সেও তো এখন পুলিশের হেফাজতে।"

"তবে কি মীরের কোনও বিপক্ষ দল এই কাজ করেছে মনে হয়?"

"না। তাও না।"

"যুগলকিশোরের কোনও গুপ্ত শত্রু?"

"তেমন কেউ আছে বলেও তো জানা নেই। সবচেয়ে রহস্যময় হল সেলিম ও জাভেদের অন্তর্ধান। এই বাড়ি ছেড়ে গেল কোথায় তারা? আর সব মেয়েদেরও কাউকে দেখছি না।"

"কাউকে আর না দেখাও যেতে পারে। যুগলকিশোরকে যে বা যারা খুন করেছে তারা হয়তো এমনই ভয়ংকর যে তাদের ভয়েই পালিয়েছে ওরা।

আমি একটু ভাবনাচিন্তা করে বললাম, "আচ্ছা এমন কি হতে পারে না, ডানকুনিতে সকলের ধরা পড়ার খবরটা কোনও কারণে মীরের কানে পৌঁছলে তারই নির্দেশে এই কাণ্ডটা হয়েছে। এখানকার পুলিশের নজর এড়িয়ে আর কিছু করা সম্ভব নয় বুঝেই যুগলকিশোরের খেল খতম করে জাল গুটিয়ে নিয়েছে ওরা। সেলিম আর জাভেদই হয়তো সবাইকে নিয়ে রওনা হয়েছে জামালপুরের দিকে।"

"হয়তো তাই। কিন্তু এরকম হয়েছে বলে এখনও আমার মনে হচ্ছে না।"

যাই হোক, এরপর আমরা গোটা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আর কারও অস্তিত্ব পেলাম না।

আমাদের থানার ও.সি এখানকার থানায় খবর পাঠালেন, থানা থেকে অফিসাররা এলে সবাই মিলে তদন্ত করে ডেডবডি মর্গে পাঠিয়ে বিদায় নিলেন সবাই।

আমরাও ফিরে এলাম।

কী যে হল কৃষ্ণাসুন্দরীর তা কে জানে? তার ভাইটার পরিণতিও যে কী হল তাই বা বলতে পারে কে? সন্দেহ হল সবুজলালকে। তবে সন্দেহটা মনের মধ্যে একবারমাত্র উঁকি দিয়েই দূর হল। কেননা সবুজলাল যুগলকিশোরকে কখনওই হত্যা করবে না।

তা হলে?

অনেকরকম দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়েই বাড়ি ফিরলাম অনেক রাতে। রাখহরি আমার জন্য হানটান করছিল। বলল, "সেই কখন বেরিয়েছেন। একটা ফোন করে দিলেও তো পারতেন?"

বললাম, "সত্যিই খুব ভুল হয়ে গেছে। আসলে এমনই এক পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম যে শুধুমাত্র টেনশন ছাড়া মনের মধ্যে অন্য কিছুই ছিল না।"

রাত বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে ডিমের ঝোল দিয়ে সামান্য দুটি ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লাম। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দু'চোখের পাতা এক করে ডুব দিলাম সুপ্তিসাগরে।

আজকাল ঘুমের মধ্যে আমি অনেকরকম আজগুবি স্বপ্ন দেখি। তাই স্বপ্ন দেখছিলাম আমি যেন হালকা শরীর নিয়ে আকাশপথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কতকগুলো পরি আমার আশপাশ দিয়ে হাসি হাসি মুখ করে উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করেও তাদের ধরতে পারছি না। আবার মাটিতেও নামতে পারছি না শরীরটা হালকা হয়ে যাওয়ায়। হঠাৎই কী যেন হয়ে গেল। আমি সবেগে নামতে লাগলাম নীচের দিকে। আর তখনই পতনের ভয়ে ঘুমের মধ্যেই গোঁ গোঁ করে উঠলাম।

রাখহরি ছুটে এসে আমাকে ধরল। বলল, "আপনি অনেকক্ষণ থেকেই গোঁ-গোঁ করছেন। কী হল হঠাৎ? শরীর খারাপ নয়তো?"

আমি উঠে বসে চোখে মুখে জল দিয়ে এক গেলাস জল খেয়ে বললাম, "না রে। একটা অন্যরকম স্বপ্ন দেখে এমনটা হয়ে গিয়েছিল। যা তুই শুয়ে পড়গে যা। এখন রাত তিনটে।"

রাখহরি বলল, "আর শুয়ে লাভ নেই। একটু চা করি না?"

"সেই ভাল। দেখতে দেখতেই ভোর হয়ে যাবে। চা খেয়ে বরং একটু বাগানে

পায়চারি করব।''

আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডোর বেলটা বেজে উঠল।

এমন অসময়ে কে আসতে পারে? রাখহরিকে বললাম, ''দেখ তো কে?''

রাখহরি সাড়া নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ''কোনো মহিলা।''

''খুলে দে।''

রাখহরি দরজা খুলতেই পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এক তরুণী একটু ভারিক্কি মেজাজ নিয়ে ঘরে ঢুকল। ঢুকে নিজেই দরজাটা বন্ধ করে হাতের পিস্তলটা লুফতে লুফতে কোনও অনুমতি না নিয়েই সোফায় এসে বসল।

রাখহরির মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে তখন। বিশেষ করে আমাকে অবিচল দেখে ও যে কী করবে তা ভেবে পাচ্ছে না।

তরুণী আমাদের দুজনের মুখের অবস্থা দেখে বলল, ''ভয় পাচ্ছেন?''

আমি বললাম, ''ভয় পেলে আপনি কি এ পর্যন্ত আসতে পারতেন? আপনার পিস্তলটাও এতক্ষণে ঘরের কোনখানে যে ছিটকে পড়ত তা কে জানে?''

তরুণী বলল, ''যদি ভুল ঠিকানায় না এসে থাকি তা হলে আপনি নিশ্চয়ই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর মিঃ অম্বর চ্যাটার্জি?''

''মনে হয়।''

''আমি মরিয়ম। এ পর্যন্ত আমি মোট সাতটা খুন করেছি। অবশ্য কালকের তিনটে খুন নিয়ে।''

''এখন কি অমায় খুন করতে এসেছেন?''

''না না। আমি আরও তিনটে খুন করতে চাই। তাহলে আমার খুনের সংখ্যা হবে দশ। খুনের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি বাড়িয়ে লাভ কি বলুন?''

''আপনার আগমনের কারণটা জানতে পারি কি?''

''অবশ্যই। আমার সবকিছু জানাব বলেই তো আপনার কাছে আসা। আমি এর পরে যে তিনটে খুন করব তাতে আপনার সক্রিয় সহযোগিতা চাই।''

আমি একটু উত্তেজিত হয়ে বললাম, ''আপনি কি আমায় পেশাদার গুণ্ডা পেয়েছেন?''

''মোটেই না। গুণ্ডার দরকার হলে আমি আপনার কাছে আসব কেন? আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমার একটি আঙুলের ইশারায় আমার হয়ে কাজ করতে অনেকেই এগিয়ে আসবে। ঠিক কিনা বলুন?''

''ওসব বাজে কথা রেখে আসল কথা বলুন। বলুন আপনি কী জন্য এসেছেন?''

''তার আগে একটু চা খেয়ে গলাটা ভেজানো দরকার। আপনার ঘরে যদি কেক বিস্কুট কিছু থাকে তো দিন না, খিদেও পেয়েছে খুব।''

রাখহরি সঙ্গে সঙ্গে চায়ের জল বসিয়ে কতকগুলো বিস্কুট প্লেটে সাজিয়ে খেতে দিল মেয়েটিকে। বলল, ''কেক নেই। তবে এখনই গরম হালুয়া তৈরি করে দিচ্ছি। আগে চা-বিস্কুট খান।''

মবিয়ম বলল, ''কী নাম ভাই তোমার?''

''আমার নাম রাখহরি।''

''থ্যাঙ্কস্। আমার ভাইয়ের নাম ছিল আল্লারাখা।''

তরুণী যে কী কারণে কোথা থেকে এসেছে তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার পরিচয়ই বা ও পেল কী করে? খুবই রহস্যময় মেয়েটি। তবে ও যখন নিজেই এসেছে তখন ওকে আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলাম না। জলযোগ পর্ব শেষ হলে ও নিজেই যা বলার বলবে।

স্লিম ফিগারের এই মেয়েটি অপূর্ব না হলেও সুন্দরী। ওর টিকলো নাক আর ছুরির ফলার মতো চোখ দেখলেই বোঝা যায় দারুণ বেপরোয়া ও। কিন্তু এই বয়সে এমন খুনের নেশা কেন যে চেপেছে ওর তা কেন জানে?

একটু পরে চা-বিস্কুট ও হালুয়া খেয়ে প্রকৃতিস্থ হল ও। তারপর এক গাল হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "খুব অবাক হয়ে যাচ্ছেন, না?"

"তা একটু তো হচ্ছিই।"

মরিয়ম বলল, "এবার তা হলে কাজের কথা বলি। আপনার কাছে না এসে পুলিশের কাছে গেলে ওরা আমার কোন কথাই শুনত না। উলটে আমার পরিচয় পেলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে লকাপে পুরে নিজেদের কৃতিত্বের কথা জাহির করত। আপনি পুলিশের সহযোগী গোয়েন্দা। কিন্তু গোয়েন্দা পুলিশ নন। সেই ভরসাতেই আপনার কাছে আসা। আমার কাজ শেষ হলে আপনি আমাকে ধরিয়ে দিতে পারেন। কেন না আমি নিজে থেকে আত্মসমর্পণ না করলে আপনার পুলিশ বন্ধুদের সাধ্য নেই আমাকে ধরে। তবে আমি আত্মসমর্পণ করব কিন্তু শর্ত সাপেক্ষে।"

"কী সেই শর্ত?

"আমি দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এতগুলো খুনের দায় নিয়েও পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে বেড়ালাম অথচ কেউ আমাকে ধরতেই পারল না। আর নিজে যখন স্বেচ্ছায় ধরা দেব তখন ওঁরা কৃতিত্ব নিয়ে কাগজে ফলাও করে স্টেটমেন্ট দেবেন ওটি হচ্ছে না। ওঁরা কোর্টের কাগজে স্বীকারোক্তি দেবেন আমার মতো একজন দাগি ক্রিমিনালকে ধরতে না পারার লজ্জায় স্বেচ্ছায় চাকুরি থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন। এতে যদি রাজি হন তবেই আমি ধরা দেব। না হলে যেমন ফাঁকা মাঠের বিড়ালি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি তেমনই ঘুরে বেড়াব।"

আমি বললাম, "বেশ, আপনার কথাটা বলে দেখব পুলিশকে।"

মরিয়ম বলল, "আমাকে আপনি বলার দরকার নেই। তুমি বললেই খুশি হব। কেন না এখন থেকে আমরা দুজনে বন্ধুর মতো।"

"তা হলে তুমিও আমাকে তুমি বলবে।"

"তা হয় না। আপনি একজন গণ্যমান্য নাগরিক। আর আমি বস্তি ক্লাসের বাজে মেয়ে। আপনার যেটা শোভা পায় আমার তা পায় না। আপনাকে আমি একটা কাজের দায়িত্ব দেব। আশা করি সেটা আপনি ভালভাবেই পালন করবেন। কাজটা অত্যন্ত জরুরি।"

"কী কাজ তা না জানলে কেমন করে পালন করব?"

"এ কাজ আপনার দ্বারাই সম্ভব। তাই অন্য কাউকে দিয়ে করাতে চাই না। তবে একটা কথা, পুলিশকে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানাবেন না এ বাপারে। আমি থাকব নেপথ্যে। বডিগার্ড হয়ে। যাতে বহিরাগতরা কেউ হামলা না করে।"

আমি এবার কঠিন গলায় বললাম, "কোন বাজে কাজ হলে আমার পক্ষে কিন্তু করা সম্ভব নয়।"

"নাচতে নেমে ঘোমটা টানবেন না মিঃ চ্যাটার্জি। বাজে মেয়ের কাছ থেকে ভাল

কাজ আশাই বা করেন কী করে?"

রাখহরি এবার বেগে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। আমি ইশারায় ওকে চুপ থাকতে বললাম।

মরিয়ম বলল, "যে কৃষ্ণাসুন্দরীর খোঁজে আপনারা ডানকুনি এমনকি মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত গিয়েছিলেন, সেই কৃষ্ণাসুন্দরীকে আজই রাতের আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে আপনার দায়িত্বে ওর ভাগলপুরের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে চাই। সঙ্গে ওর সেই অপহৃত ভাইটিও আছে।"

ঘরের মধ্যে একটা বোমা পড়লে আমি বোধ হয় এতটা চমকাতাম না যতটা চমকালাম মরিয়মের কথায়। তাই বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, "কৃষ্ণা তোমার কাছে!"

"হ্যাঁ। আমার পরের বোন রাবেয়ার জিম্মায় রেখে এসেছি তাকে। এখন আপনিই বলুন না কোহিনূরের মতো এই দুর্লভ সামগ্রীকে কি যার তার মারফত পাঠানো যায়? আপনার চেয়ে বড় রক্ষক ওর আর কে-ই বা হতে পারে?"

আমি ওর মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, "আমার সব কিছুই কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

"হবারই তো কথা।" বলে একটু চুপ থেকে বলল, "কৃষ্ণাকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার পর আমি মীর আর সবুজলালের মোকাবিলা করতে চাই। সেই সময়ও আপনার সাহায্যের প্রয়োজন। কেননা সবুজলালকে সহজে কব্জা করা গেলেও মীর কিন্তু গভীর জলের মাছ। আজ রাতের অভিযানে আমার বোন রাবেয়াও আপনাদের সঙ্গে থাকবে। দু'জনেই থাকবে বোরখাপরা অবস্থায়। গোলাপ ফুল চিহ্ন বোরখা হবে কৃষ্ণার আর রজনীগন্ধার বোরখাটা আমার বোন রাবেয়ার। আসলে আমি একা। দলছুট এক কর্মী। নিজেই নিজের নেত্রী। নিজেই নিজের দল। আমাকে হত্যা করার জন্য মীর বেশ কয়েকজনকে কাজে লাগিয়েছে। তাই আমি প্রথমে সবুজলালকে মেরে মীরকে একটা চমক দিতে চাই। তারপর..."

"তারপর?"

"মীরকে হত্যা করে ওর মসনদে আমি প্রেতের মতো নাচব।"

আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই রাখহরি আরও এক রাউন্ড চা দিয়ে গেল।

আমি বললাম, "মরিয়ম, তুমি কে তা জানি না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে রুখে দাঁড়ায় আমিও সব সময় তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। কৃষ্ণাকে ও তার ভাইকে তুমি যে ওই নরক থেকে উদ্ধার করেছ তার জন্যে তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ। এখন বল দেখি কীভাবে কী করলে তুমি? তোমার মতো মেয়ের সঙ্গে এই অন্ধকার জগতের শয়তানদের সম্পর্ক গড়েই বা উঠল কীভাবে?"

মরিয়াম ম্লান মুখে বলল, "কী হবে আমার মতো ভাগ্যহীনা এক মেয়ের চোখের জলের কাহিনী শুনে?"

আমি বললাম, "শুনতেই হবে। তুমি নিজেই না আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছ?"

মরিয়াম বলল, "তবে শুনুন—

আমাদের দেশ হল বিহারের মুঙ্গের জেলায় মুঙ্গেরেই। খুব ছোটোবেলায় আমি বাবা মায়ের সঙ্গে কলকাতায় খিদিরপুরে চলে আসি। আমরা দু'বোন এক ভাই। আমার বোনের

নাম আগেই বলেছি, রাবেয়া। ভাই সবার ছোটো। ওর নাম আল্লারাখা। ভাইটা একটু বড়ো হলে ওর কিডনির অসুখ দেখা দিল। আমরা তখন দু'বেলা দুমুঠো পেট ভরে খেতেও পাই না। তাই ওর অসুখের খরচা চালাতে হিমসিম খেয়ে গেলাম একেবারে। আমার শরীর স্বাস্থ্য বরাবরই খুব ভাল। মুখশ্রীও তো দেখছেন, মন্দ নয়। তবে আমার বোন রাবেয়া কিন্তু দারুণ সুন্দরী। এই সময়ে আমি সবুজলালের পাল্লায় পড়ে গেলাম। ও আমাকে বলল, সৎপথে থাকলে খেতে পাবি না। আমাদের খাতায় নাম লেখা, দেখবি আখের একদিন খুলে যাবে। দু'হাতে টাকা রোজগার করবি। তোর ভাই-এর কিডনির ব্যবস্থাও করে দেব আমরা। তা ছাড়া তোকে যা সুন্দর দেখতে মীর হয়তো তোকে দেখলেই নিকাহ্ করতে চাইবে। তা যদি হয় ভাগ্যের দরজা দু'হাট করে খুলে যাবে তোর।''

''আমি প্রতারকটাকে বিশ্বাস করলাম। ও আমার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কলকাতার একটি নামী হাসপাতালে ভাইটাকে ভর্তিও করাল। তারপর আমাকে নিয়ে চলে গেল সাহেবগঞ্জের গঙ্গার ওপারে মণিহারি গ্রামে। সেখানেই আরও কিছু মেয়ের সঙ্গে আমাকেও ট্রেনিং দিতে লাগল অস্ত্র চালনার। জালিয়াতি ও প্রতারণার যত রকম কলাকৌশল আছে তার সবই রপ্ত করাল। এইসব কাজের বিনিময়ে ভাল কমিশনও পেতাম। এদের দলের একটি মস্ত গুণ যেটা সেটা হল কোনও মেয়ের গায়ে এরা কখনও হাত দিত না। তবে মীর কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে যেমনই নৃশংস তেমনই বর্বর।

''ইতিমধ্যে দু'দুটো বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল। আমি ওদের কথামতো কাজ করছি। দু'হাতে টাকা লুটছি। বাড়িতে পাঠাচ্ছি। কিন্তু রুগ্ন ভাইটাকে একবার দেখতে আসবার সময়ও পাইনি। সবুজলাল একবার অবশ্য আমায় মন রাখতে আমাকে মীরের কাছে নিয়ে গেল। সে কী বিশাল বৈভব তার। আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বলল, মেয়েটার দিকে একটু নজর দিস। ওর কয়েকটা ছবি আমার কাছে দিয়ে রাখ। মনে হচ্ছে ভাল দাম পাওয়া যাবে এর।

''মীরের কথা শুনে হতাশায় ভরে উঠল আমার মন। আমি কোথায় ভেবেছিলাম মীর আমাকে নিকাহ্ করলে আমার সব দুঃখ দূর হবে। এইসব জঘন্য কাজগুলো আর করে বেড়াতে হবে না, তার জায়গায় এ কী!

'ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা খুন আমি করে ফেলেছি। আমার প্রতারণার ফাঁদে ফেলে কত পরিবারকে সর্বস্বান্ত করেছি। তার বিনিময়ে আমি কী পেলাম? আমার মন তখন থেকেই বিদ্রোহী হতে শুরু করল। ইতিমধ্যে সবুজলালের বলি হল কৃষ্ণাদের পরিবার। কৃষ্ণাকে আমি চিনতাম। কেননা ওর বাবার কাছে বেশ কয়েকবার চিকিৎসার জন্য যেতে হয়েছিল আমাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে শুনলাম ওর ভাইটাকে ওরা কিডন্যাপ করেছে এবং দারুণভাবে ব্ল্যাকমেল করছে কৃষ্ণাকে, তখনই আমার মনে হল আর এদের সঙ্গে দোস্তি নয়। ইতিমধ্যে বাড়ির জন্যও মনটা হু-হু করছে। এই নিয়ে আমার সঙ্গে জোর বচসা হল সবুজলালের। ও আমাকে কিছুতেই বাড়ি আসতে দেবে না। আমিও ছাড়ব না, বললাম, ''রইল তোমাদের কাজ। ভাইয়ের জন্য ভীষণ মন কেমন করছে আমার। তার কোনও খবর পাচ্ছি না। দু'চারদিনের জন্য হলেও আমাকে যেতে হবে।'' এতদিনে মুখ খুলল সবুজলাল। বলল, ''তোর ভাই আর নেই রে। অনেকদিনই গত হয়েছে! পাছে তুই দুঃখ পাস তাই বলিনি।'' শুনে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। এবং তখনই স্থির করলাম এদের অস্ত্রেই এদের আমি বধ করব। তবে সেই ভাব মনের মধ্যে গোপন রেখে বললাম, ''আমার বাড়ির আর

সব?" "ওরা ঠিক আছে।" আমি চোখের জল মুছে বললাম, "তা হলে আমাকে একবার মীরের কাছে নিয়ে চলো। আমার কিছু সাহায্যের দরকার।" সবুজলাল বলল, "এর জন্য মীরের কাছে যেতে হবে কেন? সে ব্যবস্থা তো আমিই করে দিতে পারি।" আমি বললাম, "না। আমি যাব তার কাছে।" সবুজলাল বলল, "ওখানে গেলে তোর বিপদ হবে। কেননা তোর চোখ যে অন্য কথা বলছে। তুই ওখানে গিয়ে পৌঁছনোর আগেই হয়তো কুশারী পাণ্ডের অ্যাসিডের বাল্ব ঝলসে দেবে তোর এই সুন্দর মুখটাকে। তার চেয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো যেমন কাজ করছিস তেমন করে যা।"

মরিয়ামের কথা শুনতে শুনতে ঘেমে উঠলাম আমি। বললাম, "তারপর?"

"তারপর আমি আর ওকে না ঘাঁটিয়ে বললাম, তা হলে আমায় বাড়ির জন্য কিছু টাকা পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। সবুজলাল বলল, এই তো বাধ্য মেয়ের মতো কথা। কত দিতে হবে বল? আমি বললাম, "আপাতত হাজার দশেক টাকা পাঠিয়ে দাও। সবুজলাল বলল, তাই দেবো। আসলে তোর ওপর আমার খুব মায়া পড়ে গেছে। তা ছাড়া তুই অত্যন্ত কাজের মেয়ে। তোকে দিয়ে যে কাজ করানো যাবে অন্যকে দিয়ে তা করানো যাবে না। ওদিকে কৃষ্ণারও ডাক পড়েছে মীরের কাছে। ওকে মোটা টাকার বিনিময়ে বাইরের কোনও দেশে পাঠিয়ে দেবে মীর। যদি গোলমাল করে তা হলে ওর অবস্থাটা যে কী হবে তা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। তোর ওইরকম পরিণাম যাতে না হয় সে দিকটা আমি দেখব। আপাতত কয়েকদিনের জন্য তুই পাটনায় চলে যা। সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ কোনও একজনকে খুনের ঝুঁকি নিতে হবে। আমি বুঝেই নিলাম পাটনায় যাওয়াই আমার শেষ যাওয়া। হয় ওরা আমাকে কাজের অছিলায় বধ্যভূমিতে পাঠাচ্ছে নয়তো ওদেরই কাউকে খুন করে আমায় পালাতে হবে কলকাতায়। তবে একবার যদি এদের জাল কেটে বেরোতে পারি তা হলে আমার নয়, ওদেরই মৃত্যুঘণ্টা বাজবে এবার। যাই হোক, সবুজলালের কথামতো আমি পাটনায় যেতেই পান্না নামের একজন আমাকে দরিয়াপুরের একটি বাড়িতে নিয়ে গেল। পান্নাকে আমি চিনতাম। তাই সাহসে ভর করেই গেলাম ওর সঙ্গে।"

মরিয়ামের কথার মাঝেই বললাম, "তুমি পাটনায় যাবার আগেই চালাকি করে কেটে পড়লে না কেন?"

"সম্ভব ছিল না। ওকাজ করতে গেলে পথেই আমাকে গুলি খেয়ে মরতে হত। ওরা কি আমার পেছনে কোনও চর রাখেনি ভেবেছেন? পাটনায় পৌঁছলে ওরা আমার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকত। সে জন্যই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে চলে গেলাম। তা দরিয়াপুরের বাড়িতে বসে রাতে পরিকল্পনা হল এখানকার অত্যন্ত প্রভাবশালী এক নেতা ধনিরাম শেঠকে হত্যা করার। এ কাজ আমাকেই করতে হবে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন এবং বিপজ্জনক। ধনিরামের সঙ্গে একজন গোর্খা বডিগার্ড থাকে। কাজ হাসিল হলে তার দ্বারাও আমার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। অতএব খুব সাবধানে এ কাজ করতে হবে আমাকে। পারিশ্রমিক এক লাখ। এবং সেটা অগ্রিম। আমি রাজি হলাম। তবে এও জানি ও টাকা আমাকে ভোগ করতে হবে না। অপারেশন শেষ হলেই দাদাজির একটি গুলিতে আমিই শেষ হয়ে যাব।"

আমি বললাম, "তুমি তো পান্নার সঙ্গে দরিয়াপুরে গেলে। রাতে ওখানে কার সঙ্গে পরামর্শ হল?"

"দাদাজি হলেন ওখানকার ম্যান। ওনার কথাতেই ওঠাবসা করে সবাই। ওনার প্রকৃতি সাপের চেয়েও খল। ওঁর সঙ্গেই পরিকল্পনা হল।"

"তারপর?"

"তারপরই একটা চরম ডিসিশন নিয়ে নিলাম। দাদাজি আমাকে একটি বিদেশি পিস্তল দিয়ে বললেন, এটাকেই কাজে লাগাও। আমি ওই সঙ্গে টাকাটাও নিলাম। দু'ঘণ্টার মধ্যে কাজ হাসিল করে ফিরে আসছি বলে পান্নাকে বললাম, এক গেলাস জল খাওয়াও তো। পান্না জল আনতে পাশের ঘরে যেতেই আমি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি করলাম দাদাজিকে। তারপর অন্ধকারে গলিপথ ধরে মহেন্দ্রুঘাটে এসে একটা নৌকো নিয়ে চলে এলাম পহলেজা ঘাটে। সেখানে এক গরিব চাষির বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে পরদিন ঘুর পথে মোকামায়। সেখানেও এক রাত আমার এক পরিচিতর বাড়িতে কাটিয়ে চলে এলাম খিদিরপুরে। এসে শুনলাম আমার ভাইটা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। ওরা হাসপাতালে ভর্তি করার পর কিডনি দেওয়ার ব্যবস্থা করা দূরে থাক আর কোনও খোঁজখবরও নেয়নি। ইতিমধ্যে আমার ওপর বদলা নিতে ওরা রাবেয়ার দিকে নজর দিয়েছে। আমি ঠিক সময়ে এসে না পড়লে কৃষ্ণার সঙ্গে রাবেয়াও পাচার হয়ে যেত। যাই হোক, আমি তো জানতাম মেটিয়াবুরুজের ঠেক। দলে নাম লেখানোর আগে এখানে বসেই সবুজলালের সঙ্গে কথাবার্তা হত। কুশারী পাণ্ডেকেও এখানে কয়েকবার দেখেছি আমি। রাবেয়ার মুখে শুনলাম আমাকে মারার জন্যে এবং ওদের নিয়ে যাবার জন্যই কুশারীর এখানে আগমন। আমার তখন ভয়ানক জেদ। আমি ওখানে গিয়েই প্রথম গুলি চালাই সেলিম আর জাভেদ নামে মীরের পোষা দুটো গুণ্ডার ওপর। ভাগ্যক্রমে যুগলকিশোর ও কৃষ্ণাকেও পেয়ে গেলাম এখানে। যুগলকিশোর আমার মূর্তি দেখে ভয়ে পালাতে গেল। ততক্ষণে তাকেও একটা গুলি করলাম। এরপর কৃষ্ণার ভাইকে উদ্ধার করে অন্যান্য মেয়েদের বললাম, বাঁচতে চাস তো এখনই পালা। না হলে পুলিশের হাতে পড়লে সারাটা জীবন জেলের ঘানি টানতে হবে। পারলে মীরের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকিস।" ওরা চলে যেতেই আমি কৃষ্ণার সাহায্য নিয়ে সেলিম আর জাভেদের ডেডবডি দুটো ম্যানহোলের গর্তে ঢুকিয়ে দিলাম। যুগলকিশোরেরটা আর পারলাম না। পাছে দেরি হয়ে যায় সেই ভয়ে ওদের নিয়ে চলে এলাম খিদিরপুরে। ইতিমধ্যে কৃষ্ণার মুখেই খবর পেয়েছি রাকেশ শর্মা ও কুশারী পাণ্ডে অ্যারেস্ট হয়েছে বলে।"

আমি বললাম, "আমার এতদিনের গোয়েন্দাগিরিতে এমন রোমহর্ষক ঘটনার মুখোমুখি আমি কখনও হইনি। দু'একটা খুন হয়েছে আমি তার তদন্ত করেছি। ধরেওছি অপরাধীকে। কিন্তু এ তো দেখছি ভয়াবহ ব্যাপার। তা আমার ব্যাপারে এত সব তুমি জানলে কার কাছে? কৃষ্ণা তো আমাকে চেনে না।"

মরিয়ম বলল, "আপনারা যখন মেটিয়াবুরুজের বাড়িতে তদন্ত করছিলেন আমি তখন বোরখা পরে হেফাজতে থাকা রাকেশের পিছনে দাঁড়িয়ে ওর সব কথাবার্তা শুনছিলাম।"

মরিয়ম বলল, "আর আপনার সময় নষ্ট করব না। আমার অনেক কাজ। এখন তাহলে আসি? আপনি কিন্তু স্টেশনে যেতে মোটেই দেরি করবেন না।"

আমি বললাম, "আর এক কাপ চা?"

"না। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

মরিয়ম চলে গেল। আমি অবাক হয়ে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই পৌঁছে গেলাম স্টেশনে। অত ভিড়ের মধ্যেও মরিয়ম এসে আমার হাত ধরল। বলল, "আমি জানতাম আপনি আসবেন। তবু ধন্যবাদ। টাকা একটু বেশি গেল, ফার্স্ট ক্লাস কুপেই একটা ম্যানেজ করেছি। ভেতরে ঢুকে লক করে দেওয়া যাবে।"

আমি বললাম, "ওরা কোথায়?"

"ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।"

আমি মরিয়মের সঙ্গে ওয়েটিংরুমে যেতেই গোলাপ ও রজনীগন্ধার চিহ্নযুক্ত বোরখাপরা দুটি মেয়ে এসে আমাকে প্রণাম করল। সঙ্গে দশ বারো বছরের ছেলেও ছিল একটি। বুঝলাম এরাই কৃষ্ণা ও রাবেয়া। ছেলেটি কৃষ্ণার ভাই।

আমি বললাম, "আমার পরিচয় এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমরা জেনেছ মরিময়ের কাছে। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব তোমাদের রক্ষা করবার।"

মরিয়ম আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, "আমার বিষয়ে বা এই অভিযান প্রসঙ্গে পুলিশকে কিছু জানাননি তো মিঃ চ্যাটার্জি?"

"না না। তা হলে পুলিশ হয়তো আমাকেই আসতে দিত না। সব কাজ কি পুলিশকে জানিয়ে করা চলে?"

এরপর ট্রেন এলে আমরা নির্দিষ্ট বগিতে গিয়ে বসলাম।

মরিয়ম বলল, "দু'জন রেল পুলিশকেও আমি হাত করেছি। ওরাও সব সময় নজর রাখবে। তবে আপাতত আমি খুব একটা বিপদের সম্ভাবনা দেখছি না। তার কারণ মনে হয় এখানকার এই বিপর্যয়ের খবর আদৌ পৌঁছয়নি ওদের কাছে। সেলিম আর জাভেদের মাধ্যমেই খবর পৌঁছত। তা ওরাই তো ম্যানহোলের গর্তে। যুগলকিশোর মৃত। আর যে মেয়েরা মুক্তি পেয়েছে তারা ভুলেও বলবে না। বললে ওদেব ওপরও চাপ আসবে। বলবে, "ওই হত্যাকাণ্ডের সময় তোমরা কী করছিলে?"

আমি বললাম, "মরিয়ম তুমি বুদ্ধিমতী। যদি তুমি বিপথে না আসতে তা হলে আজ তুমি দেশের একজন হতে। তোমার মতো বেপরোয়া মেয়ে এর আগে আমি দেখিনি। তবু বলছি এতটা নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। মীর এতক্ষণে সবকিছুই ভালভাবে জেনে গেছে। কুশারী পাণ্ডে গ্রেফতার হওয়ার খবর সে জেনেছে যুগলকিশোরের ফোনে। কৃষ্ণাকে নিয়ে ডানকুনি স্টেশন থেকে পালাবার সময় কোথাও না কোথাও থেকে ফোন করে সে নিশ্চয়ই জানিয়েছে সবুজলালকে। যেহেতু সে তার ভগিনীপতি। ওর ওইদিন মেটিয়াবুরুজে আসা মানেই সেলিম ও জাভেদকে সতর্ক করতে আসা। তা ছাড়া যুগলকিশোরের খুন হওয়ার ব্যাপারটাও ওদের কানে পৌঁছত ঠিক। ওর বাড়ি থেকেই খবর চলে যাবে সবুজলালের কাছে। শুধু তাই নয়, পাটনার কাজে গিয়ে তুমি ওদেরই দলের বড়ো একটা চাঁইকে গুলি করে এসেছ। অতএব জেনে রেখো ওরাও তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।"

মরিয়ম বলল, "এতটা কিন্তু আমি তলিয়ে ভাবিনি।"

"এত টাকা দিয়ে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে না এসে যদি আলাদা কোনও একটা গাড়ি নিয়ে যেতে সেটাই হত বুদ্ধিমানের কাজ। অত অল্পসময়ের মধ্যে আমারও মাথায় আসেনি। না হলে আমি বলতাম কি একটা টাটা সুমো বা ওই জাতীয় কিছু ভাড়া করে যেতে।"

মরিয়ম বলল, "সত্যি, টেনশানের মাথায় খুব ভুল কবে ফেললাম।"

ট্রেন ছাড়ল।

কোচ অ্যাটেনডেন্ট এসে টিকিট পরীক্ষা করে গেলে আমরা ভেতর থেকে লক করে দিয়ে গুছিয়ে বসলাম সকলে। কৃষ্ণা ও রাবেয়া এতক্ষণে ওদের বোরখা খুলে ফেলল। সকলের মুখে কৃষ্ণার রূপের কথা শুনে আমি মনে মনে ওর একটা ছবি এঁকে নিয়েছিলাম। এখন দেখলাম ওর সৌন্দর্য আমার কল্পনাকেও ছাপিয়ে যায়। রাবেয়াও কোনও অংশে ওর চেয়ে কম যায় না। মরিয়ম একটু চাপা। তবে ওর চোখের আকর্ষণ দুর্দান্ত।

কৃষ্ণা রাবেয়া দুজনের সঙ্গেই পরিচয় হল আমার।

কৃষ্ণা বলল, "মরিয়ম না থাকলে আমি মীর সাহেবের খপ্পরে পড়ে কোথায় যে হাপিস হয়ে যেতাম তা কে জানে? ও আমাকে রক্ষা করল। তবে আমি ঠিকই করেছিলাম, তেমন কিছু হলে আত্মহত্যাই করব।"

আমি বললাম, "ভাগ্যিস করোনি। করলে ভুল করতে। শুধু একটা কথা মনে রেখো, কারও ওপর অভিমান করে নয়, আত্মহত্যা যদি করতেই হয় তো যার জন্য করবে তাকে শেষ করে তবেই কোরো।"

কৃষ্ণা বলল, "ভাগ্য ভাল যে সে কাজ করতে হল না। মরিয়মের জন্য আমার আদরের ভাইটাকেও ফেরত পেলাম।"

এরপর রেলেরই ক্যান্টিন থেকে কিনে আনা মটন বিরিয়ানি দিয়ে রাতের খাওয়া শেষ করলাম। তারপর মুখ হাত ধুয়ে এসে আবার বসলাম জমিয়ে গল্প করতে।

আমি মরিয়মকে বললাম, "তুমি যে কৃষ্ণাকে ওর ভাইকে নাথনগরে পাঠাচ্ছ সেখানে গেলে ওকী মীরের খপ্পরে আবার পড়বে না?"

"যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। তবে সবুজলাল ও মীর এই দুজনকেই খতম না করা পর্যন্ত রাবেয়াই বডি গার্ড হিসেবে থাকবে ওদের কাছে। তাছাড়া ওদের এলাকার লোকজনকেও আমি সর্তক করে দিয়ে আসব।"

ট্রেন তখন বর্ধমান পেরোচ্ছে।

মরিয়ম আবার বলল, "কৃষ্ণা নাথনগরে ওদের বাড়িতে গেলেই খবর ওরা পেয়ে যাবে। তাতে বরং সুবিধেই হবে আমাদের।" তারপর কী ভেবে যেন বলল, "আমাদের বলা উচিত হবে না। কেন না খুন তো আপনি করবেন না। খুন করব আমি। অবশ্যই যাকে তাকে নয় ওই কুখ্যাত দু'জনকে। আপনি গোয়েন্দা মানুষ, আমি খুন টুন করে পালালে আপনি তদন্ত করে আমাকে খুঁজে বার করবেন। আপনার হাতে ধরা দিতে আমার একটু আপত্তি থাকবে না। বরং নিজেকে ধন্য মনে করব। আপনার মতো কেউ আমার জীবনে এলে কী যে আনন্দ হত। কিন্তু এ জীবনে তা হওয়ার নয়।" বলে একটু চুপ করে থেকে বলল, "আপনি কি বিবাহিত?"

"না।"

"আমারও যেন তাই মনে হল। সকালে আপনার বাড়িতে গেলাম কিন্তু ওই ছেলেটি আর আপনি ছাড়া কাউকেই দেখলাম না। তা এইভাবে আর কতদিন কাটাবেন?"

আমি হেসে বললাম "এইভাবে যে ক'দিন চলে।"

"সত্যই কি আপনি বিয়ে করবেন না ঠিক করেছেন?"

"ঠিক না করলে তো আমার ঘরে আপনি কাউকে না কাউকে দেখতেই পেতেন।"

"আপনি কৃষ্ণাকে বিয়ে করতে পারেন না?"

"না। কেননা ওর সৌন্দর্যের কাছে আমি আনফিট। তবে ও চাইলে ওর জন্য আমি

ভাল পাত্র একটা দেখে দিতে পারি। আমি তো মনে মনে ভাবছি আমারই পরিচিত একজন সাব ইনসপেক্টর, সাদা পায়রার মতো দেখতে তার সঙ্গেই ওর চেষ্টা করব বিয়ের। দু'জনকে মানাবেও ভাল।''

''হাসালেন আপনি। ওর মতো এক ঘরছাড়া কুখ্যাত অপরাধী দলের মেয়েকে পুলিশের একজন সাব ইনস্পেক্টর বিয়ে করতে রাজি হবেনই বা কেন?''

''সে ব্যাপারটা আমরা ওপরই ছেড়ে দাও। তাছাড়া কৃষ্ণা তো খারাপ মেয়ে নয়। ও যেভাবে একটি পরিবারের শিশুকে অপহরণ করতে গিয়েও কিছু না করে ফিরে এল তাতে ওর মহত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে। শুধু ও কেন? আমার চোখে তুমিও অপরাধী নও। তোমার যে পরিচয় আমি পেয়েছি তাতেই বুঝেছি তুমিও কত মহৎ। আমার কাজ অপরাধীকে ধরা। পুলিশেরও এই একই কাজ। এরপর আইন তার প্রচলিত ধারা হিসেবে শাস্তি দেয়। সেইসঙ্গে ভাল হবার সুযোগও দেয় অপরাধীদের। তুমি তো সুযোগ পাবার আগে নিজেই নিজেকে শুধরে নিয়েছ। তা হলে?''

কৃষ্ণা এতক্ষণে বলল, ''আপনার কৃপায় সত্যই যদি কখনও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারি তা হলে ওই বউদির কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে বউদিকে একটা প্রণাম করে আসব।''

''নিশ্চয়ই তুমি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। অনেক মানুষেরই জীবনে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে থাকে। তোমারও তাই হয়েছিল। এখন তুমি মুক্ত বিহঙ্গ। তবে কিনা তুমি তো মেয়ে। তোমার পক্ষে এটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। অবশ্য আজকের দিনে এসব কোনও ব্যাপারই নয়।''

মরিয়ম বলল, ''নাও, সবাই শুয়ে পড়ো এবার। আমি একটু বাথরুম থেকে আসি। আর একটা কথা, রাতে কেউ দরজায় নক করলে আমাকে জিজ্ঞেস না করে খুলবে না কিন্তু। মিঃ চ্যাটার্জি আপনিও কিন্তু আমাকে না জানিয়ে দরজা খুলবেন না। যদি ওদের কেউ হয়...।''

''তা হলে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা গুলি করবে আর সেই গুলিটা প্রথম তুমিই খাবে, এই তো?''

''ঠিক তাই।''

ট্রেনের গতি ক্রমশ মন্থর হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে বোলপুর আসবে এবার।

আমি একবার উঁকি মেরে কামরার চেহারাটা দেখে নিলাম। চারদিক সুনসান। দুজন আর.পি.এফ শুধু টহল দিচ্ছে দুদিকে।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সজাগ রইলাম। ট্রেন এসে থামল বোলপুরে। কিছুক্ষণ থেমে আবার চলতে শুরু করল। একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে মরিয়ম এসে বলল, ''আপনার কথাই ঠিক। মীরের কাছে খবর পৌঁছে গেছে। কেননা বোলপুর স্টেশনে আমি ধুন্ধর ও আজিজকে দেখলাম। ওরা প্রতিটি বগিতে আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখন পাশের কম্পার্টমেন্টে ঢুকেছে ওরা। ভেস্টিবল ট্রেন। ভেতরে ভেতরে ঠিক এসে পড়বে এখানে। আপনি একটু সতর্ক থাকুন। আমি দেখছি ওদের মোকাবিলা করতে পারি কিনা।''

''কিচ্ছু করতে হবে না। কুপেয় ঢুকে বসে থাকো। হাজার ধাক্কাধাক্কি করলেও দরজা আমরা খুলব না।''

''দরজা না খুললে দরজা ওরা ভেঙে ফেলবে।''

"রেলপুলিশ থাকা সত্ত্বেও?"

"রেলপুলিশ কোথায়? যে দু'জন পাহারায় ছিল তারা বোলপুরে নেমে গেছে।"

"এখন তা হলে কী করতে চাও?"

"ওই দুটোকেই শেষ করে দিতে চাই।"

"ওইসব পরিকল্পনা একদম মাথা থেকে সরাও।" বলেই এক ঝটকায় ওকে টেনে ঢুকিয়ে নিলাম কুপের মধ্যে। বললাম, "ওরা আসুক, দরজা ঠেলুক তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।"

মরিয়মের উত্তেজনা কিন্তু কাটে না। একসময় বলল, "শুধু আপনি আমি হলে চিন্তা করতাম না। কৃষ্ণা, রাবেয়া আর ওই বাচ্চাটার জন্যই কিছু করতে সাহস করছি না। যদি ওদের কিছু হয়ে যায়?"

আমি বললাম, "তা হলে একটা কাজ করো। এর পরের স্টেশনই সাঁইথিয়া। আমরা সবাই চুপিসারে ওইখানে নেমে পড়ি চলো। তারপর ওখান থেকে একটা প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে সিউড়ি হয়ে মাসাঞ্জোরের ওপর দিয়ে প্রথমে দুমকায়। সেখানে একটা দিন যে কোনও হোটেলে কাটিয়ে পরদিন ভাগলপুর, নাথনগরে চলে যাব।

কথাটা মনে ধরল মরিয়মের। বলল, "কিন্তু এত রাতে সাঁইথিয়ায় কোনও গাড়ি তো পাবে না।"

"পাবেই। কেননা মফঃস্বলে ট্রেনের টাইমে যত রাতই হোক গাড়ি পাওয়া যাবে।"

ফার্স্ট ক্লাস কুপেতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া মাথায় উঠল। সাঁইথিয়ায় ট্রেন থামতেই নেমে পড়লাম আমরা। পাঁচশো টাকায় একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে আমরা এগিয়ে চললাম দুমকার দিকে।

মরিয়ম বলল, "এই বুদ্ধিটা আগে খাটালেই হত। এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।"

কিন্তু যতটা যা ভেবেছিলাম ততটা তা হল না। সাঁইথিয়া থেকে সিউড়ি, রানিশ্বর, মাসাঞ্জোর হয়ে পাতাবেড়ের জঙ্গলে ঢুকতেই কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠল মরিয়ম। বলল, "এত করেও বোধ হয় শেষ রক্ষা হল না।"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "সে কী! কেন?"

"ওরা মৃত্যুর দূত হয়ে আমাদের পিছন পিছন আসছে।"

আমি রাতের অন্ধকারে পাহাড় ও জঙ্গলের রূপ দেখে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ড্রাইভারের পাশের আয়নায় চোখ পড়তেই দেখলাম একটি আম্বাসাডার আমাদের ফলো করে দ্রুত এগিয়ে আসছে। সে গাড়ির হেডলাইট জ্বলছে না।

আমি বললাম, "ওটা যে আমাদের শত্রুপক্ষের গাড়ি কী করে বুঝলে?"

"অনেক কিছুই আমি গন্ধে টের পাই। তা ছাড়া অনুসরণকারী গাড়ির হেডলাইট জ্বালে না।"

"দুমকা এখনও অনেক দূরের পথ।"

মরিয়ম বলল, "ভালই হয়েছে। লড়াইটা এখানেই জমে উঠুক। মিঃ চ্যাটার্জি, আপনি ওদের নিয়ে নাথনগরেই চলে যান। দুমকায় থাকার আর কোনও প্রয়োজন নেই। আমি একাই সামলাচ্ছি এদের।"

আমি বললাম, "শুধুমাত্র অনুমানে ভর করে কোনও কিছু করতে যেও না। আগে

দেখোই না ওরা কারা।''

''ও গাড়িটাকে আমি চিনি।'' তারপর ড্রাইভারকে বলল, ''পাইলট ভাই, আপনি একটু কায়দা করে এক জায়গায় গাড়িটাকে এমনভাবে থামিয়ে দিন যাতে পেছনের গাড়িটা আর না এগোতে পারে। সেই ফাঁকে আমি নেমে যাব। আপনি একটুও দেরি না করে ওদের নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব নাথনগরে চলে যাবেন। আপাতত শ'পাঁচেক টাকা আপনি রাখুন। তেল কম থাকলে দুমকায় নিয়ে নেবেন।''

ড্রাইভার বললে, ''ওর জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। রাতের গাড়িতে তেল আমার ভর্তিই থাকে। মুখোমুখি কোনও গাড়ির সঙ্গে যদি সংঘর্ষ না হয় তা হলে আমি ঠিকই যথাস্থানে পৌঁছে দেবো এদের।''

মরিয়মের কথামতো ড্রাইভার গাড়িটাকে বেশ একটু জোরে চালিয়ে এক জায়গায় ব্রেক কষতেই মরিয়ম লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। তারপর চকিতে মিশে গেল অন্ধকার গাছপালার আড়ালে।

আমি তখনকার মতো কিছু না বললেও খানিক গিয়েই ড্রাইভারকে বললাম, ''দুমকার দিকে না গিয়ে ডানদিকের যে পথটা রামপুরহাটের দিকে চলে গেছে গাড়িটা ওইদিকে ঘোরাও তো।''

ড্রাইভার তাই করল।

এখানে আমার এক বিশেষ পরিচিতজনের একটি ঠেক আছে। আমি কৃষ্ণা রাবেয়াদের সেখানেই নিয়ে এলাম। যার আশ্রয়ে নিয়ে এলাম তার নাম রামু রাউত। দেওঘরে ত্রিকূট পাহাড়ের কাছে একটি গ্রামে ওর বাড়ি। মাসাঞ্জোরে ড্যামে চাকবি পেয়ে এখানে ও আছে। কোনও একটি ব্যাপারে আমার কাছে ও কৃতজ্ঞ। আমিও কখনও-সখনও এপথে এলে ওর সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত দেখা করে যাই।

আমি ওকে ঘুম থেকে ডেকে আমাদের বিপদের কথা বললাম। তারপর বললাম, ''এই মেয়েদুটি এবং বাচ্চাটাকে বাকি রাতটুকুর মতো এখানে আশ্রয় দাও। কাল সকালের মধ্যেই ফিরে আসব। আর আমার সুবিধের জন্য তোমার স্কুটারটা আমি চাই।''

রামু রাউত এতে করেই রোজ মাসাঞ্জোরে যাওয়া আসা করে। দুমকা দেওঘর যায় মাঝে-মাঝে। এক কথায় ওর স্কুটারটা ও আমাকে দিয়ে দিল।

আমি স্কুটার নিয়ে ড্রাইভারকে বললাম, ''আপনি তো শুধু আর গাড়ি চালক নন, আমাদেরই একজন হয়ে গেছেন। কাল সকালে আমি ফিরলে ভাল, না হলে ওদের তিনজনকে দয়া করে পৌঁছে দিয়ে আসবেন নাথনগরে কেমন?''

ড্রাইভার বলল, ''আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার যথাকর্তব্য আমি করবই।''

আমি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঝড়ের গতিতে সেই জায়গাতেই ফিরে এলাম। এসে দেখলাম চারদিকে চাপ চাপ কিছু রক্ত পড়ে আছে। সেই গাড়িও নেই, কেউ নেই। বুঝলাম এই সময়টুকুর মধ্যেই যা হবার তা হয়ে গেছে। মরিয়ম কেন যে ওদের মোকাবিলা করতে গেল তা কে জানে। বিপদটা যে ওরই হয়েছে তাতে.কোনও সন্দেহ নেই।

তাড়াহুড়োর মধ্যে সঙ্গে টর্চটা নিতে ভুলে গেছি। তবুও আশপাশের ঝোপঝাড়গুলো একবার ভাল করে দেখে নিলাম। না, কারও কোনও ডেডবডি দেখতে পেলাম না কোথাও। ওরা যে দুমকার দিকেই গেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমিও তাই দুমকার পথ ধরলাম।

দুমকা পর্যন্ত যেতে হল না। কিছুদূর যাওয়ার পরই চোখে পড়ল সেই গাড়িটা। কাছে গিয়ে দেখলাম গুরুতর আহত অবস্থায় কে যেন একজন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছে গাড়ির ভেতর। কিন্তু আর কেউ নেই কেন? তবে কি মরিয়মই এই কাণ্ড ঘটিয়ে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে?

এমন সময় হঠাৎই জঙ্গলের দিক থেকে একটা গুলি এসে ছিটকে পড়ল আমার পায়ের কাছে। আমি তখনই মেকি একটা আর্তনাদ করে চকিতে সরে এলাম গাড়ির অপর পাশে।

পরক্ষণেই আমি আহত হয়েছি ভেবে দু'জন গুণ্ডাকৃতি লোক ছুটে এল আমার দিকে। ওরা খুব কাছাকাছি আসতেই আমারও পিস্তল গর্জে উঠল টিস্যুম-টিস্যুম।

দুজনেই গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল সেখানে। ওরা যখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আমি তখনই আত্মপ্রকাশ করে ওদেরই রিভলভারের বাঁট দিয়ে দু'জনের মাথায় এমন মোক্ষম ঘা দিলাম যে ওদের আর উঠে দাঁড়াবারও শক্তি রইল না।

ওদের দ্বারা আর যখন আমার আক্রান্ত হবার কোনও ভয় নেই দেখলাম তখন এক এক করে দু'জনকেই তুলে শোয়ালাম গাড়ির ভেতর। অচৈতন্য সেই লোকটির ওপরই শুইয়ে দিলাম দুটোকে। ওদের তিনজনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। দু'জনের তো আগেই নিয়েছি, গাড়িতে যে ছিল তারটা এবার নিলাম। সেগুলো এক জায়গায় রেখে এদিক ওদিক হাতড়াতেই জোরালো টর্চ একটা পেয়ে গেলাম সেখানে। তারপর সেই টর্চের আলোয় পথ দেখে জঙ্গলের একটু ভেতরে ঢুকতেই যা দেখলাম তা দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। দেখলাম একটি শুকনো গাছের গুঁড়ির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে মরিয়মকে। তার চারপাশে কতকগুলো শুকনো ডালপালা, স্তূপীকৃত গাছের পাতা ইত্যাদি। অর্থাৎ ওকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবার জন্যই এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল।

খুব সময়ে এসে পড়েছি যা হোক। আর একটু দেরি হলে ওই দুষ্কৃতীরা আগুনে ঝলসে দিত ওকে। আমি টর্চের আলোয় বন্দিনী মরিয়মকে দেখেই বললাম, "ভয় নেই মরিয়ম। আমি এসে গেছি।" বলেই ছুটে গেলাম ওর দিকে।

আর ঠিক তখনই মাথায় একটা আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়লাম সেখানেই। মরিয়মের পায়ের কাছে। আঘাতটা এতই জোরে ছিল যে চোখে যেন অন্ধকার দেখলাম। পরক্ষণেই মনে হল কে যেন একজন ভারি শরীর নিয়ে মসমস করে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

একসময় সে এল।

এসেই আমার গায়ে লাথি মেরে চিৎ করে শোয়াল আমাকে। তারপর কঠিন গলায় বলল, "মীরের যারা মোকাবিলা করতে আসে তাদের পরিণাম এইরকমই হয়। ওই শয়তান মেয়েটার সঙ্গে তোকেও আজ জীবন্ত অগ্নিদাহ করব।"

মরিয়ম তবুও একবার শেষ চেষ্টা করে মরিয়া হয়ে চেঁচাল, "কে আছো বাঁচাও।"

মীর বলল, "কেউ এখানে আসবে না বাঁচাতে। যত পারিস চেঁচা।" বলেই শক্ত হাতে টেনে তুলল আমাকে।

ভুল করল মীর।

সেই সুযোগেই আমি ওর পেটে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে ট্রিগারটা টেনে দিলাম। প্রাণান্তকর একটা চিৎকার করে মীরও ওর রিভলভার তাগ করল আমার দিকে। আমি এক ঝটকায় সেটিকে ফেলে দিলাম ওর হাত থেকে। দিয়েই ছুটে গেলাম মরিয়মকে মুক্ত করতে।

বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে মরিয়ম ধীরে ধীরে এগিয়ে এল মীরের কাছে। বলল, "শয়তানের রাজত্ব শেষ। সবুজলালকে উচিত শিক্ষা দিয়ে এসেছি। এবার তোমার পালা। তোমারই তৈরি করা চিতায় আজ আমি তোমাকেই শোয়াব।"

পেটে গুলি খেয়ে মীর তখন ছটফট করছে। সেই অবস্থাতেই মরিয়ম ওকে টেনে হিঁচড়ে শোয়াল সেই শুকনো ডালপালার ওপর।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "না, এ-কাজ কোরো না তুমি। চলো একে ধরাধরি করে কোনরকমে থানায় নিয়ে যাই।"

মরিয়ম ফোঁস করে উঠল এবার। বলল, "খবরদার থানা পুলিশের নাম মুখে আনবেন না। এইসব দুষ্ট দুর্জনরা ওদেরই পোষ্যপুত্র। আপনি হঠাৎ করে না এসে পড়লে আমার কি অবস্থা হত একবার ভেবে দেখুন তো। এতক্ষণে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে পুড়ে ঝলসে আমি শেষ হয়ে যেতাম। তাই শত্রুর শেষ আমি রাখব না।" বলেই মীরের পকেট হাতড়ে একটা লাইটার বার করে ধরিয়ে দিল সেইসব শুকনো ডাল পাতায়। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। আর সেই আগুনে প্রাণান্তকর চিৎকার করতে করতে ভুট্টার মতো পুড়তে লাগল মীর। কেননা গুলিবিদ্ধ পেট নিয়ে ওর তখন ছুটে পালাবারও ক্ষমতা ছিল না।

অবস্থার বিপাকে পড়ে এমন দৃশ্যও চেয়ে চেয়ে দেখতে হল।

একটু পরেই কাদের যেন কণ্ঠস্বর কানে আসতে মরিয়ম বলল, "মনে হয় পুলিশ। আগুন দেখে ছুটে আসছে। শিগগির পালিয়ে চলুন এখান থেকে।" বলেই আমার একটা হাত ধরে টানতে টানতে আমাকে আরও গভীর জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেল। তারপর এক জায়গায় একটি খাদে নেমে বড়ো একটি পাথরের আড়ালে এসে হাঁফাতে লাগল। আমারও হাঁফ ধরে গেছে তখন।

আমরা দুজনেই সেই পাথরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লাম সেখানে।

মরিয়ম আমার বুকে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "খুব লেগেছে আপনার তাই না? সত্যি আমার মতো একটা বাজে মেয়ের আবদার রাখতে গিয়ে কী বিপদেই না পড়েছিলেন আপনি। শয়তানটা ভাগ্যে আপনাকে গুলি না করে মাথায় আঘাত করেছিল।"

বললাম, "সবই বরাত জোর। সত্যি, মাথাটা এখনও ঝনঝন করছে।"

"এই অবস্থায় একটু জল দিতে পারলে ভাল হত।"

"কাল নাথনগরে গিয়ে যে কোনও একজন ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে নিলেই হবে। এখন বলো তুমি গাড়ি থেকে নেমে পড়ার পর কী হল?"

মরিয়ম বলল, "আমি একটা বড়ো গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। ওই গাড়ির ভেতর থেকে তখন সবুজলালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আর লুকোতে হবে না মরিয়ম, আমরা তোকে দেখেছি। কুশারী পাণ্ডে অ্যারেস্ট হবার পর থেকেই সর্তক ছিলাম আমরা। তা ছাড়া তোকে তো আজ কদিন ধরেই আমরা খুঁজছি। দাদাজিকে গুলি করে পালিয়ে এলি তুই। ভাবলি বেঁচে গেলি। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মতো কঠিন কাজ আর কিচ্ছু কি আছে? তবে জেনে রাখ দাদাজি বেঁচে গেছে এ যাত্রা। আয় কাছে আয়। তোকে একটু আদর করি। মীর সাহেব গাড়িতেই আছেন। তোকে ইনাম দেবেন।" এই পর্যন্ত বলে মরিয়ম একটু দম নিল। তারপর আবার বলল, "আমি তখন ধরেই নিয়েছি অদ্যই আমার শেষ রজনী।" এবার মীরসাহেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আমি বলছি তোর কোনও ভয় নেই আয়। তোকে নিয়ে যাব বলেই তো এসেছি আমরা। তুই যে এ পথে আসবি সে তো আমাদের

জানাই ছিল। হাওড়া শিয়ালদহ দুটো স্টেশনেই নজর ছিল আমার। ধুন্ধর ও আজিজকে তাই তোর পেছন লাগিয়েছিলাম। তারা উপপ্রদর্শনের জন্যই তোকে দেখা দিয়ে আড়াল হয়ে গেছে। আমি জানতাম বোলপুরে না দিলেই তুই সাঁইথিয়ায় নামবি। না নামলে রামপুরহাটে তোদের জোর করে নামাতাম। তোর জন্যে আমরা মাসাঞ্জোরে অপেক্ষা করছিলাম। ধুন্ধরের ফোন পেতেই আমরা তৈরি ছিলাম তোকে অভ্যর্থনা করার জন্য। যে গাড়িতে তোরা আসছিস সেই গাড়ির নম্বরও আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল।"

মরিয়মের মুখে সব শুনে বিস্ময় যেন সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগল আমার। আমার গোয়েন্দাগিরির জীবনে এ যেন এক অদ্ভুতের চমক। বললাম, "তারপর?"

"আমি কোনও সাড়াশব্দ না করে গাছের আড়ালেই রইলাম। শুধু অপেক্ষা করতে লাগলাম ওদের একজনের অন্তত গাড়ি থেকে নেমে আসার। কেউ যখন নামছে না আমি হঠাৎই তখন চিৎকার করে উঠলাম 'উঃ মরে গেলাম, বাবারে! কীসে কামড়ালো আমায়। সাপ—সাপ—আমাকে সাপে কামড়েছে। উঃ মাগো...।" বলে গলাটা বিকৃত করলাম। আর তখনই এক এক করে ছুটে এল ওরা। আমি তখন এলোপাথারি গুলি চালাতে লাগলাম ওদের দিকে। পরপর তিনটি গুলি জালালকে লাগল। বাকিগুলো ফসকালো। আমার গুলি শেষ হতেই আমাকে ধরে ফেলল ওরা। ওদেরই একজন আমাকে গুলি করতে যাচ্ছিল। মীর বাধা দিয়ে বলল, "এমন সুখের মৃত্যু ওর জন্য নয়। ওকে একটা শুকনো গাছের সঙ্গে বেঁধে আগুন পোয়াতে দে।"

আমি সব শুনে বললাম, "বাকিটা তো আমার জানা। তা রাত যে শেষ হতে চলল মরিয়ম। এবার চলো ফেরা যাক।"

মরিয়ম যেন শিউরে উঠল আমার কথায়। বলল, "ক্ষেপেছেন? এত কাণ্ডের পর আমি কি আত্মপ্রকাশ করে জেলের ঘানি টানতে যাব? অনেক দুঃখের পথ পার হয়ে মুক্তির আলো দেখেছি আমি। এখন আমাকে মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে বেড়াতে দিন আপনারা। আমাকে বিদায় দিন। ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই আমি মিলিয়ে যেতে চাই। কাল সকালে আপনি ওদের নাথনগরে পৌঁছে দিন। আমার বোন রাবেয়াকে রেখে গেলাম। একটু দেখবেন ওকে। আর এই হতভাগিনী মরিয়মকে যেন ভুলবেন না।"

মরিয়ম আমাকে হ্যান্ডশেক করে বিদায় নেবার জন্য পা বাড়াতেই আমি যা কখনও কারও সঙ্গে করিনি তাই করলাম। ওর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে টান দিলাম। বললাম, "কোথায় যাচ্ছো তুমি? কেন যাচ্ছো?"

"আমি যে সন্ত্রাসবাদিনী।"

"তুমি যে খুন করেছ তার কোনও প্রমাণ আছে? পুলিশের খাতায় ব্ল্যাক লিস্টে তোমার নাম আছে?"

"জানি না।"

সব কিছুই প্রমাণ-সাপেক্ষ। তুমি সন্দেহভাজন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনও কিছুরই প্রমাণ নেই তোমার। তাই বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াও তুমি। চক্রে পড়ে যা কিছু করেছ তা ভুলে যাও। ভবিষ্যতে আর কখনও এ কাজ কোরো না। এখানেও আর থেকো না তুমি। কলকাতায় ফিরে গিয়ে খিদিরপুরেই থেকো।"

মরিয়ম অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

আমি বললাম, "হাঁ করে দেখছ কি এসো।"

আমি ওকে একটু ঘুরপথে বড়ো রাস্তার দিকে নিয়ে এলাম। তারপর এক ই
ওকে লুকিয়ে রেখে সোজা চলে এলাম অকুস্থলে যেখানে তখন বেশ কতকগুলো গা.
থেমেছে। আপ ডাউনের অনেকগুলো গাড়ি। লোকজনও জমেছে অনেক। ওদের দে
বুঝলাম পুলিশ নয়, এদেরই চলাফেরার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম তখন।

আমি ওদের সামনে গিয়ে রামু রাউতের সেই স্কুটারটা যেটা আমি নিয়ে এসেছিলা
সেটাতে বসলাম। কয়েকজন প্রশ্ন করল, "ব্যাপারটা কী এই রাতে?"

বললাম, "দেখতেই তো পাচ্ছেন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরিণাম। নিজেদের মধ্যেই মারামারি
করে মরেছে সব। পুলিশি ঝামেলায় যদি পড়তে না চান তো এখনই কেটে পড়ুন।"

একটি কথাতেই কাজ হল। মীরের গাড়িটা রাস্তা ধারে ঠেলে সরিয়ে নিজেদের রাস্তা
ঠিক করে কেটে পড়ল সব।

আমি স্কুটার নিয়ে মরিয়মের কাছে এলাম। তারপর ওকে পিছনের সিটে বসিয়ে দ্র
চলে এলাম রামু রাউতের বাসায়।

আর এখানে থাকা নয়।

রামু রাউত চা খাবার কথা বলল। আমরা ওইটুকু সময়ও আর নষ্ট না করে ওকে
ধন্যবাদ জানিয়ে রওনা হলাম দুমকার দিকে। চা পর্বটা আমরা দুমকাতেই সেরে নিলাম
তারপর ভাগলপুর হয়ে নাথনগরে কৃষ্ণাদের বাড়িতে।

কৃষ্ণার মা হারানো সন্তান ও মেয়েকে ফিরে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে
পেলেন। পরের ভাইটিও দিদিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল হাউ হাউ করে। আমি ওদে
বাড়িতে দিন দুই থেকে মরিয়ম ও রাবেয়াকে নিয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়। তবে
মরিয়মকে খিদিরপুরে রাখার ঝুঁকিটা আর নিলাম না। ওকে পাঠিয়ে দিলাম কানপুরে আমা
এক ব্যবসায়ী বন্ধুর ফ্যাক্টরিতে ছোটোখাটো একটা কাজ দিয়ে! ডানকুনিতে ধৃত কুশারী
পাণ্ডে সমস্ত অপরাধ কবুল করায় কয়েক বছরের জেল হল তার। রাকেশ শর্মাকেও
রীতিমতো ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল এবারের মতো। সে কিন্তু কথা রেখেছিল
এখানকার পাট চুকিয়ে চলে গেল তার স্বদেশেই। দুর্যোগের মেঘ কেটে যাওয়ায় কৃষ্ণারও
বিয়ে হল ভাগলপুরের এক বিত্তবান যুবকের সঙ্গে। অর্থাৎ সব দুঃখই দূর হল ওদের।

কিছুদিন পরে কানপুর থেকে মরিয়মের একটা চিঠি এল। চিঠিতে সে লিখছে
"মরিয়মের কথা মনে আছে তো? মরিয়মকে যেন ভুলবেন না। দিনে রাতে একবারও যদি
মরিয়মকে মনে করেন তবে এই হতভাগিনী মরিয়ম তার জীবনকে ধন্য মনে করবে।"

আমি চিঠির প্রতিটি ছত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে এক অপার্থিব আনন্দ অনুভব
করলাম।